পৌষ ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

BanglaBook.org

কলকাতার কাছেই, উপকণ্ঠে, পৌষ-ফাগুনের পালা—এই ট্রিলজি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্র কুমার মিত্রের সর্বোত্তম সাহিত্যসৃষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু—এইরকম সময়ের পটভূমিতে এই ট্রিলজির কাহিনীর সূত্রপাত। কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা পত্নী রাসমণি ও তার তিন কন্যার জীবন নিয়ে এই উপন্যাস-ত্রয়ীর কাহিনী শুরু। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যমা শ্যামাকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, তবু রাসমণির তিন কন্যার ক্রমবর্ধমান পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার নরনারী বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে কাহিনীতে অসাধারণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কাহিনীর অখন্ডতা লাভ করেছে। সংস্কারে সংস্কৃতিতে উন্নত অথবা নিদারুণ দারিদ্রক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের এই সব মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ-সংকীর্ণতা, আশা-নিরাশা, ছোট-বড় সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ সবকিছুর মধ্য দিয়েও তাদের অপরাজেয় জীবনাকাঙ্ক্ষার এবং জীবনযুদ্ধের এক নিটোল অনবদ্য কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক যা আমরা আগে শুনিনি, আজকাল শোনা যায় না, অদূর আগামীকালে শুনব কিনা সন্দেহ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে এই ট্রিলজি নিঃসন্দেহে একটি দিকচিহ্ন।

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে গজেন্দ্র কুমার মিত্র একটি বর্ণাঢ্য নাম। জীবনের বিচিত্র কথকতা তাঁর রচনায় আলাদা মাত্রা লাভ করেছে। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় সাহিত্যের চিত্রনে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

'কলকাতার কাছেই' 'উপকণ্ঠে' এবং 'পৌষ ফাগুনের পালা' এই ত্রয়ী উপন্যাস রচনা করে গজেন্দ্রকুমার মিত্র মননশীল পাঠকদের নজর কেড়েছেন বিশেষভাবে। এর মধ্যে 'পৌষ ফাগুনের পালা' পাঠকমহলে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও সমাদৃত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার এই উপন্যাসের জন্যে অতিরিক্ত মর্যাদা বয়ে এনেছে।

'পৌষ ফাগুনের পালা'-র চরিত্রগুলো বাঙালির সহজ-সরল জীবনের গল্পকথায় যেন কেবল অনবদ্য নয় চিত্রন্তনও।

www.BanglaBook.org

পৌষ ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মুক্তধারা

মুক্তধারা
২৩১৬
প্রতিষ্ঠাতা : চিত্তরঞ্জন সাহা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক : বিজলী প্রভা সাহা

প্র কা শ ক
জহর লাল সাহা
মুক্তধারা [স্বত্বঃ পুথিঘর লিঃ]
২২ প্যারীদাস রোড ঢাকা-১১০০

প্র কা শ কা ল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্র চ্ছ দ
রাজীব রায়

ব র্ণ বি ন্যা স
ঈশিন কম্পিউটার, ঢাকা-১১০০

মু দ্র ণ
ঢাকা প্রিন্টার্স ঢাকা-১১০০

মূ ল্য
৫০০ টাকা

ISBN : 978-984-8858-47-9

POUSH FAGUNER PALA
[Novel]
By Gajendra Kumar Mitra
Published by Jahar Lal Saha, Muktadhara [Prop. Puthighar Ltd]
22 Pyaridas Road, Dhaka-1100, Bangladesh
Second Edition : September 2016
Cover Design : Razib Roy
Price : Taka 500.00

Distributor in India **Puthipatra [kolkata] Pvt. Ltd.**
9 Anthony Bagan Lane, Kolkata-9
Distributor in UK **Sangeeta Ltd.**
22 Brick Lane Street, London
Distributor in Canada **ATN MEGA STORE**
Toronto, Canada
Online Distributor : www.rokomari.com/muktadhara

উৎসর্গ

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিয়ে আলো, আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিল তুলি; তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু, নাই সে কেবল দিন গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস-বায়ু।

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নর-নারী; তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক– বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্রজগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সকাল সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল। বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনেফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে– তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।

–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের প্রধান দুটি পরিবারের বংশ-তালিকা ॥

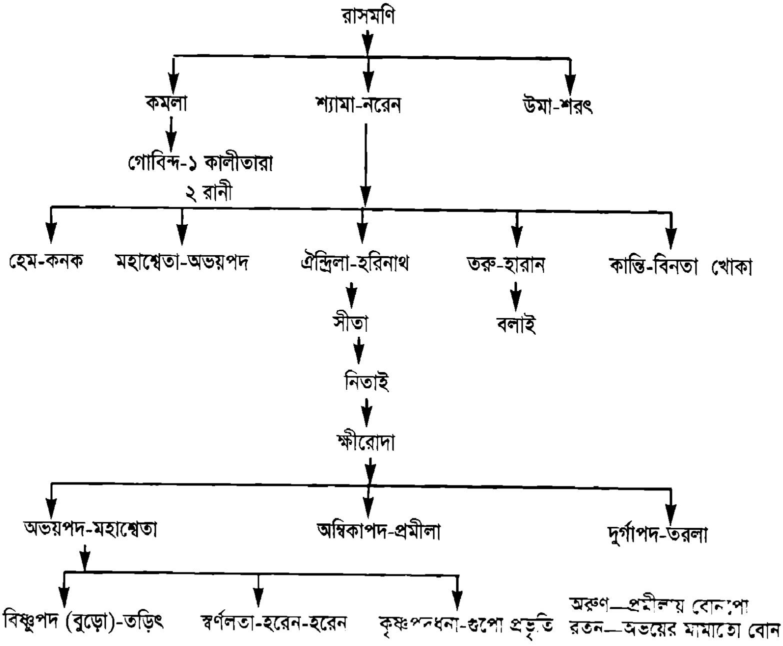

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

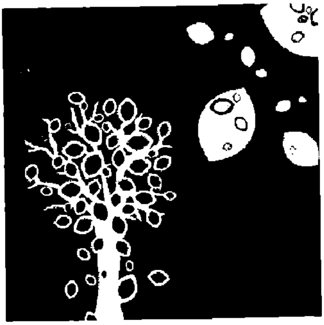

পৌষ-ফাগুনের পালা

ভোর হ'তে না হ'তে আসতে শুরু হয় হাওড়া ও শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে— কেরাণী ও কুলিবোঝাই ট্রেনগুলো। হাজার হাজার মানুষ নামে সে সব গাড়ি থেকে। লিলুয়া-বেলুড়-দমদমের নানান কারখানার শ্রমিক এরা, অসংখ্য অগণিত অফিসের কেরানি। এই দু দলই বেশি— কিন্তু তা ছাড়াও আসে বহুরকমের মানুষ, সারাদিন ঘুরে ঘুরে গস্ত ক'রে সন্ধ্যার সময় ফেরে বিপুল মালের বোঝা টেনে; আসে হোটেল-রেস্তোরাঁ মিষ্টান্নভাণ্ডারের বয়-খানসামা-কারিগর; বিপুল পণ্যের পসরা নিয়ে আসে ব্যাপারীর দল, শাকসবজি-ফলমূলের ফসল নিঃশেষ ক'রে টেনে আনে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে; ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরাও আসে কিছু কিছু; আসে কর্মপ্রার্থী বেকারের দল। আরও ছোট-বড় বহু উদ্দেশ্য ও আশা নিয়ে আসে বহু বিচিত্র মানুষ। সকাল থেকে বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত বিরাট জনতা দলে দলে এসে পৌছতে থাকে এই সুবিপুল মহানগরীর দুটি দ্বারপ্রান্তে।

এরা থাকে নানান জায়গায়। বহুদূর— চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল কিংবা আরও দূরে থাকে কেউ কেউ। দূরবর্তী স্টেশন থেকেও হয়ত দু-তিন মাইল তফাতের ঝিঁঝি-ডাকা, জোনাকি-জ্বলা জনবিরল নিভৃত গ্রাম সে-সব। আবার খুব কাছাকাছি জায়গা থেকেও আসে অনেকে। কলকাতার একেবারে কাছে, গায়ে-গায়ে লেগে থাকা গণ্ডগ্রাম ও উপনগরীর জনাকীর্ণ স্টেশন থেকেও বিস্তর লোক আসে। সংখ্যায় এরাই বরং বেশি। বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, কালিঘাট, উল্টোডাঙ্গা, দমদম, আগরপাড়া, সোদপুর, বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌরীগ্রাম, কদমতলা, বড়গেছে, মাকড়দা— আরও অসংখ্য নামের স্টেশন থেকে আসে তারা গাড়ি-বোঝাই হয়ে। ট্রেনগুলো যেন অজগরের মতো স্টেশনে স্টেশনে গিলতে গিলতে আসে মানুষগুলোকে— একেবারে এখানে পৌছে উগরে দেয়। ঐটুকু ট্রেনের একটা কামরায় অতগুলো মানুষ ছিল তা চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চায় না। যেমন বিশ্বাস হ'তে চায় না কাছাকাছির ঐসব স্টেশনগুলোয় দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য লোক শেষ পর্যন্ত উঠবে এই ঠাস-বোঝাই কামরাগুলোর মধ্যে।

নিঃশেষে শুষে নেয় এই শহর আর তার আশপাশের কলকারখানা অফিসগুলো— বহুদূরস্থিত উপকণ্ঠের কর্মক্ষম মানুষগুলোকে। অনেককে ভোরবেলাই বেরোতে হয় — ফেরে একেবারে রাত্রে। বহুদূরের গ্রাম থেকে আসে যারা, অথচ ঠিক আটটায় যাদের হাজিরা দিতে হয়, তাদের কেউ কেউ সূর্য অনুদয়েই ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। গরমের দিনেও দিবালোকে তাদের মুখ দেখতে পায় না ঘরের লোক। মেচাদা-বাগনান

BanglaBook.org

থেকে যারা লিলুয়ার কারখানায় চাকরি করতে আসে, তাদের ছেলেমেয়েরা রবিবার বাড়ির মধ্যে একটা অপরিচিত লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

এমনি করে আসতে আসতে বেলা দশটার মধ্যেই নিঃশেষে চলে আসে খেটে-খাওয়া মানুষের দল। পড়ে থাকে শুধু রুগ্ন অশক্ত শিশু ও ছেলেমেয়েরা। তারপর সারাটা দিন যেন ঘুমিয়ে থাকে এই সব জায়গাগুলো।

এখন— এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভ ও ভারতভঙ্গের পর হয়ত আর অতটা নেই। এই শহর এগিয়ে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। এখন জনবিরল ও নিভৃত সুপ্তশান্ত গ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন। অসংখ্য সমস্যার জটিল ও কুটিল ঘূর্ণাবর্তে শান্তি বা সুপ্তি গেছে তলিয়ে। কিন্তু উনিশ শ' কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশেও এরকম ছিল না। তখন সকাল আটটা থেকেই এই সব জায়গাগুলোতে শুরু হয়ে যেত প্রমীলার রাজত্ব। আপন আপন গৃহস্থালিতে খেটে খাওয়া বাঁধা জীবনযাত্রার মেয়ে তারা। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমিত, শক্তি ছিল সামান্য। তাদের জ্ঞান ছিল সংসারের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। অতি সংকীর্ণ গণ্ডিবাঁধা পথে আবর্তিত হ'ত তাদের জীবনযাত্রা। বাইরের বিপুল জগৎ তাদের কাছে অস্পষ্ট ধারণার বস্তু মাত্র। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেদের বিশেষ বিশেষ সমস্যার ঠুলি পরে তারা সংসারের ঘানি-গাছে ঘুরে মরত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ছোট ছোট আশা-কামনা— অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধি কলহ-কচকচির মধ্যেই একদিন তারা চোখ মেলত এ-পৃথিবীতে; আবার তার মাঝেই একদিন বুজে যেত সে-চোখ চিরকালের মতো। অতি ছোট ছোট তৃপ্তি বা অতৃপ্তি বুকে নিয়ে সেদিন যাত্রা করত তারা বিধাতার দরবারে— যিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়েও তার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ দেন নি তাদের।

আমার এ কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে এমনি সময়েই— এমনি মানুষদের নিয়েই। শ্যাওলাদামে ভর্তি টোপাপানায় ঢাকা ডোবার মতোই নিস্তরঙ্গ তাদের জীবন। সেখানে বাইরের ঝড়ঝাপটা সামান্য স্পন্দন মাত্র জাগাতে পারে— তরঙ্গ তুলতে পারে না। বাহির বিশ্বের বিপুল কোন বিপর্যয় তাদের কাছে দূরশ্রুত মেঘ-গর্জনের মতোই, বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস তাদের অলস-অবসর বিনোদনের উপাদান মাত্র। সে-সব যুগান্তকারী ঘটনার পরিণাম তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, তার থেকে নিজেদের কূপমণ্ডুক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যাও ঢের বড়।

তবু কাল বদলায়। বিশ্ব-সংসার নিজের নিয়মে আবর্তিত হয়। সে পরিবর্তন তাদের আপাত-স্থির জীবনেও চাঞ্চল্য আনে, ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

এ কাহিনী সেই নিস্তরঙ্গতার ও সেই চাঞ্চল্যের। সেই স্থাবরতার ও সেই ভাঙ্গনের।

লেখক

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

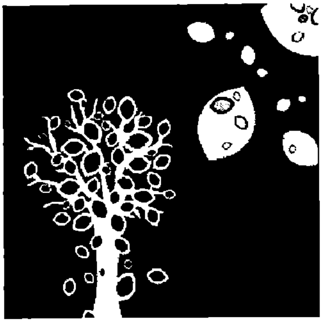

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোকে বলে ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়— এ হবেই। যে সৎপথে থাকে, যে ধর্মকে ধরে থাকে শেষ পর্যন্ত তারই জিৎ হয় এ সংসারে। বহু লোকের মুখেই কথাটা শুনেছে মহাশ্বেতা। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে। নানা বিভিন্ন রূপে, নানা বিভিন্ন শব্দবিন্যাসে। তবে শব্দে বা রূপ যে তফাৎই থাক— সব কথারই সার-মর্ম এক। দীর্ঘ-দিন ধরে শোনার ফলে বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল কথাটায়। আর সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি ক'রেই দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা অস্পষ্ট আকারহীন আশার প্রাসাদও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সে প্রাসাদের ভিত্তিমূল এবার নড়ে উঠেছে, সেই বিশ্বাসটাকেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না কোনমতে।

'মিছে কথা! মিথ্যে কথা ওসব! কথার কথা। লোকের বানানো গালগপ্প!... ধম্মপথে থাকো তাহ'লেই তোমার সব হবে। মুখে আগুন অমন সব হওয়ার। মুড়ো খ্যাংরা মারতে হয় অমন একচোকো ধম্মের মুখে আর ঐ ধম্মের গৎ যারা আওড়ায় তাদের মুখে! গুণে গুণে সাত ঘা ঝ্যাঁটা মারতে হয়! আমার দরকার নেই আর ওসব ধম্মের বুলিতে। অরুচি ধরে গেছে একেবারে। জম্মের শোধ অরুচি ধরে গেছে। সব মিছে, সব ভুয়ো।— আসল কথা যে যা সুবিধে করে নিতে পারো এ সংসারে—নাও। হরেহম্মে হোক, লুটপাট করে হোক— আপনার কাজটি বাগিয়ে নাও— তোমারই জিৎ। কিচ্ছু হবে না। হবেই বা কি? অকা সরকার বলত না যে মাকড় মারলে ধোকড় হয়—চালতা খেলে বাকড় হয়, তাই ঠিক।... যার বুদ্ধি আছে, ক্ষ্যামতা আছে, বুকের পাটা আছে— এ সংসারে তারই জয়-জয়কার— বুঝেছ? খোদ ভগবানও তাকে ভয় করে চলে।'

কথাগুলো যে কাকে বোঝায়—নিজেকে না প্রতিপক্ষকে, তা মহাশ্বেতা নিজেও জানে না। বেলা নটা দশটার সময় পুকুরঘাটে যখন কেউ থাকে না তখন সকালের এক-পাঁজা এঁটো বাসন নিয়ে গিয়ে জলে ভিজোতে দিয়ে বসে বসে আপনমনেই গজরাতে থাকে সে। যেন বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে।

মাঝে মাঝে শ্রোতাও জুটে যায় অবশ্য। ওবাড়ির জেঠতুতো বড় জা লীলার মা মাঝে মাঝে এই সময়টায় ঘাটে আসেন। তাঁর ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে, দুই বৌ-ই বলতে গেলে সংসার বুঝে নিয়েছে— সুতরাং কাজ কম। প্রথম প্রথম বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করে দিন কাটত, এখন তারাই গিন্নি, তাদের স্বামীর রোজগারে সংসার চলে, কাজেই সেদিক দিয়ে বেশি সুবিধে হয় না। একটা কথা বললে তারা দশটা শুনিয়ে দেয়। এখন সকাল

BanglaBook.org

থেকে একটি গামছা কোমরে, একটি গামছা বুকে দিয়ে তিনি বাগানে ঘুরে বেড়ান। নিজের বাগানে উচ্ছে গাছে ঠেকো দেওয়া, শসা গাছের মাচা ঠিক করা হয়ে গেলে— কোন কোন দিন নিচু বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে এদের বাগানেরও তদ্বির করেন। অবশ্য একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে নয়— কারণ যেমন নিঃসঙ্কোচে তিনি এসে এদের বাগানে বেগার খাটেন তেমনি নিঃসঙ্কোচেই যাবার সময় এদের বাগান থেকে ডুমুরটা, খাড়াটা— সুবিধে হ'লে গোটাকতক আমড়া, এমন কি কাঁদি থেকে দুটো চারটে কাঁচ-কলাও পেড়ে নিয়ে যান। এরা তা' জানে, কারণ লীলার মা চুরি করেন না— প্রকাশ্যেই নেন। প্রমীলা প্রথম প্রথম ঝগড়া করত— বৃথা দেখে এখন আর করে না। লীলার মা সপ্রতিভভাবেই হেসে বলতেন, 'রাগ করিস কেন নতুন বৌ, এ তো আমার নেয্য পাওনা—ফী। কাজ করে দিই—তার মজুরি নেই?'

প্রমীলা হয়ত বলত, 'কে কাজ করতে বলে আপনাকে? কে সাধে?

'ওমা—সাধাসাধির আবার কী আছে? এ তো পরের বাগানের কাজ নয়—আপনার লোক, দশরাত্তিরের জ্ঞাতি। আমারটা করব তোদেরটা করব না? এ আবার কি কথা!'

ভোর থেকে বাগানের তদ্বির ক'রে এই সময়টা লীলার মার স্নান করতে আসার সময় হয়। বিশেষ করে মহাশ্বেতার গলার আওয়াজ পেলে হাতের দুটো একটা কাজ বাকি রেখেও চলে আসেন। ওধারের ঘাটের একটা পৈঠেতে বসে হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কী হ'ল লা সেজ বৌ, আজ আবার ধম্মকে নিয়ে পড়লি কেন?'

'এর আবার পড়াপড়ির কি আছে! অসহ্যি হয় বলেই বলা। তোমরা তো দেখছ, সেই সাত বছরের মেয়ে এদের বাড়ি এসেছি, একদিনের জন্যে কারুর মন্দ করেছি, না কারুর কুচ্ছো করে বেড়িয়েছি? ভূতের খাটুনি খেটেছি চিরকাল—গুরুজনরা যা বলেছে করেছি; কখনও উঁচু বাগে চেয়ে দেখেছি এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না.. তা কী ফলটা হ'ল বলতে পারো? আমি যে দাসি সেই দাসিই রয়ে গেলুম এ বাড়িতে। যিনি রাণীগিরি করতে এসেছিলেন তিনি রাণীগিরি করে যাচ্ছেন। এই কি ধম্মের বিচার হ'ল? কেন, আমি তাঁর কি করেছি?'

কৌতুকের ও তৃপ্তির হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় লীলার মার। যতদূর সম্ভব কণ্ঠে সহানুভূতি টেনে এনে বলেন, 'আর দুটো চারটে বছর কাদায় গুণ ফেলে কাটিয়ে দে, তারপর আর তোর ভাবনা কি? ষেটের এখনই তো তোর ছেলেরা সব মাথাধরা হয়ে উঠেছে, ওরাই তো বড়ো— দুদিন পরে তো ওরাই বাড়ির কত্তা হবে। তখন তোর কাছেই জোড়হস্ত থাকতে হবে সবাইকে।'

'ওগো রেখে বোস, রেখে বোস। ওসব কথা আমাকে শোনাতে এসো না। বলে অত সুখ তোর কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে।... আমার কপাল কত্তা পোক্কার দেখছ না। আমার দিদ্‌মা বলতেন যে, যে আঁটকুড়ো হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে।... ছেলেদের কথা আর তুলো না। ওরা আরও এক কাটি সরেশ। নিজেরা তো নিজেদের গণ্ডা বুঝে নিতে পারেই না, আমি কিছু বলতে গেলে উল্‌টে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।...হবে না, কেমন ঝাড়ের বাঁশ সব। ওদের গুষ্টি চিরকাল মহারাজা মহারাণীর সামনে হাতজোড় করে কাটালে আর যথাসম্ভব এনে তাদের খপ্পরে তুলে দিলে— ওরাও তাই শিখবে তো! এখনই সপুরী সব সেইখেনে দেখগে যাও হাতজোড় করে আছে। তাও যদি তারা মুখপানে চাইত একটু।...লজ্জা ঘেন্না পিরবিত্তি কিছু কি আছে ওদের! থাকবেই বা কি করে, জম্মে এস্তক যা দেখছে তাই তো শিখবে! বলে আগন্যাঙলা যেমনে যায় পেছন্যাঙলা তেমনে ধায়। ঝ্যাঁটা মারো এমন সংসারে আর এমন ছেলে-পুলেতে!'

BanglaBook.org

নির্গমনের পথ পেলেই নাকি বাষ্পের বেগ প্রবলতর হয়ে ওঠে, সেইটাই নাকি বাষ্পযন্ত্রের মূল কথা। মহাশ্বেতার অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ-বাষ্পও বহিরাগমনের এই সামান্য পথ বেয়ে প্রবলতর বেগ ধারণ করে। তারই উত্তেজনায় সে আর কিছু করার মতো খুঁজে না পেয়ে হাত দিয়ে ঢেইয়ে জল তুলে তুলে অকারণেই ঘাটের পৈঠেগুলোকে ধুতে শুরু করে!

আসলে মহাশ্বেতার সবচেয়ে বড় ব্যথার জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছেন লীলার মা।

জীবনে সব কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে এই শেষ আশাটিকেই ধরে ছিল সে। ছেলেরা তো তার আপন, ওরা তো তার পেটেই হয়েছে—ওদের ওপর তার কর্তৃত্বটা খাটবে। আর ওরা বড় হয়ে উঠলে সেই কর্তৃত্ব একদিন সংসারের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু সেই সর্বশেষ আশাটিতেই বুঝি ছাই পড়তে যাচ্ছে। ছেলেরা কেউ লেখাপড়া শেখে নি, কেউ শিখছে না—। ওর মা বলেন, 'বামুনের ঘরের গোরু! ওরে তোর জন্মদাতাকে দেখে শিখলি না— ভদ্দরলোকের ছেলে বামুনের ছেলে মুখ্খু হ'লে কী হয়। যেমন করে পারিস লেখাপড়া শেখা। খানিকটা অন্তত ইংরিজি শিখুক। করছিস কি!' কিন্তু সেটা নিয়ে তত মাথা ঘামায় না মহাশ্বেতা। সে জানে যে এদের বংশে তেমন কেউ হবে না। লেখাপড়া শিখুক না শিখুক—ওদের দাদামশায়ের মতো অমানুষ হয়ে উঠবে না। সভ্যতা সহবৎ এ আর নতুন ক'রে জানবার দরকার নেই, এ ওদের মধ্যেই আছে। এদের—মানে ওদের বাপ-কাকার ধারা খানিকটা তো পাবেই।... আর রোজগার? তার জন্যেও ভাবে না সে। ওদের গুষ্টিরা কে কত লেখাপড়া শিখেছিল? তারা যদি মোট মোট টাকা রোজগার করে আনতে পারে—ওরা পারবে না! সে একরকম ঠিক হয়েই যাবে, বয়স বাড়লেই বাপ-কাকারা যেখানে হোক ঢুকিয়ে দেবে!...ওদের বাপ-কাকার সে আমল থেকে কালের হাওয়া যে খানিকটা পাল্‌টেছে, এ কথাটা মহাশ্বেতার মাথায় ঢোকে না। সেটা বোঝবার মতো শিক্ষাদীক্ষা বা অনুকূল আবহাওয়া কিছুই তো সে পায় নি!

না, সে সব চিন্তা নেই ওর।

ওর জ্বালা অন্যত্র। ছেলেগুলো, মেয়েটা—যত বড় হচ্ছে সব যেন এক-কাঠ্‌ঠা হচ্ছে, সবাই গিয়ে জড়ো হচ্ছে ওদিকে, শত্তুর দিকে। কেউ কি তার দিক টানতে নেই! এই জন্যেই তো আরও এত আক্রোশ ওর জায়ের ওপর। গুণতুক যে কিছু করে সে সম্বন্ধে মহাশ্বেতার মনে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কেন? কেন? এত করেও কি আবাগী সর্বনাশীর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল না? ছেলের বাপকে তো স্বামী-স্ত্রী মিলে চিরকাল ভেড়া করে রাখলে— আবার ছেলেমেয়েগুলোকেও ধরেছে! মেয়েটাও তো ওর দিকে হ'তে পারত! কী মন্তর যে ঝাড়ে মেজবৌ, ছেলেমেয়েগুলো সব যেন ওর কথায় ওঠে বসে। একটা কিছু বলবার জো নেই— নেয্য কথা, যথা-কথা বলবার থাকলেও বলতে পারে না—এ ওদের জন্যে। শত্রু হাসবার লজ্জায় অপমানে সরে আসতে হয় মুখে কুলুপ এঁটে।

এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত কম সইতেও তো হ'ল না মহাশ্বেতাকে। সাত বছরের মেয়ে সে এসেছে বৌ হয়ে—এখনকার দিনে সে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলে। সাত বছরের বৌ আর বাইশ বছরের বর। কথাটা শুনলে হাসে সবাই। এমন কি সেদিনও হেসেছিল অনেকে। কিন্তু এমন অসম বিবাহ দেওয়ার জন্যে মহাশ্বেতা অন্তত তার মাকে দোষ দিতে পারে না। সেদিন না হোক, পরে সে বুঝেছে যে কী অবস্থায় পড়ে তাঁকে এ বিবাহে মত দিতে হয়েছে। বরং সেদিন যে তাঁর মনে সামান্য এই বয়সের ব্যবধানটুকু বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, এ জন্য মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

মহাশ্বেতার মা শ্যামা তখন একেবারে অসহায়। সরকার বাড়ির নিত্যসেবার আধসের চাল, কখানা বাতাসা আর একপো দুধ এই তাঁর তখন একমাত্র ভরসা— তিন চারটি

BanglaBook.org

ছেলেমেয়ে নিয়ে ঐটুকু সম্বল করেই দিন কাটছে তাঁর, অর্থাৎ দিনের পর দিন উপবাস করছেন। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতেন অর্ধেক দিন, সে জন্য সে চালটুকুও ভোগে আসত না প্রায়ই, কারণ পূজোর কাজটা পরকে ডেকে চালাতে হ'ত সে সময়। যে পরের বাঁধা কাজে বেগার দিতে আসবে সে অবশ্যই শুধু হাতে যাবে না। অতগুলি প্রাণীর ঐ সামান্য সম্বলটুকুও তাকে ধরে দিতে হ'ত। ঠাকুরের সেবা না হ'লে ঐ তিনদিক চাপা ঘরখানাও থাকে না— একেবারেই পথে বসতে হয়। উপবাস করে পড়ে থাকবার জন্যেও তো মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন চাই।

এই চরম দুঃসময়ের মধ্যেই সরকারগিন্নী মঙ্গলা প্রস্তাবটা এনেছিলেন। দোষে গুণে জড়ানো বিচিত্র মানুষ মঙ্গলা, কিন্তু দোষ যা-ই থাক, তিনি যে ওদের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই প্রথম ওদের বাড়ি আসার দিনটি থেকেই, শ্যামা ওঁর কাছে নানাভাবে উপকৃত। তাছাড়া তিনিই সেদিন বলতে গেলে শ্যামাদের একমাত্র অভিভাবিকা। মনিবগিন্নী তো বটেই। সুতরাং তিনি যখন এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলেন এবং 'তুই ভাবিস নি বামনী, যেমন করে হোক হয়ে যাবে' এই আশ্বাস দিয়ে বিয়ের ভারটা সত্যি সত্যিই একরকম নিজের হাতে তুলে নিলেন— তখন আর শ্যামার ইতস্তত করা সম্ভব হয় নি, সে অবস্থা তাঁর ছিল না। তাই সাত বছরের মেয়ের চেয়ে বরের পনেরো বছর বেশি বয়সটা সেদিন কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

কিন্তু বয়সের এই প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানটাই মহাশ্বেতার কাছে খুব বড় কথা ছিল না। বাইশ বছরের পুরুষ তারপর ঢের দেখেছে মহাশ্বেতা, এখনও ঢের দেখছে—ঐ বয়সে অমন রাশভারী পুরুষে পরিণত হ'তে আর কাউকে দেখে নি। তার কপালেই যেন এমনি সৃষ্টিছাড়া হয়ে জন্মেছিল অভয়পদ। শুধু কি বয়সের, আরও বহু ব্যবধান ছিল দুজনে। মহাশ্বেতা চিরদিনই বেঁটেখাটো গোল-গোল— অভয়পদ লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ। মহার রঙ্ মাজামাজা, অভয় ফিট্ গৌরবর্ণ। অত বড় পুরুষ ঘনকালো চাপ দাড়ি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল একরত্তি একটুখানি মেয়েকে। সেই প্রথম চারচোখে চাওয়ার ক্ষণটি থেকেই মহাশ্বেতা স্বামীকে যে ভয় ও সমীহের চোখে দেখেছিল, সারা জীবনেও তার আর কোন পরিবর্তন হয় নি। পরবর্তীকালে তার সম্বন্ধে স্বামীর স্নেহেরও কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছে, তাঁকে পরম আশ্রয় বলে অবলম্বন করতে পেরেছে, তবু সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর স্থিতধী মানুষটির সম্বন্ধে তার সেই সবিস্ময় সম্ভ্রমের ভাবটা কখনও কাটে নি; আজও সে তাঁকে মনে মনে ভয় ও সমীহ করে চলে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে পর্যন্ত কাকেই বা সে ভয় না করত!

একে তো ঐ বয়সে, বলতে গেলে মূলসুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে, সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়ায় নতুন জগতে আসা। তার ওপর উপদেশ ও হুঁশিয়ারীরও অন্ত ছিল না সেদিন। শ্বশুরবাড়িতে কী ভাবে চলতে হয়, কীরকম আচরণ করলে বাপের বাড়ির নিন্দা হ'তে পারে এবং সেটা যে কী পর্যন্ত গর্হিত কথা ও বাপ-মার সম্বন্ধে অপমানকর— কোন মতেই সে নিন্দা যে হ'তে দেওয়া উচিত নয়— সে সম্পর্কে বিচিত্র ও বিবিধ উপদেশে বিহ্বল ও দিশেহারা হয়েই এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিল সে। সে জন্য ভয়ের অন্ত ছিল না। তার ভালমানুষ শাশুড়িকে পরবর্তীকালে আর কেউ ভয় করেছে বলে জানা নেই মহাশ্বেতার, কিন্তু সে করেছে। ফলে সে দেবর ননদ কারুর কাছেই জ্যেষ্ঠাবধূর পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'তে পারে নি কোনদিন। সকলেই তাকে অবহেলা করেছে, ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে নি কখনও। তার অনেক পরে মেজ বৌ এসে অনায়াসে তাকে ডিঙ্গিয়ে এ বাড়ির কর্তৃত্বের রাশ টেনে নিয়েছে নিজের হাতে।

Banglabook.org

আসলে বুদ্ধি ও সাংসারিক অভিজ্ঞতাতেও সে সকলের পিছনে পড়ে আছে চিরকাল। বুদ্ধিটা হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই তার কম, তার ওপর যখন তার বিয়ে হয়েছে তখন তার মস্তিষ্ক পরিণত হবার কথা নয়, বুদ্ধিও নিতান্ত অপরিণত। আর এখানে এসে এমন ভাবেই এদের সংসারের ঘানিগাছে আটকে গেছে যে, আর কোন দিকে তাকিয়ে দেখার—এ বাড়ি বা এ সংসারের বাইরেকার কোন অভিজ্ঞতা লাভ করার—সুযোগ ঘটে নি। সুবিপুল জগৎ তার কাছে এই বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সব দিক থেকেই, সে যেন তার সেই সাত বছরের বয়ঃসীমার কাছাকাছিই থেকে গিয়েছে।

কিন্তু মেজ জা প্রমীলা এসেছিল অনেক বেশি বয়সে। তাছাড়া স্বভাবতই সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। ভগবান এক একটি মেয়েকে অনেকের ওপর আধিপত্য করবার সহজ সনদ দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান, প্রমীলাও সেই ধরনের মেয়ে। সে এসে স্বাভাবিকভাবেই শাশুড়ি, জা, ননদদের ডিঙ্গিয়ে গেছে। চেহারাও অবশ্য তার খারাপ নয়, কিন্তু পুরুষ রূপের চেয়ে অনেক বেশি আকৃষ্ট হয় মেয়েদের বুদ্ধির দীপ্তিতে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়। প্রমীলার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ছোট দেওর দুর্গাপদ তো দিনকতক উন্মত্তই হয়ে উঠেছিল ওকে নিয়ে; ছোট বৌ তরলার কী দুঃখেই না দিন কেটেছে সে সময়টা— নিতান্ত তার কপালে আছে স্বামী পুত্র ভোগ করা তাই ফিরে পেয়েছে দুর্গাপদকে, সেও নিতান্ত দৈবাৎ। কিন্তু তবু পুরোটা পেয়েছে বলে মনে করে না মহাশ্বেতা— নইলে আজও তো সেই মেজ বৌয়ের কথায় দুর্গাপদ ওঠে বসে, মাইনের টাকা পাই-পয়সাটি এনে ধরে দেয় তাকেই।

অবশ্য সেদিক দিয়ে অভয়পদ সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই মহাশ্বেতার। দেবতাদের চরিত্রেও দোষ আছে, অভয়পদর চরিত্রে নেই। সেদিক দিয়ে সাক্ষাৎ মহাদেব। মহাশ্বেতার ক্ষোভ অন্যত্র। অভয়পদও মুখে স্বীকার না করুক, মনে মনে প্রমীলাকেই ঐ সংসারের প্রকৃত গৃহিণী বলে জানে। আর বোধ হয় সেই জন্যেই, না কখনও সে মহাশ্বেতার সঙ্গে কোন সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করে, না তাকে কোন কথা খুলে বলে। স্নেহ আছে— কিন্তু সে স্নেহ ছেলেমানুষের প্রতি বয়স্ক লোকের। জীবনের অংশীদার বলে গ্রহণ করতে পারলে না কখনও। ঠিক এমনভাবে গুছিয়ে হয়ত ভাবতে পারে না মহাশ্বেতা কিন্তু এই ধরনেরই আকারহীন একটা নিরুদ্ধ অভিমান তাকে নিরন্তর পীড়া দিতে থাকে। কিছুতেই কোন মতে স্বস্তি পায় না।

এত কথা ছেলেমেয়েদের জানবার কথা নয়, তারা জানেও না। এর মূল চলে গেছে বহুদূর অতীতে। এর ইতিহাস শুরু হয়েছে তাদের জন্মের পূর্ব থেকে। এ অভিমানের কারণ ও মূল্য বোঝবার মতো জীবন-অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। তারা শুধু এর বহিঃপ্রকাশটাই দেখে। কারণ খুঁজে পায় না বলেই ভাবে অকারণ। মহাশ্বেতাকে দোষী করে তাই।

এমন কি সেদিনের মেয়ে স্বর্ণলতা পর্যন্ত বলে, 'মা যেন সর্বদা কী এক জ্বালায় ছিট্‌ফিটিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমার বাপু মনটা ভাল নয়, যাই বলো। বড্ড রীষ তোমার। তোমার কোনদিন ভাল হবে না, দেখে নিও। দিদিমা ঠিকই বলে, খল যান রসাতল। তোমার ভাল হবে কী করে?'

মহাশ্বেতা শোনে আর আরও জ্বলে যায়। ললাটে করাঘাত করে। ছুটে চলে যায় নির্জন জায়গায় মনের বিষ উদ্গীরণ করতে।

॥ ২ ॥

স্বামী অভয়পদের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার বিস্তর নালিশ। সে স্ত্রীর সঙ্গে কোন দিন কোন বিষয়ে আলোচনা করে না; সে স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘকাল— প্রথম সন্তান হওয়ার পর থেকেই এক ঘরে বাস

BanglaBoi.org

করে না; তারই পয়সায় শুধু নয়, বেশির ভাগ তারই গতরে এতবড় বাড়িটা উঠেছে অথচ তার বৌ শোয় সবচেয়ে পুরানো আর সবচেয়ে চাপা ঘর-খানায় (তারই ব্যবস্থা) এবং সে নিজে শোয় চলনে, তাও একখানা কাঠের বেঞ্চির ওপর; যুদ্ধের সময় চোরাই মাল সরিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছিল, সেই সব টাকাটাই সে মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে, শুধু তাই নয় আজ পর্যন্ত মাইনের সমস্ত টাকাটা ধরে দেয় ভাইয়ের হাতে; খায় সে-ই সবচেয়ে খারাপ; কাপড় পরে সবচেয়ে মোটা আর খাটো; এক ময়লা জিনের কোট ছাড়া কোন জামা পরল না আজ পর্যন্ত; চিরকাল হেঁটে অফিস করেছে এখান থেকে—তিন ক্রোশ তিন ক্রোশ ছ' ক্রোশ পথ। এখন হাঁটতে পারে না, ট্রেনে যায় কিন্তু ট্রামে কখনও চড়ে নি— অথচ তারই পয়সায় বড়মানুষ হয়ে ভায়েরা কত কাপ্তেনি করছে; সংসারে খাটে মজুরের মতো কিন্তু সে সংসার পরিচালনার ব্যাপারে একটা কথাও বলে না কোনদিন, এমন কি মেজকর্তার 'কুচক্কুরে-পানায়' ছেলেগুলো যে একটাও লেখাপড়া শিখছে না— সে সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার পুরো নালিশের ফর্দ লিপিবদ্ধ করলে একটা বড় পুঁথি হয়ে যাবে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, অভয়পদের এই সর্বশেষ কীর্তির জন্য মহাশ্বেতা সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। সে যে ওর সঙ্গে এমন শত্রুতা করবে, এতবড় সাধে বাদ সাধবে তা কখনও কল্পনাও করে নি সে। যার সম্বন্ধে এই দীর্ঘকাল, প্রায় দু যুগ ধরে যে প্রচণ্ডতম অথচ অসহায় বিদ্বেষ বহন করে আসছে— তাকে এতদিন পরে আঘাত দেবার এমন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রটি যে কেড়ে নেবে অভয়পদই— এ সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

আর কী কৌশলেই না মেজকর্তা অম্বিকাপদ এই কাজটি করিয়ে নিলে! উঃ সত্যি, বুদ্ধির কথা ধরলে নিত্য উঠে মেজকর্তার 'পাদোক জল' খাওয়া উচিত, এত বড় ধূর্ত, এমন ফন্দিবাজ বোধহয় আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্তত মহাশ্বেতার জীবনে আর কারুর কথা মনে পড়ে না। তার চেয়েও এক কাঠি সরেশ হ'ল মেজগিন্নী। বিধাতা নির্জনে এসে এদের জোড় মিলিয়েছেন।

না, একটা অনাথ বালক আশ্রয় পেল তাতে কোন ক্ষোভ নেই মহাশ্বেতার। প্রথম যখন খবরটা কানে গেল যে মেজ বৌয়ের সদ্য বিধবা বোন সরমা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, একমাত্র অনাথ ছেলেটার মুখে জল দেবার কেউ নেই, পাড়ার লোকের দয়ার ওপর নির্ভর করে একা সেই ভুতুড়ে ভাঙ্গা বাড়িতে পড়ে আছে—তখন কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসেছিল মহাশ্বেতার, 'আহা ছেলেটাকে এখানে এনে রাখলে তো হয়।' আগেকার মতো বোকা থাকলে বলেই ফেলত হয়ত কিন্তু ইদানীং অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভাবতে শিখেছে সে, ওর মুখ থেকে কথাটা বেরোলেই মেজবৌ লুফে নেবে, আর সেই সঙ্গে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন কথা শোনাবার মত পথটিও চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ভেবেই অতিকষ্টে মুখের কথা মুখে চেপে রেখেছিল মহাশ্বেতা।

অথচ ঠিক সেই কাণ্ডটিই তো হ'ল।

সরমা বেচারির চিরকালই পোড়া কপাল। বিয়ে হয়েছিল যখন তখন ওর বর কোন্ সরকারি ইস্কুলে মাস্টারি করে— তখনকার দিনের ঈপ্সিত পাত্র। কারণ বিদ্বান এবং সরকারি-চাকরে একাধারে। কিন্তু বিয়ের পরই দেখা গেল ওর স্বামী প্রভাস চিররুগ্ন; রোগ তার সর্বাঙ্গে, বলতে গেলে সর্ববিধ। বারোমাসই ভোগে এবং প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। ফলে মাসের পর মাস ইস্কুল কামাই হ'তে থাকে। নেহাৎ সরকারি ইস্কুল বলেই কাজটা অনেকদিন টিকে ছিল কিন্তু সমস্ত রকম নিয়ম-কানুন এবং কর্তৃপক্ষের ধৈর্যের সীমা যেদিন লঙ্ঘন করল সেদিন আর টিকল না।

BanglaBook.org

সেও প্রায় দশ বছরের কথা। এর পর থেকেই প্রভাস বসে বসে খাচ্ছে। তবু তখনও মা ছিলেন, মার জন্য ছোটভাইকে কিছু কিছু দিতে হ'ত— এমনই বরাত, কিছু দিন বাদেই মাও মারা গেলেন। কোথাও থেকে কোন আয়ের পথ রইল না। কখনও এক আধটা মাস্টারি যে না পেয়েছে তা নয়, কিন্তু কোনটাই রাখতে পারেনি। একমাস কি আঠারো দিন কাজ করার পরই যদি দু-মাস কামাই হয় তো সে মাস্টারকে রাখাই বা যায় কী করে? প্রাইভেট টিউশ্যনিও মধ্যে মধ্যে পেয়েছে—দেশে-ঘাটে সে টিউশ্যনির কীই বা মূল্য—তবু তাও তো থাকে নি। সর্বত্র একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ এই দীর্ঘকাল বসে বসেই খেতে হয়েছে এবং কিছু কিছু চিকিৎসার খরচও যোগাতে হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার উপায় থাকত না প্রায়ই। চিকিৎসা করাতে গেলে ডাক্তার ডাকতে হয়, ওষুধ কিনতে হয়। ইদানীং চোখ বুজেই থাকত প্রায় সরমা — পাড়াঘর থেকে শোনা টোটকা-টুটকি ভরসা ক'রে। কিন্তু এক-এক সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হত তখন আর চুপ করে থাকা যেত না। তার ফলে একে একে যথাসর্বস্ব — জমি জায়গা, গহনা, আসবাব, মায় বাসন-কোসন বিক্রি করতে হয়েছে। এছাড়া আত্মীয়স্বজনদের কাছে ভিক্ষা তো আছেই। কিন্তু ক্রমাগত সাহায্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়— সুতরাং তারা প্রায় সকলেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। একেবারে এমনি অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় এনে পৌছে দিয়ে প্রভাস যেদিন মারা গেল সেদিন সরমা আর কোনও পথই কোথাও দেখতে পায় নি— আত্মহত্যা ছাড়া। সেই পথই সে বেছে নিয়েছে। আসন্ন শ্রাদ্ধ ও ছেলের ভবিষ্যতের সমস্যা ভগবান ও পাড়ার লোকের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে সে কড়িকাঠ ও পুরনো শাড়ির সাহায্যে সব জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

খবরটা পাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা, ছোট দেওর দুর্গাপদর মুখে। সরমার গ্রামের একটি ছেলে ওদের অফিসে কাজ করে— তার মুখেই শুনেছে দুর্গাপদ। খবরটা শুনে মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল, ছেলেটাকে আনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে— কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের এতবড় ব্রহ্মাস্ত্রটা নষ্ট করতেও মন ওঠে নি, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে ছিল।

সব মাটি করল অভয়পদ।

তিনভাই এক সঙ্গে খেতে বসেছিল। অম্বিকাপদই কথাটা তুলল, 'আমার সেজশালির কেলেঙ্কারিটা শুনলে দাদা?'

অভয়পদ মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

'কাল নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে সে!'

অভয়পদ মাথা নামিয়ে ধীরে সুস্থে ভাত মাখতে মাখতে শুধু প্রশ্ন করল, 'ছেলেটা?'

'ছেলেটা পাড়ার লোকের ওপর জিম্মে— আর কি! ঘরে নাকি একটা কাঁথাকানিও আর নেই বেচবার মতো। শ্রাদ্ধশান্তি করে শুদ্ধ হবারও একটা খরচ চাই তো, সেই জন্যেই বোধ হয় কোনদিকে কোন কূলকিনারা না পেয়ে গলায় দড়ি দিলে ছুঁড়িটা। কীই বা করবে-- এমন অবস্থা হয়েছিল, ভিক্ষেও তো বোধ হয় আর কেউ দিত না। নিত্যি নেই দেয় কে, নিত্যি রুগী দেখে কে! তা প্রভাসচন্দ্রের তো দুটোই ছিল কিনা।'

অভয়পদ কোন কথা কইল না, যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেয়ে যেতে লাগল। রান্নাঘরের ভেতরেই ওরা খেতে বসেছে। বড় মেজ দুই বৌই সেখানে উপস্থিত। দেখা বা শোনা কোনটারই অসুবিধা নেই।

খানিকটা পরে অম্বিকাপদই আবার প্রসঙ্গটা তুলল, 'তাহ'লে কিছু তো সাহায্য করা দরকার—কী বলো দাদা?'

BanglaBook.org

'সাহায্য কী করতে চাও?' শান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অভয়পদ।

'যাহোক কিছু। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও কিছু আসবে নিশ্চয়, কিন্তু খরচও তো কম হবে না, নমো-নমো করে করলেও বেশ কিছু লাগবে। ছেলেটার তো শুনেছি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। অথচ ওর নাকি মাথা খুব ভাল, পড়াশুনোয় চাড়ও খুব। পাড়ার লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে নিয়ে নিজে নিজেই পড়ে যা পারে।'

'ছেলেটাকে এখানে বরং আনিয়ে নাও, যা হয় করে এখানেই শুদ্ধ হবেখন্।'

সংক্ষেপে এই কথা বলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় অভয়পদ। রাত্রের খাওয়া তার খুবই কম, সেটুকু সারা হয়ে গেছে।

ঠিক এতটার জন্যে বোধহয় অম্বিকাপদও তৈরি ছিল না, কিংবা সবটাই অভিনয় (মহাশ্বেতার বিশ্বাস তাই)— সে একটু অবাক হয়ে বললে, 'এখানে আনিয়ে নেব? মানে বরাবরের মতো? নইলে একবার নিয়ে এলে তো আর ঘাড় থেকে নামানো যাবে না!'

'সেইটেই যথার্থ উপকার করা হবে, নইলে দু-দশ টাকা সাহায্য করলেই বা কি না করলেই বা কি?' ওর শুদ্ধ হওয়া কি আর আটকে থাকবে? যেমন করেই হোক হয়েই যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা দায়িত্ব নেওয়া—। এখানে আনলে মানুষ করার সব দায়টাই তো চাপবে আমাদের ওপর!'

'তোমার এখানে এতগুলো লোক খাচ্ছে, একটা ছেলে বাড়তি খেলে টেরও পাবে না। আর মানুষ করা? মানুষ যদি হয় তো সে আপনিই হবে— না হয় সেখানে থাকলেও যা করত এখানেও তাই করবে। জবাবদিহি তো কারুর কাছে করতে হবে না সে জন্যে!'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না। তার পক্ষে এতগুলো কথা বলাই ঢের।...

আর বলার দরকারই বা কি! অম্বিকাপদর মুখ স্মিত প্রসন্ন ভাব ধারণ করল। প্রমীলা স্বামীকে উপলক্ষ্য করে এবং সম্ভবত মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সত্যি, অনেক তপস্যা ক'রে এমন দাদা পেয়েছিলে! মানুষ নয়— সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের সঙ্গে মিলোতে গিয়েই আমরা ভুল করি, দোষ দিই—কিন্তু আমাদের মাপে মেলবার লোকই নয় যে।... ওঁকে এখনও তোমরা কেউ চিনতে পারো নি— এ আমি জোর করে বলতে পারি।'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অসহ্য ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। এবার আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'কেমন করে চিনবে মেজবৌ, যাদের গোড়ে গোড় দেয় সদাসব্বদা, তারাই চেনে! মনের মতো কথা বললেই দেবতা— নইলে যারা হক্ কথা বলে তারা সব জানোয়ার বই তো কিছু নয়!'

'পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে! তোমারই বা অস্বৈরণ হয় কেন দিদি! তোমায় তো কেউ বলে নি। তাছাড়া কে হক্ কথা বলে আর কে মিছে কথা বলে তা তো ঠিক করে বোঝবার কোন উপায় নেই! তা তোমার হক্ কথাটা কী শুনিই না?'

'আর শুনে দরকার কি ভাই! যার কথা শোনবার তা তো শোনা হয়েই গেছে। দেববাক্য তো বেরিয়েছে মুখ দিয়ে— আর কেন?'

'তবে কি তুমি বলতে চাও, এনে কাজ নেই ছেলেটাকে? স্পষ্ট করে খুলে বলোই না মনের কথা! অনাথ আতুর একটা ছেলে তোমাদের বাড়িতে দুটো পাতকুড়োনো ভাত খেয়ে মানুষ হ'ত— তা না হয় হবে না। কী করা যাবে, মনে করব সেও নেই, মরে গেছে। চোখে তো দেখতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া—রাস্তা তো কেউ তার ঘোচায় নি, কত লোকই তো ভিক্ষে করে জীবন কাটাচ্ছে!....তার জন্যে এত রাগারাগির কী আছে? বট্ঠাকুর যাই বলুন, তোমার যদি মত না থাকে তো তাকে আনবে কে এখানে? আনব কি দুবেলা তোমার ঐ

Banglabook.org

মধুর বাক্যি আর খোঁটা শোনবার জন্যে? তারপর শোকাতাপা ছেলেটা রেলে গলা দিক কি পুকুরে ঝাঁপ দিক— আমাদের মুখটা আরও উজ্জ্বল হোক আর কি! চোখের বাইরে যা-খুশি হোকগে, মরুক বাঁচুক আমরা তো আর দেখতে যাচ্ছি না। আমরা কেন এখানে এনে মাঝখান থেকে নিমিত্তের ভাগী হই?.... না বাপু, ও বটঠাকুর যাই বলুন, বড়গিন্নীর যখন মত নেই, তখন তুমি ও ব্যাপারে আর যেও না, এই সাফ বলে দিলুম!'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলও বলা যায়—সে গালে হাত দিয়ে একদিকে মাথাটা হেলিয়ে বলল, 'বাব্‌বা, কী বানাতেই পারিস তুই মেজবৌ! তাকে আনা আমার ইচ্ছে নয়— একথা আমি কখন বললুম লা, কার গলা জড়িয়ে বলতে গেলুম? বলে শুনে এস্তক চোখে জল রাখতে পারছি না, মনটা ছট্-ফট্ করছে— একটা দুধের বালক বাপ-মা মরা অনাথ— তার যদি একটা গতি হয় আমি তাতে বাদ সাধব! না তাকে আমি কথা শোনাতে যাবো?.... আমি কি এমনই পিচেশ?... উঃ ধন্যি বাবা, ধন্যি! দিনকে রাত করতে পারিস তোরা। আমারই ঘাট হয়েছিল তোদের কাছে মুখ খুলতে যাওয়া। বলি না তো কখনও, মুখে তো কুলুপ এঁটেই থাকি! যে যা খুশি করুক, মরুক হাজুক—এই শিক্ষা হয়ে গেল, আর যদি কখনও দুটি ঠোঁট ফাঁক-করি!'

বলতে বলতে রাগে দুঃখে অভিমানে অবিচারবোধে দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে মহাশ্বেতার— সে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর যেতে যেতেই— সেই অবস্থাতেই— নিজের নির্বুদ্ধিতার পূর্ণ অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এ বিষয় নিয়ে অন্তত মেজবৌকে কোন কথা শোনাবার পথটা সেও বন্ধ করে দিয়ে এল চিরদিনের মতো। আর শুধু অভয়পদকে দিয়েই নয়, তাকে দিয়েও বলিয়ে নিলে মেজবৌ, ছেলেটাকে এখানে আনাবার কথা!

॥ ৩ ॥

অরুণ প্রথমে এসে অতটা বুঝতে পারে নি। প্রথমত দুটো প্রবল শোক, একান্ত নিঃসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুর্ভাবনা, তারপর একেবারে অপরিচিত পরিবেশ—সবটা মিলিয়ে সে একটু বিহ্বল হয়েও পড়েছিল। কোন জিনিস ভাল করে লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তাছাড়া, কোন ঘটা না থাক— শ্রাদ্ধশান্তির কিছুটা ঝঞ্ঝাটও আছে—সেজন্য নিজেকে যথেষ্ট বিব্রত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে সবগুলো মিটে গেলে থিতিয়ে বসার পর যখন চারিদিকে চাইবার মতো দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হ'ল, তখন সে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল। ছেলে তিন কর্তার মিলিয়ে যেটের আটটি তখনই— মেয়ে অবশ্য একটি। লেখাপড়ার বয়স এদের সকলেরই হয়েছে, প্রথম তিনজনের তো উৎরেই গেছে। মেজকর্তা ও ছোটকর্তার তিন ছেলে এবং বড়কর্তার ছোটটি তবু ইস্কুল পাঠশালায় যায় একবার ক'রে— বড়গুলো তাও যায় না। যারা যায় তারাও কেউ কখনও বাড়িতে বই নিয়ে বসে না। এরা তাহ'লে পড়ে কখন?

অরুণের পড়াশুনো হয় নি, হ'তে পারে নি ব'লে। কিন্তু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা যে পড়াশুনোর একটা ঠাট্ বজায় রাখারও চেষ্টা করে না এবং সেজন্যে তাদের অভিভাবকরাও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নন, এটা তার সমস্ত অভিজ্ঞতায় অতীত। তাই সে প্রথমদিকে একদিন বোকার মতো একটা প্রশ্নও করে ফেলেছিল মেজছেলে কেষ্টকে, 'ভাই তোমরা পড় কখন?'

কেষ্ট বা কৃষ্ণপদকে প্রশ্ন করার কারণ— এ বাড়ির মধ্যে তাকেই ওর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ভদ্র ব'লে মনে হয়েছিল। সে কথাও কয় এদের মধ্যে কম।

BanglaBook.org

'সাহায্য কী করতে চাও?' শান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অভয়পদ।

'যাহোক কিছু। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও কিছু আসবে নিশ্চয়, কিন্তু খরচও তো কম হবে না, নমো-নমো করে করলেও বেশ কিছু লাগবে। ছেলেটার তো শুনেছি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। অথচ ওর নাকি মাথা খুব ভাল, পড়াশুনোয় চাড়ও খুব। পাড়ার লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে নিয়ে নিজে নিজেই পড়ে যা পারে।'

'ছেলেটাকে এখানে বরং আনিয়ে নাও, যা হয় করে এখানেই শুদ্ধ হবেখন্।'

সংক্ষেপে এই কথা বলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় অভয়পদ। রাত্রের খাওয়া তার খুবই কম, সেটুকু সারা হয়ে গেছে।

ঠিক এতটার জন্যে বোধহয় অম্বিকাপদও তৈরি ছিল না, কিংবা সবটাই অভিনয় (মহাশ্বেতার বিশ্বাস তাই)— সে একটু অবাক হয়ে বললে, 'এখানে আনিয়ে নেব? মানে বরাবরের মতো? নইলে একবার নিয়ে এলে তো আর ঘাড় থেকে নামানো যাবে না!'

'সেইটেই যথার্থ উপকার করা হবে, নইলে দু-দশ টাকা সাহায্য করলেই বা কি না করলেই বা কি?' ওর শুদ্ধ হওয়া কি আর আটকে থাকবে? যেমন করেই হোক হয়েই যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা দায়িত্ব নেওয়া—। এখানে আনলে মানুষ করার সব দায়টাই তো চাপবে আমাদের ওপর!'

'তোমার এখানে এতগুলো লোক খাচ্ছে, একটা ছেলে বাড়তি খেলে টেরও পাবে না। আর মানুষ করা? মানুষ যদি হয় তো সে আপনিই হবে— না হয় সেখানে থাকলেও যা করত এখানেও তাই করবে। জবাবদিহি তো কারুর কাছে করতে হবে না সে জন্যে!'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না। তার পক্ষে এতগুলো কথা বলাই ঢের।...

আর বলার দরকারই বা কি! অম্বিকাপদর মুখ স্মিত প্রসন্ন ভাব ধারণ করল। প্রমীলা স্বামীকে উপলক্ষ্য করে এবং সম্ভবত মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সত্যি, অনেক তপস্যা ক'রে এমন দাদা পেয়েছিলে! মানুষ নয়— সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের সঙ্গে মিলোতে গিয়েই আমরা ভুল করি, দোষ দিই—কিন্তু আমাদের মাপে মেলবার লোকই নয় যে।... ওঁকে এখনও তোমরা কেউ চিনতে পারো নি— এ আমি জোর করে বলতে পারি।'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অসহ্য ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। এবার আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'কেমন করে চিনবে মেজবৌ, যাদের গোড়ে গোড় দেয় সদাসব্বদা, তারাই চেনে! মনের মতো কথা বললেই দেবতা— নইলে যারা হক্ কথা বলে তারা সব জানোয়ার বই তো কিছু নয়!'

'পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে! তোমারই বা অসৈরণ হয় কেন দিদি! তোমায় তো কেউ বলে নি। তাছাড়া কে হক্ কথা বলে আর কে মিছে কথা বলে তা তো ঠিক করে বোঝবার কোন উপায় নেই! তা তোমার হক্ কথাটা কী শুনিই না?'

'আর শুনে দরকার কি ভাই! যার কথা শোনবার তা তো শোনা হয়েই গেছে। দেববাক্য তো বেরিয়েছে মুখ দিয়ে— আর কেন?'

'তবে কি তুমি বলতে চাও, এনে কাজ নেই ছেলেটাকে? স্পষ্ট করে খুলে বলোই না মনের কথা! অনাথ আতুর একটা ছেলে তোমাদের বাড়িতে দুটো পাতকুড়োনো ভাত খেয়ে মানুষ হ'ত— তা না হয় হবে না। কী করা যাবে, মনে করব সেও নেই, মরে গেছে। চোখে তো দেখতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া—রাস্তা তো কেউ তার ঘোচায় নি, কত লোকই তো ভিক্ষে করে জীবন কাটাচ্ছে!....তার জন্যে এত রাগারাগির কী আছে? বট্‌ঠাকুর যাই বলুন, তোমার যদি মত না থাকে তো তাকে আনবে কে এখানে? আনব কি দুবেলা তোমার ঐ

BanglaBook.org

মধুর বাক্যি আর খোঁটা শোনবার জন্যে? তারপর শোকাতাপা ছেলেটা রেলে গলা দিক কি পুকুরে ঝাঁপ দিক— আমাদের মুখটা আরও উজ্জ্বল হোক আর কি! চোখের বাইরে যা-খুশি হোকগে, মরুক বাঁচুক আমরা তো আর দেখতে যাচ্ছি না। আমরা কেন এখানে এনে মাঝখান থেকে নিমিত্তের ভাগী হই?.... না বাপু, ও বটঠাকুর যাই বলুন, বড়গিন্নীর যখন মত নেই, তখন তুমি ও ব্যাপারে আর যেও না, এই সাফ বলে দিলুম!'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলও বলা যায়—সে গালে হাত দিয়ে একদিকে মাথাটা হেলিয়ে বলল, 'বাব্‌বা, কী বানাতেই পারিস তুই মেজবৌ! তাকে আনা আমার ইচ্ছে নয়— একথা আমি কখন বললুম লা, কার গলা জড়িয়ে বলতে গেলুম? বলে শুনে এস্তক চোখে জল রাখতে পারছি না, মনটা ছট্-ফট্ করছে— একটা দুধের বালক বাপ-মা মরা অনাথ— তার যদি একটা গতি হয় আমি তাতে বাদ সাধব! না তাকে আমি কথা শোনাতে যাবো?.... আমি কি এমনই পিচেশ?... উঃ ধন্যি বাবা, ধন্যি! দিনকে রাত করতে পারিস তোরা। আমারই ঘাট হয়েছিল তোদের কাছে মুখ খুলতে যাওয়া। বলি না তো কখনও, মুখে তো কুলুপ এঁটেই থাকি! যে যা খুশি করুক, মরুক হাজুক—এই শিক্ষা হয়ে গেল, আর যদি কখনও দুটি ঠোঁট ফাঁক-করি!'

বলতে বলতে রাগে দুঃখে অভিমানে অবিচারবোধে দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে মহাশ্বেতার— সে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর যেতে যেতেই— সেই অবস্থাতেই— নিজের নির্বুদ্ধিতার পূর্ণ অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এ বিষয় নিয়ে অন্তত মেজবৌকে কোন কথা শোনাবার পথটা সেও বন্ধ করে দিয়ে এল চিরদিনের মতো। আর শুধু অভয়পদকে দিয়েই নয়, তাকে দিয়েও বলিয়ে নিলে মেজবৌ, ছেলেটাকে এখানে আনাবার কথা!

॥ ৩ ॥

অরুণ প্রথমে এসে অতটা বুঝতে পারে নি। প্রথমত দুটো প্রবল শোক, একান্ত নিঃসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুর্ভাবনা, তারপর একেবারে অপরিচিত পরিবেশ—সবটা মিলিয়ে সে একটু বিহ্বল হয়েও পড়েছিল। কোন জিনিস ভাল করে লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তাছাড়া, কোন ঘটা না থাক— শ্রাদ্ধশান্তির কিছুটা ঝঞ্ঝাটও আছে—সেজন্য নিজেকে যথেষ্ট বিব্রত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে সবগুলো মিটে গেলে থিতিয়ে বসার পর যখন চারিদিকে চাইবার মতো দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হ'ল, তখন সে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল। ছেলে তিন কর্তার মিলিয়ে যেটের আটটি তখনই— মেয়ে অবশ্য একটি। লেখাপড়ার বয়স এদের সকলেরই হয়েছে, প্রথম তিনজনের তো উৎরেই গেছে। মেজকর্তা ও ছোটকর্তার তিন ছেলে এবং বড়কর্তার ছোটটি তবু ইস্কুল পাঠশালায় যায় একবার ক'রে— বড়গুলো তাও যায় না। যারা যায় তারাও কেউ কখনও বাড়িতে বই নিয়ে বসে না। এরা তাহ'লে পড়ে কখন?

অরুণের পড়াশুনো হয় নি, হ'তে পারে নি ব'লে। কিন্তু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা যে পড়াশুনোর একটা ঠাট্ বজায় রাখারও চেষ্টা করে না এবং সেজন্যে তাদের অভিভাবকরাও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নন, এটা তার সমস্ত অভিজ্ঞতায় অতীত। তাই সে প্রথমদিকে একদিন বোকার মতো একটা প্রশ্নও করে ফেলেছিল মেজছেলে কেষ্টকে, 'ভাই তোমরা পড় কখন?'

কেষ্ট বা কৃষ্ণপদকে প্রশ্ন করার কারণ— এ বাড়ির মধ্যে তাকেই ওর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ভদ্র ব'লে মনে হয়েছিল। সে কথাও কয় এদের মধ্যে কম।

BanglaBook.org

'সাহায্য কী করতে চাও?' শান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অভয়পদ।

'যাহোক কিছু। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও কিছু আসবে নিশ্চয়, কিন্তু খরচও তো কম হবে না, নমো-নমো করে করলেও বেশ কিছু লাগবে। ছেলেটার তো শুনেছি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। অথচ ওর নাকি মাথা খুব ভাল, পড়াশুনোয় চাড়ও খুব। পাড়ার লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে নিয়ে নিজে নিজেই পড়ে যা পারে।'

'ছেলেটাকে এখানে বরং আনিয়ে নাও, যা হয় করে এখানেই শুদ্ধ হবেখন্।'

সংক্ষেপে এই কথা বলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় অভয়পদ। রাত্রের খাওয়া তার খুবই কম, সেটুকু সারা হয়ে গেছে।

ঠিক এতটার জন্যে বোধহয় অম্বিকাপদও তৈরি ছিল না, কিংবা সবটাই অভিনয় (মহাশ্বেতার বিশ্বাস তাই)— সে একটু অবাক হয়ে বললে, 'এখানে আনিয়ে নেব? মানে বরাবরের মতো? নইলে একবার নিয়ে এলে তো আর ঘাড় থেকে নামানো যাবে না!'

'সেইটেই যথার্থ উপকার করা হবে, নইলে দু-দশ টাকা সাহায্য করলেই বা কি না করলেই বা কি?' ওর শুদ্ধ হওয়া কি আর আটকে থাকবে? যেমন করেই হোক হয়েই যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা দায়িত্ব নেওয়া—। এখানে আনলে মানুষ করার সব দায়টাই তো চাপবে আমাদের ওপর!'

'তোমার এখানে এতগুলো লোক খাচ্ছে, একটা ছেলে বাড়তি খেলে টেরও পাবে না। আর মানুষ করা? মানুষ যদি হয় তো সে আপনিই হবে— না হয় সেখানে থাকলেও যা করত এখানেও তাই করবে। জবাবদিহি তো কারুর কাছে করতে হবে না সে জন্যে!'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না। তার পক্ষে এতগুলো কথা বলাই ঢের।...

আর বলার দরকারই বা কি! অম্বিকাপদর মুখ স্মিত প্রসন্ন ভাব ধারণ করল। প্রমীলা স্বামীকে উপলক্ষ্য করে এবং সম্ভবত মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সত্যি, অনেক তপস্যা ক'রে এমন দাদা পেয়েছিলে! মানুষ নয়— সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের সঙ্গে মিলোতে গিয়েই আমরা ভুল করি, দোষ দিই—কিন্তু আমাদের মাপে মেলবার লোকই নয় যে।... ওঁকে এখনও তোমরা কেউ চিনতে পারো নি— এ আমি জোর করে বলতে পারি।'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অসহ্য ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। এবার আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'কেমন করে চিনবে মেজবৌ, যাদের গোড়ে গোড় দেয় সদাসব্বদা, তারাই চেনে! মনের মতো কথা বললেই দেবতা— নইলে যারা হক্ কথা বলে তারা সব জানোয়ার বই তো কিছু নয়!'

'পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে! তোমারই বা অস্থির হয় কেন দিদি! তোমায় তো কেউ বলে নি। তাছাড়া কে হক্ কথা বলে আর কে মিছে কথা বলে তা তো ঠিক করে বোঝবার কোন উপায় নেই! তা তোমার হক্ কথাটা কী শুনিই না?'

'আর শুনে দরকার কি ভাই! যার কথা শোনবার তা তো শোনা হয়েই গেছে। দেববাক্য তো বেরিয়েছে মুখ দিয়ে— আর কেন?'

'তবে কি তুমি বলতে চাও, এনে কাজ নেই ছেলেটাকে? স্পষ্ট করে খুলে বলোই না মনের কথা! অনাথ আতুর একটা ছেলে তোমাদের বাড়িতে দুটো পাতকুড়োনো ভাত খেয়ে মানুষ হ'ত— তা না হয় হবে না। কী করা যাবে, মনে করব সেও নেই, মরে গেছে। চোখে তো দেখতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া—রাস্তা তো কেউ তার ঘোচায় নি, কত লোকই তো ভিক্ষে করে জীবন কাটাচ্ছে!....তার জন্যে এত রাগারাগির কী আছে? বট্ঠাকুর যাই বলুন, তোমার যদি মত না থাকে তো তাকে আনবে কে এখানে? আনব কি দুবেলা তোমার ঐ

BanglaBook.org

মধুর বাক্যি আর খোঁটা শোনবার জন্যে? তারপর শোকাতাপা ছেলেটা রেলে গলা দিক কি পুকুরে ঝাঁপ দিক— আমাদের মুখটা আরও উজ্জ্বল হোক আর কি! চোখের বাইরে যা-খুশি হোকগে, মরুক বাঁচুক আমরা তো আর দেখতে যাচ্ছি না। আমরা কেন এখানে এনে মাঝখান থেকে নিমিত্তের ভাগী হই?.... না বাপু, ও বটঠাকুর যাই বলুন, বড়গিন্নীর যখন মত নেই, তখন তুমি ও ব্যাপারে আর যেও না, এই সাফ বলে দিলুম!'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলও বলা যায়—সে গালে হাত দিয়ে একদিকে মাথাটা হেলিয়ে বলল, 'বাব্‌বা, কী বানাতেই পারিস তুই মেজবৌ! তাকে আনা আমার ইচ্ছে নয়— একথা আমি কখন বললুম লা, কার গলা জড়িয়ে বলতে গেলুম? বলে শুনে এস্তক চোখে জল রাখতে পারছি না, মনটা ছট্‌-ফট্ করছে— একটা দুধের বালক বাপ-মা মরা অনাথ— তার যদি একটা গতি হয় আমি তাতে বাদ সাধব! না তাকে আমি কথা শোনাতে যাবো?.... আমি কি এমনই পিচেশ?... উঃ ধন্যি বাবা, ধন্যি! দিনকে রাত করতে পারিস তোরা। আমারই ঘাট হয়েছিল তোদের কাছে মুখ খুলতে যাওয়া। বলি না তো কখনও, মুখে তো কুলুপ এঁটেই থাকি! যে যা খুশি করুক, মরুক হাজুক—এই শিক্ষা হয়ে গেল, আর যদি কখনও দুটি ঠোঁট ফাঁক-করি!'

বলতে বলতে রাগে দুঃখে অভিমানে অবিচারবোধে দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে মহাশ্বেতার— সে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর যেতে যেতেই— সেই অবস্থাতেই— নিজের নির্বুদ্ধিতার পূর্ণ অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এ বিষয় নিয়ে অন্তত মেজবৌকে কোন কথা শোনাবার পথটা সেও বন্ধ করে দিয়ে এল চিরদিনের মতো। আর শুধু অভয়পদকে দিয়েই নয়, তাকে দিয়েও বলিয়ে নিলে মেজবৌ, ছেলেটাকে এখানে আনাবার কথা!

॥ ৩ ॥

অরুণ প্রথমে এসে অতটা বুঝতে পারে নি। প্রথমত দুটো প্রবল শোক, একান্ত নিঃসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুর্ভাবনা, তারপর একেবারে অপরিচিত পরিবেশ—সবটা মিলিয়ে সে একটু বিহ্বল হয়েও পড়েছিল। কোন জিনিস ভাল করে লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তাছাড়া, কোন ঘটা না থাক— শ্রাদ্ধশান্তির কিছুটা ঝঞ্ঝাটও আছে—সেজন্য নিজেকে যথেষ্ট বিব্রত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে সবগুলো মিটে গেলে থিতিয়ে বসার পর যখন চারিদিকে চাইবার মতো দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হ'ল, তখন সে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল। ছেলে তিন কর্তার মিলিয়ে ষেটের আটটি তখনই— মেয়ে অবশ্য একটি। লেখাপড়ার বয়স এদের সকলেরই হয়েছে, প্রথম তিনজনের তো উৎরেই গেছে। মেজকর্তা ও ছোটকর্তার তিন ছেলে এবং বড়কর্তার ছোটটি তবু ইস্কুল পাঠশালায় যায় একবার ক'রে— বড়গুলো তাও যায় না। যারা যায় তারাও কেউ কখনও বাড়িতে বই নিয়ে বসে না। এরা তাহ'লে পড়ে কখন?

অরুণের পড়াশুনো হয় নি, হ'তে পারে নি ব'লে। কিন্তু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা যে পড়াশুনোর একটা ঠাট্ বজায় রাখারও চেষ্টা করে না এবং সেজন্যে তাদের অভিভাবকরাও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নন, এটা তার সমস্ত অভিজ্ঞতায় অতীত। তাই সে প্রথমদিকে একদিন বোকার মতো একটা প্রশ্নও করে ফেলেছিল মেজছেলে কেষ্টকে, 'ভাই তোমরা পড় কখন?'

কেষ্ট বা কৃষ্ণপদকে প্রশ্ন করার কারণ— এ বাড়ির মধ্যে তাকেই ওর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ভদ্র ব'লে মনে হয়েছিল। সে কথাও কয় এদের মধ্যে কম।

BanglaBook.org

কেষ্ট এ প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত বোধ করেছিল। সে একবার ঢোঁক গিলে, বাইরের দিকে চেয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'না, মানে পড়ি— এই কদিন গোলমালে সব ওলটপালট হয়ে গেছে আর কি। বসতে হবে— এবার বসতে হবে!'

কিন্তু তার এই আত্মসম্মান বজায় রাখার ক্ষীণ চেষ্টাটুকুকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল স্বর্ণ, 'তবেই হয়েছে। তুমি কাকে কী জিজ্ঞেস করছ অরুণদা! পড়া! মেজদাকে তুমি গাছে ওঠার কথা জিজ্ঞেস করো, ঘুড়ি ওড়াবার কথা বলো—মাছ ধরতে বলো, পোষ্কার পোষ্কার জবাব পাবে। এমন কি খটির বাজারে কোন্ জিনিসের কি দর, তা পজ্জন্ত ওর মুখস্থ। ঐ লেখাপড়ার কথাটি বাপু জিগ্যেস করো নি! ওটা এ বাড়ির ধাতে সয় না!'

কেষ্ট আরও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। লজ্জাটা রাগে রূপান্তরিত হয়ে চোটটা গিয়ে পড়ে স্বর্ণর ওপর, 'দ্যাখ বুঁচি, মেলাই ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি বলে দিলুম। মারব টেনে গালে একটি চড়, ছোট মুখে বড় কথা বলা বার করে দেব একেবারে!'

ঠোঁটের একটা অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি ক'রে বিচিত্র সুর টেনে সমান তেজের সঙ্গে জবাব দেয় 'বুঁচি, ইঃ! টেনে চড় মারবে? তবেই তো আমি ভয়ে ইঁদুরের গত্ত খুঁজলুম আর কি। মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ না একবার, মেজকাকী তোমার কী খোয়ারটা করে!.... অত তো তেজ দেখাচ্ছ, বেশ তো কই বার করো না, দেখাও না অরুণদাকে তোমার কখানা আর কী কী বই আছে! নিয়ে এসো না, দেখি!'

'যাঃ যাঃ! ওকে দেখাতে যাবো কী জন্যে? ও কি আমাদের গার্জেন নাকি! যাকে দরকার বুঝব তাকে দেখাব!' কেষ্ট একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি ক'রে চলে যায় সেখান থেকে।

আবারও খিল খিল করে হেসে ওঠে স্বর্ণ। বলে, 'মুখসাপোটটুকু তবু রাখা চাই ছেলের! ওধারে মুখ শুকিয়ে আম্‌সি।... সে যাকগে মরুক গে, মোদ্দা ওদের মুখ চাইলে তোমার পড়া হবে না। তুমি তোমার নিজের মতো নিজে পড়বে।'

দশ-বারো বছরের মেয়ে, সে তুলনাতেও বরং কিছু বেঁটেই দেখায় স্বর্ণকে। অর্থাৎ সেদিক দিয়ে মায়ের ধাতে গেছে। যদিও গায়ের রংটা তার দেখবার মতো, মুখচোখও কাটাকাটা, অভয়পদর মেয়ে বলে চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু স্বভাবটি পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে, এই বয়সেই গিন্নি-গিন্নি ভাব, হাতপা ঘুরিয়ে মুখচোখ নেড়ে কথা বলে বয়স্কা ঠাকুমা-দিদিমার মতো।

ঐটুকু মেয়ের অমনি পাকা কথা আর গিন্নিদের মতো চোখমুখ ঘুরিয়ে কথা বলা দেখলেই হাসি পায় অরুণের। আজও হাসি পেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি ম্লান হয়ে উঠল তার। মাথা হেঁট করে ডান পাশের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা ঘষতে ঘষতে বলল, 'আমি — মানে আমার তো বই পত্তর কিছুই নেই, ভেবেছিলুম এদের বই চেয়ে নিয়ে পড়ব। তেমন বই-ই তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'আছে। তেমন খুঁজলে এক-আধখানা বেরোবে বৈকি! মেজকাকার চেষ্টার তো কসুর নেই। বই সবাইকে কিনে দিয়েছিল— একেবারেই বাজে খরচ দেখে এদান্তে আর বড়গুলোকে দেয় না। তবে সে সব বই যে কোথায় আছে, কেমন আছে, তা বলতে পারব নি। সে বই খুঁজে বার করে তবে তুমি পড়বে— এই ভরসায় যদি থাকো তাহলে এহকালে আর তোমায় পড়তে হচ্ছে না, এ আমি পষ্টাপুষ্টি বলে দিচ্ছি! দাদার ভরসা বাঁয়ে ছুরি!... আর সে তুমি পড়বেই বা কি, ওরা তো সেই কোন্ কেলাস থেকে সব পড়া ছেড়েছে তার ঠিক নেই, সে বইতে তোমার কী হবে? তুমি তো আগে আগে ইস্কুলে পড়েছ শুনেছি।...না না, তোমায় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে! দাঁড়াও মেজকাকীকে বলিগে—'

BanglaBook.org

ছুটেই চলে যাচ্ছিল, অরুণ খপ্ করে ওর একটা হাত ধরে ফেললে। ধরে ফেলেছিল হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায়, তারপরই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'তা তোমার বই কই? তুমিও তো কিছু পড় না দেখি!'

স্বর্ণ ওর ধরন দেখে আবারও হেসে উঠল। তারপরই কিন্তু মুখটা গম্ভীর করে পাকাগিন্নীর ভঙ্গিতে বললে, 'হ্যাঁ, মেয়েছেলের আবার পড়া! যাবো তো পরের বাড়ি, আজ না হোক দুদিন বাদে সেই যেতেই তো হবে। আর সেখানে গিয়ে তো সেই হাঁড়িবেড়ি ধরা আর গোবর নিকোনো! গোচ্ছার পড়ে হবেই বা কি! না, ওসব বাপু আমার ভাল লাগে না। ততক্ষণ মা কি মেজকাকীকে সংসারের যোগাড় দিলে ঢের কাজ হবে।'

এবার অরুণও না হেসে পারল না। বললে, 'কিন্তু পরের বাড়ি গিয়ে গয়লা ধোপার হিসেবটাও তো রাখতে হবে। তাছাড়া বাপের বাড়িতে চিঠিও লিখতে ইচ্ছে করবে তো দুচারখানা। আজকাল তো সব মেয়েই পড়ে কিছু কিছু । একটু লেখাপড়া জানা থাকলে নিজের ছেলেমেয়েদেরও পড়াতে পারা যায়।'

'কে জানে বাপু! আমাদের তো হিসেব-টিসেব সব মেজকাকাই রাখে। অবিশ্যি মেজকাকী ছোটকাকীও কিছু কিছু জানে। ছোটকাকী তো বইটই হাতে পেলে বেশ পড়ে দেখিছি।... তা বেশ তো, তুমি পড়াশুনা আরম্ভ করো— আমি বরং তোমার কাছে পড়া বলে নেব, য়্যাঁ? সেই বেশ হবে।'

অরুণ হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল কিন্তু সেটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না স্বর্ণ— এক দৌড়ে চলে গেল রান্নাঘরে মেজকাকীর কাছে।

'হ্যাঁ গা মেজকাকী, তোমাদের তো মুখ্খুর সংসার, কারুর কিছু হবে না। তা ঐ ছেলেটাকেও কি বসিয়ে মুখ্খুর ডিম করবে?'

প্রমীলাও এই মেয়েটিকে ভালবাসে। এক মেয়ে বলে নয়—ওর মতো পরিষ্কার মন আর কারুর নেই বলে। ওর আপন-পর জ্ঞান কম, সবাইকেই আপন বলে মনে করে। তাছাড়া আজকাল মহাশ্বেতা কিছু কথা শোনাতে এলেই স্বর্ণ মেজকাকীর হয়ে ঝগড়া শুরু করে দেয়। সেটাও সম্ভবতঃ ওর প্রতি প্রমীলার প্রীতির একটা প্রধান কারণ।

'কে লা, কার কথা বলছিস?' প্রমীলা একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে চায়।

বাড়ির মধ্যে এই একটিই মেয়ে বলে স্বর্ণলতার আদর বেশি, তার সর্বত্রই অবারিত দ্বার। আজকাল বড়দের কাছে কোন কিছু চাইতে হ'লে ছেলেরা ওকেই মুরুব্বি ধরে। বুঁচি সুপারিশ করলেই আর্জি মঞ্জুর হয়— এ তারা বার-বারই দেখেছে।

আজও সে সস্নেহে স্বর্ণর একটা হাত ধরে বলল, 'বলি ব্যাওরাটা কী? গিন্নিমা আজ আবার সকালে কার ওপর সদয় হয়ে উঠলেন?'

'এই তোমার বোনপোর কথাই বলছি!' হাতমুখ-চোখ ঘুরিয়ে বলে স্বর্ণ, 'বলি ও তো এবাড়ির ছাঁচে নয়, ওর লেখা-পড়ায় চাড় আছে, ওর বিদ্যে হবেও। তা ওর বই-পত্তরের কিছু ব্যবস্থা করে দাও!'

'বল্ না গিয়ে তোর মেজকাকাকে। মেজকাকা তো তোর কথায় ওঠে বসে!' প্রমীলা ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে।

'হ্যাঁ, তা আর নয়! মেজকাকা যে কার কথায় ওঠে বসে তা এবাড়ির সবাই জানে। আমাকে ঘাঁটিও নি বাপু! এখন ওর কি করবে তাই বলো।'

'হবে গো গিন্নী হবে। এই তো আসছে মাস থেকে নতুন কেলাস শুরু হবে সব ইস্কুলে, তোমার মেজকাকা বলেছে ওকে একেবারে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বইপত্তর কিনে দেবে!'

BanglaBook.org

'বেশ বাপু বেশ। একটা সুরাহা হ'লেই ভাল।'

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বোধকরি অরুণকেই খবরটা দিতে আসছিল স্বর্ণ, কিন্তু রোয়াক পেরিয়ে দালানে পড়তেই পড়ে গেল একেবারে মায়ের সামনে। মহাশ্বেতা এখান থেকে সবই শুনতে পেয়েছে, সে মুখের একটা বিশ্রী ভঙ্গি করে চাপাগলায় বলে উঠল, 'পরের মেয়ের জন্যে তো মাথাব্যথার অন্ত নেই একেবারে! নিজের ভাইদের লেখা-পড়ার কী হচ্ছে তা তো কোন দিন ভাবতে দেখি না। কৈ, এত তো পীরিত, তাদের জন্যে একটা মাস্টার রাখতে তো বলতে পারিস মহারাজা-মহারাণীকে!'

'হ্যাঁ—তা আর নয়। যা রত্ন সব এক-একখানি গব্ভে ধারণ করেছে! ওদের জন্যে মাস্টার রাখবে! কত পড়ার চাড় ওদের দেখছ না! বলি মেজকাকা কি চেষ্টার কমতিটা করছে শুনি। ওদের ইস্কুলে দেয় নে? না বই কিনে দেয় নে? সেসব কোথায় গেল? ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাতে পেরেছিলে? মাস মাস একরাশ করে টাকা গুণগার দিয়ে এদান্তে না বন্ধ করেছে।... কত গুণের ছেলেরা তোমার তা দ্যাখো না — শুধু শুধু পরের ওপর রীষ করে জ্বলে পুড়ে মরো!'

'মুয়ে আগুন। মুয়ে আগুন লাগুক তোমার! কথার ছিরি দ্যাখো না। ভায়েরা সব যেন শত্তুর ওর। পরঘরী এখন থেকে ঘর ভাঙছেন! মর্ মর্! একধার থেকে তোরা মরিস তো আমি শান্তি পাই, আমার হাড় জুড়োয়। ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে কোথাকার? কবে মরবি তুই, কবে খালধারে যাবি তাই বলে যা আমায়!'

'দাঁড়াও আগে তোমাকে পাঠাই, তবে তো যাব!'

মুচ্কে হেসে আবার ছুটে চলে যায় স্বর্ণ। মার গালাগাল তার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

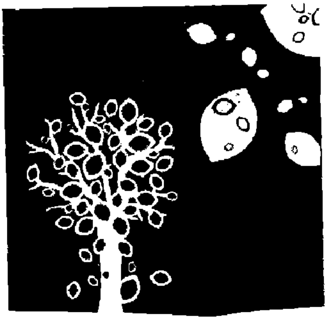

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাশ্বেতার নিজের কথাতেই, তার 'দুঃখের ভরা পরিপূন্ন হ'লে' তবে সে মায়ের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু শ্যামার আর ভাল লাগে না এ সব, তার নিজেরই যথেষ্ট জ্বালা, যথেষ্ট দুর্ভাবনা। সে তুলনায় মহাশ্বেতা তো রাজরাণী। শুধু শুধু বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া বৈ তো নয়। এক এক দিন নিতান্ত অসহ্য হ'লে বলেই ফেলতেন মুখের ওপর, 'নে বাপু তোর ঐ একঘেয়ে থগ-বগানি আর নাকিকান্না থামা দিকি। সেই বলে না— মারবার না লোক থাকলে চালতাতলায় বাস— তা তোর হয়েছে তাই। নিজের ভাতার, নিজের ছেলেমেয়ে— তাদের তুই সামলাতে পারিস না— পরকে দোষ দিস কেন? হাতে পেলে আর কে কবে ছেড়ে দেয়! সবাই চায় নিজের দিন কিনে নিতে। তোর বুদ্ধি নেই, তুই পারিস না—ওদের আছে ওরা পারে। তোর ভাগ্যের দোষ দে, ওদের কি অপরাধ!'

এর পর—বলাবাহুল্য— এক অবর্ণনীয় কাণ্ড হ'ত। মহাশ্বেতা রেগে কেঁদে মাথা খুঁড়ে চিৎকার করে বুক চাপড়ে পাড়ার লোক জড়ো করত। আগে সত্যিই এদিক ওদিক থেকে লোক ছুটে আসত— এখন সবাই জেনে গেছে 'নতুন বামুনদের বড় মেয়ের মাথাটায় বাপু বেশ ছিট আছে। বদ্ধ পাগল।' এখন আর বড় একটা কেউ আসে না।

এই সব দিনে যাবার সময় বারবার প্রতিজ্ঞা করে যেত মহাশ্বেতা যে, সে আর কখনও বাপের বাড়ি আসবে না। বাপের বাড়ি তার ঘুচে গেছে— সপুরী এক-গাড়ে গেছে, তা সে জানে। তাই সে ধরে নেবে। আর কখনও এ-মুখো হবে না। ফের যদি কখনও এ-মুখো হয় তো তার নামে সবাই যেন কুকুর পোষে, গুয়ের জল গায়ে ছেটায়... ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আবারও আসতে হয় তাকে ঠিকই। না এসে থাকতে পারে না। অন্য কোনও খবর থাকলে, মজাদার বা চটকদার কোন ঘটনা ঘটলে তার পরের দিন ছুটে আসতেও তার বাধা নেই। শ্যামা তা জানেন, তাই তিনি ওর চেঁচামেচি কান্নাকাটিতেও বিচলিত হন না, শাপমন্যি দিব্যি-দিলেশাতেও না। শ্যামার পুত্রবধূ কনকেরই অসহ্য লাগত প্রথম প্রথম, সে মৃদু অনুযোগ করে বলত, 'কেন মা জেনেশুনে ও পাগলকে ঘাঁটান। চুপ করে শুনে গেলেই হয়!'

'আমার আর সহ্যি হয় না মা। একে আমার জ্বালাতনের শরীর, নিজের ভাবনাচিন্তেয় বলে আমার নিজের ঘুম হয় না, তার উপর কানের কাছে যদি নিত্যি ঐ সব মিথ্যে নাকেকান্না কাঁদে আর হা-হুতাশ করে তো কার ভালো লাগে বল তো! হ্যাঁ, মা যদ্দিন ছিলেন আমিও মার কাছে গিয়ে পড়তুম কিন্তু সে যে কত দুঃখে, কত দুঃখ বুকে চেপে চেপে রেখে, সে কেউ জানে না। বুক যখন ফাটবার মতো হ'ত, যখন প্রাণ আসত ঠোঁটের ডগায়, তখনই ছুটে যেতুম! তাই কী সব কথা তাঁকে বলেছি? নিজের ভাতার-পুতের কেচ্ছা নিজের শ্বশুরবাড়ির খিটকেল কখনও বাপ-মায়ের কাছেও করতে নেই। আকাশের গায়ে

BanglaBook.org

থুতু দিলে সে থুতু নিজের গায়েই এসে পড়ে। বলে আহাম্মুক নম্বর চার, ঘরের কথা করে বার। ঐ তো ওরই ছোট জা, দাঁতে দাঁত চেপে কী দুঃখটাই না সহ্য করলে, কৈ একদিন ওকে কেউ বাপের বাড়িতে এমনিও যাওয়াতে পেরেছিল? ছেলে পেটে আসতে একেবারে সাধ খেতে প্রথম বাপের বাড়ি গেল— মাথা উঁচু করে!'

আবার কোন দিন বলতেন, 'ওর ঐ মিথ্যে কথাগুলো আমার সহ্য হয় না বাপু, তা তুমি যতই বলো কোনদিনই অসৈরণ কথা আমার ভাল লাগে না। এতটি তো সাত ঝুড়ি নিন্দে করে শ্বশুরবাড়ির— তুমি একটা কথা বলো দিকি, তখনই ফোঁস করে উঠবে। মায় ঐ মেজকর্তা মেজগিন্নী, নিত্যি যাকে গাল না দিয়ে জল খায় না, তারাও দেখবে তখন কত জ্ঞানবান বিচক্ষণ কত বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। তখন ওদের বিবেচনাই ধন্যি ধন্যি হবে। ওর ও রোগ, মধ্যে মধ্যে খানিকটা কান্নাকাটি চেঁচামেচি না করে থাকতে পারে না। বায়ু রোগ ওটা।.... ছেলেগুলোকে নিজে ইচ্ছে করে অমানুষ করছে। কী সমাচার না ওর বাপ কাকারা কে কত লেখাপড়া শিখেছে, তারা করে খাচ্ছে না? দিন কতক হেসে-খেলে বেড়াক না। নিহাৎ যখন দেওরকে জাকে গাল দেবার দরকার হয় তখনই ছেলেদের পড়াশুনোর কথাটা মনে পড়ে। ওসব নাকে-কান্না আমার ভাল লাগে না।'...

কিন্তু সেদিন বলতে গেলে একটা অঘটনই ঘটল। মহাশ্বেতা এল প্রায় লাফাতে লাফাতে, খুশিতে ডগোমগো হয়ে, আহ্লাদে ফেটে পড়তে পড়তে। দূর থেকেই তার এ ভাবান্তর লক্ষ করেছিলেন শ্যামা, মেয়ে এসে বাড়ি ঢুকতে তাই অন্য দিনের মতো নিরাসক্ত ভাব বজায় রাখতে পারলেন না, একটু উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই মুখ তুলে চাইলেন।

'নাঃ, তা যাই বলো বাপু, ছেলেটার পয় আছে! মাওড়া অনাথা হ'লে কি হবে, আমার সংসারে এসে পয় ফলিয়েছে তা মানতেই হবে।'

'কে ঠাকুরঝি, কার কথা বলছ?' কনক জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্নটা মার কাছ থেকে এলে মহাশ্বেতা আরও খুশি হ'ত ঈষৎএকটু ভ্রুটা কুঞ্চিত হ'ল কনকের ব্যস্ততায়। তবু হাসি-হাসি মুখেই হাত পা নেড়ে বলল, 'ঐ মেজ-বৌয়ের বোনপোটার কথা বলছি। ঐ অরুণটার কথা। যাই হোক, ও আসবার পরেই তো তোমার নন্দায়ের সুবুদ্ধি হ'ল তবু, বিষয়ের কথা কইতে এল আমার সঙ্গে। কোনদিন তো এর আগে আমাকে মানুষের মধ্যেই গণ্যি করে নি, টাকা-পয়সার কথা আমার সঙ্গে যে কইতে হয় এ কখনও জানত না।...আর এ শুধু বলাই নয়, আমার একটা আয়ের পথও তো হ'ল। ছেলেটার পয় ছাড়া কি বলব বলো, নইলে এমন অকালে সকাল, আমার হঠাৎ এমন বরাত খুলবেই বা কেন?'

এবার শ্যামাও আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। 'আয়' এবং 'বরাত খোলা' শব্দ দুটো তাঁর কাছে কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। আজকাল মেয়েকে দূর থেকে দেখলেই কপালে যে বিরক্তির রেখাটা পড়ে সেটা মুছে গিয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, 'কী রকম, কী রকম। হঠাৎ বরাতটা কী খুলে গেল শুনি? জামাই তোর বাড়ি সম্পত্তি কিনেছে?'

'তবেই হয়েছে! সেদিন পূবের সূয্যু পশ্চিমে উঠবে। তা নয়— অত আশা আমার নেইও। আমার কাছে দু পয়সা আয়ের পথ হ'লেই ঢের। দাঁড়াও আগে বসি একটু দম নিই। বলছি তারপর!'

অর্থাৎ বেশ ঘটা করেই বলবার মতো কথাটা।

শ্যামা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নারকেল পাতা চেঁচে খ্যাংরা কাটি বার করছিলেন, তিনি পাতাগুলো এক দিকে সরিয়ে একটু জায়গা করে দিলেন। কনক তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একটা পিঁড়ি পেতে দিল। চেপেচুপে বসে কিছুক্ষণ স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল

BanglaBook.org

মুখে মা আর বৌদির দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। যেন খুব মজার কোন কথা বলে তার ফলাফলটা দেখছে এখন।

শ্যামা ওর ভাবগতিক দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বললেন, 'নাও, তোমার দম নেওয়া হ'ল? এখন কী মতলবে এসেছ কথাটা খুলে বলো দিকি, অমন থিয়েটার য়্যাক্‌টো করতে হবে না!'

মনের পাত্রে তৃপ্তি আর বিজয়গর্ব তখন উছলে উঠেছে মহাশ্বেতার, তাই এসব তুচ্ছ খোঁচা গায়ে মাখল না। হাসি হাসি মুখে বলল, 'বলি মাথার ওপর ভগবান আছেন তো গা! দিনকে রাত বলে কতকাল চালানো যায়? একদিন না একদিন ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন না?...চেরকাল মোটা মোটা টাকা এনে ঐ দুই রাজারাণীর শ্রীপাদপদ্মে ঢেলেছেন, যত কিছু উপাজ্জন গোদাপদে সমপ্পন। কী না আমার ভাই-ভাজ খুব ভাল। লক্ষ্মণ ভাই! ও-ই সবাইকে দেখবে।... তা এবার চোখটা একটু খুলল তো? মানুষটা বেঁচে থাকতেই এই, চোখ বুঝলে কী মূর্তি ধরবে তা বুঝছে না এবার? হাড়ে হাড়েই বুঝছে। তবে ঐ, ভাঙ্গে তো মচকায় না। তেমন ঝাড়ের বাঁশ নয় কেউ। ওরা মরে তবু ময্যেদা হারায় না। সব সব, বুঝলেও সব সমান। ছেলেগুলো পজ্জন্ত দ্যাখো না— লেখাপড়া করে না কিছু না, কথা কইতে যাও দিকি, মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে দেবে একেবারে। কত এম-এ লোক থ হয়ে যায় ওদের মুখের সামনে!'

এবার শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বঁটিখানা দেওয়ালের খাঁজে উপুড় ক'রে রেখে পাতারই একটা ফালি বার ক'রে নিয়ে ঝ্যাঁটার কাটিগুলো বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'তুমি দেওয়ালের সামনে বসে বক্তিমে করো মা, আমি উঠলুম, আমার কাজ আছে!'

'রোস রোস। আমার আসল কাজটাই যে বাকী গো। বাবা, তুমি যে একেবারে সব্বক্ষণ ঘোড়ায় জীন কষে আছ দেখতে পাই!...তবে কাজের কথাই সেরে নিই। অ বৌদি, তুই একটু ওধারে যা ভাই, মার সঙ্গে দুটো পেরাইভেট কথা আছে!'

তারপর গলাটা নামিয়ে— ও ঘর থেকে কনকের শুনতে কোন রকম বাধা না হয় এমন পর্দাতেই — ফ্যাস ফ্যাস ক'রে বললে, 'দুশোটা টাকা দিতে হবে আমাকে এখুনি— জামাইয়ের দরকার!'

এইবার শ্যামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। অন্ধকারও হয়ে উঠল বলা যায়। আর যাই হোক, ঠিক এ আক্রমণটা আশঙ্কা করেন নি তিনি। মেয়ের খুশির তালটা যে তাঁর ওপর এসে পড়বে তা একবারও ভাবেন নি।

প্রায় মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'হঠাৎ? জামাইয়ের কী এমন দরকার পড়ল? আমার কাছে তোর টাকা থাকে জামাই জানলেন বা কী করে?'

'না, মানে তোমার জামাইয়ের দরকারও বলতে পারো, আমার দরকারও বলতে পারো!'

'ঘোরপ্যাঁচ ছেড়ে একটু খোলসা করেই বলো না কথাটা বাছা!'

'ঘোরপ্যাঁচের আর আছে কি! আমিই বলেছি তাকে টাকাটা দেব। এখানে টাকা আছে তাও আমিই বলেছি।'

মেয়ের কণ্ঠে তাপের আভাস পেতেই শ্যামার কণ্ঠের তাপটা কমে আসে। এ তাপ মালিকানার তাপ, এর চেহারাটা শ্যামার চেনা আছে। নিজের টাকা সে চাইচে, এর মধ্যে কোন অনুরোধ কি অনুনয় নেই। এর ওপর কোন কথাও চলবে না।

বেশ একটু নরম গলায় প্রশ্ন করেন তিনি, 'তা হঠাৎ? জামাই-এর হঠাৎ টাকার দরকার হ'ল যে। সম্পত্তি কিনবেন নাকি কোথাও?'

'তবে বাপু খোলসা করেই বলি কথাটা। কাউকে যেন ব'লো নি। শোন। ওদের আপিসে

BanglaBook.org

নাকি দু-তিনটে নতুন সায়েব এসেছে— তাদের খুব জুয়োর বাই। শনিবারে শনিবারে রসার মাঠে কী ঘোড়দৌড় না কি হয়, সেখানে গিয়ে মড়-মড় টাকা ঢেলে আসে। এর জন্যে নাকি দুচোকের-ব্রত দেনা করে যেখানে পায়। আর মোটা মোটা টাকা সুদ গোনে। একশ' টাকায় এক মাসে পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা সুদ। অফিসের বেয়ারা দারোয়ানগুলো সব লাল হ'য়ে গেল সুদ খেয়ে খেয়ে। তাই দেখে ওর মাথায় ঢুকেছে কথাটা যে খোট্টা দারোয়ানগুলো এত পয়সা কামাচ্ছে— তবু ওদের কিছু নেই — আর আমরা এত টাকা নিয়ে বসে আছি, আমরা কামাতে পারব না! তা পেরথম পেরথম কাউকে বলে নি, নিজেই দু-চার টাকা যা নিজের হাতে ছিল দিয়েছে। মাস কাবারে পেয়েওছে সুদে আসলে সব টাকা। বলি টাকা তো হাতের মুঠোয় গো, মাইনে তো নিতে হবে, ঐখানে তো টিকি বাঁধা সব।'

এই পর্যন্ত বলে, বোধ করি দম নেবার জন্যেই একটু থামে মহাশ্বেতা। কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বুদ্ধিমানের মতো বলতে পেরেছে, এর জন্যে একটু আত্মপ্রসাদের হাসিও হাসে।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। কথাটা এত সহজ নয়, এর মধ্যে কোথাও একটা বড় রকম গোলমাল আছে। সেই গোলমালটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মনে মনে।

মহাশ্বেতাই আবার শুরু করল। পূর্ব প্রসঙ্গের খেই ধরে বলল, 'তা কথাটা তাই কাল হাটি-পাটি পেড়ে লক্ষ্মণ ভাইকে বলতে গেছল। আমি তো আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছি কিনা যখনই দেখি আপিস থেকে ফিরে বড় ভাই গিয়ে মেজ ভায়ের ঘরে সেঁদিয়ে দোর দিলে, তখনই বুঝি যে এবার বিষয়-কম্মের ব্যাপার কিছু হবে। আমিও আজকাল সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আড়ি পাতি। তাতেই তো সব শুনলুম, নইলে কি আর আমাকে এ সব কথা ও নিজে থেকে বলবে? তবেই হয়েছে! সেই লোকই কিনা!'

কথাটা আবার সোজা রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে দেখে অসহিষ্ণু শ্যামা প্রশ্ন করলেন, 'তা মেজকর্তা কি বললে?'

'সব বিত্তান্ত খুলে বলে বড়কত্তা বললেন, আমাকে তুমি বেশি না, শ'তিন-চার টাকা দাও, ছ মাসে আমি ডবল ক'রে দিচ্ছি। তা মেজকত্তার মত হ'ল না। তিনি বললেন, না দাদা এসব কাজ ভাল না। এইভাবে ধার করতে করতে একদিন এমন হবে যখন আর মাইনের টাকায় কুলোবে না। তাছাড়া এর কোন লেখাপড়া নেই। সুদ নিচ্ছ তুমি কাবুলিওয়ালার বাড়া, কোম্পানিকে বলতে গেলে কোম্পানিও শুনবে না। লেখাপড়া যদি ক'রেও দেয় তবু কোম্পানী তার টাকা কেটে তোমাকে দেবে না। বলবে যেমন লোভ করতে গেছেলে তেমনি তার ফল ভোগ করো গে।....তোমার জামাই কত বুঝিয়ে বললে; বললে দিনরাত ঐখেনে পড়ে আছি, এ তো মোট কিছু নয়, আমি যদি অল্প দিনে আসলটাকে ডবল করে নিতে পারি শেষ পর্যন্ত না হয় কিছু টাকা ডুবলই। তাতে তো আর লোকসান নেই। তা মেজকত্তার বুদ্ধি বেশি— বললেন, না, লোভ মানুষের বেড়েই যায়, দেখো তুমি ও সুদের টাকাও সরিয়ে রাখতে পারবে না, সবসুদ্দু খাটাবে, যাবে যখন সবসুদ্দুই যাবে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, বেশি লোভ ভাল না! তার চেয়ে যেমন আছি তেমনি থাকি।'

'অম্বিক ঠিকই বলেছে। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—এ সবও জুয়া খেলা। তাছাড়া ওরা, সায়েব জাত, হঠাৎ রাতারাতি সরে পড়লে আর কোথায় ওদের পাত্তা পাবি যে টাকা আদায় করবি? না বাপু, দরকার নেই তোরও ওসবে গিয়ে, এ তো কটা টাকা। গেলে আর দুঃসময়ের সম্বল বলতে কিছু থাকবে না।'

'দ্যাখো', অকস্মাৎ তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার কণ্ঠ, 'তোমার জামাইয়ের চেয়ে টাকাটা বেশি বোঝে— এমন মানুষ তো আমি কই আর দেখলুম না। বলি আজ যে মেজকত্তা সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা দিয়ে বসে আছেন সে টাকাটা করলে কে? সে কি ওঁর

BanglaBook.org

রোজগারের টাকা? আজ যদি আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গি? যুদ্ধের সময় চোরাই লোহা চালান করে শয়ে শয়ে টাকাটা কে রোজগার করেছিল? তাতে ঝুঁকি ছিল না? ধরা পড়লে যে একেবারে পুলিপোলাও দেখিয়ে দিত। তখন এসব ধম্মের বুলি কোথায় ছিল! তা তো নয়, এখন টাকাটা গুদোমজাত করে বসে আছি, নাড়ছি চাড়ছি হাত বুলোচ্ছি সোনার বাটে— এখন বার করতে বড় মায়া লাগছে আর কি! হাত্তোর বেইমানের জাত রে? যার ধন তার ধন নয়— নেপোয় মারে দই!'

এর পর আর টাকাটা না দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ লোককে বোঝাতে যাওয়াও বৃথা হিতে বিপরীত হবে। হয়ত এর চেয়েও কটুকথা শুনতে হবে নিজেকেই। শ্যামা আর কথা বাড়ালেন না। পাতা চাঁচবার জন্যে একটা খাটো কাপড় পরে ছিলেন, সেটা ছেড়ে ভিজে গামছা পরে গিয়ে ঘরের দোর দিয়ে কোথা থেকে হাতড়ে হাতড়ে দুশোটি টাকা বার করে এনে নিঃশব্দেই মেয়ের সামনে ফেলে দিলেন।

মহাশ্বেতা টাকাগুলো নিয়ে পেট-কাপড়ে বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'আমিও তেমন বাপের বেটি নই বাপু। যেমন মেজকত্তার ঘর থেকে বেরলো অমনি আমি ইশারা ক'রে ডেকে নে এসে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিলুম। তা মানুষ তো নয়, পাথর— ওকে শোনানোও যা দ্যালটাকে শোনানোও তা। তবু মনের ঝালটা তো মিটিয়ে নিলুম। আর মুখে না মানুক, ভেতরে ভেতরে তো বুঝল।.... ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়ে বললুম, আমাকে তো কোনদিন বিশ্বাস করো না, আমার হাতে ভরসা করে কখনও টাকাও দিলে না। তবু আমিই তোমার মান রাখব। আমি তোমাকে এনে দেব দুশো টাকা। তখন একটু অবাক হ'ল, মুখটা একটু ওজ্জ্বলও হ'ল। বললে, তুমি কোথায় পাবে? আমি তা বলে অত বোকা নই যে সব টাকার সন্ধান দেব। আমি বললুম, সে আমি এনে দেব যেখান থেকে পাই। মোদ্দা সুদটা ঠিক ঠিক আমাকে এনে বুঝ ক'রে দিও, সেটা আবার যেন নিয়ে গিয়ে ঐ শ্রীপাদপদ্মে ঢেলো নি। তা বলে, না না— পাগল। তোমার টাকার সুদ তুমিই পাবে।...তাই এই ছুটে এলুম।'

এতক্ষণে আনুপূর্বিক ইতিহাস শেষ করে উঠে পড়ল সে।

'যাই; আবার এতটা পথ এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে যাওয়া তো, ভয় করে। ভেবেছিলুম দুপুরবেলা আসব, তা ও বিনি-মাইনের চাকরির কি ছুটি আছে! খোকাটা কোথায় গেল, এগিয়ে দিয়ে আসত একটু?'

'ঐ বাগানে কী করছে বোধ হয়। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যা। সাবধানে যাস একটু। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।'

শুষ্ক বিরস কণ্ঠে কর্তব্য পালন করেন শ্যামা। তাঁর মুখের অপ্রসন্নতাও ঢাকা থাকে না। কিন্তু মহাশ্বেতার তা লক্ষ করবার কথা নয়, করলও না— খুশী মনেই বৌদিকে ডেকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

এ গাঁ ও গাঁ বটে, এপাড়া ওপাড়াও বলা যায়। সবসুদ্ধ তিন-পোর বেশি নয়, এটুকু পথ হাঁটতে এখানে কারুরই গায়ে লাগে না।

॥ ২ ॥

শ্যামার এ বিরসতার কারণ আছে বৈকি। টাকাটা যদিও মহাশ্বেতার, এবং সে জমাই রাখতে দিয়েছে মাকে, তবু এইটেই এখন শ্যামার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সব টাকাই অভয়পদ এনে ভাইকে ধরে দিত—এখনও দেয়। মাইনের টাকাই শুধু নয়— উপরির টাকাও, সৎ অসৎ সর্ববিধ উপার্জনের টাকাই। এই নিয়ে মহাশ্বেতার অশান্তির অন্ত ছিল না। সে অশান্তি অবশ্য মুখ ফুটে অভয়পদকে জানাবার বা এই নিয়ে তার সঙ্গে কলহ-

BanglaBook.org

কাজিয়া করার সাহস কোনদিনই তার হ'ত না, যদি না পিছনে থেকে শ্যামা তাকে নিরন্তর উত্তেজিত করতেন। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই নিজের দাবি জানিয়েছিল মহাশ্বেতা এবং তার ফলে অভয়পদ দু-চার টাকা মধ্যে মধ্যে দিতে শুরু করেছিল। চেয়ে নেওয়া ছাড়াও, ইদানীং সাহস বেড়ে যেতে, পকেট থেকেও দু-এক টাকা ক'রে সরাতে শুরু করেছিল। অভয়পদ তা টের পেত আর টের যে পেত সে কথাটাও সে মহাশ্বেতাকে জানিয়ে দিয়েছিল— কিন্তু তা নিয়ে রাগারাগি করে নি। মহাশ্বেতা তাতেও কতকটা প্রশ্রয় পেয়েছিল।

তবু সে কতই বা! বেশি টাকা না-বলে নেবার সাহস মহাশ্বেতার আজও হয় নি। সুযোগও কম। তেমন বাড়তি টাকা ওর পকেটে পড়ে থাকে কদাচিৎ। সুতরাং সব জড়িয়ে মহাশ্বেতার জমানো টাকার পরিমাণ ছ-সাতশ'র বেশি ওঠে নি এখনও পর্যন্ত।

টাকাটা যতই হোক— শ্যামার কাছে অনেক। জামাইয়ের কাছে তাঁর কিছু ঋণ আছে, এই বাড়িখানা করার দরুন। সে টাকাটা আজও শোধ দিতে পারেন নি। কিছু কিছু যে দিতে পারতেন তা নয়— কিন্তু ইতিমধ্যে উপার্জনের একটা নতুন এবং অভিনব পথ আবিষ্কার করেছেন, তা হচ্ছে সুদে টাকা খাটানো। এ পাড়ায় থালা বাটি গেলাস রুপোর বাসন— দৈবাৎ কখনও সোনার গহনা রেখেও টাকা ধার করতে আসে অনেকে। বেশি টাকায় শ্যামার উৎসাহ কম। চার আট আনা ধার দেওয়াতে সুদ বেশি আদায় হয়। টাকায় এক পয়সা সুদ, আট আনা চার আনাতেও এক পয়সা। কারণ, পয়সা ভেঙ্গে সুদ দেওয়া নিয়ম নেই।

এ পথটা একদিন অকস্মাৎ আপনিই খুলে গিয়েছিল। শ্যামাও সুযোগটা বুঝতে ও তার সদ্ব্যবহার করতে ইতস্তত করেন নি কিছুমাত্র! সেই থেকে জামাইকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন। জামাইও তাগাদা দেয় না অবশ্য, হয়ত সে ফেরত পাবার আশাতে ঠিক দেয়ও নি; তবে শ্যামা দেবেন ঠিকই। আপাতত যা হাতে আসে সুদে খাটান, এই সুদ বা সুদের সুদ থেকেই একদিন ও ঋণটা শোধ হয়ে যাবে— এ ভরসা তাঁর আছে।

মেয়ের টাকাও এই কারবারে খাটে তাঁর। অবশ্য টাকাটা সুদে খাটাবার জন্য মেয়ে রাখে নি তাঁর কাছে। পাছে আর কেউ বাটপাড়ি করে সেই ভয়েই রেখেছে। তবে মেয়েকেও তিনি এই লাভ বা সুদের কিছু অংশ দেবেন, অন্তত এখনও মনে মনে এ রকম শুভ ইচ্ছা আছে। মেয়েকেও সে কথা শুনিয়ে রেখেছেন। তবে সে হিসেব নেইও তাঁর। মেয়েকে যখন টাকাটা বুঝ দেবার সময় হবে তখন একটা আন্দাজী আয় ধরে ঠাওকো থোক কিছু ধরে দিলেই চলবে। সে পরের কথা। এখন যদি আসলই বেরিয়ে যায় এইভাবে হাত থেকে—।

ভাবতেই খারাপ লাগছে শ্যামার। একদিন এমনিই, বলতে গেলে খেলার ছলে এ কারবার আরম্ভ করেছিলেন, সেটা যে এমনভাবে তাঁর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা আজকের আগে তিনিও বুঝি এমনভাবে অনুভব করেন নি। অবশ্য সব টাকাটা খাটছে না এটা ঠিক— নইলে চাইবা মাত্র বার করেই বা দিলেন কি করে— তবু মহাজনের হাতে টাকাটা সব সময় থাকা দরকার। নইলে এ কারবারের ইজ্জৎ থাকে না। মক্কেলও হাতছাড়া হয়ে যায়। 'নেই নেই' শোনাতে হয়, খুব অনিচ্ছাতে দিচ্ছেন এমন ভাবও দেখাতে হয়— তবু শ্যামা ফেরান না প্রায় কাউকেই। কারণ তিনি জানেন যার এমন ঠেকা, বাসন কি গয়না রেখে ধার নিতে এসেছে, সে নেবেই— তিনি ফেরৎ দিলে অপর জায়গা থেকে নেবে— মাঝখান থেকে তিনি সুদটা খোয়াবেন কেন? তা ছাড়া নতুন পথ পেলে পরেও হয়ত সেই পথেই চেষ্টা দেখবে, অর্থাৎ ঘরটাই নষ্ট হয়ে যাবে চিরকালের মতো।

অথচ এখন কীই বা করা যায়?

BanglaBook.org

এ টাকাটা গেছে যাক, কিন্তু এখানেই যে ওরা থামতে পারবে না তা শ্যামা বুঝতে পারছেন। এ বড় সাংঘাতিক লোভ, প্রায় জুয়ার নেশার মতোই। আবারও আসবে, আবারও চাইবে। এক উপায়— হাতে নেই, সুদে খাটছে বলা, কিন্তু তা হলেই অনুমানের ঘরে সুদের অঙ্কটা বাড়তে থাকবে মেয়ের মনে— আশাটা বেড়ে যাবে। তখন আয়ের হিসাব চাইবে সে।

নাঃ, সেও কোন কাজের কথা নয়।

তবে?

এই তবেটাই ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসে রইলেন শ্যামা। তাঁর ভাবগতিক দেখে কনকেরও বিস্ময়ের সীমা রইল না। এখনও আকাশে আলোর আভাস আছে, এখনও পুরোপুরি অন্ধকার নামে নি ওদের উঠোনের কাঁঠালগাছ কলাগাছের ছায়ায়— এখনই এমনভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা স্থির হয়ে— এ শ্যামার পক্ষে একেবারেই অভিনব। কনকের অভিজ্ঞতায় অন্তত এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নি।

কারণটা শুনলেও অবশ্য কনক বুঝত না। বরং আরও হাস্যকর মনে হ'ত। পরের টাকা ওঁর কাছে খাটত, না হয় আর খাটবে না। এটা তো একটা বাড়তি আয়, এর ওপর ভরসা করে কিছু ওঁর সংসার চলছে না, তাছাড়া মেয়ের টাকাটা সব বেরিয়ে গেলেও ওঁর কারবার অচল হবে না— তবে?

কনক বুঝতে পারত না, কারণ সে অনেক পরে এ বাড়িতে এসেছে। আভাসে ইঙ্গিতে, মেজো ঠাকুরঝির কথা থেকে, মহাশ্বেতার কদাচিৎ কোন বেফাঁশ কথাতে— সে কিছু কিছু পূর্ব ইতিহাসের আঁচ পেয়েছে ' কিছু বুঝেছে সে তার শ্বশুরের মৃত্যুর সময়— তাঁকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে— কিন্তু তবু সবটা সে জানে না, সে ইতিহাস তার কল্পনার অতীত।

শ্যামার শ্বশুররা ছিলেন খুব নামকরা গুরু-বংশ। বাড়িঘর শিষ্য-যজমান বিষয়সম্পত্তি সব দিকেই প্রাচুর্য দেখে শ্যামার মা রাসমণি মূর্খ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। ঠিক অত সহজে, অত অল্পদিনে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে সত্যি-সত্যিই তাঁর মেয়েকে পথের ভিখিরী করবে সে ছেলে, তা তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি। যা ছিল, তাতে বসে খেলেও দু'পুরুষ কেটে যেতে পারত। আর রাসমণিও অসহায় বিধবা মেয়েছেলে— অভিভাবকহীন, সহায় সঙ্গতিহীন— তিনিই বা করবেন কি। ঘটক-ঘটকীর ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁর তো উপায় ছিল না। ছেলে মূর্খ এটা জেনেছিলেন কিন্তু সে যে অমানুষ এটা জানতে পারেন নি।

শ্যামার স্বামী নরেন আর ভাসুর দেবেন— সেদিক দিয়ে দুজনের কেউই কম কৃতী নন। ওঁদের বাড়ি বাগান প্রভৃতি সব যখন খিদিরপুর ডক পড়ল তখন নতুন বাড়ি খোঁজার অছিলায় ওঁদের গুপ্তিপাড়ায় এক শিষ্যের খালি বাড়িতে রেখে এসে দুই ভাই-ই প্রাণ খুলে উড়তে শুরু করলেন। বাড়ির টাকা, সরকার থেকে পাওয়া—সে আর কদিন। তারপর অন্য বিষয়ও ভাগ ক'রে নিয়ে দুজনেই জলের দামে বেচে দিলেন, ওড়াবার ব্যবস্থাটা রইল অব্যাহত। তারপর একদিন অবশ্য আবার মাটিতে পা দিতে হ'ল। কিন্তু তখন সে সমস্ত টাকাই উড়ে চলে গেছে— রেখে গেছে দুজনের শরীরে কিছু কুৎসিত ব্যাধি। দেবেন তবু নিজেকে সামলে নিলেন, সামান্য কিছু ওষুধ সংগ্রহ ক'রে আগ্রাতে গিয়ে 'ডাগদারি' শুরু করলেন (ওদেশে ডাক্তারি করার জন্য তখন নাকি চিকিৎসা শাস্ত্র জানবার দরকার ছিল না!) এবং স্ত্রীপুত্রকে ভরণপোষণ করার মতো আর্থিক অবস্থা ক'রে নিলেন। কিন্তু স্বভাবকে বা অভ্যাসকে কিছুতেই সংযত করতে পারলেন না নরেন। তার ফলে বহু দুর্গতির মধ্য দিয়ে এসে অবশেষে আশ্রয় যোগাড় করলেন পদ্মগ্রামের সরকারদের বাড়ি, পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে। তবে সেটুকু আশ্রয়ই সেদিন শ্যামার কাছে স্বর্গের চেয়ে দুর্লভ ছিল, কারণ তার

BanglaBook.org

আগে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল অবস্থায় একটি শিশু এবং বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিয়ে যেভাবে দিন কেটেছে, তা একমাত্র তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।

এই পূজারীর কাজটাও যদি মন দিয়ে করতেন নরেন তো হয়ত সংসারটা দাঁড়াতে পারত। কিন্তু একেবারেই ভবঘুরে স্বভাব হয়ে গিয়েছিল— তাঁর মন কিছুতেই এক জায়গায় বাসা বাঁধতে পারত না। তাছাড়া কুসংসর্গ অভ্যাস থেকে স্বভাবের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল— সে লোভেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ত তাঁকে। দু'মাস, ছ'মাস কখনও বা এক বছর দেড় বছর অন্তর হুতাশনের মতো এসে পড়তেন কোথা থেকে, কখনও কিছু— চাল ডাল ময়দা বা পুরোপুরি একটা সিধা— সঙ্গে আনতেন, কখনও বা দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের মতো এসে এদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসিয়ে কিছুদিন পরে শ্যামার হতদরিদ্র সংসার থেকেই কিছু চুরি ক'রে আবার সরে পড়তেন নিজের অজ্ঞাতবাসে। এ প্রায়ই হ'ত। কী ক'রে যে এই একেবারে অচল অবস্থা সচল রেখেছিলেন শ্যামা, একান্ত প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, আর ক'রে— টিকেছিলেন শুধু নয়— দাঁড়িয়েও ছিলেন শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু ক'রে— মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ি ক'রে ভবঘুরে স্বামীকে শেষ-নিঃশ্বাস ফেলবার নিজস্ব আশ্রয়টুকু দিতে পেরেছিলেন— সে ইতিহাস, কনক তার চিন্তাশক্তিকে যত উচ্চপ্রসারী পাখা মেলে কল্পনার সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনুক— সেই সত্য ইতিহাসকে কোনদিন স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।

হ্যাঁ, বড়জামাই অভয়পদ অবশ্য অনেক সাহায্য করেছেন— যদিচ ঠিক কতটা করেছেন তা শ্যামা ছাড়া কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানেন না; এমন কি মহাশ্বেতাও নয়। (মুখপোড়া মিন্সে কি কোন কালে কোনকথা খুলে বললে ওকে! ওরই বাপের বাড়ির কথা চেরকাল ওর কাছে ঢেকে ঢেকে ম'ল। মুয়ে আগুন বুদ্ধির!) — তবু এ দাঁড়ানো যে কী দাঁড়ানো, কী অমানুষিক চেষ্টা, কী অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি এবং কী উত্তুঙ্গ উচ্চাশা থাকলে যে এই পুনরুত্থান সম্ভব— তা কনক কেন আর কেউই কোনদিন ধারণা করতে পারবে না। আর তা না থাকলে সহস্র অভয়পদ পাশে এসে দাঁড়ালেও এভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হ'ত না। হয়ত বড়জামাইও সেটা বুঝেছিল, নইলে সে-ও এমনক'রে পাশে এসে দাঁড়াত না। তাকেও প্রায় বাল্যকাল থেকেই জীবনের সঙ্গে লড়াই করে, একটি পয়সা বাঁচাবার জন্যও একান্ত সাধনা ও প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে, একদা শিশু ভাইবোনদের মানুষ করতে হয়েছিল। সেই দুর্লভ অথবা দুর্লভতর শক্তি শাশুড়ীর মধ্যে প্রত্যক্ষ ক'রেই সে সম্ভবত নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল।

সুতরাং আজ যদি পয়সা সম্বন্ধে একটা মোহই পেয়ে বসে থাকে তাঁকে, উপার্জন করাটা যদি নেশায় পর্যবসিত হয়ে থাকে তো শ্যামাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজ তাঁকে সারা দিন-রাত পাতা কুড়িয়ে জড়ো করতে বা নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাঠি সঞ্চয় করতে দেখে যারা হাসে, তারা এ ইতিহাস জানে না বলেই হাসে, আর হাসবেও চিরকাল, কারণ আর কেউই জানবে না। কোনদিনই না। সেদিনের যারা প্রধান সাক্ষী— হেম আর মহাশ্বেতা— তাদের স্মৃতিতেও কি বর্তমানের সূক্ষ্ম সাদা পর্দা পড়ে যাচ্ছে না? অতীতের কথা আর বুঝি তাদেরও তেমন ক'রে স্মরণ করা বা অনুভব করা সম্ভব নয়! হয়ত তারাও এমনই হাসে মনে মনে অথবা বিরক্ত হয়।

॥ ৩ ॥

এরই মধ্যে একদিন— একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো— তরু এসে হাজির।

ভোরবেলা, সবে শ্যামা কাপড় কেচে এসে পাতার জ্বালে ছেলের ভাত চড়িয়েছেন, কনক উঠে ছড়া-ঝাঁট দিচ্ছে, অশ্রুমুখী মেয়ে এক কাপড়ে এসে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল শ্যামার।

জন্মের পর মোট নটি বছর নিশ্চিন্ত ছিলেন শ্যামা, যতদিন না বিবাহ হয়েছিল। তারপর দশ বছর বয়সে সেই বিবাহের পর থেকে — সারা জীবনই তাঁকে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে। দুঃসংবাদ শুনতে হয়েছে শুধু। এইতেই অভ্যস্ত তিনি। আকস্মিক, অভাবনীয় কোন ঘটনা ঘটলেই তিনি জানেন একটা বড়রকম দুর্ঘটনার সামনে দাঁড়াতে হবে এবার।

আজও সেই রকমেরই একটা বড় কিছু শোনাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখনও খুব বেশিদিন হয় নি, এমনি ভোরবেলা এমনি কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে এসে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, স্বামীর কালব্যাধির সংবাদ নিয়ে। এও সেই ভোরবেলা। এরও চোখে জল।

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন শ্যামা, কোন প্রশ্ন পর্যন্ত মুখ দিয়ে বেরলো না।

কনকই গোবরজলের বালতি নামিয়ে ছুটে এসে হাত ধরল, 'এ কী ঠাকুরঝি! এ কী অলক্ষণ! ভোরবেলা এমনভাবে— কী হবে মা! এসো এসো, বসো এসে। কী হয়েছে কি?'

হাতধরে নিয়ে এসে বসাল সে রান্নাঘরের দাওয়াতেই।

'কী হয়েছে রে? জামাই, জামাই ভাল আছেন তো?'

এতক্ষণে স্বর বেরোয় শ্যামার কণ্ঠ দিয়ে। স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ও বিকৃত একটা স্বরই বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে।

'সে ভাল আছে।' কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে তরু।

'তবে? তুই একা, এ ভাবে?

হেম রান্নাঘরেই শোয়, সে এতক্ষণ আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে একটু আলস্য করছিল, ভাতের ফ্যান উথলে উঠলেই মা ডাকবেন, তখন উঠে স্নান প্রাতঃকৃত্য সারতে যাবে। মায়ের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সেও ছুটে বেরিয়ে এল, সেও আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রথমটা।

এভাবে প্রশ্ন করলে তরুর পক্ষে কিছুতেই সব কথা খুলে বলা সহজ হবে না তা বুঝে কনক একেবারে ওর পাশে বসে ওর হাতদুটি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে রাগারাগি করে চলে এসেছ বুঝি?'

মাথা হেঁট ক'রে আরও অস্পষ্ট অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল তবু 'সে জানে না। আমি যখন এসেছি তখনও ঘুমোচ্ছে।'

যাক। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল এতক্ষণে শ্যামার। তবু ভাল, জমাইয়ের কিছু হয় নি। চরম বিপদ অন্তত নয়।

হেমই এবার তাড়া দিয়ে উঠল, 'সে জানে না, তবু তুই এমনভাবে এলি কেন? কি হয়েছে কি?'

'আমি— আমি আর ওখানে ঘর করতে পারব না। আমি তা হ'লে মরে যাব। ও বুড়ি আমাকে মেরে ফেলবে!'

কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় কথা বলে ডুকরে কেঁদে উঠল তরু।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল সকলে, বেশ কিছুক্ষণ। ওকে সান্ত্বনা দেবার কি আশ্বাস দেবার চেষ্টামাত্র কেউ করতে পারল না। এমন কি কনকও না। কিছুক্ষণের জন্য যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেল সকলের চেতনা। ঠিক কি শুনছে, ঠিকমতো শুনছে কিনা, এ থেকে কতটা খারাপ অনুমান করতে হবে— তা বোঝবার মতো শক্তি রইলো না কারুর।

সম্বিৎ শ্যামারই ফিরে এল সকলের আগে। কিন্তু তিনিও কথা কইতে পারলেন না, শুধু পাগলের মতো সজোরে নিজের ললাটে করাঘাত করতে লাগলেন। যেন এই কপালটা সত্যিই ভেঙ্গে ফেলতে পারলে তিনি বাঁচেন, অব্যাহতি পান।

BanglaBook.org

সেই কোন্ সুদূর অতীতে শুরু হয়েছে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আজও কি শেষ হ'ল না? আজও কি ক্লান্ত হলেন না সে অদৃশ্য দণ্ডদাতা? কী এত পাপ করেছিলেন আগের জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিভৃতে বসে— কেউ কি বাধা দেবার ছিল না, কেউ ছিল না নিষেধ করবার?

তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়েরাও?

তারাও কি বসে বসে তাঁর সঙ্গে শুধু পাপই ক'রে এসেছে আগের জন্ম-ভোর?

না, এ তাঁরই পাপ। তাঁরই অন্যায় হয়েছে ওদের পৃথিবীতে আনা। তাঁরই বোঝা উচিত ছিল যে তাঁর রক্ত যেখানে এক ফোঁটাও আছে, কেউ সুখী হবে না। কেউ না।

একমাত্র অন্যথা হচ্ছে তাঁর বড় মেয়ে— অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত। তাও তার অদৃষ্টে কী আছে এর পরে, তা কে বলতে পারে?

বড় মেয়েরও বিয়েটা দিয়েছিলেন শ্যামা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে; বিয়ে দেবার সময় আর তার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নানা উদ্বেগ আর আশঙ্কায় কণ্টকিত ছিলেন। জীবনে এমনিতেই বিবাহ সম্বন্ধে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁর আর তাঁর যমজ বোন উমার বিবাহ নিয়ে— তাতে বিবাহ সম্বন্ধে আতঙ্কের ভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহাশ্বেতার বিয়েটাই সবচেয়ে ভাল দাঁড়িয়ে গেছে। জামাইয়ের তো কথাই নেই, অমন জামাই লোকে তপস্যা করে পায় না— শাশুড়ী জা শ্বশুরবাড়ির অপরাপর লোকজন সম্বন্ধেও শ্যামার অন্তত কোন নালিশ নেই। এমন নির্বিবাদী ও নির্ঝঞ্ঝাট কুটুম-বাড়ি লোকে কদাচিৎ পায়। মহাশ্বেতা যা-ই বলুক, শ্যামা তাঁর জীবনে অনেক দেখলেন, তিনি জানেন বহু ভাগ্যেই এমন শ্বশুরবাড়ি পেয়েছে তাঁর বড় মেয়ে।

মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার বিয়ে দিয়েই সবচেয়ে সুখী আর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামা। মাধব ঘোষাল দৈবাৎ মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেচে সেধে নিয়ে গিয়েছিলেন পুত্রবধূ ক'রে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন কোন রকম অযত্নও হ'তে দেন নি সে বধূর। আর জামাই হরিনাথ তো ছিল স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা পাড়া ঘরে একটা গল্পের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এমন মিল কখনও-সখনও চোখে পড়ে। কদাচ কখনও শোনা যায়। অন্তত শ্যামা তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে কখনও শোনেন নি এটা ঠিক।

কিন্তু মেয়ের কপাল। বোধ হয় ওর জন্মলগ্নে সবগুলি কুগ্রহ একসঙ্গে বাসা বেঁধেছিল নইলে এমন হবে কেন? দুদিনের জ্বরে বলতে গেলে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল শ্বশুর, স্বামীর ধরল রাজযক্ষ্মা। যেন গ্রামসুদ্ধ দুর্ভাগিনীর ঈর্ষার নিঃশ্বাসেই স্বামী-সৌভাগ্য জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। সদ্যোজাত শিশু সন্তান নিয়ে এসে উঠল তাঁর বাড়ি—শুধু বিধবা হয়েই নয়, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে। জামাইয়ের ঐ সাংঘাতিক অসুখের সময় দিশেহারা মেয়ে চিকিৎসার খরচের জন্য যথাসর্বস্ব লিখিয়ে দিয়েছে ওদের নাম— অর্থাৎ দেওরদের নামে। চিরদিনের গর্বিতা মেয়ে তাঁর, রূপসী, স্বামী-সৌভাগ্যবতী— আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। ওর যে কী জ্বালা তা শ্যামা বোঝেন, অহর্নিশ সেই জ্বালায় নিজে জ্বলছে আর ওর চারিদিকে যারা আছে তাদের জ্বালাচ্ছে। সে জ্বালায় শ্যামাও দগ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি।

তবু ছোট মেয়ে তরুর বিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামা। অবশ্য সতীনের ওপর বিয়ে দেওয়া— কিন্তু তরুর বুড়ি দিদিশাশুড়ী অনেক জমি জায়গা দিয়ে সে বৌয়ের কাছ থেকে না দাবিনামা লিখিয়ে রেজেষ্ট্রি করিয়ে একেবারে পাকা ক'রে নিয়েছেন। সে দলিল শ্যামা দেখেছেন, অক্ষয় সরকার উকিল দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছেন সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই। বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট, ছেলেও চাকরি করে। যাকে বলে আল সোল নেই, তাই। এক বুড়ি ঠাকুমা, সে যে কোন দিন চোখ বুজবে। তারপর একেবারেই

BanglaBook.org

নিষ্কণ্টক। মেয়ে-জামাইয়ের ভাবও হয়েছে বেশ, তাও তিনি টের পেয়েছেন ওদের কথা-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে।

কিন্তু সে সব আশাভরসা ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে এ কী হ'ল?

অকস্মাৎ কী এমন ঘটল যে তরুকে পালিয়ে চলে আসতে হ'ল?

শ্যামা ওকে কোন প্রশ্নও করতে পারলেন না। ললাটে আঘাত ক'রে ক'রে অবসন্ন হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিলেন।

প্রশ্ন করল কনকই, আস্তে আস্তে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন ক'রে ক'রে— কিছুটা বা ওকেই বলবার অবকাশ দিয়ে আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা বার ক'রে নিল।

বুড়ি যে পরিমাণ ভালবাসে হারানকে, সেই পরিমাণই ওর সম্বন্ধে তার আশঙ্কা। বৌ এসে পর ক'রে নেবে— বাংলাদেশের চিরকালীন আশঙ্কা শাশুড়ীদের, কিন্তু এ আরও উগ্র, আও ভয়ঙ্কর। যদিও এ দিদিশাশুড়ী— তবু সাধারণ শাশুড়ীর চেয়েও যেন বেশি। কারণ সব হারিয়ে ওর এই হারান। হারানও যদি পর হয়ে যায় তো তাকে দেখবে কে? এই কারণে এ দিকটা সম্বন্ধে সে সদা-সতর্ক, সদা-জাগ্রত।

শুধু হারানকে হারাবারই ভয় নয়— আরও একটা অদ্ভুত ভয় ইদানীং পেয়ে বসেছে বুড়িকে। বিষয়-সম্পত্তি হারানের পৈতৃক নয়, বুড়ির নিজস্ব। বুড়ি হারানের বাবার জেঠাইমা। সম্পত্তি সেই পিতামহের স্ব-ক্রীত। একটা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা পরের মেয়ে তাঁর এই সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক হয়ে বসবে— হয়ত বা উড়িয়ে দেবে নষ্ট করবে— এই ভেবে ভেবেই বুড়ি প্রায় পাগল হ'তে বসেছে। সম্পত্তি এমন কিছু নয়, ন'বিঘে বাগান ভদ্রাসন এবং বারো বিঘে আন্দাজ ধান-জমি। আরও কিছু ছিল, সে বৌকে দিয়ে হাতছাড়া হয়েছে। এছাড়া আছে বুড়ির কিছু গহনা এবং সম্ভবতঃ কিছু নগদ টাকা। তবে সেটা আছে কি না এবং থাকলেও ঠিক কত তা হারানও জানে না। পোস্ট অফিসে শ'পাঁচেক টাকা পড়ে আছে— কিন্তু সে টাকা বুড়িকে কখনও তুলতে হয় না, অথচ কিছু কিছু খরচ সে নিজেও করে— তাইতেই হারানের ধারণা যে বেশ কিছু তার হাতে আছে।

তবু এই সম্পত্তির ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তার এমন মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত হাওড়ার কাছ থেকে কোন্ এক তান্ত্রিককে আনিয়েছিল 'যক' দেবে বলে। সে সম্পত্তির পরিমাণ এবং বিবরণ শুনে হেসে চলে গেছে, তিরস্কারও ক'রে গেছে খুব—তার সময় নষ্ট করবার জন্যে, বলে গেছে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ না করলে এ ধরনের তান্ত্রিক ক্রিয়া হয় না। একটি ব্রাহ্মণ বালক চাই, তাকে খুনের দায়— এ কি সোজা কথা নাকি?

তার পর থেকেই বুড়ি নাকি আরও ক্ষেপে গেছে।

অবশ্য তার আগেও, সে-বৌয়ের ওপরও অত্যাচার নাকি কম করে নি। সে বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে, সহ্য করতে না পেরেই নাকি বাপের বাড়ি চিঠি লিখে পালিয়ে যায়। এসব কথা পুকুরে স্নান করতে বা বাসন মাজতে গিয়ে পাড়ার অন্য মেয়েদের কাছে শুনেছে তরু। অনেকেই বলেছে... এক কথা। সুতরাং খানিকটা সত্য আছেই।

আর তা-ছাড়া, সে সম্বন্ধে হারানও সচেতন। এর আগে এ ধরনের ঘটনা না ঘটলে সে-ই বা এত সতর্ক হবে কেন? সে যতদিন সতর্ক ছিল ততদিন এতটা বাড়াবাড়ি তো হ'তে পারে নি।

কী সতর্কতা? কনকের প্রশ্নের উত্তরে লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা নামিয়ে সেকথাও বললে তরু। সেও যেমন বিচিত্র, তেমনি হাস্যকর।

বিয়ের পর প্রথম হারান বৌ সম্বন্ধে খুব উদাসীন নিরাসক্ত ভাব দেখিয়েছিল। তরুকে ঠাকুমার কাছে শোওয়াবার প্রস্তাব করেছিল। অন্যথায় তিনজনই একসঙ্গে শোবে, এমন

BanglaBook.org

প্রস্তাবও করেছিল। বুড়ি ভারি খুশী, সে-ই তখন জোর ক'রে বৌকে হারানের ঘরে পাঠিয়ে দিত প্রতি রাত্রে। তবু তখনও হারান বৌয়ের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা কইত না। তবু প্রথমটা ওর ব্যবহারে একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল। ছোট মাসীর কাহিনী সে মা'র মুখে, মেজদির মুখে অনেকবার শুনেছে। বিয়ে করেছিল মেসোমশাই নাকি শুধু তার মার সংসারে খাটবার জন্যে, নিজে একরাত্রের জন্যেও গ্রহণ করে নি স্ত্রীকে। সুন্দরী উমা অনাঘ্রাতা থেকেই ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেল। স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করা আর হ'ল না। অথচ এমনিতে সে মেসোমশাই নাকি খুব ভদ্র, ওদের বাবার মতো নয়!

সে যাই হোক— হারান শিগ্‌গিরই তার ভয় ভেঙ্গে দিল। একদিন একটা চিঠি লিখে ওকে জানিয়ে দিলে যে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু এখন কয়েকটা দিন ওদের প্রেম এবং প্রেমালাপটা একটু সংযত হয়ে— যতটা সম্ভব সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে করতে হবে এই মাত্র। বুড়ির ভীমরতি হয়ে মাথাটা একটু খারাপ-মতো হয়েছে, সুতরাং সাবধান থাকাই ভাল। বুড়ি আর কদিন? এই কটা দিন তরু যেন মানিয়ে নেয়, আর কিছু মনে না করে!

তবু তখনও হারানের আচরণের পুরো অর্থটা ওর বোধগম্য হয় নি। হারানও পরিষ্কার করে বলে নি যে বুড়ির ভীমরতির সঙ্গে ওদের নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে প্রেমালাপ করার কী সম্পর্ক। বোধ হয় লজ্জায় বেধেছিল, কেলেঙ্কারিটা পুরোপুরি নববধূকে খুলে বলতে। কিন্তু পরে তরুই আবিষ্কার করেছিল কারণটা। বুড়ি প্রত্যহ ওদের ঘরে আড়ি পাতত। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কতদূর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হচ্ছে সেটার খবর রাখত।

সবই জানত হারান কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতাটা সম্পূর্ণ ঢাকা সম্ভব নয়। ইদানীং ওরা একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। একটু চালাকিও করতে গিয়েছিল। প্রথম রাত্রে দু'একটা শুষ্ক প্রয়োজনীয় কথা বলে দুজনেই কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে হারান নাক ডাকাবারও চেষ্টা করত, তারপর ঘাটে যাবার অছিলায় কেউ দেখে আসত বুড়ি জেগে আছে কি না— বুড়ি ঘুমিয়েই পড়ত ততক্ষণে— তখন নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে গল্প করত।

কিন্তু বুড়ি আরও চালাক। সে তরুর চোখের দিকে চেয়ে সন্দেহ করত ব্যাপারটা। তার বয়স হয়েছে ঢের। মনের খুশি যে চোখের চাহনিতে অকারণেই উপচে পড়ে এটা সে জানে। তাছাড়া রাত্রি-জাগরণের কালিও চোখের কোণে ঢাকা কঠিন। বুড়িও তাই ইদানীং প্রথম রাতটা মটকা মেরে পড়ে থেকে গভীর রাত্রে উঠে এসে আড়ি পাতত। তার পরেই অত্যাচার চরমে উঠল। এবং সর্বশেষে— শ্যামারাও খবরটা এই প্রথম জানল—তরু গর্ভবতী হয়েছে টের পেয়ে যেন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল। হারান ভেবেছিল বুড়ি বংশরক্ষা হচ্ছে ভেবে, খুশী না হোক— একটু চেপে থাকবে, কারণ তারও জল-পিণ্ডির ব্যবস্থা আর নেই। সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল পরোক্ষভাবে— তাতে হিতে বিপরীত হল। তা'হলে সবাই তার মরণের কথাই চিন্তা করছে, 'মরণ ডাকছে' ভেবে ক্ষেপে উঠল! আগে গায়ে হাত তুলত না, এইবার মারধোর শুরু করল। গালাগাল তো অষ্টপ্রহর। এমন অকথা কুকথা নেই যা বলে না। দিনেরাতে সদাসর্বদা তরুর পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করছে।

এও সয়েছিল তরু কিন্তু গত সাত-আটদিন খাওয়ায় হাত দিয়েছে বুড়ি। ভাত বেড়ে খেতে বসেছে দেখলেই হয় ভাতের থালা টান মেরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নয়ত পুকুরে দিয়ে আসে। হাঁড়িসুদ্ধ ভাত গোরুর ডাবায় ঢেলে দেয়। একদিন ভাতের থালা জোর ক'রে চেপে ধরেছিল— নড়াতে পারে নি— ছাই এনে পাতে ফেলে দিয়েছে। কদিনই বলতে গেলে এর খাওয়া নেই।

BanglaBook.org

'তা ঠাকুরজামাই কি এসব টের পান না?' কনক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকার পর অতিকষ্টে প্রশ্ন করে। তার চোখেও তখন জল এসে গিয়েছে এইসব শুনতে শুনতে। আরও, নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রেই হয়ত।

'কেন পাবে না! আমি তাকে কাগজে লিখে লিখে সব জানিয়েছি। সে শুধু বলে— আর একটু। দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাকো। এবার পুরো ভীমরতি ধরেছে, শিগগিরই মরবে বুড়ি।..... আসলে সেও বুড়িকে ভয় করে। তারও ঐ বিষয়ের ভয়। এতদিন এত কষ্ট সহ্য করল, দুদিনের জন্যে যদি সবসুদ্ধ যায়— বুড়ি যদি ছন্নমতি হয়ে আর কাউকে লিখে দিয়ে যায়! এই ভয়েই গেল। আমি তাও বলেছি, চল আমরা চলে যাই, কোথাও একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকব, তুমি যা আনবে তাইতেই চালাব। তাতে শিউরে ওঠে, বলে, বাপ্‌রে, এতটা সম্পত্তি দুটো দিনের জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাবে!'

'তারপর? আজ কী হ'ল তাই বল না!' অসহিষ্ণু হেম প্রশ্ন করে।

ওদিকে মুখ ফিরিয়ে তরু বলে, 'পর পর দু'দিন খাওয়া হয় নি শুনে পরশু রাত্তিরে পকেটে ক'রে দুটো সন্দেশ এনেছিল। রাত্রে সেই সন্দেশ খেয়ে দালানে জল খেতে বেরিয়েছি, বুড়ি নিজের ঘর অন্ধকার ক'রে জানলায় বসে ছিল, সব দেখেছে। কাল ভোরবেলা যে-ই আমি ঘাটে গিয়েছি বুড়ি ঘরে ঢুকেই ওর পকেটে হাত দিয়েছে। এসব দিকে আশ্চর্য মাথা এখনও বুড়ির। সকালে বাজার করার সময় বেরিয়ে পাঁদাড়ে ফেলে দেবে বলে শালপাতার ঠোঙাটা পকেটেই রেখেছিল— বুড়ি টেনে বার করল। তখন সটেপটে চেপে ধরতে ওকেও মানতে হ'ল কথাটা। তখন তো ছড়া বেঁধে গালাগাল দিলেই— তারপর ও বেরিয়ে যেতে একটা ছুতো করে বললে, আমি পুলিশে যাব, তোরা আমাকে বিষ দিয়ে মারছিস। এর মধ্যে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেছল— সেই থেকে মধ্যে মধ্যে ধুয়ো তোলে, তোরা আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছিস। তা আমি পুলিশে যাবার কথায় আর থাকতে পারি নি, বলেছিলুম যান না পুলিশে, কত ধানে কত চাল একবার দেখুন না। যা নির্যাতন করছেন আমায় তা পাড়াঘরের সবাই জানে, দেখবেন আপনার হাতেই তখন দড়ি পড়বে।... তাতে বলে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোর ঐ জিভ আমি আজ টেনে বার করব। এই বলে সাঁড়াশি টকটকে করে পুড়িয়ে এনেছিল জিভ টানবে বলে, আমি কোনমতে হাত এড়িয়ে ছুটে বাইরে চলে এসেছিলুম, কিন্তু সেই সাঁড়াশি আমার বুকে লেগে কী কাণ্ড হয়েছে দ্যাখো—'

বলতে বলতে আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তরু। তারপর দাদার দিকে পেছন ফিরে বুকের জামা সরিয়ে বৌদিকে দেখাল— এতবড় একটা ফোস্কা পড়ে আছে, তখনও বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

দেখেছিলেন শ্যামাও, তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন আর একবার। শুধু কনকই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'তারপর? তা তখনই চলে এলে না কেন?'

সে কথাও বলল তরু, কোনমতে— থেমে থেমে, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে।

সে সময় আর তার কোন জ্ঞান ছিল না। ভয়ে যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে পাশের দত্তদের বাড়ি আছড়ে পড়েছিল, সে দত্তগিন্নী পোড়া জায়গাটায় নারকেল তেল লাগিয়ে বাতাস ক'রে একটু সুস্থ ক'রে তুলেছিলেন। তৃষ্ণায় তখন সমস্ত ভেতরটা ওর শুকিয়ে গেছে বুঝে একঘটি বাতাসার সরবতও ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁকেই বলেছিল তরু এখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে, কিন্তু দত্তগিন্নী তা শোনেন নি। ওকেও ছাড়েন নি। আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'তোমার সোয়ামী আসুক, এমন কেলেঙ্কারি শুনলে কি আর একটা বিহিত করবে না? ফট্‌ ক'রে অমন এক কথায় শ্বশুরঘর ছেড়ে যেতে নেই মা!'

BanglaBook.org

তরুও তাই আশা করেছিল। ভেবেছিল এবার অবস্থা চরমে উঠেছে জানলে— এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে— নিশ্চয়ই তার চৈতন্য হবে। হারান অফিস থেকে ফিরছে দেখে দত্তগিন্নীই সঙ্গে ক'রে এনে সব বলে দিয়ে গেলেন তরুকে। সে কিন্তু সব কথা শুনে মন্তব্য করল, 'তা তুমিই বা জেনেশুনে ও পাগলকে ঘাঁটাতে গেলে কেন? সত্যিই কি আর কিছু ও পুলিশে যেত!'

এই পর্যন্ত।

একটা সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করেনি হারান কিম্বা পোড়া জায়গাটাও একবার দেখতে চায় নি। বুড়ি ভাত বেড়ে খেতে ডাকলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে খেতে বসেছে, খেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বুড়িকেই রাঁধতে হয়েছিল, কারণ তরু তো ছিল না- নইলে না খেয়েও তরুই রান্না করেছে কদিন, আর যতই বিষ দেবার কথা বলুক মুখে, বুড়ি খেয়েছেও এতটি— যেমন খায়। বুড়ি কাল কী মনে ক'রে তরুর মতোও রান্না করেছিল, হয়ত সকালের অতটা বাড়াবাড়িতে নিজেই ভয় পেয়ে থাকবে— হারানের পাতেই ভাত বেড়ে দিয়ে হেঁকে বলেছিল, 'ও ডাইনীকে দয়া ক'রে খেয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে বল্ হারান, আমার শরীর খারাপ, বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারব না!'

তরু খেতে যায় নি, ঘরে ঢুকে মেঝেতে পড়ে ছিল, সেখান থেকেও ওঠে নি। হারান কিন্তু নির্বিকার ওকে খেতে অনুরোধ করা কিম্বা ডেকে বিছানায় শোয়ানো, কিছুই করে নি। তরুর বিশ্বাস একটু পরে সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বরং।

তাই সারারাত জেগে পড়ে থেকে মনের ঘেন্নায় শেষরাত্রে উঠে চলে এসেছে ও।...

এখন যদি এরা আশ্রয় না দেয় তো— সামনেই পুকুর আছে,— কিম্বা স্টেশনে গিয়ে রেলেও গলা দিতে পারে। মোট কথা, ওকে যদি যেতেই হয়— পিতৃকুল, শ্বশুরকুল সকলের মুখে কালি দিয়ে সে যাবে। এই তার স্পষ্ট কথা।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে রইল। যেন নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে সবাই।

হেমের অফিসের বেলা পার হয়ে গেছে। এরপর আর স্নানাহার করে গিয়ে ছটা চল্লিশের ট্রেন ধরা সম্ভব নয়। সেদিকে খেয়ালও নেই হেমের। কোলের বোন তরু— বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আর শান্ত বলেই বোধ হয় ওর প্রতি তার স্নেহ একটু বেশি চিরদিনই।

শ্যামা যেন আরও কাঠ হয়ে গেছেন। উনুনে ভাত ফুটে গলে গেছে। আঁচ ঠেলে দেওয়া বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণই কিন্তু ভেতরের তাপে তা এখনও ফুটছে। একটু পরেই হয়ত অখাদ্য পাঁক হয়ে যাবে, এতখানি খাদ্য-বস্তু নষ্ট হবে। তবু সেদিকেও শ্যামার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ভাবছিলেন তাঁদের রক্তের কথা। তাঁর মা'র রক্ত যেখানে এক ফোঁটাও আছে, কেউ সুখী হবে না। মনের মধ্যে এই আঘাতের মধ্যেও বিচিত্র হাসি একটা পাচ্ছিল তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন যে মেজমেয়ের বৈধব্য এবং তাঁর স্বামী নরেনের মৃত্যুতেই বুঝি এ প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে গেল। হায় রে! এতই সহজে ভাগ্যকে ফাঁকি দেবেন তিনি!

সম্বিৎ ফিরল বুঝি কনকেরই প্রথম।

সে উঠে দাঁড়িয়ে তরুর হাত ধরে টেনে বললে, 'তুমি ঘাটে চল ঠাকুরঝি মুখহাত ধুয়ে কাপড়টা কেচে নাও, আমার একটা শাড়ি আছে আলনায়, এটেই পরো। মুখে একটু জল দাও। অমন করে বসে থেকে তো লাভ নেই!'

এই টুকু সহানুভূতির স্পর্শেই এতদিনের নিরুদ্ধ বেদনা আবার প্রবল হয়ে ওঠে তরুর। সে হু হু ক'রে কেঁদে বৌদির কাঁধে মুখ গুঁজে বলে, 'আমার কি হবে বৌদি, আমি কোথায় দাঁড়াব!'

BanglaBook.org

এইবার হেমও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়।

তার কণ্ঠস্বরও সম্ভবত খানিকটা বাষ্পার্দ্র হয়ে এসেছিল। জোর করে সে কণ্ঠকে সহজ করতে গিয়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের কঠোর শোনাল।

সে বলে উঠল, 'হবে আবার কি? আমরা তোকে দুটো ভাত দিতে পারব না? একটা বোন পুষছি, না হয় আর একটাকেও মনে করব তেমনি হয়ে এসে উঠেছে!'

শিউরে উঠল কনক।

'ও মা, ছি ছি! ও কী অলুক্ষণে কথা! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে কনক, 'দুদিনের ব্যাপার দুদিনেই মিটে যাবে ঠাকুরঝি, তোমার ঘর-বর তুমি ঠিকই পাবে। নাও এখন ঘাটের দিকে চল দিকি!'

শিউরে ওঠেন শ্যামাও অস্ফুট কণ্ঠে 'ষাট। ষাট!' ক'রে ওঠেন।

তেমন ক'রে আর কাউকে না এসে উঠতে হয়।

ছেলেটা যেন কি!

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়িতে খানিকটা ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে ফ্যান গালতে বসেন। যদি কিছুটাও আদায় হয়। হয়ত সবটা এখনও পাঁক হয়ে যায় নি।

কনক একরকম জোর ক'রেই তরুকে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'মা, ওঁর তো অফিসে যাওয়া হ'লই না আজ, যা দেখতে পাচ্ছি— তা ওঁকে একবার বলুন না নিবড়েয় যেতে!'

হেম কথাগুলো বলে উঠোন পেরিয়ে ওধারে সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিল। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠ মন্তব্য করে উঠল, 'কিসের জন্যে ঐ ছোটলোকদের কাছে যাব শুনি!... এই ব্যবহারের পর পায়ে ধরে বোনকে ফিরিয়ে দিতে যাব? ওরা তো আরও পেয়ে বসবে। এবার তো সোজাসুজি খুন ক'রে ফেলবে তাহলে। না, সে আমি পারব না। ও থাক এখানেই— নিজেরা যদি খেতে পাই তো বোন ভাগ্নেও একমুঠো খেতে পাবে।'

অগত্যা চুপ ক'রে যায় কনক। কিন্তু কথাটা তার আদৌ ভাল লাগে না। অথচ তার আর কীই বা বলার আছে, স্বামীর ওপরই বা তার কতটুকু অধিকার।

সে শুধু নীরব জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চায় শাশুড়ীর মুখের দিকে।

কিন্তু শ্যামা কিছুতেই বলতে পারে না। কিছুই ভেবে পান না যেন। বহু আঘাত সহ্য করেছেন জীবনে কিন্তু তখন নিশ্চিন্ত ভাবটা ছিল না, আঘাতের জন্যেই যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন তিনি। এখন, এই বছর-কতকের নিশ্চিন্ততার পর, আকস্মিক এই আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনিও। তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও যেন আজ আর কোন কাজ করছে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

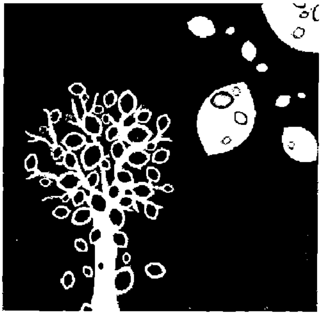

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাশুড়ী যতই চুপ ক'রে থাকুন এবং হেম যতই ভাত-কাপড়ের ভরসা দিক, কনকের বুকের মধ্যে যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে তরুর অবস্থাটা চিন্তা ক'রে। কিছুতেই সে স্বস্তি পায় না; তরুর দিকে চোখ পড়লেই চোখে জল এসে যায় তার।

হয়ত এতটা উদ্বেগ অকারণ, কিছুই হয়ত হবে না শেষ পর্যন্ত, হয়ত ওবেলাই মিটে যাবে সব— তবু একটা আকারহীন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে থাকে সে। মনে হয়, এ ঠিক হচ্ছে না; তাদের তরফ থেকে কিছু একটা করা দরকার, যেমন ক'রেই হোক এটা মিটিয়ে নেওয়া দরকার। যদি— যদি শেষ পর্যন্ত হারানেরও বিষ-নজরে পড়ে যায় তরু এই ঘটনা উপলক্ষ ক'রে?

দোষ তরুর নেই সত্যি কথা—কিন্তু পুরুষের মন কি সুক্ষ্ম ন্যায়বিচার ধরে চলে!

তা যদি চলত তবে কনকেরই বা এ অবস্থা হবে কেন?

কনকের এতটা উদ্বেগের কারণ যে ঐখানেই।

তার নিজের কথা ভেবেই তরুর জন্যে এত দুশ্চিন্তা।

আহা যে পেয়েছে, সে সুখী হয়েছে— সে আর না হারায়, সে সুখ থেকে না বঞ্চিত হয়।

পোড়া ঘায়ের ক্ষতটা তরুর বুকের ওপর— আর কনকের বুকের মধ্যে, আজও সমান দগদগ করছে।

অথচ তার এ কথা কাউকে বলবার নয়—জানাবার নয়। কাউকে খুলে বলতে পারলেও হয়ত একটু শান্তি পেত সে। কিন্তু কী বলবে? তার এ অদ্ভুত অবস্থা—ত্রিশঙ্কুর মতো স্বামীর হৃদয়াকাশে ঝুলে থাকা কে বুঝবে? হয়ত বলবে বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা। সহানুভূতির পরিবর্তে উপহাসই করবে তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই দোষ দেবে—বলবে তারই অক্ষমতা, স্বামীর মন সে দখল করতে পারে নি মেয়েমানুষের পক্ষে চরম অপমানের কথা এটা। আর সেই কারণেই সে কাউকে বলে না, নিজের বাবা-মার কাছেও না। তাঁরা জানেন— বোধহয় সবাই জানে, কনক সুখী, স্বামী-সৌভাগ্যবতী।

আর বাস্তবিকই—সে যে কী—সৌভাগ্যবতী না দুর্ভাগ্যবতী—তা সে যে নিজেই বুঝতে পারে না এক এক সময়। কারণ ঠিক স্বামী-পরিত্যক্তা বলতে যা বোঝায়—এদেশে মেয়েরা যাকে বলে 'বর নেয় না'—সে অবস্থাও তো তার নয়। স্বামীর ঘরে থাকে স্বামীর পাশে শোয়, স্বামী তাঁর সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা দাবি করেন, হাতে হাতে পান-জল কাপড়-জামা যুগিয়ে দিতে হয়— প্রয়োজন মতো কথাও বলেন সহজেই—রাত্রে শোবার পর কনক পা টিপে দেয়, সে সেবাটা তিনি অত্যন্ত আরামের সঙ্গেই উপভোগ করেন।

BanglaBook.org

কোন অসদ্ব্যবহারও করে না হেম। এমনিতেই তার মেজাজটা ইদানীং একটু রুক্ষ হয়েছে—সেটা মা বোন সকলের সঙ্গে ব্যবহারেই সমান প্রকাশ পায়—হয়ত কনকের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। তেমনি, অতিরিক্ত রূঢ়তা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি, এমন নালিশও কনক করতে পারবে না। এমন কি, বহুদিনের ব্যবধানের মধ্যে মধ্যে তাদের দৈহিক মিলনও ঘটে—তবু কনক জানে যে হেম তাকে আজও পর্যন্ত ঠিক স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রয়োজনের আসবাব এই পর্যন্ত, তার প্রতি সপ্রেম তো দূরের কথা—সকাম কোন আসক্তিও বোধ করে না। আর তা জানে বলেই ঐ দৈহিক মিলনের দিনগুলো তার পক্ষে আরও বেদনাদায়ক আরও অপমানকর হয়ে ওঠে। কে জানে কেন, তার কেবলই মনে হয় হেম তাকে মূক পশুর মতো মনে করে, আর সেই ভাবেই আচরণ করে। সে দিনগুলোর অপমান ভুলতে তাই কনকের বহুদিন সময় লাগে। অথচ তার দোষ কি—সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

মোটামুটি তার চেহারা খারাপ নয়—লোকে বলে ভালই, অন্তত তাই সে শুনে এসেছে চিরকাল। বয়স বরং হেমের তুলনায়, মানান-সই যা, তার চেয়ে অনেকটাই কম। তার বিয়ের সময় এ নিয়ে আত্মীয়মহলে অনেক কথা উঠেছিল। কিন্তু অত বিচার করা সম্ভব ছিল না তার বাবার, অনেকগুলি বোনের একটি সে। তার দিদির বিয়েতেই তার বাবা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, এই যা পাত্র পেয়েছেন তিনি ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তা হোক, কনকের অন্তত সেজন্য কোন নালিশ ছিল না। বয়স যাই হোক-সে বয়সের ছাপ হেমের মুখে আজও পড়ে নি। যথেষ্ট রূপবান সে, বিয়ের পরের দিন দিনের আলোয় বরকে দেখে কনকের মন তৃপ্তিতেই ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। বর রান্নাঘরে শুতে চেয়েছিল—সম্ভবত ফুলশয্যা সম্বন্ধে কোন মোহ বা ভুল ধারণা কনকের না হয় সেই জন্যেই। সেদিনটা মা বোন বকাবকি ক'রে ঠেকালেও পরের দিন থেকে আজও সে রান্নাঘরেই শুচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে সে কথাও বলে নি দীর্ঘকাল, খুব প্রয়োজন ছাড়া, কোন প্রণয়সম্ভাষণ তো দূরের কথা। ওরা বাপের বাড়িতে শিখিয়ে দিয়েছিল স্বামীর পা টিপতে হয়— সেই মতো সব লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সে নিজে থেকেই পা টিপতে শুরু করেছিল। কোন বাধা দেয় নি হেম। কোন সেবাতেই তার অরুচি নেই—সবই তার প্রাপ্য বলে গ্রহণ করে। অথচ কনকেরও যে কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে, তাকেও যে কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত, সেইটে তার মাথাতে ঢোকে না। ও শুনেছে ওর মেজ ননদের মুখে ওদের মাসশাশুড়ীর কথা, মেসোমশাই ফুলশয্যার দিন মধ্যে বালিশ রেখে শুয়েছিলেন, জীবনে কখনও গ্রহণ করেন নি স্ত্রীকে। সেই মেসোমশাই নাকি বুড়ো বয়সে রক্ষিতা হারিয়ে সেবা নেবার জন্য স্ত্রীর কাছে এসে উঠেছেন। এই রকমই এদের ধারা নাকি/ কনক ভাবে মধ্যে মধ্যে—আর সে সম্ভাবনার কথা মনে হ'লে শিউরে ওঠে।

অবশ্য আগের মত কঠোরতা আর নেই। এমন কি সাংসারিক পরামর্শও কোন কোন সময় নিজে থেকেই যেচে নেয় তার কাছে। এর মধ্যে একদিন কনকের শরীর খুব খারাপ হ'তে মৌড়ির হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দিয়েছিল শাশুড়ীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। মেয়েদের অসুখ হ'লে ডাক্তার দেখাতে হবে কি ওষুধ খাওয়াতে হবে— এটা শ্যামার মতে বাড়াবাড়ি। বৌদের জন্যে আবার এত! একটা যাবে আর একটা হবে। 'বেঁচে থাক আমার মোহনবাঁশী, কত শত মিলবে দাসী!' ঠিক ওর সম্বন্ধে এসব কথা না বললেও বৌদের সম্বন্ধে এই ধরনের বহু মন্তব্য করতে শুনেছে কনক—সুতরাং তাঁর মনোভাব জানতে বাকি নেই।

কিন্তু এতেও তৃপ্ত নয় কনক। সে জানে যে এটা নিতান্তই মায়া, স্নেহ। পাখি পুষলেও

BanglaBook.org

মায়া হয়—এ তো মানুষ। সে যে দিয়েছে অনেক। এ সংসারে ঢুকে পর্যন্ত দিনরাত পরিশ্রম করছে, নীরবে প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে যাচ্ছে, ওর জন্য একটুখানি অন্তত করতে বাধ্য হেম।

আসলে হয়ত তার বিধবা মেজ ননদ ঐন্দ্রিলাই বিষিয়ে দিয়ে গেছে তার মন। তা নইলে হয়ত এতটা মাথা ঘামাত না। ঐন্দ্রিলা তাকে গোপনে সব কথাই বলে গেছে। এই রেল অফিসে ঢোকবার আগে নাকি হেম থিয়েটারে চাকরি করেছিল কিছুদিন। সেইখানে নলিনী বলে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে খুব প্রেম হয় ওর। একেবারে নাকি তাকে নিয়ে পাগল হ'তে বসেছিল। সেইটে হাতেনাতে ধরা পড়েই নাকি সে চাকরি যায়। কিন্তু তবু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যায় নি—তাও জানে ঐন্দ্রিলা। কনকের বৌ-ভাতের দিনও তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং সেও এসেছিল। 'গরদের শাড়ি পরে এসে সোনার জিনিস দিয়ে মুখ দেখে গেল—মনে নেই তোমার?' প্রশ্ন করেছিল ঐন্দ্রিলা।

খুবই মনে আছে কনকের। কারণ সে মহিলার চালচলন বেশভূষা সবই ছিল উপস্থিত সমস্ত অভ্যাগতা থেকে স্বতন্ত্র। তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ও বিব্রত ছিল হেম—তাও লক্ষ করেছে কনক, ঘাড় হেঁট ক'রে বসে থাকা সত্ত্বেও। আরও মনে আছে এই জন্যে যে, তাকে নিয়ে বড় ননদের শ্বশুরবাড়ির মধ্যে বেশ একটা চাপ গুঞ্জরণ উঠেছিল। মহাশ্বেতার মেজ জার হাসি আর মন্তব্যটা কনকের আদৌ ভাল লাগে নি। তখনই কেমন খট্‌কা লেগেছিল।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা ঐখানেই থামে নি।

আরও কিছু বলেছিল কনককে।

ঐন্দ্রিলা অদ্ভুত, তাকে দেখলে ভয় করে কনকের, সাক্ষাৎ হুতাশনের মতো জ্বলে ও জ্বালিয়ে বেড়ায় সর্বদা। ওর সম্বন্ধেও যে তার কোন প্রীতি নেই তাও কনক জানে। আসলে কেউ সুখে আছে-এটা সুদূর কল্পনাতে অনুমান করলেও জ্বলে ওঠে সে। সে সুখের মূলসুদ্ধ উৎপাটিত না করা পর্যন্ত যেন তার শান্তি থাকে না।

সেইজন্যেই এত কথা বলেছিল ওকে ঐন্দ্রিলা—প্রীতিবশত নয়।

স্বামী যে তাকে ভালবাসে এমন অসম্ভব দুরাশা যেন কনক কখনও না পোষণ করে। এইটেই বার বার বোঝাতে চেয়েছিল সে।

হেমের মন পড়ে আছে বহুদূরে।

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে চেয়ে চোখ ধেঁধে আছে তার। পতঙ্গের মত সেই দিকেই শুধু লক্ষ্য—সামান্য মাটির প্রদীপ কনকের সাধ্য নেই যে সে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

তার মাসতুতো দাদা গোবিন্দর দ্বিতীয়পক্ষের বৌ রানীই নাকি সেই জ্যোতিষ্ক।

ইদানীং দীর্ঘকাল ধরে তার জন্যেই নাকি ঐন্দ্রিলার দাদা পাগল। সে নাকি মহা খেলোয়াড় মেয়ে, ধরাও দেয় না ছেড়েও দেয় না, শুধু অবিরাম খেলায়। হেমও নাকি বেশি কিছু চায় না—তাকে দেখে তার কথা শুনেই সে মুগ্ধ। সেইটুকু পেলেই খুশি সে। আর সেটুকু পাবার কোন বাধাও নেই। তাই সে মোহ খুব তাড়াতাড়ি ঘুচবে হেমের, এমন অসম্ভব আশা যেন কনক না মনে ঠাঁই দেয়।

রানীদিদিকে দেখেছে কনক। মুগ্ধ হবার মতোই মেয়ে।

শুধু রূপেই নয়—রূপোসী মেয়ে কনক আরও দু-একজন দেখেছে, কিন্তু তারা যেন পুতুলের মতো, আলতো সন্তর্পণে রেখে রূপ বাঁচাতেই তারা ব্যস্ত, প্রাণহীন অহঙ্কারের পুতুল এক-একটি। কিন্তু রানীদি তেমন নয়—কারুর মতোই নয়, সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অত উচ্ছল প্রাণশক্তি আর কারুর মধ্যে দেখেছে বলে কনকের মনে পড়ে না। হাসিতে-খুশিতে কথায়-বার্তায় কাজকর্মে অনন্য সে।

BanglaBook.org

যদি সত্যিই সে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে থাকে হেমের, আর মন যদি সেখানে বাঁধা পড়ে থাকে, তাহলে কনকের বিশেষ কোন আশা নেই, তার সেও বোঝে।

তাই তার আরও হতাশা, আরও অতৃপ্তি। যেটুকু পায় তাতে মন ওঠে না—ঐন্দ্রিলার দেওয়া বিষ তার ক্রিয়া করেছে মনে, সে কেবলই দেখে স্বামী তার সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট না হোন—উদাসীন।

তাই অন্তর তার তৃষ্ণার্ত হয়েই থাকে। আর কেবলই মনে হয় বিবাহিতা মেয়েদের সব সুখ-সৌভাগ্যের বড় কথা হ'ল স্বামী-সোহাগ, তা থেকে যেন কোন দুর্ভাগিনী কখনও বঞ্চিত না হয়।

যে কখনও পায় নি তার কথা তবু আলদা, যে একবার পেয়েছে সে তা হারিয়ে বাঁচে কি ক'রে।

ঐন্দ্রিলা ওর মহা সর্বনাশ করেছে জেনেও তাই কনক তাকে মার্জনা করে। বোঝে যে এই জ্বালাই তার স্বাভাবিক। তার বিশেষ দোষ নেই, বেচারি!

আজ তাই তরুর জন্যও ওর এত দুশ্চিন্তা।

বেলা বারোটা নাগাদ হারানের গলা পাওয়া গেল বাইরে।

'দাদা আছেন নাকি, দাদা?'

হেম ঘরেই ছিল, অফিস যাওয়া তার হয় নি, সে-বেলা উৎরে গিয়েছিল, আর বোধ হয় যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও ছিল না। সেই সময়, কনক তরুকে ঠেলে ঘাটে পাঠাবার পর সে যা কটা কথা বলেছিল হেম, তারপরই আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আর ওঠেও নি, কথাও বলে নি কারুর সঙ্গে। স্নানাহারের তো প্রশ্নই ওঠে না। শ্যামা অবশ্য বসে নেই তাঁর অভ্যস্ত কাজ ঠিকই ক'রে যাচ্ছেন, কিন্তু সে কতকটা কলের পুতুলের মতো, তাঁরও যে বেলার দিকে নজর আছে তা মনে হয় না।

ভোরের রান্না বাদে সাধারণ গৃহস্থর যা রান্না কনকই করে। আজ যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সে-পর্ব শেষ ক'রে তরুকে ধরে এক রকম জোর ক'রেই একগাল ভাত খাইয়ে দিয়েছে—তারপর থেকে সে-ও চুপ ক'রে বসে আছে দাওয়ায়। হেমের এই অবস্থায় স্নান করতে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত হবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না সে। হয়ত মা'রই একসময় খেয়াল হবে, তিনিই বললেন। অথবা শেষ পর্যন্ত হেমই উঠবে। কনকেরও সমস্ত মনটা ভারী হয়ে আছে, এদিকে বিশেষ তাগিদ নেই। তাই চুপ ক'রে অপেক্ষাই করছে সে ঘটনার গতি স্বাভাবিকভাবে আবর্তিত হবার।

হারানের গলা পেয়ে সে-ই ছুটে বাইরে এল, 'ঠাকুর জামাই যে, কী ভাগ্যি! আসুন আসুন—ভেতরে আসুন। অমন পরের মতন বাইরে থেকে ডাকছেন কেন?'

কনকই যে আগে বেরিয়ে আসবে তা বোধ হয় ভাবে নি হারান, সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কোনমতে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'আর বৌদি, ব্যাপার দিকে পরই হ'তে বসেছি।'

তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি আর এখন ভেতরে যাব না, আপনি দয়া ক'রে আপনার ছোট ননদকে বলুন যে, কেলেঙ্কারি যা হবার তা তো চরমই হ'ল, বাকি তো কিছু রইল না। এখন তার যদি সে ঘর করবার ইচ্ছে থাকে, তাহ'লে এক্ষুনি এই দণ্ডে আমার সঙ্গে যেতে হবে। নইলে সে-মুখো যেন আর কখনও না হয়।'

'ছি ছি! কী সব বলছেন ঠাকুরজামাই। বেশ তো, তাই না হয় হ'ল—তা একটু ভেতরে আসতে দোষ কি। জামাই মানুষ, বাইরে দাঁড়িয়ে এমন করে ভরদুপুরবেলা—। চলুন চলুন। যা বলবার আপনিই বলুন না তাকে, আমরা কেন আর নিমিত্তের ভোগী হই।'

BanglaBook.org

'না না, ওসব আদর-আপ্যায়ন এখন থাক। ওসব আমার এখন ভাল লাগছে না। আপিস কামাই হ'ল মিছিমিছি—। আবার এই ঠেকো-রোদ্দুরে এতটা পথ যেতে হবে—।'

'তাই তো বলছিলুম, নেয়ে খেয়ে বেলা পড়লেই না হয় যাবেন। আপিস তো গেলই, শুধু শুধু এখনই ছুটে লাভ কি। আসুন আসুন, একটা কথা রাখুন, আমি আপনার গুরুজন হই—তায় কুটুম, আমার কথা রাখতে হয়।'

বোধ হয় চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যেই, একেবারে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল হারান। তারপর একটু চেষ্টাকৃত কর্কশ কণ্ঠেই বলল, 'মাপ করবেন বৌদি, যদি ছোট হয়ে বড়কথা বলে ফেলি। কুটুম কিসের, বোয়ের সম্পর্কেই তো। এ কুটুম্বিতেয় আমার আর রুচি নেই। আপনি দয়া ক'রে ওকে গিয়ে বলুন—আমি ঠিক ঘড়িধরা আর পাঁচ মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। এর মধ্যে যদি আসতে পারে—আর সেখানে থাকতে চায় তো আসবে, নইলে এই শেষ!'

ওর ভাবভঙ্গি দেখে এই উদ্বেগের মধ্যেই হাসি পেয়ে গেল কনকের। যেন যাত্রার দলের সেনাপতি। মনে পড়ল হারানের থিয়েটার করার খুব শখ, পাড়ার ক্লাবে খুব নাকি নামও ওর।

হাসি পেল বলেই বোধ হয় অপমানটা গায়ে লাগল না। সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হয়ত হাতটাই ধরত শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তার আগেই হেম বেরিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়াল ভগ্নীপতির সামনে।

'পাঁচ মিনিটও তোমার থাকবার দরকার নেই, তুমি এখনই পথ দেখতে পার। কী করতে যাবে আমার বোন সেখানে আবার শুনি—খুনহ'তে? শেষ করেই তো এনেছিলে দুজনে মিলে, এখনও যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করছে কণ্ঠার কাছে, সেটুকুও না নিঃশেষ করতে পারলে বুঝি তোমাদের দিদি-নাতির মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে না? রাস্কেল কম্‌নেকার! আবার মেজাজ দেখানো হচ্ছে। তোমাদের পুলিশে দিতে পারি জানো? তোমাকে আর তোমার এই ডাইনী ঠাকুমাকে! আর তাই দেওয়াই উচিত। নইলে আরও কার কি সর্বনাশ করবে তার ঠিক কি! তুমিও যেমন, ঐ রাস্কেলকে আবার মিষ্টি কথায় ঘরে ডাকছ!'

হারান হেমের উগ্রমূর্তিতে কেমন যেন একটু নরম হয়ে এসেছিল গোড়ার দিকটায়, কিন্তু দু-দুবার 'রাস্কেল' শুনে তার মুখও অগ্নিবর্ণ ধারণ করল। সে বলল, 'বেশ তো—তাই দিন না দেখি কত মুরোদ! থানাপুলিশ আমরাও করতে জানি। সে কোমরের জোর আমাদের আছে। ...যা ঢ্যাঁটা আপনার বোন! বাড়িতে ঠাকুমা দিদিমা থাকলে অমন একটু-আধটু শাসন করেই। তার জন্যে কোন্ ভদ্দরলোকের মেয়ে ভাতের ওপর ঠ্যাকার ক'রে না খেয়ে পড়ে থেকে এমন হুট্ ক'রে একা একা চলে আসে তাই শুনি! এ তো কুলত্যাগ করা। .. আর কেউ হ'লে ঘরে নেবার নাম করত না। পাড়াঘরে শুনলে বলবে কি? আর শুনতেই কী বাকি আছে! কেলেঙ্কারে যে মুখ দেখাতে পারব না আমরা।—তবু তো ঠাক্‌মার অনেক সহ্য—বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, এবারের মতো মাপ কর, ওকে নিয়ে আয়। ঠাক্‌মা এখনও এ বাড়িকে চেনেনি তো!.. বেশ, থাক না আপনার বোন এখানে। চিরদিনই পুষুন। হয়ত কাজেও লাগাতে পারবেন। কিন্তু মনে থাকে যেন, সে দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হ'ল। এই শ্বশুরবাড়িতে লাথি মেরে আমি চলে যাচ্ছি!'

সে হন হন ক'রে বেরিয়ে গেল।

হেম প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধরে পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছিল। বোধ করি গিয়ে গলা টিপেই ধরত। কনক সব লাজলজ্জা ভুলে পেছন থেকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল, 'করছ কি! হাজার হোক ও জামাই। একদিন হাঁটু ধরে ওর হাতে বোনকে তুলে দিয়েছ। ও শত অপমান করলেও

BanglaBook.org

আমাদের সয়ে যেতে হয়। বোনের কথাটাও ভাবো, ওর যে সারাজীবন এখনও সামনে পড়ে।'

অগত্যা হেম নিরস্ত হ'ল। ততক্ষণে হারানও ওদের বাগান পেরিয়ে একেবারে বাইরে রাস্তাতে গিয়ে পড়েছে—ছুটে যাওয়াও আর সম্ভব নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ততক্ষণে অশ্রুমুখী তরু বেরিয়ে এসেছে।

'আমি যাই বৌদি, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। যদি আর দেখা না হয়, দোষঘাট যা করেছি, মাপ ক'রো—'

কিন্তু সে আর এগোবার আগেই হেম তার একখানা হাত চেপে ধরল, 'খবর-দার! এক পা বাড়ালে কেটে দুটুকরো ক'রে ঐ পগারে ফেলে দেব। তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। ...কতবড় ছোটলোক! শ্বশুরবাড়িতে লাথি মেরে চলে গেল, আর তুই এ বাড়ির মেয়ে হয়ে সেখানে যাবি শেষে ঘর করতে!... আবার বলে কিনা —কাজেও লাগাতে পারেন! আমি ওদের মতো বোনকে দিয়ে রোজগার করাই কিনা!—হাত্তোর ছোটলোকের ঝাড়!...থাক তুই মনে করব তুইও খেঁদির মতো বিধবা হয়ে এসেছিস!'

॥২॥

এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন ঐন্দ্রিলা এখানে ছিল না। এমন প্রায়ই থাকে না সে আজকাল। বিধবা হবার পর সর্বস্বান্ত হয়ে যখন চলে আসে তখন আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ি সে যাবে না— এই প্রতিজ্ঞা করেই এসেছিল। আর যাবার কথাও নয়, কারণ তার শাশুড়ী সে সময় যে চরম দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা ক্ষমার অযোগ্য। অবশ্য তাঁর তরফ থেকে সে দুর্ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ ছিল। তাঁর বিশ্বাস তাঁর স্বামী এবং পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য ঐন্দ্রিলাই দায়ী। ওরই বিষনিঃশ্বাসে তাঁর সোনার সংসার শুকিয়ে গেল। এ বিশ্বাস তিনি চেপে রাখারও চেষ্টা করেন নি। হেমকেও সেকথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতিজ্ঞা যা-ই করুক, কিছুদিন এখানে থাকার পর এখানটাও অসহ্য হয়ে উঠল যখন— তখন চরম একটা রাগারাগি ক'রে সেই শ্বশুরবাড়িতেই আবার গিয়ে উঠল ঐন্দ্রিলা। ভাগ্যক্রমে তাদেরও সেটা খুব দুঃসময় চলছে। ওর শাশুড়ী শয্যাগত, জা পোয়াতি, ননদের অসুখ— কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। সুতরাং তারাও বেঁচে গেল ওকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে। সাদর অভ্যর্থনা ও সস্নেহ আচরণের কোন অভাব ঘটল না, এমন কি ওর শাশুড়ীর মুখ থেকেও অভাবনীয় মিষ্টবাক্য বেরোতে লাগল।

কিন্তু যে মেয়ে বাপের বাড়িতে বনিয়ে চলতে পারে নি সে শ্বশুরবাড়িতে বনিয়ে চলবে— এটা সম্ভব নয়। একদা সেখানেও অশান্তি চরমে উঠল। তাছাড়া তাদেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে তখন, তাদের মনের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। অগত্যা আবারও এখানে এসে উঠতে হ'ল। সে সময় উপলক্ষ্যও জুটে গিয়েছিল একটা— ফিরে আসাটা খুব বেমানান হয় নি।

তারপর থেকেই এই চলেছে। যখন আসে তখন ভালমানুষ— তার পরও দু-তিন মাস বেশ থাকে। মেজাজ ভাল থাকলে রান্নাবান্নাও করে, তাও না থাকলে কাপড় জামা বিছানার চাদর যেখানে যা আছে, একরাশ ক্ষার ফুটিয়ে দমাদম কাচতে বসে। কিম্বা বাগানের তদ্বির ক'রে বেড়ায়। মুখের উগ্রতা তখনও প্রকাশ পায় তবে সেটা মারাত্মক নয়। কিন্তু কোনমতে মাস তিনেক কাটলেই আবার অসহ্য হয়ে ওঠে, ওরও — এদেরও। আবার একদিন কোন একটা তুচ্ছ ও হাস্যকর রকমের উপলক্ষ্য ধরে প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি করে— এবং সে কলহ চরমে উঠলে— চরমেই ওঠে— আবারও মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যায়।

BanglaBook.org

এখান থেকে শ্বশুরবাড়িতেই যায় সে সাধারণত। সোজা গিয়ে উঠলে তারাও ঠিক বাধা দিতে পারে না। এক সময় ওকে বড়ই প্রয়োজন লেগেছিল, আবারও হয়ত লাগতে পারে ভেবে— অথবা চক্ষুলজ্জায়, তারাও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। সম্পত্তিতে অধিকার থাক বা না থাক, বাড়ির বৌ এবং নাতনী— দু'চার দিনের জন্যেও আশ্রয় না দিলে পাড়াঘরে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেখানেও সেই মাস দুই তিন, বড় জোর। তারপরই আবার একটা বড় রকমের ঝগড়া— শাপশাপান্ত গালিগালাজ— কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসা। সেই পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়। এই-ই চলছে দীর্ঘকাল।

ঈষৎ পরিবর্তন হয় মধ্যে মধ্যে অবশ্য। যখন কোন এক আকস্মিক কারণে অল্প কালের মধ্যেই কোথাও প্রবল ঝগড়া হয়ে যায়—তখন মধ্যে মধ্যে কলকাতাতে বড় মাসিমার কাছেও ওঠে। তবে সেখানে স্থান কম, অসুবিধাও ঢের। সুতরাং খুব বিপাকে না পড়লে সেখানে যায় না।

তরু যেদিন আসে সেদিন ঐন্দ্রিলা শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। সংবাদটা পেতে তার একদিনের বেশি দেরি হয় নি। এ সব সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে কখনই খুব দেরি হয় না, এ ক্ষেত্রে হারানদের পাড়ার লোকেরা বহুদিন পরে পরিবেশন করার মতো এমন মুখরোচক সংবাদ পেয়ে— (দু-দুবার বৌ পালানোর খবরটা মুখরোচক তো বটেই) উপযুক্ত উৎসাহের সঙ্গেই তা প্রচার করেছে। ঐন্দ্রিলাও খবর পেয়েই চলে এল এখানে। বিধবা হবার পর এই প্রথম বোধ হয়, রাগারাগি না ক'রে এল সেখান থেকে।

সেটা বিকেলবেলা, তরু বিষণ্ণভাবে বড়ঘরের সামনের সিঁড়িটাতে বসে ছিল চুপ ক'রে। ঐন্দ্রিলাকে দেখে তার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে গেল। সম্ভবত দাদার কথাটা মনে ক'রেই। দু-দুবার ইঙ্গিত করেছে হেম। ইঙ্গিত কেন, স্পষ্টই বলেছে কথাটা। বিশ্রী তুলনা। দারুন মর্মঘাতী শব্দ। হে ঈশ্বর তেমন সর্বনাশ যেন কখনও না হয়। যা করেছে করেছে— তবু সে বেঁচে থাক, সুস্থ থাক।... কাল থেকে অন্তত হাজার বার এই প্রার্থনা করেছে সে মনে মনে। মনে মনেই সিদ্ধেশ্বরীতলায় মাথা খুঁড়েছে।

আজ এখন ঐন্দ্রিলাকে দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ল আবার। শিউরে উঠল সে সঙ্গে সঙ্গেই । হে ঈশ্বর! এই হুতাশন হয়ে বেঁচে থাকা! অতি বড় শত্রুরও যেন এমন অবস্থা না হয়! ঐ বুড়িও বোধ হয় এই অবস্থারই পরিণতি। হে ভগবান! আবারও শিউরে উঠল সে।

ঐন্দ্রিলা এত জানত না। জানলেও অত সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাত কিনা সন্দেহ। এ অবস্থা ঐ দুঃখ অনুমান করার মতো— উপলব্ধি করার মতো সহজ ছাড়া। সেই জন্যই তাকে অমন দমকা বাতাসের মতো বাড়ি ঢুকতে দেখে শুধু তরু নয়, কনকও কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

ঐন্দ্রিলা কোন দিকে না তাকিয়ে একেবারে সিঁড়ির সামনে এসেই দাঁড়াল, 'ওমা, যা শুনলুম তা তাহ'লে সত্যি? আমি বলি কথার কথা... তাহ'লে সবই সত্যি বল্! তোকে নাকি ওরা দুজনে মিলে খুন করতে গিয়েছিল? গরম লোহা পুড়িয়ে নাকি সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা দিয়েছে?... কী হবে মা!'

তারপর একটু থেমে, যেন কতকটা বিজয়গর্বের সঙ্গে চারদিকে চোখ বুলিয়ে— 'একটু বসি বাবা, এতটা হেঁটে এসে কোমর ধরে গেছে'— বলে সেই সিঁড়িতেই তরুর পাশে বসে পড়ল।

'এই শুনলুম এত ভাল বে হয়েছে ত্যাত ভাল বে হয়েছে— কত কথাই শুনলুম। জিনিসপত্তর ঢেলে দিলে মায়ে-বেটায়, সোহাগী ছোট মেয়ের ঘটা ক'রে বিয়ে হ'ল—তা

BanglaBook.org

এই বিয়ের ছিরি! বলি সেই তো আমার মতোই সব ঘুচিয়ে-পুচিয়ে এসে উঠতে হ'ল বাপের বাড়ি।'

তরু আর শুনতে পারল না, ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে গেল খিড়কীর বাগানের দিকে। কনকও প্রতিবাদ না ক'রে পারল না। যদিও সে তার এই মেজ ননদটিকে যথেষ্ট ভয় করত, তবু মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, 'ওকি কথার ছিরি, মেজঠাকুরঝি!..... ষাট ষাট! ওদের ও দুদিনের মন কষাকষি— দুদিন পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। ঘুচিয়ে-পুচিয়ে চলে আসতে হবে কেন!.... অমন কথা কেউ বলে! একে কাল থেকে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল মেয়েটা!'

ঈষৎ যেন একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়ে ঐন্দ্রিলা, 'না আমি অত ভেবে বলি নি। সত্যিই তো, আমার মতো জন্ম জন্ম ধরে এত পাপ তো আর কেউ করে নি— কেনই বা অমন হবে। যা হবার এই আমার কপালের ওপর দিয়েই হয়ে গেল, আর তাই যাক। আর কারুর এমন হয়েও কাজ নেই।... আর হবেই বা কী জন্যে বলো, ওর কপাল যে ঢের ঢের ভাল; আজ বলে নয়, চিরদিনই ভাল। মা ভাই ভাজ সকলেরই আদরের নিধি ও—বরেরও নয়নের মণি হয়ে থাকবে বৈকি।.... তা-হ'লে এমনটা হ'লই বা কেন? তরু ঠিক এল কবে? কাল তো? তা তারপর আর কোন খোঁজখবর করে নি ওরা?' খাপছাড়াভাবে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে সে।

অর্থাৎ বিষ আর কৌতূহলের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হয়। কনকের এই সস্নেহ সহানুভূতি যথারীতিই ঐন্দ্রিলার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, দৃষ্টিও কঠিন হ'তে শুরু করেছিল, কিন্তু সে ঝগড়া এখন শুরু করলে ইতিহাসটা পুরোপুরি শোনা হয় না বলেই সেটা এখন মূলতুবি রাখল।

'তা করবে না কেন? কালই তো ঠাকুরজামাই নিতে এসে ছিলেন দুপুরবেলা!'

'তারপর? তা হ'লে গেল না কেন?' তীক্ষ্ণ বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঐন্দ্রিলা।

এ নাটকের এমন দ্রুত পরিসমাপ্তি নৈরাশ্যজনক বৈকি।

'তোমার দাদা মত করলেন না।'

'দাদা মত করলেন না? কেন? বোন পোষবার খুব শখ বুঝি দাদার? একটা বোন ভাগ্নীকেই পুষতে পারে না, আবার আর একটার দায় ঘাড়ে নিতে যায় কোন আক্কেলে! ভীমরতি ধরেছে নাকি দাদার?'

ঝড় যে কখন কোন্ দিক থেকে উঠবে ঐন্দ্রিলার রসনায়— তা আজও কোন হদিস পায় না কনক।

অগত্যা তাকে সংক্ষেপে কালকের ঘটনাটা খুলে বলতে হয়।

'বেশ করেছে দাদা! ঠিক করেছে! কেন কিসের জন্যে এত অপমান সয়ে সেখানে মেয়ে পাঠাব আমরা! ইস! ভাত দেবার ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই! না খেয়ে সেখানে শুধু মার খাবার জন্যে পড়ে থাকবে, না? কেন, মেয়ে-জন্ম কি এতই ফ্যালনা একেবারে! তরি কোথায় গেল, ও যেন না কোন দুঃখু রাখে মনে। কী হয়েছে, একটা পেট তো! চলেই যাবে। দু'বোন বসে যদি ঠোঙা তৈরি করি তাহ'লেই দুটো পেট চলে যাবে আমাদের। আজকাল রোজগারের কত রাস্তা হয়েছে। বলি এই তো মা— পাতা বেচে কত পয়সা কামায়!'

আবরও সেই তুলনা।

কনক বিব্রত বোধ করে কিন্তু কেমন ক'রে ওকে সামলাবে ভেবে পায় না। তাকে বাঁচিয়ে দেন শ্যামা। তিনি এতক্ষণ বাগানে শশাগাছের মাচা ঠিক করছিলেন, তরুকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতে দেখে এবং ঐন্দ্রিলার গলার আওয়াজ পেয়েই ব্যাপারটা

BanglaBook.org

অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি উঠোনে ঢুকে বললেন, 'ওর ভাবনা আর এখন থেকে তোমাকে ভাবতে হবে না মা, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে!'

বোধ করি এইটেরই অপেক্ষা করছিল ঐন্দ্রিলা। সে এবার নিজমূর্তি ধারণ করল। কনকের সহানুভূতির আয়নাতে নিজের অবস্থাটা প্রত্যক্ষ ক'রে সেই থেকেই জ্বলছিল সে, এখন কৌতূহল অবসান— সে বিষ উদ্গার করতে কোন অসুবিধাও নেই।

'সে তো জানিই, আমার কপালই যে এমনি, ভাল বলতে গেলেও মন্দ হয়ে যায়। ঠিকই তো, আমার যা-খুশি হোক গে, তোমাদের সোহাগী মেয়ের পায়ে কাঁটাটিও না ফোটে। আমার সঙ্গে তুলনা করলেও বুক ফেটে যায় তোমাদের। কৈ, আমার জন্যে তো এত প্রাণ কাঁদতে দেখি নি কখনও! আমিও তো মেয়ে। আমিও তো সইছি এই দুঃখ। আমি কিছু ফ্যালনা নই। রূপেগুণে আমার পাশে দাঁড়াতে পারে ও? চিরকাল তোমাদের এই এক-চোকোমি দেখে এলুম। ভাল হবে না— বুঝলে? তোমাদের কখনও ভাল হবে না। এত অর্শদর্শ ভাল নয়, এত একচোকো যারা তাদের কখনও ভাল হয় না! ইত্যাদি ইত্যাদি।

কনক বেগতিক দেখে অনেক আগেই চলে গিয়েছিল বেরিয়ে— তরুর কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাগানের শেষপ্রান্তে, পুকুরেরও ওধারে— অর্থাৎ শ্রুতিসীমার বাইরে।

শ্যামার এ সবই গা-সওয়া। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা আমরা যদি এতই মন্দ আর একচোকো— তো আমাদের কাছে আসো কেন মা — আমাদের হাড় ভাজা ভাজা করতে! আমরা তো কোনদিন এরেবেরে আনতে যাই না! আজও তো কৈ আসতে বলি নি! যেখানে সুখে থাকো, যারা ভাল— তাদের কাছে সেখানে থাকলেই তো পারো।'

'বাব্বা! এত বিষ তোমাদের মনে মনে! এত বিষ হয়েছি যে আর এক দণ্ডও সহ্য হচ্ছে না আমাকে!.... না, তোমার ঐ আত্তরাসী রাঙের রাধা মেয়ের অসুবিধে হবে আমি থাকলে? আমার মুখ দেখলে আমার হাওয়া লাগলেও ওর মন্দ হবে বোধ হয়?.... তাই ওর বিয়ের সময় একটা ছুতো ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে আমায়? মনে করো আমি কিছু বুঝি না— না!.... কেন, কিসের জন্যে আমি যাব? আলবৎ থাকব। যদ্দিন খুশি তদ্দিন থাকব। কৈ, তাড়াও দিকি, কেমন তাড়াতে পারো। অমন বিয়ে দিয়েছিলে কেন আমার যে দুদিন না যেতে যেতে সব ঘুচে যায়! এখন যাও বললে আমি শুনব কেন? আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও— মাসোয়ারা বন্দোবস্ত করো, বাড়ি কিনে দাও— আমি চলে যাচ্ছি। অমনি অমনি তোমাদের সুবিধে ক'রে দিতে চলে যাব— তা স্বপ্নেও ভেবো না!'

এ রকম কতক্ষণ চলত তা বলা কঠিন। কোন যুক্তি-তর্কে বোঝানোর চেষ্টাও বাতুলতা। তরুর বিয়ের সময়ে তুচ্ছ ছুতো ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে ঐন্দ্রিলাই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলেও লাভ নেই। এখন প্রথম প্রশ্ন ওকে থামানো। কিন্তু কেমন ক'রে থামাবেন তা শ্যামাও ভেবে পান না। যতটা অপ্রীতি আরও ঘটাতে পারলে ও আবার রাগ ক'রে ঝগড়া ক'রে চলে যায়, ঠিক ততটা এই সন্ধ্যাবেলা করতে ইচ্ছাও করে না। বিশেষত কাল থেকে তাঁর মনটা অত্যধিক দমে গেছে। এমন কখনও হয়নি এর আগে। হয়ত এটা বয়স বাড়বারই লক্ষণ। তা ছাড়া ভরসন্ধ্যাবেলায় কিচি কিচি ঝগড়া ঘোর অলক্ষণ, ভদ্রলোকের বাড়ির পক্ষে বেমানান তো বটেই। অনেক হয়েছেও তাঁর জীবনে, আর কোন অলক্ষণ ঘটতে দিতে সাহস হয় না তাঁর; কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, এখন মিষ্টি কথা বলতে গেলেও ও শান্ত হবে না, তার মধ্যে কোন মতলব খুঁজে বার ক'রে আরও চেঁচাতে থাকবে। পেয়েও বসবে খানিকটা।

প্রমাদ গুনছেন শ্যামা— এমন সময় এক অঘটন ঘটল। সহসা হেম এসে পড়ল। অঘটনই বলতে হবে, কারণ কোনদিনই এত সকাল সকাল সে বাড়ি ফেরে না। সম্ভবত

BanglaBook.org

কালকের ঘটনার জের তার মনকেও ভারী ক'রে রেখেছিল, তাই অফিসের ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে এসেছে।

হেমকে দেখেই ঐন্দ্রিলা একেবারে চুপ ক'রে গেল। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। হঠাৎ যেন শামুকের খোলায় আঘাত লাগার মতো গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে ঘাটে গিয়ে কাপড় কেচে এসে সহজভাবেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তার এ ভাবান্তরের কারণ ছিল। আসার সময় মেয়ে সীতাকে আনতে পারে নি। সে মেজকাকীর সঙ্গে তার বাপের বাড়ি গেছে, আজ বিকেলে ফেরবার কথা। ঐন্দ্রিলা বার বার বলে এসেছে যখনই ফিরুক, এমন কি রাত হয়ে গেলেও যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে কথার অন্যথা করতে তাদের সাহস হবে না। পাঠাবে তারা নিশ্চয়ই। হয়ত ছোটকাকার সঙ্গেই পাঠাবে। যে কোন মুহূর্তেই তারা এসে পড়তে পারে। সে সময় যদি বড় রকমের একটা ঝগড়া—'হাড়াই-ডোমাই' গোছ চলতে থাকে তো ওদের কাছে বড্ড খেলো হয়ে যাবে। তার ওপর দাদা যা মেঘের মতো মুখ ক'রে এসে ঢুকল— এখন কোন কথা বললে সে হয়ত এমন রুদ্রমূর্তি ধরবে যে তখন বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না। আজই এসে আবার আজই ঝগড়া ক'রে বেরিয়ে যাওয়া— সেটা, এমন কি ঐন্দ্রিলার পক্ষেও, বড় লজ্জার কথা। দাদার ব্যাপার সব সময় বুঝতেও পারে না সে— এক সময় যতই ওদের রাগারাগি চেঁচামেচি হোক, নির্বিকারভাবে বসে থাকে সে পাথরের মতো, আবার এক এক সময় একটুতেই ক্ষেপে ওঠে। এই সব ভেবেই তাড়াতাড়ি চুপ করে ঐন্দ্রিলা।

হেম অত লক্ষ করে নি। কিছুক্ষণ পূর্বে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল এখানে তার কোন আভাসও পায় নি। সেক্‌রাদের বাড়ির কাছ থেকেই ঐন্দ্রিলার গলার আওয়াজ পেয়েছিল সে, কিন্তু ঝগড়া ক'রে ক'রে ওর স্বাভাবিক গলাও চড়া হয়ে গেছে, দূর থেকে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সামনে ঐন্দ্রিলাকে দেখেও কিছু বলল না তাই। কখন এল কেন এল— মেয়ে কোথায়, এসব প্রশ্নও করল না। যথানিয়মে কাপড়-জামা ছেড়ে ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসে একেবারে শুয়ে পড়ল।

চা বা জলখাবারের পাট নেই এ বাড়িতে। হেমও কোনদিন কিছু খায় না। শনিবার সকাল ক'রে ফিরলেও কিছু খেতে চায় না। একেবারে রাত্রে ভাত খায়— এই তার চিরদিনের অভ্যাস।

সুতরাং তার আচরণে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করলেন না শ্যামা। করল কনকই।

প্রথমত অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসা, এইটেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। মন খারাপ বলেই আরও, বেরিয়ে কোথাও আড্ডা দিতে যাবার কথা। মন-মেজাজ খারাপ থাকলে সাধারণত সে সিমলেয় যায় বড় মাসিমার বাড়ি— সেদিনগুলো টের পায় কনক। প্রথমত ফিরতে অতিরিক্ত রাত হয়, এখানে খায় কম, ভাত নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করে— তাছাড়া মেজাজও প্রসন্ন থাকে। সুতরাং আজ ছুটির পরই বাড়ি চলে আসা প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। তার ওপর মুখের ভাবটা সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলোতে শ্যামা লক্ষ না করলেও বাগানে ঢোকবার মুখে কনক লক্ষ করেছিল। অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। হয়ত আরও কোন দুঃসংবাদ আছে কোন দিকে।

তখনই কিছু বলল না সে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোরে চৌকাঠে জল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসল। শাশুড়ী ঘাটে গেছেন স্নান করতে— তিনি এসে একটি ডিবে জ্বেলে ভাত চড়াবেন। পাতার জ্বালটা এবেলা আর বৌকে লাগাতে দেন না। তরকারি রাঁধাই থাকে, শুধু দুটি ভাত ফুটিয়ে দেওয়া। তাঁর বা ঐন্দ্রিলার জন্যে খাবার করার পাট নেই— চাটটি ক্ষুদভাজা বা চালভাজা তেলহাত বুলিয়ে নিয়ে খাবেন যখন হয়— অন্ধকারে বসেই।

BanglaBook.org

শ্যামা কাপড় কেচে ঝাপ্‌সা আলোতেই ঘাট থেকে চাল ধুয়ে এনে রাখলেন। কাপড় ছাড়লেন অন্ধকারেই। এইবার তুলসীতলার প্রদীপ থেকে 'লম্প' বা ডিবেটা জ্বেলে এনে বসবেন উনুনের কাছে। ঐ থেকেই পাতা জ্বেলে উনুন ধরাবেন। দেশলাইর কাঠির অনর্থক খরচা শ্যামা পছন্দ করেন না। একটা দেশলাই প্রায় এব পয়সা পড়ে, কটাই বা কাঠি থাকে— একমাসও যেতে চায় না একটা দেশলাই। হ্যারিকেন একটা আছে বাড়িতে, সেটা কদাচিৎ জ্বালা হয়। বর্ষাকাল বা ঝড়জল না হ'লে সেটা তোলাই থাকে। এই 'লম্প'টিই জ্বলে, বাড়ির মধ্যে একমাত্র আলো হিসেবে। যেদিন হেমের আসতে অনেক রাত হয় সাতটার গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ হয় জগাছার পূলের ওপর সেদিন আবার এরই আলোতে নতুন করে পাতা চাঁচতে বসেন শ্যামা কিংবা তেঁতুলের বিচি ছাড়াতে কিম্বা এই ধরনের কিছু। অর্থাৎ আলোটা বাজে খরচা না হয়। কনক নিদ্রালু চোখে বসে বসে শুধু দেখে, হয়ত একটু-আধটু গল্প করে। এ সময়টায় তার কোন কাজ থাকে না। সকাল করে খাওয়ার পাট চুকলে ঘাট থেকে বাসন মেজে এনে রাখে রাত্রেই। তখনও ঐ লম্পই নিয়ে যেতে হয়। নইলে বসেই থাকা। কাজের সময় গল্প করাটা শ্যামা ভালবাসেন না, কাজ খারাপ হয়, হাতকাটার ভয় থাকে। তাই গল্পও তেমন জমে না। খুব কষ্ট হচ্ছে দেখলে এবং শ্যামার মেজাজ ভাল থাকলে বলেন, 'তুমি শুয়ে পড়োগে বৌমা, হেম এলে আমি ডেকে দেব তখন।'

ঐন্দ্রিলা যখন এখানে থাকে তখন সীতাকে বসিয়ে ঐ আলোতেই অল্পস্বল্প পড়াবার চেষ্টা করে কনক। তার লেখাপড়ার পুঁজিও অবশ্য সামান্য— তবু যা পারে একটু পড়ায়। আসলে একটা কাজ নিয়ে থাকা। নইলে শুধু শুধু বসে থাকলেই রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ঢোকে— বাজে চিন্তা। নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তাকেই বেশি ভয় ওর, তাই সবরকম চিন্তাকে এড়াতে চায় সে।

সুতরাং শ্যামার পর পর কার্যপদ্ধতি ওর জানা আছে। ওর ছোট দেওর বলে 'রুটিন বাঁধা কাজ'। সে থাকলে কনকের একটু সুবিধা হয়। কিন্তু এবার অনেক চেষ্টা করে তাকে কলকাতাতে ছোট মাস-শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়েছে হেম, এখানে থাকলে নাকি তার পড়াশুনো কিছুই হবে না। মাসিমার শরীর খারাপ, একটা-আধটু বাজারহাট করে দেয়, ইস্কুলে পড়ে। হেম গোপনে পাঁচ টাকা কর দেয় সেখানে— সেটা শ্যামা জানেন না, জানলে প্রলয় কাণ্ড হবে। নগদ টাকা দিয়ে ছেলে পড়ানোর পক্ষপাতী তিনি নন।

শ্যামা লম্পটা নিয়ে তুলসীতলায় আসতেই কনক কাছে এগিয়ে গেল। আস্তে ডাকল, 'মা।'

'কেন গা বৌমা?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন শ্যামা। প্রদীপের সেই সামান্য আলোতেই ওর মুখখানা ঠাওর করার চেষ্টা করেন। ডাকবার ধরনেই বুঝতে পারেন যে কোন জরুরি বক্তব্য আছে তার।

'না, তেমন কিছু নয়।' তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে সে, 'বলছিলুম যে— আপ—মানে ওর মুখের চেহারাটা আমার তত ভাল লাগছে না। কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। একবার জিজ্ঞাসা করুন না। ঠাকুরজামাইদের কোন খবরটবর আছে কিনা—'

শ্যামা চুপ করে যান। তাঁর ছেলের খবর বৌয়ের কাছ থেকে শোনাটা খুব রুচিকর নয়। হয়ত 'ঠাকুরজামাই' সংক্রান্ত প্রশ্নটা মধ্যে থাকাতেই সামলে নিলেন। একটু খানি চুপ করে থেকে শুধু বললেন, 'তা তুমিই জিজ্ঞেস করো না বৌমা।'

'না না—। তা ছাড়া আমাকে উনি বলবেনও না তেমন কোন কথা হ'লে।'

এবার একটু খুশি হন শ্যামা। আশ্বস্তও হন। তাড়াতাড়ি লম্পটা জ্বালিয়ে এনে ঘরে ঢোকেন, 'হ্যাঁরে, অমন করে এসে শুয়ে পড়লি কেন রে? শরীরটা খারাপ করছে নাকি?'

'না।' সংক্ষেপে জবাব দিল হেম। দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুয়েছিল, তেমনিই রইল। এপাশও ফিরল না।

BanglaBook.org

এরপর আর কথা বাড়ানো উচিত নয়। ছেলের আজকাল বড় মেজাজ হয়েছে। কী বলতে কী বলে বসবে হয়ত।

তবুও ইতস্তত করেন শ্যামা। এবার তিনিও বুঝতে পারেন যে ছেলের মন খারাপ হবার কোন বিশেষ কারণ ঘটেছে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সামান্য একটু কেশে গলার আওয়াজ ক'রে বলেন, 'তা হ্যাঁ রে—ওদের কোন খবরটবর পাস নি, মানে নিবড়ের?'

ছিলেকাটা ধনুকের মতো লাফিয়ে সোজা হয়ে বসে হেম, 'খবরদার বলছি, এ বাড়ির কেউ যেন সে ছোটলোকদের নাম না নেয়। ওদের নাম যে করবে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে দিলুম।'

এখনই আর কোন কথা বলা সম্ভব নয়। শ্যামাও চুপ ক'রে থাকেন। হঠাৎ যেন তাঁর মনে হয় নরেনকে দেখছেন—বা, তার কথাগুলো শুনছেন। এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও কেমন ভয় হয় তাঁর—ছেলে কালক্রমে বাপের স্বভাবই প্রাপ্ত হবে না তো।...

চুপ ক'রে থাকে সকলেই। শ্যামার পিছু পিছু কনকও এসে দাঁড়িয়েছিল চৌ-কাঠের বাইরে, সে যেন নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ ক'রে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় যেন আবহাওয়াটাও। শুধু শ্যামার হাতে ধরা 'লম্প'র শিখাটা অল্প অল্প কাঁপতে থাকে তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, আর তাতেই হেমের ছায়াটাও একটু একটু কাঁপে পিছনের দেওয়ালে।

কিন্তু হেমই চুপ ক'রে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। সে নিজেই ওদের প্রসঙ্গ তোলে এবার, 'ছোটলোকটা কি করেছে জানো? এখান থেকে গিয়ে সোজা সেই প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ি উঠেছে। তাদের হাতে-পায়ে ধরে সেই বৌকে নিয়ে এসেছে আবার।'

'কী সর্বনাশ!' শ্যামা ও কনক দুজনের কণ্ঠ থেকেই একসঙ্গেই বেরিয়ে আসে কথাটা—চাপা, অস্ফুট—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো।

'হ্যাঁ। সকালে উঠে ওর ঠাকুমা নাকি খুব চেঁচামেচি করেছিল, আমি আবার হারানের বিয়ে দেব, সাত দিনের মধ্যে যদি আর একটা বৌ না আনতে পারি তো আমার নাম নেই—এইসব। তাতে নাকি ওর পাড়ার কেউ কেউ এসে ছোটলোকটাকে ডেকে বলেছে যে ওসব মতলব করলে আমরাই এবার পুলিশে গিয়ে খবর দেব যে তোমাদের এই ব্যবসা দুজনে মিলে বৌ খুন ক'রে নতুন নতুন বৌ আনো তার গয়নাগাঁটি মারবে বলে! তাতেই ন্যাকি ভয় পেয়ে ও এখানে এসেছিল। দিদি নাতিতে কিছু মতলব এঁটেই এসেছিল বোধ হয়—এখান থেকে তাড়া খেয়ে সটান সেখানে চলে গেছে।

'তা তারা আবার পাঠালে?' আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন ফোটে।

'পাঠাবে না কেন! তারা কড়ার করিয়ে হারানকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে ওর সঙ্গে দিদিশাশুড়ীর কোন সম্পর্ক থাকবে না,—রান্না-খাওয়া পর্যন্ত আলাদা করতে হবে। জেদ বই তো নয়—জেদ বজায় রাখতে সবেতেই রাজি হয়েছে। তাদেরই তো ভাল হ'ল!'

'তা তোকে কে বললে?'

এখনও যেন আড়ষ্টতা কাটে নি শ্যামার! বিহ্বলভাবে কতকটা কাঠের পুতুলের মতোই প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছেন শুধু।

'ওদের পাড়ার নাড়ু চক্কোত্তি আছে না, ওরেদই কী রকম হয় সম্পর্কে, তার ছেলে আমাদের অফিসে ঢুকেছে আজ মাস কতক হল। তার মুখেই শুনলুম।— আবার বলেছে কিনা—'

কথাটা শেষ হ'ল না। তার আগেই কী একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ হ'ল বাইরে! কে যেন পড়ে গেল।

BanglaBook.org

তরু কখন নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা কনকও টের পায় নি।

এখন চমকে পিছন ফিরে অন্ধকারেই বুঝতে পারল।

'মা, শিগগির একবার আলোটা আনুন তো। ঠাকুরঝির ফিট হয়েছে বোধ হয়! চেঁচিয়ে উঠল কনক।

ওধার থেকে অন্ধকারেই ঐন্দ্রিলার কণ্ঠ ভেসে এল সে অর্ধ-স্বগতোক্তি করছে, 'এখনই মুচ্ছো গেলি— এর পর কী করবি? এই তো কলির সন্ধ্যে লো। কত মুচ্ছো যাবি এর পর?... কত কল্লাই জানে বাবা আজকালকার মেয়েরা।'

॥৩॥

এই ঘটনার পর থেকে তরু যেন কেমন হয়ে গেল। কথা সে চিরদিনই কম বলে, সেদিক দিয়ে তার স্বভাব মহাশ্বেতা ও ঐন্দ্রিলার বিপরীতই বলা যায়— কিন্তু এখন যেন একেবারেই কথা ছেড়ে দিল সে! কেউ কথা কইলে উত্তর দেয় না, দু'তিনবার পর পর কোন প্রশ্ন করলে কিম্বা বকাবকি করলে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না'— এর বেশি নয়। তাও ঘাড় নেড়ে কাজ সারা সম্ভব হলে তাই নাড়ে। চুপচাপ বসে থাকে অধিকাংশ সময় ঘরের জানলায়। বাইরের দিকে বা বাগানের দিকের জানলায় নয়— উঠোনের দিকের জানলায় বসে একদৃষ্টে কাঁঠাল চারাটার দিকে চেয়ে থাকে। দিনে রাতে, সব সময়। কেউ এসে জোর করে টেনে নিয়ে গেলে স্নান করে খায়— তা নাহলে তাও করতে চায় না। সারাদিন খেতে না দিলেও কোন কথা বলে না বা খেতে চায় না।

কনকই এসবগুলো করে। সে-ই জোর ক'রে নিজের সঙ্গে ঘাটে নিয়ে যায়, জোর ক'রে গিয়ে ভাতের সামনে বসিয়ে দেয়। তাও প্রথম প্রথম ঠিক গোনা দু'গ্রাস খেয়েই উঠে পড়ত, কনক ছেলেটার কথা স্মরণ করাতো, 'পেটে যেটা আছে তার কথাটা একটু ভাবো ঠাকুরঝি। ওটাকে বাঁচাতে হবে তো। ওটা তো তোমার নিজস্ব— তাতে তো কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। তার কথাটা ভাবছ না কেন?'— বলাতে এখন খায় কিছু। তাও যা প্রথম দেওয়া হয় তা-ই খায়, আর চায়ও না, দিতে এলেও নেয় না। হাসিখুশি তো দূরের কথা— যদি একটু কাঁদত, তা'হলেও শ্যামা কতকটা স্বস্তি পেতেন।

'পোড়ামেয়ের চোখে কি জলও থাকতে নেই একফোঁটা?... কী হবে বৌমা, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে নাকি? কোন মতে ওকে একটু কাঁদাতে পারো না মা?'

সে চেষ্টা অনেক করেছে কনক; কোন ফল হয় নি। ওর ভেতর-বার সবটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে বোধ হয়— কোন কিছুরই বোধশক্তি আর নেই। চোখের জলের উৎসও বুঝি গেছে শুকিয়ে। দুঃখের বহির্প্রকাশের মধ্যে আছে শুধু মূর্ছা রোগটা। সেদিনের পর থেকে ওটা থেকেই গেছে। দুদিন তিনদিন অন্তরই মধ্যে মধ্যে ফিট হয়।

মহাশ্বেতা বলে, 'ওর ওপর বাপু, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, কোন অন্যিদেবতার ভর হয়েছে। এ একেবারে পষ্ট লক্ষণ। এ আমি ভাল বুঝছি না। ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করাও তোমরা। বল তো মাকড়দায় একজন ভাল গুণীন্ আছে শুনেছি, তার খবর করি। খুব বেশি নেয়ও না শুনেছি। সেবার আমার বড় ননদের ভাসুরঝির অম্নি হয়েছিল—'

বিরক্ত হয়ে শ্যামা থামিয়ে দেন ওকে 'তুই চুপ কর তো। তোর সব তাইতে বক্তিমে আমার ভাল লাগে না। অন্যিদেবতার ভর হয়েছে! সে হয়ে থাকলে তোরই মাথাতে হয়েছে। গুণীন্ তুই দেখাগে যা!'

মহাশ্বেতা ঐন্দ্রিলা নয়। সে ঝগড়া করতে পারে না, ম্লানমুখে চুপ করে থাকে। তবে সে তখনকার মতোই। একটু পরেই হয়ত কনকের কাছে গিয়ে ফ্যাশ ফ্যাশ করে বলে,

BanglaBook.org

'আমি বলছি বৌদি, তুমি দাদাকে বলে একটা ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করাও। যে রোগের যা। এ মন্তর-তন্তর ছাড়া ভাল হবে না। মা তো এদান্তের কথা জানে না, এখন খুব ভর হচ্ছে অন্যিদেবতাদের।

কনক অবশ্যই চুপ করে থাকে। ইদানীং 'অন্যিদেবতাদের খুব বেশি ভর হচ্ছে এ কথা শোনবার পর হাসি চাপা কঠিন। সেইজন্যে আরও প্রাণপণে চুপ করে থাকতে হয়। তার বড় ননদীকে সে চিনেও নিয়েছে এর মধ্যেই— জানে যে ওকে এসব কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

তার উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করে না মহাশ্বেতা। হয়ত তখনই আবার তরুর সামনে গিয়ে বলে, 'কী লো, কী খেতে টেতে ইচ্ছে হয় খুলে বল্। যা মন চায় বল্, আমি পাঠিয়ে দেব। এখানে তো ভাল-মন্দ কিছু হবার যো নেই। ভাত-হাঁড়ির ভাত খাও, তাতে মা গররাজী নয়, তার ওপর কিছু চেয়ো না বাপু। হি হি।... তা আমাকেই বলিস— যখন যা ইচ্ছে হবে। পেটে-পোয়ে খাবার সাধ চেপে রাখতে নেই। ছেলের মুখ দিয়ে নাল পড়ে। কচুরি খাবি দু'খানা? হিংয়ের কচুরি? বল্ তোর দাদাবাবুকে বলে দিই, বড়বাজার থেকে এনে দেবে। আ-মর, মুখপোড়া মেয়ে হাঁ-ও করে না হুঁ-ও করে না। বাক্যি হরে গেছে যেন।'

তারপরই আবার হয়ত— কিছুক্ষণ পূর্বের ধমকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে— মা'র কাছে গিয়েই উপদেশ দেয়, 'তুমি ওকে দিয়ে খুব কাজকম্ম করাও। অমন ক'রে বসিয়ে রেখো নি। পোয়াতী মেয়ে, শেষে যে গুম পাগল হয়ে যাবে। খাটলে-খুটলে অত ভাবার সময় পাবে না, মনটাও ভাল থাকবে তখন!'

এ যে সৎ-পরামর্শ তা শ্যামাও জানেন। কথাটা তাঁর মাথাতেও গিয়েছিল বহু-পূর্বেই। কিন্তু কাজটা করাবে কাকে দিয়ে? একশবার কি টেনে টেনে নিয়ে জোর করে কাজ করানো যায়? কীই বা কাজ তাঁর সংসারে? তাঁর যা নিজস্ব কাজ—পাতা কুড়োনো, পাতা চাঁচা, তা ও পারবে না। বাগানের তদারক ও কখনও করে নি— কিছু জানে না। এক যেটা পারে, কনকের কাজ কিছু কিছু ভাগ করে নিতে। তা-ও এখন ঐন্দ্রিলা রয়েছে— সে যেন আরও, তরু এসেছে বলেই, বেশি করে করে কাজ করছে। রান্না বাসন মাজা, ঘর-দোরের পাট— কনকের কাছ থেকে টেনে নিয়ে করছে।

সবচেয়ে বড় কথা— অনিচ্ছায় কোন কাজই করানো যায় না। জোর করে বসিয়ে দিয়েও দেখেছেন, টেনে নিয়ে গিয়ে উনুনের ধারে বসিয়ে পাতার জ্বাল দেওয়াতে শুরু করে চলে এসেছেন— খানিক পরে গিয়ে দেখেছেন সে তেমনি চুপ করে বসে আছে। উনুন নিভে ধুস। ভাতও খানিকটা কাঁচা, খানিকটা সেদ্ধ— ঢিকচেলো হয়ে আছে। দুপুরে বাসন দিয়ে ঘাটে বসিয়ে রেখে এসেছেন, বেশ খানিকটা গড়িয়ে উঠে গিয়ে দেখেছেন যে, সে তেমনি বসে আছে, বাসন একখানাও মাজা হয় নি।

আবার কনক অনুযোগ করে, 'অমন করে ঘাটে-টাটে একা বসিয়ে রেখে আসবেন না মা, ফিটের ব্যারাম হয়েছে, যদি হঠাৎ জলের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়? আমরা তো জানতেও পারবো না!'

কথাটা ঠিকই, শ্যামাও তা বোঝেন। সুতরাং সে চেষ্টা ছেড়ে দেন।

অর্থাৎ কিছুই করা যায় না— সমস্যা শুধু দিন-দিন উগ্রতর হয়ে ওঠে।

আরও বেশি সমস্যা হয়েছে ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে।

তার বাক্যবাণ অহরহ বর্ষিত হয়ে চলেছে তরুকে উপলক্ষ করে। অথচ এমন কিছু ঝগড়া-ঝাঁটিও করে না যে বাড়াবাড়ি হয়ে চলে যাবে আবার। এবার যেন সে একটু বেশি সতর্ক হয়েছে। যাকে অন্তর-টিপুনী বলে, শুধু সেইটুকু দিয়েই সরে যায় অন্যত্র, ঝগড়া পেকে ওঠবার অবকাশ দেয় না।

BanglaBook.org

হয়ত তরুর কাছে গিয়েই হাত-পা নেড়ে চাপা গলায় মুখের বিকৃত ভঙ্গি করে বলে, 'রাখালি লো রাখালি— কত খেলাই দেখালি!.... মাইরি, আদর নিতে তুই জানিস বটে। তোকে সবাই ভালমানুষ বলত। আমি জানি— চিরকাল মিচকে পোড়া শয়তান তুমি! কেমন কল্লা করলে— কোন কাজকম্ম কিছু করতে হচ্ছে না, অথচ সকলে হা-হুতাশ করছে, কী হ'ল কী হ'ল মেয়েটার কী হ'ল!'

আবার হয়ত জানলার বাইরে উঠোন থেকে কিছুক্ষণ ওর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, 'নমস্কার। নমস্কার। তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার। একবছর ধরে নিত্যি তোমার পাদোকজল খেলে তবে যদি তোমার বুদ্ধির ধার দিয়ে যেতে পারি!'

এক এক সময় অন্তরের বিষও চাপতে পারে না। হিংস্র গলায় তর্জন করে ওঠে, 'হবে না! এত দেমাক ভাল নয়। বড্ড অহঙ্কার হয়েছিল তোর, ভেবেছিলি বর একে-বারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে,— তুই রাগ দেখিয়ে এখানে চলে এলেই চোখে শর্ষে ফুল দেখে ছুটে এসে হত্যে দিয়ে পড়বে। ওরে, হাজার হোক ওরা পুরুষ জাত, ওদের চার দোর খোলা।.... আমার বর সত্যি-সত্যিই আমার হাতধরা ছিল, আমার কথায় উঠত বসত, তবু কখনও এরকম ঘাঁটাতে যাই নি আমি। তুই ভাবিস্ তোর খুব বুদ্ধি! ঐ বুদ্ধিই তোর কাল হ'ল!' ইত্যাদি—।

এ ছাড়া ওকে উপলক্ষ করে এবং শুনিয়ে মাকে বৌদিকে বলা তো আছেই।

মাঝে মাঝে উদ্বেগে কনকের চোখে জল এসে যায়।

'কী হবে মা! মেজ ঠাকুরঝি দেখছি মেয়েটার একটা ভালমন্দ কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না। নিত্যি শুনতে শুনতে শেষে যদি মনের ঘেন্নায় একটা কিছু করে বসে?

'সবই তো বুঝি মা। কী করব সেইটেই যে শুধু বুঝতে পারি না। দুই-ই যে আমার পেটের কাঁটা। কোনটাই যে ফেলবার নয়। কাকে কি বলি বলো! ওকে তো দুবেলা টাইস করছি— দেখছই তো। কিন্তু ও কি কথা শোনবার পাত্তর! ওকে তো চেনো। এর পর কিছু করতে গেলে গলা-ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতে হয়। মা হয়ে সেটাই বা করি কী করে বলো?'

এক এক সময় আর থাকতে না পেরে চরম সাহসে ভর করে হেমের কাছে গিয়েই বলে কনক, 'কী করলে বলো তো মেয়েটার? সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেলে কী করবে?'

হেম গোড়ার দিকে অত গ্রাহ্য করে নি। শ্যামা কি কনক উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু বলতে গেলে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'প্রথম প্রথম শক্‌টা পেলে অমন হয়ই। দুটো চারটে দিন যেতে দাও না,—একটু সামলে নিক, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ দুঃখে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদে, কেউ গুম হয়ে থাকে— দ্যাখো না? সব দুঃখই জুড়িয়ে যায়, ওরও যাবে!'

হেম বাড়িতে থাকেই কম, রবিবারেও পুরো দিনটা বাড়ি থাকে না—খাওয়া দাওয়ার পরই বারোটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। শনিবার সকাল করে ফিরে কাপড়-জামায় সাবান দিয়ে— হয় বিকেলেই আবার বেরিয়ে পড়ে, নয়ত বাগানে মন দেয়। তরুর অবস্থাটা তত চোখে পড়ে না ওর। কাজেই প্রথম প্রথম অতটা উদ্বেগের কারণও বুঝতে পারে নি।

কিন্তু ক্রমশ সেও চিন্তিত হয়ে উঠল।

অথচ এখন যে কী করা উচিত তাও ভেবে পায় না সে।

কনকের অনুযোগে এক সময় চটে ওঠে, 'তা কী করতে হবে কি? এখন আবার পায়ে ধরে সতীনের ওপর গিয়ে দিয়ে আসতে হবে? সে আমি অন্তত পারব না। দিতে হয় তোমরা দাওগে।..... আর দিলেই বা সে সতীন ঢুকতে দেবে কেন?'

আবার কখনও ঠাণ্ডা মেজাজেই জবাব দেয়, 'তা আমিই বা কি করছি বলো। তখন ঐ অবস্থায় মেয়েটাকে খুন হতে পাঠানোই কি ঠিক হত? দেখলে তো কি মেজাজ। ও রকম

BanglaBook.org

কথা শুনলে মরা মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তা আমি তো জ্যান্তমানুষ। এ ওর বরাত। বরাত ছাড়া কিছু নয়।'

এ কথার পর চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কনক বা শ্যামা কারুরই কোন উত্তর যোগাত না।

॥৪॥

হঠাৎ একদিন কথাটা উঠল।

সেটা শনিবার না হলেও কী কারণে সকাল করে ছুটি হয়েছিল— সিমলেয় বড় মাসিমার কাছে হয়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছে হেম। শ্যামা যথারীতি বসে তেঁতুল কাটছেন, সীতা বই খুলে বসে ঢুলছে এবং মধ্যে মধ্যে শ্যামা বা কনকের কাছে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে। ঐন্দ্রিলার জ্বর-সে শুয়ে পড়েছে। কনক বাইরের অন্ধকার বাগানটার দিকে চেয়ে বসে আছে স্থির হয়ে । অন্ধকারে জোনাকিগুলো জ্বলছে আর নিভছে। অসংখ্য জোনাকি। এক এক সময় ভয় হয় ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে—কত, বোধ হয় হাজার হাজার হবে। এরা দিনের বেলা থাকে কোথায়, কই তখন তো মোটে দেখা যায় না!

সন্ধ্যেটা এমনি এলোমেলো চিন্তাতেই কাটাতে হয়। কনকের লেখাপড়া খুব বেশি জানা নেই, তবু হয়তো চেষ্টা করলে একটু-আধটু পড়তে পারত, কিন্তু বইয়ের পাটই নেই বাড়িতে। শ্যামা নাকি সেকালের মতে লেখাপড়া ভালই জানতেন, এখনও তাঁর হাতের লেখা মুক্তোর মতো— অনভ্যাসে সব ভুলে গেছেন। সীতারই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ধাঁধায় পড়েন, দ্বিতীয় ভাগের বানান বলতে পারেন না সব শব্দের। ছোট দেওর এখানে এলে তার পড়ার বইগুলো নিয়ে মধ্যে মধ্যে পাতা ওল্টায় কনক, তাও শ্যামার সামনে নয়, মেয়েদের 'আয়না মুখে করে বসা' তাঁর ভাল লাগে না। ওতে সংসার বয়ে যায়, সাত হাল হয় মানুষের। মেয়েরা সংসারের কাজ নিয়ে না থাকলে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না।

সুতরাং—আরও অন্তত দুটো ঘণ্টা কী করে কাটবে এই ভেবে যখন অস্থির হচ্ছে মনে মনে, তখন হঠাৎ সদরে পরিচিত জুতোর আওয়াজ উঠতে যেন বেঁচে গেল সে। প্রথমটা একটু চিন্তাও হয়েছিল— আবার কোন দুঃসংবাদ নয় তো? কিন্তু 'লম্পর কাছাকাছি আসতে দেখল যে মুখের ভাব প্রসন্ন, চোখের কোণে তখনও একটা কৌতুক-হাস্যের আভাস লেগে আছে— উচ্ছল হাস্য-পরিহাসের স্মৃতি সেটা।

ঘাট থেকে মুখহাত ধুয়ে আসতে কনক মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, 'ভাত দেব এখন?'

'ভাত?' উদার প্রসন্নতার সঙ্গে বলল হেম, 'তা দাও। কতক্ষণ আর বসে থাকবে। আটটা বেজে গেছে। আজ বড়মাসিমার ওখানে গেছলুম মা (শ্যামা মনে মনে বললেন, তা জানি, সে তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি!') হঠাৎ সকাল করে ছুটি হয়ে গেল আজ— কে এক সাহেব মরেছে, তাই চলে গেলুম। বৌদির আবার ছেলে হবে!'

'তাই নাকি?' এবার শ্যামা আর চুপ করে থাকতে পারেন না।

'যাক, এবার একটা ছেলে হলে দিদির একটু শান্তি হয়।' তিনি একটু থেমে বলেন।

'ছোটমাসিও আজ এসে পড়েছিল। দুবাড়িতে বুঝি মেয়েরা পড়ে নি— তাই একটু সময় পেয়ে এসেছিল। মেসোমশাইয়ের শরীর খুব খারাপ, হাঁপানির টানে সারারাত ঘুমোতে পারেন না, মাসিকেও বসে তেলমালিস করতে হয় বুকে অর্ধেক দিন।'

'তা হাঁরে— খোকা কেমন আছে?'

'ভাল আছে। বলছিল যে দেখে যাবি। কিন্তু তখন গেলে বড্ড রাত হত।'

BanglaBook.org

'উমা কি আর ওকে একটু দেখছে-শুনছে? কে জানে। পয়সা নিয়ে পরের বাড়ি পড়িয়ে পড়িয়ে ঘরে এসে আর কি ওর গাধার খাটুনি খাটতে ইচ্ছে করে।...ত হাঁরে, শরৎ জামাই তো কিছু কিছু পান ছাপাখানা থেকে, উমা তো এবার একটু বিশ্রাম নিলে পারে।'

স্বামী-পরিত্যক্তা উমা একদা অবলম্বন হিসেবে এই মেয়েপড়ানোর কাজ নিয়েছিল— নিজের স্বল্পবিদ্যা সম্বল করেই। দুটাকা একটাকা মাইনের টিউশ্যানিই বেশি, তাই দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি পড়িয়ে বেড়াতে হয়, নইলে ঘরভাড়া খাওয়াপরা একটা লোকের খরচ ওঠে না। শ্যামার মনে হয়— ঘরে থাকলে তার কোলের ছেলেটাকে একটু দেখতে পারত। একটা ছেলে পড়ে আছে মহার মামাতো ননদের বাড়ি—জায়গাটা ভাল নয়—তবু আদরযত্নেই আছে। যখন আসে তার বেশভুষার মহার্ঘ তাতেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখাপড়াতেও ভাল সে। তার জন্যে চিন্তা নেই। চিন্তা এই ছেলেটার জন্যেই।

ভাবতে ভাবতে একনিমেষে বহুদূর চলে গিয়েছিলেন শ্যামা। হঠাৎ কানে গেল হেম বলছে, 'সে তো মেসোমশাই নিজে কতবার বলেন। তা কে শোনে বলো! মাসি বলে যে, না, যতদিন পারব নিজের রোজগারে খাব। যে স্বামী কখনও ফিরে চাইলে না তার পয়সায় বসে খাব কিসের জন্যে।... আর খোকার পড়ার কথা বলছিলে। খোকা এখন সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ছে— ইংরিজি বই সব তার, সে কি মাসি পড়াতে পারে?'

'কেন— উমা তো ইংরিজি শিখেছিল গোবিন্দর কাছে।

'হ্যাঁ সে কী শিখেছিল— ফার্স্টবুক পর্যন্ত। নেহাত আজকালকার দিনে কোন মেয়েই শুধু বাংলা শিখতে চায় না— কাজচলা গোছের একটু শেখাতে হয়— তাই!'

ইতিমধ্যে কনক ঠাঁই করে ভাত বেড়ে দিয়েছে। হেম গিয়ে খেতে বসে। শ্যামাও কাছে এসে বসেন। 'লম্প' এখানে, সুতরাং তাঁর কাজ বন্ধ। তাছাড়া জেগে থাকলে ছেলের খাওয়ার সময় এসে বসেন প্রত্যহই। ভাতটা আর বেড়ে দিতে পারেন না— একশবার ওঠা-বসা করতে কোমর-ব্যথা করে তাঁর।

দু-এক গ্রাস খাবার পর হেম বলল, 'বড় বৌদি কী বলছিল জান মা খুকীর কথায়?'

গলাটা অকারণেই একটু বড় করে হেম। খাওয়ার ব্যবস্থাটা রান্নাঘরের দাওয়ায়। ভাত বেড়ে দিয়ে কনক ঘরের মধ্যে চৌকাঠের অপর পারে দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ী যখন সামনে বসে থাকনে তখন এখানে থাকার প্রয়োজন নেই, শোভনও নয় সেটা। যা দরকার শ্যামাই বলতে পারবেন, ও শুধু এসে দিয়ে যাবে।

সেই অন্তরালবর্তিনীও যাতে শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই গলাটা চড়ানো। খুশি হবারই কথা কনকের কিন্তু বড়বৌদির নামটা সেই উথলে-ওঠা খুশির ফেনায় যেন জল ঢেলে দেয়। তার প্রসঙ্গ শোনামাত্র মনের ধনুকে কে যেন টং করে টঙ্কার দিয়ে ওঠে। বিদ্বেষের আগুনে কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে, কঠিন হয়ে ওঠে দেহ, মনও জুগুপ্সু হয়ে ওঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয় টান টান হয়ে যেন নামটাকে সরিয়ে দিতে চায় স্মৃতি ও শ্রুতি থেকে।

বড়বৌদি কী বলছে তা শোনার জন্য শ্যামাও খুব উৎসুক নন। ছেলের এই অত্যধিক বড়বৌদি প্রীতি তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। তবে এ বীতরাগ কনকের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে নয়; ছেলের এই অত্যধিক আকর্ষণের পিছনে কিছু অর্থব্যয়ও হয়—এই তাঁর আশঙ্কা।

'যেখানে এত সোহাগ পীরিত, সেখানে কি আর এমনি হাত মুখে ওঠে, মন পাবার জন্যে কি আর চাট্টি সেই শ্রীপাদপদ্মে ঢেলে দিতে হয় না মনে করো?' প্রায়ই বলেন ছেলের আড়ালে।

সুতরাং কোন উত্তর দেন না শ্যামা, কথাটা শোনবার জন্যে কোন আগ্রহও দেখান না।

BanglaBook.org

তবে তাতে যে হেমের উৎসাহ কমে তা নয়, সে আগের মতোই ঈষৎ গলাটা চড়িয়ে বলে, 'বলছিল যে ওর বৌদি যদি একটা শনিবারে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করে চিঠি লিখে পাঠায় তো কেমন হয়? আমাকেই বলছিল খুকীর বৌদির জবানিতে একখানা লিখতে— তা আমার হাতের লেখা তো সে জানে। সেটা দেওয়া ঠিক হবে না!'

'এই ছিরির কথা! তাই আবার তুমি সবিস্তারে ব্যাখ্যা না করে বলতে এসেছ!' মনের অপ্রীতি কণ্ঠে চাপা থাকে না শ্যামার, 'আহা কী বুদ্ধি!' যেন সে সেই নেমতন্নর জন্যই হাত ধুয়ে বসে আছে। অমনি তু করলেই চলে আসবে! বলে সে এখন এতদিন পরে তার প্রথম বৌকে এনেছে, সে তো বলতে গেলে এখন নতুন তার কাছে। তাকে ছেড়ে তাকে চটিয়ে এক কথায় অমনি ছুটে আসছে! রেখে বসো দিকি! একে বলে চ্যাংড়ার বুদ্ধি।'

হেম বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়। উৎসাহের আধিক্যেই সে অমন জমাট-বাঁধা আড্ডাটা ছেড়ে ছুটে এসেছে। এই প্রস্তাবের যে এই পরিণাম হবে তা ভাবে নি।

সে একটু চুপ করে থেকে বেশ মুষড়ে পড়া গলাতেই বলে, 'সে তো আমি বললুম। তা বৌদি বললে, ঠাকুরঝির পেটে তার ছেলে, প্রথম সন্তান, সে টান তো একটা আছে। তুমি লিখে দ্যাখোই না— অফিসের ঠিকানায় দিও বরং।'

'দূর! দূর! যত সব বাজে কথা।'

কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন শ্যামা।

হেম আর কিছু বলে না, গম্ভীর ভাবে খেয়ে উঠে যায়। সেদিন রাত্রে আর কনকের সঙ্গেও কোন কথা বলে না। একেবারে দেওয়ালের দিকে ফিরে শোয় গোড়া থেকেই।

কিন্তু কনকের মনে যতই বিদ্বেষ থাক বড়বৌ সম্বন্ধে — কথাটা তার মন্দ লাগে না। কোন উপায়ই তো হচ্ছে না— একটু বেয়ে-চেয়ে দেখতে দোষ কি! সত্যিই তো, প্রথম সন্তান এসেছে পেটে—তার ওপর একটা টান তো থাকবেই। যতই বলো বাপু, বড়দির মাথায় খেলেও খুব!

সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে জেগে ভাবল কনক। দিনের বেলাও কাজকর্মের ফাঁকে তোলাপাড়া করল অনেক, তারপর চিঠি একটা লেখাই সাব্যস্ত করল। কী আর হবে, না হয় উত্তর দেবে না— এই তো।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সীতার কাছ থেকে খানদুই খাতার পাতা আর দোয়াত কলম চেয়ে নিয়ে চিঠির মুসাবিদা করতে বসল। বার বার কাটাকুটি হয়, কোনটাই পছন্দ হয় না। এককালে ও পাড়ার অনেক বিবাহিতা মেয়ের প্রেমপত্র লিখেছে, কিন্তু অনভ্যাসে এখন যেন কোন কথাই মনে পড়ে না। হাতের লেখা ভাল নয় কোনকালেই— এখন আরও কদর্য হয়ে গেছে।

তবু তিন-চারবার চেষ্টার পর একটা চিঠি খাড়া করল শেষ পর্যন্ত।

লিখল—

'ঠাকুরজামাই,

ছোটঠাকুরঝি আপনার জন্য দিনরাত কাঁদিতেছে এবং পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন অবস্থায় সে বেশিদিন বাচিবে বলিয়া মনে হয় না। একবার আসিয়া অন্তত শেষ দেখা দিয়া যান। তাহার গর্ভে আপনার প্রথম সন্তান, সে গেলে সন্তানও যাইবে। দয়া করিয়া সামনের শনিবার একবার আসুন, মিনতি করিতেছি। আপনি আমার আশীর্বাদ লইবেন। গুরুজনদের প্রণাম দিবেন। ইতি—

আপনার বৌদি।'

বানান ভুল যে অনেক হল তা কনকও জানে। তবু এইটে লিখে ওর মনে হল মন্দ দাঁড়ায় নি। হাতের লেখাও, চেষ্টা করলে পড়া যাবে। তবে খামে কি আর দিতে দেবে হেম,

BanglaBook.org

মিছিমিছি দুটো পয়সা যে খরচ করবে তা মনে হয় না। আবার হয়ত পোস্টকার্ড এনে দেবে, আবার নকল করতে হবে। সেটা কেমন দাঁড়াবে কে জানে।

শ্যামা গড়িয়ে ওঠবার আগেই দোয়াত-কলম যথাস্থানে রেখে এল সে। আঙুলে একটু কালি লেগেছিল, ঘষে ঘষে তুলে এল ঘাট থেকে।

হেমকে জিজ্ঞাসা না করে এ চিঠির কথা সে কাউকে বলবে না।....

হেম প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল, খুশিও হল।

বড়বৌদির কথাটা উড়িয়ে দেয় নি কনক বরং সেই মতো কাজ করেছে, খুশিটা এই জন্যই বেশি।

তারপর প্রদীপের আলোতে (হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে বলে সব ঘরে একটা করে প্রদীপ দিয়াশলাই রেখে দিতেন শ্যামা— রান্নাঘরেও) চিঠিটা পড়ে বলল, 'বাঃ এই তো বেশ হয়েছে। দিব্যি গুছিয়ে লিখেছ তো। বাবা, তোমার পেটে পেটে এত। আমি সাত জন্মে বসে ভাবলেও এর একটা লাইন আমার মাথাতে যেত না। খুব লোককে লিখতে বলেছিল বড়বৌদি!'

বড়বৌদির নামেতে আজও মনের মধ্যে তেমনি একটা টং করে শব্দ উঠলেও খুশিও হল কনক। স্বামীর মুখে তার এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এই প্রথম শুনল সে। খুশির জোয়ার মনের কানায় কানায় উপচে উঠে অপ্রীতিকর নামটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার গৌরাভ মুখবর্ণে ক্ষণে ক্ষণে রক্তোচ্ছ্বাস হতে লাগল। আর সেইদিকে চেয়ে ক্ষীণ আলোতেই মনে হ'ল হেমের যে অনেকদিন পরে সে নতুন ক'রে দেখল কনককে। রানীবৌদির দীপ্তি নেই বটে— সে কটা মেয়েরই বা আছে বাংলাদেশে?— তবু কনকেরও যে কিছু নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে সেটা আজ লক্ষ করল সে। প্রদীপের খেলে-যাওয়া আবীর গোলার মতো রক্তোচ্ছ্বাসটাও তার চোখ এড়াল না। লজ্জারও যে—এটাকে লজ্জার লালিমা বলেই ধরে নিল হেম— একটা শোভা আছে, তা মানতেই হবে। এটা কিন্তু সকলের থাকে না। অতি সপ্রতিভ রানীবৌদির এই শোভাটি তেমন চোখে পড়ে না। নলিনীরও এমন মধুর লজ্জা দেখার অবকাশ হয় নি তার।.... সুতরাং সে তাকিয়েই রইল সেদিকে— কয়েক মুহূর্ত। সুশ্রী মসৃণ ললাটে পটে আঁকার মতো সুন্দর ভ্রূ-তারই মধ্যে কালো টিপ একটি; বার বার ঘোমটা টানবার ফলে ঈষৎ বিপর্যস্ত কেশের কোলে কোলে সূক্ষ্ম একটি স্বেদরেখা বরাবরই ছিল, এখন সম্ভবত প্রদীপের তাপেই তার বিন্দুগুলি বৃহত্তর হয়ে ঐ টিপটির চারপাশে নামছে, ভ্রূর উপরে উপরে জমা হচ্ছে— সবটা জড়িয়ে ভালই লাগল হেমের।

ওর হঠাৎ চুপ করে যাওয়াটা লক্ষ করতে কনকেরও একটু সময় লাগল। সেও তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিল এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটা। যখন খেয়াল হল, তখন বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ল স্বামীর সেই ঈষৎ মুগ্ধ দৃষ্টি, ফলে সে আরও সুখী, আরও লজ্জিত, আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। এই-ই প্রথম, তবু এ দৃষ্টি বুঝতে বোধ করি কোন মেয়েরই ভুল হয় না।

আবারও প্রবল খুশির জোয়ার বিচিত্র বর্ণাভার সৃষ্টি করল তার মুখে— তবু কনক সেটা উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করল না। সে যেন বড় বেশি দৈন্য প্রকাশ করা হয়, ছি!

সে বরং এই মোহটা ভাঙবার জন্যেই জোর করে বাস্তবে নেমে এল, 'তা এটা তো আবার পোস্টকার্ডে নকল করে দিতে হবে? পোস্টকার্ড আছে তোমার কাছে?'

'দূর পাগল! পোস্টকার্ড কি? অফিসে চিঠি দিতে হবে— এসব চিঠি কখনও পোস্টকার্ডে দেওয়া চলে। তুমি এমনি আমার জামার পকেটে রেখে দাও, কাল আমি খাম কিনে ঠিকানা লিখে ফেলে দেব।...মাকে বল নি তো? এখন বলো না—দেখাই যাক না কী ফল হয়।'

পাগল শব্দটাও স্নেহ ও প্রশ্রয়-সূচক।

এই ধরনের সাদর সম্ভাষণের জন্যই তো কতকাল অপেক্ষা করেছে সে!

Banglabook.org

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা; কিন্তু তখনই ঘুম এল না।

তরুর যা হয় হবে কিন্তু এ উপলক্ষে কনক তার পথ দেখতে পেয়েছে।

রানীদিকে বৈরীভাবে দুরে রেখে কোন লাভ নেই। এ প্রসঙ্গ ধরেই, এই পথ দিয়েই স্বামীর অন্তরঙ্গ হ'তে হবে। অন্তরঙ্গতা না জন্মালে কোন দিনই সে তার মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং এই পথটাই সোজা— এতদিন বোকার মতো এড়িয়ে যেত সে। বড়ই বোকামি করেছে, আর না।

সে হেমের পা টিপতে টিপতে যেন কতকটা আপন মনেই বলল, 'রানীদির খুব বুদ্ধি, না?

একেবারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল হেম।

'বুদ্ধি ব'লে বুদ্ধি— আমি কোন ব্যাটাছেলের অমন বুদ্ধি দেখি নি। আঁচে বুঝে নেয় কথা। এই তো আমাদের সব অফিসের সায়েবদেরও দেখি— একটা কথা বোঝাতে ঝিক্কুড় নড়ে যায়। অথচ দ্যাখো হাজার হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। তাই তো বলি তা হাসে, বলে ভাগ্যিস শিখি নি তাহলে তো এমন করে আমার দেখা পেতে না, দারোয়ানকে কার্ড দিয়ে সেলাম করে ঢুকতে হত!'

এমনিই চলে দীর্ঘক্ষণ। শেষে এক সময় রাতই শেষ হয়ে আসে। ফরসা না হোক— ভোরাই বাতাসে তা টের পায় কনক। তবু সে-ই প্রসঙ্গটা থামতে দেয় না। হেমের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলেই সে নতুন প্রশ্নের ইন্ধন যোগায়— নতুন প্রসঙ্গ তোলে রানীদি সম্পর্কে। নতুন করে আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে হেম।

এ খেলা সুখের নয়। এক নারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বক্ষেত্রেই অপর নারীর অন্তরে বিষদাহের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে সে দাহের তো কারণই আছে যথেষ্ট। তবু সে থামতে দেয় না। স্বামীর সঙ্গে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে এমনভাবে প্রাণখোলাগল্প করতে পারবে সে— এও যে তার কাছে কল্পনাতীত। তাই তিক্ততায় যতই অন্তরের পাত্র পূর্ণ হয়ে যাক, বেদনার ভারে মনটা যতই পিষে গুঁড়ো হয়ে যাক— সে যেন আর নিজেও থামতে পারে না। শুনেছে নিম-উচ্ছে ফুলেও মধু থাকে, মৌমাছি তাতে গিয়েও বসে, লেবুর তেতো খোসা দিয়েও নাকি মোরব্বা হয়— তেমনি সেও এই তিক্ততার মধ্যে থেকে স্বামীর অন্তরঙ্গ সাহচর্যের যে মধুটুকু আস্বাদ করতে পায়— সেইটেই পরম লাভ বলে মনে হয় তার।

এই প্রথম তাদের বিবাহিত জীবনে গল্প করতে করতে সারা রাত কেটে গেল। ওঘরে শ্যামার দোরখোলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি কনক বেরিয়ে এসে যখন অবসন্নভাবে দাওয়ায় বসে পড়ল— তখন তার সমস্ত শরীর যেন অল্প অল্প কাঁপছে। সে কম্পন সুখের কি বিষাদের, আনন্দের কি ঈর্ষার তা সে নিজেও বুঝতে পারল না।

॥ ৫ ॥

মনে মনে এবং প্রকাশ্যে যতই রানীদির বুদ্ধির তারিফ করুক কনক—সত্যি সত্যিই যে ও চিঠিতে কোন কাজ হবে তা সে আশা করে নি। অন্তত এ শনিবার আসবে না, এটা ঠিক। আরও দু-তিন বার লিখলে হয়ত আসতে পারে সে। অর্থাৎ আরও দু-তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

তবু সে হেমকে শনিবার দিন বিকেলে বেরোতে বারণ করল।

হেম কপালটা কুঁচকে বলল, 'কেন, তোমাদের জামাই আসবে, তোমরাই আদরযত্ন ক'রো। আমি না থাকাই তো ভাল!'

'তা তো ভাল বুঝলুম। আশা নেই—তবু যদিই এসে পড়ে—জামাই মানুষ, কিছু তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে! তোমাদের ঘরে তো কিছুই নেই!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ—! ঐ যা ডাল-ভাত হয় তাই খাবে।'

'না না—তা হয়না। একটু একটু মাছ ওর মতো, কি দুটো আলুও অন্তত না হ'লে কী ক'রে চলে!'

এ বাড়িতে আলু কেনার পাট নেই। নতুন আলু যখন খুব সস্তা হয় তখন এক আধদিন হেম নিয়ে আসে পোস্তা থেকে একেবারে পাঁচ সের। কৃপণের ধনের মতো সে-ই রেখে রেখে দীর্ঘকাল ধরে খাওয়া হয়। একটু দাম বাড়লেই সেটুকু কেনাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন চলে উঠোন কুড়িয়ে যা বাজার পাওয়া যায় তাই দিয়ে। তা শ্যামার বাড়িতে হয়ও অবশ্য অনেক রকম—থোড় মোচা কাঁচকলা ডুমুর, সজনে ও নাজনে ডাঁটা, সজনে শাক, আমড়া। এ-ছাড়া পুকুরের ধারে ধারে সুষুনি ও কলমি শাক তো অজস্র। এরা তো খায়ই, পাড়ার লোকও অনেকে তুলে নিয়ে যায়। পুঁই কুমড়ো লাউ-ডগা, এগুলো মধ্যে মধ্যে। কুমড়ো লাউ খুব ফলে না—অল্প জায়গায় এত গাছ, কোনটাই জুত হয় না তাই—তবু মাঝে মাঝে দু একটা মেলে বৈকি। সুতরাং অভাব খুব হয় না আনাজের, আর-একটু তেল কি মশলা পেলে এসব দিয়েও মুখরোচক তরকারি হয়। সেটারও যে কান্ত অভাব। সপ্তাহে পাঁচ-ছটাকের বেশি তেল আসে না। আগে হাসি পেত কনকের, এখন সেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে— সে নিজেও তাই রান্না করে। শুধু ফোড়ন চোঁয়ানোর মতো তেল দেওয়া হয়। শ্যামা নিজেও বলেন, 'তেলের কি স্বাদ আছে গা? একটু কাঁচা তেল মুখে দিয়ে দ্যাখো দিকি! সুসিদ্ধ এবং পরিমাণ-মতো নুন—এই তো ব্যাঞ্জনের স্বাদ। বড়জোর একটু ঝাল দাও। গন্ধ করবার জন্যে ফোড়ন—ফোড়ন চোঁয়ানোর মতো তেল—এইটুকু দরকার! বেশি ঢেলেই বা লাভ কি?'

সয়ে গেছে সবই, মাছও চায় না সে, তবু মধ্যে মধ্যে একটু আলুর জন্যে মনটা বড় ছট্‌ফট্ করে; অথচ আলুই একেবারে দুর্লভ এ বাড়িতে। মেজাজ ভাল থাকলে তবু রবিবার সকালে এক-আধদিন হাতছিপে এক-আধটা মাছ ধরে হেম—কিন্তু আলু কেনার ইচ্ছা বা সাহস তারও নেই।...

হেম কথাটা শুনে চুপ ক'রে রইল। খুব মনঃপূত যে হ'ল না, তা কনক বুঝতে পারল মুখ দেখেই।

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না হয় আধপো একপো আলু এনে রেখে তুমি চলে যাও, তারপর যা হয় ক'রে চালিয়ে নেবো 'খন!'

'না, সে আবার মার কাছে কী বলবে? সতেরো রকম কৈফিয়ৎ। দ্যাখো আসে কিনা—এলেও খায় কি না, শুধু শুধু কতকগুলো খরচান্তর ক'রেই বা লাভ কি!' ...দেখি একটু—'

হেম বাইরে যাবার জন্য কাপড় কোঁচাচ্ছিল—এ বিলাসটুকু তার আজও আছে, শনিবার দেশি কাপড় পরে বিকেলে কলকাতায় যাওয়া—কোঁচানো শেষ ক'রে সেটা আবার সযত্নে তুলে রেখে টান হয়ে শুয়েই পড়ল বিছানাতে।

এত অল্পে যে সে রাজি হবে তা কনক ভাবে নি। সাধারণ দিনে তো নয়ই, সামান্য জল-ঝড়েও তার এই বেরনো আটকানো যায় না। এও এক রকমের জয় তার।

সে একটু মুখ টিপে হেসে বলল, 'মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন আবার, যদি বলেন আজও বেরোল না যে বড়? তা'হলে কী উত্তর দেব? কোনদিনই তো থাকো না, মানে কোন শনিবার—জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'যা হয় ব'লো। ব'লো যে মাথা ধরেছে একটু। হয়ত পরে যাবে। কিংবা কিছুই বলে কাজ নেই। ব'লো যে আমি কি জানি!'

এই বলে সেও হাসল একটু। হয়ত অকারণেই।

BanglaBook.org

আসলে তারও এ কদিনে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছে কনককে। ওর সঙ্গেও যে গল্প ক'রে সুখ হয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগেও গল্প করা চলে—এটাই যেন একটা আবিষ্কার।

আর তার এই সামান্য পরিবর্তনের ফাঁকেই কখন যে কনক তাদের গল্প করাটাকে সুকৌশলে রানী বৌদি থেকে প্রসঙ্গান্তরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েও তাকে জাগিয়ে রাখছে গত দুদিন, তাও লক্ষ করে নি। অত জানতও না সে, কনকের মনেও যে এত কথা উঠতে পারে, তারও যে এত কৌশল জানা, এত বুদ্ধি থাকা সম্ভব — এ তাকে কেউ বলে দিলেও বোধ করি সে বিশ্বাস করত না।

এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা এবং বেশ ভাল লাগছে— এইটুকুই শুধু জানত।

তাই অন্য শনিবারে বেরোতে না পারলে যতটা অসহ্য মনে হ'ত আজ আর ততটা হল না। বরং আজ একটু আলস্য করতে ভালই লাগল যেন। কদিনই রাত্রে যথেষ্ট ঘুম হচ্ছে না— শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও বুজে এল সহজেই।

নিশ্চিন্ত হল কনক। তৃপ্তও হল। ঘরে যদি বাঁধতে পারে একবার, মনেও পারবে। আর ঘরের লোক কোনদিনই ঘরে না থাকলে যেন খাঁ-খাঁ করে— সে যদি ঘরে শুয়ে ঘুমোয় তাও ভাল।

সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় বাগান থেকে একরাশ শুকনো আমড়া পাতা ও বাঁশ পাতা নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন শ্যামা। ওকে দেখেই— কনক যা আশঙ্কা করেছিল— উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁগা বৌমা, হেম যে আজ এখনও বেরোল না বড়? সাড়ে চারটের গাড়ি তো যাবার সময় হয়ে এল প্রায়! এতক্ষণ তো কোন শনিবার থাকে না। শরীর টরীর খারাপ হয় নি তো?'

গুছিয়ে কি উত্তর দেবে ভাবছে কনক—এমন সময় বাইরে থেকে পরিচিত-কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—'সীতা আছিস নাকি রে, সীতা?'

'ওমা, জামাই!'

এতখানি জিভ কেটে দুড়দুড় করে পালিয়ে গেলেন শ্যামা খিড়কির বাগানের দিকে। কারণ এই পাতা কুড়নোর সময়টা তিনি যে বেশ ধারণ করেন, তাতে কোনমতেই জামাই বা কুটুমসাক্ষাতের সামনে বেরনো যায় না। একটা গামছা বা হেমের অফিস থেকে আনা দুসুতির টুকরো পরেন এবং একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া-গোছের গায়ে দেন। অনেকে এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে কিন্তু তিনি গায়ে মাখেন না। বলেন, 'হ্যাঁ, বুড়ো হ'তে চললুম— বিধবা মানুষ— আমাদের আবার অত বেশভূষা কি গা? কী থাকে না পাতায়, কুকুর বেড়ালের গু থেকে সত্তিক জাতের এঁটো— মাছের কাঁটা পাঁঠার হাড়— চান তো করতেই হবে, মিছিমিছি একটা কাপড় ভেজাই কেন?'

আবার ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে ডাকে হারান, 'কৈরে সীতি, কোথায় গেলি!'

অর্থাৎ, দাদাকে ডাকবে না। এত লোক থাকতে বৌদিকে ডাকাও ভাল দেখায় না।

কনক শাশুড়ীর সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল। এইবার সে বেরিয়ে এল 'আসুন আসুন, ঠাকুরজামাই। আসুন।'

'হ্যাঁ— এই তাই আপনার জোর তলবেই ছুটে আসা। তা যা বলব, আদরযত্ন আর কি, খাওয়া তো আজ খেলে কাল ময়লা, মুখের মিষ্টি কথাই লোকে মনে রাখে। তা সেটা আপনার আছে খুব। বড় বংশের মেয়ে আপনি, আপনার কথাই আলাদা।'

কথা বলতে বলতেই ভেতরে এসে দাঁড়াল। কনক ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একটা আসন

BanglaBook.org

এনে দাওয়ায় পেতে দিল, 'বসুন ভাই। তা মিষ্টি কথায় কি আর আপনার সঙ্গে তা বলে পারব? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। আপনারা নাটক নভেল পড়া লোক, যা গুছিয়ে বলতে পারেন—'

এ কামড়ের দিক দিয়েও যায় না হারান। উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, 'না না বৌদি ওসব নাটক নভেল টভেল আমি বুঝি না, আমিও থার্ড ক্লাস পড়া লোক, কোন মতে আপনাদের আশীর্বাদে করে খাচ্ছি। আমার স্বভাব একেবারে অন্য রকম, পেটে এক মুখে এক নই—যা মনে আসে বলে দিই, ব্যস খালাস!'

কনক ভাবছে অন্য কথা। মা ওদিক দিয়ে পুকুরে গেছেন—কিন্তু আসবার এই পথ। হয় জামাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরে বসিয়ে এদিকের দোর জানলা বন্ধ করে দিতে হয়— নয় তো একখানা কাচা ভাল কাপড় ঘাটে দিয়ে আসতে হয়। অথচ জামাইকে ফেলে যাওয়া— এখনই একটা দুটো কথা না বলে—সেটাও ভাল দেখায় না।

তরু যথারীতি জানলাতেই ছিল। প্রথম ডাকটা কানে যেতেও বিশ্বাস করে নি। ভেতরে ঢুকতে দেখে ছুটে গিয়ে ঘরে দাঁড়িয়েছে— কনক যখন আসন আনতে গিয়েছিল তখন দেখে এসেছে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সে দাঁড়িয়ে। তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। সীতাও ঘুমুচ্ছে, ঐন্দ্রিলাও ঘরে নেই।

হারান কিন্তু বলেই চলেছে, 'অনেক ভাবলুম চিঠি পড়ে, বুঝলেন বৌদি, কী কর্তব্য। ভাবলুম হাত যখন একবার ধরেছি শালগ্রামশিলা সাক্ষী করে, ওর নাম কি ওর গর্ভে যখন আমারই বংশধর— তখন আমার উচিত ওকে দেখা।'

কী একটা আওয়াজ হল না? কনক কান খাড়া করে থাকে। কিন্তু হারানের কথার মধ্যে চলে যাবার মতো ফাঁকও যে পাওয়া যাচ্ছে না।

হারান বলছে, 'ও ছেলেমানুষ, বোকার মতো একটা কাজ করেছে— তাই বলে আমিও ছেলেমানুষী করব? তা হ'তে পারে না। বাড়িতে ফিরে এসে বললুম, আমি ওখানে যাচ্ছি— তা তিনি তো একবারে দশবাই চণ্ডী — বুঝলেন না? মরুক গে, মেয়েমানুষ চেঁচায়ই, তা আমি কি আর সে জন্যে কর্তব্যভ্রষ্ট হব! চলে এলুম সটান— সামনে দিয়েই—। মোদ্দা সকাল করে ফিরতে হবে বৌদি— জরুরি রিয়ের্সাল আছে ক্লাবে, না গেলেই নয়!

'ও মা, তাই কখনও হয়! কনক আরও কি বলতে যাচ্ছিল, ভেতর থেকে সীতার নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ও মামী শিগ্‌গির এসো, ছোট মাসীর আবার ফিট হয়েছে!'

'ঐ, চলুন চলুন— একেবারে ভেতরেই চলুন।' তারপর ঘরে ঢুকে পাখা খোঁজবার ছল করে সীতাকে চুপি চুপি বলে, 'শিগ্‌গির তোর দিদিমার কাপড়টা ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আয় মা!'

অত বেলা অবধি ঘুমোনোর ফলে সীতার তখনও আচ্ছন্ন বিহ্বল ভাবটা রয়েছে, সেটা বিকেল কি সকাল—ভাববার চেষ্টা করছে প্রাণপণে—সে বেশ কলরব ক'রেই প্রশ্ন করল, 'কোন্‌টা মামীমা—পাঁচিধুতিটা? ঐটেই তো পরে সকালে!'

'না রে, কাচা থানটা!' থানটা আলনা থেকে পেড়ে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে একরকম ঘর থেকে ঠেলেই দেয়।

ততক্ষণে হারান নিজেই কলসি থেকে খানিকটা জল হাতে করে নিয়ে মুখে ছিটোচ্ছে তরুর, 'ইস, এমন হাল হয়ে গেছে! এ যে চেনাই যায় না। খেতে না মোটে—নাকি? দেখুন দিকি; একে বলে ছেলেমানুষি! ছি ছি! পেটে একটা আছে, তার কথাও তো ভাবতে হয়। কি দরকার ছিল এত কাণ্ডর বলুন তো। আসবারই বা কি দরকার, এলেও, তখন চলে গেলেই হত। আমি দেখছি আপনার— এক আপনারই এর মধ্যে স্থির বুদ্ধি, ভাল বুদ্ধি! ঐ তো— ঠাক্‌মার তো বিষ-দাঁত ভেঙ্গে গেছে, গেল হপ্তা থেকে পক্ষাঘাত হয়ে বাঁ দিকটা পড়ে গেছে একদম, বিছানায় শুয়ে যা কিছু। আমার তিনি তো দুবেলা গঞ্জনা দিয়ে তবে

BanglaBook.org

কন্না করছেন। এখন চুপ একদম, শুধু পড়ে পড়ে কাঁদছে। সামনে গাল দেবার সাহস আর নেই, দিলেও আড়ালে— বুঝলেন না!'

ততক্ষণে তরুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে মাথায় ভিজে কাপড়টাই টেনে দিলে।

'উঁহু-উঁহু উঠো না। উঠো না। আর ভিজে আচলটাই বা মাথায় দেবার দরকার কি? অসুখ করবে যে! ঘরে কে আর আছে—বুঝলে না— বৌদি তো ঘরের লোক। সত্যি, অনেক পুণ্যি করে বৌদি পেয়েছিলে— বুঝলে—না—'

কনক মুখ টিপে হেসে সেইখানেই একখানা আসন পেতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আসল ঘরের লোকটিকে নিয়ে এখন থাকুন ভাই, নকল ঘরের লোক এখন কাজে যাচ্ছে!'

বাইরে তখন শ্যামা অনেকটা সাব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু মুখ তাঁর আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার!

কনক উঠোনে নেমে কাছে যেতেই চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'সে-ই চিঠি পাঠানো হয়েছিল বুঝি— আমার কথাটা অগেরাহ্যি করে?'

সে কণ্ঠস্বরে কনকের বুক শুকিয়ে উঠল। আসল কথাটা বলতে সাহস হল না— একেবারে মিথ্যাও বলতে পারলে না, ঢোঁক গিলে লেখার কথাটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

'হুঁ। তা তো দেবেনই। বড় বৌদি বলেছেন, সে যে বেদবাক্যি— গুরুমন্তর একেবারে। আমি বেটি কে, ঘুঁটে-কুড়ুনি কানিপরা দাসি বৈ তো আর নই!'

তাঁর এই অযৌক্তিক বিষোদ্গার দেখে অবাক হয়ে যায় কনক। এবাড়িতে এসে পর্যন্ত মানবচরিত্রে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু আজকের এটা একেবারে নতুন। মা সন্তানের সুখে সুখী নন, তার জীবন, তার ভবিষ্যতের চেয়ে তাঁর কাছে তাঁর অত্যন্ত তুচ্ছ একটা কর্তৃত্বের প্রশ্নই বড়— এরকম এখনও ভাবতে অভ্যস্ত নয় সে, তাই তার অবাক লাগল। কিম্বা ঠিক কর্তৃত্বর প্রশ্নও নয়— বুদ্ধির অহঙ্কারে আঘাত লাগলে বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কে জানে।

সে কোনমতে ওঁকে এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

হেম উঠে তখনও বিছানাতেই বসে আছে চুপ করে। তার মুখ প্রসন্ন। তরুর ভবিষ্যতের চেয়েও তার বর্তমানের চিন্তাটাই পাষাণ-ভার হয়ে চেপে বসেছিল মনে, সেই ভারটাই নেমে গেছে। রানী বৌদির কথাটা ফলেছে, তৃপ্তি সে জন্যেও।

ওকে ঢুকতে দেখে বলে, 'তাহলে ছটাকখানেক কাটা মাছ নিয়ে আসি, আর দুটো মিষ্টি— কি বলো?'

'তাই আন। কিন্তু দোহাই তোমার— চিঠিটা যে আমি লিখেছিলুম, মাকে যেন বলো না!'

'জানি।' বলে মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে যায় হেম।

হারানের যে জরুরি রিহার্সাল আছে ক্লাবে, তখনই যাওয়া দরকার— সে কথাটা আর তার মনে রইল না। বলা বাহুল্য, এরাও কেউ মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল না।

শাশুড়ী সামনে এসে দাঁড়াতে খুব সহজভাবেই তাঁকে প্রণাম করে কুশল প্রশ্ন করল। তরুর ছেলেমানুষী প্রসঙ্গে তাকে মৃদু তিরস্কার এবং সাধারণভাবে অনুযোগ করল। অর্থাৎ লজ্জা পাবার মতো কোথাও কিছু ঘটেছে, তা তার আচরণে আদৌ প্রকাশ পেল না।

শ্যামা অবশ্য বেশিক্ষণ বসলেন না, রান্না করার অছিলায় বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে কিন্তু তাতে হারানের উৎসাহ কমল না। ততক্ষণে ঐন্দ্রিলা এসে পড়েছে পাড়া বেড়িয়ে। সে

তাকে নিয়েই পড়ল। তা ছাড়া সীতা কনক— এবং নীরব নত-মুখী তরু তো আছেই— গল্প করার লোকের তার অভাব ঘটল না।

হেম একবার মাত্র এসে দাঁড়িয়েছিল। হারান শশব্যস্তে উঠে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর ঘাড় হেঁট করে মাথাটা চুলকে বলল, 'দাদা অভাগা ছোট ভাইকে মাপ করেছেন তো? রাগের মাথায়— আর তখনও খাওয়া হয় নি বুঝলেন কিনা— এতটা পথ ঠেকো রোদ্দুরে এসে আর লঘু-গুরু জ্ঞান ছিল না!'

এত সহজে এসব কথা যোগায় না হেমের মুখে। সে একটু মৃদু হেসে আশ্বস্ত করে, 'সব ভালো তো?'— কুশল প্রশ্ন মাত্র করে সরে পড়ল। তখন আর কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়, সে হাত-ছিপটা পেড়ে নিয়ে কেঁচোর সন্ধানে চলল। যদি দু-একটা মাছ ওঠে।

যথা নিয়মে চা জলখাবার— এবং যথা সময়ে ভাতও খাওয়া হয়ে গেল। কনক আগেই বাইরের ঘরে ওদের বিছানা করে দিয়েছিল, মুচকি হেসে বলল, 'যান সটান একেবারে ওঘরে চলে যান। আপনাদের ঐসব ছাই-ভস্ম কি ধোঁয়া-টোঁয়া খাওয়া আছে সারুন গে, ঠাকুরঝি খেয়ে-দেয়ে যাচ্ছে।'

সবকটা দাঁত বার করে হে হে করে হাসে হারান।

'এই তো সব মাটি করলেন বৌদি। মা দাদা সব রয়েছেন— ধোঁয়া খাবার কথাটা চেঁচিয়ে বলে দিলেন!'

'না, তাঁরা তো আর টের পাবেন না। একটু পরেই যে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোবে— তখন!'

'আরে সে অন্য কথা।'

হাসতে হাসতেই গিয়ে ঘরে ঢোকে।

তার পরের দিনও থাকল সে। একেবারে সোমবার এখান থেকেই খেয়ে-দেয়ে অফিস রওনা হল।

যাবার সময় কনকই প্রশ্ন করল, 'তার পর? আবার মশাইয়ের দেখা পাচ্ছি কবে? শনিবার অন্ততঃ আসছেন তো?'

এ শনিবার নয় বৌদি।' হারান বেশ সপ্রতিভভাবে বলে, 'আপনিই বুঝে দেখুন, তারও তো একটা ক্লেম হয়ে গেল কিনা— নতুন করে। ফি শনিবার এলে কুরুক্ষেত্তর করবে— হয়ত আপিং খাবে কি জলে ঝাঁপ দেবে।... সে আবার বাপের আদুরে মেয়ে— বুঝলেন না! আর আমার কাছে— সর্বদা ন্যায্য বিচার। এক শনিবার তার এক শনিবার এর। বলে কয়েই আসব, নুকোছাপা কিছু নেই তো! হাত যখন ধরেছি— বুঝলেন না?'

'তা—তাঁর তো এই হপ্তার দিনগুলো রইলই!' মৃদুস্বরে তবু কনক বলতে যায়।

'উঁহু তার নয়—তার নয়। এ দিনগুলো ধরুন ঠাকুমা-মাগীর! সে তো শুধছে। তার কন্না করছে তো—ও। গু-মুত থেকে নাওয়ানো-খাওয়ানো সবই তো করতে হচ্ছে—তবে? তার দরুন একটা বাড়তি ক্লেম তার আছে—বুঝলেন না?'

হে হে করে হাসতে হাসতে চলে গেল হারান।

কনক ফিরে দেখল তরু নিজে থেকেই ও ঘরের বিছানা তুলছে। সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শুধু শ্যামা কটু কণ্ঠে মৃদু মন্তব্য করলেন, 'খুব হল আর কি! মেয়ে তো বসে রইলই বুকের ওপর বারোমাস— তার ওপর এখন ঘর-জামাই পোষো। একগাদা খরচান্ত শুধু!'

BanglaBook.org

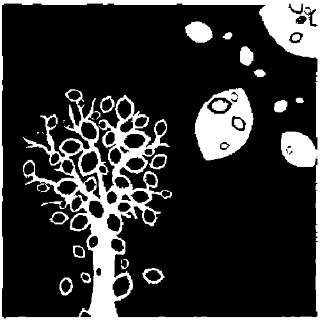

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দর বৌ রানীই প্রথম কথাটা তুলল।

সেদিন অফিস থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল হেমের। সিমলেয় বড় মাসিমার বাড়ি এসে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। বড় মাসিমা গেছেন পাড়াতে কোথায় চণ্ডীর গান শুনতে। এ একটা যেন নেশা হয়েছে তাঁর— রোজ যাওয়া চাই। গোবিন্দ তখনও বাড়ি আসে নি। ন'টার আগে কোন দিনই আসতে পারে না সে, শনিবার ছাড়া। তাও শনিবারও ফিরতে ছ'টা সাড়ে ছটা বেজে যায়। ইস্কুল সিজন-এ অর্থাৎ শীতকালে কাজের চাপ যখন পড়ে— তখন ন'টাতেও আসতে পারে না, আরও রাত হয়। সে যখন ফেরে তখন এদের এক ঘুম সারা হয়ে যায়। গোবিন্দ তার এক বন্ধুর ছাপাখানায় কাজ করে। মাইনে কম, কাজ বেশি। কিন্তু তবু এইখানেই কাজ শিখে চাকরি নিয়েছে বলে চক্ষুলজ্জায় বাধে, কাজ ছাড়তে পারে না। সাধারণ ছাপাখানা নয়— মানচিত্র ভূচিত্রাবলি ছাপা হয় সেখানে। দায়িত্বর কাজ, ঝুঁকি অনেক। ছাপাখানার ছুটি না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হয়। কারণ মালিক ছ'টা বাজলেই বাড়ি চলে যায়— সে ছাড়া ছাপার খুঁটিনাটি গোবিন্দর মতো আর কেউ বোঝে না। সাধারণত সাড়ে আটটা অবধি খোলা থাকে প্রেস— সব বন্ধ করে ফিরতে ন'টা তো বটেই, দেরিও হয়ে যায়।

সেই সময়টা রানীবৌয়ের নিরঙ্কুশ অবসর। সে সন্ধ্যার আগেই বিকেলের রান্না সেরে নেয়। কারণ মেয়ে আগলানো এক হাঙ্গামা। সে কাজটা ওর শাশুড়ী থাকলে করতে পারেন। কোনদিন হয়ত তিনিই রান্না করেন, ও মেয়ে আগলায় আর ঘরের খুঁটিনাটি কাজ সারে।

রান্না সেরে চুল বেঁধে গা ধুয়ে এলে ওর শাশুড়ী কাপড়-চোপড় কেচে আহ্নিক সেরে বেরিয়ে যান। কোনই কাজ থাকে না হাতে। কেউ না এলে একটু বই-টই পড়ে। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে হেমই এনে দেয় বই। হেম এলে বই-পড়া হয় না, গল্পই করে বসে বসে। অবশ্য গল্পটা একতরফাই চলে বেশি। হেম বেশি কথা কইতে পারে না, বিশেষ করে বড়বৌদির সামনে এলে যেন তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে যায়। শুধু চুপ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। কথা কইতে ইচ্ছাই করে না তার— মনে হয় সে সময়টা বৌদির কথা শুনলে কাজ হবে।

আজও তাই শুনছিল সে। ঘুমন্ত মেয়েকে একটা পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে কথা বলছিল বড় বৌ, আর হেম সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষু ও কর্ণে ঘনীভূত করে বসে শুনছিল এবং দেখছিল। শিগ্‌গিরই আবার ছেলেপুলে হবে, সাধ হয়ে গেছে— এখন-তখন অবস্থা। তবু কী দেহের বাঁধুনি, বোঝাই যায় না যে এত ভারী হয়ে এসেছে দেহ। দাঁড়ালে তবু যদি-

BanglaBook.org

বা বোঝা যায়— বসে থাকলে একেবারে টের পাওয়া যায় না। এদিক দিয়েও রানীবৌদির বরাত ভাল। পর পর হয়ে ন্যাঞ্জারি হয়ে পড়ে নি। বড়টি বোধ হয় বছর চার-পাঁচের হল— মনে মনে হিসেব করে হেম। যার ভাল হয়, তার সব ভাল।

কথাটা উঠেছিল তরু প্রসঙ্গে। তরুর ঠাকুমা-শাশুড়ী মারা গেছেন— সেই উপলক্ষে, একত্রে অশৌচ পালনকরবার নাম করে হারান নিয়ে গেছে তাকে। শ্রাদ্ধশান্তি মায় জ্ঞাতিভোজন পর্যন্ত মিটে গেছে আজ প্রায় দু-সপ্তাহ হল। তবু সেখানেই আছে। হারানের তরফ থেকে ফিরিয়ে আনবার বা দিয়ে যাবার কোন কথাই ওঠে নি এখনও পর্যন্ত।

'তোমরা কোন কথা তোল নি তো?'

'পাগল!'

'যাক—বোধ হচ্ছে তাহ'লে তোমাদের ঘাড় থেকে ও ভার সরেই গেল। ওরও টানাপড়েন হচ্ছিল তো—'

'বিশেষ। এদান্তে তো ফি শনিবারেই আসছিল।'

'তার মানে টানটা আছে এর ওপরই। তাছাড়া প্রথম সন্তান— সেটাও একটা চিন্তা আছে তো! ভালই হল। ছোট ঠাকুরঝিরও তো সময় হয়ে এল; কবে বলতে কবে হয়ে পড়বে। তোমাদের কাছে থাকলে ঐ ঝঞ্ঝাটটি পুরো তোমাদের ঘাড়ে পড়ত— আর খরচা। একটা বিয়েন তোলার কি কম খরচা!

এই বলে একটু মুচকি হেসে বলল, 'আমাদের ইনি তো সেই নাম করে জোর করে পঞ্চাশটা টাকা আদায় করেছেন বন্ধুর কাছ থেকে। ধার বলেই চেয়েছিলেন, তা কী ভাগ্যি টাকাটা দিয়ে বলেছে যে ও আর খাতায় লিখতে-টিখতে হবে না।'

'ভালই তো!' হেম বলে।

'হ্যাঁ! কত তো ভাল। আজকাল সবাইকে ওপরটাইম দিতে হয় নাকি বেশি খাটলেই। ছাপাখানার জমাদার থেকে সবাই পাচ্ছে। ওকে দেয়! দিলে পঞ্চাশ টাকা তো এক মাসেই পাওনা হয়ে যাবে মশাই।'

তারপর আবার হঠাৎ তরুর প্রসঙ্গ চলে যায়।

'তা হ্যাঁ ভাই— ওদের বন্দোবস্তটা কী রকম হবে?'

কাদের?' অন্যমনস্ক হেম অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'ঐ ছোট টাকুরঝিদের? কে থাকবে আর কে যাবে? পুরনো যিনি তিনি কি আর এখন যেতে রাজি হবেন? অসময়ে এসেছেন!'

'তা জনি না। শুনছি নাকি সেও আছে এখনও। তারও নাকি—'

এই বলে থেমে যায় হেম। সংকোচে কথাটা শেষ করতে পারে না।

'ওমা সেও পোয়াতী! তবেই তো বললে ভাল! তারও তো একটা কোলেম জন্মে গেল তাহলে!'

'হুঁ। তাই তো মনে হচ্ছে। আমি জানি না— ও বলছিল। ও তো দু-তিন দিন দেখলে কিনা। ওর ওপর খুব ভক্তি। শ্রাদ্ধের আগের দিন থেকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। বলে বৌদি না গেলে হবেই না।'

'তা তোমার বৌ যদি দেখে থাকে তো ঠিকই দেখেছে। সে বোকা মেয়ে নয় তাহলে কি করবে এখন হারান? দুই বৌ নিয়েই ঘর করবে নাকি?'

'কে জানে!'

'তা সে যাকগে মরুক গে— তোমাদের ঘাড়ে আবার না চাপিয়ে দিয়ে গেলেই হল। যার দায় সে বুঝুক!'

BanglaBook.org

তারপরই— একটু চুপ করে থেকে বলেছিল সে।

'আচ্ছা, ছোট ঠাকুরঝি তো নিজের বাড়ি চলে গেল। খোকাও তো ছোট মাসিমার ওখানে। এবার কান্তি ঠাকুরপোকে বাড়িতে আনিয়ে নাও না! আর কেন এখানে ফেলে রাখছ।'

চমকে উঠেছিল হেম, 'কান্তিকে?কেন, সে তো বেশ আছে। রাজার হালে আছে। অমন ভাল ভাল কাপড় জামা পরিয়ে মাস্টার রেখে কি আমরা তাকে পড়াতে পারব!'

'কী দরকারই বা তাকে অমন রাজার হাল অব্যেস করাবার। গরিবের ছেলে গরিবের মতো থাকাই তো ভাল। সেটা তো তার বাড়ি নয়, এইটেই তার বাড়ি, এইখানেই আসতে হবে থাকতে হবে তাকে। তা না করে— অমনি চাল যদি অব্যেস হয়ে যায়, তাহলে কি ও লেখা-পড়া শিখলেও তোমাদের কোন কাজে লাগবে?'

হেম চুপ করে থাকে। এমনভাবে কখনও ভাবে নি সে। মাত্র তিন-চার দিন আগে কনকও এই প্রসঙ্গ তুলেছিল— তাকেও চুপ করিয়ে দিয়েছিল ঐ বলে। আশ্চর্য, মনে মনে স্বীকার করে হেম, সহজ সাংসারিক বুদ্ধিটা তাদের চেয়ে এই এক ফোঁটা মেয়েগুলোর কত বেশি।

রানী আবার বলে, 'যতই হোক, ছেলে যতই ভাল হোক— তবু ওসব জায়গায় না রাখাই ভাল। জায়গাটা ভাল নয় বুঝলে....তোমরা বলো বা নাই বলো আমি তো সব জানি। ও বড় ঠাকুরঝির কী রকম ননদ, নন্দাই কী করে— কিছুই আমার জানতে বাকি নেই। তাছাড়া সে যেমনই হোক, পাড়াটাই যে খারাপ। মানুষ-খেকো রাক্কুসীর পাড়া! অমন সোনারচাঁদ ভাই তোমার— কার নজরে পড়বে, ইহকাল-পরকাল সব যাবে।'

'কিন্তু দুদিন পরে কলেজে পড়ার কথা। তখন তো আমরা আর কিছু করতে পারব না। সে তো হাতির খরচ!'

'কিসের হাতির খরচ এমন। এখন তো তোমার সংসার হাল্‌কা হয়ে এল। কোনমতে কলেজের মাইনেটা টানতে পারবে না? বই তো কত ছেলে শুনেছি চেয়ে-চিন্তে, হাতে-লিখে নিয়ে কাজ চালায়। ভাল ছেলে, চাই কি বিনা মাইনেতেও পড়তে পারবে, জলপানি পায় তো কথাই নাই। এখন আর কেন পরের বাড়ি ফেলে রাখা অমন করে। বলি সে দৈন্যদশা তো আর তোমাদের এখন নেই!'

'তা নেই, তবুও—! অনেক খরচা শুনেছি। তবে ঐ যা বলেছ, জলপানি একটা পেতে পারে। ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে!'

'তবে! সে তো আমিও শুনেছি! তাহলে জলপানি নিশ্চয় পাবে, দেখে নিও!'

তারপরই বুঝি কথাটা মনে পড়ে যায় তার।

'আচ্ছা, এই ফার্স্ট ক্লাসে ওঠার কথা তো কবে শুনেছি। তার তো এবার এগ্‌জামিন দেবার কথা।'

'এবারই তো দেবে!' নিশ্চিন্ত হয়ে জবাব দেয় হেম।

দেবে কী গো— সে এগ্‌জামিন তো হয়ে গেছে!'

'যাঃ!' অবিশ্বাসের সুরে বলে হেম।

'এই দ্যাখো! কবে হয়ে গেছে। আর বোধ হয় মাস-খানেকের মধ্যেই ফলাফল বেরিয়ে যাবে।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ—আমি বলছি। আমার মেজ খুড়তুতো ভাই দিলে না এবার। শেষ দিন দেখা করে গেল। সে তো কবের কথা!'

'সে কি!' আবারও বিমূঢ়ভাবে বলে হেম।

BanglaBook.org

'তোমাদের জানালে না, মাকে পেন্নাম করে এল না— কী কথা!' বড় বৌ বিস্মিত হয়ে বলে, 'তাছাড়া এগ্‌জামিন শেষ হয়ে গেছে, এখন তো বাড়িতে এসেই থাকবার কথা! আর তোমরা খবরও রাখো না! বেশ লোক বাবা তোমরা।'

'তাই তো!' এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে ওঠে হেম, 'মুস্কিল হচ্ছে এদানি তো আর ছুটিছাটাতে বাড়ি আসত না, এলেও কদাচিৎ কখনও— একদিন দু দিন থেকে চলে যেত। ওরা পয়সা খরচা করে মাস্টার রেখেছে, মিছিমিছি পড়া কামাই করানো— এই জন্যেই আমরাও কিছু বলতুম না। আর ভাল যে আছে সে তো চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়— কাজেই আর পেড়াপীড়ি করতুম না। কিন্তু এগ্‌জামিন হয়ে গেল বলছ— অথচ আমরা একটা খবর পর্যন্ত পেলুম না! এইটে যেন বড় খারাপ লাগছে। সত্যিই কি ছেলেটা পর হয়ে গেল নাকি? রতনের ওর ওপর নজর পড়েছে খুবই— যে রকম আদরযত্ন করছিল, পুষ্যিপুত্তুর-টুত্তুর নিয়ে নেয় নি তো?'

এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে বড় বৌ, 'মাইরি ঠাকুরপো, তোমার যা বুদ্ধি, ঘুঁটের মেডেল গড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নিদেন একটা পেরাইজ!'

'কেন—কী বললুম এমন? অপ্রতিভ হয় হেম। ভালও লাগে তার। বড় বৌদির কাছে বোকা বনতে দোষ নেই।

'তা নয়! যা শুনেছি আমি বড়-ঠাকুরঝির মুখে, এত কিছু বয়স নয় ওর রতন ঠাকুরঝির যে অত বড় ছেলের মা সাজতে পারে। তাছাড়া পুষ্যিপুত্তর কেউ অত বড় ছেলেকে নেয়ও না আর তা নিলেও তোমাদের না জানিয়ে নিতে পারে কখনও? আইনে তা টিকবে কেন? তা নয় ফুটফুটে ছেলে— শান্তশিষ্ট, পড়ায় মন আছে—তাই ভালবাসে যত্ন করে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তা যাই হোক' তুমি বাপু একবার খবর নাও।'

'নেব। তুমি তো আমায় ভাবনা ধরিয়ে দিলে।'

'আবার নেব-তে দরকার কি, আজই যাও না। এখনও তো আটটা বাজে নি!'

'না, আজ হবে না। এখন রামবাগানে গিয়ে দেখা করে কথা কয়ে হাওড়ায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। নটা পঁয়ত্রিশ না পেলে একেবারে দশটা চব্বিশ— বাড়ি পৌঁছতে দুপুর রাত।'

'তবু ভাল— বাড়ির ওপর টান হয়েছে একটু!' এক রকমের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ টিপে হাসে রানী।

'না,তা নয়। আবার তো সেই ভোরে ওঠা!' অকারণেই লাল হয়ে ওঠে হেম, 'তাছাড়া রাত্রে গেলে ওখানে দেখাও পাওয়া যায় না। দারোয়ান ঢুকতেই দেবে না হয়ত। সে বলাই আছে। গেলে সন্ধ্যের আগে।'

'রতনের সঙ্গে না দেখা হোক— তোমার ভাইকেও ডেকে দেবে না?'

'না— সে ওদের বারণ করাই আছে। মানে একটু পত্তর আড়াল দেয় তো এখনও, সেই ইজ্জতটা নষ্ট করতে চায় না আর কি! তাছাড়া পাড়াটা ভাল নয়, রাত্তির বেলা যেতে ইচ্ছেও করে না— আর দরকারই বা কি, পরশুই তো শনিবার, আপিসের ফেরৎ বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে মুখ হাত ধুয়ে চলে যাব এখন— চারটে নাগাদ যাওয়াই ভাল।'

'তাই যেও।'

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে।

বলার মতো কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে যায় দুজনেরই।

এ রকম আজকাল প্রায়ই হয়।

বহু দিন বহু ঘণ্টা এমনি করে সামনা-সামনি বসে কাটিয়েছে ওরা, ওদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বাঁধা জীবনে কী-ই বা এত কথা থাকতে পারে?

BanglaBook.org

আগে নিত্যই আসত হেম, এখনও সপ্তাহে দু-তিন দিন করে আসে। রবিবারে গোবিন্দ থাকে কিন্তু বাকি দিনগুলোতে ওরাই শুধু বসে থাকে— এমনি মুখোমুখি। সুতরাং যতরকম প্রসঙ্গ প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে ওরা।

অবশ্য হেমের তাতে আপত্তি নেই। বরং এমনি করে চুপ করে বসে থাকতে পারলেই ও খুশি— এমনি বড়বৌদির মুখের দিকে চেয়ে।

বেশিক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে কিন্তু রানীর ভাল লাগে না। তার গা ভারী হয়ে এসেছে, আলস্য করতেই ইচ্ছে করে।

সে একটু পরে বিরাট একটা হাই তুলে বলে, 'ঠাকুরপো, আমি ভাই শুই একটু। কিছু মনে করো না।'

'না না, মনে করব কেন? আমি বরং যাই আজ—তুমি দোর দিয়ে শোও বরং। বড় মাসিমা তো অন্য দিন এসে যান এতক্ষণ, সাড়ে আটটা তো বাজে!'

'মার আজ ফিরতে রাত হবে। আজ বুঝি খুল্লনার সাধ গাইবে— মা সব সিধে সাজিয়ে নিয়ে গেছেন। গান শেষ হবে, সিধের থালা আজাড় হবে তবে তো আসবেন! আজ যার নাম সেই ফিরতে নটা স-নটা!'

'তবে আমি যাই— তুমি দোর দাও।'

দোরের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসে বড় বৌ। হেম চৌকাঠ ডিঙোতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে সে ডাকে, 'ঠাকুরপো!'

হেম চমকে পিছনে ফেরে। দৃষ্টিটাও কেমন যেন অদ্ভুত বড় বৌদির।

সে আবার ভিতরে একটা পা দেয়, 'কিছু বলবে?'

'বলছিলুম কি— তুমি কিছু মনে ক'রো না ঠাকুরপো, অনেক ভেবে দেখেই বলছি— বলছিলুম যে তুমি কোথাও বদলির চেষ্টা করো। তোমাদের তো রেলের চাকরি, বদলি হয় শুনেছি। হয় না?'

'সে যারা লাইনে কাজ করে তাদেরই বেশি হয়। আমাদেরও হতে পারে— অপর কারখানায়। চেষ্টা করলে অন্য কোন কারখানায় যেতে পারি বটে, আরও দুটো জায়গা আছে। কিন্তু কেন বলো তো?'

বেশ একটু অবাক হয়েই চায় হেম তার দিকে।

ঠিক তখনই উত্তর দেয় না রানী, হয়ত দিতে পারে না। আরও কিছুক্ষণ সেই বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হেমের মুখের দিকে। সে চাহনি যেন কী রকম। হঠাৎ সে দিকে চেয়ে আজ বড় দীন বোধ করে হেম নিজেকে।

একটু পরে রানী বলে, প্রায় চুপিচুপি, 'আমার কাছ থেকে দূরে কোথাও না গেলে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে ঠাকুরপো, এ মোহ তুমি ঘোচাতে পারবে না। তোমার জীবন শুধু নয়, ভেবে দ্যাখো আরও একটা জীবন যেতে বসেছে। এর আগেও তোমাকে বলেছি, এখনও তোমাকে বলছি, বহু ভাগ্য করলে কনকের মতো বৌ মেলে। ওর দিকটা চেয়ে দ্যাখো, ওর জীবনটা নষ্ট করো না। তুমি দূরে কোথাও চলে যাও কনককে নিয়ে— এক বছর বাইরে থাকলেই এই মোহটা চলে যাবে, বৌকে নিয়ে সত্যিকারের সুখী হতে পারবে। শুধু শুধু—। ভেবে দ্যাখো, কোন লাভ তো নেই।'

কথাটা শুনতে শুনতে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল হেমের মুখ। সেটা ডবল-পলতের বড় টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে রানীর চোখ এড়াল না। মনে হল যেন কে এক ঘা চাবুক মেরেছে হেমের মুখে— এমনি করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

BanglaBook.org

এই ভয়েই— এই রকম মর্মান্তিক আঘাত লাগবে তার বুঝেই— বহুদিন বলতে গিয়েও বলতে পারে নি সে। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে মিছিমিছি, অনেক অপরাধ তার জমে যাচ্ছে তারই মতো আর একটা মেয়ের কাছে। আর না!

অনেকক্ষণ পরে, যেন অসাড়-হয়ে-যাওয়া জিভে কিছুক্ষণ ধরে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে হেম আস্তে আস্তে বলে, 'আমি যে এখানে এমন করে আসি—তাতে তুমি বিরক্ত হও!'

এতখানি জিভ কেটে রানী একেবারে ওর হাত দুখানা চেপে ধরল, 'ছি ছি! স্বপ্নেও তা ভেবো না। এক-এক সময় মনে হয় তোমার মতো আমার কোন সোদর ভাই থাকলেও তাকে আমি এতটা স্নেহ করতে পারতুম না। আমার এখানে কে আছে বলো। একা-একা মুখ বুজে থাকা বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে— এইতো। তবু তুমি আস, গল্পে-গুজবে হাসি-ঠাট্টায় আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায়— টেরও পাই না। কিন্তু আমার ভাল লাগে সেটা বড় কথা নয় ঠাকুরপো, তোমার আর তোমার বৌয়ের সারা জীবনটা পড়ে রয়েছে, সেই কথাটা একবার ভাবো!'

'আমি— আমি তো এখন আর ওকে অযত্ন করি না।'

'তাও আমি জানি।' একটু হেসে বলে রানী, 'তুমি কি আমার চোখ এড়াতে পার! আমি বলছি— তোমাদের মধ্যে আমি যতদিন থাকব তোমরা ঠিক সুখী হ'তে পারবে না। তাই বলছি কিছু দিনের জন্যে অন্তত তুমি সরে যাও!'

আবারও কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেম। কিছু যেন তার মাথাতে ঢুকছে না। কতকটা বজ্রাহত তাল গাছের মতো অবস্থা তার—দাঁড়িয়ে আছে খাড়া হয়ে বটে কিন্তু কোথাও যেন কোন প্রাণলক্ষণ নেই, ভেতরকার সবটা ঝলসে গেছে।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে আবার বুঝি তার জিভে সাড় ফিরে এল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও চেপে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

কিন্তু তার সেই রক্তহীন বিবর্ণমুখ আর দীপ্তিহীন চোখের দিকে চেয়ে রানীই এবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার আঘাতটা যে এমন ভাবে বাজবে তা বোধ হয় আগে অতটা ভাবে নি। নিজের এই নিষ্করুণ হিত-বাক্যের প্রতিক্রিয়া নিজের মধ্যেই হতে শুরু করেছে।

সে আবারও হেমের হাত দুটো ধরে ফেলে বলল, 'আমার ওপর রাগ করলে ঠাকুরপো?'

'না। রাগ করব কেন, তুমি তো আমার ভালর জন্যই বলেছ।'

'না না, মাইরি ঠাকুরপো, ও সব ভদ্দর্তা কথা রাখো। ঠিক করে বল তো!.... তুমি বরং একটু বসে যাও, মা আসুন। নইলে আমার মনে হবে রাগ করে চলে গেলে।... কী বলতে কী বলে ফেললুম, না বললেই হত।.... এখন আমার দুর্ভাবনায় সারা রাত ঘুম হবে না।.... একটু বসো। বরং কাগজ জ্বেলে একটু চা করে দিই, খেয়ে যাও!'

তার এই ছেলেমানুষী আকুলতায় হেসে ফেলল হেম। ম্লান হাসি, তবু তাতেই ক্ষমার চেহারা দেখতে পেল রানী। যে যথার্থ ভালবাসে সে কোন অপরাধই ক্ষমা না করে পারে না।

হেম ততক্ষণে কণ্ঠস্বরকেও অনেকটা আয়ত্তে এনেছে। হাসিমুখেই বলল, 'ভয় নেই। রাগ-টাগ কিছুই না। আজ আসি— তুমি দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়গে। পরশু তো আসছি, সেই দিন এসে চা খেয়ে যাবো বরং—'

সে আর দাঁড়াল না। রাস্তাতে পড়েও প্রায়-বিকম্প পা-দুটোকে যথাসম্ভব টেনে টেনে দ্রুতই চলবার চেষ্টা করল।

এর অনেকক্ষণ পরে ট্রেন থেকে নেমে যখন বাড়ির পথ ধরল তখন কিন্তু মনে হল পা দুটো বেশ স্বাভাবিকভাবেই চলছে। কিছু পূর্বের সে দুর্বলতা আর নেই।

BanglaBook.org

অন্ধকার বিজন পথ। বাজারের কাছে না গেলে, পোলটা না পেরোনো পর্যন্ত কোথাও আলো পাবে না। চারিদিকের ঝুঁকে-পড়া বহু বিচিত্র গাছের ছায়ায় নক্ষত্রের আলোও এসে পৌঁছবার উপায় নেই। নভেলের ভাষায় একেই বুঝি বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিন্তু, হেমের মনে হল নভেল যারা পড়ে সেই শহরের মানুষরা কখনই এ অন্ধকার কল্পনা করতে পারবে না।

আলো অবশ্য আছে, জোনাকীর আলো। কিন্তু তাতে পথ দেখা যায় না— বরং আরও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। তবে হেমের বিশেষ আর অসুবিধে হয় না। অনেকেই, যাদের ফিরতে রাত হয়, তারা স্টেশনের কাছে দোকানে লণ্ঠন রাখার ব্যবস্থা করে, ফেরার পথে আলো জ্বেলে নেয়। হেমের অত ঝঞ্ঝাট ধাতে সয় না। নিত্য গিয়ে গিয়ে অভ্যাসও হয়ে গেছে তার, অন্ধকারেই বেশ চলতে পারে।

আজ বরং কলকাতা থেকে এসে এই অন্ধকারটাই বেশ ভাল লাগল। হঠাৎ কেমন মনে হল ঐ কোলাহল আর উজ্জ্বল আলোর মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখানে এসে আবার তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে কখন ডান দিকে বেশি বেঁকে গিয়ে পড়েছিল— টের পায় নি। একটা বাঁশের ডগা মাথায় লাগতে খেয়াল হল তার। ভাগ্যিস চোখে লাগে নি। হেঁট হয়ে সেটা বাঁচিয়ে আবার রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ল। নিত্য মানুষের চলাচলে এই মাঝখানটাই পরিষ্কার থাকে, একটা মানুষের সমান উচ্চতার মধ্যে কোন ডাল-পালা এসে পড়তে পারে না।

সোজা ফাঁকা পথে পড়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে চলতে এতক্ষণ পরে ভরসা করে সে রানীবৌদির কথাটা মনে করল। ওখান থেকে বেরিয়ে অবধি প্রাণপণে ও প্রসঙ্গটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল। জোর করে ভাবছিল বা ভাববার চেষ্টা করছিল অন্য কথা। অফিসের কথা— ছোটসাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছে, চাঁদা দিতে হবে ফেয়ারওয়েলের। বাজার— পোস্তা থেকে অনেক দিন ডালের ক্ষুদ আনা হয় নি। একটা গরু পুষলে কী হয়? এ ছাড়া তরু, হারান, ঐন্দ্রিলা, খোকা, ছোট মাসী— সকলের কথা মনে আনবার চেষ্টা করেছে রানী ছাড়া। তার কথাটা মনে আনতে সাহস করে নি— যদি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে? যদি না স্বাভাবিকভাবে পথ চলতে পারে?

কিন্তু এখন ভেবে দেখল সে। রানীবৌদি, তার প্রস্তাব— তার মৃদু তিরস্কার, সবই। একে একে সন্ধ্যার সব কথা ও ঘটনাগুলো ভেবে নিল। না, সত্যিই তার ওপর রাগ করে নি ও। এমন কি ক্ষুণ্ণও তেমন হয় নি। আশ্চর্য। নিজের পরিবর্তনে নিজেই যেন খানিকটা অবাক হয়ে গেল। এ কী কেরই প্রভাব? ঠিকই বলেছে বড়বৌদি। নিজে থেকে হয়ত এ মোহ সম্পূর্ণ দূর করতে পারত না কোন দিনই— ভালই হল ওদিক থেকে কথাটা উঠল। সত্যিই তো, কী লাভ হচ্ছে দিনের পর দিন এই কাঙালপনা করে, এই ভিক্ষাপাত্র ধরে থেকে। কী পাচ্ছে সে? মনে পড়ল আর একটা দিনের কথা। নলিনীর বাড়ি থেকে যেদিন বিতাড়িত হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল সেই দিন সেই মুহূর্তটির কথা। ওঃ কী কষ্টই হয়েছিল সেদিন। মনে হয়েছিল বুঝি আর বাঁচবেই না সে। আত্মহত্যাই করত হয়ত, নলিনীকে দেখার আশাতেই বুঝি মরতে পারে নি। তরুণ বয়সের প্রথম প্রেমের ব্যাকুলতা মনে করলে আজ হাসি পায় বটে কিন্তু নলিনী তাকে অনেক দিয়েছিল। তার মতো সে ভালই বেসেছিল ওকে।

তবু সেও দৈন্য আর কাঙালপনা ছাড়া আর কিছু নয়। এও তাই। না, চিরদিন ধনীর প্রসাদের বাইরে ভিখারী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু লাভ নেই। ওখানের উজ্জ্বল আলো ওর

BanglaBook.org

কি কাজে আসবে? তার পর্ণকুটিরের মাটির প্রদীপই ভালো। সে স্নিগ্ধ আলো কাজে সহায়তা করবে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করবে না।...

পোল পেরিয়ে বাজারে এসে পড়ল সে। হারাধন নন্দী বসে এখনও হিসেব করছে। ভোঁদার দোকানে ভিয়েন চলছে এখনও।

হঠাৎ মনে হল বিস্মৃত অতীত কোন জীবন থেকে বর্তমানে এসে পড়ল সে। তার আসল জীবন, বাস্তব জীবন।

না, কালই সে বদলির চেষ্টা করবে অফিসে গিয়ে।

॥ ২ ॥

শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না এদের, কান্তির খবরের জন্যে। শুক্রবার বিকেলে মহাশ্বেতাই এল ছুটতে ছুটতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে।

'বলি তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ডটা শুনেছ! ছি ছি, কি কেলেঙ্কারটাই করলে আর কী মুখটাই পোড়ালে!'

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই কথা বলতে শুরু করে সে। তারপর বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

আলো বেশিক্ষণ পাওয়া যাবে বলে আজ বাইরের ঘরের রকে এসে বসেছিলেন শ্যামা। কাজটাও একটু নতুন ধরেছিলেন আজ— চিরাচরিত পাতা চাঁচা বা গামড়া থেকে পাতা ছাড়ানো নয়— কাঁথা সেলাই করতে বসেছিলেন। অনেকগুলো ছেঁড়া কাপড় জমেছে, এদিকে আর হাত না দিলেই নয়। সামনে শীতকালেই দরকার হবে। পুরনো কাঁথা সবই প্রায় ছিঁড়ে এসেছে, সে এখন বিছানায় পাতা চলবে আরও দু-এক বছর— কিন্তু গায়ে দেওয়া চলবে না আর।

'গুণধর ছেলের কাণ্ড' বলতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল শ্যামার— ছুঁচটাও হাতে বিঁধে গিয়েছিল সজোরে— কিন্তু তবু কোন্ গুণধর ছেলে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি কদিন ধরে ভাবছিলেন খোকার কথাই। উমা তো ফেরে রাত ন'টার সময়— খোকা ইস্কুল থেকে ফেরে চারটেয়। তারপর যে কী করে তা কে জানে। হয়ত যত রাজ্যের পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলে, কি কী করে তার ঠিক কি! হয়ত কোন দিন বিড়ি খেতে শিখবে। শরৎ জামাই আছেন বটে তা তিনিও তো রুগ্ন, বসে বসে হাঁপান। তিনি কি আর অত বড় ছেলের ওপর নজর রাখতে পারেন?

ভয় যেটা মনে প্রবল ও প্রধান হয়েছিল সেইটেই মুখে বেরিয়ে গেল, 'খোকা?'

'খোকা কেন গো! তোমার গব্বের সেরা যিনি— যিনি তোমার মুখ ওজ্জ্বল করবেন! কান্তিচন্দর!... বাবা, আমড়া গাছে কি আর ন্যাংড়া ফলে, বাবা এদান্তে বলত ঠিকই— কচুর বেটা ঘেঁচু— বড় জোর মান।'

মহাশ্বেতার ধরন দেখে মনে হল যেন পরমাত্মীয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে আসে নি— কোন শত্রুর মহাসর্বনাশের আনন্দসংবাদ বহন করে এনেছে। ঠিক তেমনি বিজয়দীপ্ত চাহনি তার, তেমনিই উল্লাস।

আসলে তার সন্তানরা লেখাপড়া শেখে নি বা শিখছে না বলে এরা যত কথা শুনিয়েছেন, তার জ্বালাই মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। দুর্বল মানুষকে তার আত্মদোষ দেখিয়ে দিলে প্রতিকার করতে পারে না সংশোধন করতে পারে না— কিন্তু যে দেখিয়ে দেয় তার ওপর বিদ্বিষ্ট হয়ে থাকে। তার ছেলেদের লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থাই করতে পারে না সে— সব চেয়ে বড় কথা তার তেমন প্রয়োজনও বোঝে না— তবু এঁদের গঞ্জন ও বিদ্রূপের জ্বালাটা পোষণ করে রাখে। আজ যেন তার সেই শোধ নেবার দিন এসেছে।

BanglaBook.org

শ্যামা কিন্তু কান্তির নাম শুনে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যান। কি হয়েছে, কী করেছে সে প্রশ্নও করতে পারেন না।

কনক ওধারে কি কাজ করছিল, বড় ননদের আওয়াজ পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে বট্ ঠাকুরঝি?'

প্রশ্ন করে আর মনে মনে কাঁপতে থাকে। দুঃসংবাদের কী আর শেষ হবে না! এদের বাড়িতে দুঃসংবাদও যা আসে কখনও ছোট তো আসে না কিছু— একেবারে মহাবিপদের বার্তা নিয়েই আসে।

'হবে আর কী বলো— কান্তিচন্দ্র তোমাদের ফেল করে বসে আছেন?'

'ফেল করেছে! কান্তি ফেল করেছে!' বার দুই বিহ্বলের মতো প্রশ্ন করেন শ্যামা।

বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। বিশ্বাস করার কথাও নয়। গতবারেও যে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেছিল! প্রাইজ পেয়েছিল। প্রাইজের বই এখানেই রেখে গেছে সে। এখনও রয়েছে ও-ঘরে।

'তার যে এবার পাস দেবার কথা!' কনক প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ গো— পাস দেবারই তো কথা। তা ঐ বড় পাসের আগে একটা কি ছোট পাসও দিতে হয়— তবে বড় পাস দিতে যেতে দেয় তো, সেই পাসই দিতে পারে নি— সব বিষয়ে নাকি ফেল করেছিল।'

'কিন্তু তা কী ক'রে হবে ঠাকুরঝি! গত বছরেই সে প্রথম হয়েছে সে কি করে সব বিষয়ে ফেল হতে পারে! হয়ত খুব ভাল না হতে পারে, হয়ত দুটো-একটায় দৈবাৎ ফেল হতে পারে— তাই বলে সবেতে ফেল! পাসের এগজামিনেই বসতে দেবে না?'

'সে এগ্‌জামিন তো কবে হয়ে গেছে। সে কী আর বাকি আছে তোমার!'

'কিন্তু সে কী রকম করে হল বট্‌ঠাকুরঝি! আপনি শুনলেন কার কাছে?'

'আবার কার কাছে। খোদ তোমার নন্দায়ের কাছে। মিথ্যে বলবার বান্দা সে নয়। তারও খুব দুঃখ হয়েছে। তার মুখটাও তো পুড়ল। বড় মুখ করে রেখে এসেছিল। আসলে ওরই ভুল হয়েছে, আমার ননদ ভালমানুষ হলে কি হবে— পাড়াটা যে খারাপ। ছেলে তো বকে যাবেই।'

সেই প্রথম একটি বিহ্বল প্রশ্নের পর একটি কথাও বলতে পারেন নি শ্যামা, কোন প্রশ্নই করতে পারেন নি। মহাশ্বেতার শেষ কথাটায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কি বললি, কি বলেছেন জামাই— বকে গেছে! কান্তি বকে গেছে?'

এইবার বোধ হয় মার অব্যক্ত ব্যথার আর্তস্বরে লজ্জা পেল মহা, মাথা হেঁট করে বললে, তাই তো বলেছে রতন তোমার জামাইকে। অবশ্য রতন ঠিক বলে নি। সে নাকি একটা কথাও বলতে পারে নি, ঘাড় হেঁট করে ছিল সব্বক্ষণ। বলি তারও খুব লজ্জা হয়েছে তো গা, বিশ্বাস ক'রে তার কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিল। বলেছে ওদের খুকী ঝি, রতনের সামনেই বলেছে। খুব নাকি বকে গিয়েছিল, ওরা নাকি মোটে টের পায় নি। এদান্তে নাকি ইস্কুলেও যেত না। কাজেই কোথায় কি কখন করছে— এরা জানতে পারে নি। ঐ ছাই কী যেন এগ্‌জামিন—তার ফল বেরোতে তখন সবায়ের চোখ খুলল, তখন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সব খবর। তোমার জামাই তো অধোবদন একেবারে।...ঐ দিকে গেছল কী কাজে, নতুন বাজারে বুঝি কি দরকার ছিল—হঠাৎ মনে হয়েছে অনেকদিন তো খোঁজ-খবর করা হয় নি একবার খবর নিয়ে যাই। তা খবরের তো ঐ ছিরি। মাথা হেঁট করে ঐ বিত্তান্ত শুনে চলে এল। আর হবে কি, তোমরা তো কেউ খবরও নাও না— ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত!'

এ অনুযোগের উত্তর দিল কনকই। সে আর থাকতে পারল না, বলল, 'আমরা খবর

BanglaBook.org

নিলেই বা কী হত ঠাকুরঝি, যাদের বাড়িতে আছে তারাই কিছু টের পায় নি— একদিন দুদিনে মানুষ এত খারাপ কিছু হতে পারে না— নিশ্চয় অনেকদিন ধরেই বদ্‌সংসর্গে মিশেছে— তা তারাই যদি জানতে না পেরে থাকে, আমরা এক-আধ দিন গিয়ে খবর নিয়ে এলে কি আর জানতে পারতুম!'

কনকের মনটাও বড় খারাপ হয়ে গেছে। বিয়ের সময় এসে দাঁড়িয়েছিল— মনে আছে— যেন রাজপুত্তুর। যেমন রূপ তেমনি মিষ্টি কথা। সেই ছেলে এমন বিগড়ে গেল!

'না, তবু,—, একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মহাশ্বেতা—'তবু বাড়ির লোক ঘন ঘন যাওয়া আসা করলে একটু ভয় থাকে বৈকি। এ একেবারে নিশ্চিন্তি তো!'

শ্যামা উত্তর দেন না কোনটারই। আসলে তখন তিনি প্রাণপণে তাঁর অন্তরের ফেনায়িত বিষকে সংযত করছেন, প্রচণ্ড উষ্মাকে পরিপাক করছেন প্রাণপণে। তাঁর মাথাতে কথাগুলো ভাল ঢোকে নি— কিছু গুছিয়ে ভাবতেও পারছেন না, সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে— আর তার মধ্যে মনের সব যুক্তি ছাপিয়ে যেটা উঠে আসতে চাইছে তা হল একটা ভয়ঙ্কর চণ্ডাল ক্রোধ। একটা বীভৎস কিছু করতে পারলে যেন শান্তি পান তিনি, পৈশাচিক একটা কিছু। এ উষ্মা বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর নয়—একসঙ্গে যেন অনেকের উপর। এই মেয়ে, জামাই, তার বোন, সেই বিশ্বাসঘাতক ছেলে, উদাসীন মোহাচ্ছন্ন বড় ছেলে— সর্বোপরি নিজের অদৃষ্ট এবং এই সমস্তর মূল, এই ছেলে-মেয়ের জন্মদাতা পরলোকগত স্বামীর ওপরও। সব কটাকে শিক্ষা দেবার মতো একটা কিছু করতে পারলে তবে হয়ত এ ক্রোধের শান্তি হত তাঁর।

ইচ্ছা করছিল এক-একবার ঐ মেয়েটাকে ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দেন, যে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে এই খবরটা দিতে এসেছে। আবার মনে হচ্ছিল কোমর বেঁধে ছুটে গিয়ে জামাই বা তার সেই স্বৈরিণী বোনের সঙ্গে খুব খানিকটা ঝগড়া করে আসেন। ছোটলোকদের মত উগ্র কলহ— তাঁর মেজ মেয়ের মতো— ঐ রকম ভাবে কোথাও একটা মনের বিষ ঝাড়তে পারলে যেন শান্তি হয় তাঁর।

কিন্তু কিছুই করা হয় না শেষ অবধি। এ জীবন তাঁকে আর কিছু না দিক— ধৈর্যটা দিয়েছে খুব। ওটার প্রয়োজনও যেমন হচ্ছে জীবনভোর, তেমনি ভগবান তাঁকে দিয়েছেনও খুব অকৃপণ হাতে।

সামলেই নিলেন নিজেকে শেষ পর্যন্ত। শুধু কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় মনের সেই প্রচণ্ড উষ্ণতার সামান্য আভাসটুকু মাত্র ধরা পড়ল।

বললেন, 'তা সে— সে কী করছে এখন? তার সঙ্গে দেখা হয় না জামাইদের? বাড়ি ছিল না সে?— তখুনি কান ধরে তাকে টেনে আনতে পারলেন না? তার বকামি বার করতুম শয়তান, পেটের শত্তুরের!'

'ও মা, সে কোথায় যে তাকে টেনে আনবে!'

বেশ সহজ ভাবেই কথাগুলো বলে রকে উঠে বসে পা ছড়িয়ে পায়ে হাত বুলোয় মহাশ্বেতা।

'ওখানে নেই? সে কি? তবে সে কোথায়? কৈ এখানে তো আসে নি! এসব কথা তো বলিস নি এতক্ষণ।'

'বলছি বলছি। রোস, বলবার ফুরসৎ পেলুম কোথায়।.... ওরা নাকি এখানেই পাঠাতে চেয়েছিল, বলেছিল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও কিন্তু তোমার ছেলেই নাকি লজ্জায় আসতে চায় নি। তখন রতনের বর—', কনককে প্রায় দেখিয়েই তার দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টিপল মহাশ্বেতা, 'ঐ যে কী বাবু, তার যেন কোন্ দেশে জমিদারি আছে, কী যেন

BanglaBook.org

বেশ বললে বাপু নামটা তোমার জামাই— কী যেন আরাম না কি— হ্যাঁ আরমবাগ অঞ্চল বলে কী এক জায়গা আছে, খুব নাকি দূরও নয় জায়গাটা এখান থেকে— সেইখানেই পাঠিয়েছে। ওদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়েই ইস্কুল আছে, ওদের কাছারিবাড়িতে থাকবে আর সেই ইস্কুলে পড়বে এ-বছরটা। তারপর এ বছর যদি ঐ মাঝারি এগ্‌জামিনে পাস করতে পারে, তখন আসবে আবার এখানে।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে পেরে একবার যেন বিজয়গর্বে চারিদিক চেয়ে নিল সে।

শ্যামা আরও স্তম্ভিত হয়ে যান। 'আরামবাগ! সে তো শুনেছি হুগলি জেলায়। আমাদের এঁদের ক-ঘর শিষ্য ছিল সেখানে— শাশুড়ীর মুখে শুনেছি। সে তো একেবারে ম্যালেরিয়ার ডিপো, যেসব শিষ্যরা ছিল কেউ টিকতে পারে নি— একধার থেকে মরে হেজে গিয়ে সব পালিয়েছিল ঘরবাড়ি ছেড়ে। সেইখানে পাঠিয়েছে আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে! কী আস্পদ্দা তাদের। কেন পাঠায়, কার হুকুমে পাঠায় তাই শুনি। আমাদের একবার জিজ্ঞেস নেই বাদ নেই—খবর করা নেই, ড্যাং করে পাঠিয়ে দিলে! বাঃ, বেশ তো!'

মহা এবার একটু বিরক্তই হয়ে ওঠে, 'তা বাপু একযাই তাদের দোষ দিচ্ছ কনে! তোমার ছেলে তোমাদের কাছে আসতে না চেয়ে থাকে, খবর দিতে না দিয়ে থাকে তো তারা কি করবে! ঐখানে বসিয়ে রেখে দেবে ছেলেকে আরও মাথাটি বেশি করে চিবিয়ে খাবার জন্যে! এখানে থেকে নষ্ট হয়ে যেত, ভালই তো করেছে দূরদেশে পাড়াগাঁয়ে পাঠিয়ে। কী এমন অন্যায়টা করেছে তা তো বুঝলুম না। ম্যালেরিয়া— বলি সে গাঁয়ে কি সবাই ম্যালেরিয়ায় উজ্জুড় উঠে যাচ্ছে ফী বছর? তাহ'লে গাঁয়ে লোক আছে কি ক'রে, ইস্কুলটা চলছে কী করে? পড়ছে কে?'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তা বেশ তো, তোমাদের পছন্দ না হয়, আনিয়ে নাও না। এ তো আর জোর-জবরদস্তির কথা নয়। তোমার বড় ছেলেকে পাঠাও, ঠিকানা নাও, চিঠি লেখ কিম্বা কেউ গিয়ে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এসো। এ তো তোমাদেরই করবার কথা। তোমরা কেউ খবর রাখ নি— তোমার জামাই ওপযাচক হয়ে খবরটা দিয়ে তো আর এমন কিছু অন্যায় করে নি যে, সেই থেকে আমার ওপর টাঁইশ করছ! আমারই ঘাট হয়েছিল বলতে আসা, শুনেছিলুম, চুপ করে বসে থাকলেই হত।'

অভিমানে মহাশ্বেতার গলা ভারী হয়ে আসে।

কিন্তু শ্যামা আরও বিরক্ত হন। বোধ করি অন্তরের সেই বিষটা প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়ায় গলার মধ্যে।

'তুই থাম্ বাপু! কাকে বলছি কী বলছি তা কিছু ভাল ক'রে না শুনে না বুঝে তুই আর গ্যাজোর গ্যাজোর করিস নি। তোকে বলছি, না জামাইকে বলছি? আর তোরও তো ভাই— নাকি তোর পর? আমরা ওদের চিনতুম? ওদের দেখালে কে— জামাই দেখিয়েছেন তো! তোরা খবর রাখবি খবর দিবি—এ এমন আর বড় কথা কি?'

'ঘাট হয়েছিল— হ্যাঁ সেটা স্বীকার করছি একশো বার—ঘাট হয়েছিল তার, তোমাদের ওপকার করতে আসা কি ওখানে ছেলে রেখে আসা। তার যে স্বভাব এই— এত জায়গায় এত খোয়ার হয় তবু ওপকার করতে যাওয়া চাই!.... তা অন্যায় হয়ে গেছে মানছি আমি — এখন কী করবে করো। জামাইকে ধরে ফাঁসি দেবে না শূলে দেবে— যাতে তোমাদের মন ওঠে তাই করো— আমি আর কী বলব!'

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না, যুক্তির কোন মূল্যই নেই এর কাছে। মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে এই এক নূতন উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে উঠে শ্যামা বলেন, 'আচ্ছা হয়েছে— সে

BanglaBook.org

যা করবার জামাইয়ের সঙ্গে বোঝাপাড়া করব এখন। তুই এখন সরে যা দিকি সামনে থেকে—'

'তাই যাচ্ছি। একেবারেই যাচ্ছি। থাকতে আসিও নি। ঐ যে বলে না, মনের গুণে ধন। তা তোমারও তাই, মনটা ভাল নয় বলেই যাতে হাত দাও বিষ হয়ে যায়। তুমি নেমোখারাম বলে তোমার ছেলেও তাই হয়েছে!'

সে উঠে হন হন করে বাড়ির পথ ধরল। কনক হাত ধরে টেনে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল একবার, তার হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

'না ভাই খুব শিক্ষা হয়েছে। জীবনভোরই শিক্ষা পাচ্ছি— তবু মন তো মানে না। তবে এবার এই শেষ, জন্মের শেষ!'

চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল সে।

ওর এ জন্মের শেষ এবার নিয়ে অনেক বারই হয়েছে। সম্ভবত কালই আবার ছুটে আসবে ও— তেমন লাগ-সই কোন কথা থাকলে। সুতরাং মহাশ্বেতার চলে যাওয়া নিয়ে কোন চিন্তা নেই শ্যামার। তিনি আড়ষ্ট হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন— কান্তির কথাটা।

তাঁর গর্ভের শ্রেষ্ঠ সন্তান— গর্ব করার মতো ছেলে কান্তি। রূপের তো তুলনাই নেই, মেয়েদের মধ্যে ঐন্দ্রিলা, ছেলেদের মধ্যে কান্তি। কিন্তু ঐন্দ্রিলার গুণ নেই— এর তাও আছে। ঐন্দ্রিলা সুযোগ পেয়েও লেখাপড়া শেখে নি— এ সুযোগ না পেয়েও লেখাপড়ার জন্য পাগল ছিল।

শান্ত বিনয়ী ভদ্র। যেমন মিষ্টভাষী তেমনি সৎ।

মিথ্যা কথা পর্যন্ত কখনও বলতে পারে না।

সেই ছেলে এমন হয়ে গেল! এত বকে গেল!

এমন নষ্ট হয়ে গেল যে আর কোন পদার্থ রইল না!

কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা।

আর এই ক-মাসের মধ্যে! এই তো মনে হচ্ছে সেদিন এসে প্রাইজের বইগুলো রেখে গেল।

শ্যামাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন পদ্মগ্রামে—মঙ্গলা দেখে কত খুশি হলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

সৎপরামর্শও দিয়েছিলেন একটা। সেদিন তাঁর পরামর্শটা শুনলেই ভাল হত।

প্রস্তাবটা একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্যামা।

মঙ্গলা বলেছিলেন, 'তোমাদের পাড়ায় মল্লিকদেরই এক জ্ঞাতি পশ্চিমে থাকে শুনেছি। অগাধ সম্পত্তি করেছে— এক মেয়ে। ঘরজামাই করবার জন্যে সোন্দর ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছেলেমানুষ বর চাই— শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। বিষয়-আশয় কারবার দেখতে পারে এমন ভাল ছেলের দিকেই ঝোঁক। দ্যাখ— তুই বলিস তো আমি খোঁজখবর করি। এমন ফুটফুটে শান্তশিষ্ট ছেলে পেলে লুফে নেবে।'

'হ্যাঁ, মার যেমন কথা! বুড়ো হয়ে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা।... এই ছেলের ওপরই আমার ভরসা—একে বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকব! আর ঘরজামাইতে বড্ড ঘেন্না মা আমার চিরকালের। না,না, সে হয় না।'

'দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস। সত্যিই আমি বড্ড বুড়ো হয়েছি রে-আর বেশি দিন নেই।... তবে দিলে ভাল করতিস বামনী,—এমন ডবকা ছেলে শহরে রেখে দিয়েছিস—ফেরৎ পেলে হয়!"

সেই শেষ কান্তি এসেছিল! হ্যাঁ—মধ্যে আর একদিন এসেছিল, বিজয়ার দিন। তাও পুরো একটা দিনও থাকে নি। সন্ধ্যায় এসেছিল ভোরে চলে গেছে।

BanglaBook.org

মঙ্গলা ঠাকরুণের আশঙ্কা যে হাতে হাতে ফলবে—তা কে জান্‌ত। তাহ'লে কি আর ছেড়ে দিতেন!

মঙ্গলা চিরদিন তাঁদের মঙ্গলই করেছেন এটা ঠিক। রাগারাগি ঝগড়া যে হয় নি তা নয়—কিন্তু আজ ঠাণ্ডা মাথায় শ্যামা ভেবে দেখেন যে, দোষ তাঁদেরই বেশি ছিল। এতটা যে সহ্য করেছেন ওঁরা এই আশ্চর্য। এখনকার দিনের মানুষ হ'লে সহ্য করত না। কী অন্যায় না করেছে তাঁর স্বামী—ব্রাহ্মণ যদি অভিসম্পাত দিয়ে চলে যায়—এই ভয়ে সব সহ্য করেছেন ওঁরা। মহাশ্বেতার বিয়ে, ঐন্দ্রিলার বিয়ে, তরুর বিয়ে পর্যন্ত—সবই মঙ্গলার যোগাযোগে হয়েছে। চিরদিনের উপকারী মানুষ।

খুব উচিত ছিল শ্যামার—মঙ্গলার কথা শোনা, অন্তত সতর্ক হওয়া!

বিষয়ী কায়স্থ পরিবারের মেয়ে, বিষয়ী কায়স্থ পরিবারের বধূ—বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ির মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত। ভূয়োদর্শী স্ত্রীলোক মঙ্গলা—তাতেও সন্দেহ নেই। অনেক দেখেছেন জীবনে, অনেক বেশি মানুষ চেনেন। তাঁর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি।

আসলে কান্তির যে ঠিক এতটা বয়স হয়ে গেছে, সত্যিই ডব্‌কা হয়ে উঠেছে—সেইটেই খেয়াল হয় নি শ্যামার। অনেক বেশি বয়সে পড়াশুনো শুরুই করেছে কান্তি—সুতরাং বয়স হয়েছে বৈকি!

বকে যাবার তো এ-ই বয়স!

তাঁর ছেলে, তাঁর তাই নজরে পড়ে নি! ছেলে কবে বড় হয়ে যায় মা তা বুঝতে পারে না—পরের নজরে ঠিক পড়ে। মঙ্গলা ঠিকই ধরেছেন।

তাছাড়া তাঁর মা একটা কথা বলতেন, 'আকরে টানে!' যে আকর থেকে বেরিয়েছে তার কিছু প্রভাব থাকবেই। ছেলের জন্মদাতা যে কী ছিলেন—সেটাও মনে রাখা উচিত ছিল শ্যামার।....

ছুঁচ সুতো হাতে নিয়ে কাঁথার কাপড় সাজিয়েই বসে থাকেন শ্যামা—সেলাই করা আর হয় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে ক্রমশ। কনক সন্ধ্যা দিতে চলে যায়—তবু শ্যামা বসে থাকেন। তাঁর এখনও কাপড় কাচা হয় নি—বাগানের অনেক কাজ বাকি রইল, সন্ধ্যাহ্নিক আছে—এসব কিছুই মনে পড়ে না তাঁর। বসেই থাকেন চুপ ক'রে।

কত ছেলে তো দস্তুরমতো বকে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে। আবার ভাল হয়ে পড়াশুনো ক'রে মানুষ হয়। কান্তি কি পারবে সামলে নিতে নিজেকে। আবার কি ফিরে পাবেন তাঁর ছেলেকে! তাঁর সেই ছেলে—তাঁর আশা ভরসা, তাঁর গর্ব!

কে জানে সত্যিই বকে গেছে কিনা, গেলেও ঠিক কতটা গেছে! কিছুই যে জানতে পারছেন না এখনও। হেম কাল না গেলে কিছু জানাও যাবে না। এই দীর্ঘ সময়টা কী ক'রে অপেক্ষা করবেন, এই ভেবেই ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকেন শ্যামা।

॥ ৩ ॥

হেমও কথাটা শুনে ঘুমোতে পারে না সারারাত। আশ্চর্য, কালই বড় বৌদি কথাটা বলেছে। কনকও বলেছিল তবে অতটা জোর দেয় নি। বোধ হয় সাহস করে নি দিতে। এখনও কনক তার কাছে অনেকটা ভয়ে ভয়ে থাকে। কোন কিছুই জোর ক'রে বলতে পারে না এখনও।

কথাটা সে স্বীকার করে কনকের কাছেও।

'তুমিও বলছিলে, পরশু বড় বৌদিও খুব যাচ্ছেতাই করলেন। তাঁকে বলেই ছিলুম শনিবার যাব। তাঁর মুখেই খবর পেলুম যে ম্যাট্রিক এগ্‌জামিন কবে হয়ে চুকে বুকে গেছে।

BanglaBook.org

তাইতেই তো প্রথম ভাবনা ধরেছিল। তাই বলে যে এমনটা হবে— ইস, এ কখনও ভাবতেও পারি নি।'

কনক কোন কথা বলে না। নীরবে বসে ওর পা টিপতে থাকে।

তার বুদ্ধি বা তার দূরদর্শিতা যে বড় বৌয়ের থেকে কম নয়—এটায় বেশি জোর দেওয়া ঠিক হবে না—এসব জয়লাভ শান্ত সংযত হয়ে উপভোগ করতে হয়, কচলে তেতো করতে নেই।

তাছাড়া সে জানে যে, হেম তার সব ভাই-বোনকেই মনে মনে ভালবাসে। জীবনের বহু দুর্যোগ বহু ঝড়ঝাপ্‌টা বহু কষ্ট সহ্য করেছে সে, বহুদিন উপবাস গেছে তার জীবনে— এখনও জলখাবারের কথা সে ভাবতেই পারে না— সুতরাং বাহ্য রুক্ষতা তার স্বাভাবিক। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করেছে বলেই হয়ত ভাই-বোনদের সকলের ওপরই তার টান আছে।

শুধু স্নেহ নয়— এই ভাইটি সম্বন্ধে অনেক আশা, অনেক গর্বও ছিল হেমের।

সেটা নানা কথার ফাঁকে, নানা লোকের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখেছে কনক।

সুতরাং আঘাতটা যে কতটা বেজেছে তার, তা সে জানে। এসময়ে নিজের কথা বলে বিরক্ত করতে নেই।

অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হয় হেমের— কনক এখনও বসে বসে পা টিপেই যাচ্ছে।

'তুমি শোও, শোও। সারারাত বসে থাকবে নাকি!'

'শুচ্ছি, তুমি ঘুমোও।' মৃদুকণ্ঠে বলে কনক।

'পাগল। আমার ঘুম আসতে আজ অনেক দেরি। তোমার খাটা-খাটুনি যায় সারাটা দিন, তুমি শুয়ে পড়।'

'খাটা-খাটুনিটা তোমার হয় না বুঝি!' একটু হেসে বলে কনক।

যতটা বলেছে হেম তাইতেই সে কৃতার্থ। এর জন্যে সারারাত বসে পা টিপতেও সে রাজি।

'হ্যাঁ, আমাদের খাটুনি তো কাগজ-কলম নিয়ে! বসে বসে কাজ। মাথার খাটুনি। নাও নাও, তুমি শুয়ে পড়।'

আজ এই প্রথম, হাত ধরে তাকে জোর করে শুইয়ে দেয় হেম।

কিন্তু কনকেরও ঘুম আসে না আজ। এই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার উত্তেজনা তো আছেই। কিন্তু তা ছাড়াও, সেও ভাবছিল কান্তিরই কথা।

ভাল হয় নি, কাজটা ভাল হয় নি এদের— অমন জায়গায়, অমন পাড়ায় রেখে আসা।

এরা এখনও ভাবে যে কনক রতনের পূর্ণ পরিচয় জানে না। হয়ত আভাসে ইঙ্গিতে কিছু বুঝেছে, তবু সবটা নিশ্চয়ই শোনে নি। তাই এরা প্রাণ খুলে ওর সামনে আলোচনা করতে পারে না। হেমও পারছে না তাই— নইলে, সব কথা খোলাখুলি বলতে পারলে বোধ হয় হাল্‌কা হ'ত ওর মন। ঐ বিশ্বাসটা ওদের আছে জানে বলেই কনক চুপ করে আছে— নইলে কথাটা সেও তুলতে পারত।

কী দরকার মিছিমিছি ওদের অপ্রস্তুত করে।

সবই জানে কনক, ঐন্দ্রিলা কিছুই বলতে বাকি রাখে নি।

আরও বলেছে সে অভয়পদদের সম্বন্ধে তার একটা বিজাতীয় আক্রোশ আছে বলেই। ওদের কেলেঙ্কারি বলতে বলতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যথার্থ আনন্দ পায়।

বোধ হয় বোনের সুখের সংসার বলেই তার এই আক্রোশ।

রতন অভয়পদদের মামাতো বোন্। সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেইটাই তার সম্পূর্ণ পরিচয়ও নয়। দেবার মতো পরিচয় আর নেই তার। তাই এরাও দেয় না কারও কাছে।

BanglaBook.org

ওর প্রসঙ্গই তোলে না, একেবারে চুপ করে থাকে। ক্রিয়া-কর্মে তাকে নিমন্ত্রণ করে পাওনার লোভে, সে আসবে না জেনে নিশ্চিন্ত হয়েই করে। লোক পাঠিয়ে লৌকিকতা করে সে— এরা বলে, 'ও আমাদের এক আত্মীয়।' নামটাও করে না।

সেও অবশ্য এখানে আসে না। খোঁজ-খবরও করে না। কোন আত্মীয়-সমাজেই যায় না সে।

এরা কিন্তু যায় মধ্যে মধ্যে। বেশির ভাগ অম্বিকাই যায়।

তার কারণ রতনের নাকি অগাধ পয়সা। তাই সব মান-মর্যাদা খুইয়েও সম্পর্কটা এরা ধরে আছে এখনও।

সে সম্পর্কের সূত্রেই অভয়পদ ছেলেটাকে দিয়ে এসেছিল তার বাড়ি।

এত বুদ্ধি অভয়পদর, সে এ কাজটা কেন করল আজও ভেবে পায় না কনক।

কে জানে কী বুঝেছিল সে। কনক অন্তত আজও বুঝতে পারে না এর যুক্তি। রতনের বিবরণ শুনে ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় ছেলেটা সম্বন্ধেই। কাজটা ভাল হয় নি—নিজের মনে বার বারই বলেছে— উচিত হয় নি ওখানে দিয়ে আসা— কিম্বা এতদিন ফেলে রাখা। কোনমতেই উচিত হয় নি।

বিশেষত ঐ লোকটা, অভয়পদর মামা এখনও জীবিত! ঐ বাড়িতেই বাস করে।

স্বার্থপরতার এমন কুৎসিত দৃষ্টান্ত উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে কিছুতে রাখা ঠিক নয়— মূর্খ হলেও কনক এটা বোঝে।

ছি ছি! ঐ কি মানুষের কাজ! একি মানুষ পারে!

বিশ্বাস করেনি কনক। উড়িয়ে দিয়েছিল সে, বাজে কথা বলে।

ঐন্দ্রিলা তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, 'মাইরি বলছি, এই তোমার দিব্যি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ওরা মনে করে কেউ জানে না, চেপে চেপে রাখে কিন্তু জানতে কার বাকি আছে এ কেলেঙ্কার। বলি এ চত্বরে যত বামুন সবাই ওদের জানে, আত্মীয়গুষ্টি তো কম নয় ওদের। দাদাবাবুর যে বোনের বিয়ে হয়েছে— তারাও যে আবার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি হয় ওর মামার। তারা কোন সম্পর্ক রাখে না ওদের সঙ্গে। কেউ নাম করলে সকলের সামনে থুতু ফেলে। এরাই গিয়ে পাত চাটেন। পয়সার চেয়ে বড় এদের কিছু নেই!'

তবু যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

গরিব অনেকেই থাকে! তাই বলে অমানুষ হবে! এ তো রাক্ষসের কাজ। তারাও বোধহয় নিজের সন্তানের সর্বনাশ করে না!

ঐন্দ্রিলা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'আসলে লোকটা কুড়ে মড়া। কোন্ ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করত— খোলার ঘরে থাকত। তাও নাকি এগারো না বারো টাকা মাইনে ছিল, কাজে ফাঁকি দিত বলে অত বছর কাজ করেও মাইনে বাড়ে নি। আদ্ধেক দিন খেতে পেত না, দৈন্যদশা একেবারে। কিন্তু রূপটা ছিল খুব মিন্‌সের। দাদাবাবুর মাকে দেখে বুঝবে না, তাছাড়া সহোদর ভাই তো নয় খুড়তুতো বা জাঠতুতো নাকি মামাতো— ঠিক জানি না। তবে নিজের নয় শুনেছি। মিন্‌সের রূপই পেয়েছিল মেয়ে দুটো। খোলার ঘরে অত রূপ—সে কি চাপা থাকে। শিগ্‌গিরই পেছনে লোক লাগল। তখন ওর মোটে বুঝি তেরো বছর বয়স। মিন্‌সে পেয়ে গেল দাঁও! মোটা টাকা হেঁকে বসল— ব্যাস আর কি, ঢালাও কারবার। খোলার ঘর থেকে বড় বাড়িতে এসে উঠল। শুয়ে থাকে দিনরাত আর নভেল পড়ে। ভালমন্দ খাবার, ভাল ভাল পান তামাক। ওর মামীটা ছিল সতীলক্ষ্মী— সে মনের ঘেন্নায় পাগলের মতো হয়ে গেছল। বলতে গেলে না খেয়ে মর্ল সে!'

'তিনি মারা গেছেন?' অভিভূত কনক প্রশ্ন করেছিল।

'হ্যাঁ— মরে জুড়িয়েছে সে! রতনের যে প্রথম বাবু ছিল সে ছিল খুব ভাল, স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকত। সে মরতে না মরতে মিন্‌সে আর একটি জুটিয়ে দিলে গা! মেয়েটাকে প্রাণভরে কাঁদতে পর্যন্ত দিল না। এ নাকি মহা বদমাইশ— দুর্দান্ত মাতাল, মেয়েটাকে পর্যন্ত মাতাল করে দিয়েছে! ছিঃ ছিঃ কানে শোনাও পাপ, ভদ্রলোক বামুনের বংশ—মেয়ে বেচে খাচ্ছিস।'

তা ওর আর একটি বোন?'

'সে খুব সেয়ানা। সে দুদিনেই বাপকে বুঝে নিলে। সে বললে, তুমি বাপ হয়ে তোমার স্বার্থ দেখলে যখন— আমাদের দিকে চাইলে না, তখন তোমার কথাই বা আমরা ভাবব কেন? নিজেকে বেচে যখন খেতে হবে, তখন তোমার এন্তাজারিতেই বা থাকব কিসের জন্যে। সে আলাদা থাকে। বাপকে এক পয়সা তো দেয়ই না— বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। সে এর মধ্যে নাকি তিন-চারখানা বাড়ি করে ফেলেছে কলকাতায়। কারও সঙ্গে সম্পক্ক রাখে না সে। এঁরা তো গিছলেন কুটুম্বিতে ঝালাতে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, কিসের আত্মীয় তোমরা, বাবা যখন আমাদের সর্বনাশ করলে, তোমরা কেউ এসে দাঁড়িয়েছিলে? বাধা দিয়েছিলে? তোমরা নিয়ে গিয়ে যদি রাখতে তোমাদের কাছে, বিয়ে দিতে তো বুঝতুম আত্মীয়। এখন এসেছ পাপের পয়সায় ভাগ বসাতে! দূর হও, বেরোও।... এমনি তার কাটাকাটা কথা। জাঁহাবাজ মেয়ে সে— এর মতো ভালমানুষ বোকা নয়।'

এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়— ঐন্দ্রিলা দিব্যি গেলে বললেও সে বিশ্বাস করত না, যদি না এদের এতটা ঢাক ঢাক ভাব দেখত। এত চাপাচাপি এত লুকোনো কিসের জন্যে, যদি না এদের ভেতরে গলদ থাকে। এদের ব্যাপার দেখেই কথাটা ক্রমশ বিশ্বাস হয়েছে তার।

ছি ছি। অসৎ জায়গায় পড়ে অসৎ সংসর্গে ছেলেটা বুঝি বরবাদই হয়ে গেল।....

ঘুম হয় না কনকেরও। হেমও যে জেগে আছে তা সে বুঝতে পারে। তবু কথাও কয় না। নিথর হয়ে শুয়ে থাকে সে।

কথা কইলেই ঐ প্রসঙ্গ উঠবে, কী বলতে কী বলে ফেলবে সে। কনক সব জানে বুঝলে হয়ত দারুণ লজ্জা পাবে হেম। যতদিন না হেম নিজে থেকে বিশ্বাস করে সব কথা বলছে, ততদিন সেও জানতে দেবে না যে সবই জানে।

চুপ করে শুয়ে থাকার আরও কারণ আছে অবশ্য।

আর একট অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার। সেইটেই প্রাণপণে উপভোগ করছে সে।

মাথার দিকটা দক্ষিণ— এবং সেদিকে জানলাও আছে একটা, তবু রুজুরুজি বয় না বলে তেমন হাওয়া ঢোকে না। তার ওপর চালাঘর— জানলার ওপরই চালাটা পড়েছে এসে। গরমের সময় চাপা ভ্যাপ্‌সা গরম লাগে। অন্য দিন ঘুমিয়ে পড়ে হেম— অতটা টের পায় না। তাছাড়া এমনিতেও ঘাম তার কম।

কনকেরই গরম লাগে বেশি, সে ঘামেও খুব, কিন্তু এই ঘরেই শুয়ে শুয়ে সয়ে গেছে তার, ঘুম পেলে অনায়াসে ঘুমোতে পারে।

আজ হেমেরও গরম লেগেছে। অনেকক্ষণ পরে— কনক ঘুমিয়েছে ভেবেই সে উঠে চালের বাতা থেকে সন্তর্পণে পাখাটা টেনে নিয়েছে। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে টেনেছে সে— পাছে কনকের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আল্‌তো একবার তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে যে কনকও ঘামছে। তারপর থেকে এমনভাবে হাওয়া খাচ্ছে যাতে কনকেরও হাওয়াটা লাগে ভালভাবে। মধ্যে মধ্যে শুধু কনকের দিকেও হাওয়া করছে।

BanglaBook.org

মসস্ত শরীর জুড়িয়ে গেছে কনকের। শুধু শরীর নয়, মনও।

বহুদিনের সঞ্চিত গুমোট গরমে লেগেছে স্বামীর স্নেহের বাতাস। তার আর কোন দুঃখ নেই।

আরামে চোখ জড়িয়ে আসারই কথা— কিন্তু চেষ্টা করেই জেগে রইল সে। পাছে এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়।....

ভোরবেলা রাজগঞ্জের কলে ভোঁ বাজতেই উঠে বসতে হয়।

তার উঠে বসার ধরন দেখেই হেমের সন্দেহ হয় যে সে জেগেছিল। সে বলে, 'ওকি, তুমি ঘুমোও নি!'

তখনও ভাল করে ভোর হয় নি, তেমন আলো হয় নি। তাই কনকের মুখটা দেখা গেল না। সুখে ও লজ্জায় সে মুখে কী অর্পূব রঙ লেগেছে তাও দেখতে পেল না হেম। কনক শুধু একটু হেসে স্বামীর হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।

'ওরে দুষ্ট মেয়ে! সারারাত মট্‌কা মেরে পড়ে থেকে আমার সেবা খাওয়া হল! এখন আবার লোক-দেখানো বাতাস করা হচ্ছে। থাক্। এখন ভোরাই হাওয়া উঠে গেছে আর দরকার নেই!.... আচ্ছা, ঐ গরমে অত ঘামের মধ্যে চুপ করে শুয়ে ছিলে কী করে!'

এবার কনক মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়, 'ও আমাদের সহ্য হয়ে যায়!'

'নমস্কার বাবা তোমাদের সহ্যতে। গায়ে হাত দিয়ে আমার তো মনে হল কে এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে তোমার গায়ে।'

তারপর অল্প কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ হেম বলে ওঠে, 'দ্যাখো আমি ভাবছি— এখান থেকে চেষ্টা করে কোথাও বদলি হয়ে যাই। এখন আমি বদলি হ'লে কোয়ার্টার পাবো। তুমি সুদ্দ গিয়ে থাকতে পারবে। এখান থেকে— এসব ঝামেলা থেকে দূরে কোথাও নিরিবিলি সংসার পাততে চাই। কী বলো?'

বদলি শব্দটা শুনেই নিমেষে বুকটা যেন হিম হয়ে গিয়েছিল, বুকের স্পন্দন গিয়েছিল থেমে। এত দুঃখের এত দীর্ঘ তপস্যার ফল হাতের কাছে এগিয়ে এসেও দূরে সরে যাবে, জীবনের সুধাপাত্র ওষ্ঠের সামনে থেকে যাবে ফিরে? আবার এক যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকার অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়বে সমস্ত ভবিষ্যৎ!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পরের কথাটায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস পড়তে শুরু হয়, আবার বুকের স্পন্দন অনুভব করে সে। বরং সে স্পন্দন যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে। দেহের লোমকূপগুলো পর্যন্ত যেন কী এক পুলকে রিন্‌রিন্ করতে থাকে। সে নিজেও টের পায় এক ঝলক উষ্ণ রক্ত যেন হৃদয়ের পাত্র উপ্‌চে মুখে এসে পড়ে।

ভাগ্যে ঘরে আলো নেই— নইলে এত আনন্দ কিছুতেই ঢাকতে পারত না সে হেমের কাছ থেকে। আর তার কাছে মনের এই গোপন সাধ, গোপন স্বপ্ন ধরা পড়ে গেলে বড় লজ্জার কারণ হত।

স্বপ্ন বৈকি!

শুধু সে আর হেম! কোন দূর দেশে গিয়ে নিরিবিলি নিভৃতে সংসার পাতবে। সে কি সত্যিই হবে কোন দিন? এ যে স্বপ্ন দেখতেও ভয় করেছে এতকাল। সুদূরতম অসম্ভব কল্পনার কথা এ সব!

মনে হল বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্বামী প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'সে তো ভালই!' অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে কনক (তবু সুখের এই বিপুল আবেগ কণ্ঠে কি প্রকাশ পায় না একটুও?)।—'কিন্তু মা? উনি তো এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে চাইবেন ন। ওর কাছে কাকে রাখবে? এক মেজদি— কিন্তু তার ওপর ভরসা করা যায় না একটুও!'

BanglaBook.org

'সেও ভাবছি। খোকাটাকে এনে রাখতে হবে আর কি! দেখি কী হয়। যাবো বললেই তো আর এখুনি যাওয়া হচ্ছে না, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে তার আগে। এমনি ভাবছিলুম কথাটা!'

আর কোন কথা বলার অবকাশ হয় না। ওঘরের দোর খোলার আওয়াজ হয়েছে, শ্যামা উঠে পড়েছেন। ঘাট থেকে ঘুরে এসেই রান্না চাপাবেন।

কনকও উঠে দোর খুলে ও-ঘরে চলে যায়। আঁচলটা পেতে ঠাণ্ডা মেঝেটায় শুয়ে পড়ে সে। শ্রান্তিতে ও শান্তিতে চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে তার—কিছুতেই যেন চেয়ে থাকতে পারছে না!

হেম ফিরলো গভীর রাত্রে। এরা সকলেই তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে।

তরু আর হারান হঠাৎ এসে পড়েছে বিকেলে— আজ থাকবে তারা। তরু অনেকদিন পরে বেশ হাসি-হাসি মুখেই এসেছিল, চাপা মেয়ে— তবু চোখে খুশির আভা স্পষ্ট। খুশির কারণটাও খুলে বলেছে সে কনককে এসেই। সতীন কদিন ধরে খুনসুটি করে করে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছিল, সেটা লক্ষ করে— তরু কিছু না বলতেই— আজ ওকে নিয়ে হারান এখানে চলে এসেছে, তাকে জব্দ করবার জন্যে।

কিন্তু এখানে এসে কথাটা শুনে তারও মুখ শুকিয়ে গেছে। হাজার হোক মার পেটের ভাই— তারই ঠিক পরের পিঠোপিঠি ভাই। মধ্যে একটা হয়ে নাকি মারা গেছে কিন্তু সে কথাটা বোঝবার মতো বয়স তখন ছিল না তরুর— একেই সে দেখেছে তার পরে। খেলা করেছে এর সঙ্গে। এর ওপর কত আশা-ভরসা মায়ের তাও সে জানে। সেও তাই জেগে বসে আছে খবরটা শোনবার জন্যে।

রাত হচ্ছে দেখে শ্যামার এক একবার মনে হচ্ছিল যে হেম বুঝি আজও তার বাঁধা সাপ্তাহিক আড্ডায় গেছে— সে সন্দেহ মুখেও প্রকাশ করেছিলেন একবার। কিন্তু কনক জানে যে তা নয়। সে একবার নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রতিবাদও করে ফেলল, 'আমার তো তা মনে হয় না মা তিনি জানেন যে এখানে সবাই ভাবছে!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল। মার সামনে কথাটা বলা ভাল হয় নি। বড় বেশি গিন্নোমো হয়ে পড়ল। শ্যামা একবার এ পাশ ফিরে চাইলেনও। অন্ধকারে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখা না গেলেও সেটা বেশ অনুভব করল কনক। অর্থাৎ বৌ তাঁর ছেলের খবর তাঁর চেয়ে বেশি রাখতে শুরু করেছে!

তা তিনি যা-ই মনে করুন— কনকের এটুকু বিশ্বাস আছে হেমের ওপর। আজ অন্তত আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করবে না সে— এটুকু দায়িত্বজ্ঞান তার আছে। খবরটাই ভাল নয় নিশ্চয়। আর সেই সম্পর্কিত কোন কারণেই এতটা রাত হচ্ছে।

হেম ফিরল দশটারও পর।

মুখ অন্ধকার করেই ফিরল সে। এরা তারই আসার অপেক্ষায় বসে আছে জেনেও সে কারও সঙ্গে কোন কথা কইল না, সোজা জুতো ছেড়ে নিজের ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

কোন রকম সম্ভাষণ পর্যন্ত না করে সটান ঘরে চলে যাওয়া তার পক্ষে নূতন কিছু নয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। সে জানে যে আজ তার মুখ থেকে খবর শোনবার জন্যই এরা অপেক্ষা করে আছে। তবুও কোন কথা না বলে ভেতরে চলে যাওয়ার কারণটা সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আছে।

কিন্তু কী সে দুঃসংবাদ? ঠিক কতটা খারাপ? সেটা-ও তো জানা দরকার।

প্রশ্নটা সকলের ঠোঁটের কাছে এসে নিঃশব্দে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। কেউই উঠতে পারল না কিন্তু। গিয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহসও নেই কারো।

BanglaBook.org

শ্যামা কোন কথাই বলতে পারছেন না। ঠোঁট দুটো বড় বেশি কাঁপছে তাঁর কথা কইবার চেষ্টা করলেই।

অনেকক্ষণ পরে কোনমতে বলেন শুধু, 'তুমি একবার যাও বৌমা!'

কনক ঘাড় নাড়ে।

'আপনিও চলুন মা। আমার ভরসা হচ্ছে না।'

তবুও যেন শ্যামা উঠতে পারেন না।

অথচ একজনের যাওয়াও দরকার। লোকটা সেই ভোরে বেরিয়ে এতক্ষণ পরে তেতেপুড়ে বাড়ি ফিরেছে। তারও একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দরকার।

তাছাড়া এ সংশয়ও সহ্য হচ্ছে না।

অগত্যা শ্যামাকেই উঠতে হয়। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি। প্রশ্ন করতে সাহস হয় না তখনও।

হেম এসে জামা-কাপড় সুদ্ধই শুয়ে পড়েছিল। এদের দেখে এবার উঠে বসল।

তাকে কোন প্রশ্নও করতে হল না। নিজে থেকেই সে জানাল সব কথা।

কিন্তু জানাবারও বিশেষ কিছু ছিল না।

তার বক্তব্য থেকে এইটুকুই শুধু জানা গেল যে সে বিশেষ কিছুই জানতে পারে নি।

রতন দেখা করে নি তার সঙ্গে। রতনের নাকি শরীর খারাপ— দেখা করা সম্ভব নয়। মোক্ষদা এসে বলেছে যা কিছু। হ্যাঁ, পরীক্ষায় ফল একেবারেই ভাল হয় নি তাই এসব সংসর্গ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মনিব। কোন্ দেশ, কী ঠিকানা এমন কি কোন্ ইস্কুলে পড়ছে তাও বলতে পারবে না সে। ঠিকানা নাকি রতনও জানে না। তাকে এ নিয়ে বিরক্ত করেও লাভ নেই। বাবু এলে সে ঠিকানা জেনে রাখতে পারে। কিন্তু বাবুও এখন কলকাতায় নেই— তিনি বাঙ্গাল দেশে কোথায় গেছেন একটা বড় মকদ্দমা নিয়ে— ফিরতে আরও দশ বারো দিন দেরি হবে।

এ ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নি। বহু জেরা, এমন কি অনেক অনুনয় বিনয় করেও নয়। এমন ব্যবহার এর আগে আর কখনও করে নি ওরা। হেম যখনই গেছে, ওপরে ডেকে পাঠিয়েছে রতন। চা জলখাবার খাইয়েছে জোর করে। আজ এমন ভাব দেখাল মোক্ষদা, যেন সে কোন অবাঞ্ছিত অনুগ্রহপ্রার্থী, অকারণে উত্যক্ত করতে গেছে। রতনের বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল হেম— তাও পারে নি। মোক্ষদা বলেছে, বাবুর শরীর ভাল নয়, আর মেজাজ তো জানেনেই কী রকম—ও দেখা না করাই ভাল। তাছাড়া তিনি তো জানেও না কিছু। এ সব ঝামেলা ভালবাসে না তিনি মোটে!'

এর পর আর কি বলবে হেম। চলেই এসেছে।

আসার মুখে সে একেবারে মহাঁদের বাড়ি হয়ে এসেছে।

অভয়পদকে জানিয়ে এসেছে সব কথা। তাকেই বলে এসেছে হেম— একদিন গিয়ে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে। তার আর যাবার ইচ্ছে নেই। ভালও দেখায় না। অভয়পদ অবশ্য এক কথাতেই রাজি হয়েছে। সব কথা শুনে সেও খুব দুঃখিত, লজ্জাও পেয়েছে একটু। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে পারবে না সে। কোমরে প্রকাণ্ড একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। জ্বরও হয়েছে তার তাড়সে— ফোড়াটা না ভাল হলে যেতে পারবে না।

তার মানে এখনও অন্তত সাত-আট দিন না গেলে কোন খবরই পাওয়া যাবে না।

কী আর বলবেন শ্যামা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

তাঁর আজকাল আর দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে না, এক এক সময় নিজেই ভাবেন—ভেতরটা কি তাঁর পাথর হয়ে গেল নাকি?

BanglaBook.org

'সেও ভাবছি। খোকাটাকে এনে রাখতে হবে আর কি! দেখি কী হয়। যাবো বললেই তো আর এখুনি যাওয়া হচ্ছে না, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে তার আগে। এমনি ভাবছিলুম কথাটা!'

আর কোন কথা বলার অবকাশ হয় না। ওঘরের দোর খোলার আওয়াজ হয়েছে, শ্যামা উঠে পড়েছেন। ঘাট থেকে ঘুরে এসেই রান্না চাপাবেন।

কনকও উঠে দোর খুলে ও-ঘরে চলে যায়। আঁচলটা পেতে ঠাণ্ডা মেঝেটায় শুয়ে পড়ে সে। শ্রান্তিতে ও শান্তিতে চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে তার—কিছুতেই যেন চেয়ে থাকতে পারছে না!

হেম ফিরলো গভীর রাত্রে। এরা সকলেই তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে।

তরু আর হারান হঠাৎ এসে পড়েছে বিকেলে— আজ থাকবে তারা। তরু অনেকদিন পরে বেশ হাসি-হাসি মুখেই এসেছিল, চাপা মেয়ে— তবু চোখে খুশির আভা স্পষ্ট। খুশির কারণটাও খুলে বলেছে সে কনককে এসেই। সতীন কদিন ধরে খুনসুটি করে করে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছিল, সেটা লক্ষ করে— তরু কিছু না বলতেই— আজ ওকে নিয়ে হারান এখানে চলে এসেছে, তাকে জব্দ করবার জন্যে।

কিন্তু এখানে এসে কথাটা শুনে তারও মুখ শুকিয়ে গেছে। হাজার হোক মার পেটের ভাই— তারই ঠিক পরের পিঠোপিঠি ভাই। মধ্যে একটা হয়ে নাকি মারা গেছে কিন্তু সে কথাটা বোঝবার মতো বয়স তখন ছিল না তরুর— একেই সে দেখেছে তার পরে। খেলা করেছে এর সঙ্গে। এর ওপর কত আশা-ভরসা মায়ের তাও সে জানে। সেও তাই জেগে বসে আছে খবরটা শোনবার জন্যে।

রাত হচ্ছে দেখে শ্যামার এক একবার মনে হচ্ছিল যে হেম বুঝি আজও তার বাঁধা সাপ্তাহিক আড্ডায় গেছে— সে সন্দেহ মুখেও প্রকাশ করেছিলেন একবার। কিন্তু কনক জানে যে তা নয়। সে একবার নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রতিবাদও করে ফেলল, 'আমার তো তা মনে হয় না মা তিনি জানেন যে এখানে সবাই ভাবছে!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল। মার সামনে কথাটা বলা ভাল হয় নি। বড় বেশি গিন্নোমো হয়ে পড়ল। শ্যামা একবার এ পাশ ফিরে চাইলেনও। অন্ধকারে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখা না গেলেও সেটা বেশ অনুভব করল কনক। অর্থাৎ বৌ তাঁর ছেলের খবর তাঁর চেয়ে বেশি রাখতে শুরু করেছে!

তা তিনি যা-ই মনে করুন— কনকের এটুকু বিশ্বাস আছে হেমের ওপর। আজ অন্তত আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করবে না সে— এটুকু দায়িত্বজ্ঞান তার আছে। খবরটাই ভাল নয় নিশ্চয়। আর সেই সম্পর্কিত কোন কারণেই এতটা রাত হচ্ছে।

হেম ফিরল দশটারও পর।

মুখ অন্ধকার করেই ফিরল সে। এরা তারই আসার অপেক্ষায় বসে আছে জেনেও সে কারও সঙ্গে কোন কথা কইল না, সোজা জুতো ছেড়ে নিজের ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

কোন রকম সম্ভাষণ পর্যন্ত না করে সটান ঘরে চলে যাওয়া তার পক্ষে নূতন কিছু নয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। সে জানে যে আজ তার মুখ থেকে খবর শোনবার জন্যই এরা অপেক্ষা করে আছে। তবুও কোন কথা না বলে ভেতরে চলে যাওয়ার কারণটা সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আছে।

কিন্তু কী সে দুঃসংবাদ? ঠিক কতটা খারাপ? সেটা-ও তো জানা দরকার।

প্রশ্নটা সকলের ঠোঁটের কাছে এসে নিঃশব্দে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। কেউই উঠতে পারল না কিন্তু। গিয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহসও নেই কারো।

BanglaBook.org

শ্যামা কোন কথাই বলতে পারছেন না। ঠোঁট দুটো বড় বেশি কাঁপছে তাঁর কথা কইবার চেষ্টা করলেই।

অনেকক্ষণ পরে কোনমতে বলেন শুধু, 'তুমি একবার যাও বৌমা!'

কনক ঘাড় নাড়ে।

'আপনিও চলুন মা। আমার ভরসা হচ্ছে না।'

তবুও যেন শ্যামা উঠতে পারেন না।

অথচ একজনের যাওয়াও দরকার। লোকটা সেই ভোরে বেরিয়ে এতক্ষণ পরে তেতেপুড়ে বাড়ি ফিরেছে। তারও একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দরকার।

তাছাড়া এ সংশয়ও সহ্য হচ্ছে না।

অগত্যা শ্যামাকেই উঠতে হয়। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি। প্রশ্ন করতে সাহস হয় না তখনও।

হেম এসে জামা-কাপড় সুদ্ধই শুয়ে পড়েছিল। এদের দেখে এবার উঠে বসল।

তাকে কোন প্রশ্নও করতে হল না। নিজে থেকেই সে জানাল সব কথা।

কিন্তু জানাবারও বিশেষ কিছু ছিল না।

তার বক্তব্য থেকে এইটুকুই শুধু জানা গেল যে সে বিশেষ কিছুই জানতে পারে নি।

রতন দেখা করে নি তার সঙ্গে। রতনের নাকি শরীর খারাপ— দেখা করা সম্ভব নয়। মোক্ষদা এসে বলেছে যা কিছু। হ্যাঁ, পরীক্ষায় ফল একেবারেই ভাল হয় নি তাই এসব সংসর্গ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মনিব। কোন্ দেশ, কী ঠিকানা এমন কি কোন্ ইস্কুলে পড়ছে তাও বলতে পারবে না সে। ঠিকানা নাকি রতনও জানে না। তাকে এ নিয়ে বিরক্ত করেও লাভ নেই। বাবু এলে সে ঠিকানা জেনে রাখতে পারে। কিন্তু বাবুও এখন কলকাতায় নেই— তিনি বাঙ্গাল দেশে কোথায় গেছেন একটা বড় মকদ্দমা নিয়ে— ফিরতে আরও দশ বারো দিন দেরি হবে।

এ ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নি। বহু জেরা, এমন কি অনেক অনুনয় বিনয় করেও নয়। এমন ব্যবহার এর আগে আর কখনও করে নি ওরা। হেম যখনই গেছে, ওপরে ডেকে পাঠিয়েছে রতন। চা জলখাবার খাইয়েছে জোর করে। আজ এমন ভাব দেখাল মোক্ষদা, যেন সে কোন অবাঞ্ছিত অনুগ্রহপ্রার্থী, অকারণে উত্ত্যক্ত করতে গেছে। রতনের বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল হেম— তাও পারে নি। মোক্ষদা বলেছে, বাবুর শরীর ভাল নয়, আর মেজাজ তো জানেনেই কী রকম—ও দেখা না করাই ভাল। তাছাড়া তিনি তো জানেও না কিছু। এ সব ঝামেলা ভালবাসে না তিনি মোটে!'

এর পর আর কি বলবে হেম। চলেই এসেছে।

আসার মুখে সে একেবারে মহাঁদের বাড়ি হয়ে এসেছে।

অভয়পদকে জানিয়ে এসেছে সব কথা। তাকেই বলে এসেছে হেম— একদিন গিয়ে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে। তার আর যাবার ইচ্ছে নেই। ভালও দেখায় না। অভয়পদ অবশ্য এক কথাতেই রাজি হয়েছে। সব কথা শুনে সেও খুব দুঃখিত, লজ্জাও পেয়েছে একটু। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে পারবে না সে। কোমরে প্রকাণ্ড একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। জ্বরও হয়েছে তার তাড়সে— ফোড়াটা না ভাল হলে যেতে পারবে না।

তার মানে এখনও অন্তত সাত-আট দিন না গেলে কোন খবরই পাওয়া যাবে না।

কী আর বলবেন শ্যামা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

তাঁর আজকাল আর দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে না, এক এক সময় নিজেই ভাবেন—ভেতরটা কি তাঁর পাথর হয়ে গেল নাকি?

BanglaBook.org

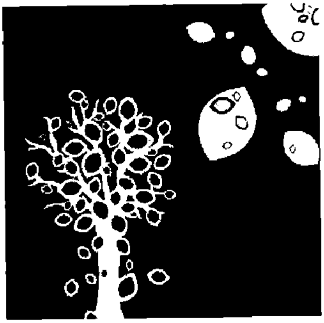

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অভয়পদ ভাল হয়ে উঠে ঠিকানা সংগ্রহ করার আগেই কান্তির কাছ থেকে একটা চিঠি এল। সম্ভবত রতনদের দিক থেকে কোন রকম তাড়া দেবারই ফল এটা। সামান্য চিঠি, তবে তারই হাতের লেখা বটে।

গোনা দুটি ছত্র লিখেছে সে, — 'আমি ভালই আছি, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।

চিঠির সঙ্গে ঠিকানাও আছে। আরামবাগ এলাকারই ছোট গ্রাম একটা। তারকেশ্বর লাইনের এক স্টেশন থেকে নেমে গোরুর গাড়ি করে যেতে হয়— বেশ খানিকটা পথ।'

ঠিকানা পাওয়ার আগে যতটা ব্যাকুলতা ছিল— পাওয়ার পর আর ততটা রইল না। এখন যেন সে অনেকটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে— ইচ্ছে করলেই আনিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং এখন আর তেমন দুশ্চিন্তা নেই।

কনক অবশ্য বলল, 'আপনি লিখেই দিন না আসতে। যা হবার এখানে এলে হবে। পড়াশুনো করতে চায়, এখানেও তো ইস্কুল আছে।'

শ্যামাও ভেবেছেন অনেক। তিনি বললেন, 'তা তো আছে কিন্তু সেখানে একগাদা খরচ-পত্তর করে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়, বইও কিনে দিয়েছে ওরা সব। এখানে এলে সে সমস্তই বরবাদ হবে। সেখানকার এক রকম বই, এখানে হয়ত অন্য রকম। একটা বছর নষ্ট হল, আবারও একটা বছর নষ্ট করব? খানিকটা পড়তে পড়তে চলে আসবে আধাখ্যাঁচড়া হয়ে— এখানে এসে যদি এখানের পড়া ধরতে না পারে? খরচও তো হবে একগাদা। ইস্কুলের মাইনে আছে, বই কেনা আছে। অত পেরে উঠব কেন? থাক্ কাদায় গুণ ফেলে এই ক'টা মাস, যা হয় হবে!'

তবু কনক একবার বলতে গেল, 'কিন্তু পাসের পড়া তো সব ইস্কুলেই এক রকম হয় শুনেছি মা!'

শ্যামা বললেন, 'না না। আমি হেমকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে বললে, মোটামুটি পড়াটা এক— কিন্তু বই আছে অনেক রকম। এক এক ইস্কুলে নাকি এক এক বই পড়ায়। যে ইস্কুলে ভর্তি হবে, সেই ইস্কুলের মতো বইও নাকি চাই। নইলে নাকি খুব মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে, রোজের পড়াটা পড়তে পারে না।'

প্রসঙ্গটা ঐখানেই চাপা পড়ে যায়।....

কনকের— কে জানে কেন— খুব ভাল লাগে না এঁদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু কিছু বলতেও পারে না সে। শাশুড়ীর কাছে জোর করে বা জেদ করে কিছু বলার সাহস তার নেই। বলতে পারত হয়ত হেমের কাছে— কিন্তু সেখানেও একটা বাধা দেখা দিয়েছে! বেশি বললে হেম মনে করতে পারে যে তার ভাইয়ের কল্যাণ-চিন্তার চেয়ে কনকের স্বার্থ-চিন্তাটাই বড় কথা এর মধ্যে। তার কারণ খুব সম্প্রতি, মাত্র দুদিন আগেই কথাটা উঠেছিল। হেমের বদলির কথা।

BanglaBook.org

হেম বলেছিল, 'এদিকে দ্যাখো না মজাটা। অন্য সময় কোন আর্জি জানালে ওপর-ওলাদের কাছে, কত অসুবিধে হয়—এখন বলতে না বলতেই তো মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে দেখছি। জামালপুরে নাকি লোক দরকার— কেউ নাকি যেতে রাজি হচ্ছে না। আমি বলতেই বড়বাবু লাফিয়ে উঠলেন একেবারে। বললেন— এক্ষুনি, এক্ষুনি। বল তো নতুন কোয়ার্টার ভাল দেখে দিয়ে দিচ্ছি ব্যবস্থা করে!'

'তারপর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে কনক।

'মুশকিল হয়ে গেছে যে। আমি এখন যাই কী ক'রে? কথাটা তুমি সেদিন ঠিকই তুলেছিলে। তখন অত ভাবি নি। কিন্তু এখন যত ভাবছি ততই দেখছি যে ঐ জন্যেই শেষ পর্যন্ত যাওয়া আটকাবে আমার। বাড়িতে কে থাকবে। খেঁদির ওপর তো কোন ভরসাই নেই। খোকাকে ওখান থেকে ইস্কুল ছাড়িয়ে আনতে গেলে সেখানের সব বই নষ্ট হবে, এখানে আবার নতুন করে কিনতে হবে। বছরের গোড়াতে হ'লে তবু এর-ওর কাছে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যায়— অন্তত কতকগুলো তো পাওয়া যায়ই— এখন আর কে দেবে? মা শুনলেই ক্ষেপে যাবে। তবু তো মা মনে করে সেখানের সব খরচাই মেসোমশাই দেন, মা তো অত জানে না যে আমিও কিছু কিছু দিই।.... সেও না হয় হল—কিন্তু অঘ্রাণ মাস না এলে কিছুই করা যাচ্ছে না দেখছি। একটা ক্লাসে উঠলে ছাড়িয়ে আনা অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। সেখানে ছোট মাসিরও অবশ্য খুব কষ্ট হবে, হাত-নুড়কুৎ হয়ে উঠেছিল তো খানিকটা!'

সেই সময়েই কনক বলেছিল কথাটা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি একেবারে না বলে দিয়েছ?'

'বলি নি এখনও, কিন্তু বলতেই তো হবে। উপায় কি বলো?'

'দুটো একটা দিন দ্যাখো না। ঠিকানাটা আসুক— যদি মেজ ঠাকুরপোকে এখানে আনানোই হয় তো—। তোমার অত ইচ্ছে বলেই বলছি।'

তাড়াতাড়ি যোগ করে সে শেষের কথাগুলো।

'হ্যাঁ—তাহ'লে তবু হয় বটে একটা উপায়। তবে তারও তো পাসের পড়া। তার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া—। সেও ভাবছি। দেখি। ওর খবর তো আসুক আগে।'

এই কথার পর কনকের তরফ থেকে তাকে আনানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলে একটা কদর্থ হওয়া স্বাভাবিক।

কী মনে করবে হেম। বড় বেশি লোভী আর স্বার্থপর ভাববে হয়ত। ছিঃ। সে ভাল নয়। ওদের ছেলে— ভাল-মন্দ ওরা না বোঝে, তারই বা এত দায় কি!'

তার বাইরে গিয়ে সংসার পাতার প্রশ্ন? সে না হয় আর কিছুদিন পরেই হবে। এত দিন যখন এখানে থাকতে পেরেছে, আরও কটা মাস অনায়াসে পারবে। তার সে-জন্যে অত তাড়াও নেই! স্বামীকে যদি পায় সে— সব কষ্টই সহ্য হবে তার। আর হেম তো বলেইছে, অঘ্রাণ মাসে খোকাকে আনানো যেতে পারে, সেই সময়ই বরং সুযোগ বুঝে কথাটা মনে করিয়ে দেবে একবার!

কিন্তু অঘ্রাণ মাসে আর কথাটা পাড়া যায় না।

অনির্দিষ্টকালের জন্যে চাপা পড়ে যায় কথাটা তার আগেই।

আশ্বিন মাসের গোড়াতেই ঐন্দ্রিলা চলে গেল।

তার চলে যাওয়া কিছু এমন অভিনব নয়, ওটা আজকাল বরং নিয়মিত হয়ে উঠেছে; দু-তিন মাস ওখানে— দু-তিন মাস এখানে, এই ভাবেই চলে। তাই এবারও, যাওয়ার সময় কিছুই বুঝতে পারেন নি শ্যামা। কোন সন্দেহও হয় নি তাঁর। বরং এখন দুটো-তিনটে মাস

Banglabook.org

অন্তত কলহ-কচকচির হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন—এই ভেবে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

খুব একটা কিছু নতুন রকমের অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটে নি।

যেমন হয়— ঝগড়াটা একদিন চরমে উঠলে মেয়ের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে আর গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে যায়— তেমনি গেছে। শুধু এবার একেবারে ভোর থেকেই আরম্ভ করেছিল বলে এক সময় হেম তেড়ে এসেছিল, 'চুপ করবি, না কি? এবার একদিন বুকে বসে সাঁড়াশি দিয়ে জিভ্ ছিঁড়ে বার করব— চিৎকার করা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব!'

এই! তারপরই তো সে অফিসে বেরিয়ে গেছে। ঐন্দ্রিলা চালিয়েছে দুপুর পর্যন্ত। আর হেমের তেড়ে আসাও একেবারে নতুন নয়। এর আগেও— তার সামনে খুব বাড়া-বাড়ি হলে— এমন তেড়ে এসেছে, গাল-মন্দও দিয়েছে।

সুতরাং অকস্মাৎ এ কাণ্ডর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্যামা আদৌ।

খবরটা পাওয়া গেল কদিন পরেই— ঠিক পূজোর মুখটাতে।

সেদিন বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠী।

খবর আনল— চিরকাল যে ভগ্নদূতের কাজ করছে— সেই মহাশ্বেতাই।

দূর থেকে তার আসার ভঙ্গি দেখেই কনকের বুক কেঁপে উঠেছিল। ও রকম ছুটতে ছুটতে, মহাশ্বেতার নিজের ভাষায় 'রুদ্ধু শ্বাসে', আসা মানেই কোন নিদারুণ সংবাদ। সুসংবাদ আর তাদের কী আসবে— নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ।

আর সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল।

সেদিন গোটা বাগান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে বেলা তিনটের সময় সবে খেতে বসেছেন শ্যামা— মহাশ্বেতা এসে সামনে বসে পড়েই বলল, 'শুনেছ, তোমার মেজ মেয়ের কীত্তি!'

কনক ভেবেছিল চোখ টিপে দেবে, সারা দিনের পর খেতে বসেছেন বেচারি, কোন দুঃসংবাদ হয় তো দু মিনিট পরে বলাই ভাল— কিন্তু সে সুযোগই পেল না সে। মহাশ্বেতা কোন দিকেই চাইল না। মা এত বেলায় কেন খেতে বসেছেন সে প্রশ্নও করল না। যখন কোন বড় খবর তার মাথার মধ্যে থাকে— তখন আর কোন কিছুই মাথায় ঢোকে না। সে নিজে থেকে অবস্থা বুঝে বিবেচনা করবে— খেয়ে নিতে সময় দেবে সে আশা বৃথা।

শ্যামার উদ্যত আহার্যের গ্রাস মুখের কাছ থেকে নেমে আসে আবার। তাঁরও বুকটা ধ্বক করে ওঠে। দুঃসংবাদ আর অমঙ্গল— এইতেই তো অভ্যস্ত তিনি। তবু এখনও একবার বুকটা কেঁপে ওঠে বৈকি!।

'না তো। কী কীর্তি?'

'তিনি যে রাঁধুনীর চাকরি নিয়েছেন!'

'চাকরি নিয়েছে? রাঁধুনীর? সে কি!'

খাবারের থালাটা ঠেলে দিয়ে সরে বসেন শ্যামা।

'আপনি খেয়ে নিন্ মা—খাওয়াটা শেষ করে উঠুন। সারা দিনের পর—। ঠাকুর-ঝিও আর কথাটা বলার সময় পেলেন না। যা হবার তা তো হয়েইছে আর হবেও, খাওয়ার মধ্যেই কথাটা না বললে হত না?'

কনক আর থাকতে পারে না। তার কণ্ঠস্বরটা আপনা থেকেই একটু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মহাশ্বেতও এবার একটু অপ্রস্তুত হয়।

'সত্যিই তো, তুমি বাপু খেয়েই নাও না! কথা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি না হয় বসছি দু দণ্ড। যা হবার তো হয়েই গেছে। সে কথা যথার্থ, লেহ্য কথা। তা তোমারই বা এমন তিনপোর বেলায় খাওয়া কেন?'

BanglaBook.org

কিন্তু শ্যামা ঘাড় নাড়েন, 'আমি আর খাব না। থালা সরিয়ে দিয়েছি, বিধবা মানুষ আর খাওয়া চলবেও না। একটু তো খেয়েছি— ওতেই চলে যাবে আমার। তুই বল।'

'বলব আর কি বলো। মুখটা তো দিন দিনই ওজ্জ্বল হচ্ছে আমার! এক-একজন এক-একবার করে মুখ পোড়াচ্ছেন আর শত্তুর হাসছে। এই তো খবর দিলেন মেজগিন্নি স্বয়ং—কী হেসে হেসে আর টিপ্পুনি কেটে কেটে বলার ঢং। যেন আমার দুঃখে গলে পড়ছেন একেবারে।'

'তা সে কবে নিলে এ কাজ? কোথায়ই বা নিলে!

'নিয়েছে নাকি পরশু থেকে। কি তার আগের দিন থেকে। অত পোষ্কার করে শুনি নি বাপু। নিয়েছে আবার কোথায়— যাতে আমাদের মুখটা বেশি করে পোড়ে তাই করা চাই তো তার! মেজগিন্নীরই কে মামাতো বোনের বে হয়েছে ঐ ওদিকে কোথায় ডোমজুড়ের কাছে— বর বুঝি উকিল, মস্ত সংসার তাদের— সেইখানে চাকরি নিয়েছেন। তা নিলি নিলি পরিচয়টি হাটিপাটি পেড়ে না দিলে হ'ত না। সেই উকিল বোনাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছেন মেজকত্তার আপিসে— ওদের আবার কে যেন কাজ করে ঐ আপিসে— সেই-ই এসে বলে গেছে মেজকত্তাকে। ছি ছি। কথাটা যখন বললে মেজগিন্নী, তখন মনে হল ধরিত্তির দ্বিধা হও মা, আমি প্রেবেশ করি। কোন দিক দিয়ে আর আমার মুখ পুড়তে বাকি রইল না। নিত্যি এক এক কেলেঙ্কার লেগেই আছে আমার বাপের বাড়িতে।'

আড়ষ্ট হয়ে বসে শুনছিলেন শ্যামা এতক্ষণ।

এইবার শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তা তার মেয়ে? মেয়েকে নিয়ে গেছে?'

'কৈ মেয়ের কথা তো বললে না কিছু। মেয়ে সুদ্ধ আর কে চাকরি দেবে। মেয়ে বোধ হয় রেখে গেছে শ্বশুরবাড়ি। কে জানে? কে আবার খবর নিচ্ছে খুঁটিয়ে। আমি কি আর এই সুখবর কানে শোনবার পর কোন-কিছু জিজ্ঞেস করেছি! যা বলেছে, ওরাই বলে গেছে নিজগুণে।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'মুখটা কি আর তোমার এক মেয়ের বাড়ি পুড়ল— তা যেন স্বপ্নেও ভেবো না। সব মেয়েরই মুখ ওজ্জ্বল হল একেবারে। মেজাবোয়ের ঐ মমাতো বোনের বড় জা আবার হ'ল কে জানো— হারানের ঠাকুমার সম্পক্কে ভাইঝি। আপনার ভায়ের মেয়ে নয়, বুড়ির নাকি নিজের ভাই কেউ ছিল না, খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই হবে। জ্ঞাতি। তা খবরটা কি আর সেখানে পৌঁছচ্ছে না মনে করো!'

শ্যামা উঠে পড়েছেন ততক্ষণ।

পাতের খাবার কনক গুছিয়ে রাখবে। তাকেই খেতে হবে রাত্রে। এ বাড়িতে খাদ্য কিছু ফেলার রেওয়াজ নেই। সীতা থাকলে সে খায়— নইলে কনককেই উদ্ধার করতে হয়। নেহাৎ ডাল ঝোল মাখা ভাত থাকলে ফেলা যায়— তাও সীতা থাকলে তাকে খাওয়ানো হয়— কিন্তু সাদা ভাত বা আস্ত রুটি— রুটি কদাচিৎ হয়— চালের ক্ষুদ ও ডালের ক্ষুদ মিশিয়ে সরুচাকলিই বেশি— এসব ফেলার কথা ভাবতেই পারেন না শ্যামা। যদিচ একটা অদ্ভুত উদারতা তাঁর আছে—বোধ হয় নিজে বহুদিন ধরে অন্নের কষ্ট পেয়েছেন, উপবাস করে দিনের পর দিন কেটেছে বলেই— দুপুরের দিকে কোন ভিখারি এলে ফেরান না। পাতা পেতে উঠোনে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দেন। নিজের ভাতও অনেকদিন ধরে দিয়েছেন, পাতার জ্বালে নিজের মতো ভাত ফুটিয়ে নিয়েছেন পরে। তেমন বেলা হলে নিজের জন্যে আর রান্নাও করেন না, যা হোক মুড়ি বা ক্ষুদ-ভাজা খেয়ে কাটিয়ে দেন। কিন্তু তাদেরও— পাতের এঁটো ভাত দেন না। বলেন, 'বাপরে, ওরা হ'ল নারায়ণ, জন্মের মধ্যে কম্ম একদিন দুটো ভাত খেতে বসেছে আমার বাড়ি, এঁটো ভাত দিতে পারব না!'

শ্যামা পুকুরে চলে গেলেন আঁচাতে, কিন্তু তাতে মহাশ্বেতার উৎসাহ কিছুমাত্র কমল না। সে কনককে উদ্দেশ করেই বলে চলল, 'ঐ হারানই কি কম কেলেঙ্কারটা করল! সে

BanglaBook.org

নিয়ে অমনি আমার বাড়িতে কথায় কথায় হাসাহাসি আর টিটকিরি। আমার ছেলেগুলো সুদ্দু এমন বোকা— মুখ্‌খুর ডিম তো সব তার হবে কি— আপনার পর হাস্যিদিঘ্যি জ্ঞান আছে? — ওরা সুদ্দু শত্তুরদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে একেবারে — কথা উঠলে হয়। আবার আমার গুণের মেয়ে মেসোমশাই বলেন না, বলেন, তোমার বোনাই, তোমার ভগ্‌গিনপোত— এই সব! হবে কি, দিন রাত ঐ মহারাজা মহারাণীর কাছে শিখ্‌নে পাচ্ছে তো— কত ভাল আর হবে বলো! ঐ মেয়ে হতে আমার হাড় ভাজাভাজা যদি না হয় এর পরে তো আমি কী বলেছি। তোমরা দেখে নিও!'

হারানের ব্যাপারটা হাসবার মতোই বটে। মনে হলে কনকেরও হাসি পায়। শুনেছে সেও মহার ছেলে-মেয়েদের কাছেই। মহার কোন ভাগ্নে বুঝি হারানের সঙ্গে কাজ করে— সেই এসে বলেছে। প্রথম যেদিন শুনেছিল কনক, সেদিন মুখে কাপড় গুঁজেও হাসি চাপতে পারে নি। ও-ঘর থেকে এসে রান্না-ঘরে শুয়ে পড়েছিল হাসতে হাসতে।

তরুর একটি ছেলে হয়েছে। তরুর সতীনও নাকি পূর্ণ গর্ভবতী। ঘরে জোড়া খাটে বড় একটা ঢালা বিছানা করে দুই বৌকে নিয়ে এক বিছানাতেই শোয়। দুই বৌ দুদিকে থাকে, মাঝে হারান।

এ সব কথা হারানই নাকি গল্প করেছে আফিসে।

বেশ গর্বের সঙ্গেই নাকি সে এ সব গল্প করে।

আফিসের বন্ধু বুঝি কে একদিন এই কথা শুনে একটু খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'কী করে দুটোকে সামলাও ভায়া—কীভাবে জল খাওয়াও বাঘে গরুকে এক ঘাটে— একটু শিখিয়ে দাও না!' তাতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে থিয়েটারি বক্তৃতার মতো বলেছে হারান, 'হুঁ— হুঁ— তোমাদের মতো ছটাকখানেক প্রাণ নিয়ে ঘর করে না এ শর্মা। মরদ বাচ্ছা, বুঝলে? যে খাওয়াতে জানে সে বাঘে গরুকে এক ঘাটেই জল খাওয়ায়। আমার কাছে ও সব নেই। ঢাকঢাক নেই, অর্শদর্শও নেই। দুজনেই সমান আমার কাছে, সমান ব্যবহার পাবে। কম-বেশি কাউকে দেখব না—ব্যস। এক ঘরে এক বিছানায় শান্তিতেই শুচ্ছি। লোকের বাড়িতে সতীন থাকলে আলাদা আলাদা ঘরে রেখেও শান্তি পায় না, বাড়িতে কাক-চিল বসে না একেবারে। আমার বাড়িতে যাও, দেখবে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। শব্দ করবে কেন, পুরুষের দাপট থাকলে মেয়েদের সাধ্যি কি যে টুঁ শব্দ করে! আমার খুশি, আমি দুটো ছেড়ে চারটে বে করব— তোমার কি? তুমি তোমার পাওনাগণ্ডা পেলেই তো হল! বুঝলে, এ তোমরা নও। সংসারে আদর্শ স্থাপন ক'রে যাব— দেখবে এর পর লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে— হ্যাঁ, মরদ বাচ্ছা বটে। মরবার পর জীবনী লিখে বাহা বাহা করবে।'

সত্যিই বাপু বাহাদুরী আছে হারানের! শান্তিতেই তো আছে। তরুকে অনেক জেরা করেছে কনক— মোটামুটি শান্তিতেই আছে, ঝগড়া কচকচি নেই। তরু না হয় ভালমানুষ কিন্তু তার সতীনটি যেমন পাড়াগাঁয়ের সাধারণ মুখরা মেয়ে হয় তেমনিই। তার ওপর আবার বাপসোহাগী, আদুরী মেয়ে। তাকে যে শাসনে রেখেছে সেটা খুব কম কথা নয়!...

মহা আরও খানিকটা বকে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেল। শ্যামা খুব যে একটা বিচলিত হয়েছেন তা তাঁর আচরণে বোঝা গেল না— অভ্যস্ত কাজ-কর্ম সবই ক'রে যেতে লাগলেন তিনি— কিন্তু তাঁর গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝতে পারল কনক যে মনের মধ্যে তাঁর গভীর আলোড়ন চলছে একটা। দুটি ওষ্ঠের এই বিশেষ ভঙ্গি এতদিনে কনকের পরিচিত হয়ে গেছে। শ্যামার পূর্ব সৌন্দর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বিশেষ— শুধু মুক্তোর মতো সাজানো দাঁত এবং পাতলা ঠোঁট দুটি এখনও অবশিষ্ট আছে। হাসলে এখনও সুন্দর দেখায়, তেমনি ঐ দুটি ঠোঁট যখন পরস্পরের সঙ্গে গাঢ়সম্বন্ধ হয়ে চেপে বসে— তখন সমস্ত মুখটা

BanglaBook.org

এমন কঠিন ও পুরুষ দেখায় যে এখনও কনকের বুকের মধ্যেটা গুরগুর করতে থাকে! রূঢ় ভাষা যে বেশি ব্যবহার করেন শ্যামা তা নয়, অভদ্র ভাষা এখনও তাঁর মুখে আটকে যায়— কিন্তু এই সব সময়গুলোতে যখন কথা বলেন কিছু, তখন যার সম্বন্ধে বলেন তার গায়ে যেন কেটে কেটে বসে। একেই বুঝি কবিরা বলেছেন বাক্যবাণ। এমন তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ঘাতী ভাষা যে কোথায় পান শ্যামা তা কনক অনেক চেষ্টা করেও ভেবে পায় না। আবার এক এক সময় ভাবে সে, এ হয়ত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর জীবন-সংগ্রামেরই ফল, হয়ত এই বয়সে তারও মুখে এই ধরনের কথা আপনিই যোগাবে।

আজ কিন্তু সে রকম আঘাত কারুর ওপর পড়ল না। পাতা চাঁচতে চাঁচতে অনেকক্ষণ পরে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন শ্যামা, 'ঐ মেয়ে নিয়ে বৌমা আমার শ্মশানে গিয়েও শান্তি হবে না। পরের বাড়ি গিয়ে যদি শান্ত হয়ে থাকতে পারত, যদি টিকে থাকত তো আমার বলবার কিছু ছিল না। একটা কাজ নিয়ে থাকা তো ভালই— আমার অত লজ্জা-সরম নেই, রাজ-রাজেশ্বরের মেয়ে নয় তো যে খেটে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আমার ভাবনা হচ্ছে যে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। ওখানেও টিকতে পারবে না— দেখো ঝগড়াঝাঁটি করে অপমান হয়ে বেরিয়ে আসবে। যারা পয়সা দিয়ে লোক রাখবে তারা অত ঝাল সহ্য করবে না তো। শুধু এর জন্যে কুটুম্ব-সাক্ষাতের কাছে মাথা হেঁট করা— মুখ পুড়নোই সার হবে!'

খানিকটা পরে আবার বলেন, 'শুধু কি একটা ভয়? এখনও ঐ রূপ দেখছ তো— আগুনের মতো। পরের বাড়ি হয়ত এক ঘর পুরুষের মধ্যে থাকা। কার খপ্পরে পড়বে, কী করবে— সেই আরও ভয়। আরও কত মুখ পুড়বে এই ভয়ে সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকা!'

কনক চুপ করেই শোনে বসে বসে। কী বলবে সে! আর উত্তরের জন্যও বলেন নি শ্যামা, এটা তাঁর স্বগতোক্তি কতকটা।

খানিকটা আরও নিঃশব্দে পাতা চাঁচবার পর বললেন তিনি, 'গেল তো মেয়েটাকেই বা ওখানে রেখে গেল কেন? সেই মতলবই যদি ছিল তো এখানে রেখে গেলেই হত। তবু তুমি একটু দেখতে শুনতে পারতে। এখানে একা থাকলে একেবারে চাষার ঘরের মেয়ে তৈরি হবে, তুমি দেখো!'

এইবার কনক কথা বলল, 'তা ওকে না হয় আনিয়ে নিন না মা!'

'কখ্খনও না!' তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠেন শ্যামা, 'এমন অন্ধ মায়া আমার নেই মা। এক তো যেচে অপমান হতে যাওয়া— তারা যদি বলে ওর মা আমাদের কাছে দিয়ে গেছে, তোমাদের বাড়ি পাঠাব না— তখন মুখটা কোথায় থাকবে! তার ওপর তাঁকেও তো চিনি, এখানে এনে রাখব— যদি কোন রকম পান থেকে চুন খসে তো কৈফিয়ৎ চাইবেন— কেন আমার মেয়েকে আনতে গিছলে তোমরা, কিসের জন্যে!.... না মা, বেশ আছি। অত টান আমার কারুর ওপর নেইও আর। ঢের শিক্ষা হয়েছে— ঢের পেয়েছি, আর কেন! ও মেয়ে যদি ওখানে মরেও যায় তো নিজে থেকে আনতে যাব না!'

এর পর আর বলবার কিছু নেই। কনক চুপ করেই থাকে। কিন্তু ওর সত্যিই মন-কেমন করে মেয়েটার জন্যে। কাছে থাকলে তবু সময় কাটে একটু। তার সঙ্গেই তবু গল্প করা যায়। এ নিঃসঙ্গ ও নিঃশব্দ পুরীতে যেন মাঝে মাঝে দম আটকে আসে কনকের।

॥ ২ ॥

অঘ্রান মাসের পয়লা তারিখেই হঠাৎ একটা পালকি এসে থামল কনকদের বাগানে। দুপুর পার হয়ে গেছে বিকেল শুরু হয় নি— এমনি সময়টা, শ্যামা খেয়ে আঁচিয়ে উঠে ঘাটের

BanglaBook.org

ধারে দাঁড়িয়েই রোদ পোয়াচ্ছেন। উঠোনে এত গাছপালা হয়েছে যে ভাল করে রোদ নামেই না কখনও।

হঠাৎ পাল্‌কি আসতে দেখে শ্যামা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কনকও বাড়ির ভেতর থেকে শব্দ পেয়েছিল, সেও ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের বাড়িতে আবার পাল্‌কি করে কে আসবে। এতকালের মধ্যে তো কাউকে আসতে দেখে নি সে।

পাল্‌কির পিছনে পিছনে একজন পিলেরোগা ধরনের ক্ষয়া-ঘষা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আসছিলেন, এতক্ষণ ওরা দেখতে পায় নি। তিনি পাল্‌কি-বেয়ারাদের সঙ্গে অত দ্রুত চলতে পারেন নি— পিছিয়ে পড়েছিলেন। এইবার তিনি ছুটে এগিয়ে এসে পাল্‌কির দোর খুলে কাকে যেন হাত ধরে আস্তে আস্তে টেনে বার করলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় বয়ে আনার মত করেই বাইরের ঘরের রকে বসিয়ে দিলেন। একটা সাদা বোম্বাই চাদর মুড়ি দেওয়া মানুষ—ঠকঠক করে কাঁপছে সে, আর কী রকম একটা অব্যক্ত আওয়াজ করছে।

মুড়ি দেওয়া হলেও মেয়েছেলে নয় এটা বোঝা-গেল। খানিকটা কোঁচা ঝুলে পড়েছে এদিকে— অর্থাৎ পুরুষ।

সঙ্গের অভিভাবকটি এতক্ষণ এদের সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি, এদিকে ফিরে তাকান নি। এবার এদিকে ফিরে— কাকে নমস্কার করবেন ঠিক করতে না পেরে, শ্যামা ও কনকের মাঝামাঝি একটা জায়গা লক্ষ্য করে নমস্কার করলেন। শ্যামা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও একখানি কাটো ময়লা ধুতি পরেছিলেন— তাই বাড়ির গৃহিণী না দাসী বুঝতে পারেন নি ভদ্রলোক।

সে ভদ্রলোকটিও অবশ্য খুব সুস্থ নন। তাঁর মুখের চেহারাও যৎপরোনাস্তি শীর্ণ ও দুর্বল— অনেকদিন কোনো রোগে ভুগছেন বলেই মনে হয়। বেশভূষাও তথৈবচ। অত্যন্ত মলিন ধুতি পরনে — জীর্ণ গলাবন্ধ ময়লা কোটের ওপর ততোধিক ময়লা একটি উড়ুনি। নমস্কার করা হয়ে গেলে দু-হাত উড়ুনির দুই প্রান্ত ধরে ওধারের তুলসী গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্যামা এতক্ষণ অবাক হয়ে চেয়েছিলেন শুধু, এবার বিস্মিত এবং ঈষৎ বিরক্ত ভাবেই বললেন, — 'এসব কী ব্যাপার? কারা আপনারা? কোথা থেকে আসছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় আপনাদের বাড়ি ভুল হয়েছে। কোন্ ঠিকানা খুঁজছেন বলুন তো?'

গলার আওয়াজে নিঃসংশয়ে শ্যামাকেই বাড়ির কর্ত্রী বুঝতে পেরে তিনি চাদর ছেড়ে দিয়ে জোড় হাতে আর একটি নমস্কার করলেন, তারপর বিনীত কণ্ঠেই বললেন, 'আজ্ঞে না মা-ঠাকরুণ, বাড়ি ও-ই চিনিয়ে দিয়েছে। আপনার ছেলে!'

আপনার ছেলে!

চমকে শিউরে উঠলেন শ্যামা। কনকও।

বোধ হয় সামনে ভূত দেখলেও অত চম্‌কাত না তারা।

'ছেলে!' খানিকটা পরে বাক্যস্ফূর্তি হয় শ্যামার, 'আমার ছেলে? কোন্ ছেলে!'

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে যান তিনিই সেই মুড়ি-দেওয়া কম্পমান মূর্তিটার দিকে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে মুখটা দেখার চেষ্টা করেন।

অনেকক্ষণ পরে চিনতেও পারেন।

কান্তি!

সঙ্গে সঙ্গে— এতকাল পরে তাঁর সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি ডুক্‌রে কেঁদে ওঠেন। চিৎকার করে— মড়া কান্নার মতো। কনক ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোন সান্ত্বনা দিতে পারে না। তারও দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে। চিনতে পেরেছে সেও।

কান্তিই— কিন্তু এ কী চেহারা তার!

BanglaBook.org

শেষ যেবার আসে সে— কনক দেখেছিল— একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের মতো।

উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, অপূর্ব মুখশ্রী; কান্তিমান তরুণ ছেলে। দীঘল সুস্থ গঠন, দীর্ঘায়ত টানা চোখে ঘন পল্লব, সুন্দর বঙ্কিম ঠোঁটের ওপর ঘন শ্যামল রেখা। আর তেমনি সরল ঋজু চেহারা— আর কিছুদিন পরে শুধু সুন্দর নয়, সুপুরুষ হয়ে উঠবে— তা তখনই দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

আর এ যে এসেছে— তার রং রোদেপোড়া তামাটে কালো গায়ে খড়ি উড়ছে, রুক্ষপাত্‌লা চুল, হাত-পা কাঠিকাঠি। মুখে যেন— বলতে নেই— মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে একেবারে। তেমনি ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টি।

এ কী সেই লোক? বিশ্বাস হয় না কিছুতেই।

শ্যামার মড়া-কান্না শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এল অনেকে। স্বয়ং মল্লিক-গিন্নীও এসে দাঁড়ালেন। তিনি প্রবীণ লোক, বহুদর্শী। এক নজরে দেখে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। শ্যামাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, ষাট্ ষাট্, ও কি কথা। অমন মড়া-কান্না জুড়ে দিয়েছ কেন গা! এ কী অলুক্ষণে কাণ্ড, ঠিক দুপুর বেলা! রোগা ছেলে এসেছে— আগে তাকে ঘরে তোল, তার মুখে একটু জল দাও— তা নয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিলে! আর তুমিও তো তেমনি বৌমা। নাও ওকে ছাড়, দেওরকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাও। এত কান্নাকাটির হয়েছেই বা কী, অসুখ করলে সকলেরই চেহারা খারাপ হয়— তায় পুরুষ মানুষ, সুন্দর চেহারা ওর কী কাজেই বা আসবে। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে তাই অমন কাঁপছে— আহা বাছা রে।'

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এই কান্নাকাটি দেখে হকচকিয়ে গেছলেন। মল্লিক-গিন্নীর কথাতে তিনিও খানিকটা ধাতস্ত হলেন। অকারণেই তাঁকেও একটা নমস্কার করে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মা-ঠাকরুন্, ঠিক ধরেছেন। ম্যালেরিয়াই বটে। ঐ এক কালরোগেই দিলে আমাদের দেশটাকে উচ্ছন্ন করে। কী কালব্যাধি যে তা বলবার নয়। এ ছেলেটিও অনেকদিন ধরে ভুগছে মা— পুরনো রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনও চিকিচ্ছে করলে হয়ত বাঁচবে, যেভাবে পড়ে ছিল, না চিকিচ্ছে না কিছু— বেঘোরে, সে ভাবে থাকলে আর বাঁচত না।'

মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'তা তুমি কে বাছা? একে পেলেই বা কোথায়?'

'আজ্ঞে মা, আমি ওখানকার ইস্কুলের জয়েন্ট হেডমাস্টার। আমাদের ইস্কুলেই পড়ত। জ্বরে পড়েছে অনেকদিন। সেই বর্ষার গোড়া থেকে ধরুন। ভোগেই বেশি, মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে ইস্কুলেও আসে। আমাদের হোস্টেলে তো থাকে না— থাকে বাবুদের কাছারি-বাড়িতে। সেইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা— গোমস্তা-মুহুরীদের সঙ্গে। আমাদের অত দায়ও নেই তাই। এবারে অনেকদিন ইস্কুলে আসে না দেখে— পরীক্ষার সময় এসে গেল ওর, হেডমাস্টারমশাই আর আমি পরশু দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি এই অবস্থা— উঠতে পারে না, মড়ার আকৃতি। ওদের জিজ্ঞাসা করলুম যে ডাক্তার দেখিয়েছ? বলে সে রকম তো হুকুম নেই। আমরা কলকাতায় লিখেছি— কোন উত্তর পাই নি। খরচা করলে দেবে কে? তা মাস্টার মশাই বললেন, বাপু হাসপাতালেও তো দেখাতে পারতে— তা বলে, আজ্ঞে দুকোশ পথ, গোরুর গাড়ি ছাড়া তো যাওয়া চলবে না— সে ভাড়া দেবে কে? চোর চোর— বুঝলেন না, মহা চোর। জ্বর হলে শুধু একটু নির্লক্ষে জল-সাবু দিয়ে ফেলে রাখত। একটা চাকর আছে কাছারির — হরিহর বলে— সে নাকি মধ্যে মধ্যে তার নিজের পয়সায় পোস্টাপিস থেকে কুইনাইন এনে খাওয়াত, র' কুইনাইন, খেয়ে খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করছে, কানে শুনতে পায় না। কেন মা— আপনিই বলুন, বাবুরা ওর খোরাকির পয়সা দেয় তো— তা থেকেও তো বাঁচে কিছু, অসুখ হ'লে তো এক পয়সার সাবুতেই চলে যায়— তা এক

BanglaBook.org

দিন আর গ্রামের বটুক ডাক্তারকে ডাকা যেত না। তার তো মোটে এক টাকা ফি। আমাদেরও খবর দিলে পারত!'

'এখানে চিঠি দেয় নি কেন, এদের ছেলে, এরা গিয়ে নিয়ে আসত!' মল্লিক-গিন্নী প্রশ্ন করেন।

'কি জানি মা, তা বলতে পারব না। ওরা তো বলে ছেলে নাকি বারণ করেছিল; বলেছিল শুধু ব্যস্ত করা তাঁদের, এমন পয়সা নেই যে আসবেন বা চিকিৎসার টাকা পাঠাবেন।...... তা আমাদের হেডমাস্টারমশাই বললেন, এ তো ছেলেটা এখানে থাকলে এক মাসও বাঁচবে না ভাই জয়কেষ্ট, একে দিয়ে আসতে হবে। সব মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে দু-আনা, চার-আনা চাঁদা তুলে, ইস্কুল থেকেও বই বাঁধাই চার্জ বলে কিছু লিখিয়ে নিয়ে— আমাকে দিয়ে পাঠালেন।'

পাল্‌কি-বেয়ারারা এতক্ষণে অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছে, তারা ভাড়ার তাগাদা দিয়ে উঠল। জয়কৃষ্ণবাবুর বোধ করি ওদের কথাটা মনেই ছিল না, তিনি অকারণেই এতখানি জিভ কেটে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাবারা, দিচ্ছি। এক মিনিট!'

যথারীতি ভাড়া নিয়ে খানিকটা তকরার করার পর পয়সা বুঝে পেয়ে যখন তারা চলে গেল, তখন জয়কৃষ্ণবাবু তাকিয়ে দেখলেন যে চারিদিক খালি হয়ে গিয়েছে। শ্যামা ও কনক ধরাধরি করে কান্তিকে নিয়ে ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে যারা ছিল তারাও ঘরে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শুধু মাল্লিক-গিন্নীই তখনও সদরের চৌকাঠে একটা পা দিয়ে ইতস্ততঃ করছেন। বোধ হয় জয়কৃষ্ণবাবুর কথাটা ভেবেই ভেতরে যেতে পারেন নি।

খানিকটা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবার পর জয়কৃষ্ণবাবুর সম্ভবত বোধগম্য হল এই তথ্যটা যে, এখন তিনি অনাবশ্যক।

বাড়িতে যে অবস্থা চলছে, তাঁর দিকে কারুর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয় তা তিনি বুঝতে পারলেন। লোকও বেশি নেই—ঐ দুটি স্ত্রীলোক ছাড়া— নইলে তাদের কাউকে দেখা যেত। পুরুষ-মানুষ কেউ এখন থাকার কথাও নয়।

সুতরাং এখন চলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা, এবং কাকেই বা বলে যাবেন বুঝতে না পেরে মল্লিক-গিন্নীকেই উদ্দেশ করে বললেন, 'তাহলে আমি মা এখন যাই, ওঁদের বলে দেবেন। ভাল হয়ে যদি আবার যেতে চায় তো যাবে। তবে এ বছরের টেস্ট বোধ হয় আর দিতে পারবে না— সে তো এসে পড়ল বলে। আর তা যদি দিতে না-ই পারে তো গিয়েই বা লাভ কি। ওখানে থাকলে আবারও পড়বে। আমরা ফি হপ্তায় কুইনাইন খাই নিয়মিত— তাই দেখুন না হাল।'

তিনি একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চাদরের খুঁট-দুটি আবার দুহাতে চেপে ধরলেন, অর্থাৎ রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মল্লিক-গিন্নী মিনিটখানেক ইতস্তত করলেন, ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর আবার বেরিয়ে এসে বললেন, 'যাবেন? কিন্তু আপনার তো খাওয়া-দাওয়া কিছু হয় নি বোধ হয়!'

'আজ্ঞে কখন আর হবে বলুন। রাত থাকতে গোরুর গাড়িতে চেপেছি তো—অনেকটা পথ তাই গাড়োয়ানকে বলে বোর্ডিং-এই গাড়ি মজুত রেখেছিলুম রাত্তিরে। তারপর তো ধরুন তিনবার ট্রেন বদলে আসা। সকালে সেওড়াফুলিতে একটু যা চা খেয়ে নিয়েছিলুম — ওকেও দিয়েছিলুম, সহ্য করতে পারলে না, বমি হয়ে গেল।........ তা সে যা হোক, আমার জন্যে ভাববেন না, এই যাবার পথে যা হয় জলটল খেয়ে নেব এখন। দিয়েছেন,

BanglaBook.org

মাস্টারমশাই পয়সা সব হিসেব করেই দিয়েছেন। এই পাল্‌কিটাতে যা আনা চারেক বেশি লাগল। তা তাতেও আটকাবে না। যা হোক করে হয়েই যাবে।'

তিনি একটু হেসে যাওয়ার জন্যে ফিরে দাঁড়ালেন। মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'না না, সে কখনও হয়! আপনি এত কষ্ট করে নিয়ে এলেন আমাদের ছেলেকে, মহা উপকার করলেন, প্রাণরক্ষাই করলেন ওর বলতে গেলে। এরা বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে, বুঝলেন না— অমন সোনার চাঁদ ছেলের এই ছিরি, আঘাতটা লেগেছে খুব। তাই আর হুঁশপব্ব কিছু নেই। নইলে এখানেই সব ব্যবস্থা করে দিত এরা। ছেলের দাদা থাকলে খরচপত্রও দিয়ে দিত। তা আপনি বরং আমার ওখানেই— যা হয় দুটো মুখে দিয়ে নেবেন। ডাল তরকারি সবই কিছু কিছু আছে— দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে বেশি দেরি লাগবে না। আমরাও ব্রাহ্মণ, আমাদের ওখানে খেতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।'

'না, না— সে সব কোন-কিছুই নেই আমাদের। আমরা পাল—ঐ মৃত্তিকার কাজ আমাদের কুলকর্ম। তা চলুন। তবে বিকেলের গাড়ি না ধরতে পারলে ওদিকে ইস্টিশানে পড়ে থাকতে হবে। যা পথ, রাত বেশি হয়ে গেলে আর যেতে ভরসা হয় না। নেই কি, বাঘ ভালুক থেকে সাপখোপ সব আছে। বুনো শিয়ালরাও কম যান না। অবিশ্যি আছে, ইস্টিশানের কাছেই একঘর কুটুম্বও আমাদের আছে। অনেককাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই এই যা— তবে গিয়ে দাঁড়ালে চিনতে পারবে। সে যা হয় একটা হবেই'খন ব্যবস্থা। আপনাদের প্রসাদ দু'টি পেয়েই যাই।'

মল্লিক-গিন্নী একটু হেসে বললেন, 'না না, আমি বেশিক্ষণ আটকাব না। ট্রেন আপনি পাবেন। না হয় একগাল আলোচালই চড়িয়ে দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। আপনি স্নান করতে করতেই—'

এতখানি জিভ কেটে জয়কৃষ্ণবাবু বললেন, 'স্নান? ঐটি মাপ করবেন মা। স্নান করি আমি ধরুন মাসে একদিন। তাও ফুটনো জল ছাড়া চলে না। তাতেই কি নিস্তার আছে— যতদিন পরে যেভাবেই করি না কেন, মাথায় জল পড়লেই জ্বর আসবে। ঐ জন্য ছুটিছাটা দেখে করতে হয়— যাতে একদিন শুয়ে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। স্নান করার দরকারও নেই তেমন— মুখ হাত ধুয়ে নিলেই চলবে।'

'তা হলে চলুন।' বলে মল্লিক-গিন্নী আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তাঁকে।

হেম সেদিন এসে পৌঁছল রাত ন'টারও পর। সব শুনে সে অবশ্য তখনই ছুটল ডাক্তারের বাড়িতে কিন্তু ডাক্তার এলেন না। তাঁর কোমরে ব্যথা, রাত্রে আর বেরোতে পারবেন না। আর একজন নতুন ডাক্তার বসেছেন বটে, তাঁর দু'টাকা ফি, ডাক্তারেও তত সুবিধের নন। এমনিতেই তো শ্যামা ডাক্তার ডাকাতে আপত্তি করছিলেন, পরের দিন সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথাই বলেছিলেন। হেম ধমক দিয়ে উঠেছিল বলে খুব বেশি কিছু বলতে পারেন নি।

'তোমার যেমন কথা! অজ্ঞান অচৈতন্য রুগী, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, একে টেনে নিয়ে যাব হাসপাতালে! তা হলে তো পাল্‌কি করতে হয়, সেও তো যাতায়াতে অন্তত দেড় টাকা। তাছাড়া ও অবস্থায় পাল্‌কিতেই বা ওঠাব কী করে! একটু ধাতে না এলে ওকে নড়ানোই উচিত নয়!'

সুতরাং সে রাত্রে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হল না। এরা শুধু সবাই মিলে জেগে ঘিরে বসে রইল সারারাত। রোগীর কোন জ্ঞানই নেই, অসাড়ের মতো পড়ে আছে। শেষরাত্রের দিকে জ্বর একটু কমল কিন্তু তখনও জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বেঁচে আছে কিনা— এক এক সময় সেই ভয় হতে লাগল। কেবল মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নড়ে উঠছে

BanglaBook.org

একটু— মনে হয় জল খেতে চাইছে, অল্প অল্প জল দিলে খাচ্ছেও— সেই যা ভরসা। তাও শ্যামা একবার একটু বেশি জল দিয়ে ফেলেছিলেন, দুদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, মুখে রেখে একটু একটু করে খেতে পারল না।

সকালবেলাই হেম আবার গেল ডাক্তারের কাছে। ফকির ডাক্তার—দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, খুব দূর নয়, কিন্তু একবার বেরিয়ে পড়লে ধরা মুশকিল। ফকির এককালে এখানকার এক বড় ডাক্তারের কম্‌পাউন্ডার ছিলেন, তিনি মারা যেতে বাজারে এক ডিস্‌পেন্‌সারী সাজিয়ে বসেছেন, নিজেই চিকিৎসা করেন। সবাই বলে ফকির বিচক্ষণ ডাক্তার— এম-বি পাস ডাক্তারের চেয়েও ভাল। হয়ত আরও বলে, মাত্র এক টাকা ফি বলে। কোথাও কোথাও আট আনাও নেন। ডিস্‌পেন্‌সারীতে গেলে (ফকির বলেন চেম্বার) তাও লাগে না, অথচ প্রত্যেককেই যত্ন করে দেখেন। ওষুধও অনেক সময় বাকিতে দেন— ওষুধের দামও কম। যে মিক্সচারটা সব জায়গায় বারো আনা—কলিকাতায় এক টাকা পাঁচসিকে— উনি সেইটাকেই নেন দশ আনা করে। গরিব দুঃখীর ক্ষেত্রে আরও কমিয়ে দেন দাম। আট আনা সাত আনা— যার কাছে যা পান তাই নেন।

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। এসেছিলেন হাসি হাসি মুখে কিন্তু দেখতে দেখতেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'শুনেছিলুম বটে ওদেশের ম্যালেরিয়ায় বাঘ সুদ্ধ জব্দ হয়ে যায়—কিন্তু ভাবতুম ওটা কথার কথা। এখন দেখছি সাংঘাতিক সত্যি। ইস্! এখানেও তো কম নেই, কিন্তু এমন ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া তো কখনও দেখি নি মশাই। সমস্ত রক্ত শুষে খেয়েছে একেবারে! বললে বিশ্বাস করবেন না—বোধ হয় এক ছটাক রক্তও আর দেহে নেই। এধারে পিলে লিভার দুই-ই বেশ ডাগর। খুব সাবধানে রাখতে হবে। দুধ দেবার আর চেষ্টা করবেন না এখন, লিভারের যা অবস্থা— সইতে পারবে না। ফলের রস মিছরির জল— এইসব খাওয়ান। ওষুধ দিচ্ছি দুরকম— তবে ওষুধের চেয়ে পথ্যির দিকেই মন দিতে হবে বেশি। পাৎলা সাবুর জল আর মিছরির জল্, এই-ই এখন চলুক। নাড়াচড়া করতে যাবেন না—যে কোন সময়ে হার্টফেল করতে পারে— দেহের এমনি অবস্থা। এতটা পথ এল কী করে তাই ভাবছি।'

এর পর দশবারোদিন ধরে চলল— বলতে গেলে যমে-মানুষে টানাটানি। শ্যামা দিনরাতই আগলে বসে রইলেন। হেম অফিসের ফেরৎ এসে কাছে বসলে তিনি একটু উঠতেন। তাও হেমকে সন্ধ্যা-বেলাই ডাক্তারের কাছে ছুটতে হত দুদিন একদিন অন্তর। ভোরে তার সময় হলেও ডাক্তার ভোরে উঠবে কেন? কনকের ওপর সারা সংসার পড়েছে— বাড়ির পাট বাসন-মাজা রান্না সব। দুপুর ছাড়া সে কাছে এসে বসবার ফুরসুৎ পেত না। সেই সময়ই যা একটু ছাড়া পেতেন শ্যামা। প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নানাহার একসঙ্গে সেরে নিতে হ'ত। ঐ সময়েই ঘন্টা দুই একটু গড়িয়েও নিতেন তিনি। রাত্রে ঘুম হত না। একটি প্রদীপ জ্বেলে রেখে রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে একা জেগে বসে থাকতেন। জেগে না থেকে উপায়ও নেই। অজ্ঞান অচৈতন্য ছেলে মুহুর্মুহু শুধু হাঁ করছে আর ঠোঁট নাড়ছে অর্থাৎ জল। সাবুর জল ফলের রস মিশ্রীর জল—সবই ঝিনুকে ক'রে ক'রে খাওয়াতে হচ্ছে। অচৈতন্য অবস্থায় খাওয়া। ডাক্তার শাসিয়ে গেছেন, 'খুব সাবধানে পথ্যি দেবেন— এ অবস্থায় বিষম লাগলেই বিপদ!'

দিনের বেলা আসে অনেকেই। তরু আর হারান এসে একদিন লেবু আঙুর দিয়ে গেছে। বড় জামাই এসে খবর নিয়ে যান প্রায় নিত্য। নিত্যই এক জোড়া করে কমলালেবু এনে রেখে যান। এ ছাড়া ডাক্তারের ফল খাওয়াবার নির্দেশ মানা যেত না। সাবু, মিশ্রি ছাড়া আর কিছু কিনতে দেন নি শ্যামা। ফলের কথায় বলেছিলেন, 'ওসব বড়লোকের জন্যে ব্যবস্থা। ফল না খেলে যদি ছেলে সারবে না— তবে ডাক্তার দেখাচ্ছি কেন? রাশ রাশ

BanglaBook.org

ওষুধই বা কিসের জন্যে? না, অত পারব না। তা ছাড়া, কমলালেবুতে ঠাণ্ডা করে— আমরা দেখেছি কবরেজরা খেতে দিত না। জ্বর থাকতে লেবু খেলে মুখে ঘা হয়!

কিন্তু পরে কিনে দিয়ে যেতে খুব আর আপত্তি করেন নি।

যারাই আসত দিনের বেলা। একদিন পাল্‌কি ক'রে এসে মঙ্গলাও দেখে গেলেন। একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন আজকাল। ছুঁচিবাইয়ের দরুন জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে-পায়ে হাজা দগ্‌দগ্‌ করছে। ফিসফিস করে বলেন 'আসতে কি দেয়! সব্বস্ব ছেলেরা বার করে নিয়েছে, এখন তো ওদের এক্তাজারি! একটা পয়সা খরচ করতে গেলেও ওদের কাছে হাত পাততে হয়। আর হাত পাতলেই কী চোখ-রাঙ্গানি বাবুদের— পারব না অতসব, অত নবাবি চলবে না! এইসব। কী করব— হাতি যখন দঁকে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট্‌ মারে!' তারপর গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেন, 'কী জানিস বামনি, আছে, এখনও কি দুচার টাকা নুকুনো নেই মনে করিস— তা আছে। কিন্তু তবুও ছেলেদের কাছে চাইতে হয়। না চাইলেই সন্দ করবে যে, তবে তো মা-মাগীর কাছে এখনও দুপয়সা আছে— আর অমনি ভাগাড়ে গরু পড়ার মতো চিলশকুনের দল এসে পড়ে দুয়ে বার করে নেবে। এই শেষ বয়সে একটা পয়সার আজির হয়ে পড়ব নাকি? এখন কতদিন বাঁচতে হবে তার ঠিক কি?'

তারপর মুখ বাড়িয়ে হাতে ক'রে বয়ে আনা পিকদানিটায় খানিকটা পিক ফেলে বললেন, 'দেখলি তো বামনি— তখন যদি ছেলেটাকে ঘরজামাই দিতিস তাহলে আজ আর ওর এই হাল হত না। সেই যে বলেছিলাম তোকে—মনে আছে? সে মেয়ের তো বে হয়ে গেছে। বে দিয়েই তো বাপ মিন্‌সে অক্কা— এখন জামাইয়ের বাপ, মা, ভাই ঘরে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব করছে, তাদেরই যথাসব্বস্ব। জামাইকে পোষ মানিয়ে পর করে নেবার তো আর সময় হল না— তার বাপমায়ের দিকে টান ষোল আনাই থেকে গেল যে মেয়ে শাশুড়ীর ঘর করতে গেলে দুঃখু পাবে বলে এত কাণ্ড করলে মিন্‌সে, সেই মেয়েই এখন উঠতে বসতে শাশুড়ীর ঠোনা খাচ্ছে! তুই যদি দিতিস তা'লে তোরও আজ অমনি দণ্ডভিজ্জি বজায় থাকত।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তোর কপাল তো ভাল নয়— বারবার তো দেখছিস। তোর উচিত ছিল দিয়ে দেওয়া। পরের কপালে ছেলে ঠিক থাকত। এখন গেল তো— ছেলের রূপের দেমাক, নেকাপড়ার দেমাক কিছুই তো রইল না আর— এখন কেঁদে কেঁদে মর্‌। আর কী হয় তাই দ্যাখ্‌। এই রকম শক্ত অসুখ হলে শুনেছি একটা অঙ্গ নিয়ে তবে রোগ যায়। ভাল যদিবা হয়, আস্ত ছেলে ফিরে পাবি কিনা সন্দেহ!'

শ্যামা এতক্ষণে কথা বলার অবকাশ পেলেন, 'ওসব কথা বলবেন না মা, বরং আশীর্বাদ করুন ছেলে ভাল হয়ে উঠুক!'

'ও কী লো, বামুনের ছেলেকে আশীর্বাদ করে কি অকল্যেণ টেনে আনবে আমার ঐ শত্তুরগুনোর মাথায়! বেশ বললি তো! ভগবানকে ডাক, তাঁর কাছে মাপ চা। গেল জন্মে এ জন্মে ঢের পাপ করেচিস— তাই এত দুগ্‌গতি। ভগবানের কাছে মানৎ করে তবে যদি গোটা ছেলে ফিরে পাস!'

তারপর আঁচল খুলে দুটো টাকা বার করে কান্তির বিছানার পাশে রেখে বললেন, 'তোর অভাব নেই আর— তবু আমার একটা কত্তব্য আছে তো। সাবু, মিছরি কিনে দিস ছেলেটাকে। পেটের শত্তুরদের ভয়ে ওখান থেকে কিনে আনতে পারি নি— তাহলেই জেনে যাবে হাতে টাকা আছে। আর একবার টাকার গন্ধ পেলে হয়, ছিনে জোঁকের মতো ছুটে আসবে অমনি!'

আরও অনেকেই খবর পেয়ে এসে দেখে গেল।

মল্লিক-গিন্নীও দুপুরবেলা এসে বসেন।

BanglaBook.org

কিন্তু রাত্রে কেউ থাকে না। একা একটা ঘরে মিটমিটে আলোতে জেগে বসে থেকে অজ্ঞান কঙ্কালসার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে— বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া কান্না গলার কাছে এসে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, ছেলের অকল্যাণের ভয়ে কাঁদতেও পারেন না।

মঙ্গলার কথাটা মনে হয়ে আরও বুকের মধ্যেটা যেন হিম-হিম ঠেকে। তিনি কি আর সত্যিই গোটা ছেলেকে ফিরে পাবেন? অমন রূপবান, কান্তিমান ছেলে তাঁর।

হে মা সিদ্ধেশ্বরী! এ কী করলে মা!

আর তখনই মনে হয় ছোট খোকাটাকে বোনের কাছ থেকে আনিয়ে নেবেন এবার। বিশ্বাস নেই আর কাউকেই।

॥ ৩ ॥

এখানে আসবার ঠিক বারো দিন পরে ভাল করে জ্ঞান হল কান্তির। চোখের চাউনি থেকে ঘোলাটে ভাবটা চলে গিয়ে পরিচয়ের দীপ্তি ফিরে এল। মনে হল তাকে ঘিরে মা-দাদা-বৌদির বসে থাকবার কারণটাও বুঝতে পারল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল একটা নিরতিশয় লজ্জা। যেন সেই লজ্জা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যই আবার চোখ বুজল সে।

শ্যামা তখনই সাগ্রহে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কনক বেশ একটু দৃঢ়-কণ্ঠেই নিবৃত্ত করল তাঁকে, 'এখন নয় মা, আরও কিছুদিন যাক, দুর্বল শরীর মাথাও দুর্বল— এখন কি কোন কথা ভাল করে গুছিয়ে ভাবতে পারে? সেটা ভাবতে দেওয়াও ঠিক নয়। আর একটু সারুক শরীরটা!'

শ্যামা তা বুঝলেন, চুপ করে গেলেন খানিকটা।

আরও চার-পাঁচ দিন পরে কথা কইল সে। জল চেয়ে খেল, খাবার চাইল।

কিন্তু সেই সময়ই তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করলেন শ্যামা যে সে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে ঠোঁট-নাড়া দেখে তবু বোধ হয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে, জবাবও দিচ্ছে কিছু কিছু—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কিছু বললে বা শিয়রের দিক থেকে কোন প্রশ্ন করলে একটা উত্তরও পাওয়া যাচ্ছে না। রীতিমতো চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পাচ্ছে।

পরের দিনই ফকির ডাক্তারকে খবর দিয়ে পাঠালেন শ্যামা। তিনি এসে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'ভয় নেই— ও কুইনাইনের একেষ্ট, সারতে দেরি লাগবে। ওর প্রাণটা যখন ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তখন কানটাও ফেরাতে পারব। তা ছাড়া একটু জোর পেলে না হয় কলকাতার কলেজে নিয়ে যাবেন, সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছে, ভাল চিকিৎসা হলে সেরে যাবে। শরীরে রক্ত নেই, একটু দুধ পেটে পড়ে নি, শুধু খানিকটা করে কুইনাইন খেয়েছে তার আর কী হবে বলুন।.... না, ও ভাল হয়ে যাবে তবে সময় লাগবে ঢের—তা বলে দিচ্ছি। রোগটি খুব সহজ হয় নি ওর, এটা মনে রাখবেন। পিলে-লিভার এখনও জেঁকে বসে আছেন। জ্বরও— এখন তো তিনচার দিন অন্তর আসছে, ওটা কমে গেলেও দেখবেন একাদশী আমাবস্যে পুন্নিমেতে গা-গরম হবে এখন দু-চার বছর। তবে বেলপাতার রস শিউলিপাতার রস এইসব টোট্‌কা খাওয়াবেন— খরচ নেই, অথচ উপকার হবে।'

কিন্তু ফকির ডাক্তার যতই আশা ও আশ্বাস দিয়ে যান—জ্বর আসবার দিনগুলোর মধ্যেকার সময়টা দীর্ঘতর হয়ে এলেও— কানের কোন উপকার হল না। বরং আরও যেন বেশিকালা হয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সেটা শ্যামার যত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও

BanglaBook.org

কনকের চোখ এড়ায় নি। সে চুপি চুপি হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সেদিকে। বলল, 'তুমি আর দেরি করো না— বড় কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ফকিরবাবু যা জানেন তা করেছেন, এর বেশি আর ওর কাছে আশা করাও অন্যায়!

হেমও লক্ষ করল ব্যাপারটা। কিন্তু বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা তাদের নয়। নিয়ে গেল সে মৌড়ীর হাসপাতালেই। তাঁরা দেখে বললেন, 'কানের পর্দা তো ঠিক আছে, কালা হবার তো কথা নয়। সম্ভবত দুর্বলতার জন্যেই হয়েছে, একটু ভাল করে খাওয়ান দুধ-টুধ— তাহ'লেই ভাল হয়ে যাবে। তাড়াহুড়োর কাজ নয়— অত ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলছেন— তাহলে সারতে সময় লাগবে বৈকি!'

ভাল করে কীই বা খাওয়াতে পারে ওরা। খুব অসুখের সময় তবু পাঁচজন ফলটল দিত— এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ভেবে হেম একপো করে দুধের রোজানি করে দিল। তাও মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করেই। শ্যামা রুক্ষকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেন, কিসের জন্যে— ও ছেলে আমার কী স্বগ্‌গে বাতি দেবে তাই শুনি। ওর ইহকাল পরকাল সব গেছে। আমার সর্বনাশ করে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়িয়ে পঙ্গু হয়ে এসে বসলেন চিরকালের মতো— একটা বিধবা মেয়ে নিয়ে জ্বলে মরছি আবার একটা হয়ত পুষতে হবে। তার আবার অত কেন—একগাদা পয়সা খরচ করে দুধ খাওয়ানো!'

হেম বললে, 'তোমার যেমন কথা। বেটাছেলে বিধবা মেয়ের মতো বসেই বা খাবে কেন। লেখাপড়া যদি আর না-ই করে, তা ব'লে রোজগার করে খেতে পারবে না? কানটা যদি যায় বরং সেই একটা ভাবনার কথা। ওটা যাতে ফিরে পায়, সেটা আগে দেখা দরকার নয়?'

তাতেও হয় নি অবশ্য। শেষ অবধি বলতে হয়েছে হেমকে যে দুধের টাকা সে আলাদা দেবে, মাসের খরচ ছাড়া। হেম যে মাইনের সব টাকা মাকে দেয় না— এ শ্যামা জানেন। হেমও গোপন করে না। মাসে কুড়ি টাকা করে দেয় সে— এ ছাড়া সে কত রাখে, ঠিক কত তার এখন আয় তা শ্যামা জানেন না। এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ যে করতে যান নি শ্যামা তা নয় কিন্তু সুবিধা হয় নি, হেম স্পষ্টই জবাব দিয়েছে, 'এই থেকেই তো বাঁচিয়ে তুমি টাকা জমাচ্ছ, তেজারতি খাটাচ্ছ। আর দরকার কী? সবই বা ধরে দেব কেন? আমারও তো আপদ-বিপদ আছে।'

আর কিছু বলতে পারেন নি শ্যামা। আজও কিছু বলতে পারলেন না। হয়ত বলারও কিছু নেই। হয়ত এটাই চেয়েছিলেন। টাকাটা ওপক্ষ থেকে বার করার জন্যেই এত কঠিন হয়েছিলেন তিনি।

ছেলে একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই— অর্থাৎ উঠে বসবার মতো হতেই শ্যামা তাঁর নিরুদ্ধ প্রশ্নের স্রোতকে ছেড়ে দেন।

'কেন এমন হ'ল? কী করেছিলি যে ওরা এত বড় শাস্তিটা দিলে? তুই এখানে চলে এলি না কেন? এমন হয়েছিল যখন তখনই বা চলে এলি না কিসের জন্যে? কি এত লজ্জা তোর? খুন-জখম করেছিলি না রাহাজানি করেছিলি? কী জন্য তুই আমার এত বড় সর্বনাশটা করলি! এখন যদি কানটা তোর না সারে? যদি জন্মের মতো কালা হয়ে যাস? লেখাপড়া তো গেলই— এরপর যে ভিক্ষে করে খেতে হবে তা হলে! এমন করে শরীরটা পাত করলি কী কারণে? এমন দুর্বুদ্ধি কেন হল তোর আমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলো বেশ চেঁচিয়েই করেন শ্যামা। কান্তির শ্রুতিগম্য করেই। শুনতে যে পেয়েছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কারণ প্রতিক্রিয়া জাগে সঙ্গে সঙ্গেই। কথা উঠলেই সেই যে মাথা হেঁট করে—সে মাথা আর তোলে না কিছুতেই। কিন্তু উত্তরও দেয় না। একটি কথাও বলে না। দিনের পর দিন সহস্র প্রশ্ন তেমনি নিরুত্তরই থেকে যায় সেই

BanglaBook.org

প্রথম দিনটির মতো। ক্রমশ রুক্ষতর হয়ে ওঠে শ্যামার মেজাজ— ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কণ্ঠের স্বর ও প্রশ্নের ভঙ্গি দুইই কঠোরতর হয়ে ওঠে। নির্মমভাবে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন তিনি— আর এই জিনিসটা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবু কান্তির কণ্ঠ থেকে একটি শব্দমাত্র উচ্চারিত হয় না। সমস্ত প্রশ্নবাণই নিশ্ছিদ্র নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এক এক সময় প্রায় ক্ষেপে ওঠেন শ্যামা, গায়ে হাত তুলতেও যান— কনক কাছে থাকলে হাত ধরে প্রতিনিবৃত্ত করে। কিন্তু কান্তি চুপ করেই থাকে, শুধু দুই চোখ দিয়ে এই সময়গুলোয় নিঃশব্দে যে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে অবিরল ধারায়— তাইতে বোঝা যায় যে শ্যামার কথাগুলো যথাস্থানে গিয়েই পৌঁচেছে— কথাগুলোর প্রয়োগ কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় নি। বাইরের নীরবতার চর্ম ভেদ করে সে বাক্যবাণ মর্মে গিয়ে বিঁধেছে।

অবশেষে এক সময় হার মানেন শ্যামা।

হাহাকার করে ওঠেন নিজে নিজেই। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন বার বার। গাল পাড়েন তাঁর চিরন্তন ভাগ্যকে আর নবতম দুর্ভাগ্যের উপলক্ষ তাঁর এই ছেলেকে। সে সময় সমস্ত রকম শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যায় তাঁর মুখের ভাষা। কুৎসিত ইতর গালিগালাজ বেরোয় মুখ দিয়ে। দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে থাকার ফলে যা শুনে এসেছে, কিন্তু এতকাল কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারেন নি— এমন সব ভাষা। সে সময় কনকের সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হেম প্রায়ই সে সব সময়গুলোয় থাকে না— তার উপস্থিতিকালে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য ধরেই থাকেন শ্যামা—থাকলে সে ধমক দেয়, নয় তো অর্ধবিহ্বল ভাইকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দেয় সেখান থেকে।

গালাগাল দেন তিনি রতনকেও।

সে সময় এ খেয়ালও থাকে না যে তার আসল পরিচয় এতকাল সযত্নে পুত্রবধূর কাছে গোপন করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। মনে থাকে না যে এ গালাগাল তাঁদের গায়েই এসে পড়েছে। সে স্ত্রীলোকটার যে পরিচয় আজ তিনি উদ্‌ঘাটিত করছেন, সে পরিচয় জানার পর কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠানো বাপ-মা-অভিভাবকদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করার কোন অধিকার পর্যন্ত তাঁদের নেই। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়েই গালাগাল দেন, তিনি তাঁর ছেলের সর্বনাশরূপিণী সেই নারীকে। দেখতে শুনতে যদি না-ই পারবে, যদি নজর রাখা সম্ভবই না হবে— তবে কেন সে এমন করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তাঁর ছেলেকে। আর যখন বুঝল যে ওখানে রাখা আর উচিত নয়— কেন সে জোর করে পাঠিয়ে দেয় নি তার ছেলেকে তাঁর কাছে! কেন? কেন? কী এমন শত্রুতা করতে গেছলেন তিনি তার? কী তার পাকাধানে মই দিতে গেছলেন— কিম্বা বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিলেন!'

অভিসম্পাত করেন তাকে— 'সর্বনাশ হোক। সর্বনাশ হোক। যে পয়সার অহঙ্কারে এমন ধরাকে সরা দেখা, সে পয়সা যেন একটিও না থাকে— মালা হাতে করে যেন পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়। সর্ব অঙ্গ থাকতে যেন চোখটি যায় আগে। হাতে যেন মহাব্যাধি হয়।' ইত্যাদি—

তবুও কোন কথা বলে না কান্তি। শুধু নীরবে অশ্রুপাত করে বসে বসে।

উত্তর দিতে পারে না কান্তি তার কারণ উত্তর দেবার মতো কিছু নেই ওর। কিছুই বলবার নেই। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব নয় সে সুগভীর কলঙ্কের ইতিহাস। অন্তত ওর পক্ষে সম্ভব নয় এটুকু লজ্জা ও ঘৃণা তার এখনও অবশিষ্ট আছে।

যা ঘটেছিল তা বলবার আগে ওর আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। এমনিই হয়ত করা উচিত ছিল, অনেক আগেই,— এই কৈফিয়ৎ দেবার মুহূর্ত উপস্থিত হবার আগেই উচিত

ছিল এ-পৃথিবী থেকে সরে যাওয়া, কিন্তু পারে নি সে। আসলে বড় দুর্বল সে ভেতরে ভেতরে। দুর্বল বলেই পারে নি সেদিন আত্মহত্যা করতে। দুর্বল বলেই ভাগ্য ওর জীবন নিয়ে এই মর্মান্তিক খেলা খেলতে পারল।....

ঠিকই বলছেন মা। সেই সর্বনাশিনীই ওর এই দুর্গতির প্রধান কারণ—কিন্তু ওর নিজের দিক থেকেও দায়িত্ব কাটিয়ে ফেলবার উপায় নেই যে। তার সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অপরাধ একদিকের পাল্লায় তুললেও ওর নিজের অপরাধের বোঝা কিছুমাত্র হাল্‌কা হয় না— ওর দিকের পাল্লাও তেমনি ভারী হয়ে ঝুঁকে থাকে। ওর অন্যায়ও তো কম নয়। বরং আরও বেশি, আরও অমার্জনীয়। ওর অন্তরের দিকে তাকালে যতদূর দৃষ্টি যায়— সেখানেও তো কলুষ কম জমা হয়ে নেই। দেবার মতো কৈফিয়ৎ বরং তার কিছু আছে— কারণ সে যা তাই, তার বেশি নিচে তো নামে নি। কোন কৈফিয়ৎ নেই ওরই, এই জঘন্য আচরণের কোন জবাব নেই। ওর নিজের মনেই যে সীমাহীন গ্লানি আর লজ্জার ইতিহাস লিখিত হয়েছে, যে অপরাধবোধ রয়েছে পুঞ্জীভূত— তারপর আর কাউকে দোষ দিতে যাওয়া, অপরাধের দায়িত্বটা আর কারুর ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া আরও একটা বিপুলতর অন্যায় আর একটা অক্ষমণীয় অপরাধ হয়ে উঠবে।

না, দোষ ও দেবে না রতনদিকে। যদিও সে-ই হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেছে এই সর্বনাশের দিকে, অধঃপতনের দিকে। কিন্তু কান্তিও তো বাধা দেয় নি কিছু, কোন প্রতিবাদ করে নি। নিজের জন্ম, নিজের অবস্থা— আত্মীয়স্বজন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই তো ভুলে বসেছিল সেদিন। ওরই তো বাধা দেওয়া উচিত ছিল— এমন অস্বাভাবিক, এমন অন্যায় পথে পা দেবার আগে। এটুকু জ্ঞান যে সেদিন তার না ছিল তাও তো নয়— একেবারে সরল শিশু ছিল না সেদিনও। এটা ঠিক যে, এই গত কমাস একরকম বনবাসে একা পড়ে থাকতে থাকতে— রোগশয্যায় একা শুয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে যতটা গুছিয়ে ভাবতে শিখেছে সে, যতটা বয়স তার দেহের তুলনায় বেড়ে গেছে— ততটা জ্ঞান অভিজ্ঞতা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না সেদিন, তবু মোটামুটি ন্যায়-অন্যায় বোধ একটা ছিল বৈকি। কাজটা যে ভাল নয়, তাও সেদিন সে জানত। তাকে মানুষ হ'তে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে— সেইজন্যই তাকে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে— এসবও জানত। তার মা দাদা ভাইবোনেরা তার মুখ চেয়ে আছেন, সেটাও সেদিন অজানা ছিল না।...তবে?

বাধা সেদিন দেয় নি তার কারণ সেই আপাতরমণীয়, আপাতমধুর সর্বনাশের পথে নামতে তার তরফ থেকেও বুঝি উৎসাহের অভাব ছিল না।

মনে আছে তার— কিছুই ভোলে নি। প্রতিটি দিনের ইতিহাস তার মনে আছে। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বিপলের। মনে গাঁথা আছে প্রতিটি ঘটনা। চরম সর্বনাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইতিহাস।

এ ইতিহাস শুরু হয়েছে অনেকদিন— দু-তিন বছর আগেই।

সেই দাদার বিয়ের সময় থেকে। কিম্বা বলা যায় তারও আগে থেকে।

তবে ঐ সময়টায়ই প্রথম সে রতনদির আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। অদ্ভুত লেগেছিল তার ব্যাপারটা ঃ অকারণে লজ্জাও হয়েছিল একটু। এখানে যে দিন আসবে— দাদার বৌভাতের দিন—হঠাৎ নিজে হাতে ওকে সাজাতে বসলেন রতনদি। এরকম কখনও করেন নি। পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে তার আগেই অবশ্য, কিন্তু তখন অতটা বুঝতে পারে নি। কিছুদিন ধরেই পাগলের মতো ওর জন্যে জামার ওপর জামা করাতে দিচ্ছিলেন, ধুতির ওপর ধুতি কিনছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনেই। আদ্দি আব্‌রোঁয়া রেশমের পাঞ্জাবি— দেশি ফরাসডাঙ্গার দামি মিহি ধুতি। সেই সঙ্গে মুসলমান দর্জি ডেকে চুড়িদার পাজামা-আচকান।

BanglaBook.org

অবাক হয়ে যেত কান্তি, কিছুই বুঝতে পারত না রতনদির মতিগতি। প্রতিবাদ করতে যেত প্রথম প্রথম, ব্যাকুলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করত, 'এ কী করছেন রতনদি, মিছিমিছি কেন এত খরচ করছেন বলুন তো! আমার তো একগাদা জামাকাপড় রয়েছে। একেই তো কত খরচ করাচ্ছি আপনার, তার ওপর অকারণে এ সব করছেন কেন?'

রতনদি কিন্তু উড়িয়ে দিতেন কথাটা কখনও ধমক দিতেন, 'আচ্ছা আচ্ছা— হয়েছে, যাও, তোমাকে আর অত পাকা-পাকা কথা বলতে হবে না।' কখনও বা ওর কাঁধে হাত রেখে ওর মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলতেন, 'কী হবে আমার এত পয়সা রে? কার জন্যে রেখে যাব? তোকে সাজিয়ে যদি আমার সুখ হয়, করলুমই নয় দুটো পয়সা খরচ। তোর কি?' আবার এক একদিন বলতেন, 'সুন্দর চেহারাতেই তো সুন্দর পোশাকের দাম। এই তো তার সার্থকতা। আমাদের আর কি— দেখেই তৃপ্তি।'

ওঁর মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পারত না কান্তি, আরও কুণ্ঠিত, আরও অপ্রতিভ হয়ে পড়ত।

সে যে এত সুন্দর দেখতে তাও তো আগে সে জানত না। রতনদির মুখে বার বার শুনেই কতকটা সচেতন হয়েছিল সে। ইদানীং আয়নায় নিজেকে দেখে ভাববার চেষ্টা করত সত্যিই সে সুন্দর কিনা। আবার ভাবত রতনদিটা পাগল। সুন্দর সুন্দর করে এত মাথা ঘামাবার কী আছে। রতনদিও তো কী সুন্দর দেখতে। নিজেকে সাজালেই তো পারে, আর সাজাচ্ছেও তো—তবে আর কি!

আগে কুণ্ঠিত হত সে শুধু খরচের কথাটা ভেবেই। কিন্তু ঐদিন— দাদার বৌভাতের দিন থেকে লজ্জার ও সঙ্কোচের আরও একটা কারণ দেখা দিল। কেন লজ্জা তা বলা মুশকিল ছিল সেদিন— আর সেই জন্যেই কথাটা কাউকে বলতে পারে নি। প্রথমত বিয়ের দিন তো যেতেই দিলেন না রতনদি, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে; দাদার বিয়েতে একদিন বরযাত্রী গেলে এমন কি ক্ষতি হতে পারে তা তার মাথাতে যায় নি সেদিন, মনে মনে একটু ক্ষুণ্নই হয়েছিল। বৌভাতের দিন সকালেই যাবার কথা, কী খেয়াল গেল রতনদির, তাঁর সেই অত শখের দেড় ঘন্টা ধরে চান তাড়াহুড়ো করে সেরে এলেন ওকে সাজাতে। নিজে হাতে পরিপাটি করে সাজিয়ে ওর চিবুকটি ধরে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন,'সত্যি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে কান্তি, যেন সত্যিকারের রাজপুত্তর!'

আর তারপরই দুহাতে ওর মুখটি ধরে কাছে এনে একটি চুমো খেয়ে বলেছিলেন, 'যাও, সাবধানে যেও। সকাল ক'রে চলে এসো। দারোয়ান যাচ্ছে সঙ্গে, আমার হয়ে ও-ই নৌকতা করবে।'

লজ্জার পরিসীমা ছিল না সেদিন, কিন্তু তবু সে নিতান্তই নির্দোষ গ্লানিহীন লজ্জা। অনেকটা সুখের ও আত্মপ্রসাদেরও বটে। রতনদির মাথাটা খারাপ এই কথাই বার বার বোঝাতে চেয়েছিল সে নিজেকে। সেই সঙ্গে এ কথাটাও মনে উঁকি মেরেছিল যে সে সুন্দর দেখতে— আর রতনদি সত্যি-সত্যিই ছোট ভায়ের মতো দেখেন ওকে।

তবু— মনের মধ্যে অস্বস্তিও একটা কোথায় ছিল।

কেমন একটু ভয়-ভয়ও করেছিল যেন সেদিন। নাম-না-জানা ভয়। মনে হয়েছিল এতটা ভাল নয়, এতটা সইবে না। হয়ত সকলের চোখ টাটাবে, রতনদির বাবাও বিরক্ত হবেন হয়ত— ওর জন্য এত খরচ করছে জানতে পারলে।

কিন্তু রতনদির যেন সব ভয়ডর হঠাৎ ঘুচে গেল। সমস্ত হিসেবের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, এর পর থেকে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। প্রত্যহই

BanglaBook.org

ওকে নিজে হাতে সাজাতে যেতেন— ভাল ভাল দামি দামি পোশাক পরাতেন। নিতান্ত কান্তি খুব বিদ্রোহ করত বলে— ইস্কুলের সময়টা পাগলামি একটু বন্ধ রাখতেন। রতনদিদের পুরনো ঝি মোক্ষদাও ওর পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাই আরও সংযত হয়েছিলেন খানিকটা। মোক্ষদা বলেছিল, সত্যিই তো বাপু, তুমি যেন পাগল হয়েছো তাই বলে ও তো আর হয় নি যে অমনি লব-কাত্তিক সেজে ইস্কুল পাঠশালে যাবে। অপর ছেলেরা ক্ষেপিয়ে শেষ করবে যে জামাইবাবু বলে।'

কিন্তু ইস্কুল থেকে এলে আর রক্ষে নেই। ইস্কুলের জামা-কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়েই ভালভাল জামাকাপড় পরতে হবে, সেজেগুজে রতনদির কাছে বসতে হবে খানিকটা। এ সময়টা তাঁরও প্রসাধনের সময়, কান্তিকে সাজিয়ে বসিয়ে রেখে নিজে সাজতেন—কোনদিন বলতেন, 'চলো ছাদে বেড়াতে যাই।' ছাদে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে কিংবা কাঁধে হাত দিয়ে পায়চারি করতেন। কোনদিন বা শুধুই মুখোমুখি বসে গল্প করতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে বেড়াতে যাওয়া বা খেলাধুলোর পাট ছিল না কান্তির— পাড়াটা খারাপ বলে বিকেলের দিকে বেরোতে নিষেধ করতেন এঁরা, তাছাড়া তার নিজেরও ভাল লাগত না। ইস্কুলের ছেলেরা আগে আগে ওর ঐ পাড়ায় থাকা নিয়ে নানারকম বাঁকা মন্তব্য করত, ওর সম্বন্ধে একটা হীন ধারণাও করে নিয়েছিল, সেটার পুরো কারণটা না বুঝলেও ঐ পাড়ায় বাস করা যে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে শোভন নয় এটা সে বুঝেছিল। তাই যেটুকু না বেরোলে নয় সেইটুকুই শুধু বেরোত! আর পড়বার সময় তো সেটা নয়ই, মাস্টার মশাইরাও বলতেন; "All work and no play makes Jack a dull boy"—রতনদিও বলতেন, ইস্কুল থেকে এসেই আবার বই নিয়ে বসতে নেই, ওতে পড়াশুনো এগোয় না। মাথাকে বিশ্রাম দিতে হয় একটু।'

কিন্তু সন্ধ্যে হলে, যখন পড়াশুনোর সময় হত, তখনও রতনদি ওকে ছাড়তে চাইতো না। সঙ্গে সঙ্গে তেতলায় ওর ঘরে এসে বলতেন, 'তুমি পড়, আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব না, শুধু চুপ করে বসে থাকব!'

ওর ওপরের ভোল্ পালটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সে মেঝেতে পাতা তোশকের বিছানা আর নেই (যদিচ সেই শয্যাতে শুয়েই কান্তির প্রথম মনে হয়েছিল সুখস্বর্গ!), সে জায়গায় একজনের মতো বোম্বাই খাট এসেছে, গদি তোশক ঝালর-দেওয়া বালিশে সাজানো হয়েছে বিছানা। পড়বার জন্যে একটা ছোট টেবিল চেয়ারও আনিয়ে দিয়েছেন রতনদি!

কান্তি গিয়ে চেয়ার টেবিলে বই খাতা নিয়ে বসলে রতনদি ওর পাশে বিছানার ওপর বসতেন। রতনদির বর নটার আগে আসেন না কোনদিনই। আগে আগে এ সময়টা রতনদি বই পড়তেন শুয়ে শুয়ে— এখন আর বই ছোঁন না। ওঁর বর রাশীকৃত বাংলা বই কিনে পাঠিয়ে দেন, সে সব গাদামারা পড়ে থাকে। এখন ওঁর এই নতুন নেশায় পেয়ে বসেছে— হাঁ করে কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা।

চুপ করে বসে থাকব বললেই কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। রতনদিও বসতে পারতেন না। দু'চার মিনিট পরেই উশখুশ করে উঠতেন, একথা সেকথা পাড়তেন। কান্তিরও অস্বস্তি লাগত, একটা মানুষ দুহাতের মধ্যে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে— এ অবস্থায় বই-খাতায় ডুবে থাকে কী করে? ওর মাস্টার আসতেন সকালে; এক এক সময় কান্তির মনে হ'ত, মাস্টারমশাই যদি পড়াবার সময়টা বদলে দেন তো ভাল হয়। কিন্তু পাড়া খারাপ বলেই বোধ হয়— সন্ধ্যার দিকে তিনি আসতে চাইতেন না।

প্রথম প্রথম পড়ার ব্যাঘাত হত বলে এ ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগত না কান্তির— ন'টা বাজলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কারণ ন'টা বাজলেই ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক

রতনদিকে নেমে যেতে হত নিচে। জামাইবাবুর আসবার সময় হত। কিছুদিন পর থেকে আর তত খারাপ লাগত না। তারপর এক সময় কান্তি আবিষ্কার করল যে তারও ভালই লাগে এই গল্প করাটা। ক্রমশ এমনও হল যে, রতনদি নিচে চলে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন বসাতে পারত না পড়ায়। কেবলই মনের মধ্যে ঘুরেফিরে কিছুক্ষণ আগেকার কথাগুলোরই রোমন্থন চলতে থাকত। মনে হত বেশ মানুষ রতনদি। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি জমিয়ে গল্প করতে পারেন। যার ভাল হয় তার সব ভাল হয়। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি স্বভাবটিও সুন্দর। সত্যি দেখতেও কেমন চমৎকার, যখন সেজেগুজে বসেন তখন যেন মনে হয় পটে-আঁকা কোন ঠাকুর-দেবতার ছবি।... তারপর সময়ের হিসাবটাও যেতে লাগল গুলিয়ে, কোথা দিয়ে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরে নটার ঘরে আসত তা দুজনের কেউই টের পেত না। অসহিষ্ণু মোক্ষদা গলির মোড়ে 'দাদাবাবু'র গাড়ির আওয়াজ পেয়ে যখন ওপরে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠত—তখন খেয়াল হত ওদের। 'কী গো তোমাদের আর কথার ঝুলি ফুরোবে না—না কি? ওদিকে মানুষটা এসে দেখতে না পেলে যে রগ্গিরস্ত পাতালস্ত করবে তার ঠিক আছে? গাড়ি এসে ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করতেছে তাও কি কানে শুনতে পাও না? একেবারে রুন্মত্ত হয়ে বসে গপ্প করা যে দেখতে পাই— জ্ঞানগম্যি থাকে না একটু? এখনি তো রোপরে উঠে আসবে— ত্যাখন আমি কী জবাব দেব মানুষটাকে!' চমকে উঠত রতনদি, 'ওমা, নটা বেজে গেছে নাকি রে? কখন বাজল? টের পাই নি তো?'

'তা টের পাবে কেন? নটা কি আজ বেজেছে— কুড়ি পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে দ্যাখো গে যাও! বলি তোমার না হয় পয়সার অভাব নেই, ঐ গরিবের ছেলেটার মাথা খাচ্ছ কেন বল দিকি অমন কড়মড়িয়ে চিবিয়ে? নেকাপড়া তো ওর শিকেয় উঠল দেখতে পাই। একটা পাসও কি করতে দেবে না?'

'তুই থাম মুকী। তোর বড্ড আসপদ্দা বেড়েছে।' এই বলে, কান্তিরই ছোট আয়নাটায় মুখখানা দেখে নিয়ে আলতো হাতে চুলটা একটু ঠিক করে দ্রুত নেমে যেতেন রতনদি।

মোক্ষদার এই তিরস্কারের দিনগুলোতে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ত কান্তি, অনুতপ্ত হ'ত একটু। জোর করে পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করত। কিন্তু মন আবার কখন বইখাতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন শুরু করত তা নিজেই টের পেত না। সত্যি কোথা দিয়ে নটা বেজে গেল— আশ্চর্য তো! এই তো মনে হচ্ছে একটু আগেই ছাদ থেকে ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা!.... না, কাল থেকে একটু হুঁশ রাখতে হবে। রতনদিকে শাসনও করতে হবে একটু। রোজ রোজ মজার গল্প ফেঁদে ওর পড়া নষ্ট করা! আর কি বাজে কথাই বলতে পারে রতনদি, এত কথা পায় কোথা থেকে! তবে ঐ যে বইয়ের গল্পগুলো বলে—ওগুলো কিন্তু বেশ। বঙ্কিমবাবুর বইগুলো এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে পড়বে সে। রতনদির কিন্তু মনেও থাকে খুব— এক-এক সময় তো মুখস্থ বলে যায়। লেখাপড়া করলে ভাল হত।

এমনি করে কখন আবার ডুবে যায় সে রতনদিরই চিন্তায়, তা বুঝতেও পারে না। টেবিলের ওপর আলোটা জ্বলতে থাকে, বইখাতা মেলাও থাকে সামনে—ওর মুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ-পূর্বে-বসে-থাকা রতনদির শূন্য জায়গাটায় স্থির-নিবদ্ধ করে বসে বসে কত কী ভাবতে থাকে।

BanglaBook.org

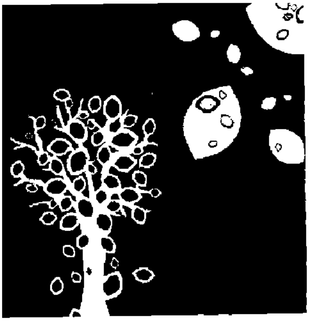

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম বিপদের সঙ্কেত পেল কান্তি একদিন মোক্ষদার কাছ থেকেই। সেদিন কী একটা হাফ-হলিডের দিন, শনিবারই বুঝি, দুপুরবেলা ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেছে যখন সে— রতনদি তখনও ঘুমোচ্ছেন। একটু ইতস্তত করল, একবার ভাবল ঠেলে ঘুম ভাঙ্গায় রতনদির। আবার কী মনে করে ওপরে উঠে গিয়ে বইখাতা নিয়েই বসল। অনেকদিনের টাস্ক জমে গেছে সব। মাস্টারমশাইদের কাছে কদিন ধরেই বকুনি খাচ্ছে— রতনদি এবার উঠে পড়লে আজও হবে না কিছু। এই বেলা সেরে নেওয়াই ভাল।

সে বিছানাতে বসে অঙ্ক কষছে, মোক্ষদা এল ঘর ঝাঁট দিতে। খানিকটা নীরবেই ঝাঁট দিল সে, তারপর কী মনে করে ঝাঁটাটা ফেলে কান্তির কাছে এসে দাঁড়াল কোমরে হাত দিয়ে।

প্রথমে অতটা বুঝতে পারে নি কান্তি। ঝাঁটার শব্দ থেমে যাওয়াও লক্ষ্য করে নি অত—হঠাৎ এক সময় কাছে একটা মানুষের উপস্থিতি অনুভব করে মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে মোক্ষদা। মুখেও তার কেমন একধরনের হাসি। সে কি কৌতুকের না অনুকম্পার— না বিদ্বেষের, তা ঠিক ধরতে পারল না কান্তি। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'কী গা মোক্ষদাদি, আমায় কিছু বলবে?'

মুচকি হাসল মোক্ষদা। বলল, 'আর কিছু নয়— বলছিনু কি আর নেকাপড়ার ঠাট কেন ঠাকুর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না! আর যে কিছু হবে না এখানে থেকে তা তো নিজেই বুঝতে পারতেছ। এই বেলা পালাও— ভাল চাও তো। তবু এখনও জাত-ধর্মটা আছে— আর কিছু দিন এখানে পড়ে থাকলে সে দুটোও যাবে, ইহকাল পরকাল দুই-ই খুইয়ে বসে থাকতে হবে। লাভ তো হবেই না কিছু উপরন্তু মার খেয়ে বেরোতে হবে এ বাড়ি থেকে, এও বলে রাখছি। মুকী আজকের লোক নয়, দেখল ঢের... ও-মাগীর ছেমো যখন চেপেছে তখন বেশি দিন আর তোমার বাঁচোয়া নেই, তোমার কাঁচা মাথাটি পরিপুন্ন করে চিবিয়ে না খেয়ে ছাড়বে না। তবে এখনও সময় আছে, যদি পালিয়ে বাঁচতে পারো তো দ্যাখো। বামুনের ছেলে তায় গরীবের ছেলে— চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্যেই বলা।'

সত্যিই সেদিন কিছু বুঝতে পারে নি কান্তি, শুধু একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল তার, অকারণেই কানের কাছটা উঠেছিল লাল হয়ে। অবাক হয়ে বলেছিল, 'তুমি কি বলছ মোক্ষদাদি, আমি তো— আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝতে যে পারবে না তা আমিও জানি! তাহলে আর তোমাকে সাবধান করতে আসবই বা কেন? এত যদি তোমার বুদ্ধি থাকত তাহলে কি আর এমনি করে নিজের

BanglaBook.org

সর্বনাশ নিজে করতে। তাহলে তো দিন গুছিয়ে নিতে। এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করতেছে— এ তোমার কী কাজে আসতেছে বলো? তেমন সেয়না শঠ্‌ঠ ছেলে হ'লে বেশ ক'রে দুয়ে বার ক'রে নিত। মাগী যেকালে ফলেন্‌ হয়েছে সেকালে কি আর কিচ্ছু হিসেব করত— যা চাইতে তাই দিত।... নাও না, তুমিও দিন কিনে গুছিয়ে নাও না— কিছু বলব না। তবু তো বুঝব একটা কাজ হচ্ছে রাখেরের। এ যে ষাঁড়ের নাদ হয়ে থাকছ। জাতও যাবে পেটও ভরবে না!'

আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে কান্তি। এ সব ভাষা তার বোধশক্তির বাইরে। 'ফলেন্‌' হওয়াটা যে কী বস্তু— তা আজও জানে না কান্তি, তবে একটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের অর্থ আন্দাজ করতে পারে বটে। কিন্তু সেদিন সবটাই দুর্বোধ্য হেয়ালি বলে বোধ হয়েছিল।

খানিকটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি কিন্তু সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না মোক্ষদাদি, তুমি একটু খুলে বলো। তুমি কি রতনদির কথা বলছ?'

'না— ওপাড়ার আসু দত্তর কথা বলছি। তুমি বেহেড্‌ বোকা, যাকে রাবর বলে তাই। আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে এ সব বলতে আসা! যাবে রধঃপাতে, তুমি যাবে— আমার কি? মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে লাভ এই— এখন যদি সাতখানা ক'রে গিয়ে নাগাও আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি!'

তারপর ঘুরে গিয়ে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে আবার সামনে এসে বলেছিল, 'তবে এও বলে রাখছি ঠাকুর, আমার সঙ্গে নাগতে এসো নি। ভাল হবে না তাহ'লে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করলে ঠকতে হয়; মনে এখো।'

সে অবশিষ্ট ঘরটুকু এক মিনিটের মধ্যে ঝাঁট দেওয়া শেষ করে পাশের ঘরখানাতে ঢুকে গিয়ে দড়াম্‌ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ও ঘরটাতে আসলে ঠাকুরের থাকবার কথা— কিন্তু মোক্ষদাদিও গভীর রাত্রে এসে ওঘরে শোয়—এ নিজে চোখে দেখেছে কান্তি। মোক্ষদা ভোরে সকলের আগে ওঠে— কিন্তু কান্তি ওঠে এক একদিন তারও আগে— ভোরবেলা চোখ মুছতে মুছতে ঐ ঘর থেকেই বেরোতে দেখেছে তাকে। তবে তাতে যে কিছু দুষ্য আছে তা ওর মাথাতে অত ঢোকে নি। সেকথা আলোচনাও করে নি সে কারুর সঙ্গে। একদিন শুধু গল্প করতে করতে রতনদির কাছে বলে ফেলেছিল, তাতে রতনদি হেসে ওর গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, 'দূর পাগল! আমার কাছে যা বললে বললে— অপর কারুর কাছে ব'লো না। ঝি-চাকরদের এ সব কথা নিয়ে মনিবদের আলোচনা করতে নেই। ও অমন হয়েই থাকে!' কী হয়ে থাকে ঠিক তা না বুঝলেও জিনিসটা যে ভাল নয় সেটা বুঝতে পেরেছিল সেদিন।

সেই মোক্ষদাদি আজ ওকে উপদেশ দিতে এসেছে!

চাকরদের কথায় মনিবের থাকতে নেই— চাকররাই বা মনিবের কথায় থাকে কেন?

রতনদিকে খারাপ বলবে কেন? আবার বলছে মাগী! আস্পদ্দা তো কম নয়! কী সাহস ওর!

কথাটা যে রতনকে আর তাকে জড়িয়ে বলা হচ্ছে এটা বুঝতে অবশ্য আরও মিনিট দুই সময় লাগল। কিন্তু তারপরই একটা অসহ্য ক্রোধে কান-মাথা আগুন হয়ে উঠল তার, ইচ্ছে হল ওঘরে গিয়ে খুব দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে সে। কিম্বা রতনদিকে ব'লে আজই ওর চাকরিতে ইস্তফা দিইয়ে দেয়। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল মোক্ষদা মানুষটি বড় সহজ নয়। যখন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে, তখনকার হিংস্র চেহারাটা ওর দেখেছে কান্তি, তাতে বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ ক'রে উঠেছে তার।

তাছাড়া— রতনদির বাবা মামাবাবু পর্যন্ত ওকে কতকটা ভয় করে চলেন তা সে দেখেছে। এতদিনের পুরনো ঝি, তার নামে লাগাতে গেলে ওর কথা কি বিশ্বাস করবে

BanglaBook.org

কেউ? রতনদিও হয়ত শেষ পর্যন্ত জবাব দিতে পারবেন না—মায়ায় পড়ে। মাঝখানে থেকে প্রবল শত্রু সৃষ্টি হবে শুধু শুধু। ঐ যা বলেছে মোক্ষদাদি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা ঠিক নয়।

সুতরাং মনের রাগ মনের মধ্যেই পরিপাক করতে হয় কান্তিকে। কোন কালেই কাউকে চড়া কথা বলা অভ্যাস নেই ওর, চিরদিন সকলকে ভয় ক'রেই এসেছে—চেষ্টা করলেও হয়ত ভাল ফল হবে না, উল্‌টে মোক্ষদার মুখ থেকে আরও কতকগুলো কটু কথা শুনে চলে আসতে হবে মাথা হেঁট ক'রে।

চুপ ক'রে বসেই থাকে তাই কান্তি। বই-খাতা সামনে খোলা থাকে, কলমের কালি নিবের ডগায় শুকিয়ে যায়—বার বার কালিতে ডুবিয়ে কাজ শুরু করতে চেষ্টা ক'রে, বার বারই হাত থেমে যায় কখন।

রাগের প্রথম প্রবলতাটা কেটে যাবার পর আর একটা কথাও ওর মনে হ'ল। আচ্ছা, মোক্ষদাদি যে কথাগুলো বল গেল তার কতকটা কি ঠিকও নয়। অধঃপথে যাওয়ার কথাটাতে ঠিক কতকটা কি বলতে চাইছে তা নয় বুঝলেও—পড়াশুনো যে তার হচ্ছে না কিছুদিন থেকেই, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এতদিন ইস্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে বলেই মান ছিল তার, ইদানীং সে নাম একেবারে ঘুচতে বসেছে। ক্লাসের পড়া পারে না, মাস্টারমশাইদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়—বকুনিও খায় সেজন্যে। পর পর তিন-চার দিন হোমটাস্ক দেখাতে না পারায় অঙ্কের মাস্টার প্রফুল্লবাবু ওকে সেদিন বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়েও দিয়েছিলেন। অথচ ঐ প্রফুল্লবাবু কী ভালই না বাসতেন ওকে। শুধু দাঁড় করিয়েই দেন নি—খুব বকেও ছিলেন। বলেছিলেন, 'পিপুল পাকছে বুঝি! হবেই তো, যে পাড়ায় আর যে বাড়িতে থাকো! এতদিন পাকে নি তাই আশ্চর্য। তা আর বেঞ্চিটা জোড়া ক'রে রেখেছ কেন বাবা, যাও না, পান-বিড়ি খেয়ে ইয়ারকি দিয়ে ঘুরে বেড়াও না—তোমারও সুবিধে হবে, আমাদেরও হাড় জুড়োবে।'

সেদিন খুব রাগ হয়েছিল প্রফুল্লবাবুর ওপর। বিশেষত 'যে বাড়ি' বলাতে। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল সেটাও চোখ এড়ায় নি ওর। দারুণ অপমান বোধ হয়েছিল। কিন্তু আজ ভেবে দেখল প্রফুল্লবাবু কিছু মিছে বলে নি। দোষ তো তারই। পড়াশুনো করতে এসেছে সে, এমনিই তো অনেক বেশি বয়সে ইস্কুলে পড়ছে—তার ওপর যদি এমনভাবে বকে যায়—। আর বকে যাওয়া না তো কী।

মোক্ষদাদি যা বলেছে ওর হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই বলেছে। রাগ না ক'রে কথাটা ভেবে দেখাই উচিত ওর! সত্যিই তো, গরিবের ছেলে, মানুষ হবে, মানুষ হবে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে এই আশাতেই তো মা-দাদা তাকে এত দূরে ফেলে রেখেছেন। তা যদি না-ই হয় তো এখানে থেকে লাভ কি? বাড়িতে চলে গেলে তবু তাঁদের সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারে।

না, মোক্ষদাদি ভালই করেছে ওকে একটু সাবধান ক'রে দিয়ে। এবার থেকে সাবধান হয়ে চলবে। রতনদির আর কি, তাঁর সময় কাটে না—তাই ওর সঙ্গে বসে গল্প করেন কিন্তু তাঁর তো মাথার ওপর এত দায়িত্ব, এত ভাবনা নেই।...

সে আবারও দোয়াতে কলম ডোবায় একবার।

কিন্তু রতনদিকে কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মনে হয়। সত্যিই তো, তার কে আছে? বর আসে রাত নটায়, এসেই মদ খেতে শুরু ক'রে। এক একদিন চেঁচামেচি মারধোর কত কী না হয়। তারপর খেয়ে ঘুমোল, ভোর হ'তে না হ'তে তো চলে গেল। মামা-বাবু নিজের খাওয়া, তামাক খাওয়া আর আরাম এই নিয়েই থাকেন। ঝি-চাকররা বোঝে শুধু পয়সা। রতনদির মুখের দিকে কে চায়! না একটা বন্ধু-বান্ধব না কোন আত্মীয়স্বজন। কথা কইবার

BanglaBook.org

পর্যন্ত লোক নেই এ বাড়িতে, সারাদিন মুখ বুজে মানুষ থাকতে পারে! কখনও কখনও দৈবাৎ ওর বরের বন্ধু-বান্ধব দু-চারজন আসে, তবু দুটো বাইরের মানুষের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু তারাও সব মাতাল। তারাও এসে মদ খেতে শুরু ক'রে—দু-একজন তো ঘুমিয়েই পড়ে, ধরাধরি ক'রে গাড়িতে তুলে দিতে হয়। এক-একজন বমি ক'রে ভাসায়। সে কী দুর্গন্ধ! সে সব পরিষ্কার করতে হয় তখন মোক্ষদাদিকেই। ঐ জন্যেই ওর আরও জোর। ...থিয়েটার-বায়স্কোপ তাই বা কবে যায়। একবার এক সপ্তাহ রতনদির বর কোথায় গিয়েছিল বাইরে, একেবারে তিন-চার দিনের মতো থিয়েটার-বায়স্কোপের টিকিট কিনে দিয়ে গিয়েছিল। হুকুম ছিল মোক্ষদাকে নিয়ে যাবার। সব নাকি ফিমেল সীটের টিকিট। তারই মধ্যে একদিন দারোয়ানকে দিয়ে লুকিয়ে একখানা টিকিট কিনে রতনদি তাকেও নিয়ে গিয়েছিল। 'সীতা' পালা—বড় দুঃখের কিন্তু চমৎকার পালা। দেখে এসে যত কেঁদেছে কান্তি তত উচ্ছ্বাস করেছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রতনদির জীবনটা কি। কী আছে ওঁর সাধ-আহ্লাদ—বলতে গেলে বন্দী হয়ে আছেন। পয়সা আছে ঢের, বর অনেক পয়সা দেয় ঠিকই—কিন্তু পয়সাই কি সব! পয়সা খরচ করার ও তো উপায় নেই নিজের খুশি-মতো। শুধু তার মা'র ভাষায়, 'ভূত-ভোজন করানো'। সেই জন্যেই তো আরও বিনা দরকারেও কান্তির জামার ওপর জামা করিয়ে দেন, কাপড়ের ওপর কাপড় কেনেন আর একটুখানি গল্প করবার জন্যে ছুটে ছুটে আসেন, হ্যাঙ্গালি জ্যাঙ্গালি করেন। ...

অর্থাৎ আবারও কখন ডুবে গিয়েছিল ঐ রতনদির চিন্তাতেই। সেটা খেয়াল হ'ল খোদ রতনদির ঘুম ভেঙে ওর খোঁজে ওপরে উঠে আসতে।

'বা রে ছেলে, কখন ইস্কুল থেকে এসে চুপি চুপি ঘাপ্‌টি মেরে ওপরে বসে আছ! আমাকে ডাকতে নেই বুঝি! আমি বলে আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছি যে তুমি সকাল ক'রে এসে ডাকবে, পেট ভরে গল্প করব। আজ তোমার সঙ্গে বসে মুড়ি বেগুনি খাব শখ হয়েছে। তা আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি—জানি ঠিক এসে ডাকবে।... ডাকো নি কেন? আমি যদি মুকীকে না জিজ্ঞেস করতুম তো টেরই পেতুম না যে চারটে বাজে।'

যে সব ভাল ভাল কথা এতক্ষণ ধরে ভেবে রেখেছিল গম্ভীরভাবে গুছিয়ে বলবে বলে—তা এর পর আর বলতে মন সরে না। যে মানুষটা সকাল থেকে আয়োজন ক'রে রেখেছে তার সঙ্গে গল্প করবে—তাকে কোন্ প্রাণে বলবে যে, 'আর তোমার সঙ্গে গল্প করব না আমি, গরীবের ছেলে পড়তে এসেছি, লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তুমি আর আমার পড়াটা মাটি করতে এসো না।'

কিছুই বলা হয় না তাই। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে বরং—যে কথাগুলো বলবে বলে ভেবে রেখেছিল—সেই কথাগুলো মনে ক'রে। তার বদলে কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে বলে, তা নয়। এই টাস্কগুলো—। অনেক দিন হয়ে গেল কিনা, আমারই গাফিলি। আজ বড্ড বকুনি খেয়েছি। তাই ভাবছিলুম—তা যাক, না হয় রাত জেগে সেরে নেবো।

'টাস্ক না দেখাবার জন্যে বকুনি খেয়েছ? তা কৈ বল নি তো! সকালে মাস্টার-মশাই কী করেন? তিনি করিয়ে দেন না কেন?'

'না, তাঁর অত সময় হয় না। আর এ তো আমারই করবার কথা। তিনি কষে দিয়ে গেলেও আমাকেই তো খাতায় তুলতে হবে।'

'তাই তো! সত্যি, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে— রোজ তোমার সময় নষ্ট করি। ক্লাসের প্রথম ছেলে তুমি — তুমি আঁক কষে না নিয়ে গেলে কী মনে করবেন তাঁরা। যৎপরোনাস্তি ম্লান হয়ে যায় রতনদির মুখ, 'তা তুমি ভাই অঙ্ক কষো, আমি এখন যাই।

BanglaBook.org

তোমার টাস্ক সারা হ'লে বরং নিচে যেও। তখনই বরঞ্চ মুখ-হাত ধুইয়ে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দেবো। আমি তোমার চা-জলখাবার এখানেই দিয়ে যেতে বলছি।'

রতনদি একেবারে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর সেই ম্লান মুখের দিকে চেয়ে, অপ্রতিভ করুণ কণ্ঠস্বরে কান্তির বুকের মধ্যটা যেন কেমন ক'রে উঠল। সে যা কখনও ক'রে না তাই ক'রে বসল। কিছু না ভেবে-চিন্তেই খপ ক'রে রতনের একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'না না, রতনদি তুমি যেও না। একটু বসে যাও। টাস্ক আমি রাত্রে ঠিক সেরে ফেলব।'

ঝোঁকের মাথায় ধরে ফেলেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেই সঙ্গেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এর আগে কখনও 'তুমি' বলে নি রতনদিকে। বলা উচিতও নয়। সে আরও লাল হয়ে মাথা নামাল, দেখতে দেখতে তার কপাল গলা ঘেমে উঠল— ভয়েও বটে, তার এই ধৃষ্টতা কী চোখে দেখবেন রতনদি, যদি রেগে যান এই ভয়ে— আর লজ্জাতেও বটে।

কিন্তু রতনদি রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। উল্‌টে তাঁর চোখ মুখ যেন মনে হ'ল আনন্দে জ্বলে উঠল। যেন কৃতার্থই হয়ে গেলেন তিনি। একটু ইতস্ততও করলেন, একবার বসতেও গেলেন আবার, কিন্তু তারপরই মন শক্ত ক'রে নিলেন যেন। উঠে দাঁড়িয়ে কেমন এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, 'অমন ক'রে প্রশ্রয় দিও না— কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই। অত নরম হলে দুনিয়ায় টিকতে পারবে না... আমি এখন যাই— সন্ধ্যের সময় আবার আসব বরং। তুমি কাজ সেরে ফেল—'

চলে গেলেন রতনদি সত্যি-সত্যিই। কিন্তু তিনি যে খুব ব্যথা পেয়েই গেলেন, সেই কথাটা মনে ক'রে কান্তির মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণের প্রতিজ্ঞা তো ভেসে গেলই— উপরন্তু যেটুকু লেখাপড়া এতক্ষণ জোর ক'রে হচ্ছিল বার বার চেষ্টার ফলে, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। রতনদির ম্লান মুখ, তাঁর করুণ কণ্ঠস্বর আর শেষের এই কথাগুলো— সব জড়িয়ে কেবলই মনে হ'তে লাগল— এত সব থাকতেও রতনদির কিছু নেই, রতনদি বড় দুঃখী। বড় দুঃখেই ছুটে ছুটে আসে তার কাছে। এই একটুখানি যা তার সান্ত্বনা— তা থেকেও বঞ্চিত করল কান্তি। না বললেই হ'ত টাস্কের কথাটা, কেন বলতে গেল! ভারী অনুতাপ হ'তে লাগল।

॥ ২ ॥

অতঃপর সোজাসুজি বই-খাতা গুটিয়েই বসে রইল সে। মোক্ষদা এল না— আজ স্বয়ং ঠাকুর এসে ওর চা-জলখাবার দিয়ে গেল। আজ আর বাঁধা-বরাদ্দ ঘরে তৈরি পরোটা নয়— কান্তি যা ভালবাসে বেছে বেছে তা-ই আনিয়েছে রতন। বড় বড় হিংয়ের কচুরি, আলুর দম— তার সঙ্গে খাস্তা গজা। দুঃখই করুক অভিমানই করুক— রতনদির স্নেহ তার প্রতি কিছুমাত্র কমে নি—এই খাবার আনানোতে আর এক দফা তাঁর অপরিসীম স্নেহেরই পরিচয় পেল কান্তি।

এর পর বসে বসে প্রায় ছটফট করতে লাগল সে। রতনদি যে নিজেই উঠে আসবেন একটু পরে কিম্বা ডেকে পাঠাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। থাকতে পারবেন না কিছুতেই। সেইটেরই অপেক্ষা করছে সে, তার আগে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু অপরাহ্ণ ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে এল, আবছা হয়ে এল বাড়ির ভেতরের দিকটা, তবু রতনদির তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। এই সময় প্রসাধন শেষ ক'রে চা খেয়ে প্রায় রোজই ওপরে ওঠেন। তবে আজ এমন চুপচাপ কেন? সত্যি বটে একবার বলেছিলেন— ওকেই নিচে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলাতে, সেইটেই ধরে বসে আছেন নাকি? বেশ মজার লোক তো! আবার যে বলে গেলেন, 'আমি বরং সন্ধ্যের সময় আসব'— সেটা ভুলে গেলেন! কিন্তু এ ভুল তো স্বাভাবিক নয়। কান্তি বেশ জানে ওদের

BanglaBook.org

এই সান্ধ্য আসরে মন পড়ে থাকে তাঁর। তবে কি সত্যি সত্যিই খুব অভিমান হয়েছে? চাপা মেয়ে, অভিমান চেপে অন্য রকম বলে চলে গেলেন?

সে আর থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। অন্য দিনের চেয়ে একটু সন্তর্পণেই নামল। কেন যে এই সতর্কতা তা সে জানে না। এটা যে সঙ্কোচ — এবং এ ধরনের সঙ্কোচের যে কোন কারণ নেই, সে সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়, আপনা থেকেই পা টিপে টিপে নামল। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে—মোক্ষদা নিচে রান্নাঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছে দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। এর পর নিশ্চিন্ত হয়েই ঢুকল রতনদির ঘরে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল সে। ঘরে আলো জ্বালা হয় নি, এখনও বেশভূষা সারা হয় নি রতনদির, চুলটা পর্যন্ত বেঁধে দিয়ে যায় নি মোক্ষদা— যেমন সেই বিকেলে ওর কাছে গিয়েছিল তেমনি অবস্থাতেই আছে এখনও। সেই ঘুম-থেকে-ওঠা সাধারণ-কাপড়-পরা আলুথালু অবস্থা। ঝুপসি অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে আছেন নিচের ঢালা বিছানাটাতে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে— সামনে হাতের কাছে একটা গেলাসে লাল-পানা কী শরবতের মতো।

কী যে সেটা, তা আজ আর বলে দিতে হল না। গন্ধতেই টের পেয়েছে। এতদিনে গন্ধটার সঙ্গে ভাল রকম পরিচয় হয়ে গেছে ওর। সে একটা চাপা আর্তনাদের মতো 'রতনদি' বলে ডেকে কাছে গিয়ে বসে বলে উঠল, 'এ কী করছ রতনদি, এমন ক'রে বসে এখন থেকেই মদ খাচ্ছ!' তারপর কেমন একটু অসংলগ্নভাবেই বলল, 'আমার ওপর রাগ করেছ রতনদি? কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে এ কাণ্ড কেন করতে গেলে। ছি ছি!'

ওর ওপর রাগ করেই এই কাণ্ড করেছেন রতনদি, এটা মনে করবার তার কোন অধিকার নেই— এটাও এক রকমের ধৃষ্টতা, অনধিকারচর্চা তো বটেই — কিন্তু সে সব কথা সে মুহূর্তে মনে এল না ওর। আবারও যে সে 'তুমি' বলছে তাও লক্ষ্য করল না।

বরং আরও আবেগের সঙ্গে, ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই রতনের একটা হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, 'ওঠো— উঠে বসো রতনদি — লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি গা-হাত ধুয়ে নাও। এ সব ছাইভস্ম আর এখন থেকে শুরু করো না। মাথায় বরং জল দাও একটু — নইলে সন্ধ্যে থেকেই মাথা ধরবে হয়ত।'

এতক্ষণ পাথরের মতোই বসে ছিল রতন, কিন্তু ওর এই স্পর্শে যেন পাষাণী প্রাণ পেল। হাতটা কান্তির হাতের মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে-ই দুহাতে চেপে ধরল কান্তির দুটো হাত। তারপর প্রবল আকর্ষণে ওকে আরও খানিকটা কাছে টেনে এনে বলল, 'সাধ ক'রে কি খাই। না খেয়ে উপায় কি বল্? দুঃখ ভুলতে পারি আর যে আমার কিছু নেই, কেউ নেই। ওরে আমি যে বড় দুঃখী, কত যে দুঃখী তা তুই বুঝবি না।'

'কে বললে বুঝব না রতনদি। আমি বুঝেছি তোমার দুঃখ। বুঝেছি ব'লেই তো ছুটে এসেছি। কেউ নেই তোমার কেন এ কথা বলছ— আমি তো আছি। আমি তো তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি।... তুমি এখানে এমনি ক'রে বসে না থেকে আমার কাছে গেলে না কেন, অন্যদিনের মতো জোর ক'রে ডেকে নিলে না কেন? কেন এমন অন্ধকারে একা বসে ঐ সব বিষ খাচ্ছ?'

'একটা বিষ নামাতে এই বিষ খাচ্ছি— বুঝলি? নইলে সে বিষে সব ছারখার হয়ে যাবে। তুই যা ভাই আমার কাছে আর থাকিস নি। নয়ত এ বিষে তুইও জ্বলে পুড়ে মরবি। তুই কালই বাড়ি চলে যা!'

আর যা ই হোক ঠিক এ কথাটা আশা ক'রে নি কান্তি। সে একেবারে আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল। রতনদির রাগ হয়েছে, অভিমান হয়েছে— এটা সে আগেই আশঙ্কা করেছিল

BanglaBook.org

কিন্তু ঠিক এতটা যে হয়েছে, তা বুঝতে পারে নি। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় ভেঙে-আসা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ রতনদি, আমি— আমি তো বলি নি কিছু। আমি তো বললুম রাত জেগে সেরে নেব পড়া— তুমিই তো চলে এলে। আমার ঘাট হয়েছিল টাস্কের কথা তোলা। সত্যি বলছি, আর কখনও বলব না। এই বারটি মাপ করো আমাকে!'

সে হাত দুটো রতনের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যিই দু হাত জোড় করল।

অকস্মাৎ যেন পাগল হয়ে গেল রতন। একটা প্রবল ধাক্কায় ওকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল, 'যা বলছি আমার সামনে থেকে, দূর হয়ে যা! নাকী কান্না কেঁদে আমার মন ভোলাতে এসেছ! যত সব মায়াকান্না! ওসব আমি ঢের দেখেছি। দূর হ হতভাগা। কাল সকালে উঠে যেন তোর মুখ আর আমাকে না দেখতে হয়। আমি ওঠবার আগে বই-খাতা জামা-কাপড় সব নিয়ে চলে যাবি— কোন চিহ্ন না থাকে তোর!'

চাপা হিংস্র গলায় কথাগুলো বলে যেন হাঁপাতে থাকে রতন।

ওর এ চেহারা বহুকাল দেখেনি কান্তি। অনেক দিন আগে একেবারে গোড়ার দিকে একদিন সকাল বেলা স্নান করার আগে মদের খোঁয়াড়ি না ভাঙা অবস্থায় দেখে বকুনি খেয়েছিল—সেই সময় কতকটা এইরকম চেহারা দেখেছিল ওর। কিন্তু তাও এতটা নয়। বাঘিনী কেমন তা জানে না সে, কখনও দেখে নি— কিন্তু বই পড়ে যা ধারণা হয়েছে তার— হঠাৎ মনে হল রতনদি আর মানুষ নেই, সেই বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এল সে সেখান থেকে। অপমানে দুঃখে দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল আসছিল ভরে, গলা অবধি ঠেলে উঠছিল কান্না— কিন্তু এখানে এর পর চোখের জল ফেলতেও সাহস হল না ওর। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু চেপে পা পা ক'রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে ওপরে চলে এল।

নিজের ঘরে এসে কান্না আর কোন শাসন মানল না। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো শব্দ করেই কাঁদতে লাগল সে— ছেলেমানুষের মতো। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। অপমান তো বটেই, দুঃখও তার কম হচ্ছিল না। বিনা দোষে সে এমনি লাঞ্ছিত হল, সেইটেই আরও দুঃখ। কেন এমন হয়ে গেল রতনদি, এতদিনের স্নেহ ভালবাসা একদিনে ভুলে গেল! নাকি বড়লোকের ধরনই এই? এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য—এত হাসি তামাশা গল্প-গুজব একসঙ্গে খাওয়া বসাতেও কান্তি কিছুমাত্র আপন হতে পারে নি রতনদির, কিছুমাত্র কাছে পৌঁছাতে পরে নি। দুজনের অবস্থার মধ্যে— ভিক্ষাদাতা ও গ্রহীতার যে দুস্তর ব্যবধান তা ঠিক রয়ে গেছে। তাই না আজ রতনদি এমন ক'রে অনায়াসে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারল তাকে!.... ওদের গরীবের ঘরে ছেঁড়া জুতোও বুঝি এমন ক'রে ফেলে না।.... এখন ও বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে, কি কৈফিয়ৎ দেবে? তাঁরা কি বিশ্বাস করবেন যে কান্তির সত্যিই কোন দোষ ছিল না? তাই কি কেউ বিশ্বাস ক'রে? যেখানে এত আদর-যত্ন সেখান থেকে বিনা দোষে বিতাড়িত হয়েছে— এ তো বিশ্বাস করার কথাও নয়।

ছি ছি, এর চেয়ে মরে যাওয়াও ঢের ভাল ছিল। আজকের রাতটা শেষ হবার আগে কোন রকমে তার মৃত্যু হয় না?

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে এমনি এলোমেলো আবোল-তাবোল কত কী কথা ভাবতে লাগল সে। মুখেও দু'একটা কথা বেরিয়ে এল। ভাগ্যে এ সময়টা ওপরে কেউ থাকে না। নইলে পাগল ভাবত তাকে! সে চেষ্টা ক'রেও যে সামলাতে পারছে না নিজেকে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর অনেকটা শান্ত হয়ে উঠে বসল। বিছানাটা ভিজে গেছে ওর চোখের জলে, মোক্ষদাদি এসে দেখলে কী মনে করবে! যদি প্রশ্নই ক'রে— কিসে

BanglaBook.org

ভিজল? অবশ্য রাত্রে বড় একটা ওপরে ওঠবার সময় পায় না। তবু— আসতেও তো পারে। ছিঃ— যদি জানতে পারে, সে বড় লজ্জার কথা হবে।

দুঃখের প্রথম আবেগটা কেটে গিয়ে এইবার মনে হল— তাহলে কী সত্যিই বই-খাতা গুছিয়ে নিতে হবে তাকে? জামা-কাপড় সে নেবে না, যেমন একবস্ত্রে এসেছিল তেমনি একবস্ত্রে চলে যাবে। ওসব ভাল জামা-কাপড় যাকে খুশি দিন রতনদি, নয়ত জ্বালিয়ে দিন—ওতে কান্তির কোন দরকার নেই। আবার মনে হ'ল সত্যিই কি রতনদির ওটা মনের কথা? নেশা কেটে গেলে আবার ওকে খুঁজবে — আনতে লোক পাঠাবে? নিশ্চয়ই তাই। কী একটা ভেবে দুঃখ হয়েছিল, তাই মদ খেতে শুরু করেছে — আর মদ খেলেই তো রতনদির অমনি মেজাজ হয়। মাতালের কথা কি ধরা উচিত?

ভাবতে ভাবতে বেশ একটু জোর পেল মনে। সোজা হয়ে উঠে বসল। হাসি পেতে লাগল নিজের ছেলেমানুষিতে। মিছিমিছি এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল ক'রে তুলে নিজেই কষ্ট পেল সে। রতনদির এত স্নেহ— এমন একদিনে মুছে যেতে পারে না। এই তো ক'বছরই দেখছে তাঁকে, এক-আধদিন তো নয়, তা সত্ত্বেও এমন ভুল বুঝতে পারলে কী ক'রে আশ্চর্য!

আবার এক সময়ে মনে হল— কিন্তু যদি সত্যিই বলে থাকেন। ওটা যদি তাঁর অন্তরের কথাই হয়? হয়ত কী শুনেছেন কার কাছে, হয়ত মোক্ষদাদিই মিছে ক'রে কী লাগিয়েছে ওর নামে— সত্যিসত্যিই রেগে গেছেন। যদি তাই হয়, কাল সকালে ওকে দেখে যদি এমনি রেগে ওঠেন, সকলকার সামনে যাচ্ছেতাই করেন? সে যে আরও অপমান!....

অনেকক্ষণ বসে ভাবল কান্তি। অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেল না। কী করবে, কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পালল না। খাবার সময় হতে ঠাকুর যখন ডাকতে এল, একবার ভাবল সহজভাবেই গিয়ে খেয়ে আসবে— কেউ না কিছু সন্দেহ ক'রে, লোক-জানাজানি না হয়! আবার ভাবল, খেতে গেলেই সে সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে, কারণ এখন তার যা অবস্থা, একগালও বোধ হয় খেতে পারবে না। সমস্ত দেহটা ভেতরে ভেতরে থরথর ক'রে কাঁপছে— গা বমি-বমি করছে সর্বক্ষণ। সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার শরীরটা ভাল নেই ঠাকুরমাশাই, আজ আর কিছু খাব না। তখন ঐ সব খেয়ে বোধ হয় অম্বলমতো হয়েছে— গা গুলোচ্ছে বড্ড!'

ঠাকুর অবশ্য তাই বুঝেই নেমে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই দেখা দিল মোক্ষদা-ঝি।

'বলি ব্যাপারটা কি বল তো ঠাকুর— খোলসা ক'রে বল দিকি আমায়? আমার সেই দোপর বেলাকার কথাতেই মন ভারী হল নাকি? নাকি দুজনে সোহাগের আগাআগি হয়েছে? আমার কথাগুলো নাগানো হয়েছে বুঝি?'

'না—মাইরি বলছি মোক্ষদাদি, এই বিদ্যে ছুঁয়ে বলছি, তোমার কথা কাউকে একটাও বলি নি! বিশ্বাস করো!'

'তা যদি বল নি বাপু তা হ'লে দুজনেরই মেজাজ গরম কেন? আগাআগিটা হল কী নিয়ে? উনি তো মান ক'রে পড়ে ছিলেন এতক্ষণ— নিহাৎ নটা বেজে দেখে ত্যাখন উঠে যেমন তেমন ক'রে কাপড় বদলে চুল বেঁধে নিলেন, তুমি তো নাহারনিদ্রাই ছেড়ে দিলে! আবার দিদিবাবুর হুকুম হয়েছে, দাদাবাবুর সরকারমশাইকে জোর তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়েছেন, কালকের মধ্যেই কোথায় বোর্ডিংওলা রিস্কুল আছে খোঁজ ক'রে দেখে তোমাকে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসতে হবে। তোমাকে উনি এ বাড়িতে আর আখবেন না!.... এসব তো অমনি অমনি হয় না বাপু— কারণ একটা আছে। এ সমিস্যেটা কী হল আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দিকি!'

BanglaBook.org

এ আবার এক নতুন খবর। মন্দের ভাল অবশ্য। তাড়িয়ে দেবেন না বাড়িতেও যেতে হবে না— বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন। একদিক দিয়ে হয়ত খুবই ভাল হল। পড়াশুনোটা হবে। তবে বাড়িতে কী বলবে, সে কথাটা থেকেই যাচ্ছে যে!

আর, আর যেটা—সেটা হ'ল রতনদি আর তাকে এ বাড়িতে রাখতে চান না। তাকে দেখতে চান না তাঁর সামনে। সে কি তারই মঙ্গলের জন্যে— না সত্যিসত্যি তার ওপর রেগে গেছেন?

'কী গো, মুখে আ নি কেন? শরীর সত্যি খারাপ, না আগ হয়েছে? — বল তো খাবার রোপরে পৌঁছে দিয়ে যাই। খাও নি শুনলে কাল সকালে আমাদের কারুর ধড়ে মাথা থাকবে না!'

'না মোক্ষদাদি, রতনদি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, আমার আর মুখ দেখতে চান না। আমি খাই নি শুনলে কিছুই বলবেন না আর, খোঁজও করবেন না!'

'হুঃ!' অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে ওঠে মোক্ষদা, টক্ ক'রে জিভেরও একটা আওয়াজ ক'রে, তারপর যেন একপাক নেচে নিয়ে বলে, 'ইল্‌লো! মরে যাই লো!.... তা আর না। বেরক্ত হয়েছে! বেরক্ত হওয়া কাকে বলে তা আর কি আমি জানি না! ওসব সোয়াগের কোঁদল— আত পোয়াতে যা দেরি, আত পোয়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে ঐ বোটিং মোটিং-এ যেতে দেবে ভাবছ? তবেই হয়েছে। তবেই চিনেছ মেয়েজাতকে। মিছিমিছি সরকারমশায়ের অদেষ্টে হয়রানি আছে, ঘুরে মরবে। ওগো ঠাকুর, এই মুকী ঝির রনেক বয়স হয়েছে— অনেক দেখেছে এ।.... নাও, নাও, সোজা হয়ে বসো দিকি। চোখে জল দাও। কেঁদে কেঁদে তো চোখ ফুলিয়েছ দেখছি। একেই বলে ছেলে-মানুষ। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করা ঠিক নয়, কাঁচা বয়স এখন তোমাদের— বলে, আত-উপোসী হাতি পড়ে। খাবার আমি রোপরে দিয়ে যাচ্ছি, লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে শুয়ে পড়ো সকাল সকাল। ওসব আগআগি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে।'

তারপর যেতে গিয়েও ফিরে এসে— গলাটা আরও নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বলে, 'বরং যদি সেয়ানা হও তো এই তালে কিছু রাদায় ক'রে নাও মোটামুটি। দু' দণ্ড মান ক'রে বসে থাকলেই যথাসব্বস্ব দিয়ে মেটাবে। নতুন নেশা তো— তার জন্যে সব করতে পারে। হি-হি!'

চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়তে পড়তে চলে গেল মোক্ষদা।

॥ ৩ ॥

রাত্রে ঘরের দোর দিয়ে শোওয়ার অভ্যাস ছিল না কান্তির। কৌটোর মতো চারিদিক আঁটা বাড়ি, সদর দরজা বন্ধ হলে আর একটা মাছিরও ঢোকবার উপায় নেই কোনদিক দিয়ে— এমন সব বন্দোবস্ত করা। তাছাড়া কীই বা আছে তার ঘরে যে চোর ঢুকবে? বইখাতা কতকগুলো—দু'-একটা জামা কাপড়, এই তো। বেশি জামাকাপড় নিচেই থাকে আজকাল রতনদির দেরাজে। যেদিন মনে পড়ত সেদিন দরজাটা ভেজিয়ে দিত শুধু, আর যেদিন পড়তে পড়তে খুব ঘুম পেয়ে যেত, সেদিন কোনমতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত, দরজার কথা মনে থাকত না। রাত্রে মোক্ষদা বা ঠাকুর শুতে আসবার সময় কপাটটা হয়ত টেনে দিয়ে যেত।

সেদিনও খোলাই ছিল দরজা। ভেজানো কপাট প্রায় নিঃশব্দেই খুলেছে— তবু খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে কান্তির। কারণ বহু রাত অবধি ঘুমোতে পারে নি সে— এলোমেলো চিন্তায় আর পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল ঘুম আসে নি তাই। একেবারে শেষের দিকে, হয়ত এই ঘণ্টাখানেক আগে একটু তন্দ্রা এসেছে। তাও খুব পাতলা ঘুম— সামান্য শব্দে জেগে উঠেছে আবার।

কে একজন তার ঘরে ঢুকছে!

তখনও ঘুমের ঘোর রয়েছে চোখে— এবং মনেও। অনিদ্রার গ্লানি আর অতৃপ্ত নিদ্রার জড়তা তখনও জড়িয়ে আছে তাকে। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, কিন্তু আওয়াজটা ভাল ক'রে বেরোল না গলা দিয়ে। আরও যে চেঁচিয়ে উঠতে পারল না, তার কারণ উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই, 'কে' বলে প্রশ্ন করার সময়েই, তার মনে হল রতনদি। রতনদি ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু এ সময় এমনভাবে রতনদির আসাটা এতই বিস্ময়কর, এতই অবিশ্বাস্য যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চাইল না।

'রতনদি?' বলে প্রশ্ন করতে গেল সে, কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার— ভাল ক'রে স্পষ্ট উচ্চারণও করতে পারল না। অস্ফুট একটা স্বরই বেরোল শুধু কোন রকমে।

মূর্তিটা আরও কাছে এল। আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ সবে উঠেছে— পূর্বমুখী দরজা দিয়ে ভেতরে এসেও পড়েছে তার এক ফালি আলো। তাতেই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মুখচোখ খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই— তার অত দরকারও নেই। এ সবই পরিচিত ওর। ঐ বেশভূষা, ঐ চলবার ভঙ্গি, দেহের গঠন! সেই চওড়া কালাপাড় দেশী শাড়িটা—হাতে সেই ফারফোরের বালা ঝিকঝিক করছে। কানে হীরের টব দুটো এই সামান্য আলোর আভাসেই ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'রতনদি!' এবারে অস্ফুট কণ্ঠে হলেও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারল। এতক্ষণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কান্তি। জামাইবাবুর কোন অসুখ-বিসুখ করল না তো— কিম্বা ওঁরই?

রতন ঘরে ঢুকেছিল আস্তে আস্তে— বোধ হয় অন্ধকারে আগে কিছু ঠাওর পাচ্ছিল না— তাই। এখন চোখটা সয়ে আসতে একরকম ছুটে এসেই বিছানায় বসে কান্তিকে জড়িয়ে ধরল একেবারে। যা কখনও ক'রে নি আজ পর্যন্ত—পাগলের মতো একেবারে ওর গালে নিজের গালটা চেপে ধরে চুপিচুপি বলল, 'তুমি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কান্তি? চলে যেতে পারবে? একটু মায়া হবে না তোমার? মন কেমন করবে না? তবে যে তুমি বললে তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি! কেন বললে তাহলে?'

কান্তির প্রথমে মনে হল মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে রতনদির। কিম্বা মদের ঝোঁকেই উঠে এসেছেন।

কিন্তু কৈ না, তেমন উগ্র গন্ধ তো ছাড়ছে না রতনদির নিঃশ্বাসে। খুবই কম— একটু আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে! সম্ভবত সেই সন্ধ্যায় যেটুকু খেয়েছিল— তারপর রাত্রে আর খায় নি। কোনমতে এড়িয়ে গেছে ওর বরের জবরদস্তি। কিন্তু তবে? তবে এসব কী বলছে?

সেও তেমনি চুপিচুপিই উত্তর দিল— পাশেই মোক্ষদারা আছে হয়ত, ভয়ে ওর বুক কাঁপছে টিপটিপ ক'রে, যা মুখ, কী সব যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করবে হয়ত এই নিয়ে যদি টের পায়— 'কিন্তু আমি তো— মানে তুমিই বললে আর মুখ দেখবে না। তুমিই তো শুনছি বোর্ডিং-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করছ! আমার কী দোষ, বা রে! আমি তো কিছু বলি নি। আমি— আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে তো চাই নি।'

'ছাড়বে না? আমাকে ছাড়বে না তো? যাই কেন হোক না, কোন দিন কিছুতে ছেড়ে যাবে না? বলো বলো— উত্তর দাও। এই আমাকে ছুঁয়ে বলো।'

'না না— রতনদি, তুমি "যাও" না বললে যাব না।'

'না, সে আমি বলতে পারব না প্রাণে ধরে। বলাই উচিত, তবু পারব না। অনেক ভেবে দেখলুম। তোমাকে কোথাও পাঠাতে পারব না।... আমার কথা যখন কেউ ভাবে না— আমিই

BanglaBook.org

বা অপরের কথা ভাবব কেন? আমি বড় দুঃখী কান্তি, আমাকে তুমি দয়া করো। আমি বড় দুর্বল আর লোভী। যদি অন্যায় ক'রে ফেলে — তবু আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।'

'ছি ছি। ওসব কথা কেন বলছ রতনদি। তুমি আমার কাছে এমন কোন অন্যায় করতেই পারো না। তোমার কাছে যা পেয়েছি তা কি আমি জীবনে ভুলব? জীবন দিয়েও তোমার ঋণ শোধ হয় না?'

'ঠিক বলছ? অন্তরের কথা তোমার? জীবন দিতে পারবে আমার জন্যে? আমি যে তাই চাইতেই এসেছি। পালিয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। ওরা ঘুমোচ্ছে, সবাই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আমি ঘুমোতে পারি নি। সারারাত ভেবেছি। ভেবে দেখেছি ভাল ক'রে তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তাতে যা হয় হবে। জীবনে কিছুই পাই নি— এটুকু আমি আদায় করব। কিন্তু জীবন দেবে তো আমার জন্যে? দিতে পারবে? কথার কথা নয় তো— মন বুঝে বলছ তো?'

'ঠিকই বলেছি রতনদি। তুমি যা করতে বলবে আমি তাই করব।'

'আঃ, বাঁচলুম, বাঁচলুম। তুমি আমাকে বাঁচালে।'

এই বলে অকস্মাৎ আরও জোরে আরও নিবিড় ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল রতন— তারপর পাগলের মতো চুমো খেতে লাগল ওকে বার বার। এত জোরে জড়িয়ে চেপে ধরেছিল যে কান্তির মনে হল পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অনুভব করছে শুধু আগুনের মতো ঐ চুম্বনগুলো।

কী যেন ভয়ঙ্কর মোহ গ্রাস করছে ওকে। যেন কোন্ মায়াবিনীর মায়া তার সব শক্তি হরণ করেছে।

ভাববারও অবসর ছিল না কিছু। কারণ একটু একটু ক'রে ওর সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল সেই মায়ায়। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। আর কিছু মনে পড়ে না।

তারপর আর কিছু মনে পড়েও নি। সেই দিনগুলোয় আর কিছু মনে ছিল না। সব একাকার অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে। তার লেখাপড়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ— তার মা দাদা বৌদি, যারা তার মুখ চেয়ে আছে অনেকখানি আশা নিয়ে— কিছু না। একটা সীমাহীন নির্লজ্জতায়, এক সর্বনাশা উন্মত্ততায় সব কিছু ঘুলিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে আত্মসমর্পণ করেছিল; সেটা যে ঘূর্ণি— ও যে শূন্যেই ঘুরছে ওর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চারিদিকে ধূলির আবরণ সৃষ্টি ক'রে, এ ঘূর্ণি যেমন অকস্মাৎই একদিন শুন্যে তুলেছে তেমনি অকস্মাৎই একদিন কোথাও আছাড় মেরে ফেলবে— তাও বুঝতে পারে নি। এক আধ দিন নয়, অনেক দিনই— কোথা দিয়ে কেটে গেল তাও টের পায় নি। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, কোন লজ্জার আবরণ ছিল না। সাংঘাতিক এক নেশায় লজ্জা ঘেন্না ইহকাল পরকাল সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিল।

ইস্কুলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল বলতে গেলে— কারণ ইস্কুলে গেলে পড়তে হয়, পড়া দিতে হয়— টাস্ক ক'রে নিয়ে যেতে হয়। রতন শুধু মাসে মাসে মাইনে পাঠিয়ে দিত, আর খবর পাঠাত যে শরীর খারাপ, শরীর ভাল হ'লেই যাবে আবার। সে প্রতিদিনই আশা করত যে এবার সে সংযত হবে, কান্তিকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে— কোন বোর্ডিংএ কোথাও— যাতে নতুন ক'রে পড়াশুনো আরম্ভ করতে পারে। তার ভরসা ছিল কান্তি ভাল ছেলে— একটা বছর নষ্ট হ'লেও আবার ঠিক ধরে নেবে।

এরই মধ্যে টেস্ট পরীক্ষার দিন কবে পেরিয়ে গেল— কান্তির মনেও পড়ল না। কিছুই মনে ছিল না তার, হুঁশ ছিল না। সকাল থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত কাটত এক উন্মত্ত নেশার মধ্য

BanglaBook.org

দিয়ে— রাত নটা থেকে পরদিন প্রভাত পর্যন্ত কাটত সারা দিনের স্মৃতি-রোমন্থনে ও আসন্ন দিনের সুখ কল্পনায়। এর মধ্যে তুচ্ছ জীবন বা ভবিষ্যতের কথা ভাববার মতো ফাঁক কৈ?

অবশেষে আবারও একদিন এল বিপদের সঙ্কেত। নিয়ে এল সেই মোক্ষদাই।

নটার সময় বাবু এসে গেলে একদিন ওপরে উঠে এল সে। কান্তি তখন বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে ভাবছে রতনের কথাই। রতন যেন চির-বিস্ময় তার কাছে, চির-বাঞ্ছিত। তার চিন্তায় ওর ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। কিন্তু মোক্ষদার রূঢ় পদক্ষেপে সেই চিন্তায় ছেদ পড়ল— স্বপ্ন ভঙ্গ হল। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

'ও' মোক্ষদাদি? তাই ভাল। আমি বলি কি—'

'কী বলো? ভাবছিলে তোমার অতনদি? হ্যাঁ— ঐটে এখনও বাকি আছে! পয়সা দেনেয়ালা বাবুকে ছেড়ে অসের নগরের কাছে অস করতে আসা! বলি ঠাকুর— অনেক অগ্রেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম, তা আমার কথা শুনলে না। উলটে বেশি ক'রে মুখ জুবড়ে পড়লে দঁকের মধ্যে। তা আমার কি। আমিও চুপ ক'রই ছিলুম। নিহাৎ শেষ পর্যন্ত একটা খুনোখুনি বেক্ষ-অক্তপাত হবে বলেই আবার হুঁশ করাতে আসা। শোন না শোন— তোমার ইচ্ছে!'

'কী বলছ মোক্ষদাদি— তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!' কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কান্তি। লজ্জা, সামনাসামনি প্রকাশ্যভাবে এই সব কথা আলোচনার লজ্জা আর তার সঙ্গে সত্যিকারের একটা ভয় যেন তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিয়েছে। হঠাৎ ওর মনে হ'ল মোক্ষদার কথাগুলোর মধ্যে সত্যিই একটা আসন্ন বিপদের আভাস আছে।

'বেশ বুঝেছ।' চোখ-মুখ ঘুরিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে মোক্ষদা, 'বলি বুঝতে তো তোমার বাকি নি কিছু। বুঝবে না কেন? সেই য্যাখন কচি খোকাটি ছিলে— ত্যাখন বুঝতে পারনু নি বললে সাজত। র‍্যাখন আর সাজে না। র‍্যাখন আর বুঝতে জানতে কোন্ জিনিসটা বাকি আছে তোমার? বলে সপ্ত কাণ্ড আমায়ণ, সীতে কার পতি।... শোন ঠাকুর, বাজে বকবার সময় নি আমার, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারব নি। এক আশ কাজ পড়ে আছে নিচোয়। ওসব ন্যাকাপানায় আর কাজও নি— যা বলছি ঠিকঠাক মন দিয়ে শোন। বাবু— মানে জামাইবাবু একটা কিছু সন্দ করেছে। ঠাকুরকে দারোয়ানকে ডেকে নানা অকম জেরা করেছে— আমাকে ক'রে নি তার রুদ্দেশ্য এই যে, আমাকে জানে দিদিবাবুর হাতের নোক বলে! তাও করতে পারে। এমনি কেউ বলে দেবে না। দিদিবাবু মুঠো মুঠো টাকা দে মুখ বন্ধ ক'রে এসেছে সব। কিন্তু জেরার মুখে কোন কথার ফাঁকে কী বেইরে যাবে তা কি কিছু ঠিক আছে? ত্যাখন কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে নি বাবু, তেমন বাবু নয় কো। আগলে, মদ পেটে পড়লে পিচেশ হয়ে ওঠে তা তো জানই। যদি সটে-পটে কোনদিন ধরে ফেলতে পারে তো তেক্ষুণি কেটে দু-টুকরো ক'রে ফেলবে।'

হয়ত ওর কথাগুলো বলবার এই উদ্ধত অপমান-কর ভঙ্গিতে, কিম্বা তাকে উপলক্ষ ক'রেই ওরা নিয়মিত অর্থ দোহন করছে রতনদির কাছে থেকে— এই কথাটা শুনে, হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল কান্তির। সে-ও বেশ চড়াসুরেই উত্তর দিল, 'তা আমাকে এসব কথা শোনাতে এসেছ কেন? নিজের মনিবকে গিয়ে বলো না। তিনি ছাড়লেই আমি যাব। বিপদ তো শুধু আমার একলার নয়, তাঁরও— আর তেমন কিছু হলে, তোমাদেরও। এত সুখের চাকরি কোথায় পাবে?'

মোক্ষদা কিন্তু রাগ করল না। কথাটা মেনে নিয়েই বলল, 'সে কথা একশো বার। হক কথা এটা। এমন পরিপুষ্ট গাই সহজে মেলে না। দুয়ে উঠতে পারলেই হ'ল। বলি সেই জন্যেই তো এত মাথাব্যথা গো। কিন্তু রোকে তো বলবার যো নি। ও তো পাগল এখন,

BanglaBook.org

কোন কি হস্যি-দীঘ্যি জ্ঞান আছে? তুমি একটু বুঝ ক'রে দ্যাখো। মার খেয়ে সে-ই যেকালে বেরোতে হবে, সেকালে এই বেলা মানে মানে সরে পড়া ভাল নয় কি? আর বলি তোমারও রেহকাল পরকাল দু-কালই তো গেল ঝরঝরে হয়ে, এর পরে খাবে কি ক'রে তাও ভাব। রাজকাল নেকাপড়া না হলে সায়েবের চাকরি হয় না। তোমার তো অইল ধর গে হয় উনুনে ফুঁ নয়তো শাঁকে ফুঁ। তা যে লবাবী মেজাজ ক'রে দিয়েছে তোমার, তাতে কি আর ঐ ওজগারে মন উঠবে? তার চেয়ে সময় থাকতে এই বেলা দু-চার হাজার বাগিয়ে নে সরে পড়ো। তোমারও রাখেরের কাজ হোক— ও ছুঁড়িও বাঁচুক। নেশা কেটে গেলে এমন কত টাকা দুয়ে বার ক'রে নিতে পারবে বাবুর ঠেঙে। তুমিও চাই কি ঐ টাকায় একটা দোকান-দানী দিয়ে ক'রে খেতে পারবে। আর কেনই বা পড়ে আছে, তোমারও তো সাধ মিটে গেছে— এবার রব্যাহতি দাও না।'

আবারও সেই টাকার ইঙ্গিত।

এবার বেশ রূঢ়ভাবেই বলল, কান্তি, 'আমি তোমাদের মতো অত ইতর নই মোক্ষদাদি যে এতদিন এত খেয়ে এত হাত পেতে নিয়ে আবার টাকা বাগিয়ে সরে পড়ব। যেতে হয় তো এমনিই চলে যাব। পুরুষমানুষ— আর কিছু না হয় মোট বয়ে খাব। তাতে কি?'

মুচকি একটু হেসে আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মেজাজেই জবাব দিল মোক্ষদা, 'তা বাপু মানছি আমরা রিতোর ছোটলোক। পয়সা খুব চিনি। পয়সার জন্যেই তো খানকিবাড়ি গতর খাটাতে এসেছি। পয়সা চিনব না। তুমি চেনো না চেনো— নিজের ভাল বোঝ না বোঝ— সে তোমার রভিউচি। তবে তাও বলি, টাকা তোমার পাওনা— বেহক্কের কিছু নয়। নিলে এমন কিছু ছোটনোকপানা হত না। তোমার কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খেয়ে বসে অইল— তার দাম দেওয়া তো রুচিতই।'

এই-বলে আর কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে মোক্ষদা চলে গেল।

কিছুই বলতে পারল না কান্তি। খুব দুকথা শুনিয়ে দিতে পারলে একটু শান্তি হ'ত ওর— কিন্তু বলা হল না। অবসর মিলল না বলে নয়— ডেকে থামানো যেত, জোর ক'রে ধরে দু'কথা বলা যেত— কী বলবে তাই ভেবে পেল না যে। শুধু একটা দুঃসহ রাগে সমস্ত দেহটা চিনচিন করতে লাগল— অব্যক্ত কী রকম কষ্ট হ'তে লাগল। রাগ আর অপমানবোধ। ওদের দুজনকে জড়িয়ে বার বার যে ইঙ্গিত দিয়ে গেল মোক্ষদা সেইটেই যথেষ্ট অপমানকর। অথচ কী-ই বা বলবার আছে? কথাটা এত নির্ঘাৎ সত্য যে অস্বীকার করবার, কি মোক্ষদাকে ধমক দেবার কোনও উপায় নেই কোথাও। আজ তারা এমনভাবেই নিজেদের নামিয়ে এনেছে যে, এইসব সামান্য দাসী-চাকরের বিদ্রূপ-ইঙ্গিত-অপমান নীরবে সয়ে যেতে হচ্ছে। জবাব দেবার মতো কিছু নেই ওদের তরফ থেকে।

কিন্তু তবু বার বার মনে হ'তে লাগল— এত স্পর্ধা ওদের, এত দুঃসাহস! যে মুখ নেড়ে এই অপমান ক'রে গেল সেই মুখখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ঠিক জবাব হত এ আস্পর্ধার।

একবার মনে হল, কালই রতনদিকে বলে ওকে জবাব দেওয়াবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবের মূঢ়তা নিজের কাছেও ধরা পড়ল। কোন ফল হবে না? রতনদি সাহস করবেন না ওকে জবাব দিতে! এই জন্যেই করবেন না। বড় বেশি জানে ওরা। বিশেষত মোক্ষদা। যে মুহূর্তে জবাব দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে মোক্ষদা গিয়ে জামাইবাবুকে খবর দেবে— জানিয়ে দেবে সম্পূর্ণ ইতিহাস! তারা এখন ওদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। একদিক দিয়ে অপমানিতও হতে হবে আর একদিক দিয়ে টাকাও গুণতে হবে। মাথায় পা দিয়ে চললেও কিছু বলবার যো থাকবে না।

BanglaBook.org

মনে পড়ল একদিন ইংরিজী কি খবরের কাগজে 'ব্ল্যাকমেল' কথাটা পেয়েছিল। মানেটা ঠিক বুঝতে পারে নি। ইংরিজীর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, 'ওর মানে কোন গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধে আদায় করা। এই ধরনের ব্যাপার।' তারপরই বলেছিলেন, 'বড় খারাপ কাজ ওটা। বড় ঘৃণা। ওর মানে না বোঝাই ভাল। কোনদিন, যেন বুঝতেও না হয়!' আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। একেই বুঝি ব্ল্যাকমেল বলে। এরা ব্ল্যাকমেল ক'রে রতনদির কাছ থেকে টাকা আদায় করছে।....

কী করবে, এ অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে পেল না কান্তি। যেন কী একটা দৈহিক অস্বস্তিতে ছট্‌ফট ক'রে বেড়াল খানিকটা।

বলবে রতনদিকে মোক্ষদার কথাটা?

লাভ কী?

বড় ম্লান হয়ে যাবেন। কষ্ট পাবেন খুব। সেই মলিন মুখ এবং নত দৃষ্টি কল্পনা করেই মায়া হ'তে লাগল কান্তির। অথচ শুনবেনও না কথাটা— তাও সে ভাল করেই জানে। প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারবেন না।

কান্তিই কি পারবে এই নিরানন্দ পুরীতে ওঁকে ছেড়ে যেতে?

তার চেয়ে ওদের ঘনিষ্টতাটাই কমিয়ে দেওয়া ভাল। তাছাড়া এইবার চেপে পড়তে বসতেও হবে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সামনের বার পরীক্ষা না দিলেই নয়। ভাগ্যিস দাদারা অত হিসেব রাখেন না— নইলে কী কৈফিয়ৎ দিত তার ঠিক নেই। মুখ দেখাতে পারত না তাঁদের কাছে।

সাত-পাঁচ ভেবে কিছুই বলা হল না রতনদিকে। মোক্ষদারা এই ব্যাপার নিয়ে টাকা আদায় করছে তাঁর কাছে, এটা কান্তি টের পেয়েছে জানলে লজ্জায় মরে যাবেন রতনদি। এতটুকু হয়ে যাবেন অপমানে। না না— ছিঃ, সে মুখ ফুটে বলতে পারবে না এ কথাটা।

যেটা বলতে পারে সেটাই বলল একদিন—ঐ ঘটনার দিন চার-পাঁচ পরে। বলল, 'এবার একটু চেপে পড়তে হয় রতনদি। একটা বছর গেল, আর গেলে চলবে না।'

'একটা বছর গেল মানে? নষ্ট হয়ে গেল?'

'গেল বৈকি। টেস্ট দেবার কথা ছিল, দিলুম না। এই তো সামনেই এগ্‌জামিন। টেস্টে পাস না করলে তো তাতে বসতে দেবে না!'

'তা কৈ—।' কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় রতন। 'তা কৈ বল নি তো'— এই কথাই বলতে যাচ্ছিল। দোষটা যে তার ঘাড়েই এসে পড়বে, সেইটে মনে পড়ে যাওয়ায় আর বলল না। আস্তে আস্তে মাথা নামাল। মুখটা লাল হয়ে উঠল— কানের ডগা পর্যন্ত।

তেমনি মাথা নামিয়েই একটু পরে বলল, 'তাহ'লে তুমি কাল থেকেই আবার ইস্কুলে যেতে শুরু করো। আর কামাই করে কাজ নেই।'

এবার মাথা নামাবার পালা কান্তির। সে নত-মুখে রতনের ব্রেসলেটটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ইস্কুলে আর আমার যেতে ইচ্ছা করে না। স্কুলে ঠাট্টা করবে, যা-তা বলবে। মাস্টারমশাইরা বকবেন, নতুন সব ছেলেদের সামনে। এখন যারা ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে তারা আমার নিচে পড়ত, কত খাতির করত। তাদের সামনে অপমান হওয়া—'

'তবে কী করবে? নতুন কোন ইস্কুলে ভর্তি হবে? কিন্তু আমি তো সে সব সন্ধান জানি না। সরকারমশাইকে বললে নানান্ কৈফিয়ৎ—জানাজানি।'

আবার মাথা নামায় রতন।

BanglaBook.org

কান্তির মাস্টারমশাইও, রোজ এসে ফিরে যেতে হয় বলে, গত মাসখানেক আসছেন না সেটাও মনে প'ড়ে গেল দু'জনকারই।

'মাস্টারমশাইকে বরং খবরটা দিই। এবার থেকে নিয়মিত আসুন।'

'না-না। ওঁকে না। তুমি বরং সরকারমশাইকে বলো অন্য একজন মাস্টারমশাই ঠিক করতে। এঁকে দিয়ে চলছে না, ভাল একজন মাস্টারমশাই চাই— এ বলতে তো কোন দোষ নেই। তাতে কি কিছু— মানে— মনে করবেন ওঁরা?'

'না, না। তা মনে করবেন কেন? তাই বলি বরং সরকারমশাইকে। একটু যদি চেপে পড়ান বেশি করে সময় দিয়ে। মানে ঘণ্টা দুই-আড়াই— না হয় বেশি মাইনেও নেবেন কিছু।'

'সে রকম হলে বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ টাকা হেঁকে বসবেন।' ভয়ে ভয়ে বলে কান্তি।

'তা হোক। টাকার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কান্তি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। এবার আস্তে আস্তে সে দূরে চলে যেতে পারবে।...

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না। ঠিক পরের দিনই— সরকারমশাইকে ডেকে নতুন মাস্টার খোঁজার কথা বলবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তখন তিনটে-চারটে হবে, রতনদির খাটে পাত্‌লা বাঘের ছবি আঁকা বিলিতে কম্বলটার মধ্যে ওরা দুজনে ঘুমোচ্ছিলো। দরজা ছিল ভেজানো। হঠাৎ সজোরে দোরটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন রতনদির বর— বা বাবু— দত্তসাহেব। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন একেবারে!

ঘটনাটা এতই আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত যে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় লাগল ওদের। তারপরই ধড়মড় করে দুজনে দুদিক দিয়ে নেমে এল খাট থেকে। কিন্তু দত্তসাহেবের মুখ দেখেই বুঝল ওরা যে আর রক্ষা নেই কারুর। ওঁর দুদিকের রগের শিরাগুলো ফুলে উঠে দব্‌দব্ করছে তা এখান থেকেই দেখা যায়। দুই চোখ টক্‌টকে লাল—হয়ত মদও খেয়েছেন একটু— কিন্তু এ লাল অঅন্যরকম— মাথায় রক্ত ওঠার দরুন এত লাল হয়েছে নিশ্চয়।

ওদের তরফ থেকে কিছু বলবার— কৈফিয়ৎ দেবার কি ক্ষমা চাইবার— কোন অবসর মিলল না। জিজ্ঞাসাও করলেন না দত্তসাহেব। কেউ কোথাও চুকলি খেয়েছে নিশ্চয়। পাকা খবর পেয়েই এসেছেন। কৈফিয়ৎ অনেক দেওয়া চলতে পারত অবশ্য — ভাইবোন, বিশেষ ছোট ভায়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া কিছু অন্যায় নয়, অশোভনও নয়। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ শুনবে কে? ওদেরও দেবার মতো অবস্থা নয়। দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না ওরা। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। আর সেইটেই তো ওদের তরফ থেকে অপরাধের স্পষ্ট স্বীকৃতি।

প্রস্তুত হয়েই এসেছেন দত্তসাহেব।

যে হাতখানা এতক্ষণ পিছনে ছিল সেইটে এবার সামনে এল।

শঙ্কর মাছের চাবুক একটা। এ বস্তুটা চেনে কান্তি। এ ঘরেও একটা টাঙ্গানো আছে

হিস্ হিস্ করে উঠলেন দত্তসাহেব, 'রাস্তার কুকুর, — তুমি মুখ দিতে এসেছ ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে। এত আস্পদ্দা তোমার! এত সাহস! এত সাহস কোথা থেকে এল তাই ভাবছি। ভিখিরী বামুনের ছেলে— পেট পুরে ভাত জুটছিল না— আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছিলুম— তার এই শোধ! চমৎকার! এই তো নিয়ম, আমারই খেয়ে আমারই পয়সায় বিষ সঞ্চয় করে আমাকে ছাড়া আর কাকে কামড়াবে? সাপের দস্তুরই যে এই! তবে সাপের ওষুধও আমার জানা আছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। হারামজাদা, কুত্তাকি বাচ্ছা কাঁহাকা!'

BanglaBook.org

সব কথা শুনতেও পেল না কান্তি। কারণ তার আগে সপাসপ চাবুক পড়তে লাগল— পিঠে হাতে বুকে মুখে— সর্বত্র। কেটে কেটে বসতে লাগল শঙ্কর মাছের চাবুক। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। রতন ব্যাকুলভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, চাপা রোষে ধমক দিয়ে উঠলেন দত্তসাহেব— 'চুপ! তুমি কি ভাবছ তুমি বাদ যাবে? ও কসবীর জাতকে শাসন করতে হয় কী ক'রে তা আমি জানি। ওর হয়ে সুপারিশ করতে আসছ!.... নিজের ভাবনা ভাব গে। তবে এ আগে। কসবী কসবীর ধর্ম পালন করবে সেইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্যায়ের কোন মাপ নেই। বেইমানী হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ—'

চাবুক কিন্তু বন্ধ নেই এক মিনিটের জন্যও। কান্তি এতক্ষণ ছট্‌ফট করছিল, এই বৃষ্টির মতো আঘাতের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষার এতটুকু ফাঁক খুঁজছিল আকুল হয়ে— দুই হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো। এবার অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল সে।

এক মুহূর্তও থামলেন না দত্তসাহেব, একবার ফিরে তাকালেন না তার দিকে, একবার হাতটা পর্যন্ত বদল করলেন না। বাঘের মতো ফিরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন রতনের ওপর। এবারের আঘাতটা যেন আরও নিষ্ঠুর, আরও সাংঘাতিক, আরও অব্যর্থ। কাপড়জামা ভেদ করে সে চাবুক মাংসতে চেপে বসে সেগুলোকে রক্তে ভিজিয়ে তুলল।

এরা কেউই কাঁদে নি, চেঁচামেচি করে নি। কিন্তু নিচে থেকে সবাই ছুটে এসে জড়ো হয়েছে বাইরে। অমন ভাবে অসময়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বাবুকে ছুটে ওপরে আসতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝেছে তারা। তাছাড়া চাবুকের শব্দ বন্ধ দোরের মধ্যে দিয়েও বাইরে আসছিল।

মোক্ষদা হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, কী হবে গো। একটা খুনোখুনি করবে নাকি শেষমেষ। ওমা— কোথায় যাব গো। থানা-পুলিশ করতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। ওগো ও জামাইবাবু, খোল খোল দরজা খোল। দরজা বন্ধ করে আবার কী শাসন। শেষে কি সবাইকার হাতে দড়ি দেওয়াবে নাকি! অ ঠাকুর, যাও যাও কত্তাবাবুকে ডেকে নে এসো। আর, দারোয়ান তুমিই বা কী রকম নোক গা। এত ডালরুটি খাও বস্তা বস্তা... একটু গায়ে জোর নি, দরজা ভাঙ্গতে পার না? মনিব খুন হচ্ছে ওধারে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখতেছ সঙের মতো। ভাঙ্গ ভাঙ্গ কপাট, ভেঙ্গে ভেতরে সেঁধোও—'

দারোয়ান সাহস পেয়ে দুম-দুম লাথি মারতে লাগল দরজায়। একটু পরে কর্তাবাবু অর্থাৎ রতনের বাবাও ছুটে এলেন। ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'এ সব কী হচ্ছে কী? দত্ত, এই দত্ত— দরজা খোল শিগ্‌গির।'

ততক্ষণে রতনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। রক্তাক্ত চাবুক শেষবার ওর অনড় দেহটাতেই আছড়ে ফেলে দোর খুলে বেরিয়ে এলেন দত্তসাহেব। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু চড়া গলাতেই কী বলতে যাচ্ছিলেন কর্তাবাবু, এক ধমকে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'তুমি চুপ করে থাকো! বুড়ো শুয়ার কোথাকার, মেয়ে বেচে খাচ্ছ বসে বসে— মেয়েকে পাহারা দিতে পারো না? পথের কুকুর এসে ঘরে ঢুকছে দেখতে পাও না? ছোটোলোকের জাত!'

তারপর সকলকার সামনে দিয়েই গট গট করে বেরিয়ে চলে গেলেন তিনি। কর্তাবাবু পর্যন্ত একটি কথাও বলতে পারলেন না!

এরপর কদিন আর কান্তির কোন জ্ঞান ছিল না। কদিন তাও জানে না সে। গায়ের ব্যথায় আর প্রবল জ্বরে বেহুশ হয়ে পড়েছিল। গায়ে নাকি ঘাও হয়ে গিয়েছিল চার-পাঁচ জায়গায়।

যেদিন জ্ঞান হ'ল সেদিন দেখল পাশে একটা টুলে ডাক্তারি ওষুধ সব রয়েছে। কাটা ঘাগুলোতেও মলম লাগানো। অর্থাৎ ডাক্তার ডাকা হয়েছে, শুশ্রূষাও হয়েছে কিছু কিছু। আরও ভাল ক'রে চেয়ে দেখল যে, সে তার ওপরের ঘরে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে।

BanglaBook.org

জ্ঞান হবার পর প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হ'ল ওর— তা হচ্ছে অপরিসীম লজ্জার। ছি ছি, এ বাড়িতে আর মুখ দেখাবে কি করে— এই সব ঝি-চাকরদের সামনে। এখনই পালিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু কোথায়ই বা পালাবে! বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে! সেখানে গিয়েই বা কোন্ মুখে দাঁড়াবে।

একটু পরে হাসিমুখে মোক্ষদা এসে দাঁড়াল।

'এই যে, হুঁশ ফিরে এসেছে? যাক বাবা, বাঁচা গেল। যা ভাবনা হয়েছিল! এধারে ইনি পড়ে রজ্ঞান রচৈতন্যি— ওধারে উনি পড়ে। আমরা যাই কোথায় বল দিকি! তবু ভাগ্যে জামাইবাবুই ডাক্তার পাঠিয়ে দেছল তাই অক্ষে।'

তারপর একটু থেমে আঁচলের নাড়া দিয়ে কান্তির মুখের ওপর থেকে মাছি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও, এবার চটপট সেরে উঠে সময় থাকতে থাকতে সরে পড় দিকি। ব্যবস্থা একটা হয়েছে যেকালে— সেকালে আর দেরি করে নাভ নি। মানুষের মন না মতি। এখন মত হয়েছে আবার সে মত ঘুরে যেতে ক্যাতক্ষণ? এই বেলা কাজ গুছিয়ে নাও!'

কান্তির এ সব বোঝার কথা নয়। তার তখনও একটু জ্বর রয়েছে, দুর্বল মাথায় এ সব কথা ঢুকলও না। সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই রইল মোক্ষদার মুখের দিকে।

মোক্ষদাই বুঝিয়ে দিলে এবার, 'তা বাপু মারুক ধরুক যা-ই করুক— এধারে মানুষটার বেবেচনা আছে, তা কিন্তুক মানতেই হবে। আমরা তো ভাবনু তাড়িয়েই দেবে সোজাসুজি, দেশে গিয়ে যেখানকার ছেলে সেখানে উঠতে হবে। মুখ দেখাবে কী করে সেই ভাবছিলুম। তা সেদিক দিয়ে বাবু যায় নি, হুকুম দিয়েছে কোথায় কোন্ ওর জমিদারীতে কি রিস্কুল আছে সেখানে যদি গিয়ে থাকতে চাও তো রিস্কুলে ভর্তি করে দেবে— কাছারীবাড়িতে থাকবে, রামলাদের সঙ্গে খাবে— রিস্কুলে পড়বে। খরচা সব তেনার। তবে লবাবি চলবে নি। গরিব গেরস্তর চালে থাকতে হবে। পোষায় ভাল, তিনি নোক দেবে, সঙ্গে গিয়ে ভর্তি করে দে আসবে, আর না পোষায় তো পত্তরপাঠ তোমাকে পথ দেখতে হবে।.... তা আমি বাপু তোমার হয়ে বলেই দিয়েছি ও সেখানে যেতেই আজী।.... জানি তো দেশে-ঘাটে যাবার মুখ নি তোমার—কোথায় যাবেই বা।'

এই প্রথম মোক্ষদা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করল কান্তি। আঃ বাঁচা গেল! বাঁচা গেল! বেঁচে গেল সে। বাঁচল এই লজ্জা থেকে শুধু নয়— সর্বনাশ থেকেও। আর কোন পথ কোথাও ছিল না। বাড়ি গেলে পড়াশুনো আর হত না এটা নিশ্চিত। এ তবু নতুন করে জীবন আরম্ভ করার একটা সুযোগ মিলল। এখন যদি চেপে খাটে তাহলে আবারও হয়ত ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

হায় রে! তখন যদি জানত দত্ত-সাহেবের এই আপাত-দয়ার পিছনে কি সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা আছে! সামান্য দৈহিক শাস্তিতে কিছুই মন ওঠে নি তাঁর, দুঃসহ ক্রোধের কিছুমাত্র শান্তি হয় নি। বড় রকমের শাস্তির জন্যেই তাঁর এই সদয় প্রস্তাব। পৈশাচিক শাস্তি— যা দীর্ঘকাল মনে থাকে, সারা জীবনে যা বাঘের দাঁতের মতো স্থায়ী দাগ রেখে যায়— তারই জন্যে এই বদান্যতার ব্যবস্থা, এই আয়োজন।

মোক্ষদা বলল, 'তাই বলছিনু তোমায়— মেজাজ ভাল থাকতে থাকতে সেখানে গে চেপে বসো গে যাও। তারপর আর কী মনে থাকবে ওর! বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। একবার হুকুম হয়ে গেলে রামলা-গোমস্তারা ঠিক খরচা যুগিয়ে যাবে পরের পর। মোদ্দা আর দেরি করো নি। কখন আবার মেজাজ পালটে যাবে, অক্ত চড়ে যাবে মাথায় আবার দুম করে কী বলে বসবে।.... দেখলে তো—যা বলেছিনু সেদিন, তাই ফলে গেল রক্ষরে রক্ষরে। খুন হও নি সে তোমার গুরুর ভাগ্যি, আর আমাদের বাপ-মার পুণ্যি—

BanglaBook.org

বামুনের অক্ত দেখতে হল নি। গরিবের কথা বাসি হলেই খাটে। এবার আর দেরি করো নি। আমি যে মানুষ চিনি— এই সব বাবু ভাইদের চিনতে কি আর বাকি আছে। ঘরের মাগকে পাহারা দেয় কে তার ঠিক নি— বাইরের আঁড়কে পাহারা দেবার জন্যে চোখে ঘুম নি! হাত্তোর বড়মানুষ রে!'

বোধ করি একটু দম নেবার জন্যই থামল একবার মোক্ষদা। সেই ফাঁকে কান্তি আস্তে আস্তে বলল, 'আমি আজই যেতে চাই মোক্ষদাদি, যত শিগ্‌গির পারো একটু ব্যবস্থা করে দাও— সরকারমশাইকে বলে। আমি আর একদিনও থাকতে চাই না।'

'ওমা তাই বলে কি আজই এক্ষুণি যাওয়া হয়। এখনও গায়ে তাত অয়েছে বেস্তর'— হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে কপালটা দেখে নিল মোক্ষদা, 'ওঠো, একটু ভাল হও, পথ্যি কর দুটো, তারপর তো যাওয়ার বন্দোবস্ত। ভয় নি— একদিনে কিছু মহাভারত রশুদ্ধু হয়ে যাবে না। সরকারমশাইকে তো আমি তোমার জবানীতে বলেই দিয়েছি, তিনিও নাকি চিঠিপত্তর নিকে দিয়েছে!'

এর তিন-চার দিন পরেই, প্রথম যেদিন ভাত পেয়েছে সে— সেই দিনই রওনা হয়ে গিয়েছিল কান্তি, কিছুতেই আর থাকতে রাজি হয় নি।

যাবার আগে রতনের সঙ্গে দেখাও হয় নি আর। সে কথা কেউ বলেও নি। রতনও চেষ্টা করে নি দেখা করার। কান্তিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। হয়ত দত্তসাহেব শুনতে পেলে আবার রাগ করবেন, হয়ত রতনদিকেই তার জন্যে কথা শুনতে হবে। কিম্বা আবার মার খেতে হবে—। নিজের আঘাত দিয়েই রতনদির কী পরিমাণ লেগেছিল তা বুঝতে পারে কান্তি। অমন ননীর মতো নরম দেহে ঐ চাবুক যখন কেটে কেটে বসেছে তখন না জানি কী যন্ত্রণাই পেয়েছে রতনদি। আজও সে কথা মনে হলে দু'চোখে জল ভরে আসে তার। সত্যিই বড় দুঃখী রতনদি, বড় অসহায়। সে তো তবু পালিয়ে যেতে পারছে, ওকে পড়ে মার খেতে হবে। থাক, আর দেখা করার চেষ্টা করবে না সে। তাছাড়া, রতনদিও লজ্জা পাবে মিছিমিছি। এমনই বোধ হয় লজ্জাতে মরে যাচ্ছে সে। আর লজ্জা বাড়িয়ে দরকার নেই।

সেও ভাল হয়ে উঠেছে, ভাত খেয়েছে— এটুকু মোক্ষদাই একদিন উপযাচক হয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল তাকে। সেই জেনেই নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল কান্তি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

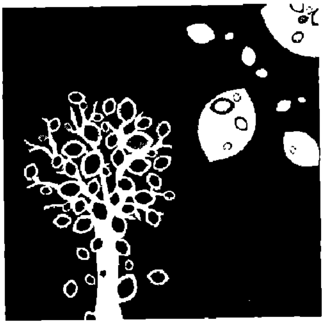

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এসব কথা বলার নয় কাউকে। মা-দাদা-বৌদির কাছে তো নয়ই— এতখানি অপরাধের কথা, লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, অস্বাভাবিক অমানুষতার কথা কারও কাছেই বুঝি বলা যায় না। সুতরাং চুপ করেই থাকে সে। চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ে যায় উত্তরের বদলে। এক এক সময় মা ক্ষেপে যান— সব কথা সে শুনতে পায় না বটে, কানের মধ্যে সর্বদা যেন একটা ঝম ঝম করে আওয়াজ হচ্ছে, দিনরাতই— আভাসে আন্দাজে তাঁর তিরস্কারের কঠিন ভাষা সে কিছু কিছু বুঝতে পারে— কিন্তু জবাব দিতে পারে কৈ? মা এক-এক দিন তেড়ে মারতেও আসেন, অথচ, কী করে বোঝাবে সে তাঁকে যে বলার মতো তার কিছুই নেই। বলবার কোন উপায় নেই। সে তিরস্কারে মাথাটাই শুধু আরও খানিকটা হেঁট হয়, চোখের ধারাটাই শুধু আরও প্রবল হয়।

বৌদি আড়ালে আবডালে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। হেঁকে বললে মা শুনতে পাবেন বলে সীতার ফেলে যাওয়া স্লেটটা খুঁজে বার করে লিখে জানায় যে, 'তুমি আমার কাছে বলো, কেউ টের পাবে না। তেমন যদি কিছু কথা হয় তো আমি বলবও না কাউকে। আর যদি এমন হয় যে মার কাছে বলতে লজ্জা করছে তোমার তো তাও আমাকে বলা সুবিধে, আমি ওঁদের বলতে পারব। চক্ষুলজ্জা হয় তো আমি চলে যাচ্ছি সেলেটে লিখে রাখো। দূরে নিয়ে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু তাও পারে না কান্তি। হাত জোড় করে শুধু।

এদিকে কানের রোগটা ওর বেড়েই যায় দিন দিন। আগে একটু চেঁচিয়ে বললেই শুনতে পেত— এখন কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করলে তবে কিছুটা শুনতে পায়! তাও অর্ধেক কথা বুঝতে পারে না। কেমন একরকম করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে ঘাড় নেড়ে, কানটা এক হাত দিয়ে খানিকটা চোঙের মতো করে বক্তার মুখের আরও কাছে নিয়ে আসে।

এবার হেমও চিন্তিত হয়ে পড়ে। এখানের হাসপাতাল থেকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। তারা আর পারবে না কিছু করতে।

কনক ক্রমাগত খোঁচায়, 'ওগো কি করছ? এর পর যে চিকিচ্ছের বাইরে চলে যাবে। দুটো একটা দিন আপিস কামাই করো। কলকাতার কলেজে নিয়ে যাও।

অগত্যা তাই করতে হয়। অফিস কামাই করে মেডিকেল কলেজের আউটডোরে নিয়ে যায়। 'ই-এন-টি'তে ধর্ণা দিয়ে যখন ডাক আসে তখন কিন্তু আশার সঞ্চার হয় একটু হেমের মনে। কারণ ডাক্তার যিনি দেখছিলেন তিনি ওর কেস দেখে খুব কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের ডেকে দেখালেন, 'স্ট্রেঞ্জ! ড্রামে কিছুই হয় নি, কালা হওয়ার অন্য কোনও কারণ নেই— অথচ শুনতে পাচ্ছে না। এ একটা ইন্টারেস্টিং কেস কিন্তু।'

BanglaBook.org

দু-দিন বড়মাসীর কাছেই রইল ওরা দু-জনে। ছোটমাসীর একখানা ঘর, তাতে ওদের ছোট ভাই খোকাকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। সেখানে থাকা সম্ভব নয়। বাড়ি থেকে রোজ রোজ আসার খরচাও আছে, ঝঞ্ঝাটও আছে।

তিন দিন পর পর গেল কান্তি। শেষের দিনে বলে-কয়ে শরৎ মেসোমশাইকে সঙ্গে দিয়ে হেম অফিস গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। এঁরাও বললেন, 'দুর্বলতার জন্যেই এ রকম হয়েছে। ভাল পুষ্টিকর কিছু খেতে দিন। টনিক খাওয়ান একটা।' টনিক লিখেও দিলেন। বিলিতি নার্ভ-টনিক। সাত-আট টাকা দাম।

হেমের মুখ শুকিয়ে উঠতে দেখে শরৎ মেসোমশাই আটটা টাকা বার করে দিলেন। বললেন, 'তুমি লজ্জা করো না বাবা, এ লৌকিকতা-লজ্জার সময় নয়। আছে বলেই দিচ্ছি, নইলে কি আর দিতে পারতুম। তুমি ওষুধটা কিনে নিয়েই যাও। আর ওখানে গিয়ে একটা দুধের যোগানি ব্যবস্থা করো, অন্তত এক পো করে। সেটাও আমি দেব। শুধু টনিকে কিছু হবে না, তার সঙ্গে ভাল খাওয়াও চাই। মাছ মাংস খাওয়াতে তো পারবে না তেমন, তবু এক পো করে দুধ খেলেও কিছুটা হবে।'

নেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিতে হল। কারণ সত্যিই তারও এমন সঙ্গতি নেই যে দুম করে আট টাকার ওষুধ কিনে খাওয়ায় এখুনি। কিছু সে হাতে রাখে ঠিকই মাইনের টাকা থেকে— কিন্তু সেও হাতি-ঘোড়া কিছু নয়। তা থেকেও তো ডাক্তারের ওষুধে কত টাকা বেরিয়ে গেল গত দু মাসে। আরও কি আপদ বিপদ হয় ঠিক আছে!

শরৎ মেসোমশাইয়ের দিল আছে কিন্তু, নইলে ওঁরও কীই বা আয়। একটা ছোট ছাপাখানা ছিল— নিজে দেখতে পারেন না, লীজ দিয়েছেন,তারই কটা টাকা ভরসা। তারও অর্ধেক নাকি আদায় হয় না! গিয়ে তাগাদা দিয়ে দু টাকা এক টাকা করে আদায় করতে হয়। দুর্দান্ত হাঁপানি মেসোমশাইয়ের, রোজ যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মাসীমা এখনও টিউশ্যনি করে সংসার চালাচ্ছেন তাই রক্ষে, নইলে খেতেই পেতেন না।

বিচিত্র ভাগ্য ছোটমাসীর। ওষুধটা কিনতে কিনতে কথাটা মনে হল হেমের। জীবনে একদিনও স্বামীর সাহচর্য পেলেন না— ফুলশয্যার রাত্রেও না। স্বামী তাঁর কোন্ ডোমের-মেয়ে-রক্ষিতা নিয়েই রইলেন সারাজীবন, অসচ্চরিত্র স্বামী স্পর্শ করলে স্ত্রীর অপমান হবে এই ভয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না কোনদিন। মার কাজের সুসার হবে বলে শুধু নাকি বিয়ে করেছিলেন। তারপর শাশুড়ীর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলেন মাসিমা। দিদিমা একা, সহায়সম্বলহীন। কোথাও দাঁড়াবার কোন আশ্রয় না পেয়ে সেদিন ছোটমাসী উপার্জনের এক অভিনব পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, সামান্য লেখাপড়া সম্বল করে এক টাকা দু টাকার টিউশ্যনি ধরে ছিলেন গোটাকতক। তার পর থেকে সে-ই চলেছে আজও। একেবারে বুড়ো বয়সে বলতে গেলে, শরতের সেই রক্ষিতাটি গত হলে, শরৎ যখন অসহায় হয়ে পড়লেন— অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেসবাড়ির নিচের তলার ঘরে পড়ে পড়ে কাশছেন আর হাঁপাচ্ছেন দেখে হেমই এসে খবর দিয়েছিল ছোটমাসীকে। ছোটমাসী গিয়ে মেস থেকে উদ্ধার করে এনে কাছে রেখে সেবা করছেন এখন। কিন্তু নিজের কোট ছাড়েন নি তাই বলে, মেসোমশাইয়ের শত অনুরোধেও টিউশ্যনি ছাড়তে রাজি হন নি। বলেছেন, 'জীবনের এতগুলো বছর যদি স্বামীর ভাত না খেয়ে চলে যেতে পেরে থাকে তো এখনও পারবো। মানুষের জীবন, বলা যায় না কিছু—তবে পারি তো শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ভাতই খেয়ে যাব। দুদিন ভাত দিয়ে যে তুমি বিয়ের সময়কার করা প্রতিজ্ঞা সেরে নেবে— তা হবে না!'...

শরতের দেওয়া সে টনিক ফুরোবার আগেই খবর পেয়ে অভয়পদ আর এক শিশি কিনে পাঠিয়ে দিলে। একদিন একরাশ ফলও পাঠিয়ে দিয়েছিল। দুধের যোগানি টাকা হেম

অবশ্য কারুর কাছ থেকে নেয় নি— নিজেই দিয়ে যাচ্ছে যেমন করে হোক। তবে মাছ মাংস খাওয়াবার কোন সুবিধে হয় নি। শনি-রবিবার হাতছিপে যা দু-একটা ধরা পড়ত, তারই বেশির ভাগটা কান্তিকে দিত কনক, এই পর্যন্ত।

এর জন্য কান্তির লজ্জার অবধি ছিল না। আরও মাথা নুয়ে পড়ত তার। অত দামি ওষুধ খাবার সময় প্রত্যেকবারই লজ্জায় তার কান-মুখ রাঙা হয়ে উঠত। উপায় নেই বলেই খেতে হত তবু। এতগুলো লোককে ব্যস্ত করছে এত টাকা খরচ করাচ্ছে— এখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠে এদের অব্যাহতি দিতে পারলেই ভাল। বৃথা চক্ষুলজ্জা করে রোগ বাড়িয়ে আরও বিব্রত করা উচিত নয়।

কিন্তু দু শিশি টনিক খেয়েও কানের কোন উপকার হল না। বরং মনে হতে লাগল আরও কালা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কিছুই প্রায় শুনতে পায় না এখন, কানের কাছে গিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করলে দুটো-একটা কথা ধরতে পারে শুধু। এবার তার নিজেরও চিন্তা হয়েছে খুব। কান না ভাল হলে ইস্কুলে যেতে পারবে না— মাস্টার মশাইয়ের পড়ানো তো কিছুই শুনতে পাবে না।

সেখানকার বই-খাতাগুলো সেই কাছারি বাড়িতেই পড়ে আছে। কে-ই বা আনতে যাবে। তারা যে গরজ করে পাঠাবে সে সম্ভাবনাও নেই। চিঠি লিখলেও কোন সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শুধু চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। কখনও সাধ্যমতো টুকটাক বাগানের কাজ করে এক-আধটু, নইলে বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে বসে থাকে আর ভাবে এই অসুখের কথা, নিজের জীবনের কথা, এই সর্বনাশা রোগের কথা। ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পায় না কিছু — অসুস্থ শরীরে খানিকটা ভাববার পর মাথা ঝিমঝিম করে। লজ্জায় অনুতাপে চোখে জল এসে যায় বার বার।

দু শিশি টনিকেও কোন কাজ হয় নি— উন্নতি তো হয়ই নি উল্‌টে বরং কিছু অবনতিই ঘটছে শুনে গোবিন্দ ওকে আবার কলকাতাতে পাঠাতে বললে। কে একজন ই-এন-টির বড় ডাক্তার আছেন, ওর বন্ধু এবং মনিব ধরের আত্মীয় হন তিনি। ওর বন্ধুকে বলেই ব্যবস্থা করেছে গোবিন্দ, তিনি বিনা পয়সায় দেখতে রাজি হয়েছেন। যদি ছোটখাটো কোন অপারেশন করলে কাজ হয় তো তিনিই করবেন— তারও কোন খরচ লাগবে না। তিনিই হাসপাতালে ভর্তি করে নেবেন।

কিন্তু এবারও কোন লাভ হল না। দুদিন তিন দিন ধরে দেখলেন ডা. মল্লিক। কোন আশাও দিতে পারলেন না তিনি। বললেন, 'আসলে ওর কানের নার্ভগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ওর কোন চিকিৎসা বিলেতে হয় কিনা জানি না, এদেশে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নি। বৃথা চেষ্টা। এর পর একেবারেই কিছু শুনতে পাবে না। কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝতে পারবে না। একেবারেই বরবাদ হয়ে গেল ছেলেটা।...ঐ যে দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া হয়েছিল বললেন, তাতেই এই কাণ্ডটি হল। সাধারণত ঐ টাইপের ম্যালেরিয়া শরীর একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়ে যায়। মনে হয় ওর বংশে ভি-ডি ছিল। তাতেই আরও অনিষ্ট হয়েছে। সরি, কী আর বলব। I feel pity for the boy.'

অর্থাৎ এদিক দিয়ে আশা-ভরসা আর কিছু রইল না। একেবারেই নিশ্চিন্ত হল ওরা।

এই খবরের পর শ্যামা আর একবার আছাড় খেয়ে পড়লেন। আর এক দফা— রতনকে উদ্দেশ্য করে— গালিগালাজ শাপ-শাপান্তর ঝড় উঠল। কান্তি কিছুই শুনতে পেল না তার, তবে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল সে অনেক কিছুই। তাকে কেউ বলে দেয় নি যে আর কোন আশা নেই কোথাও তার কান সারাবার— কিন্তু দাদা বৌদির অন্ধকার হতাশ মুখ, বড়মাসীমার চোখের জল আর মার এই রণরঙ্গিণী মূর্তি ও আছড়ে পড়া দেখে কিছু আর বুঝতে বাকি রইল

Banglabook.org

না। এবার পাথর হয়ে গেল সে। চোখে আর জল নেই তার। সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এত বড় সর্বনাশের কথা যখন ভাবতেও পারে নি— তখন লজ্জায়, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে চোখ দিয়ে জল পড়ত; এখন আর কিছুই নেই, এ সবের অতীত হয়ে গিয়েছে সে। এখন শুধু সামনে দিক-দিশাহীন অন্ধকার, নিঃসীম শূন্যতা। ভয়েই পাথর হয়ে গেল সে।

অনেক চেঁচামেচি, অনেক কান্নাকাটির পর শ্যামাও এক সময় বোধ হয় শ্রান্ত হয়েই চুপ করলেন। কিন্তু মনের আক্রোশ মেটে নি তাঁর— এই কথাটা নিয়েই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলেন। একবার ভাবলেন সত্যি-সত্যিই যাবেন সেখানে সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেতাই করে আসবেন, কৈফিয়ৎ তলব করবেন তাদের এই আচরণের। কোন্ অধিকারে ওদের না জানিয়ে ছেলেকে সেই মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়েছিল তারা? কেন? কেন এ কাজ করতে গেল তারা, কিসের জন্যে?

আবার পরক্ষণেই মনে হল, ছিঃ! জামাইবাড়িতেই কোন দিন গেলেন না তিনি— তা আবার তাদের আত্মীয়বাড়ি। বিশেষ করে ঐ বাড়িতে— ঐ পাড়ায়। না, সে সম্ভব নয়; তা তিনি পারবেন না।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা কাজ করলেন। মহাশ্বেতার বড় ছেলেটা এসেছিল একদিন, তার শরণাপন্ন হলেন, 'বুড়ো ভাই, একটা কাজ করবি? চুপি চুপি কোন রকমে তোর মেজকাকীর কাছ থেকে তোর রতনপিসীর ঠিকানাটা যোগাড় করে দিবি? এরা শুনলে হৈ-চৈ করে উঠবে— কিন্তু সেখানে কান্তির একরাশ কাপড়জামা পড়ে রয়েছে— মিছিমিছি নষ্ট হবে বৈ তো নয়। ঠিকানাটা পেলে আমি মনমন কাজে একটা চিঠি লিখে দেব, কাউকে দিয়ে তারা পাঠিয়ে দেবে।'

বুড়ো কথাটা বুঝল। নিতান্তই স্বাভাবিক এটা তার দিদিমার পক্ষে। তবে সে পারবে না, অন্য ব্যবস্থা করবে। সেই কথাই বলল, 'না দিদিমা, আমার কম্ম নয় ওসব। তবে কথাটা বার করে নেব। বুঁচি আছে মেজকাকীর পেয়ারের মন্ত্রী, তাকেই বলব। বরং তোমার নাম করেই বলব।'

'তাই বলিস। আর ঠিকানাটা পেলে আমাকে দিয়ে যাস। লক্ষ্মী দাদা আমার, তবে দেখিস, এরা না কেউ টের পায়।'

'ঠিক আছে, সে তুমি কিছু ভেবো নি।'আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বুড়ো অর্থাৎ বিষ্ণুপদ।

অবশ্য বুড়োর বুদ্ধিতে কাজও হয়। দু দিন পরেই হাসতে হাসতে ঠিকানাটা এনে দিয়ে যায়। 'মেজকাকীও জানত না ঠিক— মেজকাকার কাছ থেকে জেনে দিয়েছে। বাব্বা, ও কি আমাদের কাজ। বুঁচি বলেই পেরেছে!'

বুড়োকে দিয়েই একখানা দু-পয়সার খাম আনিয়ে নিলেন শ্যামা। তারপর অনেক দিন পরে সীতার খাতা থেকে এখখানা কাগজ যোগাড় করে চিঠি লিখতে বসলেন। সবাইকে বাঁচিয়ে আড়ালেই লিখতে হল— সেজন্যে দুদিন সময় লাগল তাঁর চিঠি শেষ করতে। বহুদিনের অনভ্যাস, কলমও সরতে চায় না। দেরি হওয়ার সে-ও একটা কারণ।

শ্যামা লিখলেন,

"কল্যাণীয়াসু,

তোমার কল্যাণ কোন-ক্রমেই আমার কাম্য নয়, তবে অন্য পাঠ খুঁজিয়া না পাইয়াই এই পাঠ দিলাম। কল্যাণ কামনা তো দূরের কথা, তোমাকে নিত্য অভিসম্পাৎ না দিয়া আমি জল খাই না। তোমার অনিষ্টই এখন আমার একমাত্র কাম্য। কারণ বিশ্বাস করিয়া তোমার কাছে আমার গর্বের সেরা সন্তানটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া একটু যদি মানুষ করিয়া দাও এই আশায়— তুমি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার সর্বনাশ করিয়াছ।

BanglaBook.org

এমন স্থানেই তাহাকে পাঠাইয়াছিলে যে কমাসেই বাছার আমার জীবনসংশয় ঘটিয়া গেল। দুর্দান্ত ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পড়িয়া ছিল, একজন অপরিচিত লোক দয়াপরবশ হইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন বলিয়া তবু প্রাণটা বাঁচিল। তাও অনেক কষ্টে, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া। বহু রাত জাগিয়া শুশ্রূষা করিতে হইয়াছিল, দশ-বারোদিন পর্যন্ত জীবনের কোন আশা ছিল না প্রাণ যদি বা বাঁচিল চিরদিনের মতো পঙ্গু অক্ষম হইয়া গেল। শুনিয়া বোধ হয় সুখী হইবে— চিরদিনের মতো তাহার দুটি কান কালা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ কালা নয়, বদ্ধ কালা। এখন কানের কাছে ঢাক বাজিলেও শুনিতে পায় না। আমরা ভিখারী, তবু ভিক্ষা দুঃখ করিয়াই বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়াছি, চিকিৎসারও কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন ও কান আর ভাল হইবে না। কোনদিনই না। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার বিষেই উহার কানটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে কী করিয়া খাইবে বলিতে পারো? পথের ধারে বসিয়া ভিক্ষা করা ছাড়া তো আর কোন উপায় রহিল না। মা, একটা কথা তোমাকে দুই হাত জোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি— আমরা তোমার কী অনিষ্ট করিয়াছিলাম যে তুমি বা তোমরা আমার এত বড় অনিষ্টটা করিলে? সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম— না পারিলে সোজাসুজি বলিয়া দিলে না কেন? সে নাকি বিগড়াইয়া গিয়াছিল— তোমরা বলিয়াছ, (সেও তো তোমার দায়িত্ব!) সেক্ষেত্রে আমাদের কাছেই পাঠাইয়া দিলে না কেন? আমাদের ছেলে আমরা বুঝিতাম। তাহাকে সাক্ষাৎ যমপুরীতে পাঠাইবার তোমার কী অধিকার ছিল? এই রহস্যটা যদি খোলসা করিয়া জানাও, এক্ষণে তবু মনকে একটা সান্ত্বনা দিতে পারি। আশা করি এ জবাব চাহিবার আমার সম্যক অধিকার আছে! পরিশেষে আবারও জানাই, সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিত্য অভিশাপ দিব, তুমিও যেন এমনি করিয়া সকল ভালোর মাথা খাইয়া বসিয়া থাক। ইতি—

কান্তির মা।”

বহুকাল পরে লিখতে বসা। হাতের লেখা এককালে মুক্তোর মত ছিল— এখন এঁকেবেঁকে বিশ্রী হয়ে গেল। বিস্তর বানান ভুলও হল নিশ্চয়ই। তবু পড়ার কোনও অসুবিধা হবে মনে হল না। শ্যামা চিঠিখানা খামে এঁটে ঠিকানা লিখে দুপুরের দিকে নিজে সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন।

জবাব পাবেন আশা করেন নি। প্রধানত গায়ের ঝাল মেটাতেই চিঠিটা লেখা। তবু দুদিন পর থেকেই একটু উৎসুক হয়ে দুপুরের দিকটায় বাইরের বাগানে ঘুরতে লাগলেন। ঐ সময় পিওন যায় প্রত্যহ এই পথ দিয়ে। যদিই চিঠি আসে, তার হাতেই পড়া বাঞ্ছনীয়। বৌমা কি কান্তির হাতে পড়লে অনেক ঝামেলা। কৈফিয়ৎ দিতে হবে বিস্তর। এখনকার ছেলেমেয়েদের আবার বড় বেশি ভদ্রতাজ্ঞান। যে আমার মন্দ করেছে তাকে দু-কথা শোনাব— এতেও ওঁদের ভদ্রতায় বাধে। ...

জবাব ডাকে এল না অবশ্য। তবে জবাব পেলেন শ্যামা।

অপ্রত্যাশিতভাবে। অচিন্তিত পথ দিয়ে এসে পৌঁছল।

চিরদিনের ভগ্নদূত মহাশ্বেতাই নিয়ে এল সে জবাব, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল সে।

‘আর শুনেছ ব্যাওরাটা। রতন গো রতন, আমার মামাতো ননদ, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে পরশুদিন। কাল ইনি শুনে এসেছেন। পুলিশ-হাঙ্গামার কাণ্ড তো— সবাইকেই জানিয়েছে তাই, যে যেখানে আছে আপ্ত-স্বজন।’

‘গলায় দড়ি দিয়েছে! সে কি?’ আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

‘হ্যাঁ গো। ঠিক দুপুর বেলা। নিজেরই শাড়ি কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে এই কাণ্ড করে বসে আছে মেয়ে। কেউ জানে নি, কেউ টের পায় নি, এমন চুপিসারে কাজ সেরেছে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যে হয়ে যায় তবু দোর খোলে না, ঘর থেকে বেরোয় না, এতেই সন্দ হতে দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে ঐ কাণ্ড। চিঠি লিখে গেছে নাকি— কারুর হাত নেই এতে, নিজের পাপের প্রাচিত্তির করতে আমি মরছি!... এমন ঘর-বাড়ি, এত পয়সা, সুখের জীবন, দ্যাখো দিকি বাপু! কী যে হল। তোমারই শাপমন্যি ফলল আর কি। যা গালটা দিলে কদিন ধরে ছড়া কাটিয়ে, এত কি সহ্য হয়! তোমার বাপু কথা বড্ড ফলেও যায়, কালমুখের বাণী।..... বলে কে যেন একখানা চিঠি দিয়েছিল দুদিন আগে, সেই চিঠি পেয়ে এস্তক মন ভার করে ছিল, খায় নি দায় নি কিছু করে নি দুদিন। সে চিঠিও পাওয়া যায় নি— তাহলে তবু একটা কিনারা হত যে কেন এ কাজ করলে। কে যে বাপু এমন শত্তুরতা করে চিঠি দিলে! কী লিখেছিল কে জানে, এমন কে চিঠি দিলে ওকে যে আপ্তঘাতী হতে হল!'

বকেই যায় মহাশ্বেতা আপনমনে, ওর অভ্যাসমতো।

কিন্তু শ্যামা যেন আর শুনতে পারেন না। তাঁর দু কান যেন পুড়িয়ে দেয় কে। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।

অভিশাপ দিয়েছিলেন সত্য কথা— কিন্তু এ রকম তো তিনি চান নি। ঈশ্বর জানেন এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা তিনি কখনও চিন্তা করেন নি।

এমন হবে জানলে ও চিঠি কখনই দিতেন না তিনি। যদি মেজবৌয়ের মনে পড়ে, যদি সন্দেহ করে যে তাঁর চিঠিতেই এই কাজ করেছে রতন তো তিনি ওদের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে?

আর তা ছাড়া— আজ যত বড় অনিষ্টই করে থাক সে— অনেক উপকারও করেছে, কান্তিকে যে যথার্থই ভালবাসত, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তার এমন ভয়াবহ পরিণতি— কোন অন্ধ ক্রোধের বশেও কখনও কল্পনা করেন নি। ছি ছি, কী করল হতভাগী। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে গেল তাঁকেই!

শ্যামা নির্জনে বার বার নিজের ইষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। পরলোকে গিয়ে যেন হতভাগিনী শান্তি পায় একটু— সেখানে না আবার এই আত্মহত্যার শাস্তি বইতে হয় তাকে।

'ঠাকুর তাকে মাপ করো, তাকে তোমার কাছে টেনে নাও।'

॥ ২ ॥

মহাশ্বেতার ইচ্ছে ছিল কান্তিকেও খবরটা দিয়ে যায়। বোধ করি পেট ফুলছিল তার তখনও। তাই শ্যামা যখন সেখান থেকে উঠে একরকম ছুটেই পিছন দিকের বাগানে চলে গেলেন নিজেকে সামলাতে— মহাশ্বেতা খুঁজে খুঁজে কান্তিকে বারও করেছিল।

'ঐ, শুনছিস! তোর সেই তিনি রে— তোর রতনদি যে ঘোঙা উলটেছেন। অক্কা পেয়েছে।... আ-মর চেয়ে আছে দ্যাকো কেমন করে— রতনদি তোর, রতন, আমার সেই ননদ মরে গেছে, বুঝলি? এই— গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছে। মা মানুষটি তো আমার সহজ নয়— মার গাল সহ্য করতে পারবে কেন? হাতে হাতে পলে গেল ওর শাপ! বাব্‌বা, মনে হলেও ভয় করে।'

যৎপরোনাস্তি চেঁচিয়েই বলেছিল মহাশ্বেতা, কিন্তু কান্তির কানে তাও পৌঁছবার, কথা নয়। সে তেমনি করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে বললে, 'কিছু বুঝতে পরছি না কী বলছ। কার কথা বলছ! কার কী হয়েছে? একটু লিখে দেবে?'

'দূর হ কালার ডিম। এক জ্বালা হয়েছে কালাকে নিয়ে। আমি তোদের মতো লিখতে পড়তে পারি কি না, যে লিখে দেব। বলে কবে সেই দাগা বুলিয়েছিলুম দিনকতক, এখনও

BanglaBook.org

তা নাকি মনে আছে। আদ্দেক বানান জানি না।..... শোন যা বলছি, আমার মুখের দিকে তাকা। তবু চেয়ে থাকে দ্যাখো বোকার মতো—'

আরও ভাল করে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবার হয়ত চেষ্টা করত কিন্তু ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে আকৃষ্ট হয়ে কনক এসে পড়ল। সে ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারে নি বটে, তবে এটা সে তার সহজ সহানুভূতি দিয়ে বেশ বুঝেছে যে, কান্তির এই দুর্গতির জন্য রতন যতই দায়ী হোক, কান্তির তার প্রতি এখনও যথেষ্ট টান আছে। কারণ এতদিনের এত কথার মধ্যেও ওর মুখ দিয়ে একটি দিনের জন্যেও রতনের বিরুদ্ধে কোন নালিশ উচ্চারিত হয় নি। হয়ত এককালে প্রচুর স্নেহ পেয়েছে তার কাছ থেকে বলেই— কৃতজ্ঞতাটা ভুলতে পারে নি, অথবা ওর এই অনিষ্টের মূলে রতনের সত্যিই তেমন কোন হাত ছিল না,— কারণ যা-ই হোক, কান্তি মনে মনে আজও রতনকে স্নেহ বা শ্রদ্ধা করে। সুতরাং হঠাৎ এত বড় খবরটা পেলে দুর্বল শরীর আরও ভেঙ্গে পড়বে।

সে ব্যস্ত হয়ে এসে মহাশ্বেতার হাত ধরে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে গেল।

'ও কী করছিলেন ঠাকুরঝি, ওকে কি এখন এই খবর দেয়! এখনও ভাল করে সেরে উঠতে পারে নি, রোগা শরীর, — এখন এত বড় আঘাত সইতে পারবে কেন?'

'নে বাপু, তোদের আদিখ্যেতা দেখলে আর প্রাণ বাঁচে না। এখনও কি তার ওপর এত টান এত ছেদ্দা-ভক্তি আছে ওর যে একেবারে বুক ফেটে যাবে! সে মাগী তো ওকে মেরে ফেলতেই বসেছিল! মা কি মন্যিটা দিত অমনি অমনি!'

'তাই বলে কি এতদিনের ছেদ্দা-ভক্তি একদিনেই উবে যায়! এত বছর ধরে এত যত্ন করেছে, সে-সব একদিনেই ভুলে যাবে? অন্তরের টান থাকবে না একটা!'

'জানি নে বাপু! তোদের কথার ধাঁচধরন বুঝতে পারি না। বলে— যে দিয়েছে মনে ব্যথা তার সঙ্গে আমার কিসের কথা, তবু যদি কই কথা ঘুচবে না মোর মনের ব্যথা!'

গজগজ করতে করতে মহাশ্বেতা চলে যায়।

কিন্তু ঐ ভাবে তাকে টেনে আনতে কান্তির মনে একটা খটকা লাগে। সে কনকের কাছে এসে বলে, 'কী হয়েছে বৌদি, বড়দি কী বলছিল। কেউ মরেছে? কার কথা বলছিল? গলা দেখাচ্ছিল—!'

ঠোঁটের ভঙ্গি ক'রে কনক বুঝিয়ে দেয়, 'ও কিছু না। ওর কে এক পাড়ার লোক মরেছে!'

কান্তি চুপ করে যায়— কিন্তু মনের খট্‌কাটা যে দূর হয় না সেটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে কনক।

পরের দিন দুপুরে আবার এসে কনককে ধরে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি বলে, 'একটা কথা বলব বৌদি, কাউকে বলবে না?— লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, না বলে আমি থাকতে পারছি না!'

কনকের মুখ শুকিয়ে ওঠে। তবুও বলতে হয়, 'বলো না কী বলবে! কী এমন কথা?'

বলবার আগেই কান্তির মুখ লাল হয়ে উঠে। মাথা নিচু করে খুব চুপি-চুপি বলে, 'এর মধ্যে— এর মধ্যে তোমরা রতনদির কোন খবর পাও নি?' আটকে আটকে যাচ্ছিল কথাগুলো। বিশেষ করে রতনদির নামটা। কোনমতে যেন মরিয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করল।

যা আশঙ্কা করেছিল তাই। হয় ডাহা মিথ্যে বলতে হয়, নয় তো সত্যটা স্বীকার করতে হয়। তবু পাশ কাটাবার জন্যে পালটা প্রশ্ন করল কনক, 'কেন বলো তো?'

আবারও মুখ নিচু করল কান্তি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'কাল রাত্রে বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। যেন ছেঁড়া-ময়লা একটা কাপড় পরা, গলায় একটা কাটা দাগ— এসে আমার কাছে হাত জোড় করে কী চাইছে। কী যে চাইছে

BanglaBook.org

তা বুঝতে পারলুম না। সেই যে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুম এল না। রতনদির কিছু হয়েছে— হ্যাঁ বৌদি? লক্ষ্মীটি, আমার কাছে গোপন করো না, সে— বেঁচে আছে তো!'

একেবারে নির্জলা মিথ্যাটা মুখে আটকায় বৈ কি!

কনক মাথা নিচু করল এবার।

কান্তির গলাটা যেন একেবারে ভেঙ্গে এল। সে স্খলিত কণ্ঠে একেবারে ফিসফিস করে বলল, 'তাই বুঝি কাল বড়দি বলতে এসেছিল? কেউ— কেউ খুন করেছে বুঝি তাকে? গলা কেটে দিয়েছে?'

কনক ঘাড় নাড়ল। ইঙ্গিতে দেখাল যে গলায় দড়ি দিয়েছে রতন।

চুপ করে গেল কান্তি। শুধু আবার দুই চোখ দিয়ে তার এতদিন পরে অশ্রুর বন্যা নামল।

এর পর দুটো দিন তার যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল তা কনক ছাড়া পুরোটা কেউ বুঝতে পারল না। ঠিক এইটেই আশঙ্কা করেছিল সে। যদি বেচারা প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারত তো হয়ত আঘাতের তীব্রতা অতটা লাগত না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে দাদা বা মার সামনে সে চোখের জলও ফেলতে পারত না। কে জানে অপরাধিনীর জন্যে চোখের জল ফেললে যদি এঁরা রাগ করেন? ঠিক সেই কারণেই তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো স্বাভাবিক ভাবেই করে যেতে হ'ত— অন্তত চেষ্টা করতে হত। ভাতের সামনে গিয়েও বসতে হত, যদিও খেতে পারত না প্রায় একগালও! প্রথম দিন রাতে ইচ্ছে করেই হেমের সঙ্গে তাকে খেতে দেয় নি কনক, হেমের প্রশ্নের উত্তরে 'আমার সঙ্গে খাবে' বলে কাটিয়ে দিয়েছিল। মা'রও সেদিন একাদশী, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তা নইলে বিস্তর বকুনি খেতে হ'ত ওকে। ভাত কমই দিয়েছিল কিন্তু তাও খেতে পারল না সে— দুএক গ্রাস নাড়াচাড়া করে কনকের চোখে চোখে পড়তেই কে'দে ফেলল। ইঙ্গিতে আশ্বস্ত ক'রে কনক তাকে চুপ করে বসে থাকতে বলল, তারপর নিজের খাওয়া হতে নিঃশব্দে ভাতসুদ্ধ থালাটা নিয়ে পুকুরে চলে গেল।

পরের দিন কিন্তু আর চেপে রাখা গেল না। তবে বিচিত্র কারণে শ্যামা খুব একটা বকাবকি করলেন না। শুধু কনককে প্রশ্ন করলেন একবার, 'খবরটা ও শুনেছে বুঝি বৌমা? মহাই বুঝি এই উপকারটি করে গেলেন আমার?'

কিন্তু শ্যামা বকাবকি না করলেও দুদিনেই আবার কান্তির যা চেহারা হয়ে গেল, তা দেখে ভয় পাবারই কথা। কনক তো বটেই— শ্যামাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। শ্যামা যে এতটা সহানুভূতির চোখে ব্যাপারটা দেখবেন তা আশা করে নি কনক, সে ভরসা পেয়ে বলল, 'কী হবে মা— আবার একটা কিছু ভারী অসুখ-বিসুখ হবে না তো গুমরে গুমরে!'

'কী জানি মা, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটা কিছু কাজের মধ্যে থাকলেও বা যা হয় হ'ত—শুধু শুধু চুপ করে বসে থাকা— এই যে হয়েছে আরও কাল!'

'ওকে— ওকে কোথাও দু-একদিনের জন্যে পাঠালে হ'ত না?'

'কোথায় পাঠাব বলো। উমার কাছে একটা রাত্তিরও কাটাবার জায়গা নেই, পাঠাতে গেলে এক বড়দির কাছে। তা কালা-মানুষ কিছুই শোনে না— কলকাতায় গাড়ি-ঘোড়ার পথ, ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আরও, কলকাতায় গেলে—ঐসব কথা বেশি ক'রে মনে পড়বে হয়ত!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে বাঁচিয়ে দেয় উমাই।

তৃতীয় দিনে ডাকে একটা চিঠি আসে কান্তিরই নামে। উমা ওকে বিস্তর সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে লিখেছে—

'তুমি কোন কারণেই হতাশ হইও না—বা হাল ছাড়িয়া দিও না। মেয়েদের পড়ার বইতে অনেক অনেক জীবনী নিত্যই পড়িতেছি, তোমার অপেক্ষা গুরুতর রকমের অঙ্গহীন লোকও পৃথিবীতে বহু বড় বড় কাজ করিয়া কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও

BanglaBook.org

যে হাত-পা বা ঐ ধরনের কোন অঙ্গ যায় নাই। আমি বলি কি, তুমি আবার পড়াশুনাতেই মন দাও। ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়িয়াছিলে মোটামুটি অনেকটা জানাই আছে। এখন বই দেখিয়া নিজেই পড়িতে পারিবে। এখন তো লিখিত পরীক্ষা—কানে শুনিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তুমি বরং ওখানকার ইস্কুল হইতে, বা যেসব বই তুমি পড়িতে, মনে করিয়া পুস্তকের তালিকা করিয়া আমাকে দাদার মারফৎ বা ডাকে পাঠইয়া দাও, আমি আমার ছাত্রীদের বাড়ি হইতে যতটা পারি যোগাড় করিয়া দিব, বাকিগুলি তোমার মোসোমশায় কিনিয়া দিবেন। তুমি আর এক দিনও সময় নষ্ট না করিয়া কাজে লাগিয়া যাও।'

উমার এই চিঠিখানাই যেন দশ বোতল টনিকের কাজ করল। কান্তির মুখ-চোখের চেহারা ফিরে গেল দুদিনে। রতনের শোকটাও এই প্রবল উৎসাহের বন্যায় অনেকটা দূরে চলে গেল। এক আধবার—বিশেষত সন্ধ্যার সময়টা—একটু উন্মনা হয়ে উঠত, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও হয়ত ফেলত কিংবা দূর শূন্যে চেয়ে চোখ দুটো উঠত ছলছল ক'রে—কিন্তু সেই গুম হয়ে বসে থাকা বা শুকিয়ে ওঠাটা একেবারে চলে গেল। সে সেইদিনই বসে বসে একটা বইয়ের ফর্দ ক'রে দাদার হাতে দিয়ে দিলে ছোটমাসীকে দেবার জন্যে। তারপর খুঁজে খুঁজে সীতার দরুন বালির কাগজের খাতাটা বার ক'রে তারই দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসল। যে ইংরেজি প্রবন্ধগুলো তার তৈরি করা ছিল, সেইগুলোই নতুন ক'রে লিখে মিলিয়ে নিতে লাগল। অর্থাৎ নতুন উৎসাহ এসেছে জীবনে—হতাশ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। এরাও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবার।

দিন পাঁচ-সাত পরেই ছোটমাসী একদফায় কতকগুলো বই পাঠিয়ে দিলেন। হেম ইতিমধ্যে ওর অফিস থেকে রেলের কখানা বাঁধানো খাতা এনে দিয়েছিল—অঙ্ক কষা ও অন্য সব লেখার জন্যে। এ তো আর ইস্কুলে দেখাতে হবে না—মিছিমিছি সাদা খাতা কিনে পয়সা নষ্ট করার প্রয়োজন কি! তাতে অবশ্য কান্তিরও কোন আপত্তি নেই। সে এবার দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনো শুরু করল। অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে সে। শুধু ওর এই একেবারে কালা হয়ে যাওয়াটা এদের এখনও অভ্যাস হয় নি বলে এদেরই একটু অসুবিধা হচ্ছে। পেছন ফিরলে আর কোনমতেই ডাকার উপায় নেই। সামনে ফিরে থাকলে হাতপায়ের ভঙ্গি ক'রে ঠোঁট নেড়ে তবু কাজ চলে। অন্যদিকে ফিরে থাকলে গায়ে হাত দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নয়ত ঘুরে গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়—কি ঘাড় হেঁট ক'রে থাকলে, একটা হাত ওর চোখের সামনে ঘুরিয়ে মাথা তোলবার ইঙ্গিত জানাতে হয়।

এইসব দেখে হেম মধ্যে মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ে। মাকে বলে, 'পড়ছে তো, প্রাইভেটে একজামিন দিয়ে পাসও হয়ত করতে পারবে কিন্তু কোন কাজ হবে কি তাতে? ও যে কোথাও চাকরি পাবে বলে তো মনে হয় না। কে দেবে ওকে কাজ? যে মাইনে দেবে সে এত দিকদারি সহ্য করবে কেন?...যা দেখছি ষাঁড়ের নাদ হয়েই ওকে জীবন কাটাতে হবে।'

শ্যামা চুপ ক'রে থাকেন। তিনি হেমের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না। মধ্যে মধ্যে তিনিও যে একটা হিম হতাশা বোধ করেন না তা নয়—কিন্তু ঠিক এতখানি অন্ধকার ভবিষ্যৎ মেনে নিতে তাঁর মন চায় না। এ ছেলের ওপর যে অনেকখানি ভরসা ছিল তাঁর। সে আশার প্রাসাদ একেবারে ধূলিসাৎ হ'লে তিনি দাঁড়ান কোথায়? তাই কতকটা নিজের গরজেই একটা ক্ষীণ আশা আঁকড়ে ধরে থাকেন। একটা কি কিছু উপায় হবে না, ভগবান কি এতটা অবিচার করবেন? তবে যে লোকে বলে 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি'—সে কি মিছে কথা? শুধুই কথার কথা? তাঁর জীবনে তিনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন সে কথা ভেবেও বল পান অনেকটা। আবার এমনও একটা ক্ষীণ আশা মনে মনে উঁকি দেয়—ভালও তো হয়ে যেতে পারে, যেমন হঠাৎ কালা হয়ে গেছে তেমনি হঠাৎই আবার হয়ত শুনতে আরম্ভ করবে। অনেক

BanglaBook.org

সময় দৈব ওষুধেও কাজ হয়। একবার তাই না হয় যাবেন মঙ্গলার কাছেই। তাঁর অনেক জানাশুনো আছে—যদি তেমন কোন ওষুধ-বিষুধের সন্ধান দিতে পারেন তিনি।

ছেলের মুখে চোখে নতুন উৎসাহের দীপ্তি জেগেছে, তার আলোও খানিকটা তাঁর মনে এসে পড়ে। হবেই একটা উপায়, যা হোক ক'রে। ভগবান কোন মতে একটা পথ দেখিয়ে দেবেনই।

॥ ৩ ॥

এর মধ্যে আর একটা প্রবল আঘাত এসে পড়ল কান্তির মনে। তার থিতিয়ে-আসা স্মৃতির সরোবরে নতুন ক'রে আলোড়ন জাগল। সে আঘাত বহন ক'রে নিয়ে এল একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটি মানুষ—মোক্ষদা, রতনের ঝি।

তখন বেলা তিনটে হবে। কান্তি বাইরের ঘরে পড়াশুনো করছে, শ্যামা সেইখানেই বারান্দায় বসে পাতা চাঁচছেন। হঠাৎ বাগানের বেড়ার আগড় ঠেলে একটি অপরিচিত মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। যে এসেছে সে এখানকার কেউ নয়। এখানকার সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারেও বিধবা মেয়েরা সাধারণত ক্ষারে-কাচা কাপড় পরে। এর পরনে পরিষ্কার বাসিধোপ-করা নরুনপাড় ধুতি। অথচ চালচলন দেখলে ঝি বলেই মনে হয়—বা ঐ শ্রেণীর কেউ। কলকাতা শহরের কোন বড়মানুষের বাড়ির ঝি হবে হয়ত।

আর একটু কাছে আসতে শ্যামা তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, 'কে গা বাছা—চিনতে পারছি না তো! কোথা থেকে আসছ?'

যে আসছিল সে তখনই জবাব দিল না। কাছে এসে সিঁড়ি দিয়ে দুটো ধাপ উঠে রকের প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'বলছি মা। একটু বসি আগে—দম নিই।'

তারপর অনিমন্ত্রিত ভাবেই রকের ওপর জেঁকে বসে বলল, 'আপনি তো কান্তি দাদাবাবুর মা? এটাই তো তাঁদের বাড়ি?'

কান্তি দাদাবাবুর মা!

বিদ্যুৎবেগে মনে পড়ে যায় কথাটা। এক রতন বা তাদের বাড়ির কোন লোক ছাড়া এ পরিচয় ধরে কেউ খোঁজ করবে না। এ নিশ্চয় মোক্ষদা। এর কথা বহু গল্প করেছে কান্তি। মহাশ্বেতাও।

মোক্ষদা পাকা লোক! সে ওঁর মুখের রেখা দেখেই বুঝতে পারল যে তিনি ভাবছেন। ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, আমি মোক্ষদা। অতন দিদিমণিদের বাড়ির ঝি।'

অপ্রসন্ন হয়ে উঠল শ্যামার মুখ। ওদের কথা তিনি সর্বতোভাবেই ভুলতে চাইছেন প্রাণপণে। আবার মনে করাতে এল কেন মিছিমিছি!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হ'ল—যে রহস্যটা কিছুতেই এতকাল আবিষ্কার করা যা নি—কান্তিকে বার বার নানাভাবে জেরা ক'রেও জানা যায় নি—সেইটেই হয়ত এবার পরিষ্কার হ'তে পারে।

তবু তিনি বিরস কণ্ঠেই বললেন, 'তা তুমি আবার কী মনে ক'রে বাছা? তোমাদের দিয়ে তো আমার ঢের উপকার হয়েছে—আর কেন? আরও কী তোমাদের অভিরুচি আছে—তাই শুনি! অনেকটাই তো সেরে এনেছিলেন তোমার মনিবরা—বাকি তো শুধু চামড়া আর হাড় কখানা। তুমি বুঝি এবার সেটুকুও সেরে যেতে এসেছ? ঐ যে বলে—হাড় খাব মাংস খাব চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব, তা সেই শেষের কাজটুকু সারতে এসেছ বুঝি!'

অকস্মাৎ মোক্ষদা ঠাঁই ঠাঁই করে দুহাতে নিজের দুগালে চড়াতে লাগল।

'এই! এই! আমার প্রাচিত্তির এই! নিত্যি নিজে হাতে নিজেকে প্রেহার করছি মা, দিন আত্তির। তাই তাতেই কি প্রাচিত্তির হবে? হবে না, নরকেও ঠাঁই হবে না আমার! মহাপাতক করেছি মা, নিজের হাতে গু গুলে খেয়েছি। তবে হ্যাঁ—তার সাজাও পেয়েছি হাতে হাতে।

BanglaBook.org

ঠাকুর আর আত পোয়াবার নেগে তুলে আকে নি—সদ্য সদ্য শোধ দে দিয়েছে। আমার মনিব সাক্ষাত রন্নপূর্ণো, তাকে আমিই তো বলতে গেলে মেরে ফেন্নুগা! য্যাদ্দিন বাঁচত কখনও কোন অভাব থাকত নি। যা চেয়েছি চেরকাল তাই দিয়েছে। একটি দিনের জন্যে না বলে নি কখনও। বলি মেয়ে-জামায়ের গুষ্টিসুদ্দু পালছিনু ঐ খুঁটির জোরেই তো গা! একেবারে ধনে-পরানে মেরে রেখে গেল! আর তার মূল হনু এই আমি—আক্কুশী শতেকক্ষোয়ারী!'

কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। উত্তেজনাও বোধ করেন শ্যামা। সুগভীর রহস্যের বুঝি আজ তল মিলল। এতদিনের কৃষ্ণ যবনিকা বুঝি অপসারিত হ'ল চোখের সামনে থেকে। তবু যথাসাধ্য বাহ্যিক নিস্পৃহতা রক্ষা করে বসে থাকেন। ওকেই বলবার সুযোগ দেন আরও।

ঘরের মধ্যে থেকে কান্তিও দেখেছে মোক্ষদাকে। কাঠ হয়ে গেছে সে ওকে দেখে। বাইরে এসে লাভ নেই, কিছুই শুনত পাবে না সে—তাছাড়া, তা ছাড়া কী জন্যে কী বলতে এসেছে ও—কে জানে! এতদিন এত যত্নে যে কলঙ্ক ঢেকে রেখেছিল, সেই কলঙ্কই বুঝি সকলের সামনে খুলে দিতে এসেছে ও। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে তার। ইচ্ছা হয় ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও।—চিরকালের মতো। রতনদিই চালাক, মরে বেঁচেছে। কান্তিরও যদি সে সাহস থাকত!

মোক্ষদা দম নেবার জন্যে একটু থেমেছিল; একটু পরে বলল, 'তা হ্যাঁ মা, আপনি শোন নি আমাদের দিদিমণি গলায় দড়ি দেচে?'

অকারণেই কানের কাছটা কেমন গরম হয়ে ওঠে শ্যামার। তিনি ঘাড় নেড়ে শুধু জানান যে শুনেছেন।

'তা কিসের জন্যে, কেন—সে বিত্তান্ত কিছু শোন নি আপনি? আমাদের কান্তি দাদাবাবু কিছু বলেনি আপনাকে?'

'বলবার কি হাল ছিল তার!' ঝেঁঝে ওঠেন শ্যামা, 'সে তো মরা এসে পৌঁছল বলতে গেলে। তাকে তো যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। সে কী বলবে? তার কিছু হুঁশপব্ব ছিল। এখন তো কথাই নেই—দু কান কালা হয়ে বসে আছে—দুনিয়ায় এত শব্দ তা একটাও কানে যায় না তার। জবু-থবু জন্তু হয়ে গেছে একেবারে। তাকে জিগ্যেসই বা করবে কে? আমরা মানুষ তো—গণ্ডার তো আর নই। ঘেন্না-পিত্তির মাথা খেয়েও বসে নেই।'

মুখে সমবেদনাসূচক চুকচুক শব্দ ক'রে মোক্ষদা বলে, 'আহা রে! কানে একেবারে শুনতে পায় না? তাহলে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে বলো! ইস্! কী ছেলের কী হাল। রমন আজপুত্তুরের মতো ছেলে—কী বলছ মা!'

'সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি দেখে যাও না বাছা। চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন ক'রেই যাও না। এই ঘরেই তো আছে!'

'না মা থাক। বাপ্‌রে, এ মুখ আর তাকে দেখাতে পারব নি। এ কালামুখীর পাপের কি শেষ আছে মা! যত শুনতিছি তত বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যাচ্ছে। বলি এসবই তো তোলা থাকতেছে গো। এর শেষ কি রমনি উঠবে!'

এবার শ্যামা আর থাকতে পারেন না, সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, 'তা কী হয়েছিল বাছা একটু শুনতে পাই না? কী এমন করেছিল ও, যে, এত বড় শাস্তিটা তোমরা দিলে?'

মোক্ষদা মাথা নামাল এবার। আঁচলের প্রান্তে বাঁধা গুলের কৌটোটা খুলে হাতে নিয়েছিল, সেটাও বাঁ-হাতে ধরা রইল। কৌটো খুলে গুলটুকু মুখে দেবারও যেন উৎসাহ রইল না তার। হেঁট মুখে কিছুক্ষণ একটা নারকেলপাতার ডগা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর বললে, 'তা মা করেছিল। আমার দোষ কম নয়, ষোল আনার রোপর রাঠারো আনা তা আমি মানতিছি—তবে দাদাবাবুও কাজটা খুবই গরিত করেছিল, তাতে কোন সন্দ নি। তুমি

BanglaBook.org

ছেলেমানুষ, এখনও রিস্কুলে পড়তেছ—তায় গরিব বামুনের ছেলে, নেকাপড়া শিখে নিজের রুন্নতি করতে গেছ—তোমার কী দরকার নৈবিদ্যির কলাতে হাত বাড়াবার? রন্যায় অবিশ্যি দিদিমণিরই বেশি—সে আমি একশ বার বলব—লেহ্য কথা বলতে মুকী ভয় পায় না তা নিজের বেলায়ই বা কি রপরের বেলায়ই বা কি—আসল কথা ফুটফুটে রাজপুত্তুরের মতো চেহারা হয়ে উঠেছিল তো দাদাবাবুর, বয়েস যা তার চাইতে যেন বেশি ছাওয়ালো হয়ে উঠেছিল গড়নটা—আর লোভ সামলাতে পারলে নি, নষ্ট করে বসল। তা তাও বলি, সেও তো দগ্দাচ্ছে কম নয়—চেরকালই ঐ আক্কশ মেয়ে-খেকো মিনসে মাতাল দাঁতাল বাপের বয়িসী সব বুকচাপ মানুষগুলো এনে বসিয়ে দিচ্ছে বৈ তো নয়—সাধ-আহ্লাদ বলতে তো কোন দিন একটা মিটতে দেয় নি। কখনও কোথাও কি যেতে পেরেছে? গয়না গড়িয়ে দিয়েছে তো মাথা কিনেছে একেবারে, সে গয়না যদি কাউকে দেকাতেই না পারলে তো লাভ কি মা বলো! বলি এই কলকেতা শহরে যে এতটা কাল কাটিয়ে গেল তা এই শহরটাই কি কোনদিন ঘুরে দেখেছে, কেমন গমগমা শহরখানা! বাড়ির বাইরে পা দেবার তো হুকুম ছেল না গা। বাবুরো যত না হোক ঐ মেয়ে-খেকো মিন্‌সের শাসন যে আরও বেশি, সব্বদাই পেরানে ভয় যে মেয়ে পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই তো দুঃখু করে বলত—মুকী, রেতকাল এখানে কাটল; জম্মকম্ম! সব এখেনে—তা একদিন চিড়িয়াখানা মরা-সোসাইটি পজ্জন্ত দেখা হ'ল না! জম্মের মধ্যে কম্ম, কাশী যাবে বলে বায়না ধরেছিল সে জামাইবাবুর কাছে—সে আজীও হয়েছিল, কিন্তু ওর বরাতে নি, পট্ করে মরে গেল। আর হ'ল নি কাশী যাওয়া। গেলে আমারও হ'ত—মুকী ছাড়া তো যেত নি সে। এ বাবু তো যমের দূত, দস্যি একেবারে—সদরের চৌকাট ডিঙ্গোবার হুকুম ছেল না এর আমলে।'

স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন শ্যামা। ওর এই অনর্গল বাক্যস্রোতের মধ্যে থেকে সার যেটুকু সেটুকু নিতে পেরেছিলেন তিনি—আর তা-ই যথেষ্ট। বাকি কথার অর্ধেকও কানে যায় নি, তিনি চুপ ক'রে বসে ভাবছিলেন ঐ কথাটাই। তাঁর রাজপুত্রের মতো রূপবান ছেলে পেয়ে সে নষ্ট করেছিল! ডাইনী! ডাইনী চুষে খেয়েছে তাঁর ছেলেকে—তাই অমন ডাইনীচোষা কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ওর। গলায় দড়ি দিয়েছে, বেশ হয়েছে। গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত। জন্মে জন্মে যেন গলায় দড়ি দেয়—তবে যদি এ অপরাধের স্খালন হয়। যে অনুতাপটুকু ছিল তাঁর এ কদিন ঐ চিঠিখানা দেবার জন্য, সেটুকু নিঃশেষে দূর হয়ে গেল অনুতাপের জায়গায় প্রচণ্ড একটা আক্রোশ অনুভব করতে লাগলেন তিনি—নিষ্ফল অথচ সীমাহীন একটা রোষ। বিশ্বাস করে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন তার কাছে—সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান। বলতে গেলে মার বয়সী তুই—তুই এই কাজ ক'রে বসলি! তাঁর দুধের ছেলে—বয়স হ'লে কি হবে, মনে মনে এখনও শিশু রয়ে গিছল যে। দুনিয়ার কোন মন্দ জিনিস, মন্দ কথা জানত না—নির্মল ফুলের মতো অকলঙ্ক ছেলে তাঁর। সেই জন্যেই আরও সোজা হয়েছে কাজটা। কেমন ক'রে প্রবৃত্তিই বা এল তার। ছি ছি! ঐ জন্যেই বলে নষ্ট মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াবে না। ঐ জন্যেই তিনি শুনে অত রাগ করেছিলেন। তিনি ঢের বেশি মানুষ চিনতেন।...

ছেলের ওপরও রাগ তাঁর কম হ'ল না। এই কাণ্ড ক'রে বসে আছেন বাবু। তাই মুখে রা নেই, তাই চুপচাপ। তাই কথা তুললেই কেবল চোখে জল। বলবেই বা কি! বলবে কোন্ মুখে। এই বয়সেই এই! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! ছেলের বাইরের শান্ত সরল চেহারা দেখে ভুলেছিলেন তিনি—ভুলে গিয়েছিলেন কোন্ বংশের ছেলে ও। বাপজেঠার নাম রাখবে না! যে ঝাড়ের বাঁশ সেই ঝাড়ের মতো না হ'লে চলবে কেন! সরকার-গিন্নী ঠিকই বলেন, ভাতার থেকে যার সুখ হ'ল না, তার সুখ আর এ জন্মে হবে না! ভেবেছিলেন এই ছেলে তাঁর মানুষের মতো মানুষ হয়ে মার মুখ উজ্জ্বল করবে। সেই বরাতই তাঁর বটে!...

বাইরে কথা বলার আওয়াজ পেয়ে কনক বেরিয়ে এসেছিল। অপরিচিত মানুষ দেখে সে ভেতরে চলে গেল বটে কিন্তু শ্যামার এবার চমক ভাঙ্গল। নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে গলার আওয়াজ বহুদূর যায়। ছেলেকে তিনি কোথায় পাঠিয়েছিলেন তা আর বিজ্ঞাপন ক'রে জানাবার দরকার নেই পাড়ার লোককে।

তিনি চাপা তিক্ত কণ্ঠে বললেন—অন্তরের বিষ কিছুতেই গোপন করতে পারলেন না—অনেক চেষ্টাতেও, 'যাক গে বাছা, তুমি একটু গলা নামিয়ে কথা বলো দিকি, ব্যাগত্যা করি। এ সব তো আর ঢাক পিটিয়ে বলবার কথা নয়। ভদ্দরলোক বামুনের ঘরের মেয়ে হয়ে যে কাজ করত তোমার মনিব সেটা আর না-ই শোনালে পাঁচজনকে। আমরা পাঁচটা কুটুম নিয়ে ঘর করি—তা ছাড়া এ হ'ল কুটুম-বাড়িরই কেচ্ছা। কুটুমের কুটুম তো—মেয়ের ননদ!'

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মোক্ষদা। যথাসাধ্য গলা নামিয়েই বলে, 'তা যা বলেছ মা, লেহ্য কথা। এ সব কি আর লোককে বলবার না জানাবার! আপনাদের এ হ'ল গে চোরের মার কান্না, মুখ বুজে সব সইতে হবে!'

শ্যামাও একটু নরম হয়ে আসেন। এখনও সবটা জানা যায় নি। রহস্যটা পুরো পরিষ্কার হয় নি এখনও। তিনিও অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বলেন, 'তা নষ্টই যদি করেছিল—তুমি যা বলছ যদি সত্যিই হয়—ওকে চোখে লেগেছিল মনে ধরেছিল বলেই তো করেছে কাজটা—তা তবে ওর অমন সব্বনাশটা করলে কেন? এ আবার কেমন-ধারা ভালবাসা?'

'সে কি করেছে? করেছে তো ঐ দস্যি, ঐ দত্যি-দানোটা!' ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে মোক্ষদা, 'আমি কি ছাই তখন বুঝেছি যে ওর ভাল-মানুষির মধ্যে রেত কাণ্ড আছে, ওর ভেতরে ভেতরে এত মৎলব ঘুরছে। আমি ভেবেছি রমন চোরের মার মেরে—আধমরা করেই তো ফেলেছিল বলতে গেলে—বুঝি মনে একটু দয়া হয়েছে। ছেলেটা যাতে আবার দাঁড়িয়ে যায়, ক'রে খেতে পারে, সেই জন্যে ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে একটা ভাল ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে। সে যে অমন দেশ—এমন সাংঘাতিক ম্যালোয়ারী রোগ সেখেনে—তা কেমন ক'রে জানব মা! তা হ'লে কি আর আমি দাদাবাবুকে যেতে বলি সেখানেই—আমিই তো বারণ করতুম!'

'মেরেছে! মেরেছে ওকে—আমার ছেলেকে!' আড়ষ্ট বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠেন শ্যামা। যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা তাঁর।

'সে কি একটু-আধটু মার মা। আমরা সব্বাই মিলে গিয়ে না পড়লে বোধহয় দুজনকেই খুন ক'রে ফেলত। শুধু কি দাদাবাবুকে—নিজের আঁড়কেও এহাই দেয় নি।'

'এতবড় আস্পর্দা—বামুনের ছেলের গায়ে হাত তোলে! কী ভেবেছে, মাথার ওপর চন্দ সূয্যি নেই!' শ্যামা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কী জাতের লোক সে?'

তাঁর সেই আগুনের শিখার মতো মুখ-চোখের দিকে চেয়ে মোক্ষদা যেন গুটিয়ে যায়। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই বলে, 'তা জানি না মা, বলে তো দত্ত। তা দত্ত তো শুনেছি কায়েতও হয়, বেনেও হয়। কী দত্ত তা জানি নি!'

'ফল পাবে। আমি যদি যথার্থ বামুনের মেয়ে হই— আর ও-ও যদি বামুনের ঘরে সতীর পেটে জন্মে থাকে তো এর ফল পাবে সে, দেখে নিও।'

মোক্ষদার মুখ বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হতে থাকে ক্রমশঃ। সে আস্তে আস্তে বলে, 'পাবে কি মা, পেয়েছেই তো শুনছি। দিদিমণি গলায় দড়ি দেবার পর থেকেই নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছে। খায় না দায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না—রাপিসেও নাকি যায় না, গুম্ খেয়ে এক জায়গায় বসে থাকে!'

'হবে না!' যেন বিজয়গর্বে বলে ওঠেন শ্যামা, 'আমার ছেলের গায়ে হাততোলা, আমার ছেলের এমন সর্বনাশ করা—এর শোধ উঠবে না! এখনই হয়েছে কি, ওরও—তোমাদের ঐ দত্তবাবুরও অপঘাত মৃত্যু হবে দেখে নিও!'

BanglaBook.org

তারপরই কথাটা মনে পড়ে যায়, 'তা সে টের পেলেই বা কী ক'রে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যেই কেউ চুক্‌লি খেয়েছে!' বলতে বলতে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চান মোক্ষদার মুখের দিকে। ওর সেই প্রথমকার অনুশোচনামূলক কথাগুলোর সঙ্গে এই ঘটনার একটা যোগসূত্র বুঝি খুঁজে পান এতক্ষণে।

আবার নিজের দুই গালে চড় মারতে থাকে মোক্ষদা, হাউ-মাউ ক'রে ওঠে একেবারে, 'হেই মা, আমি তোমার রবোধ সন্তান মা, তুমি সাক্ষেত দেবতা, হেই মা, মন্যি দিও না, দোহাই তোমার। আমি নরকের কীট মা, এমনিই নিজের সব্বনাশ নিজে করেছি—তার রোপর শাপ-মন্যি দিও না মা, তোমার পায়ে ধরতিছি!'

'চুপ চুপ, আবার চেঁচায়!' প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন শ্যামা।

'না মা চেঁচাই নি। চুপি চুপি বলতিছি! সে বেইমানী আমিই করেছি মা, স্বীকার পাচ্ছি। এদান্তে দিদিমণি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, দাদাবাবুকে নিয়ে রুন্মত্ত হয়ে উঠেছিল একেবারে। তাই দেখেই যে কী ইষ হলো মা, মাথায় যেন অক্ত চড়ে গেল ক্রেমশ। ইষ হ'লো যে, খেতে পেত না, ভিখিরীর ঘরের ছেলে এসে মনিবের মনিব সেজে বসল। আরও ভয় হল মা—মিছে কথা বলব নি, তুমি মা সাক্ষেত ভগবতী তা আমি বুঝে নিয়েছি, তোমার কাছে মিছে বলে পারও পাব নি—মনে মনে ছেল যে, দিদিমণির তো ছেলেপুলে হ'ল নি, পয়সায় দুক-দরদও নি, যা পাব দুয়ে নোব, দেশে বেশ গুছিয়ে দোব মেয়ে-জামাইকে—এখন ভয় হ'ল যে দাদাবাবুর রোপর যা টান কোন্ না ওকেই যথাসব্বস্ব দেবে—যা জামার রোপর জামা, কাপড়ের রোপর কাপড় দিচ্ছিল, জুতোই তো দাদাবাবুর জমেছিল কম করে ছ জোড়া—তা এত দিয়ে কি আর আমাদের কপালে কিছু বাকি থাকবে! তারপর তো ক্রেমশ দাদাবাবুরও চোখ খুলবে, কোন্ না পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে শিখবে সে। তখন আমাদের টাকা দেওয়াও বন্ধ করবে—যা বাঁচবে তা ওরই থাকবে, এই কথাটা যদি বোঝে অযথা খরচ কি আর করতে দেবে? আর দিদিমণির যা অবস্থা—সে তো তোমার ছেলের কথায় ত্যাখন উঠতেছে বসতেছে। দাদাবাবুর কথা তো বেদবাক্যি একেবারে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই জামাইবাবুকে কথাটা আমি নাগিয়েছিলুম। ডান হাতে করে গু গুলে খেয়েছিলুম। হেই মা, আমাকে রেবারের মতো ঘাট করো মাপ করো মা—আমার যা সাজা তা আমিই ভোগ করতিছি। এর রোপর তুমি আর মন্যি দিও না। একটা মেয়ে নিয়ে আমি ঘর করি মা।'

'মন্যি আমাকে দিতে হবে না মা, আর আমি কেনই বা দেব, আমারও অদেষ্ট, নাইলে এমন হবেই বা কেন—নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে ছেলে কেউ কখনও পাঠায়—' আস্তে আস্তে বলেন শ্যামা, 'তবে বাছা বেইমানীর দেনা তোমার তোলা থাকল, সে আমি মন্যি দিই না দিই—সে দেনা তোমাকে শুধতেই হবে! এর সুদসুদ্ধ উশুল দিতে হবে একদিন!'

যেন শিউরে ওঠে মোক্ষদা। বলে, 'আমি এতটা ভাবি নি মা সত্যি বলতিছি। তাও মুখে ঠিক বলি নি, একটু রিসারা দিয়েছিলুম মাত্তার। তাই থেকেই যে এত কাণ্ড হবে—তিল থেকে তাল—এমন সব্বনাশ হয়ে যাবে—কেমন করে জানব মা!'

চুপ করে থাকেন শ্যামা। সামনের এই প্রায় কুঁকড়ে-বসে থাকা মানুষটা সম্বন্ধে যেমন একটা অপরিমিত ঘৃণা বোধ হ'তে থাকে, তেমনি একটা অনুকম্পাও অনুভব না করে পারেন না। কী তুচ্ছ ঈর্ষার বশে নিজেরই এতবড় অনিষ্টটা করে বসে রইল! অকারণ, অমূলক ঈর্ষা—যার কোন ভিত্তিই নেই—তাইতেই পাগল হয়ে নিজের সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা নিজেই পুড়িয়ে দিলে। ওর চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে! নিজেরও অনিষ্ট করল আর সেই সঙ্গে তাঁরও অতিবড় সাধে এমন বাদ সাধল।

BanglaBook.org

খানিক পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামা যেন আবার কতকটা স্বাভাবিক হন। বলেন, 'তা আজ কী মনে ক'রে এসেছ বাছা এখানে—সে কথাটা তো এখনও বললে না। এই সব সুখবর দিতে নিশ্চয়ই গাড়িভাড়া করে এত দূরে আসো নি। ব্যাপারটা কি খুলে বলে ফেল। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, এবার উঠতে হবে!'

মোক্ষদাও এবার যেন একটু প্রকৃতিস্থ হয়। সামনে আর একটু এগিয়ে এসে আরও ফিসফিস ক'রে বলে, 'হ্যাঁ গো মা—এসব কথা বলতে কি আর আসে মানুষ, কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তাই! বলছিলুম কি দাদাবাবুর নেয্য পাওনা অত বড় সম্পত্তিটা রমনি রমনি ছেড়ে দেবে? একবার লড়ে দেখবে না? এদিকে তো বলতেছ ছেলে ঐ কাজের বার হয়ে গেল—ওজগার ক'রে খাবার ভরসা তো আর অইল না— তা একদিক দিয়ে ক্ষেতিটা পুষিয়ে নাও। সম্পত্তিটা তো বড় কম না—পেলে ঐতেই সারা জীবন কেটে যাবে ওর!'

সম্পত্তি!

ছিলে-কাটা ধনুকের মতোসোজা হয়ে বসেন শ্যামা, শব্দটা শোনবামাত্র।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'সম্পত্তি? কিসের সম্পত্তি? ওর আবার সম্পত্তি এলো কোথা থেকে?'

'তাই বলতেই তো আমার আসা গো! একখানা সেই কী চিঠি গেল না—তাতেই দাদাবাবুর বিত্তান্ত সব জানতে পারলে তো—আমাকে বলে নি কিছু দিদিমণি, তবে আমি বুঝেছি মা, সে চিঠি আপনিই দিয়েছিলে, ও আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। আর কে এমন কড়া চিঠি লিখবে বলো। পড়তে পড়তেই মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল, দুচোখ দিয়ে দর-দর ক'রে জল ঝরতে লাগল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, মুকী এত ক'রেও তোদের আশা মেটে নি, তোরা তাকে সেখানে মরতে পাঠিয়েছিলি!... তাতেই তো জাননু যে দাদাবাবুর খবর দিয়ে কে চিঠি নিকেছে। তা সে তুমি ছাড়া! আর কে নিকবে বলো গরজ করে।... সেই যা একবার একটা কথা মুখ দে বার করেছিল, তারপরই একেবারে যেন কাঠ হয়ে গেল। অত তো জানত না, জানে সেখেনে আছে, লেখাপড়া করতেছে—ভালই আছে, কেমন আছে কী বিত্তান্ত তা তো আর জিজ্ঞেসা করবার সাহস ছিল না, কাউকে দিয়ে যে খোঁজ করাবে সে জোও নি। বাপ তো ঐ চণ্ডাল। সরকারকে জিজ্ঞেস করবে—সে যদি আবার নাগায় বাবুর কাছে!... তা সে যাক গে, চিঠি পেয়ে গুম্ হয়ে অইল সারাদিন। বিকেলে উঠলে নি, গা ধুলে নি, মাথা বাঁধলে নি—কিচ্ছু না। আমি বলতে গেনু—তা বললে, ফের যদি আমার দিক করতে রাসিস তো আমি এক্ষুণি ঐ ফলকাটা ছুরিখানা গলায় বসিয়ে দোব!

আত্তিরে বাবু এল—তা ওপরের ঘরে গে একটা চাদর মুড়ি দে পড়ে অইল। সেই যে-ঘরে দাদাবাবু থাকত গো—সেই চৈকীর রোপরেই পড়ে অইল, সারাআত। বাবুকে বলে পাঠাল শরীর বেস্তর খারাপ, কেউ যেন না দিক্ করে। বাবু নিজে এল, মুখের রোপর থেকে চাদর না সরিয়েই বললে, আমার বাড়ি আমার ঘর—তোমার পয়সাতেও এ বাড়ি কেনা নয়—তা আমার শরীর খারাপ হ'লেও কি সেখানে আমি এক জায়গায় শান্তিতে পড়ে থাকতে পারব নি নাকি?... অমন কথা বাবু এর পূব্বে আর কখনও শোনে নি, সে হকচকিয়ে ভয়ে ভয়ে চলে গেল। বোধ হচ্ছে যে কত্তা-বাবুকে গে নাগিয়ে থাকবে, কত্তাবাবু আসতেছিল, আমি বারণ কন্নু। বন্নু যে, একেবারে ক্ষেপে আছে এখন যেও নি, কারুর কথা মানবে নি, হিতে বেপরীত হবে। তা কত্তাবাবু বুঝল। চলে এল চুপি চুপি।...তা সেই পর আত ঝাঁঝাল, উঠল নি, খেলো নি, মুখে একটু জল দিল নি। পরের দিনও তাই। খুব করে বলতে, হাতে পায়ে ধরতে উঠে শুধু এক কাপ চা খেয়েছিল। তারপর দোপর বেলা হঠাৎ কী মনে করে উঠল, নিজের ঘরে কাগজ কলম টেনে নিয়ে খস খস ক'রে কি নিক্‌ল—

BanglaBook.org

একখানা চিঠি এমনি খামে আঁটল, আর একখানাতে সই করার পর আমাকে আর ঠাকুরকে বললে সই দিতে দুটো—তা আমি তো সই করতে জানি নি, টিপ দিনু। বন্নু এ কি সব নেকন গা, তা বললে, আমি যদি মরে যাই, এই বাড়ি আর আমার যা-কিছু আছে কান্তি পাবে, এ সব তারই অইল। আমার তেখুনি সন্দ হ'ল—বন্নু তা এখুনি মরার কথা কেন গা? বললে, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা কি কিছু বলা যায় মুকী! আগে ভাবতুম আমি মরে গেলে ওরা তাকে দেখবে—এখন তো দেখছি সবাই শত্তুর। সে মানুষটা কাজের বার হয়ে গেল, এরপর খাবে কি? য্যাদ্দিন বাঁচি না হয় কিছু কিছু পাঠালুম—আমি মলে ত্যাখন? তা আমিও তাই বুঝনু। তখন কি জানি ওর মনে এই মতলব আছে, তাহলে কি সঙ্গ ছাড়ি! আমাদের বিদেয় দিয়ে ঘরে গে খিল দিলে, বললে, সমস্ত আত ঘুম হয়নি কাল, এখন একটু ঘুমোব, সঞ্জের আগে যেন কেউ না ডাকে! ব্যস—তারপর সঞ্জে ছেড়ে আত হ'য়ে যায় দেখে ডাকতে গেনু তা সাড়াও নি শব্দও নি। ত্যাখন গিয়ে কত্তাবাবুকে ডাকি। তিনি এসে দারোয়ান ডাকে। দারোয়ান দোর ভেঙ্গে দ্যাখে ঐ কাণ্ড!'

রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলেন শ্যামা। মোক্ষদা থামতে প্রায় অসহিষ্ণু ভাবেই বলে ওঠেন, 'তারপর?'

'বলছি গো মা দাঁড়াও, একটু দম নি।... ঐ ব্যাপার দেখে আমরা তো হাহাকার ক'রে উঠনু—ঐ পিশাচ ঐ মেয়ে-খেকোর কিন্তু কি শকুনের দিষ্টি—ওর নজরে ঠিক পড়েছে দুখানা খাম। আমরা কেউ দেখবার আগে কি হাত দেবার আগে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিলে খাম দুখানা। তারপর দারোয়ানকে পুলিশ ডাকবার আর সরকারবাবুকে দত্তসাহেবের ওখানে খবর দেবার হুকুম দিয়েই এক ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

'তারপর?' শ্যামা যেন পুরোপুরি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁর আর একটুও দেরি সইছে না।

'তারপর পুলিশ যত কালে এসে পৌছল ততকালে সে চিঠি গাব হয়ে গেছে। একখানা খাম শুধু বার করে দিলে মিন্‌সে পুলিশের হাতে। তাতে শুধু নাকি ছিল যে আমি নিজের খুশিমতো মরতিছি, রপর কাউকে না কেউ দায়িক করে। যে চিঠিতে দাদাবাবুর বিষয়-আশয় পাবার কথা নেকা ছেল, সেই যে রুইল না কি বলে, তার নামগন্ধও অইল না।'

'তা তোমরা কেউ কিছু বললে না?' উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

এ যা শুনছেন, এ যে অভাবনীয় অচিন্তিত। কলকাতার বাড়ি একখানা, বিশেষ যে বাড়ির বর্ণনা তিনি শুনেছেন, খুব কম করেও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম! ও পাড়ায় ভাড়াও বেশি, ভাড়া দিলে এখুনি কোন্ না দেড়শ দুশ' টাকা ভাড়া উঠবে। এত বড় সম্পত্তি—তাঁর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য বলতে গেলে—হাতের কাছ পর্যন্ত এসে বেরিয়ে গেল—তাঁরা একবার কথাটা জানলেন না পর্যন্ত!

'বলেছিলুম বৈকি মা! পুলিশের কাছে পষ্ট পষ্ট বলেছিলুম। তা কত্তাবাবু যে এধারে ঠাকুর মিন্‌সেকে ভেতরে ভেতরে কড়কে একে দিয়েছে তা তো জানি নি—নিস্‌পেক্টার জিগ্যেস করতেই একেবারে ঝেড়ে জবাব দিলে, তার কিছু মনে নি। আমি বলে ফেলে বেকুব। নিস্‌পেক্টার উলটে আমাকেই ধমক দিলে, বললে—রেমন ধারা মিছে কথা বললে তোমাকে বেঁধে নে যাব। বুঝব নিশ্চয় তোমার যোগসাজস আছে এ মরার সঙ্গে। তোমরা খুন করে ঝুলিয়ে রেখেছ কিনা তার ঠিক কি!... শুনে ভয়ে মরি, আর আ কাড়তে পারলুম নি। তারপর দারোয়ানের মুখে শুনি যে কত্তাবাবু গোছা করে নোট গুঁজে দেছে নিস্‌পেক্টারের হাতে। সে ত্যাখন ষোল আনা কত্তাবাবুর দিকে!'

'তা ঠাকুর অমন মিছে কথা বললে কেন? সে তো শুনেছি তোমার হাতের লোক?'

বলে ফেলেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন শ্যামা। এসব নোংরা কথা পাড়া তাঁর ঠিক হয় নি।

BanglaBook.org

কিন্তু মোক্ষদা খুব সহজভাবেই নিলে কথাটা, 'হ'লে কি হবে মা, এর জন্যে ফৈজত কি কম ক'রেছি তারে। তা বলে যে কত্তাবাবু বললেন—এসব কথা যদি রুচ্ছ-বাচ্য করো তো আমি পেরমাণ করে দেব, তোমরা সেই নষ্ট দুষ্টু ছোঁড়ার সঙ্গে যোগসাজস করে বাড়িখানা নিখিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে আমার খুন করেছ! তোমাদের দুজনারই ফাঁসি হয়ে যাবে তাতে।... সেই ভয়েই সে আর ও কথা তোলে নি।'

তারপর আরও গলা নামিয়ে শ্যামার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'কিন্তুক আমি শুনেছি মা, দু'জন সাক্ষী থাকলেই এসব মামলা জজে মেনে নেয়। ঠাকুরকে আমি বুঝিয়ে বলেছি, সে আদালতে গিয়ে যা সত্যি সব বলবে ঠিক-ঠিক।... তাতে বাড়িখানা রাদায় করতে পারবে না? হ্যাঁ মা?'

কোথায় সামান্য একটুখানি আশা যেন মাথা তুলেছিল শ্যামার মনের মধ্যে, এতক্ষণ ধরে বুঝি নিজের অগোচরেই তাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু আর সেটা বাঁচানো সম্ভব হ'ল না। আশার সেই ক্ষীণ অঙ্কুরটি কিশলয়ের রূপ নেবারও আগে শুকিয়ে মরে গেল!

এই! এতক্ষণ ধরে এইটুকু শোনাবার জন্যেই এত ভনিতা! আইন-আদালত কিছু না বুঝলেও এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাঁর আছে যে, এই সামান্য অবলম্বন ভরসা করে মামলার দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া তাঁর না আছে সহায়, না আছে সম্পদ। এতবড় বিষয় ও-পক্ষ সহজে ছাড়বে না। তাদের সঙ্গে তিনি লড়বেন কী দিয়ে আর কী নিয়ে! এ দু'জন সাক্ষী কতক্ষণ ধোপে টিকবে তারই বা ঠিক কি। ধমকে যা হয়েছে ঘুষ দিয়ে তা আরও সহজে হবে। এরাই হয়ত সাফ উড়িয়ে দেবে কথাটা।

মনের হতাশা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সে বিরক্তি কণ্ঠস্বরে উপ্‌চে ওঠে যেন, 'তা বাছা, তুমি এই বাজে কথাগুলো বলবার জন্যেই কি এত পয়সা খরচ করে এসেছ, না অন্য মতলব আছে?'

এতখানি আশার বাণী শোনাবার পর—অন্তত তার কাছে আশার বাণীই—এতটা তিক্ততা আশা করে নি মোক্ষদা। মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছে সে ইতিমধ্যে, এই বিষয়টা পাইয়ে দিলে মোটা কিছু আদায় করতে পারবে কান্তি-দাদাবাবুর কাছ থেকে, হয়ত আগেও কিছু পাবে—জরুরি সাক্ষী হাতে রাখার জন্যে। সে জায়গায় এই সম্ভাষণ। সে যেন থতমত খেয়ে চেয়ে রইল শুধু শ্যামার মুখের দিকে।

শ্যামার কণ্ঠ অধিকতর রুক্ষ হয়ে ওঠে, 'বলি আমরা তো পাগলও নই আর ছন্নও নই যে তুমি এই কথা বলবে আর আমরা ধেই ধেই করে নেচে উঠব। দলিল নেই, পত্তর নেই—তোমরা এই দুজন ছাড়া কাকে-বকে কেউ জানে না, তাও পুলিশের কাছে একজন কবুল জবাব দিয়েছ যে কিছু জানে না—তোমার কথাও পুলিশে নিশ্চয় লিখে নেয় নি—এতবড় মামলাটা করতে যাব কিসের জোরে? লোকে যে আমাদের গায়ে ধুলো দেবে—কেউ কি বিশ্বাস করবে? তারপর তোমরা আজ এই বলছ, কাল হয়ত কত্তাবাবুর কাছ থেকে টাকা খেয়ে কি ধমক খেয়ে উল্‌টো কথা বলবে—তখন মিথ্যে মামলার দায়ে জড়িয়ে পড়ব। না বাছা, আমরা বোকা লোক বটে, তাই বলে এত বোকা নই। তুমি এখন নিজের পথ দেখ—ওসব কথা আর তুলো না!'

অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো বসে থাকার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসল মোক্ষদা। গুলের কৌটোটা তখনও পর্যন্ত হাতে ধরাই রয়েছে, তা থেকে গুলটুকু বার করে মুখে দেবারও ফুরসুৎ হয় নি। কিন্তু সে কথা তখন আর মনেও পড়ল না! বরং কৌটোটা আবার যথাস্থানে বেঁধে আঁচলের অপর প্রান্তে বাঁধা এক টুকরো কাগজ বার করে আল্‌তো শ্যামার সামনে রেখে দূর থেকে গড় হয়ে প্রমাণ করল। তারপর হাত জোড় করে বলল,

BanglaBook.org

'আমি পাপী তাপী মানুষ, আপনি বামুনের মেয়ে যা বলেছ তা শোবা পেয়েছে। তবু বলি, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিও নি। বড় ছেলে বাড়ি আসুক, তার সঙ্গে সলা-পরামর্শ কর। যদি মত হয়— এই আমার ঠিকানা অইল, এখন এইখেনেই আছি, আমার এক দেশের নোকের বাড়ি। ও বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি সেই দিনই। ঠাকুর পোড়ারমুখো আর এক বাড়ি কাজ ধরেছে—তা তার ঠিকানাও আমি জানি। আমাকে এক নাইন নিখে দিলেই আমি ছুটে চলে আসব মা। কাকের মুখে বাত্তাটা শুধু পৌঁছে দিও।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটু এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, 'বুকটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে মা, অব্যেস তো নেই, ওদ্দুরে রেতটা পথ হেঁটে এসেছি, পিপাসাটা বড্ড নেগেছে। এক ঘটি জল পাব মা?'

এবার শ্যামা রীতিমতো অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। এটা তাঁরই আগে ভাবা উচিত ছিল। যা-ই করে থাক, কুটুমবাড়ির ঝি, তাঁর কাছে এসেছে, শত্রু হ'লেও আতিথেয়তার ত্রুটি ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়। তিনি তাড়াতাড়ি বঁটিটা সরিয়ে উঠে এসে দোরের কাছ থেকে কনককে ডাকেন, 'বৌমা, অ-বৌমা একঘটি খাবার জল দিয়ে যাও না মা। আর দ্যাখো দিকি কুণ্ডু বাড়ির সন্দেশ এক-আধটা পড়ে আছে কি না। নইলে আমার দরুন চালভাজার নাড়ু আছে, দুটো হাতে করে নিয়ে এসো মা।' তারপর মোক্ষদার দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে বলেন, 'বোস মা বোস। জলটা খেয়ে ওঠো। আহা, তেষ্টা তো পাবেই, এতটা পথ এই খর রোদে হেঁটে আসা।... আমারই মনে করা উচিত ছিল, তা আমার কি আর মাথার ঠিক আছে! একটু দেরি করো তো দুটো গরম ভাতও খেয়ে যেতে পারো—যা আছে বামুনবাড়ির ডাল-ভাত!'

সে তো আমার মহাভাগ্যি মা, আপনাদের পেসাদ পাব। তবে আজ আর থাকতে পারব নি মা, বলা-কওয়া নেই, তারা ভাববে।'

জল খেয়ে আর একবার প্রণাম করে মোক্ষদা চলে গেল।

'কে মা?' কনক প্রশ্ন করে।

মিথ্যা কথা বলতে পারেন না শ্যামা, কে জানে আড়াল থেকে শুনেছে কি না বৌ, একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'কান্তি যেখানে ছিল, সেই রতনের ঝি।'

প্রসঙ্গটা অপ্রিয় বুঝে কনক চুপ করে যায়—আর কথা বাড়ায় না।...

আশা যে নেই তা শ্যামা ভালরকমই জানেন, তবু হেম বাড়ি আসতে তাকে আড়ালে ডেকে সব কথা বলেন। মোক্ষদার শেষ কথাটাও জানিয়ে ঠিকানা লেখা কাগজটা হাতে দেন। তারপর—হেম কী বলবে তা অনুমান করেও জিজ্ঞাসু উৎসুক নেত্রে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

হেম কাগজটা গুটি পাকিয়ে একেবারে উঠোনে ফেলে দিয়ে বলে, 'যত্ত-সব পাগলের কাণ্ড। কালনেমির লঙ্কা ভাগ করছে বসে বসে। কোথায় কি যে সে বুড়োর সঙ্গে মামলা লড়তে যাব! রেজেস্টারি করা উইল হলেও না হয় কথা ছিল। টাকা দিলে অমন উইল মিলত। এ দুটো লোকের মুখের কথা। তাও সত্যি বলছে কিনা তার ঠিক কি! হয়ত দুজনে যোগসাজস করে এসেছে, যদি বিষয়টা আদায় হয় তো মোটা বকরা মারবে আমাদের কাছ থেকে। এবার এলে সোজা ঐ আগড়ের কাছ থেকে হাঁকিয়ে দেবো, বদমাইশ মাগী!'

এ সবই জানেন, জানতেন। তবু শ্যামার বুকের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কে জানে সত্যি কিনা। এতগুলো টাকার বিষয় হাতের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসেও হাতে এল না। তাঁর কপাল যে। নইলে এমন বোকামি সে করবে কেন! মেয়েটার মনে যদি এতই ছিল—উইলখানা খামে পুরে ডাকে পাঠিয়ে গলায় দড়ি দিতে পারল না!

BanglaBook.org

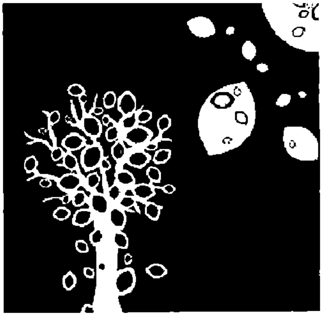

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বহুকাল ঐন্দ্রিলার কোন খবর পাওয়া যায় নি। হাজার হোক মায়ের প্রাণ। মধ্যে মধ্যে শ্যামার বুকের মধ্যেটায় হু-হু করে ওঠে বৈকি। অস্থির হয়ে ওঠেন। সে অস্থিরতা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও কনক করে। তবু সে যখন বলে, 'কী হবে মা ও পাগলের ওপর রাগ করে থেকে। একটা চিঠি লিখে দিন, চলে আসুক। মিছি-মিছি লোক হাসিয়ে আর দরকার নেই।' তখনই আবার কঠিন হয়ে ওঠেন শ্যামা, বলেন, 'না বৌমা, আর না। স্বেচ্ছায় এরেবেরে আর ঐ ঝগড়া ঘরে আনব না। লোক যা হাসবার তা তো হেসেছেই, আপ্ত-পরে কোথাও কি আর জানাজানি হ'তে বাকি আছে যে মেয়ে আমার রাঁধুনীগিরি করে খাচ্ছে! থাক ও, যখন তেজ কমবে তখন আপনিই আসবে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলাও আসে না। তারও বোধহয় জেদ, মা না ডাকলে সে আসবে না। তবে সে যে সুখে নেই তা কনক জানে। এর ভেতর বহু বাড়ি বদল করল সে। কোথাও বেশিদিন টিকতে পারে না। শ্যামারা বলেন ঝগড়ার জন্যে—কনক জানে যে সবক্ষেত্রে তা নয়। অন্য কারণও আছে। আর হয়ত সেইটেই প্রবল।

আসে না সে, কিন্তু চিঠি লেখে। বিশেষ করে ঠিকানা বা মনিব বদলের সময়। কনককেই লেখে। শাশুড়ীর হুকুম নেই বলে কনক উত্তর দিতে পারে না। তবু ঐন্দ্রিলা চিঠি দিয়ে যায়। কেন, কিসের আশায়—তা কনক বোঝে। যদি কোনদিন এদের দরকার পড়ে, যদি কোনদিন এরা ডাকে। তাই ঠিকানাটা সর্বদা জানিয়ে রাখা। তবে সে চিঠিতে ভেতরের কোন কথা থাকে না। থাকা সম্ভব নয়, এক পয়সার পোস্টকার্ডে লেখা খোলা চিঠি। ভিতরের কথাটা অনুমান করে কনক। অবশ্য ভিত্তিও একটা আছে বৈকি। মধ্যে একবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিল কান্তির অসুখের খবর পেয়ে। শ্যামাকে প্রণামও করেছিল, কিন্তু শ্যামা শুধু একটি শুষ্ক কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু বলেন নি, সীতার কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। অন্তত সে দিনটা থেকে যেতেও বলেন নি। একেবারেই নিরাসক্ত উদাসীন ছিলেন। সেই সময়ই দু-চার মিনিটের জন্যে রান্নাঘরে এসে কনকের সঙ্গে দুটো কথা বলে গিয়েছিল। ওকে দেখেই রান্নাঘরে এসে ঢুকেছিল কনক, না জানি কি বাধবে এখনই। তবে বাধে নি কিছু। বাধতে পারত অনায়াসেই—কারণ ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কান্তির প্রতি সমবেদনা উপলক্ষ্য করে অনেক বাঁকাবাঁকা কথা শুনিয়ে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু এ পক্ষ থেকে কোন উত্তর না আসাতেই কলহটা জমতে পারে নি। শ্যামা একেবারে পাথরের মতো নীরব ছিলেন।

শ্যামার ধৈর্যে শুধু কনক নয়, ঐন্দ্রিলা সুদ্ধ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেমন ভয়ও হয়ে গেল তার। মানুষের কাছ থেকে দয়ামায়া পাবার আশা থাকে, পাথরের কাছে যে কোন ভরসাই নেই। বলেছে সে যথেষ্ট। বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই বলেছে : 'হবে না। হতেই হবে যে।

আমি যে জানি। ঐ উনি, উনি যতিদন আছেন—কারুর ভাল হবে না আমাদের বংশে। ঐ এক হতেই এ বংশের সর্বনাশ হবে। ঐ যে সর্বস্বখাকী ভালখাকী বসে আছেন, সব্বাইকে খেয়ে, সকলের সব্বনাশ করে তবে উনি যাবেন। লোভ, লোভ যে প্রবল। মেয়েছেলের অত লোভ কি ভাল? অতি লোভেই সব গেল। বড়লোক শুনেই অমনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের বাড়ির অন্নদাস করে। কী, না ছেলে লেখাপড়া শিখে তালেবর হয়ে আসবে খুব হ'ল তালেবর বিদ্বান। জজ ব্যারিস্টার হয়ে এল একেবারে। এখন শুধু লাইনের টাকা বাজিয়ে তোলার ওয়াস্তা। তা তো নয়—নিজের খরচটা তো বাঁচল—আর যদি সে মাগীর নজরে পড়ে যায়—কিছু বাগিয়ে আনতে পারে! ঐ পয়সার লোভেই সব যাবে ওর। তা নইলে জ্বলজ্যান্ত জামাইটা চলে গেল—পয়সার আন্ডিলের ওপর বসে আছে—তবু একটা আধলা বার করলে না। বলতে গেলে বেঘোরে মরে গেল জামাইটা। মেয়ের চুড়ি বাঁধা রেখে তবে টাকা বার করলে। ও কি মানুষ! চামার! চামারেরও অধম। ও চশমখোর মেয়েমানুষের মুখ দেখলেও মহাপাপ হয়।' ইত্যাদি—

কনক সেদিন খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল শ্যামার ধৈর্য দেখে। পাথরও তেতে ওঠে এসব কথায়—কিন্তু শ্যামা দুটি ঠোঁট ফাঁক করলেন না। ওঁর রকম সকম দেখে মনে হ'ল যে এ সব কথা তাঁর কানেই যায় নি। অথবা আর কারুর কথা বলছে সে, অপরিচিত অন্য কোন লোক সম্বন্ধে।

ঐন্দ্রিলা অনেকক্ষণ একতরফা চেঁচামেচি করে বকে শ্রান্ত হয়ে এক সময় চুপ করে গিয়েছিল। তারপর আর বেশিক্ষণ থাকেও নি। থাকতে পারে নি। একটুখানি চুপ করে বসে থেকেই আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল। নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল—শ্যামাকে বলে বা প্রণাম করে যেতেও সাহসে কুলোয় নি।

সেই দিনই গোটাকতক কথা ঐন্দ্রিলা বলে গিয়েছিল কনককে। খুলে কিছু বলে নি—সম্মানে বড় হ'লেও বয়সে ঢের ছোট কনক—যেটুকু আভাসে ইঙ্গিতে বলা যায় তাই বলেছে। তবে তা থেকে অনুমান করতে বাধে নি বাকিটা। যেখানে গেছে ঐন্দ্রিলা সেইখানেই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—ওর মেজাজ বা শাণিত রসনা নয়—অগ্নিশিখার মতো ওর রূপ। প্রথম যেখানে গিয়েছিল—মহার সেই কে কুটুমের বাড়ি—সেখানে সেই প্রবীণ উকিলবাবুটিও সামলাতে পারেন নি নিজেকে। সাত আটটি সন্তানের পিতা তিনি—পঞ্চাশের অনেক ওপরে তাঁর বয়স। তবু তাঁকে অনেকটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছিল ঐন্দ্রিলা, তাঁর সদ্য-বিবাহিত বড় ছেলেটিও লুব্ধ হয়ে উঠল।—এবং সেটা তার স্ত্রীর নজর এড়াল না।... সেখান থেকে সে বাড়ির গৃহিণী নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠালেন। সেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সেখানে আবার বাড়ির বড় জামাই ঘন-ঘন যাওয়া আসা আরম্ভ করলেন। একদিন গোপনে এক চিঠি পাঠালেন যে, ঐন্দ্রিলা যদি রাজি থাকে, ওকে তিনি বিধবাবিবাহ করতে সম্মত আছেন। আলাদা বাসা ভাড়া করে ওকে নিয়েই থাকবেন, এ স্ত্রীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না। ইত্যাদি—। ঐন্দ্রিলা অনেক ভেবে চিঠিখানা বাড়ির গৃহিণীর হাতে দিল। ও ভেবেছিল যে এতে করে সে যে খাঁটি এইটেই প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু হ'ল হিতে বিপরীত। গৃহিণী ভাবলেন যে, ও-ই ফাঁদ পেতে তাঁর জামাইকে ভুলিয়েছে, মেয়ের সর্বনাশ করছে। তাছাড়া তিনিও স্বামী নিয়ে ঘর করেন। হাতের কাছে এমন বিপদ থাকা ঠিক নয়। ফলে তিনি এমনই কিচিকিচি শুরু করলেন যে, ঐন্দ্রিলা পালিয়ে যেতে পথ পেল না।

এইভাবে ইতিমধ্যেই চার-পাঁচ জায়গা বদল করেছে সে। সর্বত্রই প্রায়—এক কারণ। কোথাও বেশিদিন থাকা সম্ভব হয় নি। কাজ পেয়েছেও সে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কনকের

BanglaBook.org

মনে হয় সে-ও ঐ কারণেই। কারণ রাঁধুনী চাকর বহাল করেন বাড়ির পুরুষেরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। মেয়েরা হলে ঐন্দ্রিলার মতো মেয়েকে চাকরি দেবার কথা ভাবতে পারত না।

এসব কথা শাশুড়ীকে বলতে পারে নি কনক। সঙ্কোচে বেধেছিল। বলেছিল সে হেমকে। বলেছিল, 'তুমি উদ্যুগী হয়ে মাকে বলে চিঠি লেখাও। কী করছ তোমরা, শেষে কী একটা কেলেঙ্কারি হবে! তোমাদের বাড়ির মেয়ে হয়ে রাঁধুনীগিরি করছে এই তো এক লজ্জার কথা, তার ওপর যদি নষ্ট হয়ে যায় মুখ দেখাতে পারবে?'

কিন্তু হেমও রাজি হয় নি। যদিও সে ইদানীং একটু সমীহ করতেই শুরু করেছিল কনককে—বিশেষত কান্তির ব্যাপারটার পর থেকে—কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কথায় সায় দিতে পারল না। বলল, 'তুমি বুঝছ না, মা ঠিকই বলেছেন, এখন যেচে নিয়ে এলে আর রক্ষে থাকবে না। মাথায় চড়ে নাচবে একেবারে। তার ওপর যদি ঘুণাক্ষরেও কানে যায় যে আমিই সুপারিশ করেছি তাহ'লে তো কথাই নেই। এখন তবু আমাকে একটু ভয় করে—তখন তাও করবে না। কী দরকার যেচে অশান্তি ঘাড়ে করবার। তুমি যা ভাবছ অত কিছু হবে না, খেঁদি সে মেয়ে নয়। ওর আর যাই দোষ থাকুক, এক হরিনাথ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের দিকে কখনও তাকায় নি সে, আর তাকাবেও না। ওকে নষ্ট করবে জীবন থাকতে, এমন পুরুষ মানুষ জন্মায় নি এখনও। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

এরপর আর কনকের কথা কওয়া যায় না। কীই বা বলবে সে? যাদের মেয়ে যাদের বোন তাদের চেয়ে কি আর সে বেশি বোঝে?

কনক যা ভেবেছিল—বিপদ সেদিক দিয়ে কিছু না এলেও অন্য দিকে থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল।

ফাল্গুনের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন ঐন্দ্রিলার মেজ দেওর শিবু এসে হাজির হ'ল, হাতে একখানা লাল কালিতে লেখা চিঠি। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, পাতা কুড়নো শেষ করে সবে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্যামা। শিবু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। খাটো কাপড় পরনে—তবু তাই-ই টানাটানি করে গুছিয়ে গায়ে দিতে দিতে পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করলেন শ্যামা, 'কী গো, কি মনে করে? বেটার বিয়ে দিচ্ছ নাকি?'

চারদিক ঘোর-ঘোর হয়ে এলেও চিঠির লাল কালিটা তার নজর এড়ায় নি।

শিবুও হাসিমুখেই জবাব দিল, 'বেটার নয়, বেটির।'

'বেটির! তার মানে?'

বেটার বিয়ে হবারও কথা নয়—কারণ শিবুর বড়ছেলের বয়স ন-দশের বেশি হবে না, কিন্তু বেটি আরও অসম্ভব, একেবারেই এই সর্বশেষ সন্তানটি মাত্র ওর মেয়ে—তার বয়স এক পুরেছে কিনা সন্দেহ। তাই সংশয়ে উদ্বেগে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।

'ভায়ের মেয়ে আর নিজের মেয়ে কি আলাদা?' শিবু তখনও হাসিমুখেই বলে, 'আপনার সীতারই বিয়ে।'

ততক্ষণে কনক এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়েছে—অভ্যস্ত আতিথেয়তায় শ্যামাকেও বলতে হয় 'বসো বাবা', কিন্তু সেটা সত্যিই যন্ত্রচালিতের মতো বলেন তিনি। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠছে। ঘরে গিয়ে এই খাটো এবং ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসবার কথাও তাঁর মনে পড়ে না। ওর ঐ অতি-সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন, তাঁর মনে হয়েছিল যে খবর ভাল নয়, খুব ভাল কোন উদ্দেশ্যে শিবু আসে নি। এখন সেই সংশয়টাই সমর্থিত হয় ওর কথায়।

তিনি তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই পর-পর প্রশ্ন করে যান, 'সীতার বিয়ে? সে কী? কোথায়—কে ঠিক করলে? খেঁদি কোথায়? ছেলে কী করে?'

BanglaBook.org

প্রশ্নগুলোর কোন প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে শিবু ভারিক্কি চালেই বলল, 'যোগাযোগ একটা আপনাদের আশীর্বাদে হয়ে গেল আবুঁই মা, তাই আর দেরি করলুম না। বিয়ে যেকালে আমাদেরই দিতে হবে, এ দায়ে যখন আর কেউ ঘাড় পাতবে না, সেকালে আমাদেরই ভেবে-চিন্তে ঠিক করা ছাড়া উপায় কি বলুন! ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলুম, মায়ের মত নিলুম—আর বেশি লোককে জানাবার কি খবর দেবার তো সময়ও হ'ল না; এই মাসের শেষ তারিখ পেরিয়ে গেলে এখন দু-মাস আর বিয়ের দিন নেই। সামনে চোত মাস, বোশেখে পড়ছে মলমাস! পাত্র বলেছে এই তারিখেই বিয়ে দিতে হবে, আমরা না দিই অপর মেয়ে তার হাতে আছে। সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। ভাল পাত্তর হাত ছাড়া করে এর পর আবার কোথায় খুঁজে বেড়াব বলুন, আমাদের তো আর এথির জোর নেই—কাজেই না বলতে ভরসা হল না। অগত্যা ঐ তারিখেই রাজি হতে হ'ল। তা ধরুন কালকেই বিয়ে।'

'কাল বিয়ে? সে কি! আর তোমরা আজ আমাদের জানাতে এসেছ? মামা জানল না, দিদিমা জানল না—আমরা এতটুকু মেয়ে থেকে মানুষ করলুম—তার বিয়ে ঠিক করে ফেললে তোমরা আমাদের না জানিয়েই? এ কেমন ধারা কথাবার্তা বাছা, কিছু তো বুঝছি না!'

মনের কুটিল সংশয় আর কণ্ঠে চাপা থাকে না, রাখার চেষ্টাও করেন না শ্যামা।

শিবুরও এবার নিজমূর্তি প্রকাশ পায়। সে বলে, 'হ্যাঁ, মানুষ আপনারা করেছেন তা ঠিক, তেমনি আবার সব দায়িত্ব চুকিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন এটাও তো ঠিক! কৈ, এই তো এতকাল বৌদি পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করছে বলতে গেলে—মেয়ে তো আমাদের ওখানে পড়ে, এই তো ধরুন আধ ঘণ্টার রাস্তা—কৈ মামা দিদিমা একদিনের তরেও খবর নিতে গেছে বলে তো জানি নি!'

'কেন খবর নিতে যাব বাবা। সুখসমন্দা সে আমাদের না বলে-কয়ে মেয়ে নিয়ে চলে গেছে, আমাদের মত না নিয়েই—আমরা যাব সেধে তার খবর নিতে! আমরা কি যেতে বলেছি—না তাড়িয়ে দিয়েছি?'

'সে স্বেচ্ছায় গেছে!' খুব ভালমানুষের মতোই সায় দেয় শিবু, 'তবেই দেখুন! এই তো আপনার কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে, মেয়ের মা তাহ'লে চায় না যে মেয়ে আপনাদের দায়িত্বে থাকে। যে-কোন কারণেই হোক, মেয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে সে। এক-আধ-দিন রাগের মাথায় করার তো কথা নয়—ধরুন হয়েও গেল তো অনেকদিন। এর মধ্যে বহুবার এসেছে গেছে। ইচ্ছে করলেই আবার আপনাদের কাছে রেখে যেতে পারত। আজকালকার যা দিনকাল, পরের ঝক্কি কেউ যেচে স্বেচ্ছাসুখে ঘাড়ে করতে চায় না এটা তো বোঝেন। বিশেষ বিয়ের ব্যাপার, খরচার কথা। তবে আমাদের ঘাড়ে যেকালে ফেলে দিয়ে গেছে, সেকালে আমাদেরই সে ভার বইতে হবে, বংশের মেয়ে ফেলে দেওয়া তো চলবে না, দুর্নাম হ'লে তো আমাদেরই হবে, বলবে, অমুকের মেয়ে, অমুকের নাৎনী। তা আমাদের দায় যখন আমাদেরই বইতে হবে, কেউ ভাগ নিতে আসবে না—তখন অপরের মতামত নিতে যাব কেন বলুন, আর এর জন্যে এত কৈফিয়তই বা কিসের?'

বেশ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে শিবু, বোঝা যায় যে সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

বোধহয় এই-ই প্রথম, অপমানিত হয়েও চুপ করে যেতে হ'ল শ্যামাকে, দেবার মতো উত্তর একটাও খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের যুক্তিতেই তাঁকে নিরুত্তর করে দিয়েছে শিবু। যার মেয়ে,—যে তার মেয়েকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে—কৈফিয়ত চাইতে গেলে সে-ই চাইতে পারে একমাত্র। ওঁদের যে অধিকার, অভিভাবকত্বের দাবি, সে তো তা স্বীকার করে নি, তবে কিসের জোর ওঁদের?

BanglaBook.org

চুপ করেই রইলেন শ্যামা। শুধু অপমানে আর দুঃসহ ক্রোধে কানের মধ্যেটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

সে ক্রোধ এদের ওপরও ততটা নয়—যতটা তাঁর নিজের মেয়ের ওপর। কী লগ্নেই ঐ মেয়ে জন্মেছিল তাঁর। শুধু জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেল সকলকে। নিজের মন্দ-ভাগ্যের আগুনে শুধু নিজেই জ্বলল না, শুধু তাঁদেরই জ্বালাল না, বোধ করি নিজের সন্তানেরও আজীবন দাহের কারণ হ'ল সে আগুন। কে জানে এদের কী মতলব, বিয়ে একটা সাধারণ ব্যাপার, বরং ঠিক হ'লে আগে তাঁদেরই জানাবার কথা, খরচের একটা মোটা অংশ দাবি করার কথা। অবস্থা খারাপ নয় এদের এটা ঠিক, তবু এতও ভাল নয় যে একটা মেয়ের বিয়ে টেরও পাবে না। এরাই যে এদের অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী বড়ভাইয়ের চিকিৎসার খরচের বিনিময়ে বিষয়টা লিখিয়ে নিয়েছিল সে কথা তো তিনি ভোলেন নি!

অথচ—অথচ এক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই তাঁদের। কোন প্রতিকার হাতে নেই। সে সমস্ত পথ সেই হতভাগা নির্বোধ মেয়ে নিজেই ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে!

এরপর আর তাঁর পক্ষে এ প্রসঙ্গ তোলা সম্ভব নয়—অথচ ভেতরে ভেতরে যে তিনি ছটফট করছেন খবরের জন্যে—এ তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারল কনক। সে এবার মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। এর আগে সে কোনদিন শিবুর সঙ্গে কথা বলে নি, তবে সম্পর্কে ছোট ননদের দেওর, কথা কওয়া আটকায়ও না। সে সামান্য একটু ইতস্তত ক'রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'মেজঠাকুরজি কবে এলেন? ভাল আছেন তো তিনি?'

ছোট ও সহজ প্রশ্ন। স্বাভাবিকও। কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক ব'লেই বোধ হয়—শিবু যেন বেশ একটু বিব্রত হয়ে উঠল। তার উত্তর দেওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল যে কঠিন কঠিন প্রশ্নের জন্যই তৈরি হয়ে এসেছিল সে—এ ধরনের প্রশ্নর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ঘাড় মাথা চুলকে বললে, 'না—ব্যাপারটা কি জানেন বৌদি—মানে এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক হ'ল, বলতে গেলে চার-পাঁচদিনের মধ্যেই দু-পক্ষের দেখাদেখি দেনাপাওনা সব কিছুই ঠিক করতে হ'ল কিনা—। কাল পাকা দেখা শেষ ক'রেই বৌদিকে চিঠি দিয়েছি—কাছেই তো—এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর, কঘণ্টারই বা পথ, আজই সকালে সে চিঠি পেয়ে গেছে নিশ্চয়, আজ রাত্তিরের ট্রেনে যদি রওনা হয়—কাল ভোরেই এসে পৌঁছতে পারবে।'

'অ। ঠাকুরঝি এখনও জানেন না।... তা ছেলেটি কী করে?'

'করে—মানে করবার খুব দরকার হয় না। বিস্তর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি। এই কাছেই ডোমজুড়ে বাড়ি—ধানজমিটমি নিয়ে যা আছে তাতে একটা বড় গেরস্ত বেশ চলে যায়।'

কনক নাছোড়বান্দা। সে খুব শান্ত সুরেই প্রশ্ন ক'রে যায়—একটার পর একটা; 'তা লেখাপড়াটড়া—মানে এমনিই জিজ্ঞেস করছি, কৈফিয়ৎ চাইছি যেন ভাববেন না—'

'না না, কী আশ্চর্য। কি যে বলেন! তা নয়—তবে কী জানেন, অতটা খোঁজ করি নি। মানে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি—ঠিক প্রথম পক্ষে কাজটা হচ্ছে না। এটি দ্বিতীয়পক্ষ : তা নইলে ঘর থেকে মোটা টাকা বার ক'রে কাজ করতে পেরে উঠব কেন বলুন? দ্বিতীয়পক্ষ বলেই খরচাপত্র বিশেষ লাগছে না। অথচ অগাধ সম্পত্তি, যা শোনা গেল স্বভাবচরিত্রও ভাল—মানে সব দিক দিয়েই—বুঝলেন না, পাত্রের মতো পাত্র। কেবল ঐটুকু খুঁতের জন্যে কি আর কিন্তু করা ঠিক হ'ত?'

বলতে বলতে শেষের দিকে বেশ একটু যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে শিবু। বোধ হয় বলার ভঙ্গিতে এবং গলার আওয়াজেই পাত্র সম্বন্ধে এঁদের সমস্ত সংশয় সে দূর করতে চায়।

কিন্তু শ্যামা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পূর্বের অপমান ভুলে গিয়েই আবারও কথা কইতে হ'ল তাঁকে। সীতাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। যেখানে তার

BanglaBook.org

মঙ্গল অমঙ্গলের প্রশ্ন, ভবিষ্যতের প্রশ্ন— সেখানে মান অপমান অত মনে রাখা সম্ভবও নয়। তিনি আবারও প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'তার মানে, মেয়ের মাও জানে না যে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।... ঐটুকু একরত্তি মেয়েকে একটা দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ, হয়ত বা বুড়োর হাতেই দিচ্ছ, কে জানে—তা মেয়ের মার মতটাও কি একবার নেওয়া দরকার ছিল না বাবা?'

'অবিশ্যি। অবিশ্যি। দরকার ছিল বৈকি!' শিবুর গলা আবার মিষ্ট ও শাণিত হয়ে ওঠে (ওর কথা শুনতে শুনতে কনকের 'মিছরির ছুরি' কথাটা মনে পড়ে যায়) 'তবে কি জানেন আঁবুই মা, আমাদের ওপর মেয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে যখন সে নিশ্চিন্তি আছে—তখন আমরা মেয়ের শুভাশুভটাই তো আগে ভাবব—তার মায়ের মতামতটা ঢের পরের কথা।'

বলতে বলতেই একেবারে উঠে দাঁড়ায় সে।

কনক ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কি, ও কি—উঠছেন কি, দাঁড়ান, একটু অন্তত মিষ্টি মুখে দিয়ে যান—'

'না, বৌদি, ঐটি মাপ করতে হবে। বুঝতেই তো পারছেন, সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আসছি—পেটে আর তিল থোবার জায়গা নেই—'

'তা কি হয়। শুভকর্মে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন—একটু কিছু মুখে না দিয়ে গেলে যে মেয়েটার অকল্যাণ হবে ভাই! একটুখানি দাঁড়ান—'

সে ছুটেই ভেতরে চলে যায়। আজ তার বুকে বল আছে অনেকখানি। বড়বাজারের দিকে কী একরকম আকের গুড় উঠেছে—পশ্চিমে নাকি ঐরকম গুড়ই চলে—বড় বড় ডেলা পাকানো, দামেও নাকি ওয়ারা—অথচ খেতেও ভাল, সস্তা পেয়ে অনেকখানি কিনে এনেছে হেম গত সপ্তাহে। তাই দেখে শ্যামাও দিলদরিয়া হয়ে দুটো নারকেল বার ক'রে দিয়েছেন, আজ দুপুরে নিজেই নাড়ু পাকিয়ে রেখেছে কনক।

সে ঘরে চলে গেলে হাতের চিঠিটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে শ্যামাকে উদ্দেশ ক'রে শিবু বলল, 'কাল আপনারা সবাই যাবেন দয়া ক'রে—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা উদ্ধার করিয়ে দেবেন। মা বলে দিয়েছেন অনেক ক'রে—কোন দোষত্রুটি অপরাধ নেবেন না, মেয়েছেলে সঙ্গে নেই বলে যেন ত্রুটি ধরবেন না। তাঁর তো আসবার উপায় নেই—বাতে পঙ্গু, আমার স্ত্রী সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা। এক আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী, বৌমা ভরসা—সব কাজ তাকেই করতে হচ্ছে, বুঝছেন তো? এইসব বিবেচনা ক'রে ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে নেবেন—যেন অভিমান ক'রে বসে থাকবেন না। মা একশবার বলে দিয়েছেন।'

'তা তো হয় না বাবা। গায়ে ময়লা মাখলে যমে ছাড়ে না।' শ্যামা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'এ সব সামাজিক কাজ, অপারগ বললে চলে না। বিশেষত পাড়া-পড়শি হ'লেও না হয় কথা ছিল, এ কুটুম্বস্থল। বৌমার যাওয়ার কথা তো ওঠেই না— তুমি এসেছ বেকালে, হেম কান্তি যেতে পারত! কিন্তু বাবা কাল বিয়ে আজ শুকনো নেমন্তন্ন করতে এসেছ, সে তার বড় মামা, ছ'মাসের মেয়ে এনে সে-ই খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করেছে—সে যে যেতে রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'দেখুন—সে যা আপনারা ভাল বোঝেন। বাপ-মরা মেয়ে, কাকারা কোনমতে বিয়ে দিচ্ছে, সেখানে গিয়ে যদি দাঁড়ানো কর্তব্য মনে করেন তো যাবেন। কী আর বলব। মা যা বলে দিয়েছেন তাও বললুম। এখন আপনাদের অভিরুচি।'

নিস্পৃহ উদাসীনভাবে বলে শিবু।

ইতিমধ্যে একটা রেকাবীতে চারটে নারকেল নাড়ু আর এক গ্লাস জল এনে সামনে ধরেছে কনক।

BanglaBook.org

'উঁহু উঁহু বৌদি, মাপ করবেন— একটা, একটার বেশি কোনমতেই চলবে না। ভাববেন চাল দেখাচ্ছে তাই, নইলে বলতাম আধখানা। একটা আমার হাতে তুলে দিন।'

'আপনিই নিন না তুলে যা নেবেন।' রেকাবীটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে দেয় সে।

আলগোছে, অতি সন্তর্পণে একটা নাড়ু তুলে মুখে ফেলে হাতটা শুধু ধুয়ে নিল সে গেলাসের জলে, জল খেল না।

শ্যামা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভরসন্ধ্যায় সন্ধ্যা জ্বলার আগে কুটুমের ছেলে বাড়ি থেকে যাওয়া উচিত নয়, কনকেরও সন্ধ্যা দেখাবার আগে এই রাক্ষসী-বেলায় খেতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে—এসবই মনে হ'ল তাঁর, কিন্তু কাউকেই কিছু বলতে পারলেন না। শুধু দেহ নয়, মনেরও যেন আর কিছু ভাববার বা স্থির করার শক্তি ছিল না।

হেম বাড়ি আসতে কনকই তাকে খবরটা দিল। শ্যামা তখনও গুম্ খেয়ে বসে আছেন। মেয়েটার জন্যে দুশ্চিন্তা তো বটেই—অপমানের জ্বালাটাও ভুলতে পারছেন না, বার বার অপমান ক'রে গেল বলতে গেলে—অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ভাল রকম একটা জবাব পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

কনকেরও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। এ বাড়িতে আসার পর ঐ মেয়েটাই ছিল তার প্রধান অবলম্বন। তার সঙ্গে বকে, তার সঙ্গে গল্প ক'রেই তবু একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচত সে। সীতাকে ওদের বাড়িতে ফেলে রাখাটা কখনই তার পছন্দ হয় নি, অনেকবার সে এখানে আনবার কথা তুলেছেও—কিন্তু এঁরা সেধে আনতে রাজি হন নি, ও পক্ষের নরম হয়ে ফিরে আসারই অপেক্ষা করছিলেন। আর আনতেই হ'ল না—একেবারে পরের বাড়িতেই চলে গেল মেয়ে।

তা যাক। নিজের ঘর-বর পাচ্ছে ভালই। কিন্তু কেমন সে ঘর-বর সেই তো দুশ্চিন্তা। ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে না ব'লেই তো ভাবনা। দোজবরে বিয়ে এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়, আখছারই হচ্ছে। অল্পবয়সী দোজবরে হ'লে বলবারও কিছু নেই। কিন্তু এ বর কেমন তা কে জানে! কত বয়স, ও পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে কিনা—কিছুই তো জানা গেল না। হয়ত ভাল পাত্রই, মিথ্যেই ওরা ভেবে মরছে, কিন্তু—কনকের মনে বার বার এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—তাহ'লে এত লুকো-ছাপার কী আছে! তাদের না হয় না জানাল, মেয়ের মাকে মাত্র একদিন আগে চিঠি দেওয়া হ'ল কেন? এটাই যে মস্ত গোলমেলে ঠেকছে।

হেমও সমস্ত শুনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ! তারপর বলল, 'তা আমি আর কি করব বল! আমার আর কী করবার আছে!'

কনক ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'ওমা, তা বলে কিছুই করবে না? একটু খোঁজ-খবরও নেবে না—কী পাত্তর, কী বিত্তান্ত?'

'নিয়ে লাভ? যদিই ধরো পাত্র শুনি খুব খারাপ—আমি কি বিয়ে বন্ধ করতে পারব? মিছিমিছি ছুটোছুটি ক'রে লাভ কি?'

'বিয়ে বন্ধ করার কোন উপায় নেই? তুমি তো মামা, তেমন বুঝলেও বিয়ে বন্ধ করতে পারবে না? তাই কখনও হয়!'

'তুমি আইন-কানুন জান না—কী বুঝবে! তুমি গিয়ে বোঝাও গে পুলিশকে। আমি কি করে বিয়ে আটকাব বলো! এক থানা-পুলিশ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তা তারা যদি বলে মেয়ের মা কোথায়—তার কী মত? তখন? তাঁকে তো চেনো। তিনি যদি এসে বলেন, বেশ করব আমার মেয়ে এই পাত্তরে দেব—তখন? তখন তো সে থানা পুলিশ তারা করবে আমাদের নামে! মানহানির মামলা ক'রে বসবে তারা। সে আমি পারব না।'

BanglaBook.org

'থানা-পুলিশ না-ই করলে। পাড়ার লোকজনকে বলে কিছু করা যায় না?' ভয়ে ভয়ে বলে কনক।

'অত হ্যাঙ্গামা কে করে বলো! আত্মীয়-কুটুম্বর ব্যাপার। পাড়ার লোক মনে করবে কোন আক্‌চা-আক্‌চির ব্যাপার আছে। তারপর তার আমাদের চেনে না—ওদের সঙ্গে এতকাল বাস করছে।... আর আমাদের অত ছিষ্টি করবার দরকারই বা কি? আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে যখন নিয়ে গেছে তখন আমাদের কী দরকার ওর মধ্যে মাথা গলাবার? যাচ্ছিও না—কিছুই না! মিটে গেল! যার মেয়ে যে সোহাগ করে রেখে গেছে ওখানে, সে বুঝুক!'

অগত্যা কনককে চুপ ক'রে যেতে হয়। সে আর কি বলবে, তার কতটুকু ক্ষমতা, কতটুকু জোর। শুধু সেই নিরুপায় নিরপরাধ মেয়েটার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে চোখ ছলছল করতে থাকে তার।

কনক অনুচ্চ কণ্ঠে বললেও দালানের ভেতর থেকে শ্যামা সবই শুনেছেন, হেমের জবাবও। তিনিও আর কিছু বললেন না, শুধু বেশ শব্দ ক'রেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। এ তাঁরই ভাগ্যের দোষ, যেখানে একটু সম্পর্কও আছে—কেউ সুখী হবে না, কেউ শান্তি পাবে না।

মুখে যা-ই বলুক, শেষ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়ার পর হেম বেরিয়ে পড়ে একবার। এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তা কনক প্রশ্ন করে না, বুঝতেই পারে সে। নিশ্চয় মহাদের বাড়িই যাচ্ছে। ডোমজুড়ে ওদের সব কে চেনা লোক আছে, আত্মীয় কেউ থাকাও বিচিত্র নয়। ওরা হয়ত জানলেও জানতে পারে পাত্রের খবর।...

কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হ'ল না। তারাও কিছু জানে না। সেখানে শিবু গিয়েছিল আরও রাত্রে—আটটা নাগাদ। এখান থেকে সেরে ও-পাড়ায় গিয়েছিল! বোধ হয় শ্যামার কথাটা স্মরণ করেই—ওখানে আর মেয়েদের কথা তোলে নি—কিংবা সেই রকমই কথা ছিল—শুধু পুরুষ কজনকে নিমন্ত্রণ করেছে, তাও কুঁচো-কাঁচা নয়, তিন কর্তা আর বড় চার-পাঁচটি ছেলেকে নাম ক'রে ক'রে বলেছে। মিনিট পাঁচেকের বেশি নাকি থাকে নি, মেজকর্তাই সামনে ছিল, তাকেই বলে চলে এসেছে। তাকেও ছেলের নাম-ধাম কিছু জানায় নি। কৌশলে এড়িয়ে গেছে। অবশ্য তারও অতটা তখন মনে হয় নি, বিয়েটা যে তাড়াতাড়ি সারা হচ্ছে, মামাদের জানানো হয় নি—এ-সব কিছু জানবার কথা নয় তার। মহা সে সময় বাড়ি ছিল না, সে থাকলে হয়ত জোর ক'রে জেনে নিতে পারত। ওর অত মান-অপমানের বালাই নেই, চেঁচিয়ে হাট বাধাত, জামা ধরে টেনে বসানোও বিচিত্র নয় তার পক্ষে—কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, আজই সে গিয়েছিল পাড়ায় কাদের বাড়ি আনন্দ নাড়ু ভাজতে। ফিরে এসে খবর পেয়ে হায় হায় করছে—কিন্তু এখন আর উপায় কি?

রাত বারোটা নাগাদ হেম ফিরে এসে যখন এই খবর দিল তখনও এ দুটি স্ত্রী লোক জেগে বসে। শ্যামা তখনও জল খান নি, তাঁর আর খাওয়া হবেও না। কনক একবার ভাতের সামনে বসেছিল বটে—কতকটা শ্যামার ভয়েই—কিন্তু কিছুই খেতে পারে নি। খাওয়ার কোন প্রবৃত্তিই ছিল না। সীতাকে যে সে এতটা স্নেহ করে— তা এর আগে সে নিজেও কোনদিন বুঝতে পারে নি।

শ্যামা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। যাবার আগে শুধু কনককে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, 'তুমি আর মিথ্যে এ নিয়ে মন খারাপ ক'রো না বৌমা, ভাল বিয়ে ওর হবে না, হ'তে পারে না; সে আমি বেশ জানি। আমার ঝাড় যে! যেখানে আমার এক ফোঁটা রক্তও আছে, সেখানে কেউ কোনদিন সুখী হবে না। মিছিমিছি ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

BanglaBook.org

এ সান্ত্বনা যে তিনি কাকে দিয়ে গেলেন—কনককে না নিজেকে—তা বোঝা গেল না, তবে তা কতকটা যেন বিলাপের মতোই শোনাল। তেমনি করুণ তেমনি অসহায়।

॥ ২ ॥

পরের দিন আর এ প্রসঙ্গ কেউ তুলল না। শ্যামা রাত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছেন নিজেকে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন। কোথাও যে কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বা দুঃখ—কি পরিতাপের কোন কারণ আছে তা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিম্বা কাজকর্মের ও কথাবার্তার সহজ-স্বচ্ছন্দতায় কোনমতেই বোঝার উপায় নেই। শুধু তাঁর চোখের দিকে চেয়ে অস্বাভাবিক রক্তিমা দেখে কনক বুঝতে পারল যে, তিনি সারারাত ঘুমোন নি, হয়ত বসেই কাটিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কনক অত পোড় খায় নি এখনও—সংসারে সে এখনও শ্যামার তুলনায় নবাগত। তাই তার প্রাণটা ছটফট করতেই লাগল। সারা দুপুর ঘর-বার করল সে—একবারও শোওয়া তো দূরের কথা, স্থির হয়ে বসতে পারল না পর্যন্ত। ইদানীং কে জানে কেন, কিছুদিন ধরেই শরীরটা ভার-ভার লাগছে। যখন-তখন শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়—সেজন্যে শাশুড়ী পছন্দ করেন না জেনেও, দুপুরে সে ঘুমোয় একটু করে। শ্যামা অত লক্ষ করেন নি—সে নিজেও বলতে পারে নি কিন্তু কিছুদিন যাবৎই সে লক্ষ্য করছে যে খাওয়ার ব্যাপারেও নানারকম রুচিবিকার ঘটছে তার। পাঁচজনের সংসারে সে মানুষ। অনেক দেখেছে। এর থেকে যা সন্দেহ হওয়া উচিত তারও তা হয়েছে—তবে সে কথা সে কাকে বলবে তাই ভেবে পায় না।

কিন্তু আজ সেই দুপুরের সকল-শরীর-আচ্ছন্ন-করা দুচোখের পাতা-ভারী-হয়ে-আসা ঘুমও কোথায় চলে গেল। বরং দুপুর গড়িয়ে যত বেলা পড়ে আসতে লাগল, ততই তার অস্থিরতাও বাড়তে লাগল। ওর মনে মনে খুব একটা আশা ছিল যে, আজ সকালে মেজ ঠাকুরঝি নিশ্চয় এসে পড়েছে—সুতরাং দুপুরে কি বিকেলের মধ্যে এখানেও আসবে একবার। বিয়ে যদি খুব অবাঞ্ছিত হয় তো সে এমনি মেনে নেওয়ার মেয়ে নয়। হৈ-চৈ চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে বিয়ে বন্ধ করতে চাইবে নিশ্চয়ই এবং সেজন্যেও ওদের সাহায্য চাইতে আসবে। আর মনোমত হ'লেও এসে ওদের নিয়ে যাবে জোর করে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে—জীবনের ঐ একটা অবলম্বন—তার বিয়েতে ভাই-ভাজকে বাদ দিতে দেবে না কিছুতেই। কিন্তু এক সময় যখন অপরাহ্ণ শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তবু কারুরই দেখা কি কোন খবর মিলল না, তখন যেন ওর চোখে জল এসে গেল। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করার সময় মনে মনে বলল, 'ঠাকুর, ওর শুভ করো। অনাথা মেয়ে বাপকে দেখল না, তার স্নেহ পেল না, আদর কী বস্তু তা-ই জানল না কখনও—এখন বিয়েটা যেন ওর ভাল হয়। ঘর-বরে যেন সুখী হয় ও।'

বোধ হয় এই প্রার্থনার ফলেই মনে একটু জোর এল। ভাবল, 'সত্যি, কেনই বা আমরা এতটা কু ভাবছি। ওর কাকাদের কী স্বার্থ খারাপ বিয়ে দিয়ে? অনাথা একরত্তি মেয়ে—হাজার হোক নিজেদের ভাইঝি—জেনেশুনে কি তার অনিষ্ট করতে পারে!'

একটু সুস্থির হয়ে সে রান্নায় মন দিল। বাইরে কে এসেছে—বোধ হয় বন্ধকী জিনিস ফেরৎ নিতে—দেখল তার শাশুড়ী সুদের হিসেব নিয়ে তকরার জুড়ে দিয়েছেন। তাতে আরো বল পেল যেন। উনিও নিশ্চয়ই ভাল বুঝছেন, নইলে কি আর তুচ্ছ এক পয়সার হিসেব নিয়ে এত বকাবকি করতে পারেন? হাজার হোক ওঁরই নাতনী—সে তো পর, পরের মেয়ে।

BanglaBook.org

রাত্রে হেম এসেও আশ্বাস দিল খানিকটা, 'অত ভাবছই বা কেন—কী আর এমন অনিষ্ট হবে? দোজবরে বিয়ে তো কতই হচ্ছে। আর কিছু না—হয়ত বয়সটাই একটু বেশি—সেইজন্যেই কথাটা চেপে চেপে যাচ্ছে, বিস্তারিত কিছু বলছে না। তা আর কী করা যাবে বলো। বিষয়-সম্পত্তি—যা বলছে যদি সত্যিই অত থাকে—তাহলে অন্তত খেয়ে-পরে তো সুখে থাকবে। হোক গে বয়স বেশি, ওতে এমন কিছু এসে যাবে না। মেয়েরা অতটা ঠিক মাথা ঘামায় না বয়স নিয়ে—আমি দেখেছি।'

'কী করে দেখলে তুমি, মেয়েদের মনের মধ্যে সেঁদুচ্ছ নাকি আজকাল?'

মনটা স্বামীর আশ্বাসে হাল্‌কা হয়ে এসেছে অনেকটা, তাই একটু কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারে না কনক।

হেম কিন্তু দমে না। বলে, 'তা কেন, আমাদের অফিসের এক বন্ধুর বোন, এই নাকি ঠিক ষোল বছর বয়স। আর দেখতেও—যারা যারা দেখেছে অফিসের—সকলেই একবাক্যে বলে, ডানাকাটা পরী একেবারে। মেমেদের মতো রং। সে ওর দাদা—আমাদের অফিসে যে কাজ করে—গুরুচরণকে দেখেই বোঝা যায়। গুরু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে চারদিক আলো হয়ে ওঠে এমন রং। সেই মেয়ের এক সম্বন্ধ এল—পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো, তবে অগাধ পয়সার মালিক, শ'বাজারের রাজাদের দোউত্তর কিন্তু ওদের চেয়ে অবস্থা ভাল—রাণাঘাট-নদেয় বিস্তর জমিদারী আছে, উড়িষ্যার একটা মহল থেকে নাকি বছরে থোক আট-দশ হাজার আয়। বুড়োর এক ছেলে এক মেয়ে, তাদের ছেলেপুলে হয়ে গেছে—নাতি-নাত্‌নী—জাজ্বল্যমান সংসার। বুড়ো নাকি কবে কোথায় দেখেছিল ঐ মেয়ে, বলে পাঠাল এরা যদি রাজি থাকে তো হীরের সেট দিয়ে আশীর্বাদ করবে। এক লাখ টাকার গয়না আর এক লাখ টাকা নগদ দেবে বিয়ের দিন। তা গুরু গুরুর মা কেউ রাজি হয় নি কিন্তু মেয়ে নাকি বেঁকে বসল, ঐ বরেই আমি বিয়ে করব। কার হাতে না কার হাতে তোমরা দেবে, চিরকাল কাঁচের চুড়ি পরে বাসন মেজে দিন কাটাব, তোমাদের অবস্থা তো আমি জানি—এমনি কুলীকাবারী ছাড়া জুটবে না, হয়ত মদ খাবে, ধরে ধরে ঠ্যাঙাবে। না, অত পয়সা আমি ছাড়তে পারব না। সেই বিয়ে হয়ে গেল—মেয়েও নাকি খুব সুখী, একটা ছেলেও হয়েছে। এদেরও ভাল হয়েছে অবশ্য, পয়সা দুহাতে ঢেলে দিচ্ছে বাপের বাড়িতে।'

কনক অবাক হয়ে যায়, বলে, 'কে জানে বাবা! স্বেচ্ছায় ষোল বছরের মেয়ে পঞ্চান্ন বছুরে দোজবরকে বিয়ে করলে! কী জানি, হবে হয়ত। কার মনে কি আছে, কে জানে! তাও এক ঘর ছেলেপুলে! তা তারা কি বলে, একে মানে-গণে?'

'সে নাকি এর কথায় ওঠে-বসে, মানে ঐ ছেলে। হবে না কেন, এতকাল ঠাকুর-চাকর ছাড়া মেয়েদের যত্ন কাকে বলে তা তো কখনও জানত না। আর এ হ'ল গে গরিবের মেয়ে—নিজে হাতে চিরকাল সব করেছে, এক একদিন শখ করে এটা-ওটা রান্না করে, ছেলে-বৌকে বসিয়ে খাওয়ায়—তারা গলে গেছে একেবারে।'

'তা ভাল।' বলে চুপ করে যায় কনক। সে তখন মনে মনে অন্য কথা ভাবছে। হেমেরও তো কত বয়সের তফাৎ তার সঙ্গে—অনেকটাই বড় সে কনকের চেয়ে। কৈ, কখনও তো সে কথা মনে হয় না তার। অবশ্য হেমের চেহারা দেখলে বয়সটা বোঝা যায় না এটাও ঠিক। এখনও একবার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।... যাক্‌গে বাপু, যার সঙ্গে যার বিয়ে হয় হোক, মনের মিল হলেই হল। দোজবরেই হোক, তেজবরেই হোক, মেয়েটা যেন সুখী হয়।

রাত্রির আহরিত আশ্বাসটুকু যেন স্বপ্নের মতোই রাত্রিশেষে বাস্তব দিগন্তে মিলিয়ে যায়। নিশীথের কুসুম যেন ভোরের আলো ভাল করে ফোটবার আগেই শুকিয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

তখনও হেম অফিসে বেরোয় নি—মহা এসে হাজির। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে সে। ওরা ফিরেছে অনেক রাত্রে—বারোটারও পরে, নইলে তখনই আসত। এই ক'ঘন্টা রাত যে কী করে কাটিয়েছে তা সেই জানে।

'পোড়ার রাত কি পোয়াতে চায়? কী বলব—রাত তো নয়, অনন্ত শয্যে একেবারে! ইচ্ছে হচ্ছিল দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিই। কোনমতে ভোরের পেছনে তাই একটু আলোর ছ্যাঁকা লাগতেই বেরিয়ে পড়েছি। কারুক্কে বলেও আসে নি—খুঁজে মরবে হয়ত, মরুক গে। তবে হ্যাঁ—অরুণ দেখেছে। ঐ এক ছেলে, রাত থাকতে উঠে বইখাতা নে গিয়ে বাগানে বসবে, কখন সূর্যিদেবের একটু দয়া হবে আলো দেবে একটু। মুয়ে আগুন!'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে হেমের, অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে তার।

'তা বলি কী মতলবে এসেছ সেইটে আগে বলো না।'

'বলছি, বলছি। তবে মোদ্দা আমি বাপু যাই নি সে আমি আগে থাকতে বলে রাখছি। মেয়ে-নেমন্তন্ন যে-কালে হয় নি, সে-কালে যাবই বা কেন! হোক গে বোনঝির বে, অত বড় গুষ্টিটার একটা মান-মর্য্যেদা আছে তো গা? বিনি নেমন্তন্নয় যাওয়া যায় না। তা আমি না যাই—তিন কত্তাই গিয়েছিল। আর বুড়ো ন্যাড়া, ওরা—বড়বড় ছেলেরা সব্বাই গিয়েছিল। ভুল হবার যো নেই। ও গুষ্টির বড় সাফ চোখ, যা একবার দেখবে একেবারে ফটক তুলে নেবে মনের ভেতর। ভুল হয় নি। সকলেই একবাক্যে বলেছে কথাটা!

'তবে তুমি বকে মরো গে—আমার গাড়ির সময় হয়ে গেল। আমি যাই।'

'ও বাবা' এ যে একেবারে ঘোড়ার ওপর জীনকষা দেখতে পাই। আমিও সংসার ফেলে এসেছি। অসুমর কাজ পড়ে সেখানে। আমার কাজ কেউ করে দেবে না, সে যেন মনে ভেবো নি, উল্টে এতটি চিপ্‌টেন ঝাড়বে'খন।'

তারপর সত্যি সত্যিই হেম বেরিয়ে যায় দেখে বলে উঠল, 'ঐ সীতিটার বরের কথা বলছি গো। ওকে নাকি কোথা থেকে এক ধোঁককেশো ঘাটের মড়া ধরে বিয়ে দিয়েছে ওরা। তার নাকি এক পা ঘাটে এক পা খাটে—এই অবস্থা। খুব কম হ'লেও নাকি সীতির ঠাকুর্দার বয়িসী হবে। বে করতে বসে নাকি অনাব্রত খক্ খক্ করে কেশেছে আর সাঁই সাঁই ক'রে হাঁপিয়েছে। তাই এত লুকোছাপা—বুঝলে? তাই আমাদের কাউকে বলে নি বে-তে।... নিশ্চয় ঐ ঘাটের মড়ার কাছ থেকে এত-টি টাকা গুণে নিয়েছে। কাকা তো নয়, কসাই সব। মেয়েটাকে বেচে মোটা টাকা ঘরে পুরেছে।'

অপ্রত্যাশিত কিছু নয়—বরং জানাই কতকটা। এমনি যে একটা কিছু হবে ধারণাই তো করেছিল এরা, তবু কিছুক্ষণের জন্যে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। হেমও সদরের বাইরে একটা পা দিয়েছিল বেরোবে বলে—সে সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে গেল।

একটু বেশি বয়স হবে হয়ত—এই ভেবেছিল এরা। বড় জোর চল্লিশ। কিন্তু ঠিক এতটা—। এ কি মানুষ পারে সত্যি-সত্যিই? কনক ঘাড় নাড়ে নিজের অজ্ঞাতেই, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

অনেকক্ষণ পরে কতকটা আড়ষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শ্যামা, 'তা খেঁদী—খেঁদী কিছু বললে না? এই বিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে সে?'

যেন খুব একটা কৌতুককর কিছু ঘটেছে কিম্বা কারুর কোন বাহাদুরীর বিবরণ দিচ্ছে এইভাবে দুটি বুড়ো আঙুল মার মুখের কাছে নেড়ে বললে, 'আসে নি—আসে নি। খেঁদি কোথায় যে বলবে? সেদিকে একেবারে মূলেই হাভাত।... তাকে খবরই দেয় নি ওরা। বাজে কথা। চিঠি দিয়েছে না হাতি। মিথ্যে কথা ও-সব। দেবে কোন্ ভরসায়, তাকে ওরা চেনে না?... ছেলেরা তো গিয়ে শুরুতেই সেই খোঁজ করেছে—মেজমাসী কোথায়? তা বুড়ী

BanglaBook.org

ডাইনী সুর টেনে টেনে কৈফেৎ দিয়েছে, কী জানি, কেন এখনও এসে পৌছল না। চিঠি তো দেওয়া হয়েছিল—আসার তো কথা আজ সকালবেলাই। এল না কেন বাপু, আমরাও তো তাই ভাবছি। এসে দশ-কথা আমাদের শোনাবে হয়ত—কিন্তু এখন বে বন্ধই বা করা যায় কী ক'রে বলো!... এই সব। বদমাইশি নাকে কান্না। পাজীর পা ঝাড়া ওরা! মেয়েটার হক্কের পাওনা ফাঁকি দিয়ে নিয়েও আশ মেটে নি, চিরজন্মের মতো সব্বনাশ করাটা বাকি ছিল—সেইটে ক'রে নিশ্চিন্তি হ'ল।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মহাশ্বেতা বোধ করি একটা জুৎসই উত্তরের আশাতেই উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল এদের মুখের দিকে।

কিন্তু সে উত্তর আসতে অনেকক্ষণ দেরি হ'ল আরও।

খানিকটা শুধু আরও চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হেম নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। আর দেরি করলে গাড়ি ধরা যাবে না, এমনিও হয়ত শেষের দিকটা ছুটতে হবে। যা হবার তা যখন হয়েই গেছে, এখন আর কোনমতেই তা যখন ফেরানো যাবে না, তখন মিছি-মিছি আর অফিস কামাই করে লাভ কি?

ঘরে বসে তো আরও মন খারাপ করা শুধু শুধু।

শ্যামা তারপরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তা আমরা আর কী করব বলো! যার মেয়ে সে যদি সব জেনেশুনে, ওদের চিনেও কসায়ের হাতে জবাই হবার জন্যে ওদের ঘরেই মেয়ে তুলে দিয়ে যায়, আমাদের আর কী করবার আছে!'

'ওমা!' মহাশ্বেতা হাত-পা নেড়ে এক পাক নেচে নেয় যেন, 'ওমা, তা বলে চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? এর একটা প্রিতিকারের চেষ্টা করবে না? বলি তোমার নাৎনী তো গা। মামা দিদিমা বেঁচে থাকতে এমনি কাণ্ডটা করবে ওরা?'

'তুই থাম দিকি! সক্কালবেলা! দুর্গা দুর্গা।... তোর ঐ পিত্তিজ্বলানো কথা শুনলে আমার হাড় জ্বালা করে। আমরা কি প্রতিকার করব লা? আমাদের কি করবার এক্তার আছে? যার মেয়ে সে আমাদের কোন এক্তার মেনেছে? ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাব আমরা কোন্ আইনে? আর এখন করবার আছেই বা কি? বিয়েটা কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে? না কি আমরা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে গিয়ে ওদের কাঁচা মাথাগুলো কচাকচ কেটে আনব? বিয়ে যে আর ফিরবে না তা ওরা বিলক্ষণ জানে, জেনেশুনে হিসেব করেই এ কাজ করেছে। ওরা তোমার চেয়ে ঢের বেশি সেয়ানা তা জেনো।'

ধমক খেয়ে খানিকটা চুপ করে থাকে মহাশ্বেতা। বোকার মতো কনকের মুখের দিক চেয়ে ফিক করে হেসে ফেলে একটু। তারপর কতকটা শূন্য পানে চেয়ে বলে, 'তাহলে আর কী করব। যে যার তো নিজের কাজে লেগে গেলে। আমিও বাড়ি যাই। সেখানে হয়ত এতক্ষণে তুলক্রোম কাণ্ড হচ্ছে, খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেছে। অমৃত বেরিয়ে আসতে দেখেছে বটে—তা তাকে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। আর সে যা পোড়া ছেলে—নিজে থেকে বলবেও না। বই-খাতা যদি হাতে পেয়েছে তাহলে আর জ্ঞানগম্যি নেই, কোনদিকে চেয়ে দেখবেও না, কী ক্ষিদে পেলে বলবে না যে ভাত দাও। মুয়ে আগুন!'

॥ ৩ ॥

একটা ক্ষীণ আশা কনকের মনে ছিল যে পাত্রপক্ষ থেকে বৌভাতে তাদের বলতে আসবে। বরের তরফ থেকে বলতে গেলে মেয়ের বাপের বাড়ির পরই মামার বাড়ি ধরে—ন্যায্যমতো ওদের আগে বলা উচিত। আর তারা খোঁজ করলে কি এরা ঠিকানা দেবে না—

না সঙ্গে লোকই দেবে না? আর তো গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই। ওদের মতলব তো সিদ্ধই হয়ে গেছে।

কিন্তু কেউই কিছু বলতে এল না। নিয়মমতো যেটা বৌভাত—ফুলশয্যের দিন—সেটা কেটে গিয়েও দুদিন চলে গেল। কোন খবরই পাওয়া গেল না মেয়েটার। চারদিনের দিন সন্ধ্যের সময় একেবারে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকল ঐন্দ্রিলা।

'ওগো এ আমার কী হ'ল গো! ওগো তোমরা থাকতে আমার মেয়ের এই সব্বনাশটা হ'ল গো। ওগো তোমরা কেউ একবার গিয়ে দেখলে না!'

শ্যামা তখন সবে স্নান ক'রে এসে ঘরে কাপড় ছাড়ছিলেন, তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন।

'থাম, থাম। চুপ কর। ও কি করছিস? ভর্‌সন্ধ্যেবেলা অমন মড়াকান্না তুলছিস কিসের জন্যে? গেরস্তর অকল্যেণ—সে মেয়েটারও অকল্যেণ।... চুপ, চুপ।'

কিন্তু মাকে দেখে ঐন্দ্রিলা আরও যেন হাহাকার করে উঠল।

'ও মাগো, এ আমার কী হ'ল মা! ওমা, আমার যে ঐ একটা মেয়ে মা! আমি যে ওর ওপর ভরসা করেই বুক বেঁধে ছিলুম মা। তোমরা থাকতে আমার এ সব্বনাশ কী করে হ'ল মা।'

'চুপ। চুপ!' একটু ধমকই দিয়ে ওঠেন শ্যামা এবার, 'নিজের সর্বনাশ তো তুমি নিজেই করেছ মা। মাঝখান থেকে আর এদের মাথাটি খাচ্ছ কেন—এখন এই ভরসন্ধ্যেবেলা কান্নাকাটি ক'রে! এখন বলছ আমরা থাকতে—! আমরা কী করব শুনি! মেয়েকে নড়া ধরে নিয়ে যাবার সময় হুঁশ ছিল না! আমরা কি তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, না নিয়ে যেতে বলেছিলুম? টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে তুলে দিলে কে? তুমিই তো তাদের গার্জেন করে দিয়ে গেছ বাছা। এখন আমাদের কাছে এসে কাঁদলে কী হবে? আমরা কি করব? আমাদের জানিয়েছে তারা, না মত নিয়েছে!'

'ওগো, আমি না হয় চিরদিনের অজ্ঞান, আমি না হয় অন্যায় করেছি—তোমরা গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এলে না কেন! তোমরা যদি জোর করে এনে রাখতে তা হ'লে তো আর এ সব্বনাশটি হ'ত না!'

'হ্যাঁ—তা আর নয়! তারপর তুমি এসে উল্‌টে আমাদের নামে থানা-পুলিশ করো! কার হুকুমে আমার মেয়েকে নিয়ে এলে তোমরা—একথা বললে আমরা কোথায় দাঁড়াতুম? তোমার তো গুণে ঘাট নেই মা। আসলে এ সর্বনাশের জন্যে দায়ী তোমার স্বভাব। তোমার ঐ স্বভাবের জন্যেই চিরকাল জ্বলবে আর জ্বালাবে। তোমার পাপেই তোমার মেয়ের এই হাল হ'ল!'

কনক ততক্ষণে ছুটে এসে ঐন্দ্রিলার হাত ধরে দাওয়ায় বসিয়েছে। ওর এই চিৎকার আর মড়কান্না শুনে আশেপাশের বাড়ি থেকে লোক বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে—এবার হয়ত ভিড় করে এসে বাড়িতে ঢুকবে। লোক-জানাজানি কেলেঙ্কারি আর কিছু বাকি থাকবে না।

সে মিনতি করে বলে, 'চুপ করুন, চুপ করুন ঠাকুরঝি। ছিঃ, অমন ক'রে কি কাঁদতে আছে। কী এমন হয়েছে। আর যা হবার তা তো হয়েই গেছে, সে হওয়া তো আর ফিরবে না। মিছিমিছি মেয়েটার আরও বেশি অকল্যেণ করছেন কেন। স্থির হোন একটু।'

সে ছুটে গিয়ে একটা চুম্‌কি ঘটি ক'রে জল এনে ওর চোখে-মুখে দিতে থাকে। মাথাতেও দেয় খানিকটা থাবড়ে থাবড়ে।

'আর কি কল্যেণ হবে ভাই। আর কি বাকি আছে কিছু? ওরা যে আর কোন সব্বনাশটা করতে বাকি রাখে নি তোমাদের সীতার!'

কান্না একেবারে বন্ধ হয় না, কিন্তু কনকের সহানুভূতির স্পর্শে হাহাকারটা কমে আসে একটু একটু ক'রে।

একটু একটু করে সব খবরও পাওয়া যায় তার মুখ থেকেই।

BanglaBook.org

চিঠি পেয়েছে ঐন্দ্রিলা বিয়ের পরের দিন। সে যাদের কাছে কাজ করে তাঁরা ডাকের মোহর দেখেছেন। বিয়ের দিনে মোহর পড়েছে এখানকার। তার মানে সেইদিনই সকালে ফেলা হয়েছে—যাতে ও বিয়ের দিন না পৌঁছতে পারে।

ওকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক হ'ল তাতেই কেমন কেমন বোধ হয়েছিল ওর। নানারকম সন্দেহ মনে দেখা দিয়েছিল তখনই। তবে এতদূর কল্পনাও করতে পারে নি। ওর দেওররা যে ঠিক এতখানি অমানুষ তা ও জানত না।

মন খারাপ খুবই হয়েছিল। একটা মেয়ে—তার বিয়েটাও চোখে দেখতে পেলে না। আবার মনকে বুঝিয়েছে যে ওর যা হুতোশুনে বরাত, না দেখেছে ভালই হয়েছে। ওর নজরেই ক্ষতি হ'ত হয়ত। আরও একটা আশ্বাস মনে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল যে, দাদা আছে, মা আছে, তারা নিশ্চয় দেখেশুনেই মত দিয়েছে। মামাদের যে জানানোও হয় নি—এ যে একেবারে ওর ধারণার বাইরে। এক-একবার এও ভেবেছে যে হয়ত বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে নানা রকম অশান্তি বাধাবে কি ঝগড়াঝাঁটি করবে সেই ভয়ে দেরি করে খবর দিয়েছে ওকে।

যাই হোক—চিঠি পেয়েই রওনা দিয়েছে ও। সেইদিনই। মনিবরা বারণ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—একা মেয়েছেলে রাত্রের ট্রেনে গিয়ে কাজ নেই। একদিন সবুর করুক বরং—কে চেনাশুনো লোক কলকাতা যাচ্ছে খোঁজ ক'রে দেখে তার সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন তাঁরা। বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন আর এত তাড়া কি? কিন্তু ঐন্দ্রিলা সেই একদিনও অপেক্ষা করতে পারে নি।

এখানে এসে ওর আরও মন খারাপ হয়ে গেছে—ফুলশয্যার কোন আয়োজন নেই দেখে। দেওরদের জিজ্ঞাসা করেছে, তারা এড়িয়ে গেছে। শেষে শাশুড়ীকে গিয়ে চেপে ধরায় তিনি বলেছেন, 'গায়েহলুদ ফুলশয্যা গায়ে গায়ে কাটান গেছে—ফুলশয্যের তত্ত্ব পাঠানো হবে না।'

খুবই মন খারাপ হয়ে গেল ওর। যতই গায়ে গায়ে কাটান দেওয়া হোক, এমন তো অনেক বিয়ে দেখেছে—নিয়মকর্ম যেটুকু, একটু ফুল, দুখানা কাপড়, একটু ক্ষীর মুড়কি—এও যাবে না, সে আবার কীরকম কথা?

তখনই পাড়ায় বেরিয়ে পড়েছে—ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসবার অছিলায়। পাড়ায় যাদের যাদের বাড়িতে গেছে ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যেন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বিব্রত হয়ে উঠেছে যেন ওকে দেখে। বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত পাড়ার দাশু মজুমদারের গিন্নীর কাছে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করতে তিনি বলেছেন, 'বাপু, বুঝতেই তো পারছ, এক পাড়ায় বাস করি, আর তোমার শাশুড়ীর যা মুখ, সাধ করে কে ঝগড়া টেনে আনবে বলো ওদের সঙ্গে। দুটি ঠোঁট ফাঁক করলেই বিপদ।... তাছাড়া পাড়াঘরে তো কাউকে বলে নি—আড়াল আবডাল থেকে যা ছেলেরা দেখেছে। সেসব কথা না শোনাই ভাল। তা তুই-বা এর-ওর কাছে গিয়ে মিথ্যে মাথা খুঁড়ছিস কেন, চলে যা না। নিজে গিয়ে দেখে আয়!'

'কিন্তু ঠিকানা জানি না যে কাকীমা।' ঐন্দ্রিলা বলেছে।

আর একটু ইতস্তত ক'রে তিনি ঠিকানাটাও বলে দিয়েছেন। গ্রামের নাম, পাত্রের নাম শুধু। আর গ্রামটা ডোমজুড়ের কাছেই—এইটুকু। এর চেয়ে বেশি ঠিকানা নাকি কেউ জানে না। ওরা কাউকেই বলে নি—ওর দেওররা।

তখনই বেরিয়ে পড়েছে ঐন্দ্রিলা। গাড়ির কাপড় ছাড়া হয় নি, মুখে একটু জলও পড়ে নি। আঁচলেই টাকা কটা বাঁধা ছিল তাই রক্ষে। বাড়িতে গেলেই ওকে আটকে ফেলবে—এটা ও এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছিল বেশ।

BanglaBook.org

অজানা অচেনা পথ। প্রতি-হাত লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে যাওয়া, গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থাও জানা নেই কিছু—তবু হাল ছাড়ে নি।

একবার ভেবেছিলুম দিদির বাড়ি গিয়ে বুড়ো কি কেষ্ট কাউকে সঙ্গে নিই—আবার ভাবলুম মিছিমিছি আরও দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া তারাও হয়ত পথ-ঘাট চেনে না। দিদি খাওয়ার জন্যে পেড়াপীড়ি করবে গেলেই, ওখানেই দুপুর গড়িয়ে যাবে, যাওয়াই হবে না শেষ পর্যন্ত। তখন আমার জেদ চেপে গেছে—ওদের ফুলশয্যে বৌভাত কেমন হয় দেখতে হবে। ঘর-বরও দেখব নিজের চোখে। তাই অমনিই বেরিয়ে পড়লুম, তখনই। এদেশ ওদেশ ঘুরে পরের বাড়ি চাকরি ক'রে ক'রে আগের চেয়ে সাহস বেড়ে গেছে তো, সেয়ানাও হয়েছি অনেকখানি, শেষ পর্যন্ত তাই খুঁজে বারও করলুম! কিন্তু কী দেখতে গেলুম বৌদি, কী দেখলুম গিয়ে। এ দেখতে এক কাণ্ড ক'রে কেন গেলুম!'

আবারও হু-হু করে কেঁদে ওঠে ঐন্দ্রিলা।

কনক তখন একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে আর এক হাতে মাথায় বাতাস করছে, 'চুপ করুন, চুপ করুন ঠাকুরঝি। স্থির হোন। কেঁদে তো আর কোন ফল হবে না। মিছিমিছি আরও বেশি অকল্যেণ করছেন কেন তার!'

জামাইবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পৌচেছে তখন আর সন্ধ্যের বেশি দেরি নেই। আবছা হয়ে এসেছে চারদিক। পথে যাকেই বাড়ি জিজ্ঞাসা করেছে জামাইয়ের নাম সে-ই উত্তর দিয়েছে—কিন্তু মুচ্‌কি হেসেছে একটু। তবু তখনও ঐন্দ্রিলা মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে বিয়েবাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছে, বিশেষ দোজবরের বিয়ে, তাই ওরা হাসছে। সে হাসির কোন গূঢ় অর্থ আছে তা মনে করে নি একবারও।

বরং অন্য চিন্তাই দেখা দিয়েছে মনে।

বিনা নিমন্ত্রণে কর্মবাড়ি যাওয়া উচিত নয়, জামাইবাড়ি তো এমনিই যাওয়া অনুচিত—এসব কথা এতক্ষণ একবারও মনে হয় নি ঐন্দ্রিলার। একেবারে ওদের পাড়ায় পৌঁছে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। গাড়ির কাপড়, এমনিতেই আধময়লা হয়ে গিয়েছিল, তার-ওপর সারাদিনের 'রহটে' এখন তো রীতিমতো কালোই দেখাচ্ছে, গায়ের চাদরটাও ফুটোফুটো—কবেকার হরিনাথের দরুন চাদর এটা—তার ওপর ময়লাও হয়েছে যৎপরোনাস্তি। এই অবস্থায় জামাইবাড়ি যাওয়া—ছি! কী মনে করবে ওরা। বেশি নিমন্ত্রিত কেউ না এলেও ঘরের লোকজনও তো আছে। তাছাড়া জামাই প্রথম দেখবে শাশুড়ীকে—কী ভাববে। মেয়েরও একটা লজ্জার কারণ।

ফিরেই আসছিল। দু'চার পা এসেও ছিল কিন্তু তাতেও ঠিক মন সরল না। এতদূর এসে এত কাণ্ড করে জামাইকে না দেখেই চলে যাবে? যার জন্যে আসা। তার চেয়ে বরং একটু আড়াল থেকে ঘর-বর দেখে চলে আসবে।

সেই ভেবেই আর একটু এগিয়ে একেবারে ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল সামনের বাগানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, বেশ একটা হৈ-চৈও হচ্ছে। প্রথমটায় একটু আশ্বস্তই হয়েছিল। ভেবেছিল বৌভাতেরই ভিড় এটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্য খটকা লাগল। আলো নেই কেন? এত লোক যেখানে নিমন্ত্রিত, সেখানে অন্তত দুটো গ্যাসের আলো ভাড়া করা হয়নি—এ যেন কেমন ঠেকছে। একটা হ্যারিকেন শুধু দূরে বসানো আছে, যেখানটায় বেশি জটলা সেখানটায় কিছুই নেই। এ যেন বড় বেশি অস্বাভাবিক মনে হ'ল তার।

তখন আর একটু এগিয়ে গেল। ওরা নিজেদের গোলমালে ব্যস্ত, তাছাড়া বেশ ঘোরঘোরও হয়ে এসেছে, তাকে অত কেউ লক্ষ করবে না। কাছে যেতেই বুঝল

BanglaBook.org

ব্যাপারটা। উৎসবের আনন্দ-কোলাহল নয়—দাঙ্গা, মারপিট। অতি কুৎসিত ইতর কলহ একটা। দুই দলে বিবাদ হচ্ছে, পাড়ার লোক এসেছে মধ্যস্থতা করতে।

সেই গালিগালাজ ও কটূক্তির বিপরীত-মুখী অবিরাম বর্ষণের মধ্যে থেকে আসল ঘটনাটা যখন বুঝতে পারল, ঐন্দ্রিলা, তখন কিছুকালের জন্য তার হাত-পা পাথর হয়ে গেল। বুকের স্পন্দন থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

এইখানে বিয়ে হয়েছে সীতার! এই বিয়ে!

চিনতেও পারল সবাইকে। সীতার বর—আর তার ওপক্ষের ছেলেমেয়ে সকলেই ছিল সেখানে। যে জোয়ান জোয়ান চারজন ছোকরা এদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে—তারা জামাইয়েরই ছেলে। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে তাদের বড় ভগ্নিপতি এবং তার বড় ছেলে। সেও সতেরো আঠারো বছরের ছোকরা। ওর জামাইয়ের দিকে শুধু আছে আর একটি জামাই। সে কলকাতার লোক, ঝগড়া-বিবাদ পছন্দও করে না—এর মধ্যে থাকতেও চায় না। সে পেরেও উঠছে না তাই ওদের সঙ্গে।

আশপাশের দু'একজনকে প্রশ্ন ক'রে এই বিবাদের ইতিকথাও জানতে পারল ঐন্দ্রিলা। এই বিয়ের কথা শুনেই নাকি বুড়োর (তারা সকলেই বুড়ো বলে উল্লেখ করছে, জামাইয়ের নাম উমেশ সে একজনের মুখেও শুনল না, ছেলেরাও বাবা বললে না কেউ, তারাও বুড়ো বলতে লাগল) ছেলেরা রুখে উঠেছিল, ভয় দেখিয়েছিল যে এ তারা কখনও সহ্য করবে না—তাদের জাজ্বল্যমান সংসার, তাদের মা মারা গেছে এখনও ছমাস হয় নি—সে জায়গায় এসে বসবে কে এক হাঘরের মেয়ে—হাঘরে ছাড়া বুড়োকে মেয়ে দেবেই বা কে?—এ তারা দেখতে প্রস্তুত নয়। এ বিয়ে তারা বন্ধ করবেই, দরকার হয় তো দাঙ্গাহাঙ্গামা মারপিটেও তারা পিছ-পা হবে না। বুড়োর ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলে রাখা খুবই সোজা—কিন্তু তাও তারা করবে না, বিয়ের আসরে গিয়ে হট্টগোল বাধিয়ে পাড়ার লোক ডেকে বে-ইজ্জৎ করবে, থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে ফিরে আসতে হবে।

বুড়ো সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওদের এই শাসানিতে। অথচ বিয়েরও এমন লালসা যে কোন অগ্রপশ্চাৎ ভাববারও শক্তি ছিল না। সে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য তারা যা বলেছে তাতেই রাজি হয়েছে, বাড়িঘর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি যেখানে যা ছিল সব ঐ ছেলেদের নামে দানপত্র ক'রে রেজেস্ট্রি ক'রে দিয়েছে। তখন ভেবেছিল যে ষোলআনা অধিকার পাবার পর যার সম্পত্তি তাকে আর তার বৌকে একেবারে ফেলবে না, দুটো ভাতকাপড় দেবেই। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও দিতে বাধ্য হবে। তার জীবদ্দশাতে তো কোন ভয়ই নেই—মরার পরও বিধবাটাকে কি আর দুটো ভাত দেবে না? হয়ত বিধবার কথাটা মোটে ভাবেই নি, তার কাছে নিজের তখনকার প্রয়োজনটাই বড় হয়ে উঠেছিল সব চেয়ে।

সব হিসেব কিন্তু বানচাল হয়ে গেল যখন কাল নতুন বৌ সুদ্ধ এসে দেখল যে তার নিজের বাড়িতে আর তার ঢোকবার অধিকার নেই, সে দরজা ওদের মুখের ওপরই বন্ধ হয়ে গেল। তখন গালিগালাজ শাপশাপান্ত যা করবার বুড়ো যথেষ্টই করেছে কিন্তু ছেলেরা গ্রাহ্যও করে নি। বহু রাত অবধি কনে-বৌকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে অন্ধকারেই। যে বন্ধুকে অভিভাবক বা বরকর্তা মতো ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, সে গতিক দেখে আগেই সরে পড়েছে। তখন এক প্রতিবেশীর হাতে পায়ে ধরে বাকি রাতটা তার বাড়ির সদর-ঘরে কাটিয়েছে। তাদের তখন খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে—তাছাড়া তারা অন্য জাতও বটে—সুতরাং রাত্রের আহারও জোটেনি কারুর।

আজ সকালে উঠে যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে বুড়ো। কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউই গা করে নি; পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। কে এ ঝগড়ায় নাক গলাবে। 'ভাবিতে

BanglaBook.org

উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'—এত বড় একটা জিনিস ঘাড়ে নিচ্ছে যে সে কী বলে বিষয়সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকে! ঐ নাত্‌নীর বয়সী মেয়েটার কত বড় সর্বনাশ সে করছে সেটা খেয়াল ছিল না?

কারুর কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক একটি কথাও শোনে নি বুড়ো। তখন চোখে অন্ধকার দেখেছে। শেষ পর্যন্ত বড় ছেলের শ্বশুর এবং ছোট জামাইয়ের কাছে কান্নাকাটি ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তাদের টেনে এনেছে মধ্যস্থতা করতে। বুড়ো ভেবেছিল যে নিজের শ্বশুরের কথা বড় ছেলে কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। আর সে নরম হলে দল ভেঙ্গে যাবে, অন্য ছেলেরাও জুৎ করতে পারবে না তখন।

মধ্যস্থ দুজনকে নিয়ে ঐন্দ্রিলার মেয়ে-জামাই একটু আগেই এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ছেলেরা কোন কথা এবং কারুর কথা শুনতেই রাজি নয়। শ্বশুর আছে শ্বশুর আছে ঘরে আছে—এসব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে কেন? ও বাপকে তারা কিছুতেই এ-বাড়ি ঢুকতে দেবে না। তারা ওকে বাপ বলে মানতেই রাজি নয়। ও তো বদ্ধ পাগল। মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে ধোঁককেশো বুড়োর—নইলে এ কাজ কেউ করে? গঙ্গাপানে পা হয়েছে, খাটে উঠলেই হয় এখন—সে কিনা একটা নাতনীর বয়সী কেন—নাতনীর চেয়েও বয়সে ছোট মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এল! এখন ওদের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া মানেই তো একটা বিধবার আজীবন খোরপোষের ভার ঘাড়ে নেওয়া। সে কাজে যেতে তারা প্রস্তুত নয়।

এই নিয়েই এখনও তকরার চলছে। বুড়োর বলতে গেলে দুদিন অনাহার, তার ওপর সকাল থেকে ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি—তার আর সত্যিই তখন মাথার ঠিক নেই। নিজের আত্মজদেরই যে কুৎসিত ভাষায় ইতরের মতো গাল দিচ্ছে, তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। ছেলেরাও অবশ্য কম যাচ্ছে না। সেদিক দিয়ে অন্তত তারাও যে বাপেরই বেটা তা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

বিবাদ অনেক দূর গড়িয়েছে। আস্তে আস্তে সে ইতিহাস সংগ্রহ করতে ও বুঝতে ঐন্দ্রিলার সময় লেগেছে বেশ খানিকটা। ইতিমধ্যে কখন যে সে আরও সামনে এগিয়ে গিয়েছে তা নিজেই টের পায় নি। সীতা এতক্ষণ কোনদিকে মুখ তুলে তাকায় নি, ঘাড় হেঁট করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যাদের বাড়িতে ছিল সারাদিন, তারা ভাত খাওয়াতে সাহস করে নি বামুনের মেয়েকে—জলখাবার খাইয়েছিল সামান্য কিছু। তার খাবার অবস্থাও ছিল না। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায়, আশাভঙ্গের বেদনায় সে যেন জড় হয়ে গিয়েছিল। জড় হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় রক্ষা, নইলে তার পাগল হয়ে যাবারই কথা। এখনও এই সমস্ত অপরিচিত লোকের মধ্যে এই অতি-ইতর আবহাওয়ায় সে আরও কতকটা ভয়েই কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একসময়, যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে আট্‌কে যাওয়ায়, হাঁপিয়ে উঠে মুখ তুলতেই মায়ের দিকে চোখ পড়ে গেল তার। সে 'মাগো' বলে চিৎকার করে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ গুঁজে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ঐন্দ্রিলা প্রথমটা ভেবেছিল সীতা বুঝি মরেই গেল। তাছাড়া তারও এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে তখন, কোন মতেই আর আত্মসম্বরণ করা সম্ভব নয়। সে মাটিতে আছড়ে পড়ে কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে গালাগাল দিয়ে চিৎকার ক'রে এক প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। তাতেই কিন্তু চাকা ঘুরে গেল শেষ পর্যন্ত। অনেকেরই এবার মনে হ'ল, সত্যিই তো, ঐ একফোঁটা মেয়ের কী দোষ! অভিভাবকদের পাপে ও এত শাস্তি পায় কেন? সে কেন এত সহ্য করবে? বিশেষ ঐন্দ্রিলার কথা থেকে যখন সকলে জানতে পারল যে মেয়ের মাকে না জানিয়ে, তার মত না নিয়েই এ বিয়ে দেওয়া হয়েছে—অনাথা আশ্রয়হীনা বিধবার একমাত্র সন্তানকে ওরা ষড়যন্ত্র করে বিয়ে দিয়েছে-তখন সহানুভূতিটা পুরোপুরি এদের

BanglaBook.org

দিকে এসে পড়ল। কে একজন ছুটে গিয়ে ঘটি ক'রে জল এনে সীতার মুখে মাথায় ঝাপ্‌টা দিতে লাগল। একজন মহিলা এসে ঐন্দ্রিলাকে মাটি থেকে তুলে মুখ-চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

এইবার পাড়ার লোকরা অনেকেই বুড়োর ছেলেদের ওপর রুখে উঠল। এ কী অন্যায় কথা! 'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই!' বুড়ো খুবই খারাপ কাজ করেছে সত্যি কথা—তবু তারই বিষয় সম্পত্তি—এইভাবে তার কাছ থেকে সব সম্পত্তি হাতিয়ে এখন তাকেই এমন করে লাঞ্ছনা করা! নিজের বাড়িতে সে ঢুকতে পারবে না! আর ঐ দুধের মেয়েটা কাল থেকে না খাওয়া না দাওয়া—পরের বাড়ি পড়ে আছে—ওর ওপরই বা অকারণ এ প্রহারী কেন? যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে—এখন এদের বাড়ি ঢুকতে দাও, মেয়েটার একটু শোবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। বুড়ো যদি এ আহাম্মকী না ক'রে পুলিশ ডেকে তোদের তাড়িয়ে দিত—তা হ'লে তো এরই যথা-সর্বস্ব। তখন তোরা দাঁড়াতিস কোথায়, খেতিস কি?... এখনও যদি তাদের অল্পে চৈতন্য না হয় তো বুড়োকে নিয়ে ওরা থানায় গিয়ে ডায়রী করিয়ে ছেলেদের নামে মামলা করাবে। ভয় দেখিয়ে যে দানপত্র করা হয়েছে সে দানপত্রের কোন মূল্যই নেই। কোন আদালত তা মানবে না।

এই ওষুধেই ছেলেরা অনেকটা নরম হয়ে এল। এভাবে ঐন্দ্রিলা গিয়ে পড়ে কেঁদে জিতবে তা তারা ভাবে নি। হাতের উদ্যত লাঠি এবার নামল সকলকারই। কেবল মেজ ছেলে মুখ গোঁজ ক'রে বলল, 'জমি-জমাই না হয় লিখে দিয়েছে, হাতের নগদ টাকাগুলো তো ফুরোয় নি। বুড়ো অন্য বাড়ি একটা কিনে দিক না তার ছুক্‌রী মেয়ে-মানুষকে!'

এতেও চারিদিক থেকে সকলে ধমকে উঠল। 'এ কী অভদ্র কথাবার্তা! ব্রাহ্মণের মেয়ে, দস্তুরমতো নারায়ণ অগ্নিসাক্ষী ক'রে বিয়ে করে এনেছেন তোমাদের বাবা— তার সঙ্গে এ রকম অশোভন আচরণ করা অত্যন্ত অন্যায়।'

কিন্তু সে কথা চাপা পড়ে গেল আর একটি সংবাদে। উমেশের যে বন্ধু বরকর্তা সেজেছিল এ বিবাহে (সম্ভবত মোটা টাকা খেয়েই) এবং বিয়ে দিইয়ে নিয়ে এসেছিল কাল—আবহাওয়া অনুকূল দেখে সে এবার এগিয়ে এল, 'সে টাকা কি আর আছে বাবা জীবনধন, তার আর একপয়সাও নেই। সে টাকা থাকলেও তোমার বাবা এতক্ষণ বাড়ি ঠিক ক'রে বায়না ক'রে ফেলতেন। তিনিও কম জেদী মানুষ নন। নিহাৎ কারে পড়েই তোমাদের চোট খাচ্ছেন।'

শুধু জীবনধনেরই নয়, উপস্থিত সকলেরই কৌতূহল সরব হয়ে উঠল।

তখন তিনি সবিস্তারে সে ইতিহাসটুকু বিবৃত করলেন। আর তখনই ঐন্দ্রিলা জানতে পারল যে সীতার ভাগ্যে আশা বা ভরসা বলতে কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

সীতার ছোট কাকা ভোলা নাকি কী ফাটকা খেলতে গিয়ে আফিস থেকে হাজার-দুই টাকা ভেঙ্গে বসেছিল। এ কাজ নাকি ইতিপূর্বেও সে অনেকবার করেছে, কোনটায় হেরেছে কোনটায় জিতেছে—অফিসের টাকা যথাসময়ে পুরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এবার ক্রমান্বয়ে লোকসান হওয়ায় দেনার অঙ্ক বেড়েই গেছে, শোধ দেবার কোন উপায় করতে পারে নি। সামনেই অডিট্—কথাটা আর চাপা থাকবে না বুঝে চোখে অন্ধকার দেখল। কিন্তু অত টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবে—কে তাকে দেবে? এজমালি সম্পত্তি, বখ্‌রা হয় নি, সে সম্পত্তি বাঁধা দিতে বা বিক্রি করতে গেলে অন্য ভাইয়ের সই চাই। ভাই তা দিতে রাজি হয় নি। এই যখন অবস্থা—এক পা বাইরে এক পা জেলে—তখনই কার মুখে শুনল উমেশের কথা! সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজছে, বয়স পঞ্চান্নর কম নয় এবং তার হাতে অনেক টাকা।

BanglaBook.org

শোনামাত্র সে উমেশের এই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে! সোজাসুজি প্রস্তাব করে যে তিন হাজার টাকা পেলে এবং ওরা যদি বিবাহের যাবতীয় ব্যয় বহন করতে রাজি থাকে তো সে উমেশের সঙ্গে নিজের ভাইঝিরই বিয়ে দিতে পারে। পাছে এতগুলো টাকা খরচ শুনে ও তরফ ভয় পায় সেই জন্যে প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে মেয়েটিকে দেখাবারও ব্যবস্থা করে। মায়ের মতো অত রূপসী না হোক— সীতা লাবণ্যবতী মেয়ে। গৌরাঙ্গী নয়—তেমনি কালোও নয়, মাজা-মাজা রঙ। মুখশ্রী পেয়েছে সে বাপের কাছ থেকে— সর্বোপরি অল্প বয়স, তখন তার প্রথম কৈশোর। এ বয়সে কুৎসিত মেয়েকেও ভাল দেখায়। উমেশের মাথা ঘুরে গেল। সে এই প্রস্তাবেই রাজি হয়ে পড়ল। কথা হ'ল যে পাকা দেখার দিন দু'হাজার এবং বিয়ের দিন এক হাজার টাকা সে ভোলার হাতে দেবে এবং মেয়ের গহনা কাপড় বাসনপত্র ও খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় বাজার ক'রে পাঠাবে। গহনা কত দেবে তা ভোলা জিজ্ঞাসা করে নি—তার অত মাথাব্যথাও ছিল না। সেইটেই বরং উমেশ কম দিয়েছিল। কারণ অত টাকা তার হাতে সত্যিই ছিল না। সে ভেবেছিল যে তার প্রথমা স্ত্রীর দু'একখানা গহনা ভেঙ্গে নতুন ক'রে গড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাতাসে খবর পেয়েই তার ছেলেরা আগে সে বাক্সটি আত্মসাৎ করেছিল। সুতরাং কয়েকগাছা পাত্‌লা চুড়ি এবং একগাছি সরু হার ছাড়া কোন গহনা সে দিতে পারে নি। বাকি সব খরচটাই কিন্তু ভোলা আদায় করে নিয়েছে, বলতে গেলে ওর কান ম'লে।

এইখানেই ঐন্দ্রিলা উমেশের ঐ বন্ধুর মুখ থেকে প্রথম জানল যে, শিবু আগে এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি—বরং খুবই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। শেষে ভোলা পুরো একটি দিন নিরম্বু পড়ে থেকে মাকে দলে টানতে মা কান্নাকাটি ক'রে মেজছেলের হাতেপায়ে ধরে তাকে রাজি করিয়েছিলেন। তাও শেষ পর্যন্ত একটি হাজার—অর্থাৎ বাড়তি টাকার সবটাই তাকে গুণে দিতে হয়েছিল। জেলটা বাঁচল এবং আপাতত চাকরিটাও রইল—ভোলার এইটুকুই নীট লাভ।

এই ইতিহাস শুনে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কিছুকাল। এতখানি মূর্খতা ও উন্মত্ততা তাঁদের ধারণার বাইরে। একে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই, নিঃশ্বাসের অপচয়। অতিরিক্ত কামোন্মত্ততায় লোকটা শুধু এই মেয়েটারই সর্বনাশ করে নি, নিজেও সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছে। যতকাল বাঁচবে এদের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে—এদের হাত-তোলায় থাকতে হবে। মামলা-মোকদ্দমা করে যে নিজের বিষয় ফিরিয়ে নেবে—তারও খরচ আছে, সে টাকাটাও হাতে রাখে নি। মেয়েটাকে কী করে পাবে তা-ই শুধু ভেবেছে— কী ক'রে পালন করবে তা পর্যন্ত চিন্তা করে নি।

কে একজন পিছন থেকে বললেন, 'মেয়েটারই বরাত। নইলে এমন তো কখনও শুনি নি।

উপস্থিত সকলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই কথাটারই সমর্থন করলেন। কী আর করবেন তাঁরা? কী আর করবার আছে এক্ষেত্রে?

যাইহোক—চারিদিক থেকে উমেশকে লক্ষ করেই চাপা এবং স্পষ্ট ধিক্কার উঠলেও— তার ছেলেরা এবার বাড়ির প্রবেশপথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। উমেশ ঘাড় হেঁট করে নববধূকে নিয়ে অবশেষে তার নিজের ঘরে গিয়ে উঠল।

তারপর অবশ্যই কর্তব্যকর্মে কোন ত্রুটি ঘটে নি। উমেশের বড়ছেলের বৌ এসে হাতজোড় করে ভেতরে যেতে বলেছে, 'যা হবার হয়েছে, এখন সন্তান মনে ক'রে মাপ করুন, দয়া ক'রে ভেতরে চলুন। স্নান-টান করে একটু কিছু মুখে দিন।'

বলা বাহুল্য ঐন্দ্রিলা ওদের বাড়ি ঢোকেনি। সেও হাতজোড় করে বলেছে, 'তোমরা যেতে বলেছ এই আমার যথেষ্ট হয়েছে ভাই। কিন্তু জামাইবাড়িতে যাওয়া আমাদের বংশের

BanglaBook.org

নিয়ম নয়—সে আমি পারব না। এখানে যদি কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন তো রাতটা কাটিয়ে ভোরেই আমি চলে যাব।

তবুও ওরা অনুনয় বিনয় করেছিল কিন্তু ঐন্দ্রিলা কিছুতেই রাজি হয় নি। উমেশের সেই বন্ধুটি অতটা না বুঝেই, একবার বলেছিল তার বাড়ি যেতে কিন্তু তাকে মুখের ওপরই বলে দিয়েছে সে, 'আপনার বাড়ি যাব? আপনি বলছেন কোন্ মুখে? আপনার সাহস তো কম নয়। আপনি জেনেশুনে সেই কসাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করেছেন—আপনার ভিটেতে পা দিলেও পাপ হবে আমার। ব্রাহ্মণের নিষ্পাপ কুমারী মেয়ে—সাক্ষাৎ ভগবতী—কুমারী পূজো না করলে মার পূজো হয় না। টাকা খেয়ে সেই কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করলেন আপনি—এর ফল তোলা রইল, মনে থাকে যেন। মা সর্বমঙ্গলা এর বিচার ঠিকই করবেন। আমি যাব, হ্যাঁ যাব বৈকি—যদি কোনদিন শুনি আপনার ভিটে থেকে জোড়া মরা বেরোচ্ছে, সেইদিন আনন্দ করতে আপনার বাড়ি যাব। তার আগে নয়!'

এর পর আর সে ভদ্রলোকের সাহস হয় নি কিছু বলতে। মুখ কালি করে চলে গেছেন। পালিয়ে গেছেন বলাই উচিত বরং।

পাড়ার অপর একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এসে তখন ওর হাত ধরে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে স্নান করেছে, আহ্নিকও করেছে কিন্তু একটু গুড়ের সরবৎ ছাড়া কিছুই খেতে রাজি হয় নি। তাঁদের বাড়িশুদ্ধ সকলে মিলে অনুরোধ করেছিলেন—একটু কিছু খাবার জন্যে। কিন্তু ঐন্দ্রিলা এক কথাতে সমস্ত অনুরোধ এড়িয়ে গেছে, 'খাব তো নিশ্চয়, এত খেয়েও যখন পোড়া পেটের খিদে মেটে নি, তখন খেতে তো হবেই। কিন্তু আজ সত্যিই মুখে রুচবে না মা কিছু। আমার বড়সাধের সন্তান, ওর মুখ চেয়েই সব দুঃখ ভুলেছিলুম এতদিন, সেই মেয়ে আজ ঐ হেঁপোরুগী বুড়োর পাশে শুয়ে ফুলশয্যা করছে—তা জেনে আর এ গলা দিয়ে কিছু নামবে না। এ অনুরোধ করবেন না আপনারা।'

অগত্যা তাঁদের চুপ করে যেতে হয়েছে। সারারাত বসে কেঁদেছে ঐন্দ্রিলা সেদিন—দুটি চোখের পাতা বুজতে পারে নি এক মুহূর্তের জন্যেও। শেষ পর্যন্ত সে ভেবেছিল মেয়েকে জোর করে নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু যে ভদ্রমহিলা ওকে টেনে এনেছিলেন তাঁদের বাড়ির সকলেই বারণ করলেন, এ কাজ করতে। গিন্নি বললেন, 'দ্যাখ্ মা—তুই আমার মেয়ের বয়িসী, তুই-তোকারি করছি কিছু মনে করিস নি।—যা হয়ে গেছে তা আর কিছুতেই ফিরবে না। এ হিঁদুর বিয়ে, এতে তালাক দেওয়া নেই, তবু যতদিন আছে অদৃষ্টে—সোয়ামীর ঘর করে নিক। টেনে নিয়ে গিয়েই বা কী রাজ-ঐশ্বর্য তুই দিতে পারবি মা ওকে? আর তা দিলেও—খেতে পরতে না হয় দিলি—ভাতার তো দিতে পারবি না। তার চেয়ে যা হবার হোক, তুই চলে যা। বরাতে থাকলে ঐ ঘরই দীর্ঘদিন করতে পারবে। এই যে আমার সইয়ের মেয়ে প্রভা, তার বিয়ের আটদিনের মধ্যে জামাইয়ের যক্ষ্মাকাশ ধরা পড়ল—তবু প্রভা আমার দশ বছর ঘর ক'রে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়েই চলে গেল ড্যাং ড্যাং করে। আর তা যদি না-ই হয়, সে বরাত যদি না-ই ক'রে থাকে—মেয়েটা এখানে থাকলে, গোবেচারা ভালমানুষ কচি মেয়েটার দিকে চাইলে—ছেলে-বৌদের তবু মায়া পড়বে। ভবিষ্যতের কথাটা ভেবে দ্যাখ্। আর যতই হোক, এখনও না হয় তেমন সোমত্ত হয় নি, দুমাস পরেই হবে, তাকে সোয়ামীর ঘর ঘুচিয়ে কোথায় তুলবি বল? কতক্ষণ পাহারা দিবি? দিনরাত তো আর চোখে চোখে রাখতে পারবি নি। শেষে কি একটা কেলেঙ্কার বাধিয়ে বসবি! না না, ওসব মতলব ছাড়। যেমন একা এসেছিস একাই ফিরে যা।'

BanglaBook.org

মায়ের মতো—ওর নিজের মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ভদ্রমহিলার আন্তরিকতাপূর্ণ কথা ঐন্দ্রিলার বড় ভাল লাগল। বুঝলও সে। ওদিকে আর যাবার চেষ্টা না করে তাঁকে প্রণাম করে একাই ফিরল।

ওখান থেকে ফিরে সে ওদের সম্পর্কে এক নন্দাইয়ের কাছে গিয়েছিল মাকড়দায়। তিনি কিছুই জানতেন না, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বিশ্বাসই করতে চান নি প্রথমটায়। ঐন্দ্রিলা অনেক ক'রে দিব্যি গেলে বলতে তবে বিশ্বাস হ'ল তাঁর।

সে ভদ্রলোক নাকি এক বড় উকিলের মুহুরী। সেইজনেই গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে। কিন্তু তিনি বিশেষ আশাভরসা দিতে পারেন নি। বলেছেন এ ধরনের মামলা দাঁড় করানো শক্ত। টাকা খেয়ে কাকারা এ কাজ করেছে তার প্রমাণ কি? কোন লেখাপড়া তো নেই। হিন্দু বিয়ে নাকচ করাতে গেলে ঢের কাঠখড় পোড়াতে হবে। হাইকোর্টের এ ধারে কিছু হবে না। তাও, নাবালক মেয়ে ফুস্‌লে এনে বিয়ে দিয়েছে অভিভাবককে না জানিয়ে, প্রমাণ করতে প্রাণান্ত হবে। কারণ ঐ কাকাদের কাছে দীর্ঘকাল আছে, মাও এখানে আসা-যাওয়া করে—এটা প্রমাণ হয়ে যাবে সহজেই, সুতরাং ফোস্‌লানোর কেস টিকবে না, তাছাড়া লুকিয়েও দেয় নি। পাঁচটা আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণও করেছে। এ কেস হাইকোর্ট পর্যন্ত ঠেলতে অগাধ পয়সা খরচ হবে তাও ধোপে টিকবে কিনা সন্দেহ। আর—শেষ মোক্ষম কথা একটি বলেছেন তিনি—যদিই বা মামলা করে এবং জেতে—ঐ দাগী মেয়ে এনে আবার বিয়ে দিতে পারবে ঐন্দ্রিলা?

অর্থাৎ সর্বশেষ যেটুকু আশা মনে টিকিয়ে রেখেছিল—সেটুকুও আর রইল না।

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করতে সময় লাগল যথেষ্ট। এর মধ্যেই হেম এসে গেছে একসময়। আজকাল সে বড় একটা গোবিন্দদের বাড়িও যায় না—শনিবার ছাড়া, ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। আজ বরং একটু বেশি সকাল ক'রেই ফিরেছে। আগের ট্রেনটা পেয়ে গিয়েছিল। এসে নিঃশব্দেই ওর পিছনে বসে পড়েছে—অনর্থক কথা বলবার চেষ্টা করে নি। কাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি শুনেছে সে। বাকিটা অনুমান ক'রে নিতে আটকায় নি।

সে এবার আস্তে আস্তে—এই প্রথম প্রশ্ন করল, 'তোর শ্বশুরবাড়ি আর গেলি নি?' ঐন্দ্রিলা রাগ ক'রে সেবার চলে যাবার পর এই প্রথম কথা কইল সে ওর সঙ্গে।

ঘাড় নাড়ল ঐন্দ্রিলা। গিয়েছিল সে। কাল সেই নন্দাইয়ের বাড়ি কাটিয়ে আজ ভোরেই পৌঁচেছিল ওখানে। ইচ্ছে ক'রেই সে সময় গিয়েছিল। অফিস বেরোবার একটু আগে—সে সময়টা স্নান আহার করার কথা—হিসেব করে ঠিক সেই সময়টায়ই পৌঁচেছিল। কিন্তু সম্ভবত, দূর থেকে ওকে আসতে দেখেই ভোলা পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শিবু অতটা বুঝতে পারে নি, সে একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বুকের পাটাও বেশি। সে ঝেড়ে জবাব দিয়েছে। 'আমাদের কাছে রেখে গিয়েছিলে, আমরা যা ভাল বুঝেছি সেই মতো বে দিয়েছি।' টাকার কথাও সোজাসুজি অস্বীকার করেছে সে। বলেছে, 'মিথ্যে কথা। হয় তুমি বানিয়ে বলছ, নয় তো তোমার পাগলামি কাণ্ডকারখানা দেখে তারাই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে আরও ইচ্ছে করে। অত নগদ টাকা তার হাতে থাকলে আর ভাবনা ছিল না। তাছাড়া কী এমন ফেল্‌না পাত্তর। অত বিষয়সম্পত্তির যার তার কি মেয়ের অভাব হয়! দুপায়ে জড়ো করতে পারত সে। আর তোমার মেয়েই বা কী এমন রূপসী নুরজাহান যে তার জন্যে পয়সা লুটিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ—ঐ বিষয়সম্পত্তি দেখেই দিয়েছিলুম, সত্যি কথা। সে তোমার মেয়েরই জন্যে। সে-ই সুখে থাকবে বলে। তা সে যে সব ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে বসে আছে—কেমন ক'রে জানব বলো। তবে ও যা তোখড় লোক, ঠিক সব বাগিয়ে নেবে আবার। তোমার তো

BanglaBook.org

পয়সার জোর নেই এক কানাকড়িরও, ও বিয়ে না হ'লে কী বিয়ে দিতে তুমি? একটা কুলিকাবারি বিড়িওলা দেখে বিয়ে দিতে হ'ত। মাতাল নেশাখোর—এই জুটত শেষ পর্যন্ত। এ তো তবু নামকরা ভদ্দরলোক একটা—সাতখানা গাঁয়ের লোক চেনে। মেয়েও তোমার সুখে থাকবে দেখো। বুড়ো বয়সের বৌ, হাতের তেলোয় রাখবে। বলি আট বছরের মেয়ে দুগ্‌গা—শখ ক'রে বুড়ো শিবকে বিয়ে করেন নি?'

এইসব অবান্তর কথা বলে গেছে এলোপাতাড়ি। মুখ খোলবার অবকাশই পায় নি ঐন্দ্রিলা। অবশ্য তারপর আর দাঁড়াতে পারে নি বেশিক্ষণ। সে যখন মুখ ছুটিয়েছে-, শাপশাপান্ত শুরু করেছে—তখন অফিসের নাম ক'রে বেরিয়ে গেছে না খেয়েই। ভাত বাড়া ঘরের মধ্যে দেখেছে সে। কিন্তু ভাত খেয়ে যেতেও সাহসে কুলোয় নি শিবুর।

'আর তোর শাশুড়ী মাগী?' হেম জিজ্ঞাসা করলে।

'সে কি আর বেরোল নাকি? আমাকে দেখেই ঘরে খিল দিয়েছিল—সেই খিল দিয়েই বসে রইল। ক্যাঁট ক্যাঁট ক'রে যা মুখে এল শোনালুম। গাল দিলুম, মন্যি দিলুম—সব হজম করলে বসে বসে। শেষে শিবুর বৌটা এসে পায়ের ওপর আছ্‌ড়ে পড়ল, বলে, ও দিদি, চুপ কর দিদি, আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি ঘাট মানছি—দিদি, পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বাস করি—ওদের মুখের দিকে চাও একটু। ওরা তো কোন অপরাধ করে নি! ওর কান্না দেখেই চুপ করলুম। আর কীই বা করব, গাল দিলে কি আর মেয়ের বে ফিরবে? তাছাড়া, পাড়ার অনেকে ছুটে এসেছিল তো চেঁচামেচি শুনে, তারাও থামিয়ে দিলে—মজুমদার-গিন্নী জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল নিজের বাড়ি। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হ'ল। বুঝতেই তো পারছি, পয়সা খেয়ে ওরা যে-কালে এই কসাইয়ের কাজ করেছে, সে কালে গাল-মন্দ খাবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। ওতে কিছু হবে না। এখন কিসে একটা বিহিত হয়, তোমরা যুক্তিপরামর্শ ক'রে সেইটে বল। পুলিশে যাব একবার? ওদের নামে এই সব কথা যদি লিখিয়ে দিয়ে আসি? পুলিশ কিছু করবে না?'

অনেক আশা, অনেক আগ্রহ নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে ছোট বোন। তাকে নিরুৎসাহ করতে মন চায় না। তবু ঘাড় নাড়তেই হয় হেমকে।

'নাঃ!... ও তোর ননদাই যা বলেছে তাই ঠিক। আশা কম—আর লড়তে গেলেও বিস্তর টাকার খেলা। অর্থবল লোকবল দুই-ই চাই। আমাদের ও কোনটাই নেই। পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আমি তো আর কোন উপায় দেখি না।'

'কোন উপায় নেই? কী বলছ দাদা?' প্রশ্ন নয়—যেন আর্তনাদ করে ওঠে ঐন্দ্রিলা, 'তাহলে মেয়েটা ঐ ভাবে জ্যান্তে মরা হয়েই থাকবে চিরকাল? কোন বিহিত হবে না?'

চুপ করে থাকে হেম। কী বলবে, কী বোঝাবে ওকে!

প্রাণপণে কটি মুহূর্ত হতাশাকে ঠেকিয়ে রেখে শেষ বিন্দু আশা আঁকড়ে ধরে থাকে ঐন্দ্রিলা উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু দাদার নিরুত্তর স্তব্ধতায় সে আসা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে যায়।

আর একবার হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে। আর একবার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। এদের ওপর দোষারোপ করে, ওদের গালাগালি ও অভিসম্পাত দিতে থাকে, মেয়ের বৈধব্য কামনা করে। এ বিবাহিত জীবনের চেয়ে সে ভাল। না হয় মা মেয়ে একসঙ্গেই একাদশী করবে। সে ঢের ঢের ভাল। তারপর একসময় আবার দৈহিক শ্রান্তিতেই চুপ করে।

শান্তির মতো সান্ত্বনা আর নেই। বুঝে এরাও চুপ করে থাকে। ওর মিথ্যা অভিযোগেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করে না কেউ।

BanglaBook.org

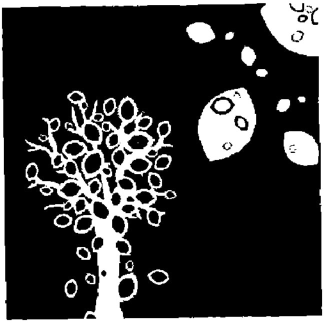

নবম পরিচ্ছেদ

এতবড় বাড়িতে বসে পড়বার মতো একটু জায়গা খুঁজে পায় না অরুণ। এটা তার কাজেও সময়ে সময়ে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু তবু কথাটা—তার কাছে অন্তত—মর্মান্তিকভাবেই সত্য। শুধু যে এ বাড়িতে কেউ পড়ে না তাই নয়—আর কাউকে পড়বার সুযোগ দিতেও প্রস্তুত নয়। এখানে যেন দিনরাতই হাট বসে আছে। হঠাৎ দূর থেকে এদের বাড়ির দিকে এলে মনে হয় কী কারণে দারুণ একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। এরা সাধারণ কথাও কয় চেঁচিয়ে। কর্তাদের যেমন গলাই শোনা যায় না—সকলেই আস্তে আস্তে কথা বলেন—ছেলেদের তেমনি ঠিক বিপরীত, তারা আস্তে কথা বলতেই পারে না; আর তাদের সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গিন্নীদেরও অভ্যাস হয়ে গেছে সর্বদা চিৎকার করে কথা বলা। তার ওপর এদের আড্ডা যা কিছু বেশির ভাগই বাড়িতে, ভায়ে ভায়ে। পাড়ার কোথাও এদের আড্ডা জমে না, তার কারণ এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে এমন বেকার খুঁজে পাওয়া কঠিন। লেখাপড়া করুক না করুক—ইস্কুল কলেজে যাওয়ার একটা ঠাট বজায় রাখে অন্য ছেলেরা। এরা সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ, তাই অবসরও এদের অখণ্ড।

এ ছাড়া আর এটা ব্যাপার আছে। পাড়ার অপর ছেলেরা কথাবার্তা কইলেও এদের একটু হীন চোখে দেখে। অন্তত অরুণের তাই অনুমান। সেটা এরাও খানিকটা বোঝে, সে কারণেও কতকটা আরও গৃহকেন্দ্রিক। আর সেই কারণেই অরুণের ওপরেও এদের একটা আক্রোশ। বোধ হয় মনে করে, শিক্ষানুরাগের এই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওদের নিরন্তর নিঃশব্দে ধিক্কার দিচ্ছে এবং অহরহ ঘরেবাইরে সকলের কাছে ছোট করে দিচ্ছে। অরুণ যে কখনও এ বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না—এমন কি ইস্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু একটা কারুর সঙ্গে মেশে না—প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও বাইরে থাকে না—সেটাও ওদের কাছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার বলে বোধ হয়।

সেইজন্যেই অনেক খুঁজে খুঁজে যদি বা একটি নিভৃত কোণ বার করে অরুণ—সেটা বেশিক্ষণ নিভৃত থাকে না। এদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা ওকে অনুসরণ করে, একটু পরেই সেখানে গিয়ে হাজির হ'তেও দেরি হয় না। এক খুব ভোরে উঠে বাগানের কোথাও গিয়ে বসলে খানিকটা সময় পাওয়া যায়—কারণ এদের রাতও হয় যেমন অনেক দেরিতে, তেমনি ভোরও সহজে হ'তে চায় না। অনাবশ্যক বসে বসে রাত জাগে বলে এধারেও উঠতে দেরি হয়। অরুণও সকাল করে শুতে পারে না এদের অত্যাচারে। তবু ওকে ভোরে উঠতেই হয়। কারণ দিনেরাতে এই যা একটু অবসর, ওদের ঘুম ভাঙ্গবার আগে পর্যন্ত। সে ওদের ঘুমের সময়টায় সারারাত জেগেও পড়তে প্রস্তুত ছিল—যদি আলোর একটা ব্যবস্থা থাকত। এ বাড়ির মেজকর্তা অর্থাৎ তার মেসোমশাই এতখানি তেল খরচ বরদাস্ত করবেন না, তা সে জানে।

BanglaBook.org

শুধু যদি চেঁচামেচি হট্টগোল হ'ত তাহলেও অতটা অসুবিধা হ'ত না। কারণ সাধারণ প্রতিকূল পরিবেশেও মন বসবার মতো পাঠে আসক্তি যথেষ্ট ছিল ওর। কিন্তু এদের আক্রমণটা যে শুধু পরোক্ষ নয়—অনেকখানি প্রত্যক্ষও। ওকে পড়তে বসতে দেখলেই এরা নানারকম অত্যাচার শুরু করে দেয়। ঠাট্টা বিদ্রূপ টিট্‌কিরির ঝড় বইতে থাকে। ওর কানের কাছে এসে হয়ত চিৎকার করে বলে ওঠে একজন, 'ওগো তোমরা কেউ এখানে কথা কয়ো নি গো কথা কয়ো নি, দুটি ঠোঁট ফাঁক করো নি। বেদব্যাসের ধ্যান ভেঙ্গে যাবে, খুব সাবধান।'

আর একজন হয়ত অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো তোলে, 'চেঁচাস কেন ছোঁড়া—তোর চিচ্‌কারে বিদ্যের জাহাজ ফুটো হয়ে যাবে যে।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে প'ড়ে হয়ত একজন বললে, 'দূর—চিচ্‌কারে নাকি আবার জাহাজ ফুটো হয়।' আগের লোক আরও চেঁচিয়ে হাত পা নেড়ে জবাব দিলে,—'একি তোর নোহার জাহাজ যে ফুটো করতে কামান বন্দুক চাই—এ বিদ্যের জাহাজ, চিচ্‌কারেই ফুটো হয়ে যায়।'

কেউ হয়ত আবার ওর চোখ এবং খোলা বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় জোড়হস্ত এগিয়ে দিয়ে—যাতে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে—বলে, 'ওগো বিদ্যাসাগর মশাই, তোমার বিদ্যে থেকে একটু ভাগ দেবে আমাকে? দাও না ভাই, একটা পেরেক-টেরেক মেরে মগজে ঢুক্যে—একটুখানি বিদ্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে হয়ত প্রচণ্ড ধমক এসে পড়ে, 'না না, তোমরা অমন করে ওর পিছনে লেগো নি। মেজকাকা জানতে পারলে দেক্যে দেবে মজা। ও বলে লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজেস্টার হবে—গোরুর গাড়ি বোঝাই করে ছালাছালা টাকা এনে দেবে মেজ কাকাকে—!' ইত্যাদি ইত্যাদি—চারিদিক থেকে চলবে এই সপ্তরথীর আক্রমণ।

প্রথম প্রথম একটু আধটু প্রতিকার বা প্রতিবাদের ক্ষীণ চেষ্টা করত অরুণ। যুক্তি দিয়ে, যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে,—কখনও বা অনুনয়-বিনয় করে ওদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করত সে। কিন্তু একেবারেই সে সব চেষ্টা বৃথা দেখে ক্রমশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। এ তার শক্তির বাইরে। জ্ঞান হবার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একান্ত দুর্দশায় ও পরানুগ্রহে কাটাবার ফলে ওর মনের মেরুদণ্ডই গেছে ভেঙ্গে। কোথাও কোন কারণে সামান্যমাত্র অধিকার কায়েম করা—এমন কি দাবি করারও শক্তি নেই আর। ওদের এইসব টিট্‌কিরির যোগ্য উত্তর মনে এলেও মুখ ফুটে তা প্রকাশ করতে পারে না। বিনা কারণেই সকলের কাছে সর্বদা যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই এদের অর্থ অর্থহীন আক্রোশ এবং ইতর ব্যবহারের কোনরকম প্রতিরোধ করার কথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, মাটির দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে বসে থাকা শুধু। খুব অসহ্য হ'লে একবার হয়ত চোখ তুলে অসহায়ভাবে করুণ মিনতির দৃষ্টিতে চায়—কিন্তু সে চাহনির অর্থ অপাত্রে প'ড়ে আরও নিষ্ঠুর কৌতুকেরই সৃষ্টি করে, ফল কিছু হয় না।

শুধু একটা দিকে কিছু শক্তি তার এখনও প্রকাশ পায়—সেটা আত্মদমনের ক্ষেত্রে। নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই চোখের জলটাকেও সে শাসন করতে পারে এখনও। ক্ষোভে দুঃখে—প্রতিকারহীন অবিচারে যখন তার বুক ভেঙ্গে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় তখন—তার এই অবস্থার একমাত্র সান্ত্বনা যে অশ্রুকে সে প্রাণপণ চেষ্টায় ফিরিয়েই দেয়—বাইরে তার একটি বিন্দুও প্রকাশ পায় না। এদের অকরুণ বিদ্রূপ-দৃষ্টির সামনে সে জল যে এতটুকু সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারবে না—বরং নবতর অত্যাচারেরই ইন্ধন যোগাবে তা সে জানে।

প্রতিকার যাঁরা করতে পারতেন—কর্তা বা গিন্নীরা—তাঁদের গোচরে এটা—অন্তত এতটা—কখনই হয় না। মুখ ফুটে এসব কথা তাদের কাছে গিয়ে বলা বা নালিশ করা অরুণের সাধ্যের বাইরে। তাই তাঁরা কেউ জানতেও পারেন না। এক কিছুটা জানে

BanglaBook.org

মহাশ্বেতা—তাও সবটা নয়। এতটা জানলে হয়ত সেও প্রতিবাদ করত। তার স্বভাবত স্নেহপ্রবণ মন এতখানি বরদাস্ত করতে পারত না। সবটা জানে না বলেই বরং মনে মনে সে একটু উৎফুল্ল হয়। কারণ ওরও একটা অব্যক্ত নালিশ আছে অরুণ সম্বন্ধে। ওর ছেলেদের যে আদৌ লেখাপড়া হ'ল না, সেজন্যে বিচিত্র মানসিক কারণে অরুণকেই দায়ী মনে হয় তার। তারও মনে হয়, অরুণের এই বিদ্যানুরাগটা অহরহ তার ছেলেদের মূর্খতাকে ধিক্কার দিচ্ছে আর সকলের কাছে ছোট ক'রে দিচ্ছে তাদের।

অরুণ যদি তার নিজের মাসীকেও এটা জানাতে পারত কি তার কাছে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করত তাহলে কি ফল হ'ত তা বলা কঠিন। কিন্তু একেবারেই চুপ করে থাকার ফলে প্রতিকার কি প্রতিবিধানের কোন আশাই থাকে না। এক সময় তার এতদিনের এত-ঘা-খাওয়া মনও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। মনে হয় সে বুঝি পৃথিবীতে আসার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে দু-হাত ভরে শুধু অন্ধকারের অভিশাপই চেয়ে এনেছে এ জন্মের পাথেয়—তার জীবনে তাই আলোকের আশীর্বাদ কখনই নামবে না।

তবু, ওর এই বর্তমান জীবনের আদি-অন্তহীন অন্ধকারে একটি স্বর্ণালোক-রেখা ছিল বৈকি।

আলোক-রেখা না বলে হয়ত তাকে আলোকদূতী বলাই উচিত। অন্তত অরুণের তাই মনে হয় মাঝে মাঝে। নিঃসীম অন্ধকারে সে যেন আলোকশিখা বয়ে এনে হাজির হয়। আর আসে সে আপনা থেকেই, না ডাকতে।

সে হ'ল বুঁচি—মহাশ্বেতার মেয়ে স্বর্ণলতা।

সেই প্রথম দিনটি থেকেই সে ওর সহায়। ওর বন্ধু।

সে-ই মেজকাকীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছে, সেই মেজকাকাকে দিয়ে ওর পড়ার বই আনিয়ে দিয়েছে। দিনকতক তাকেও লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিল অরুণ, বই খাতা সুদ্ধ টেনে বসাত রোজ—কিন্তু বেশিদিন সে চেষ্টা ওর ধাতে সয় নি। দিনকতক পরে হাঁপিয়ে উঠেছে, বলেছে, 'না বাপু, রক্ষে করো এ আমার দ্বারা হবে না। মা সরস্বতী কি সকলের সয়? সয় না। পড়তে গেলেই মাথার মধ্যে সব যেন গুইলে যায়। তার চেয়ে আমার হাঁড়িবেড়িই ভাল। তুমি আর এ চেষ্টা করো নি। মিছিমিছি তোমার সময় অপ্‌চ আমাদের বংশে লেখাপড়ার পাট নেই, তুমি চেষ্টা করলে কি হবে বলে! বলি, হ'লে তো আমার ভেয়েদেরই আগে হবার কথা গা? ওরা তো বেটেছেলে। তা ওদেরই কি হ'ল?'

সত্যি-সত্যিই, হাঁড়ি-বেড়ি নিয়েই থাকতে ভালবাসে সে। আর সে-ই হয়েছে অরুণের মুশ্‌কিল। রান্নাঘরের বাইরে কোথাও তার টিকি দেখা যায় না। কদাচিৎ এঘর-ওঘর আসা-যাওয়ার পথে হঠাৎ যদি নজরে পড়ে যায় তার ভাইদের কাণ্ড—তখনই ছুটে আসে সে। চোখমুখ গরম করে ভুরু কুঁচকে গুরুজনদের মতোই তিরস্কার করে, 'আবার তোমরা ওর পেছনে লেগেছ? লজ্জা করে না তোমাদের! নিজেদের সবকটি ন্যাজই তো কেটে বসে আছে, এখন ওরটা না কাটতে পারলে মুখ্‌খুর খাতায় নামটা না তুলতে পারলে—বুঝি মনটায় সোয়াস্তি হচ্ছে না। কেন, কী জন্যে এখানে এসেছ তোমরা—কি দরকার? সরে পড়ো, সরে পড়ো বলছি সব—সোজা ঐ পগারধারে গিয়ে বসে থাকো, তোমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করার মতো ভাম-ভোদড় বেস্তর মেলবে!'

রাগ হবারই কথা, হয়ও। যদি কাছাকাছি শ্রুতিসীমার মধ্যে মেজকাকা বা মেজকাকী না থাকে তো সাহস করে কেউ বলেও বসে, 'দ্যাখ, মুখ সামলে কথা বলবি বলে দিচ্ছি। বেশ করেছি এখানে এয়েছি। আমাদের খুশি এখানে এয়েছি। আমাদের খুশি এখানে থাকব। কী হয়েছে কি তাতে? ইঃ—উনি লেখা-পড়া করবেন বলে আমরা সবাই দিনরাত মুখে গো দিয়ে থাকব—না? ভারী আমার এলে-বিয়ে পাসের পড়া পড়ছেন রে।'

BanglaBook.org

'বলি এলে-বিয়ে না হয় না'ই হল—ও যে টুকুন পড়ছে তাও তো তোমাদের কারুর সাধ্যিতে কুলোল না। লেখাপড়ার মহিমে তোমরা কি বুঝবে—গো-মুখ্খুর দল!'

'দ্যাখ বুঁচি—,' কেউ হয়ত জোর করে একটু ধমকের সুর গলায় আনবার চেষ্টা করত কিন্তু সূচনাতেই তার সে প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটিয়ে হাত-পা নেড়ে চোখমুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বুঁচি উত্তর দিত, হ্যাঁ—দেখেছি দেখেছি, খুব দেখেছি। যাও না মেজকাকাকে গিয়ে বল না যে তোমাদের আমি গোমুখ্খু বলেছি—জবাবটা সে ব্যক্তি কি দেয় শুনে এসো না। যাবে? দ্যাখো—যদি একা যেতে ভরসায় না কুলোয় তো না হয় আমার সঙ্গেই চলো, আমি নে যাচ্ছি।'

তারপরই আবার ভ্রু কুঁচকে দস্তুরমতো ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে বলত, 'কী তোমরা ভালয় ভালয় যাবে এখান থেকে—না আমিই গিয়ে মেজকাকাকে বলব?'

এর পর আর কারুরই সাহস হ'ত না সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। যেন কিছুই হয় নি, যেন তাদের ভয় পাবার কোন কারণই নেই, বুঁচির কথাটা তারা কানেও তোলে নি ভাল করে—মুখের ওপর প্রাণপণে 'এমনি একটা নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনতা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে করতে একে একে তারা সবাই সরে পড়ত। তারা নিজেদের মর্জিমতোই যাচ্ছে যেন—অপর কারও হুকুমে নয়, এইটেই প্রতিপন্ন করতে চাইত তারা; কিন্তু পিছনে স্বর্ণের সবিদ্রূপ হাসি তাদের আত্মসম্মানের সেই আশ্রয়টুকুও রাখতে দিত না শেষ পর্যন্ত।

আর ওর ঐ আশ্চর্য শক্তি দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকত না অরুণের।

ঐ অতোটুকু মেয়ে—বয়সের তুলনাতেও অনেক ছোট দেখায় ওকে—কিন্তু কী অনায়াসেই না এদের শাসন করে সে—এই অর্ধ বর্বর বড় বড় ভাইদের! কোথা থেকে এই শক্তি এই গাম্ভীর্য আসে ওর?

ওরা সবাই চলে গেলে বহুক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবত সে বসে বসে।

অবশ্য ঠিক তখনই সময় মিলত না কোন কিছু ভাববার।

ওরা চলে গেলে অরুণকে নিয়ে পড়ত স্বর্ণ।

'আচ্ছা, তুমি কী বলো তো? বিধাতা কী দিয়ে গড়েছেন? এতটুকু হায়াপিত্তি বলে কিছু থাকতে নেই তোমার? ঠায় বসে বসে এই বাঁদরামো সহ্যি করো কি করে? একটু বলতে পারো না ওদের, একটু চোখ রাঙাতে পারো না?'

ওকে দেখলেই—কে জানে কেন—অরুণ যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠত, তার চিরদিনের বোবামুখেও হাসি ফুটত। হয়ত হেসে বলত, 'চোখ রাঙানো কি সব চোখে মানায়? ওর জন্যে ভগবান আলাদা রকমের চোখ দিয়ে পাঠান যে!'

কপট ক্রোধে চোখ মুখ রাঙা করে উত্তর দিত বুঁচি, 'কেন বলো তো যখন-তখন আমার কটা চোখের খোঁটা দাও। বেশ বেশ! আমার চোখ কটা আছে আমারই আছে—তোমার তাতে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ হয়ে পড়ত অরুণ। সত্যিই বুঁচির যেমন মেমেদের মতো সাদা রঙ, তেমনি তাদের মতোই কটা চোখ। কিন্তু অত ভেবে কিছু বলে নি অরুণ, কটা চোখের কথা মনেও ছিল না তার। থাকলে কখনই বলত না। আসলে স্বর্ণের চেহারা নিয়ে কোন দিনই মাথা ঘামায় নি সে। ওর মুখচোখ কেমন তা বোধহয় খুঁটিয়ে দেখেও নি।

ঘাড় হেঁট ক'রে তাড়াতাড়ি জবাব দিত, 'না-না—বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি সে ভাবে কথাটা বলি নি। তুমি কিছু মনে করো না। আর কোন দিন বলব না তোমার চোখের কথা!'

গম্ভীরভাবে বুঁচি বলত, 'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। আর কোনদিন বলো নি।'

তারপরই—অরুণকে চমকিত ও চমৎকৃত ক'রে উচ্ছ্বসিত হাসিতে লুটিয়ে পড়ত সে, 'ধন্যি, বাবা ধন্যি। ধন্যি ছেলে বটে তুমি যা হোক! বেটাছেলে মানুষ, একটুতে এমন

BanglaBook.org

আউতে পড় কেন? কটা চোখকে কটা বলে ঠাট্টা করলেই বা দোষ কি? সকলেই তো করে! বেশ করেছি বলেছি—এ বাক্যি কি তোমার মুখে বেরোয় না?'

সে হাসি সংক্রামক রোগের মতোই অরুণের মনেও সঞ্চারিত হয়। সেও হাসে। অল্প-অল্প, অপ্রতিভের হাসি। সুখের হাসিও। স্বর্ণের এ কথা তার মনে কোন বেদনাবোধ জাগায় না, কোন গ্লানি আনে না। বরং একটা আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনার, একটা আশ্বাসের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় যেন ওর মনের সুগভীর ক্ষতগুলোয়। মনে হয় কোন কঠিন রোগ-ভোগের পর যেন বলকারক পথ্য লাভ করেছে সে, সঞ্জীবনী সালসা সেবন করেছে।

অবশ্য কথা সে বলতে পারে না কিছু! এসব কথা জানাবার শক্তি বা সাহস তার কাছে কল্পনাতীত। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু স্বর্ণেরই বা দাঁড়িয়ে তার কথা আদায় করার অবসর কই। সে যেমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে আসে, তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবেই চলে যায়।

আর সে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ভাবে অরুণ, মেয়েটাকে যদি একটু লেখা-পড়া শেখানো যেত তো বেশ হ'ত। কত কী জানবার আছে পৃথিবীতে, কত কী শেখবার আছে—তার কোন খবরই রাখল না। শুধু হাঁড়ি-বেড়ি আর সংসারের কাজে কী যে রস পায় ও।

॥ ২ ॥

এত টাকার মুখ মহাশ্বেতা কখনও দেখেনি তার জীবনে। এক টাকায় দু আনা সুদ পাওয়া যায় তাও কখনও শোনে নি। তার মা টাকা ধার দেয় সে জানে-টাকায় এক পয়সা সুদ মেলে। তাও একশ কি পঞ্চাশ হ'লে শতকরা এক টাকার হিসেব। একেবারে শুধু হাতে দিলে সেইটেই বড় জোর দেড় টাকায় ওঠে। কিন্তু এক মাসে একশ টাকায় সাড়ে বারো টাকা সুদ—কখনও কখনও সুযোগ-মতো পনেরোও আদায় ক'রে দেয় অভয়পদ—'এ যে গল্প কথা একেবারে। বাবা, এ যে একরাশ টাকা। একটা বাবুর মাইনে বলতে গেলে।... হ্যাঁ গা, সত্যি টাকা তো এসব—নাকি মেকী? বলি জালটাল নয়?'

অভয়পদ গম্ভীরভাবে বলে, 'বাজিয়ে দ্যাখো না, কাঁসার টাকা বলে কি মনে হচ্ছে?

'কে জানে বাপু। সন্দ হয় যেন। মড়ারা এত টাকা পায় কোথা থেকে? এ তো কুবেরের ঐশ্বয্যি!'

সত্যিই তার বিশ্বাস হ'তে চায় না ব্যাপারটা। টাকা হাতে পেলেও না। মাঝে মাঝে অকারণেই নাড়া-চাড়া করে, বার করে গুণে দেখে। দুশো টাকা এনেছিল সে মার কাছ থেকে, পাঁচ-সাত মাসেই বেড়ে সেটা প্রায় ডবল হয়েছে। এ কী সহজ কথা!

তবে টাকাটা হাতে থাকে না বেশি দিন এটা সত্যি। মাসের শেষে ধার দেয়—দশ বারো দিন থাকতে—আবার মাসকাবারে ফেরৎ পায়। মাঝের কটা দিন মাত্র নাড়তে চাড়তে পায় সে। তা তার জন্যে দুঃখ নেই ওর, টাকা খাটাই তো লক্ষ্মী, বসে থাকলে আর তার দাম কি? বলি বাক্সে তুলে রাখলে ষোল বছরেও তো একটা পয়সা বাড়বে না! (এ কথা সবই অবশ্য অভয়পদর মুখে শোনা—তবে এ যে 'লেহ্য' কথা তা সেও বোঝে।)

সব মাস-কাবারে সব টাকা ফেরৎ পায় না। তা না পাক, পরের মাস-কাবারে ডবল সুদ পাবে তা সে জানে। সেদিকে মিন্‌সে খুব হুঁশিয়ার আছে—গলায় জোল দিয়ে আদায় করে। সুদটা ঠিকমতো পেলেই হ'ল। সুদের জন্যেই তো টাকা খাটানো। না-ই বা পেলে হাতে সব মাসে। সে তো বাড়ছে সেখানে।

আজকাল অনেক শিখেছে সে, এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান হয়েছে। সুদ পড়ে থাকলে তারও সুদ পাওয়া যায়—এ সে জানত না। এটা বলেছে মেজগিন্নী। মেজগিন্নী অনেক জানে সত্যি। কে জানে হয়ত বা মেজগিন্নী নিজেও এ কারবার করে লুকিয়ে। হয়ত মেজকর্তাই

BanglaBook.org

খাটিয়ে দেয় টাকাটা, ওদের কাছে সাধু সেজে থাকে। ওদের টাকা সুদে খাটলে যদি বেড়ে যায় অনেক, ফুলে-ফেঁপে যদি বড়লোক হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা—সে কি সহ্য হয়? সেই ভয়েই হয়ত দাদাকে অত সাধু-উপদেশ দিয়ে আটকাতে চেয়েছিল। সব পারে ওরা, কর্তাগিন্নীর অসাধ্য কিছু নেই। নিশ্চয়ই তাই। ভেতরে ভেতরে নিজেরাও ঐ কাজই করছে—মেজগিন্নীর বুকপোঁতা করছে শুধু। নইলে এত কথা জানল কী করে?

শুধু কী তাই। আবার নাকি কি কী চটায় আর কিস্তিতে টাকা ধার দেয় বাজারে, তাও জানে মেজবৌ। বলে, 'ও দিদি, অমন ক'রে বটঠাকুরের হাততোলায় থাকার দরকার কি, টাকা খাটাতে চাও তো বাজারে খাটাও না, মোটা লাভ।'

'সে আবার কি লো? বাজারে খাটাব কি? সে আবার কী ক'রে খাটাতে হয়?'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বেশ উৎসুকভাবেই জিজ্ঞাসা করে মহাশ্বেতা।

'সে তো খুব সোজা গো। ধরো যার কাছ থেকে মাছ কেনা হয়—তাকে দশ টাকা ধার দিলে, পরের দিন থেকে একশ' দিন পর্যন্ত রোজ সে তোমাকে দশ পয়সা ক'রে আদায় দিয়ে যাবে। মোটা সুদও পেলে, আবার সুদ ছাড়া কোন্ না মাঝে মাঝে কিছু মাছও আদায় হবে মাগ্‌না!'

'অ। তা সে কত ক'রে পোষাল তাহলে?'

আরও উৎসুক, আরও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা। প্রাণপণে হিসাবটা মাথায় আনবার চেষ্টা করে।

'বাবা এত হিসেব বুঝছ আজকাল! বলে কত ক'রে পোষাল! দিদি আর সে মনিষ্যি নেই!

'নে বাপু, তোর রঙ্গ রাখ। যা বলছিলি তাই বল।'

'বলি এত কারবার করছ, এ সোজা হিসেবটা বুঝতে পারলে না? এক টাকায় তো চৌষট্টি পয়সা গো? চৌষট্টি পয়সা ধার দিয়ে সে জায়গায় পাচ্ছ একশ' পয়সা। এক টাকা ন' আনা। তাহলে একটাকায় ন আনা পেলে। অনেক লাভ।'

'তেমনি তো একশ' দিন ধরে চলবে লো! সে তো তিন মাসের বেশি হয়ে গেল তা'হলে। সে আর এমন কি?'

'বাব্‌বা, তুমি তার চেয়েও বেশি চাও। তোমার খাঁই তো কম নয়। আরও বেশি পাও বুঝি? তা'হলে তুমি তো টাকার কুমির হয়ে পড়বে গো!'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! তা'হলে আর ভাবনা ছিল না। লাভ তো কত।... কী যে বলিস!'

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেবার চেষ্টা করে। আরও গোলমাল হয়ে যায়, আরও উলটো-পালটা বলে ফেলে। নিজেও বুঝতে পারে সে কথাটা। অনুতাপের সীমা থাকে না। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই মনে মনে নিজের কান মলে। কেনই যে এসব কথা তোলে সে, আর কেনই বা হাটিপাটি পেড়ে এ-সব সুদে খাটানোর কথা বলতে যায়! পেটে যে কেন কথা থাকে না তার—তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

এত ঠকে তবু তার লজ্জা নেই! ছি, ছি!

মনে মনে বার বার নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে মহাশ্বেতা।

যে কোন কথাই মাথায় ঢুকতে দেরি হয় মহাশ্বেতার, কিন্তু তেমনি একবার ঢুকলেও সহজে আর বেরোতে চায় না। টাকায় টাকা বাড়ে—এই কথাটা মাথায় ঢোকবার পর সে প্রাণপণে মূলধন বাড়ানোর কথাই চিন্তা করে আজকাল। মার কাছ থেকে আর এক খেপ টাকা এনেছে সে। কদিন পরে আরও একবার গিয়েছিল কিন্তু শ্যামা কিছু দেন নি। হাঁকিয়ে দিয়েছেন সোজাসুজি।

BanglaBook.org

'টাকা কি আমার কাছে বসে থাকে? এখন টাকা নেই, যা!'

'তা তুমি যে আমার টাকা খাটাও তা তো বলো নি বাপু এতদিন!' অপ্রসন্ন মুখে বলে মহাশ্বেতা।

ঠিক এই ভয়ই করেছিলেন শ্যামা। এর পর সুদের কথা উঠবে, হিসেব চেয়ে বসবে হয়ত। তিনি প্রস্তুতও ছিলেন সে জন্যে। বললেন, 'সব সময় কি আর খাটাই। এক-আধবার তেমন লোক এসে পড়লে দিতে হয় বৈকি। আর তুমি তো কিছু বারণও ক'রে দাও নি তোমার টাকা খাটাতে। এমন হুট ক'রে চেয়ে বসতে পারো তাও বলো নি টাকা রাখবার সময়। তা'হলে আমি তোমার টাকা রাখতুমই না।'

'না, তা নয়।' মহাশ্বেতা বেশ একটু দমে যায় মায়ের কণ্ঠস্বরে। তাড়াতাড়ি বলে, 'তা নয়—তবে টাকা খাটালে আমার একটা সুদও পাওনা হয় তো।'

'হয় বৈকি। হবেও পাওনা। আমি তো তোমার ভাগের সুদ দোব না এমন কথা কখনও বলি নি। যা দু'চার পয়সা পাওনা হয় তা নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু সে একটা হাতি-ঘোড়া কিছু হবে না। সে পিত্যেশ ক'রো না। কটাই বা টাকা, সব সময়ে তো খাটাইও না তোমার টাকা। তা'হলে আর চাইবা-মাত্র দিলুম কী ক'রে? দৈবে-সৈবে তেমন কেউ এলে তবেই দিই। আর তুমি তো নিয়েও গেলে বার করে চারশ' টাকা। আর কি নশ' পাঁচশ; আছেই বা?'

'তবেই তো বললে ভাল। বেশ গাইলে। তুমি তো যা সুদ দেবে তা বুঝতেই পারছি, মাঝখান থেকে আমারই লোকসান। একশ' টাকা আমার কাছে ছ মাস খাটলে দুশ' টাকা হয়ে যেত।'

'দ্যাখ—,' শ্যামা বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলেন, 'অত বাড়াবাড়ি কোন জিনিসেরই ভাল নয়। যা রয় সয় তা-ই ভাল। অত সুদ যে দেয় তার কখনও টাকা শোধ করবার মতলব নেই। সে একদিন সবসুদ্ধ ভরাডুবি করবে। তোর চেয়ে মাথা-ওলা লোক ঢের আছে সংসারে। এতই যদি সহজ হ'ত ব্যাপারটা তা হ'লে সবাই গিয়ে টাকা ঢেলে দিত। আর এত সুদ তা'হলে তারা দেবেই বা কেন? যা পিটে নিয়েছিস, নিয়েছিস—এইবার হাত গুটো। ঐ কটা টাকাই থাক, তাতেই ঢের।'

'হ্যাঁ, তা আর নয়। সব সুদ্ধ এনে তোমাকে ধরে দিই, কবে কে দশ টাকা ধার নিয়ে এক পয়সা সুদ দেবে সেই পিত্যেশে। তোমাদের জামাই নিজে হাতে ক'রে নে যাচ্ছে। বলি সে মানুষটা তো আর বোকা নয়। যাকে দিচ্ছে বুঝে-সুঝেই দিচ্ছে। তেমন কোন সন্দ থাকলে এক পয়সা বার করত না সে। আর এত-সুদই বা কিসের? কী এমন দিচ্ছে শুনি। দারোয়ানদের কাছ থেকে নিত—তাদের সুদ কি কম? আরও ঢের বেশি। টাকায় তিন চার আনা আদায় করে তারা। ওরা কি আর আমাদের মতো, যে এক পয়সায় মরে বাঁচে। ওরা হ'ল গে সায়েব বাচ্ছা—ওদের কাছে ও দু আনা এক আনার দাম কি?'

এই বলে—যেন খুব বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলেছে, বলতে পেরেছে—এইভাবে চারিদিকে সগর্বে চেয়ে নেয় একবার। কিন্তু তার সে বিজয়গর্বের উত্তাপ বেশিক্ষণ ভোগ করা যায় না। শ্যামা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন একেবারে।

'আছে বৈকি মা—খুবই দাম আছে। নইলে এত ছিষ্টি ক'রে তোদের মতো দীন-দুঃখীর কাছ থেকে হাত পেতে ধার নিত না—এই কটা সামান্য টাকা।'

শ্যামা বিরক্ত মুখে চুপ ক'রে যান। তাঁর আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হয় না। এর সঙ্গে তর্ক ক'রেই বা লাভ কি?

মহাশ্বেতাও বেজার মুখে বসে থাকে চুপ করে। তার পছন্দ হয় না কথাটা— তা বলাই বাহুল্য। তার চেয়েও বড় কথা, স্বামীকে সে জাঁক্ ক'রে ব'লে এসেছে— দুশ' টাকা আজই

BanglaBook.org

এনে দেবে, যেমন ক'রেই হোক। অথচ সে টাকার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না, অন্য কোথাও অন্য কোনভাবে হবে—এমন আশাও নেই। এতগুলো টাকা কেউ তাকে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ওপর কিম্বা মোটা সুদের প্রতিশ্রুতির ওপর ধার দেবে না—তা সে জানে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তেমনি অন্ধকারপানা মুখ ক'রেই উঠে গিয়েছিল, যাবার সময় একটা বিদায়সম্ভাষণ পর্যন্ত জানায় নি :

কিন্তু তাই বলে যে এমন বাড়াবাড়ি কাণ্ড করবে সে, তা শ্যামা একবারও ভাবে নি। বিশ্বাসই করতে চান নি কথাটা—যখন চট্‌খণ্ডীদের গিন্নী এসে জানালেন যে মহাশ্বেতা গহনা বন্ধক রেখে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করতে এসেছিল—তিনি দিতে পারেন নি বলে মল্লিকদের কাছে গেছে তাঁর ওখান থেকে; সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে তা তিনি বলতে পারবেন না অবশ্য—তবে টাকার জন্যে যে সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই—এবং বেশ মোটা টাকাই দরকার তার।

চট্‌খণ্ডী-গিন্নী নিজে এসেই খবরটি দিয়ে গেলেন। বড়-একটা এঁদের বাড়ি আসেন না তিনি, দরকার পড়লে শ্যামা নিজেই যান। এতকাল পরে বাড়ি বয়ে এসে তিনি কিছু আর মিছে কথা বলে যাবেন না, সে রকম লোকই নন। তিনি এসেছেন নিছক কৌতূহলবশতঃই। মহাশ্বেতাদের অবস্থা ভাল তা এ অঞ্চলের সবাই জেনেছে এতদিনে, অন্তত 'হন্যে হয়ে' টাকা ধার ক'রে বেড়াবার মতো অবস্থা তাদের নয়। তবে সে কী উদ্দেশ্যে কোন্ প্রয়োজনে টাকা ধার করতে এসেছে—সেইটেই জানতে চান তিনি। বিশেষত তার মাও যখন আজকাল বন্ধকী কারবার করেন তখন পরের কাছে যেতে হ'ল কেন? মাকে গোপন ক'রে সে কোথাও টাকা খাটাতে চায়, না মায়ের কাছ থেকে যা নেওয়া সম্ভব তা সব নেওয়া হয়ে গেছে বলেই বাইরে বেরোতে হয়েছে?

আসলে তাঁদের অজ্ঞাত বৃহত্তর কোন লাভের পথে এরা যাচ্ছে কিনা মায়ে-বেটিতে সেটা না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি।

কিন্তু তাঁর কৌতূহল কিছুই মেটাতে পারেন না শ্যামা। কারণ সত্যিই এ খবরটা তাঁর কাছে একেবারে নূতন। অনেক জেরা ক'রেও তাঁর পেট থেকে কোন খবর বার করতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়েই চলে গেলেন চট্‌খণ্ডী-গিন্নী। শ্যামা যে একেবারেই কোন খবর রাখেন না—এটা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন।

শ্যামা অবশ্য তাঁকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টাও করেন না বিশেষ। আসলে তখন কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না ওঁর। নানারকম সংশয় ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মনে। বহু রকমের দুর্ভাবনা। মেয়েটা ওঁর বড়ই বোকা। এতটুকু সাংসারিক জ্ঞান নেই। এধরনের মানুষ যখন আবার মাথা খেলিয়ে বুদ্ধিমানের মতো কোন কাজ করতে যায় তখনই বিপদের কথা হয়। সকলের কাছে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে, নয় তো নিজের সর্বনাশ নিজেই ক'রে বসে। কী করছে সে, গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার করছে সে কিসের জন্যে, কার জন্যে?

যদি ঐ টাকা দিয়ে বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি কেনে তো ওঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। বিষয়ের দাম কমতে পারে—একেবারে মূলে হা-ভাত হয় না। কিন্তু সুদের নেশায় পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে ধার করে অপরকে ধার দিচ্ছে না তো? তা'হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। মেয়েটা না হয় চিরকালের পাগল, জামাইও কি পাগল হয়ে গেল ওর সঙ্গে সঙ্গে? নাকি ও তাকে লুকিয়েই এ কাজ করছে? কিছু বিশ্বাস নেই, সব পারে ও। বুদ্ধি যে পথে যায় সে পথের ফুটপাথ মাড়ায় নি কখনও।...

অথচ বোকা-সোকা পাগল যা-ই হোক—এই একটি মেয়েই তাঁর জীবনে যা কিছু আশ্বাস বহন করে। শুধু যে ওর স্বামীর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন শ্যামা তাই নয়—ও যে সুখী, ও যে নিশ্চিন্ত—এইটুকুই তাঁর যেন মস্ত একটা ভরসা,-এই দিক্-দিশাহীন অন্ধকার জীবনে একমাত্র আলোক-অবলম্বন। শেষে এই সামান্য আলোকশিখাটাও নিভিয়ে দেবে না তো হতভাগা মেয়েটা? নষ্ট করবে না তো তাঁর একমাত্র আশ্রয় ও আশ্বাস-কেন্দ্রটি?

কে জানে—আবার এক সময় এমনও মনে হয়—হয়ত তেমন কোন লোকসান হবে না শেষ অবধি, কিম্বা আদৌ কোন লোকসান হবে না। বরং টাকা আসবেই উল্‌টে—অনেক টাকা, তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত অঙ্ক। এটা ঠিক যে জামাই তাঁর কড়ি-কপালে। ওর মতো অসহায় অশিক্ষিত লোক যা করেছে তা ঢের। যারা ছোট-বেলায় দুঃখ পায় শেষ বয়সে অদৃষ্ট তাদর প্রতি অনেক বেশি প্রসন্ন হন নাকি। জামাইয়েরও হয়ত তাই হবে। আর যার কপাল ভাল, ভগবান যাকে দেবেন—তাকে তুচ্ছ একটা অবলম্বন ধ'রে, যে-কোন পথেই টাকা ঢেলে দেন। হয়ত বাধা দিলে ক্ষতিই করা হবে ওদের। তবু চুপ ক'রেই বা থাকতে পারেন কৈ? তাঁর এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা যে জীবন সম্বন্ধে অন্য শিক্ষাই দিয়েছে এতকাল।...

এই নানারকম বিপরীতমুখী চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সেদিন আর কোন কাজে মন দিতে পারলেন না শ্যামা। রাত্রেও ভাল ঘুম হ'ল না তাঁর। শেষ পর্যন্ত সকাল-বেলায় সেকরাদের একটা ছেলেকে ডেকে চারটে চালতা ও গোটাদুই কাঁচকলা ঘুষ দিয়ে মহাদের বাড়ি পাঠালেন। বিশেষ দরকার, দুপুরবেলা যেন অতি অবশ্য সে একবার আসে।

মহা অবশ্য দুপুরের খানিকটা আগেই এসে হাজির হ'ল। কৌতূহল প্রবল—কোথায় কী অঘটন ঘটল বা মজার খবর পাওয়া গেল, এ সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য শিশুর মতোই।

'কী গো, বলি এত জরুরি তলব কিসের! যখন শুনলুম তুমি চাল্‌তে কাঁচকলা খাইয়ে তাকে পাঠিয়েছে—তখনই বুঝলুম কিছু একটা সমিস্যের ব্যাপার আছে। নইলে তুমি যা কিপ্পন মনিষ্যি—দরের জিনিস খরচ ক'রে সুখসোমন্দা লোক পাঠাবে—এ একটা কথাই নয়।... যেমন শোনা, আমি সব ফেলে-ঝেলে কোনমতে দুটো হাতে-ভাতে ক'রেই হুড়তে পুড়তে ছুটে এসেছি। ছোট বৌটাকে বলে এসেছি সব পড়ে রইল ভাই, তুই একটু দেখিস। ফিরে এসে আবার না মহারানীর কাছে চাট্টি কথা শুনতে হয়। আজকাল তো আবার কাজের পালা হয়েছে, ভাগ হয়েছে—যে যার পালা সে তার করবে। মোন্দা গেরস্তর কাজ ঠিক ঠিক ওঠা চাই, নইলেই এতটি কথা আর চিপ্‌টেন। তা ছোট বৌ দেখবে, তেমন নয় ও। মানুষের ঘরের মেয়ে যে হয় তার চালচলনই আলাদা। ও-ই বললে—তুমি যাও দিদি, মা যখন এমন ক'রে ডেকে পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরি দরকার আছে।... তা ব্যাওরাটা কি বলো দিকি—এত জোর তলব একেবারে!'

শ্যামা কোন বৃথা ভূমিকার মধ্যে গেলেন না—একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'তুই নাকি গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার ক'রে বেড়াচ্ছিস? গয়না নিয়ে নাকি এ পাড়ায় এসেছিলি?'

ঠিক এ প্রশ্নটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না মহাশ্বেতা। তার মুখখানা বেশ একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল কিছুক্ষণের জন্য। খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন কোনমতে বলে ফেললে, 'হ্যাঁ!'

'কেন?' কঠিন ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

এ কণ্ঠস্বর সে চেনে। চিরকাল একে ভয় করতেই অভ্যস্ত মহাশ্বেতা। ভয় আজও তার কম হ'ল না। সে-ভয় দমন ক'রে বেপরোয়া হ'তে গিয়ে হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠল সে।

'কেন আবার কি? টাকার দরকার পড়েছে বলেই এইছি। আমি তো আর কচি খুকী নই—একটা কাজ যখন করেছি তখন তার অথ্থ আছে বৈ কি।'

BanglaBook.org

'সেই অর্থটাই তো জানতে চাইছি বাছা। কথাটা বলতেই বা তোমার দোষ কী? আমি তো তোমাকে আটকাচ্ছি না, তোমারটা কেড়ে বিগড়েও নিচ্ছি না।'

'দোষ আবার কি! দেখা হয় নি তারপর থেকে, তাই বলি নি।—আর এ এমনই বা কি কথা যে, এত ছিষ্টি ব্যাখ্যানা ক'রে বলতে হবে সবাইকে? ধার-দেনা মানুষ ক'রেই থাকে, কেউ আপদে-বিপদে করে, কেউ বা কারবার করতে নেয়। আমিও না হয় ধরো কারবার করতে নিয়েছি কিছু টাকা। তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?—আর দোষের কথা কে বলেছে? কেড়ে বিগড়ে নেবার কথাই বা উঠছে কেন? আমার গয়না আমি বন্ধক রাখব—তাতে এত কৈফিয়ৎ বা কিসের? আমার কি এটুকু এক্তার নেই?'

ভেতরের ভয়টা বাইরের 'মুখ-সাপোটে' ঢাকতে গিয়ে মহাশ্বেতার কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যায়। শেষের দিকে গলাটা কেঁপেও যায় একটু।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন না শ্যামা। তুচ্ছ কথার অর্থ ধরে মান-অভিমান প্রকাশ করা তাঁর অভ্যাসও নয়। তিনি শুধু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'অ। তুমি তা'হলে কারবার করতে টাকা ধার নিচ্ছ। বাঃ, এমন না হ'লে বুদ্ধি!—তাই তো বলি, আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে কারও সঙ্গে সলা-পরামর্শ না করেই যখন এমন কাজ করেছেন, তখন একটা ভাল রকমই অর্থ আছে বৈকি!'

শ্যামা তাঁর কণ্ঠস্বরে কঠিন ব্যঙ্গটাকে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেষ্টা করেন, তবু এর ভেতরের খোঁচাটা এতই স্থূল যে মহাশ্বেতারও বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এবার সে বেশ একটু তেতে উঠেই জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, অর্থ আছেই তো। আমি কম সুদে টাকা ধার ক'রে যদি বেশি সুদে অপরকে ধার দিই তো অন্যায় অলেহ্যটা কি করা হ'ল, তা তো বুঝতে পারছি না। বলি, সব কারবারেই তো এই দস্তুর গা? কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচা—না কি বলো? বৌদিও তো শুনছ—বলি বলো না আমি হক বলছি কি না বলছি! আর যদি বেহকই বলে থাকি—টাকা গেলে আমার যাবে, এলে আমার আসবে। তোমার তো কিছু লোকসান নেই তাতে? তবে তোমার এত জ্বালানি পোড়ানি কিসের?

রাগ করবারই কথা। অপমানে বিরক্তিতে শ্যামার একদা-গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলও একবার—কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে সে উষ্মা দমনই করলেন তিনি। এ এমনই নির্বোধ, এমনই বুদ্ধিহীন যে এর উপর রাগ করা মানে নিজের শক্তিরই অপচয় করা। এর ওপর অভিমান করলে নিজেকেই অপমান করা হয়। তিনি তাই আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তা জামাই জানেন এ কথাটা?—তুই যে গহনা বন্ধক রেখে তাঁকে টাকা দিচ্ছিস?

'ও মা, তা জানে না!' সবেগে বলতে গিয়েও কেমন যেন থতমত খেয়ে থেমে যায় মহাশ্বেতা। বুঝি কথাটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায় যে কথাটা অভয়কে জানবার কোন কারণ ঘটে নি। সে টাকা চেয়েছে, মহাশ্বেতা বলেছে দেব। কোথায় পাবে সে—কিম্বা কোথা থেকে আনবে—সে প্রশ্ন অভয়ও করে নি, মহাশ্বেতাও বলে নি। হয়ত অভয়ের ধারণা যে তার স্ত্রীর কাছেই আরও টাকা আছে—জমিয়েছে সে। তবে সে সম্ভাবনার কথা মহার তখন মনে হয় নি, তা'হলে সে-ই ভুলটা ভেঙ্গে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। তখন শুধু এই কথাটাই মনে হয়েছিল যে, এইভাবে টাকাটা চাওয়া মাত্র যোগাড় ক'রে এনে দেবার মধ্যে তার একটা মস্ত বাহাদুরি প্রকাশ পাবে—স্বামীর কাছে তার 'পোজিশান্' বাড়বে (এ শব্দটা সে সম্প্রতি শিখেছে ছোট দেওরের কাছ থেকে—তার ভারী পছন্দ এ শব্দটা)। তাছাড়া ধার করার কথাটা জানানো বা অনুমতি নেওয়া যে দরকার তাও মনে হয় নি তার।

সামান্য দ্বিধায় কণ্ঠস্বর মুহূর্তকালের জন্য স্তিমিত হয়ে আসে, থতিয়ে থেমে যায় একটু, তার পরই আবার গলায় জোর দিয়ে বলে, 'সে আবার না জানে কি? সব যে তার

BanglaBook.org

নখ-দর্পণে। বলে মানুষের মুখের দিকে চাইলে সে পেটের কথা টের পায়। তার কাছে কি কোন কিছু চাপা থাকে?'

কিন্তু সেই সামান্য দ্বিধাই শ্যামার কাছে যথেষ্ট। তিনি ওর আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার চেষ্টাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'হুঁ! তার মানে তুমি তাঁকে কিছু বলো নি, লুকিয়েই করেছ কাজটা।—সে আমি বুঝেছি মা, জামাই জানলে কখনও এ কাণ্ড করতে দিতেন না! তোমার ভাল লাগবে না, তুমি শুনবেও না তা জানি, তবু আমার কর্তব্য বলেই বলেছি—কাজটা ভাল কর নি—ভাল করছ না। অন্তত জামাইকে লুকিয়ে এ কাজ করা একেবারেই উচিত নয়। যা করেছ করেছ—আজই গিয়ে তাঁকে সব খুলে বলো আর এ টাকাটা ভালয় ভালয় ফিরে পেলে আগে দেনা শোধ ক'রে গহনা ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। ছিঃ—সোনা হ'ল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীকে বন্ধক রেখে টাকা ধার করে নিতান্ত যাদের হা-ভাতের দশা তারা। এ কাজ করতে নেই, ক'রো না।'

শ্যামার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় মহাশ্বেতা, আস্তে আস্তে বলে, 'তা না হয় সে ফিরলে আজ খুলে বলব কথাটা, তারপর সে যা বলে। তবে মনে তো হয় না, যে সে বারণ করবে। টাকা খোয়াবার পাত্তর সে নয়—টাকা আদায় করবেই যেমন ক'রে হোক। এটুকু জোর আমার মনে আছে। তবু দেখি বলে—। তবে তুমি আর ঐ সব ভাল করো নি, ভালো করো নি বাক্যিগুলো ব'লো নি বাপু—তোমার কথা বড্ড ফলে যায়। কাল-মুখের বাক্যি তোমার।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় সে! খেয়ে দেয়ে এতটা পথ এসেছে, ছুটেই এসেছে বলতে গেলে—এখনও ভাল ক'রে দম নিতে পারে নি। আরও খানিকটা বসে গল্প ক'রে সেই বিকেলের দিকে ফিরবে বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল—কিন্তু এখন যেন আর বসতে ভরসা হচ্ছে না। মার কাছে ধরা পড়ে যাবার লজ্জা তো আছেই—তা-ছাড়া শ্যামার বলবার ধরনটাতে একটু ভয় ধরেও গেছে, এ অবস্থায় মার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে বসে থাকা বড্ড অস্বস্তিকর। তার চেয়ে বরং ভট্‌চায-বাড়ি ঢুকে একটু বসে জিরিয়ে নেবে। এক ঘটি জলও খেয়ে নেবে সেখানে। বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে যেন। এখানেও খেয়ে নেওয়া চলত কিন্তু তাতে করে আরও পাঁচটা মিনিট অন্তত এইখানে বসতে হয়। সেটুকুও থাকতে ইচ্ছা করছে না।

কনক অবশ্য পীড়াপীড়ি করে, হাত ধরে বসাতেও যায় কিন্তু সে আর বসে না। ঘাড় নেড়ে বলে, 'না ভাই আমি যাই। কথা তো হয়েই গেল—মিছিমিছি আর দেরি ক'রে লাভ কি? ছোট বৌটার প্রেহারী শুধু। সেও তো বালস্পোয়াতী—তার একার ঘাড়ে অতটা চাপানো ঠিক নয়। মহারানী যা আছেন, মানুষটা মরে গেলেও নিজের পালার বাইরে একটি কাজ করবেন না। তার চেয়ে পারি তো আমিই গিয়ে পড়ি, সে বসে থাকবে না, হয়ত এতক্ষণে কাজে লেগেই গেলে, তবু যতটা পারি। শেষের দিকে খানিকটা হাতাপিতি ক'রে সেরে নিতে পারলেও উগ্‌গার হয় কিছু!'

সত্যিই সে আর দাঁড়ায় না, হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

॥ ৩ ॥

কথাটা যতই আনন্দের এবং ওর পক্ষে সুখের হোক—জিজ্ঞাসা না করলে নিজে থেকে বলা যায় না। অথচ এতদিন যেটুকু সংশয় ছিল কনকের সেটুকুও আর থাকেহ না। ছেলেই হবে তার—মানে ছেলে কিম্বা মেয়ে। যে-সব লক্ষণগুলোর কথা জানা বা শোনা ছিল তার—সে সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। অথচ অনেক আগেই যাঁদের চোখে পড়ার কথা তাঁরা নির্বিকার। শ্যামার সব দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু তিনিও—হয়ত ওর দিকে ইদানীং ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন নি ব'লেই অথবা এ সম্ভাবনার কথাটা তাঁর আদৌ মনে হয় নি ব'লেই—

দেখতে পান নি কিছু। হেমেরও চোখে পড়ে না কারণ দিনের বেলা বৌয়ের দিকে তাকিয়ে দেখার অবসরই তার অল্প। এক রবিবারেই যা সকালের দিকে বাড়ি থাকে কিন্তু সে সময়টাও কাটে তার বাগানের তদ্বির করে বা মাছ ধরে। তাছাড়া কনকের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার কোন কারণ আছে ব'লেও মনে হয় না তার।

অগত্যা অনেক ইতস্তত ক'রে কনক বাপের বাড়িতেই চিঠি লেখে। এসব কথা চিঠিতে লিখতেও লজ্জা করে—লিখতে বসে অনেকবারই ভাবতে হয়েছে, অনেক ইতস্তত করেছে সে কিন্তু উপায়ান্তর না পেয়েই শেষ পর্যন্ত ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা জানিয়েছে। আজকাল তার সুবিধাও হয়েছে একটু। কান্তি বাজারে-দোকানে যায় দরকার-মতো—তাকে পয়সা দিলে খাম পোস্টকার্ড সে-ই এনে দিতে পারে। দেয়ও। এর মধ্যে দু-একবার এনে দিয়েছে। পয়সা আজকাল দুটো একটা সে সাহস ক'রে হেমের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সামান্য দুটো-একটা পয়সা চাইলে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করে না হেম, হাসিমুখেই দেয়। একবার শুধু একসঙ্গে দু আনা পয়সা চেয়ে ফেলেছিল কনক—সেই দিনই, চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল হেম, কী দরকার প্রশ্নও করেছিল। সেই থেকেই সতর্ক হয়ে গেছে কনক—আর কখনও দু পয়সার বেশি চায় না। অবশ্য সে দু আনা সে হেমেরই প্রয়োজনে চেয়েছিল—ওর হাড়ের বোতামগুলো সবই প্রায় ভেঙ্গে গেছে, কান্তিকে দিয়ে কিনে আনাবে ব'লে—তাই কথাটা বলতেও কোন দ্বিধা ছিল না, হেমের মুখের গাম্ভীর্যটাও কাটতে খুব দেরি হয় নি—তবু ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, সেই একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে তার, আর ভুল করে না।

আর কীই বা দরকার তার! নিজের জন্যে কিছু কেনার উপায় নেই এ বাড়িতে; ইচ্ছা, প্রয়োজন এমন কি সঙ্গতি থাকলেও নয়। কোন কিছু দরকার হ'লে ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীর গোচরে আনতে হয় কথাটা; যদি তিনি বলেন যে, 'দেখি—এখন তো হাতে খুব টানাটানি—সামনের মাসে না হয় মরি-বাঁচি ক'রে যা হয় করব' কিম্বা যদি বলেন যে, 'হেমকে বলে দেখি একবার যদি এনে দেয়'—তো সেটা মহা সৌভাগ্য বুঝতে হবে। আর যদি সোজা ঝেড়ে জবাব দেন যে, 'ও সব এখন হবে-টবে না বাছা অত পয়সা নেই' কিম্বা বলেন, 'আমার ঘরে ইচ্ছে করলেই কোন জিনিস পাওয়া যায় না মা, দরকার হ'লেও অনেক সময় চেপে রাখতে হয়।'—তো ব্যস্—সেইখানেই সে প্রসঙ্গের ইতি। আবার সে কথা তুলবে এত সাহস অন্তত কনকের নেই।

আর তাঁকে না বলে কোন জিনিস কিনবে, কি কিনে আনাবে এমন বুকের পাটা কার? হেমেরও সে সাহস নেই। সে চেষ্টা যে দু-একবার ক'রে দেখে নি কনক তা নয়। ইদানীং হেম তার প্রতি খুবই সদয় হয়েছে—বেশ সস্নেহ ব্যবহার করে—তবু ফরমাশের নাম শুনেই শিউরে উঠেছে। জবাব দিয়েছে, 'ও বাবা, আমি তোমাকে দুম ক'রে কোন জিনিস এনে দেব—সে আমার দ্বারা হবে না। মা টের পেলে রক্ষে থাকবে না। মিছিমিছি একটা অশান্তি। তার চেয়ে ও মাকেই ব'লো।'

অশান্তি যে তা কনকও বোঝে। দেখতেই পাচ্ছে। এমনিতেই শ্যামা যেন তার সম্বন্ধে কেমন বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছেন আজকাল। কেন তা অনেক ভেবেও সে বুঝতে পারে না। ছেলে যতদিন বৌ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল ততদিন তিনি কনকের প্রতি যথাসম্ভব (তাঁর স্বভাবে যতটা সম্ভব) সহানুভূতিই দেখিয়েছেন, প্রকাশ্যেই ছেলের ব্যবহারে অনুযোগ করেছেন। কিন্তু ইদানীং ছেলের মতি-গতি পাল্‌টাবার সঙ্গে সঙ্গে—এমন কী ভাল করে পাল্‌টাবার আগেই, শ্যামার মেজাজের পরিবর্তন ঘটে গেছে যেন। স্বামীর স্নেহ,—ভালবাসা বলে, আজও মনে করে না কনক, সে টের পাবার আগেই যেন শাশুড়ী টের পেয়েছেন। তা না হয় পেলেন—কিন্তু সেজন্যে তিনি কেন অসন্তুষ্ট হবেন সেইটেই ভেবে পায় না সে।

BanglaBook.org

চিঠি লেখারও বিপদ কম নয়। শ্যামা নিজে যদিচ মোটামুটি খানিকটা লেখা-পড়া জানেন, তবু মেয়েদের বই নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করেন না। ওটা সময়ের অপব্যয় বলেই মনে করেন। বলেন, 'অমন আয়না মুখে ক'রে বসে থাকা বড়লোকদের শোভা পায়। আমাদের গেরস্ত ঘরে ও-সব সাজে না। আর দরকারই বা কি, দু'পাতা বই পড়ে কি স্বগ্‌গে বাতি দেবে, না কোম্পানির দপ্তরে চাকরি করতে যাবে? ঐ সময়টা সংসারের বাড়তি কাজ করলে কিছু তবু সাশ্রয় হয়।'

পড়া যেমন পছন্দ করেন না, তেমনি লেখাও না। চিঠি লিখতে দেখলেই তাঁর দৃষ্টি এবং কণ্ঠ দুই-ই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বিপদ-আপদ না ঘটলে চিঠি লেখার কী সার্থকতা তা তিনি ভেবেই পান না।

'যারা কাজ-কারবার করে তাদের না হয় ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি পাঠাতে হয়, সে চিঠিতে দু'পয়সা আসে তাদের—তার জন্যেই সাহেবদের আপিসে মাইনে-করা কেরানী রাখে—তোমাদের চিঠিতে তো আর এক পয়সা আয় হবে না, বরং ঐ পয়সাটাই অপচ্ হবে। ঐ যে সব বলেন, ভারী তো এক পয়সা খরচ একখানা পোস্টকার্ডের—ওটা কি আবার খরচা নাকি! আ-মর্—একটা পয়সাই বা আসে কোথা থেকে! বলে কড়া কড়া নাউটা, কড়াটা না ফেললে তো আর নাউটা নয়। এক পয়সার পোস্টকার্ড না কিনে নুন কিনলে গেরস্তর সাতদিন রান্না চলে। আর কী দরকারই বা? দুদিন আগেই হয়তো দেখা হয়েছে না হয় আর দুদিন পরে হবে। যা বলবার আছে তখনই বলবে পেটের থলি উজোড় করে সব কথা ব'লো—তাতে তো কোন ক্ষতি হবে না। এক পয়সা লোকসান নেই তাতে। অসুখ-বিসুখ করে কি কোন জরুরি দরকার থাকে—সে এক কথা, নইলে তো সেই বাঁধা গৎ, তুমি কেমন আছ—আমি ভাল আছি। সুখ-সোমন্দা পয়সা উড়িয়ে দেওয়া।'

সুতরাং খাম পোস্টকার্ড আনলেই শুধু হয় না—চিঠি লেখবার মতো অবসরটুকুর জন্যও সাধনা করতে হয়। সে অবসর সত্যিই দুর্লভ এ বাড়িতে। সদাজাগ্রত শাশুড়ী অহরহ কর্মব্যস্ত, কখন কোথায় এসে পড়বেন তার ঠিক নেই। দুপুরে তিনি নিজে ঘুমোন না, আর কেউ ঘুমোয় তাও পছন্দ করেন না। কনক দুপুরের দিকে একটু অবসর পায় ঠিকই—কিন্তু কখন তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হবেন কিম্বা ওকে ডেকে কাছে বসাবেন তার কোন ঠিকই নেই। চিঠি লেখা তো অপরাধ বটেই—লুকিয়ে লেখা আরও কঠিন অপরাধ।

তবু ওরই মধ্যে সময় করে একখানা চিঠি লেখে সে। যেটা দশ মিনিটে লিখে ফেলবার কথা সেইটেই তিনদিন ধরে লিখতে হয়। রাত্রে লেখা যায় না—হেম জিজ্ঞাসা করবে হঠাৎ বাপের বাড়িতে চিঠি লেখার কী এমন দরকার পড়ল? বিশেষত ওর বাপের বাড়ির গ্রামের বহু ছেলে লিলুয়ায় কাজ করে—একই গাড়িতে যাতায়াত—কে কেমন আছে তার মোটামুটি একটা খবর পায়ই হেম। সে জিজ্ঞাসা না করলেও তারাই সেধে দেয় সে খবর। আগে বলত না, এখন হেম ওকে বলেও এসে সে খবর। কাজেই—আবার মিছিমিছি এক পয়সা খরচের কী এমন জরুরি প্রয়োজন পড়ল—এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু—চিঠি যখন লেখা হয় নি, তখন কী করে লিখব—এই প্রশ্নটাই ছিল প্রধান, চিঠি লিখে গোপনে কান্তিকে ফেলতে দিয়েই অনুতপ্ত হয়ে ওঠে কনক। কেনই বা একথা ওঁদের লিখতে গেল সে! তাঁরা আর কী করবেন? এক বাড়িতে থেকে সে যা জানাতে পারল না—তাঁরা অন্য গ্রাম থেকে এসে কেমন ক'রে জানাবেন? মিছিমিছি তাঁদেরও বিব্রত করা। এঁরা যে জানেন না সে কথাটা অবশ্য লজ্জায় লিখতে পারে নি সে। তবে তাঁরা অনুমান করতে পারবেন। কারণ জানলে এঁরাই জানাতেন সে কথাটা। তা-ই নিয়ম। দুম্ ক'রে এসে যদি কেউ কথাটা তোলে, তাহ'লে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না।

এক যদি তাঁরা কোন ছুতো ক'রে দু-একদিনের জন্য নিয়ে যান—তারপর সেখান থেকে লিখে জানান তো হয়। সেইটেই লিখে দেওয়া উচিত ছিল। তবে—সে মনে মনে প্রবোধ দেয় নিজেকে—সে বুদ্ধি কি আর বাবা-মার হবে না? তা না হ'লেও, এলে সে টের পাবেই, কাছাকাছি এলে না হয় একটু চোখ টিপে দেবে'খন শাশুড়ীর পিছন থেকে—যাতে চিঠির কথাটা না বলেন শাশুড়ীকে।

কিন্তু এ আশ্বাসও বেশিক্ষণ টেকে না—আশঙ্কাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, তার ভাগ্যটা যেন সৃষ্টিছাড়া একেবারে। নইলে এমন কথা কে কোথায় শুনেছে! এক বাড়িতে এক সংসারে বাস ক'রেও শাশুড়ী খবর রাখেন না—কেউ শুনলেও বিশ্বাস করবে.না। বিশেষত বিধবা শাশুড়ী—ব্রাহ্মণের বিধবা। কিন্তু শ্যামাও যে একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। সাধারণ অন্য বিধবাদের মতো আচারবিচারের ধরাকাঠ তাঁর আদৌ নেই। তিনি বলেন, 'অতশত মানতে গেলে আর কট্‌কেনা করতে গেলে আমার চলে না, আমার বলতে গেলে ভিখিরীর সংসার, দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে চলতে হয় অষ্টপ্রহর। যে সময় ঐসব করব—সে সময় আমার দু পাঁচসের পাতা চাঁচ হয়ে যাবে।... আর ওসব মানিও না, উনি ঠিকই বলতেন—এটা ক'রো না, এটা করলে অমুক হবে শুনলেই উনি ছড়া কাটতেন, মোকড় মারলে ধোকড় হয় চালতা খেলে বাকড় হয়। সেই কথাটাই ঠিক।' ভাত অবশ্য তিনি বধুর হাতে আজও খান নি, ওর দীক্ষা হয় নি—হাতের জল এখনও অশুদ্ধ বলে—চাড়া পাতার জ্বালে ভাত রাঁধা—তিনি ছাড়া কেউ অত ভাল পারেও না। ধৈর্য্যের অভাব, পাতাও অনেক বেশি খরচ ক'রে ফেলে। কিন্তু ভাত ছাড়া মোটামুটি রান্নাটা কনকই করে আজকাল, দৈবাৎ কোনদিন শ্যামার হাতে কাজ না থাকলে সে অন্য কথা। নইলে কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধরেন না তিনি। কাজেই যে কারণে জানা যেতে পারত—সে কারণটা ওদের সংসারে নেই।

চিঠি পেয়ে ওর বাবা প্রথম শনিবারেই এসে হাজির হলেন—আর এমন সময়েই এলেন যে ওর সতর্কতার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। এ সময়টা কনকের হিসেবে ধরা ছিল না। অর্থাৎ বেলা দুটোর সময়।

ও সেদিন ঘুমোয় নি। আর একটু পরেই হেম এসে পড়বে—হেম আজকাল তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে—এসেই গরম জল চাইবে সাবান কাচবার জন্যে; তাছাড়া স্বামী খেটেখুটে এসে দেখবে স্ত্রী আরামে ঘুমোচ্ছে—সে বড় লজ্জার কথা; তাই সে রান্নাঘরের দাওয়াতেই আঁচলটা পেতে গড়াচ্ছিল একটু। আর কতটা পরে পাতার জ্বালে গরম জলের হাঁড়ি চাপাবে—সামনে কার্নিসে-পড়া রোদটা দেখে সেই-পাতার হিসেব করছিল মনে মনে।

অকস্মাৎ বাবার গলা কানে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বাইরে এল কিন্তু তার আগেই অনিষ্ট যা হবার তা হয়ে গেছে। তখন আর কোন-রকম সাবধান করার উপায়ও ছিল না—তিনি ওর দিকেই পিছন ফিরে রকের ওপর জেঁকে বসেছেন। আগে কি কথা হয়েছিল তা জানা গেল না, কনক যখন এল তখন ওর বাবা হাসি-হাসি মুখে বলছেন, 'সুখবরটা শুনেই ছুটে এলুম বেনঠাকরুন, বলি যাই, খাড়া খাড়া গিয়ে সন্দেশ খেয়ে আসি গে।... আজ আর সহজে ছাড়ছি না কিন্তু তা আগেই বলে রাখছি, একটি হাঁড়ি মিষ্টি চাই।'

শ্যামার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল না বটে কিন্তু তাঁর মুখটা দেখার কোন অসুবিধাই ছিল না কনকের। প্রথমটা একটা প্রচণ্ড বিস্ময়, একটা হতচকিত ভাবই মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল—কিন্তু সে এক লহমার বেশি নয়। তারপরই তাঁর মুখ অরুণ বর্ণ ধারণ করল, ধারলো ছুরির ফলার মতোই শাণিত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু সেও এক মুহূর্তের বেশি নয়, বোধ করি সে উষ্ণতা ও উগ্রতার একটা ছায়ামাত্র সরে গেল তাঁর মুখের ওপর দিয়ে— প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

Banglabook.org

যথোচিত মিষ্ট সৌজন্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন যেন। হেসেই জবাব দিলেন, 'খাওয়া তো আমারও পাওনা হয় বেইমশাই, আমি তো পথ চেয়ে বসে আছি— আপনি হাঁড়ি হাতে করে ঢুকবেন। তা সে হবেই এখন— কিন্তু সুখবরটি আপনাকে এরই মধ্যে দিলে কে?'

সুখবরটা কি তা প্রশ্ন করার প্রয়োজন হল না। ঐ যা প্রথমেই কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল বেহাইয়ের কথাটা ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে ধরতে। কিন্তু মনের ওপর ও মুখের ওপর যত দখলই থাক তাঁর— কণ্ঠস্বরটাকে পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি— শেষের প্রশ্নটা করার সময় সতর্কতা সত্ত্বেও কণ্ঠ থেকে ঈষৎ তীক্ষ্ণ কঠিন সুরই বেরিয়ে এল। আর তাইতেই হুঁশিয়ার হয়ে উঠলেন পূর্ণ মুখুজ্জে-মশাই। তিনিও পল্লীগ্রামেই বাস করেন— এসব বাঁকা প্রশ্নের সরল পরিণতি তাঁর একেবারে অজানা নয়। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা সামলাতে একটু সময় লাগল বটে— তবে সহজ সত্য কথার পথে আর গেলেন না তিনি। বার দুই ঢোঁক গিলে বললেন, 'খবর? তা মানে— তা ঠিক বলতে পারব না। মানে ঐ মেয়েমহল থেকে শোনা, বুঝলেন কিনা— ঠিক কী করে খবরটা গেছে—'

অর্ধপথেই থেমে গেলেন পূর্ণবাবু।

শ্যামাও আর বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না। অমায়িকভাবেই হেসে বললেন, 'যাক— যে-ই দিক, খবরটা পৌঁছলেই হ'ল। আমারই দেওয়া উচিত ছিল, দোবও ভাবছিলুম কদিন থেকেই— কিন্তু জানেন তো বহুদিন মা সরস্বতীর পাট নেই, দোয়াতকলম এখন যেন বাঘ মনে হয়!'

এর পর কোন পক্ষেই সহজ সৌজন্যের অভাব হল না। বরং শ্যামার দিক থেকে একটু বাড়াবাড়িই হল বলা যায়। কান্তিকে দোকানে পাঠিয়ে সত্যি-সত্যিই দুটো রসগোল্লা আনালেন তিনি— তাও এক-পয়সানে ছোট রসগোল্লা নয়, দু-পয়সানে বড় রসগোল্লাই আনতে বলেছিলেন তিনি— ঘরে তৈরি খুদ ভাজার নাড়ুর সঙ্গে সে দুটোই সাজিয়ে দিলেন এবং পীড়াপীড়ি করে সবগুলো খাওয়ালেন। পূর্ণ মুখুজ্জেমশাইয়ের মনে যেটুকু উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, এই প্রীতিপূর্ণ হৃদ্যতায় তার আর চিহ্নমাত্র রইল না; তিনি জলযোগ শেষ করে খুশি মনেই বিদায় নিলেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা হল বটে—কিন্তু সে শ্যামার সামনেই— আড়ালে দেখা করার কোন প্রয়োজন আছে তা তাঁরও মনে হল না, শ্যামাও সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করলেন না। সুতরাং মামুলী সাবধানে থাকার দু চারটে উপদেশ দিয়ে পূর্ণবাবু হাসিমুখে মেয়েকে আশীর্বাদ করে বেয়ানকে প্রণাম করে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। বহুদিন মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনা না হওয়ায় মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কুটিল সংশয়টা দেখা দিয়েছিল, এ সুসংবাদে সেটাও নির্মূল হয়ে গেছে। ভদ্রলোক সত্যি-সত্যিই খুশি হয়েছেন।

বেয়াইকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে, তাঁর চোখের আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কানাইবাঁশীর ঝাড়টার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামা। সহজ, স্বাভাবিক মানুষ। যেতে যেতে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালেও পূর্ণবাবু কোন বৈলক্ষণ্য টের পেতেন না। কিন্তু তাঁর বগলের বিবর্ণ ছাতাটি ওঁদের বাঁশঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। বাইরের ঘরের রকে পাতার রাশ পড়ে, ঝাঁটাটা সেইখানেই কাৎ করা কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে সোজা বাড়ির মধ্যে এসেই ঢুকলেন।

হেম খানিকটা আগেই এসেছে কিন্তু শ্বশুরকে দেখেই বোধ হয়—তখনও পুকুরে নামে নি কাপড় কাচতে—রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে একটু বিশ্রাম করছিল। কনকও আছে সেখানে—সাবান-কাচার জল গরম হয়ে গেছে অনেকক্ষণই, ওদিকে কাজও পড়ে বিস্তর— তবু সেখান থেকে নড়তে পারে নি। সে বহুদিন এই ঘর করছে, শাশুড়ীকে সে বিলক্ষণ চেনে, তাঁর এই কিছু পূর্বের অমায়িক ব্যবহারে ভোলার মতো নির্বোধ নয় সে। সে তাই উনুনের ধারেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় যে একটা উঠবে সে বিষয়ে তার

BanglaBook.org

সন্দেহমাত্র ছিল না—শুধু কখন উঠবে এবং কী পরিমাণ প্রবল হবে সেইটেই ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। আশঙ্কাটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে উদ্বেগ আরও বাড়ে—কনকেরও বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনায়।

শ্যামা এসে দাওয়ার সামনেই দাঁড়ালেন। ছেলে কিংবা বৌ কে অপরাধী, অথবা দুজনেই—ঠিক করতে না পেরে দুজনের মুখের ওপরই একটা কঠোর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, আমাকে না জানিয়ে বেয়াইবাড়িতে চিঠিটা কে লিখলে জানতে পাই কি?'

উত্তর কারুর দেওয়ার কথা নয়, সেজন্য অপেক্ষাও করলেন না শ্যামা! শাণিতকণ্ঠ আর এক পর্দা চড়িয়ে পুনশ্চ বললেন, 'এ ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার তাড়াটি পড়ে গেল কার? আমাকে না বলে সাত-তাড়াতাড়ি কুটুমবাড়িতে না জানালে চলছিল না বুঝি? মহা সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল একেবারে!... আমি কি কানা না কিছু জানি না? যখন দরকার বুঝতুম আমিই জানাতুম। আর যদি এত মাথাব্যথাই পড়েছিল তো এমন ক'রে কুটুমবাড়িতে আমাকে বে-ইজ্জত না ক'রে সোজাসুজি এই দাসীবাঁদিকে হুকুম করলেই তো হ'ত যে—খবরটা জানিয়ে দাও, নইলে আমাদের চলবে না, দিন কাটছে না। না কি, মা-মাগী যে এ বাড়ির কেউ নয়—নিতান্ত ঝি-চাকরাণী, সেই কথাটাই জানানো দরকার ছিল!'

হেম এই আকস্মিক—এবং তার কাছে অকারণ, আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'কী জানানো হয়েছে কি? আর কে-ই বা জানালে?'

'কে জানিয়েছে সেইটেই তো আমি জানতে চাইছি বাছা! কার এতবড় সাহস—বুকের পাটা হ'ল যে কুটুমবাড়িতে মুখটা পোড়াতে গেল আমার!'

ছেলের প্রশ্ন করার ধরনেই শ্যামা বুঝে নিয়েছেন—সেই সঙ্গে কনকের অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও যে—কাজটা কার। সেই সঙ্গে তাঁর ভাষাও গেছে বদলে।

কনকের মাথাতে যেন কিছু ঢুকছে না। তার সবটাই যেন কাঠ হয়ে গেছে—ভেতরে বাইরে। বাইরে কোথায় একটা কাঠঠোকরা ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করছে, দুটো কাঠবেড়ালীতে ঝগড়া বাধিয়েছে—সেই দিকেই যেন প্রাণপণে কান পেতে আছে সে। আজ যে রণরঙ্গিনী মূর্তি তার শাশুড়ীর—আজ নিশ্চিত মার খাওয়া অদৃষ্টে আছে তার, সেই চিন্তা থেকেই মনটাকে সরাতে চাইছে সে।

হেম কিন্তু এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। এ সব কথার পাঁচ সে কোনদিনই সইতে পারে না। সেও বেশ গলা চড়িয়েই বলল, কী মুশকিল, অত ভনিতা না করে আসল কথাটা কি খুলে বললেই তো হয়! কী হয়েছে সেইটেই যে বুঝতে পারছি না!'

শ্যামাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কি হয়েছে জানো না? ন্যাকা?... তোমার ছিষ্টিধর বংশধর হবেন আমার স্বগৃগে বাতি দিতে—বৌ পোয়াতী, সেই খবরটা রাতারাতি তোমার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গেল কী ক'রে সেইটেই জানতে চাইছি।... খবর কি আমি জানতুম না—না কখন খবর দিতে হবে সেটা আমার জানা ছিল না? আমি কি ঘরসংসার করি নি কখনও? না কি বেদের টোল ফেলেই দিন কেটেছে চিরকাল? যে তোমার বৌ বিবেচনা শেখাতে গেল?... কী সাহস ওর! এত সাহস ওর আসে কোথা থেকে?... তুমিই নিশ্চয় এ আস্পদ্দা যুগিয়েছ ওকে! সমঝে দিয়েছ যে মা দাসীবাঁদী, ওকে থোড়াই কেয়ার—তুমি মহারাণী, তুমি যা ভাল বুঝবে তার ওপর আর কথা নেই!'

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত আর পেলও এমন আকস্মিকভাবে যে কিছুক্ষণ যেন হেম শব্দগুলোর অর্থই ঠিকমতো বুঝতে পারল না—বিহ্বলভাবে মার দিকে চেয়ে বসে রইল শুধু।

বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল কনকও। কিন্তু সে অন্য কারণে। উনি সটান্ বলে দিলেন যে উনি জানতেন! এতবড় মিথ্যা কথাটা উনি বললেন কী করে?... এ সংসারে কেউই সুবিধের নয় তা

BanglaBook.org

সে জানে—তবু, এতখানি বয়স হল ওঁর—উনি মা, মা বলে ডাকে সেও—সন্তানের সামনে এই তুচ্ছ কারণে এতবড় নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলে বসলেন!... কনকও মেয়েছেলে, তায় দিন-রাত এক বাড়িতে বাস করছে ওঁর সঙ্গে, উনি যে টের পান নি এতদিন—তা সে হলপ ক'রে বলতে পারে। শুধু শুধু—নিজের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য ঢাকবার জন্যে;—তিনি যে সুগৃহিণী, চারিদিকে চোখ আছে তাঁর সেইটুকু জাহির করার জন্যে; আর সবচেয়ে বড় কথা, কনককে লাঞ্ছনা করবার সুযোগের জনেই জেনেশুনে এই মিথ্যা কথাটা বলছেন উনি! উনি অনেক কিছু পারেন—কত যে পারেন তা তো এসে অবধিই দেখছে সে—কিন্তু এতটা যে পারেন তা ওরও জানা ছিল না।... এই নূতন আবিষ্কারের অভাবনীয়তায় সে যেন নিজের আসন্ন বিপদের কথাও ভুলে গেল—বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠল আর সমস্ত কথা ছাপিয়ে।

কিন্তু কনকের জন্য ভগবান সেদিন আরও বিস্ময় জমিয়ে রেখেছিলেন,—অধিকতর বিহ্বলতার কারণ তোলা ছিল তার জন্যে।

মার কথাগুলোর সম্যক অর্থ মাথায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত শরীরটা রিন্ রিন্ ক'রে উঠল হেমের, মনের মধ্যে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তারের যন্ত্র উঠল ঝন্ ঝন্ করে। একটা অব্যক্ত, অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত সুখে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তার মধ্যেই কথাটা তার মাথায় গেছে যে, এ বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। এ অনির্বচনীয় অনুভূতি উপভোগ করার অবসর বা সময় এটা নয়। এ মুহূর্তে কোন অশান্তি বরদাস্ত করতে রাজি নয় সে। মার যে রকম রণরঙ্গিনী মূর্তি—তিনি সব কিছুই করতে পারেন, গায়ে হাত তোলাও বিচিত্র নয়।... একবার অপাঙ্গে অপরাধিনীর দিকে চেয়ে দেখল সে।—তার সেই আনত ম্লান শুষ্ক মুখ ও একান্ত দীন ভঙ্গী দেখে একটা অননুভূত মমতাতেও মনটা ভরে গেল তার। আহা বেচারী! এই কথাটাই মনে হ'ল তার সর্বাগ্রে।

সে মুখে যৎপরোনাস্তি একটা আহত ভাব টেনে বলল, 'ওঃ, এই! আমি ভাবছি না জানি কী একটা গুরুতর কাণ্ড হয়ে গেছে।... কথাটা তো সেভাবে বলা হয় নি অতশত বুঝেও বলি নি। তুমি যে এই কথা নিয়ে তিল থেকে তাল করবে তাও জানতুম না... তাছাড়া ঠিক বলব বলে বলাও হয় নি। সেদিন বড়বাবু হঠাৎ ডেকে বললেন যে, তোমার বদলির অর্ডার এসেছে, জামালপুরে যেতে হবে।... কবে? না, এই পনেরো দিনের মধ্যে। তখনই আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে বসলুম, যে এখন দিনকতক মাপ করুন—আমার ঘরে এই ব্যাপার।... তা সে কথাটা যে এমনভাবে চাউর হবে, তাও জানি না। এখন মনে পড়ছে বটে যে সেখানে ওদের পাড়ার পুলে চক্রবর্তী দাঁড়িয়েছিল। সেই হয়ত গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে কথাটা।'

কথাটা শ্যামার বিশ্বাস হ'ল না। বিশ্বাস হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পৃথিবীটাকে তিনি দেখেছেন বহুদিন, এই ছেলেকেও দেখছেন আজন্ম। একথা ও বলে নি। সবটাই বানানো, এই মুহূর্তে যা মনে এসেছে বানিয়ে বলছে। তবু কিছু করার নেই। তাঁর এ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ নেই তাঁর হাতে। ছেলে যখন দোষটা মাথায় পেতে নিচ্ছে তখন 'বলে নি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনের মধ্যেকার ধূমায়িত রোষ তাই প্রচণ্ডতর বেগে জ্বলে উঠলেও আত্মসংযমই করতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। তিনি বিস্মিতও হলেন। ছেলে যে বৌ সম্বন্ধে আর উদাসীন নেই—এইটুকু জানতেন, কিন্তু বৌ যে এতটা হাতের মুঠোয় পুরেছে ছেলেকে, কান ধরে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে—এ খবরটা জানা ছিল না তাঁর।

কিন্তু মনে যা-ই হোক, যত দাহই সঞ্চিত হয়ে উঠুক—সেটা প্রকাশ করার স্থান কাল এটা নয়। প্রাণপণে অর্ধোদ্গত বিষ দমন করলেন শ্যামা। নিরতিশয় শীতল কণ্ঠে শুধু

BanglaBook.org

বললেন, 'অ। তাহ'লে তুমিই বলেছ! তা কৈ, বলো নি তো সে কথাটা এতদিন। ওটা যে জানতে তাও তো বলো নি!'

'বা রে।' হেম মাথা হেঁট ক'রে জবাব দেয়, 'এ কী আমার বলবার কথা! আর কেনই বা বলব। তুমিও তো জানতে, তুমিও তো বলো নি কাউকে। আমাকেও তো বলো নি। তাছাড়া—'

একটু থেমে গলাটা বোধ করি বা লজ্জাতেই একটু নামিয়ে বললে, 'তাছাড়া আমি ঠিক জানতুমও না। বলতে হয়—একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাই বলা। আন্দাজে ঢিল মারা কতকটা—। লেগে যাবে যে ঠিক ঠিক—'

'হুঁ!' অপরাধ স্বীকারের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্তি আনতবদনা বধূর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শ্যামা আরও শীতল কণ্ঠে বললেন, 'সবই জানতে বাছা। বৌ যে লিখেছে তাও জানতে—তাই সাত-তাড়াতাড়ি আগু বেড়ে এসে দোষটা ঘাড় পেতে নিলে। তোমার যে এতটা উন্নতি হয়েছে সেইটেই শুধু আমি জানতুম না— তা জানলে কি আর একথা বলতে আসি?... তোমাদের গুষ্টির দ্বারা তো অনেক শিক্ষা, অনেক ফৈজৎ হয়েছে—এইটেই বাকি ছিল শুধু বোয়ের কাছে অপমান হওয়া।... যাক্—ঘাট হয়েছে আমার একথা বলতে আসা, তাতে যদি রাজরাণীর কাছে অপরাধ হয়ে থাকে তো মাপ করতে ব'লো; আর কী করব তা জানি না—বলো তো না হয় উঠোনে নাক-খৎই দিই সাত হাত মেপে!'

এর পর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য দাঁড়ানো যায় না। তাহ'লেই সত্য মিথ্যা সাক্ষী প্রমাণের কথা উঠবে। ছেলেই বা কী মূর্তি ধারণ করবে তার ঠিক কি! কথাটা শেষ ক'রেই শ্যামা হন্ হন্ ক'রে বাইরে চলে গেলেন।

প্রমাণ-প্রয়োগ না থাক্—মিথ্যাটা কেউ মুখের ওপর মিথ্যা বলে ছুঁড়ে মারলে কারুরই ভাল লাগে না। হেমেরও লাগল না। কিছু পূর্বেকার মনের মধ্যে রিন্-রিনিয়ে ওঠা মিষ্টি সুরটা নষ্ট হয়ে গেল, কোথায় একটা বড় রকমের ছন্দপতন হ'ল যেন। মাধুর্যের বদলে মনের পাত্রে ফেনিয়ে উঠল একটা কটু-তিক্তস্বাদ। সে হন্‌হনিয়ে কাছে উঠে এসে চাপা গলায় বললে, 'তুমিই বা আমাকে না জানিয়ে—আমাদের না জানিয়ে চিঠি লিখতে গিছলে কেন? এ এমন একটা কি কথা যে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক পিটিয়ে না বেড়ালে হয় না। এইসব কথা নিয়ে ঘোঁট আদিখ্যেতা যার ভাল লাগে লাগে—আমার ভাল লাগে না, এইটে মনে ক'রে রেখো!'

কনক এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না; অন্তরভরা কৃতজ্ঞতায় এবং উচ্ছ্বসিত প্রেমে তার চোখে যে জল এসে গিয়েছিল এই কয়েক মুহূর্ত আগে—সেইটেই বেদনার অশ্রুতে পরিণত হয় শুধু। বলতে পারে না যে, ওরা অন্ধ বলেই তাকে কথাটা অন্যত্র জানাতে হয়েছিল, বলতে পারে না যে, যে স্বামী উদাসীন তার কাছে এ কথাটা নিজে থেকে মুখ ফুটে কোন স্ত্রীই জানাতে পারে না—বলতে পারে না, তার জন্য হেমকে যে গুরুজনের কাছে মিথ্যা বলতে হয়েছে তাতে এমন কোন দোষ হয় নি, কারণ সেই গুরুজনও একটু আগে তাদের কাছে মিথ্যাই ব'লে গেছেন। কিছুই বলা হয় না। একটু আগে স্বামীর মুখে মধুর মিথ্যেটা শুনতে শুনতে অভাবনীয় সৌভাগ্যের মাধুর্যরসে মন ডুবে গিয়ে যে স্বপ্ন দেখছিল, কল্পনা করছিল কেমন ক'রে সে স্বামীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে বলবে 'তুমি আমাকে মাপ করো আমার জন্যে তোমাকে মিথ্যা বলতে হ'ল'—আর স্বামী কেমন করে মধুর প্রশ্রয়ে ওকে পা থেকে টেনে তুলে বলবেন, 'দূর পাগল, তাতে কি হয়েছে!'—সে স্বপ্ন, সে কল্পনাও কোন্ বাস্তবের রূঢ় দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এর পর আর কোন কথাই বলবার প্রবৃত্তি রইল না ওর। হেঁট হয়ে হাঁড়ির গরম জলটা কলসিতে ঢেলে দিতে দিতে শুধু প্রাণপণে চোখের জলটা হেমের কাছ থেকে গোপন রাখবার চেষ্টা করতে লাগল।

BanglaBook.org

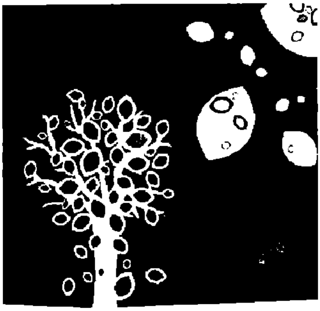

দশম পরিচ্ছেদ

শ্যামার ইচ্ছা ছিল সাধের পর বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। সাধের পর এই জন্যে যে— নইলে সাধের তত্ত্ব করতে হয়। সাধের খরচা আইনত শ্বশুরবাড়িরই। এখানে তিনি কোন মতে একখানা মিলের শাড়ি এবং পুকুরের মাছ ধরে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিয়ে সারতে পারেন কিন্তু কুটুমবাড়িতে তা চলবে না। দিতে গেলে একটু গুছিয়ে দিতে হয়। পাঁচজনে দেখবে, যেমন-তেমন করে দিলে নিন্দে হবে।

কিন্তু সাধের পর আর না। বাপের বাড়ির সাধ খেতে তো যেতেই হবে—অমনি ছেলে হয়ে আসবে একেবারে। প্রথম প্রসব হবার খরচটা বাপেরই করা উচিত—এই ওঁর ধারণা। যদিও সে কথা প্রত্যক্ষভাবে বলেন না। সামনে অন্য ওজর দেন, 'ছেলেমানুষ—এই প্রথমবার, মা-বাপের কাছে থাকে, সেই-ই ভাল। নইলে ভয় পাবে। তাছাড়া—আমার এখানে কে-ই বা আছে বলো। এত কন্না কে করবে এখানে? খেঁদিটা থাকলেও না হয় কথা ছিল!'

তবে আসল কারণটা পরোক্ষে বলেন বৈকি!

অপরকে উপলক্ষ ক'রে বলেন।

'সে কথা একশ'বার। মেয়ের বিয়ে দেবার সময় প্রথম বেন তোলার খরচটাও ধরে রাখতে হয়। শ্বশুরবাড়ির খরচা তো পড়েই রইল—বাপ মিন্‌সে প্রথমবারটাও করবে না! মেয়ে যখন হয়েছে তখন তো এসব খরচা ধরে রাখাই উচিত।'

কনক শোনে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সে সাহস তার নেই। তবে উত্তরটা তার মুখের কাছে ঠেলাঠেলি করে। শ্যামা নিজে কোন মেয়েরই বেন তোলেন নি। মহাশ্বেতার প্রথম ছেলে হওয়ার সময় তার শাশুড়ীও এই মতলব এঁটেছিলেন, কিন্তু শ্যামা উচ্চবাচ্য করেন নি। হয়ত তবুও বাঁচতেন না, নিহাৎ ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সাধের আগেই ছেলে হয়ে গিয়েছিল মহার। এ গল্প শ্যামাই করেছেন কতবার—হেসেছেন বলতে বলতে। কেমন জব্দ মহার শাশুড়ী, সে হসির এই অর্থ। ঐন্দ্রিলার বেলায় অবিশ্যি কোন কথাই ওঠে নি। তরুর তো এই সেদিন ছেলে হ'ল, কনকের সামনেই বলতে গেলে, কৈ, তাও তো শ্যামা তাকে আনবার নাম করেন নি। সে বেচারার শ্বশুরবাড়িতে তো তবু কেউ ছিল না। এমন কি সতীনও না—সেও সে সময় প্রসব হ'তে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। দাই আর পাড়ার লোকের ওপর ভরসা করে ছিল তরু।

কিন্তু শ্যামার ইচ্ছা যা-ই থাক—দেখা গেল ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম। মহাশ্বেতা তবু সাধের খরচাটা করায় নি কিন্তু এ বৌ সেটিও ষোল আনা করিয়ে নিয়ে শ্যামাকে বৃহত্তর খরচার মধ্যে ফেলে দিলে।

BanglaBook.org

শ্যামার তরফ থেকে চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, হিসাবমতো ন' মাস পড়তেই প্রথম যে দিনটি পাওয়া গেল সাধের, তিনি সেইদিনই তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে নিয়েছিলেন। যজ্ঞির ব্যাপার কিছু নয়, বাইরের এয়োও কাউকে বলেন নি—মহাদের তিন জাকেই শুধু বলেছিলেন। মহা পাঁচটা এয়োর ধুয়া তুলেছিল, তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'পাঁচটাই যে করতে হবে, কে বললে? বেজোড় হলেই হ'ল!'

মহাদের বলার সুবিধা আছে। ওরা ঘরের লোক, তাঁর হালচাল অনেকটা জানে, খুব একটা নিন্দা করবে না। কাজটা সেরেছিলেনও যতদূর সম্ভব কম খরচে। পুকুরে ছিপ ফেলিয়েছিলেন আগের দিন কান্তিকে দিয়ে, একটা মাঝারি কালবোশ আর গোটা দুই বাটা মাছ উঠেছিল। তাইতেই কাজ চলে গিয়েছিল। পায়েসের জন্যে বাজার থেকে এক পো মাত্র দুধ আনিয়েছিলেন—ইচ্ছে ছিল তাইতেই ফুটন্ত ভাত থেকে দুহাতা ফ্যানে-ভাতে ঢেলে দিয়ে গোটাকতক কুণ্ডুবাড়ির বাসি সন্দেশ গুঁড়িয়ে দেবেন; তার সঙ্গে খানকতক বাতাসা আর একটু কর্পূর দিলে কেউ টেরও পাবে না। সন্দেশগুলোয় একটু গন্ধ হয়ে গেছে—সেইজন্যেই কর্পূর দেওয়া।

কিন্তু অতকাণ্ড করতে হয় নি। মহাশ্বেতা মাকে ভাল ক'রেই চেনে, পাছে জায়েরা বাড়ি এসে টিট্‌কিরি দেয় তাই ভোরবেলাই এক ছেলেকে দিয়ে লুকিয়ে একপোটাক দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটু একটু ক'রে সকলের দুধ থেকে কেটে নিলে কেউ টেরও পায় না—অথচ কাজ চলার মতো বেশ খানিকটা দুধ পাওয়া যায়। এ মহাশ্বেতার বহুদিনের অভ্যাস। জায়েরা যে জানে না তাও না, কারণ কোন কাজটাই সে গোপনে করতে পারে না, সে বুদ্ধিই তার নেই। আস্তে কথা বলতে পারে না—কাজেই কোন কথা কি কাজ লুকোবার চেষ্টা করলে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। জায়েরা তাই জেনেও, কতকটা দয়া করেই, কিছু বলে না আজকাল। নিতান্ত ওর গায়েপড়া ঝগড়া খুব অসহ্য হ'লে মেজবৌ এক-আধদিন বলে ফেলে। জোঁকের মুখে নুন দেবার মতোই চুপ করিয়ে দেয় এই খোঁটাটা দিয়ে। তারপর কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে লাফিয়ে যত প্রতিবাদই করুক মহাশ্বেতা, সেদিনের মতো ঝগড়াটা চাপা পড়ে যায়, এ চেঁচামেচিও বেশিক্ষণ থাকে না। অভিযোগটা এতই সত্য যে বেশিক্ষণ প্রতিবাদ করতে বোধ হয় নিজেরই লজ্জা হয় তার।

অবশ্য অল্পস্বল্প খোঁচা দিতে কেউই ছাড়ে না। সেদিনও, কনকের সাধে খেতে বসে ভালমানুষ তরলাও বলেছিল, 'দিদি, পায়েসটা ঠিক আমাদের বাড়ির মতোই হয়েছে, না?'

তাতে প্রমীলা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'কেন লো— আমাদের বরদা গয়লানীর দুধের বাস্ পাচ্ছিস নাকি?'

মহা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বলেছিল, 'তোর যেমন কথা ছোট বৌ! অল্প দুধে পায়েস করা— তা আবার সেদ্ধ চালের, ও সব-বাড়িই এক রকম হয়।'...

এ পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটলেও বৌকে পাঠাতে একটু দেরি হয়ে গেল। পরের দিনই পড়ল গ্রহণ, গ্রহণের পর আট দিন যাত্রা নেই। তারপরই সংক্রান্তি মাস-পয়লা বৃহস্পতিবার— পরপর পড়ে গেল! শ্যামার ভাষায় 'আমার কপালে যেন ভগবান সার সার সাজিয়ে রেখেছিলেন দিনগুলি!' তার পরদিন পাঠাবেন সব ঠিক, বেয়াই-বাড়িও সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে— কিন্তু সেই বৃহস্পতিবারেই হঠাৎ কনকের ব্যথা উঠল, আর সারা দিনরাত ব্যথা খেয়ে শুক্রবার ভোরে ছেলে হয়ে গেল তার।

অগত্যা পাড়ার দাইকে ডাকতে হল, আনুষঙ্গিক যা কিছু খরচ তাও করতে হল। শ্যামার ভাষায়— 'এতটি গলে গেল। ছেলে এলই আমার সঙ্গে আক্‌চা-আক্‌চি করে— যেন মতলব এঁটে ঠাকুমার খরচ করাবে বলে। ও ছেলে যা হবে তা বুঝতেই পারছি। উঠন্তি

BanglaBook.org

মূলো পত্তনেই বোঝা যায়। হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে যদি না খায় তো কী বলেছি আমি। কে জানে, সেই মিন্‌সেই আবার আমাকে জ্বালাতে ফিরে এল কিনা। এদান্তে বেটার বৌকে খুব পছন্দ হয়েছিল তো— সেই বোয়ের কোলেই ফিরে এল বোধ হয়।'

শাশুড়ী যা-ই বলুন, কনকের কোন ক্ষোভ হয় না। কোন কথাই আর যেন তার গায়ে লাগে না।

ছেলে সুন্দর হয়েছে। কনকের মনে হয় বাপের মতোই সুন্দর হয়েছে। এক এক সময় মনে হয় আরও সুন্দর হবে। কান্তির কথা মনে পড়ে যায়, ওর বিয়ের সময় যেমন কান্তিকে দেখেছিল। শিউরে উঠে উপমাটা মন থেকে তখনই আবার যেন দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বাপ্ রে, ও চেহারায় কাজ নেই তার। ঐ রকম বরাত পেলেই তো হয়েছে। ছেলের রূপ নিয়ে কি হবে, গুণটাই বড়। মূর্খ অকর্মণ্য না হয় ছেলে। সে যেমন করে হোক— ভিক্ষে দুঃখ করেও ছেলেকে মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে।....

শ্যামাও, বধূর সম্বন্ধে মনে যতই বিদ্বেষ থাক, এই সব খরচপত্রের জন্য যত পরিতাপই হোক্— নাতি দেখে মন জুড়িয়ে যায়। তাঁর গর্ভের সন্তানরা বেশির ভাগই সুন্দর— তেমনিই হয়েছে এও। কান্তির মতো, ঐন্দ্রিলার মতো না হোক, বংশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। মনে মনে বার বার বলেন, 'বাঁচুক, মানুষ হোক।... কপাল ভাল নিয়ে এলে থাকে তবে তো— আমার ছেলেমেয়েদের মতো কপাল না হয়!'

কিন্তু ভাগ্য যেমনই হোক, ছেলের আয়পয় যে ভাল না— সেটা বোঝা গেল শীগগিরই।

ষষ্ঠীপূজো শেষ হ'তেই বৌকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন শ্যামা। বললেন, 'এখন কিছুদিন নিয়মে থাকা দরকার। এখানে থাকলে অনিয়ম হবেই। আর বিশ্রামও পাবে না, কে করবে বলো? আমি না হয় রেঁধে ভাতটা যোগালুম, কাঁথাকানি তো আর কাচতে পারব না। সেখানে পাঁচটার ঘর— বোনরা আছে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকতে পারবে। আর খাওয়া-দাওয়াই বা আমার ঘরে কী আছে, ভাত হাঁড়ির ভাত, আলাদা কিছু করে দোব সে ক্ষমতা কৈ?.... তার চেয়ে মা-বাপের কাছে যাক, তাদের মেয়ে তারা যেমন করেই হোক একটা ব্যবস্থা করবে।.... আমি তো একটা দিক টানলুম— তারা এবার করুক না!'

সেইটেই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই 'এতটি টাকা' খরচ হয়ে গেল— আবার যদি পোয়াতিকে সারিয়ে তুলতে হয় তো রক্ষে নেই। কোন্ না অন্তত এক পো দুধ জোগানি করতে হবে— পোয়াটাক ঘিও চাই। লুচি হালুয়া না হোক, কদিন ভাত-পাতে একটু না দিলে লোকেই বা বলবে কি! তার চেয়ে ওদের ওপর দিয়েই যাক— চাই কি, মাস-দুই যদি চেপে থাকে তো তাঁর এদিকের খরচও খানিকটা উশুল হবে। হাজার হোক, একটা পেট তো বাঁচবে।

কিন্তু বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে খবর এল হারানের খুব অসুখ— এদের কারুর যাওয়া দরকার। খবরটা দিলে চিরদিনের অগ্রদূত মহাশ্বেতাই। ছোট ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল গাছ-কতক নাজনে-ডাঁটা দিয়ে বোনের খবর নিতে তার মুখেই বলে পাঠিয়েছে তরু। কী অসুখ তা ছেলেটা ঠিক বলতে পারে নি— তবে দেখে এসেছে মেসোমশাই শুয়ে আছেন, অসাড় অনড় হয়ে, মাসীমা কান্নাকাটি করছে।

খবরটা এল দুপুরে, তখন হেম অফিসে। কান্তি বাড়িতেই থাকে বটে, এখনও সে পড়াশুনোর চেষ্টা করে খানিকটা কিন্তু মার তাড়নায় কিছুই হয় না। মা তাকে সারাক্ষণই বাগানে খাটাতে পারলে বাঁচে। এদিকে বইও সব হাতে নেই, তার ওপর মাথাটাও কেমন

BanglaBook.org

হয়ে গেছে অসুখের পর থেকে— মাথায় যেন কিছু ঢুকতে চায় না। মুখস্থ করলেও দুদিন পরে ভুলে যায়। সে জন্যে শ্যামার যেমন দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই, তেমন গঞ্জনারও না। সে গঞ্জনার ভাষা কানে না গেলেও আকারে-ইঙ্গিতে তার তীব্রতা বুঝতে পারে কান্তি, ফলে আরও যেন দিশাহারা হয়ে যায়। আরও অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে।

শ্যামা একবার ভাবলেন ওকেই পাঠাবেন, বললেনও ইশারায় কিন্তু তারপর নিজেই আবার বারণ করলেন। কোন লাভ নেই। ওঁরা দুজনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, উনি আর কনক— ওকে ঠোঁট নেড়ে কথাগুলো মোটামুটি বোঝাতে পারেন। এখনও হেমই পারে না— তরু তো পারবেই না। এই অবস্থায় ঠিক কতটা কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না তো, যদি বাড়াবাড়িই কিছু হয়ে থাকে তো তরু লিখে জানাবে সব কথা— সে সম্ভব নয়। তাছাড়া তরু তেমন লেখাতে পটুও নয়। মিছিমিছি কান্তিকে পাঠানো মানে তাদের উদ্ব্যস্ত করা। তার চেয়ে হেমই আসুক। আজকাল 'ওপর—টাইম' না থাকলে সে সকাল করেই ফেরে প্রায়। সন্ধ্যার পরই পৌঁছে যায়। ঠাকুর ঠাকুর করতে লাগলেন শ্যামা, যাতে সকাল করেই ফেরে হেম। ওপর-টাইমে সামান্য, কিছু পয়সা আসে বটে, তা হোক, তবু আজ তা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।...

ওভার-টাইম না থাকলেও— সেদিনই হেম ফিরল সামান্য একটু রাত করে। পোস্তায় গিয়েছিল, সস্তায় এটা-ওটা বাজার করতে। অবশ্য তাতে আটকাল না— তখন সবে আটটা, সিদ্ধেশ্বরীতলায় ঘড়ি দেখে এসেছে হেম— গিয়ে খবর নিয়ে আসতে সাড়ে দশটা এগারোটার বেশি হবে না। সে পুঁটলিটা নামিয়েই রওনা হয়ে গেল। অন্ধকার রাত— পথটাও খারাপ। কিছুদিন আগেই সামান্য কটা পয়সার জন্যে মানুষ খুন করেছে ডাকাতরা ঐ পথেই। মন চায় না পাঠাতে। বললেনও একবার শ্যামা, 'এখন না হয় থাক, ভোরে তুলে দিলে— পারবি না ঘুরে আসতে?'

'পাগল! তিন কোয়ার্টার এক ঘণ্টার পথ ভোরে গিয়ে আসব কেমন করে আফিসের আগ? কাল কামাই করাও চলবে না, কোন মতেই—বড়সাহেব আসবে আমাদের সেকশ্যানে। ও কিছু হবে না, আমি ঘুরে আসছি চট করে।'

যেতে দিতেও যেমন ইচ্ছা করে না— বাধা দেবারও শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত শ্যামা জোর করে কান্তিকেও সঙ্গে দিলেন। শুনতে না পাক— দোসর তো থাকবে অন্ততঃ।

'তুমি একা থাকবে?' আপত্তি করে হেম।

'সে আমি বেশ থাকব'খন— আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোরা ঘুরে আয়। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা!'

সদর দরজা ভাল করে বন্ধ হয় না, খিলটা কোনমতে ঠেকানো থাকে শুধু। একটা লোহা দা না কিনলে ওর কোন উপায়ও হবে না। কাঠটাও গেছে পচে, বহুকালের দোর জলে-রোদে জীর্ণ হয়ে এসেছে। নতুন লোহা লাগবেও না হয়ত। একেবারে দরজাটা পাল্টাবেন এই মনে করেই কিছু করা হয়নি। রাত্রে খিল বন্ধ করার পরও খান-দুই ইট নিচে ঠেকিয়ে রাখা হয়— কেউ ঠেলে ঢুকলে তবু আওয়াজ হবে। এখনও তেমনিভাবে বন্ধ করে রান্নাঘর আর বাইরের ঘরে শেকল তুলে দিয়ে দালানে এসে বসলেন শ্যামা। অন্যসময় কাজ না থাকলে আলো নিভিয়েই বসেন—অকারণে তেল পোড়ান না, আজ কুপিটা জ্বালিয়েই রাখলেন। যাবার সময় হেম একটু টুকে দিয়ে গেল বলেই— নইলে তাও রাখতেন না।

না, ভয় তাঁর শরীরী অশরীরী কোন প্রাণীকেই নেই। দীর্ঘকাল একা থেকেছেন, কাটিয়েছেন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে। হেম যখন হয়— গুপ্তিপাড়ার অতবড় বাড়িটায়

BanglaBook.org

সাতাশ বিঘে বাগানের মধ্যে বলতে গেলে একাই থাকতে হত। বুড়ো শাশুড়ী— সন্ধ্যেবেলাই ঘুমিয়ে পড়তেন। বড় বড় আমগাছ আর কালোজামের গাছে বাতাস লেগে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন সোঁ সোঁ আওয়াজ করত, উঁচু তালগাছগুলোর পাতায় আপনা-আপনি কটকট শব্দ উঠত— কত কী নাম-না জানা প্রাণীর বিচিত্র গতিবিধির আভাস পাওয়া যেত বাইরের অন্ধকারে— তখন ভয়ে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে আসত এক-একদিন। প্রাণপণে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে তাকে কাঁদিয়ে দিতেন, সেই কান্নার শব্দে শাশুড়ী যদি সজাগ হন, দুটো কথা বলেন এই আশায়।

হয়ত সব শব্দই সত্যও নয়, হয়ত অনেকখানিই কল্পনা— কিন্তু সেদিন অত বুদ্ধি হয় নি। নানারকম শব্দ পেতেন সত্যি সত্যিই। অন্ধকারে জানলার সামনে বড় বড় গাছগুলো আকাশ আড়াল করে যেন কী এক বিভীষিকার মতোই দাঁড়িয়ে থাকত। তার ওপর তার কন্দরে কন্দরে যখন জোনাকিগুলো দপদপ করে জ্বলত আর নিভত, যেন আরও ভয়ঙ্কর মনে হত সেগুলোকে। মনে হত— এত গাছপালা কী করতে হতে দেয় মানুষ? ফল খেয়ে কাজ নেই, তাঁর নিজের বাড়ি হলে জন ডেকে কালই গাছগুলো কাটিয়ে দিতেন!

তবু অন্ধকার একরকম। তাঁর আরও ভয় করত চাঁদনী রাত হলে। অসংখ্য পত্রপল্লবের ছায়ায় যেটুকু আলো নামত বাগানে, তাতে সবটা পরিষ্কার দেখা যেত না, খানিকটা আবছায়ার সৃষ্টি করত শুধু। গাছের ডালপালা কাঁপার সঙ্গে তাদের ছায়াও কাঁপত, মনে হত কত কী অশরীরী প্রাণী যেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক এক সময় আলোছায়ার বিচিত্র যোগাযোগে সত্যিই মনে হত একটা কে লোক দাঁড়িয়ে আছে— আর একটু পরে কিম্বা কাছে গেলে দেখা যেত না, ভূত দেখেছেন মনে করে কতদিন দৌড়ে পালিয়ে এসে ঘরের দোর দিয়েছেন কিম্বা আলো ছুঁয়ে বসে থেকেছেন। লোহা ছুঁলেও নাকি অপদেবতারা কিছু করতে পারে না, আর হাতেই লোহা আছে তাঁর— একথাটা সেদিন কিছুতে মনে পড়ত না। আজ দেখে দেখে বুঝেছেন ওগুলো শুধুই আলো-আঁধারির মায়া— অশরীরী কিছু আছে কিনা তা তিনি জানেন না, থাকলেও তারা শরীর ধরে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ও বাড়িটায় আবার এমন ব্যবস্থা, রাত্রে কোন প্রাকৃতিক কাজের দরকার পড়লে বাগানে বেরোনো ছাড়া উপায় থাকত না। সহজে শ্যামা বেরোতেন না, কিন্তু অসুখবিসুখ করলে বেরোতেই হত। সেই সময়গুলো যেন কান্না পেত তাঁর। শাশুড়ী দাঁড়াতেন ঠিকই— কিন্তু সেটা শুধুই দাঁড়ানো— তিনি প্রায়ই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলতেন আমি এই চেয়ে রয়েছি বৌমা, ভয় নেই, তুমি নিভ্ভরসায় চলে যাও!'

কিন্তু ভয়টা তা শুধু অশরীরী প্রাণীরই নয়—শরীরী প্রাণীরাও তো নেহাৎ কম যেতেন না! সাপ-খোপ তো আছেই, বাঘ বেরোনোও তখন ও অঞ্চলে খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। একবার মনে আছে— উনি পাইখানায় গিয়েছেন বাগানের মধ্যে—ফেউ ডেকে উঠল একেবারে পাশেই। শাশুড়ী চেঁচাচ্ছেন— 'বৌমা পালিয়ে এস, পালিয়ে এস'— তাঁর একবারও মনে হচ্ছে না যে পালিয়ে আসতে গেলে অন্তত বিঘে দুই জমি পেরিয়ে আসতে হবে— হয়ত বা বাঘের সামনে দিয়েই। তবু যেতেই হয়েছিল তাই— ডাক ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঐ পথটা ছুটে গিয়েছিলেন, হয়ত তাঁর চিৎকারেই বাঘ সরে গিয়েছিল।

তারপর পদ্মগ্রামে এসেও কম সইতে হয় নি তাঁকে। রাতের পর রাত ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেখানে দাঁড়াবারও লোক ছিল না কেউ, তাঁকেই দাঁড়াতে যেতে হত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সরকারবাড়ির বাগানের মধ্যেই ছিল বটে ঘরখানা, তবু ওঁদের মূল বাড়ি থেকে একেবারে আলাদা— অনেকটা দূরে। মন্দিরের গায়ে পূজুরীর ঘর— এইভাবেই করানো; ব্রাহ্মণদের দূরেই রাখতে চেয়েছিলেন কর্তারা— যাঁরা ঘর তৈরি

BanglaBook.org

করিয়েছিলেন। মঙ্গলা স্পষ্টই বলতেন, 'বাপরে, বামুন হল গে জাতসাপ, ওদের নেপ্‌চোয় কি থাকতে আছে। কত কি কথা ওঠে, কথার পিঠে কথা— কী বললুম না বললুম— অমনি হয়তো মন্যি দিয়ে বসে রইল। এক বাড়িতে থাকতে দুরন্ত ছেলেপুলে ঘরে-দোরে ঢুকবে কী সব অত্যাচার করবে, হয়ত হুঁশ রইল না গায়ে পা-ই লাগিয়ে বসল— সে পাপের বোঝা কে বইবে বলো? না, ও ঐ দূরে দুরে থাকাই ভাল :'

তারপর মুচকি হেসে, কৃষ্ণযাত্রায় শোনা গানের একটা কলি গেয়ে উঠতেন হয়ত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় 'দূরে রহুঁ দুরে রহুঁ প্রণাম হামার!'

সেই ঘরে, সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে বলতে গেলে দীর্ঘকালই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। এতটুকু এতটুকু বাচ্ছা নিয়ে, একদিনে ওরা বড় হয় নি, তিল-তিল সংগ্রাম করতে হয়েছে ওদের বড় করতে। দিনের পর দিন যখন অন্ন জুটত না, তখন একা ঐ অন্ধাকার বাগানে ঘুরে বেড়াতে হত যদি একটা পাকা তাল কি একটা ঝুনো নারকেল কুড়িয়ে পাওয়া যায়—এই আশায়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে আতা-পেয়ারা গাছে পেকেছে টের পেয়ে অন্ধকারেই হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে পেড়ে এনেছেন। অথচ কী না ছিল সে বাগানে, সাপ, গোসাপ, শিয়াল, বিছে— আরও কত কী। কিন্তু সেদিন ভয় করলে চলত না বলেই বেরোতে হয়েছে। এমন কিছু দুঃসাহসী তিনি ছিলেন না, মানুষ, বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ— সকলকেই ভয় করতেন, ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করত, তবু যেতে হ'ত। আর সেই ভাবে যেতে যেতেই ভয়টা কমেছে তাঁর— কেমন একটা ভরসা এসেছে মনে— তাঁর কিছু হবে না।

ভয় তাঁর কাউকেই নেই আজ— অদৃষ্টকে ছাড়া। অদৃষ্ট খারাপ বলেই— বহু দুর্ভোগ কপালে লেখা আছে বলেই জেনেছেন যে, তাঁর কিছু হবে না। সহজে অন্তত মরবেন না তিনি। মানুষ, জানোয়ার, ভূত— কেউই কিছু করতে পারবে না। তাঁর ভয় তাঁর এই কপালটাকেই, কে জানে আরও কী আছে অদৃষ্টে! আরও কী দুর্দিন কী দুর্ভাগ্য তোলা আছে তাঁর জন্যে।.....

চুপ করে বসেই রইলেন শ্যামা। দালানের দরজা বন্ধ করেন নি বটে কিন্তু সামনেই কুপির আলো, সেটা ডিঙ্গিয়ে অন্ধকার উঠোনে কিছুই ঠাওর হয় না। তা না হোক, তার জন্য ব্যস্তও নন তিনি। তিনি স্থিরভাবে চেয়ে আছেন কুপির ঐ কম্পমান শিখাটার দিকেই।

বাইরে নিশুতি হয়ে এল ক্রমে। মল্লিকবাড়ির ঝি-চাকররা এ সময়টা প্রায়ই কলহ-কেজিয়া করে রান্নাঘরে বসে— ওঁদের পিছন দিকেই ওদের রান্নামহল— তারাও চুপ করে গেছে— বোধহয় শুয়েই পড়ল। ভূতি মল্লিকদের মাতলামির দাপাদাপি চিৎকারও স্তিমিত হয়ে এল একটু একটু করে। মহাদেবের দিদিমা ঘাটে বাসন মাজতে এসেছিল— জলের ছপছপ আওয়াজে টের পেয়েছিলেন শ্যামা— সেও সম্ভবত বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল এতক্ষণে। এ পথে পথিক কেউ হাঁটে না রাত আটটার পর — এ পাড়ায় তাঁর ছেলেই সবচেয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরে— সুতরাং কারুর হাঁটার শব্দ পাবেন সে সম্ভাবনা নেই।

তবে মানুষের প্রাণলক্ষণ না থাক— অন্য জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের অভাব ছিল না। শব্দেরও না। মানুষ যখন নিস্তব্ধ হয় তখনই বোধহয় ওরা বেশি করে কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। এইটেই বোধ হয় ওদের নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করার অবসর, জীবনটা উপভোগ করার সময়। এখনই ওরা যেন বাঁচার মতো বাঁচে।

ঝিঁ ঝিঁ-পোকা সন্ধ্যে থেকেই ডাকে, অশ্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন, কিন্তু তখন কানে লাগে না, এখন মনে হচ্ছে অসহ্য। বাগানের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একাধিক গো-হাড়গেল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপের সামান্য শব্দ এ নয়, রীতিমত ভারী কিছু যাওয়ার মড়মড় শব্দ। শিয়াল ডেকে উঠছে থেকে থেকে। অনেকের ধারণা ওরা শুধুই প্রহরে প্রহরে ডাকে, এখানে বাস

BanglaBook.org

করলে সে ভুল ভাঙ্গত তাদের। প্রায়ই ডাকে ওরা, সময়ে অসময়ে। মল্লিকদের বাড়ির কার্নিসের কোণ থেকে পেঁচা-দুটোর কর্কশ কণ্ঠস্বর উঠছে— বোধহয় এখন কী একটা ছোট পাখি ধরেছে ওরা, তার করুণ চিঁচিঁ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরে থেমে গেল আবার। মরে গেছে পাখিটা। কোথায়— দূরে কোথাও দুটো বেড়ালে ঝগড়া করছে, তারও শব্দ শুনছেন শ্যামা। মাছে ঘাই দিচ্ছে মধ্যে মধ্যে পুকুরের জলে আলোড়ন জাগিয়ে। হয়ত ভামে খাচ্ছে মাছ। কে জানে!

এই সব শব্দই অন্য দিন হয়। বেশি রাত অবধি জেগে থাকা শ্যামার কাছে নূতন নয় কিছু, অন্যদিন এমনভাবে তাঁর কানে যায় না। সে সব দিনে অন্য চিন্তা থাকে, সেই চিন্তাতেই জেগে থাকেন। আজও চিন্তা আছে— কিন্তু সেই চিন্তাটাকেই তাড়াতে চাইছেন তিনি মন থেকে, মাথা থেকে। সেই জন্যেই প্রাণপণে কান পেতে আছেন বাইরের দিকে, কোথায় কি শব্দ হচ্ছে শোনবার চেষ্টা করছেন। চিন্তার সঙ্গে তিনি যেন ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছেন তাঁর ভাগ্যকেও।

তাঁর কপালে ভাল কিছু নেই তা তিনি জানেন। খবর যা আসবে তাও আঁচ করতে পারছেন। কিন্তু সে যখন আসবে তখন আসবে— এখন থেকে সে কথা ভাবতে চান না।

হঠাৎ কী একটা দমকা বাতাস উঠল। একেবারে আকস্মিক। মা বলতেন নিস্তব্ধ রত্রিতে এমনি দমকা হাওয়া তুলে পরিচিত মানুষের আত্মা চলে যায়। যাওয়ার পথে আত্মীয়-বন্ধুকে জানিয়ে দিয়ে যায় তাদের অস্তিত্ব। কে জানে কার আত্মা, চলে গেল এ বাড়ির ওপর দিয়ে। মার? নরেনের? তাঁর শাশুড়ীর? কী বলতে চাইল সে আত্মা, কোন্ নূতন বিপদের আভাস দিয়ে গেল, সতর্ক থাকতে বলল!.....

সে মর্মর শব্দ যেমন হঠাৎ উঠেছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। গাছপালাগুলো কিছুক্ষণ পত্রপল্লব নেড়ে স্থির হয়ে গেল আবার। শুধু বাঁশগাছের ডগাগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কান্ডে কান্ডে কটকট শব্দ তুলে আন্দোলিত হতে লাগল।

॥ ২ ॥

ছেলেরা ফিরল রাত বারোটারও পর।

বিপদ একটা নয়— অনেকগুলো।

হারানের অসুখটাও বাঁকা। হঠাৎ পাঁচ-ছয় দিন আগে খেয়ে উঠে কী একটা ব্যাপার নিয়ে বড়বৌয়ের সঙ্গে চেঁচামেচি করতে গিয়ে মাথায় খুব যন্ত্রণা টের পায়। দুহাতে মাথাটা ধরে বসে পড়ে উঠোনেই। সেদিন নাকি অফিস থেকে ফিরেও রাগারাগি করেছিল। কিছু না খেয়েই ক্লাবে গিয়েছিল রিহার্সাল দিতে। সেখানেও চেঁচাতে হয়েছে অনেকক্ষণ, ফিরে এসে ভাত খাওয়ার পর হঠাৎ চেঁচাতে গিয়েই এই বিপত্তি। কিন্তু শুধু মাথার যন্ত্রণাই নয়। ওকে বসে পড়তে দেখে ছুটে এসে দুই বৌ ধরতে গিয়ে দেখে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। খুব বেশি নয়— তবে নাকি নিতান্ত দু-এক ফোঁটাও নয়। তখন আর কিছুই করা যায় নি, ঘরে এনে শুইয়ে মাথায় জল দেওয়া ও বাতাস করা ছাড়া। অত রাত্রে কে-ই বা ডাক্তার ডাকতে যাবে। নিবড়েয় তেমন কোন ডাক্তারও নেই। এখানকার কোন ডাক্তারকে খবর দিলেও যেত না সে সময়ে।

যাই হোক— সে রাত্রে হারান আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি, একটু অস্ফুট গোঙানি ছাড়া। ওরা প্রশ্ন করে উত্তর পায় নি, ভেবেছে মাথার যন্ত্রণার জন্যই উত্তর দিচ্ছে না। সকালে বুঝেছে যে তা নয়, অজ্ঞানের মতো হয়ে আছে। তখন বড় বৌ কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি গেছে খবর দিতে, তরু পাড়ার লোক ডেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছে।

BanglaBook.org

ডাক্তার আর শ্বশুর একসঙ্গেই এসেছেন। শ্বশুর দেখেশুনে মুখের ওপরই বলেছেন, সন্ন্যাস রোগ— ও আর বাঁচবে না। ডাক্তার অতটা হতাশ করেন নি, তবে তাঁরও মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। কী সব ওষুধ দিয়ে কতকটা জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন কিন্তু দেখা গেছে যে হাত-পা আর কিছু নাড়তে পারছে না, কথাও কইতে পারছে না। কথা কারও বুঝতেও পারছে কিনা সন্দেহ। পক্ষাঘাতের মতোই সব লক্ষণ। ডাক্তার বলেছেন যে, সন্ধ্যা থেকে রাগারাগি করে আর চেঁচিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে ছিল, তার ওপর আবার চেঁচাতে গিয়ে এই বিপত্তি। মাথার কোন শির ছিঁড়ে গেছে, এই তাঁর বিশ্বাস। বলেছেন প্রাণের ভয় এখনও যায় নি। তবে হয়ত বাঁচিয়ে দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু আগের মতো সহজভাবে আর চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বিপদের ওপর বিপদ— শ্বশুর এসে জামাইবাড়িতে জেঁকে বসে আছেন, সুতরাং তিনিই এখন অভিভাবক। খরচপত্র সব তাঁর হাতে, তিনিই সব করছেন। তরুর বিশ্বাস বুড়ির সিন্দুকে আর হারানের আলমারীতে নগদ টাকা ঢের ছিল, বুড়ির দরুন কিছু গয়না তো ছিলই— সেই জন্যেই হারান কোনদিন বাড়িতে চাবি রেখে যেত না। বুড়ি মরার পর থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। শ্বশুর এসে প্রথম দিনই চাবির গোছা হস্তগত করেছেন। এবং প্রকাশ্যে মেয়ের গহনা সব নিজের বাড়িতে রেখে এসেছেন বাক্স সুদ্ধ। কিন্তু তরু বলে যে, তার মধ্যে ওর সতীনের গহনা ছাড়াও অনেক জিনিস তিনি বই করেছেন। বুড়ির দরুন যা কিছু ছিল সবই। এ-ছাড়াও অফিস থেকে ওর বন্ধুদের সাহায্যে টাকাকড়ি নিয়ে এসেছেন খানিকটা, অসুখের অজুহাতে। সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। তরু একেই ভীতু আর লাজুকে, তবু সর্বনাশ হয় দেখে একটু মৃদু প্রতিবাদ করতে গিছল। তিনি চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বলেছেন, অফিসের টাকা না পেলে তো চিকিচ্ছেই চলত না, ঘরে তো কিছুই ছিল না। সিন্দুক আর আলমারী তো নামেই— ভেতরে তো ঢু-ঢু, অষ্টরম্ভা। বিশ্বাস না হয় খুলে দ্যাখো না।'

মরিয়া হয়ে তবু বলতে গিছল তরু যে, সে নিজে দেখেছে সিন্দুকে নগদ টাকা আর গিনি ছিল, আলমারীতেও কিছু কিছু টাকা রাখত হারান। এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে যাবার কথা নয়— কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ওর সতীন তেড়ে এসেছে, তবে কি তার বাবা মিছে কথা বলছেন? তরু কি বলতে চায় তিনি চুরি করেছেন সে টাকা?

তেড়ে এসেছেন সতীনের বাবাও। তাঁর সে সময়কার ভয়ঙ্কর চোখমুখের চেহারা দেখে তরুর মনে হয়েছে যে তিনি হয়ত ওকে মার-ধোরই করবেন।

শুধু তাতেই ক্ষান্ত হন নি, আজই নাকি বিকেলে ওকে শুনিয়েছেন, 'যে রকম ঘটায় চিকিৎসা হচ্ছে, টাকা যা পেয়েছি, তাতে আর কদিন? এরপর তো তোমার গয়না বেচতে হবে। তোমার ছেলে হয়েছে, বিষয়-সম্পত্তি তো সবই সে পাবে। ওর তো মেয়ে— আশাভরসা বলতে তো ওর কিছুই নেই, ঐ গয়না কখানা ছাড়া। সেও তো আমারই দেওয়া। ওতে তো আর হাত দিয়ে বলতে পারি না! ওরও তো সারা জীবন পড়ে রইল। মেয়েটা যদি বাঁচে, তার বিয়েও দিতে হবে।.... না, ওর কাছ থেকে কিছু পিত্যেশ করো না। সোয়ামীকে যদি বাঁচাতে চাও তোমাকেই টাকা বার করতে হবে!'

এ-ও সব নয়, ছেলেটা নাকি গত দুদিন একজ্বরী হয়ে আছে। জ্বর বাড়ছেও না কমছেও না— ছাড়বারও কোন লক্ষণ নেই। তার কোন ওষুধের কথা তো কেউ চিন্তাই করছে না— এখন আরও কিছু খারাপ না হলে হয়। তরু ঠিক মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি— কিন্তু হেমের মনে হল সে একটু কিছু ভয় করছে। তার মনে হচ্ছে হয়ত যে সতীনের দিক থেকে ছেলেটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করাও বিচিত্র নয়।

Banglabook.org

দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে হেম চুপ করল। তার বলার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে যে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভোর ছটায় খেয়ে গেছে, এখনও পেটে কিছু পড়ে নি। অফিসে সে কোনদিন কিছু খায় না, জলখাবারের বিলাসিতা এখনও অভ্যাস হয় নি তার। দুবেলা দুমুঠো ভাত ছাড়া নিজে থেকে কিছু খায় না। বড় মাসীমার বাড়ি গেলে তিনি হয়ত কিছু খেতে দেন। আজ তাও যায় নি, উল্‌টে বাজারে বাজারে ঘুরছে। তার ওপর এই দীর্ঘ পথ হাঁটা। কিন্তু শুধু শারিরীক ক্লান্তিই নয়— মনে মনেও আজ যেন বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেটা ওর মুখের চেহারা দেখেই টের পাচ্ছেন শ্যামা। মনের জোর আর কিছুমাত্র নেই, শরীরের চেয়েও মনই বেশি অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কান্তিরও দুই চোখ ছলছল করছে, সামান্য আলোয় ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁর মনে হল চোখ দুটো অস্বাভাবিক লালও হয়ে উঠেছে। হয়ত পথে আসতে আসতে কেঁদেছে কিম্বা প্রাণপণে কান্না চাপার ফলেই অত লাল। এসে পর্যন্ত আলোটার দিকে চেয়ে বসে আছে চুপ করে। আরও ওকে যেটা পীড়ন করছে সেটা ওর উপায়হীনতার লজ্জা— এবং গ্লানিও। ওর মনের মধ্যেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন শ্যামা।.... কিছুই করতে পারছে না সে, কিছুই করবার নেই। কোন কাজেই লাগাতে পারছে না এদের, আর হয়ত পারবেও না কোন দিন.....

এরা সকলেই মুহ্যমান, এরা সকলেই বিচলিত কিন্তু শ্যামা সে রকম কিছু বোধ করছেন না কেন! খুব যে একটা দুশ্চিন্তা, একটা দুঃখ— কৈ, তেমন মনে হচ্ছে না তো। বরং বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ওদের, লক্ষ করছেন। মনে হল এদের অলক্ষে একবার বুকটা টিপে দেখেন—ভেতরের মতো বাইরেটাও পাথর হয়ে গেছে কিনা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেললেন শ্যামা, 'অনেক রাত হয়ে গেল তো, বোধহয় বারোটা একটা হবে— মুখ হাত ধুয়ে নে, তোদের ভাত দিই।'

হেম চমকে উঠল ওঁর কথা শুনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখল মার মুখের দিকে।

এতক্ষণ কি এসব কথা কিছুই শোনেন নি? না, বহু আঘাতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? অমন নির্বিকারভাবে বসেই বা আছেন কী করে? যেন অপর কারও কথা বলা হচ্ছে! ওর নিজের মেয়ে নয়— পরস্যাপি পর কেউ!

শ্যামা কিন্তু প্রস্তাব করেই দাঁড়িয়েছেন। ওঁর কথা শোনে নি কান্তি— হঠাৎ ওঁকে সহজভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেও চমকে উঠল। অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইল সেও।

শ্যামা হাতটা মুখে তোলার ভঙ্গি করে ইশারায় ওকেও বললেন, 'হাত-পা ধুয়ে নে ভাত দিই।'

হেম যেন একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলল, 'তোমার তো সেই সকালের ভাত-ব্যঞ্জন, সে কি এখনও আছে? সে-তো পচে বজ্‌কে উঠেছে এতক্ষণে। আর থাকলেও এত রাত্রে খেতে পারব না। এক গ্লাস জল দাও, তাহলেই হবে।'

কনক চলে যাওয়ার পর থেকে দুবেলা আর রাঁধেন না শ্যামা— বেলায় যা রাঁধেন তাই এই দু'ভায়ের জন্যে রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা এসে হেমকে প্রত্যহই কড়কড়া ভাত খেতে হয়। আজ সে ভাতের কী অবস্থা হয়েছে তা বুঝতে পারছে সে।

শ্যামাও তা বুঝলেন। তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। আগের দিন মল্লিকরা কী উপলক্ষে হরির লুঠ দিয়েছিল— তারই কখানা বাতাসা দিয়ে গেছে। সেই বাতাসা কখানা বার করে দিয়ে দু'ঘটি জল গড়িয়ে দিলেন ঘড়া থেকে। একহাতে সব কাজ সারতে হয় বলে খুদ ভাজার লাড়ুও করতে পারেন নি কদিন— ফলে খাবার মতো আর কিছু ঘরে নেই।

হেম মুখ-হাত না ধুয়ে সেই অবস্থাতেই দুখানা বাতাসা মুখে দিয়ে ছোট ঘটির পুরো একটি ঘটি জল খেল। এত যে তেষ্টা পেয়েছে তা সে নিজেও এতক্ষণ বোঝে নি।

BanglaBook.org

জল দিয়ে শ্যামা দাঁড়িয়েই আছেন। অর্থাৎ শুয়ে পড়তে চান এবার। হেম চলে গেলে দোর দিয়ে শুয়েই পড়বেন হয়ত।

সে আবারও মার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। সত্যিই কি মার মাথার গোলমাল হয়ে গেল?

একটু ইতস্তত করে আবার সে নিজেই কথাটা পাড়ল, 'কান্তি একটা কথা বলছিল আসতে আসতে— বলছিল এখানে এ রোগের যে ঠিক ঠিক চিকিৎসা হচ্ছে তা তো মনে হয় না। তার চেয়ে, খরচ তো হচ্ছেই পাল্কী করে এনে ট্রেনে তুলে কোন মতে ধরাধরি করে কলেজে নিয়ে গিয়ে ফেললে কি হয়?'

এবার শ্যামা কথা কইলেন। মনে হল যেন একটা অন্ধ আক্রোশে দুই চোখ জ্বলে উঠল তাঁর। সে আক্রোশ তাঁর ভাগ্যবিধাতার ওপর। সামনে পেলে বাঘিনীর মতোই নখে-দন্তে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন হয়ত—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এসব করবে কে? তুমি তো আপিস নিয়ে আছ, আর ও তো ঐ — না মনিষ্যি না জানোয়ার। যা পার করো— আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। ঢের মাথা ঘামিয়েছি, ঢের ভেবেছি। আর না। আর আমি ভাবতে পারি না। ভেবেই বা কি হবে?.... যতই যা করো— ও যা হবে তা তো আমি জানিই। আমার ভাল কিছু হয় না কোন দিন। এও হবে না। কেউ থাকবে না আমার, কেউ না—। শুধু আমি রাক্ষুসী চারযুগ বসে থাকব সবাইকে খেতে, সকলের সর্বনাশ দেখতে—'

বলতে-বলতে এতক্ষণ পরে দুই চোখ ছাপিয়ে হু-হু করে জল নামে তাঁর। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন সজোরে। হাহাকার করে কেঁদে ওঠেন।

হেম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পরের দিন ভোরবেলা অফিস যাবার পথে হেম ডাক্তারের বাড়ি হয়ে গেল। এ পাড়ারই ডাক্তার—বড় ডাক্তারের ছেলে, ভাল প্র্যাক্টিস। এত ভোরে দেখা পাবার কথা নয়— তবে সে শুনেছিল ডাক্তারের পূজোপাঠের অভ্যাস আছে, হয়ত ভোরেই ওঠেন। দেখা পেয়েও গেল সে। অত সকালেই ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার—দেখা হয়ে গেল। তিনি প্রস্তাবটা শুনে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমার তো মনে হয় না এ ঝুঁকি আপনাদের নেওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয় এখনও— অত টানা-হেঁচড়া কি সইবে? এখান থেকে একেবারে গাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন কিম্বা পাল্‌কীতে— সে আলাদা কথা। তাও রাস্তা যা, গাড়িতেও নিয়ে যেতে বলি না। ঝাঁকানিতেই দফা রফা। পাল্‌কীও বোধহয় কলকাতা পর্যন্ত যেতে রাজি হবে না। তাছাড়া সেও পাল্‌কীতে তোলা নামানো কম কাণ্ড নয়— ও-তো হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। কলকাতা হলে য়্যাম্বুলেন্স ডাকতে পারতেন। এখানে তো সে ব্যবস্থা নেই!'

তবু হেম বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলা অনেক ঘুরে দেখল। কোন পাল্‌কীওলাই রাজি হল না যেতে। কলকাতায় গেলে নাকি পুলিশে বড় দিক্ করে, সে হ্যাঙ্গামে ওরা যেতে রাজি নয়। তাছাড়া রুগী নিয়ে যাওয়া—যদি পাল্‌কীতেই মরে যায়? তাহলে ওদের পাল্‌কীতে কেউ চড়বে না।

খুব পীড়াপীড়ি করতে একজন পঞ্চাশ টাকা হেঁকে বসল।

অর্থাৎ না যাওয়ারই মতলব। সুতরাং কিছু করা গেল না।

রাত্রে হেম গিয়ে কান্তিকে রেখে এল তরুর কাছে। তবু একটা দোসর। আর কিছু না হোক, ছুটে এসে খবরটাও দিতে পারবে। ওকে কাগজে লিখে ওখানের ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দিলে একটু, যাতে একটু নজর রাখতে পারে হারানের শ্বশুরের ওপর। ছেলেটাকেও একটু দেখতে পারবে কান্তি।

BanglaBook.org

খানিকটা ইতস্তত করে শ্যামার কাছেও কথাটা পাড়ল, 'তুমি একবার গেলে বোধহয় ভাল হত। অতটা পারত না ওরা।.... বিপদের সময় জামাইবাড়ি বলে সঙ্কোচ করতে গেলে চলে না।'

কিন্তু শ্যামা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন, না। আর পারাপারির কিছু নেইও। যারা জামাইয়ের মরণ টেঁকে আগেই টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করে, তারা এত বোকা নয় যে রয়ে-বসে নেবে। যা করবার তা করেই ফেলেছে। হরিনাথের বেলা নিজের মা-ভাইই ঠকিয়ে নিলে— এ তো শ্বশুর। .... মিছিমিছি আমি গিয়ে নিমিত্তের ভাগী হতে চাই না, ওরা মজা পেয়ে যাবে, বলবে ও মাগীও সরিয়েছে।'

অগত্যা হেমকে চুপ করে যেতে হয়।

অভয়পদকে বলতে হবে কথাটা। তার একটা পরামর্শ নেওয়া দরকার।

॥ ৩ ॥

শরৎ খবরটা পেলেন গোবিন্দর কাছ থেকে। ওদের বাড়িও আসতে পারে নি হেম, কাকে দিয়ে যেন খবর দিয়েছে। গোবিন্দ আপিস থেকে ফেরার পথে বলে গেল।

তখন উমা ছিলেন না। ফিরে এসে স্বামীর মুখে শুনলেন সব। আগে বলেন নি শরৎ, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বললেন।

উমা শুনে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'যা শুনছি তাতে তো আশা-ভরসা বিশেষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। যদি বা অন্য লোকের ক্ষেত্রে বাঁচত, ছোড়দির যা বরাত—।....ঐ মেয়েটাও না আবার ঘাড়ে চাপে! কেউ তো নেই শুনেছি জামাইয়ের তিন কুলে, আর কে-ই বা দেখবে?... যদি অমনি অনড় হয়ে পড়ে থাকে, সে তো আরও বিপদ। তখন ওকে সুদ্দু টেনে এনে তুলতে হবে। যা পিশাচ শ্বশুর প্রথম পক্ষের— সে ঘেঁষ নেবে না।... তাই তো!'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আহা, বড্ড ভালমানুষ মেয়েটা, সাত চড়ে রা করে না। ওর কপালেই কি যত দুর্ভোগ!.... একে তো ঘাড়ে একটা সতীন চাপল, আগেকার কালে ওটা গা-সওয়া ছিল, এখন তো সতীন নিয়ে ঘর করা শোনাই যায় না, ওর কপালে তাও হল। তার ওপর—'

তার ওপর কি সেটা আর বলতে পারেন না উমা, মধ্যপথেই থেমে যান। কন্যা-স্থানীয়া সম্বন্ধে সে দারুন সম্ভাবনার কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারেন না। শরৎ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করেন, 'যাবে নাকি?'

'না, না। আর না।'

প্রবলবেগে মাথা নাড়েন উমা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ লাল হয়ে ওঠেন। সে অকারণ লজ্জা ঢাকতেই বোধহয় মুখটা ফিরিয়ে বসেন একটু।

আগের সে উজ্জ্বল কান্তি আর নেই, রোদে রোদে ঘুরে মুখখানা তো রীতি-মতো তামাটে হয়ে উঠেছে, তবু সে বর্ণান্তর টের পান শরৎ। এ লজ্জার কারণটাও মনে পড়ে যায় তাঁর। তিনিও মাথাটা নামান একটু।

অনেকদিনের কথা হল। তবু মনে আছে। স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছেন যেন।

হরিনাথের অসুখের খবর পেয়ে উমা পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন। ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছেই মানুষ বলতে গেলে, তাই তার আসন্ন বৈধব্যের সম্ভাবনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। অন্য কোন লোক না পেয়ে শরতের প্রেসে ছুটে এসেছিলেন সঙ্গে যাবার জন্যে। তখন কোন সম্পর্কই ছিল না, যেটুকু ছিল সেটুকু অভিমানেরই, তার আগে কোন

BanglaBook.org

দিন নিজে থেকে এসে কিছু চান নি উমা, বোধহয় সুদূর কল্পনাতেও ভাবতে পারেন নি যে কোনদিন কোন সাহায্য চাইতে হবে এই স্বামীর কাছে—যে স্বামী একদিনও গ্রহণ করেন নি তাঁকে, যে স্বামী পরের প্রেমে উন্মত্ত। তবু এসেছিলেন, প্রেস কোন্ দিকে তা ধারণা ছিল না— গোবিন্দ এসে দেখিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে স্বামীকে ডেকে বাইরে এনে মিনতি করেছিলেন— কোনমতে একটু সঙ্গে যাবার কি সুবিধা হবে? হরিনাথ মরণাপন্ন, ঐন্দ্রিলা একা অসহায়— তিনি এখনই একবার ওদের দেখতে যেতে চান।

খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন শরৎ। অনুরোধটা অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বলেই শুধু নয়, বিব্রত হবার আরও কারণ ছিল। তাঁর রক্ষিতা গোলাপীর কাছে তিনি আমরণ বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু সে তাঁকে সম্পূর্ণ পেয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না, তার সংশয় কখনও যায় নি। সে টের পেলে কী পরিমাণ অশান্তি করবে তা তিনি জানতেন— আর করেও ছিল তা— তবু সেদিন শরৎ তাঁর কর্তব্যই পালন করেছিলেন, এক মুহূর্তর বেশি ইতস্তত করেন নি।

সেদিনের কথা মনে আছে বৈকি। ট্রেনের পথটুকু একরকম, যথেষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে যাওয়া যায়, স্টেশনে নেমে অপরিসর পাল্‌কীতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে যাওয়া— অন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে— সেই বয়সেও একটু মোহ, খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। তারপর সেখানে নেমেও, হরিনাথের মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সন্দিগ্ধ প্রশ্নে দুজনেই যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছিলেন।

'আর না।' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি সচেতন হয়ে উঠেছেন উমা। সেদিনের স্মৃতিটই মনে পড়ে গেছে তাঁর।

তাই এ সুগভীর লজ্জা।...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন শরৎ।

উমাও বোধ করি সেই বিশেষ দিনটার স্মৃতিতেই ডুবে গিয়েছিলেন— শরতের নিঃশ্বাসের শব্দে সম্বিৎ ফিরল তাঁর। তিনিও একটা নিঃশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, 'আমার দ্বারা আর ওসব খবরদারী করা সম্ভব নয়। আমার শরীরে আর বয় না। তার ওপর একটু উদ্বেগ দুশ্চিন্তা হলেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে— শরীর আরও দুর্বল বোধ হয়।... আর কেনই বা, ভগবান যখন দিলেনই না— তখন পরের ঝঞ্ঝাট বইতে যাই কেন শুধু শুধু।'

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন উমাও।

কিন্তু শোওয়া আর ঘুমনো এক কথা নয়। উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে চাইলেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। উমাও পেলেন না। বহুরাত্রি পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করলেন, মধ্যে একবার উঠে গিয়ে মাথায় জল দিয়েও এলেন, তবু তাঁর চোখে তন্দ্রা নামল না।

দুটো বিছানার মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। একজন জেগে থাকলে আর একজনের সেটা অগোচর থাকা কঠিন। শরতেরও তা অজানা রইল না।

তার কারণ তিনিও জেগেই ছিলেন। ইদানীং হাঁপানিটা কম ছিল, রাত্রে ঘুমও হচ্ছিল কদিন। তাঁর অনেক সাধনার ঘুম বলেই উমারও সতর্কতার অন্ত ছিল না। পাছে তাঁর ঘুম ভেঙে যায় বলে অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরছিলেন— যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বাইরে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সেদিন শরৎ ঘুমোন নি। বহু রাত্রিই অনিদ্রায় কাটাতে হয় বলে স্থির হয়ে থাকাটা অভ্যেস হয়ে গেছে। স্থির হয়েই শুয়েছিলেন বলে উমা তাঁর জেগে থাকাটা টের পান নি। নইলে তন্দ্রা নামে নি তাঁর চোখের পাতাতেও।

তিনিও ভাবছেন আকাশ-পাতাল। ভাবছেন উমার কথাই।

অনেকদিন ধরেই ভাবছেন।

BanglaBook.org

উমা মিছে বলেন নি, কথার কথা নয়। সত্যিই উমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শরৎ কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছেন সেটা। সুগভীর ক্লান্তি ফুটে উঠেছে মুখেচোখে।

হয়ত সবটাই তার কায়িক দুর্বলতা নয়— দীর্ঘদিন ধরে একঘেয়ে পরিশ্রমে হয়ত মানসিক অবসাদও এসেছে একটা। কিন্তু সেটাও তো কম কথা নয়; মানসিক ক্লান্তি যখন মুখের ভাবে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে, তখন সেটা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন বুঝতে হবে।

আর শারীরিক ক্লান্তিরই বা অপরধাধ কি। হলও তো বহুদিন— প্রায় ত্রিশ বৎসর হতে চলল। এই একই কর্মসূচি। বেলা বারোটা না বাজতে বাজতে বেরিয়ে যাওয়া— রাত আটটা নটায় বাড়ি ফেরা। এক টাকা দু'টাকা— বড় জোর চার টাকার টিউশ্যানি, বহু বাড়িতে অনেক মেয়েকে না পড়ালে একজনের খরচ চলে না। টাকা যা-ই দিক, সকলেই ঘড়ি মিলিয়ে নেয়। দেড় ঘন্টার আগে উঠলে মুখ ভার হয় মেয়ের মায়েদের। এখন ইংরেজি পড়ার রেওয়াজ হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে-ইস্কুল সেখানকার মাস্টারনীরাও টিউশ্যানি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রতিযোগিতা খুব বেশি। উমার মতো শুধু ফার্স্ট বুক পড়া শিক্ষয়িত্রীর টিউশ্যানি জোটাও আজকাল কঠিন। সেজন্যে ভয়ে ভয়েই থাকেন উমা।... এসব কোনদিন খুলে না বললেও কথায় বার্তায় বেরিয়ে আসে। কতকটা শুনলে বাকিটা অনুমান করে নেওয়া চলে।

শুধু অবিশ্রাম বকাই নয়— হাঁটতেও হয় অনেক। শ্যামবাজার, আহিরীটোলা, বিডন স্ট্রিট, —এক এক জায়গায় এক একজন। পুরনো বাড়ি খুব বেশি নেই। বছর দুই পড়লেই ওঁর বিদ্যা শেষ হয়ে যায়— শুধু প্রাথমিক পাঠ ছাড়া ওঁকে দিয়ে পড়াবে কে? যে বাড়িতে অনেকগুলি বোন পর পর সাজানো থাকে, সে বাড়িতেই টিকে থাকেন উমাও। কিন্তু সে রকম বাড়ি এখন একটিই আছে বিডন স্ট্রীটে। ইদানীং — অনেক মেয়ে হাতছাড়া হওয়ায়, জানাশুনোর মধ্যে ভাল কাজ না পেয়ে উমা ভদ্র গৃহস্থ বাড়ি থেকে একটু নামতেও বাধ্য হয়েছেন। খারাপ পাড়ায় না, ভদ্র পাড়ায় ভদ্রলোকের মতোই বাস করে, অথচ পরিচয়টা গোলমেলে বিবাহিত দম্পতি নয়— জেনে শুনেই এমন বাড়িতে পড়ানো ধরতে হয়েছে তাঁকে। এরা মাইনে ভাল দেয়, টাকা ছাড়াও অন্য জিনিস দেয়— যত্ন করে সম্মান করে— তবু, উমার অপমান বোধ হয় বৈকি। প্রথম যেদিন এইরকম বাড়িতে কাজ নিতে হয়েছে— বেশিদিনের কথা নয়—শরৎ আসার পরের কথাই— সেদিন বাড়ি ফিরে অবসন্নভাবে বসে পড়াটা শরৎ কোন দিনই ভুলবেন না। কী সুগভীর লজ্জা আর অবসাদই না ফুটে উঠেছিল মুখে— মনে হচ্ছিল বোতল ভরা কালি কে ঢেলে দিয়েছে।

গোপন করেন নি— সবই বলেছিলেন উমা। গত তিন চার মাস ধরেই আয় কম হচ্ছে— কিছুতেই কোন ভদ্রবাড়িতে আর কাজ যোগাড় করতে না পেরেই এ কাজ নিতে হয়েছে তাঁকে। বাজারে দেনা হয়ে গেছে—মুদির দোকানে, এমন কি সবজি বাজারেও বাকি পড়েছে— আর অপেক্ষা করবার সাহস নেই তাঁর।

বহুদিন ধরেই ভাবছিলেন— কিন্তু সাহস হয় নি। সেদিন বোধ করি উমার ঐ প্রায়-ভেঙ্গে-পড়া মূর্তি দেখেই মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন।

গোলাপী মরার পর যখন নিজের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ল তখন প্রেস লীজ দিয়েছিলেন। সেই লীজই আছে এখনও, সব মাসে টাকা আদায়ও হয় না। তিন-চারদিন ঘুরে বকাঝকা করে আদায় করতে হয়। যে মাসে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন সে মাসে আদৌ কিছু পাওয়া যায় না। তবে সে-ই সব নয়, তাঁর হাতেও কিছু আছে। যত কমই হোক, কষ্ট করে চলে যায়। আর কদিনই বা বাঁচবেন তাঁরা!

BanglaBook.org

সেই কথাই বলেছিলেন, 'কিন্তু কেন এত কষ্ট করছই বা তুমি— আমার যা আছে তাতে কোনমতে শাকভাত আমাদের দুজনের চলেই যাবে। কিছু ছিল হাতে, এই কবছরে কিছু জমেওছে, তুমি তো আমার খোরাকির বেশি এক পয়সাও নাও না— যা নাও তাতে আমার খোরাকিও বোধহয় চলে না পুরো—কাজেই আর যত কমই হোক, কিছু কিছু তো জমেছেই।... আর না হয় ছাপাখানাটা বেচে হাতে নগদ টাকা নিয়ে চলো কোন তীর্থস্থানে চলে যাই। কাশীতে শুনেছি খুব সস্তা-গণ্ডা—বহু বুড়ি মাসে দু'টাকা তিন টাকা আয়ে চালায় সেখানে— কাশীতে গিয়েও থাকতে পারি। কদিনই বা আর বাঁচব আমরা, যা আছে দুটো পেট চলেই যাবে!'

'না!'

কথাটার গতি কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রথম থেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন উমা—প্রতিবাদ করার জন্য কথর ফাঁক খুঁজছিলেন শুধু— এবার একেবারে যেন ফেটে পড়লেন।

'না। এ যত দুঃখই পাই না কেন, যত নীচু দোরেই ঢুকতে হোক না কেন—এতে আমার লজ্জার কোন কারণ নেই। নিজের কাছে নিজের মাথা উঁচু আছে। তোমার ভাতের চেয়ে এ ঢের ভাল। এতকাল যদি তোমার ভাত না খেয়ে কেটে থাকে তো বাকি কটা দিনও কাটবে।... মা সতীরাণীর কাছে এই প্রার্থনাই করি অহরহ— অনেক দুঃখ অনেক অপমান জীবনে দিয়েছ—এই অপমানটা আর দিও না। তোমার ভাত যেন না খেতে হয়। তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় অন্তত!'

বলতে বলতে যেন হাঁপাতে থাকেন উমা। উত্তেজনায় মুখচোখ আরক্ত হয়ে ওঠে তাঁর।

এর উত্তর দেবার শক্তি নেই শরতের, এরপর আর কথা বলার সাহস নেই।

তিনি মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

এ উমার আর এক মূর্তি। আর কোন কারণে কোন প্রসঙ্গেই এত উত্তেজিত হন না উমা। এত কঠিন কথাও অন্য সময় তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ব্যথা পান শরৎ, ব্যথা পান এই দুর্বাক্যের জন্য নয়, ভর্ৎসনার জন্যও নয়— ব্যথা পান উমার জন্যই।

প্রথম জীবনে যেন অন্ধ হয়েই ছিলেন। অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব মায়ের কাছে মানুষ হয়েছিলেন বলে বাপের কাছ থেকে পাওয়া স্বাভাবিক ভদ্রতা নিয়ে জন্মেও অপর মানুষের দিকটা ঠিক দেখতে শেখেন নি। ওর বাবার অকালমৃত্যু হয়েছিল— কিন্তু তাকে আত্মহত্যা বলাই উচিত। প্রবল জ্বরের ওপরও বারবার স্নান করে নিমোনিয়া ডেকে এনেছিলেন তিনি— আজ শরৎ বুঝতে পারেন— সে ঐ স্ত্রীর জন্যেই।

শরতের বহু গুণ ছিল কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ না করলে তার জীবনে কী হতে পারে, সে-কথাটা ভাববার মতো মানসিক গঠনই তাঁর ছিল না। লেখাপড়া শেখেন নি, ভদ্রসমাজে মেশেন নি— তাই কোন কথা গুছিয়ে ভাবতেও পারতেন না সেদিন।

প্রথম যৌবনের সুতীব্র আবেগে গোলাপীকে ভালবেসেছিলেন— তার কাছে শপথ করেছিলেন যে, সে জীবিত থাকতে অন্য স্ত্রীলোককে কামভাবে স্পর্শ করবেন না। মার কথায় তিনি বিবাহে সম্মত হয়েছেন শুনেই সে শপথ করিয়ে নিয়েছিল— অন্যথায় আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। পতিতার কাছে করা শপথ রাখতেই তিনি উন্মুখযৌবনা বিকশিত পদ্মের মতো স্ত্রীকে গ্রহণ করেন নি সেদিন। আজ সে-কথা মনে হলে হাসি পায়। দুঃখের হাসি। সে শপথ এমনভাবে রক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ বুঝতে শিখেছেন যে, এ-শপথ রক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তর শপথ ভঙ্গ করেছেন তিনি— অগ্নি ও নারায়ণের কাছে করা শপথ!

BanglaBook.org

আশ্চর্য। এসব দিকে চোখ খুলে দিয়েছে কিন্তু সে-ই। সে-ই বলতে গেলে ওকে মানুষ করেছে। গোলাপী ছোট জাতের মেয়ে, তায় অতি নীচু ঘরের পতিতা কিন্তু অসামান্য রূপলাবণ্যের আকর্ষণে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁর ঘরে এসেছেন। শরতের সংস্পর্শে আসার আগে তো বটেই, পরেও। শরৎকে জেনে-শুনেই সে প্রস্তাবে রাজি হ'তে হয়েছে— সময়ে সময়ে তার জন্য ঈর্ষার জ্বালাও ভোগ করতে হয়েছে কিছু কিছু। তার কারণ ঈশ্বর-দত্ত রূপ ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না, এক পয়সাও দেবার সঙ্গতি ছিল না তাঁর। বরং গোলাপীই তাঁকে দিয়েছে ঢের। ছাপাখানা করেছিলেন, সে-ও তারই পয়সায়। অর্থাৎ গোলাপী তাঁর রক্ষিতা ছিল বলা ভুল—তিনিই তার রক্ষিত ছিলেন।

হয়ত সেই জন্যেই গোলাপীর কথাবার্তা আচার-আচরণ ভদ্রঘরের ময়ের মতোই ছিল। তার সংস্পর্শে এসেই শরৎ অনেক ভদ্র হয়েছিলেন। অবশ্য ব্যবসার কল্যাণেও বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে— জেনেছেন-শিখেছেন ঢের। নইলে তাঁর বাল্যের পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার মতো নয়।

ভুল বুঝতে পেরেও তা সংশোধনের চেষ্টা করেন নি কেন? শুধুই কি গোলাপীর প্রতি প্রেম, কৃতজ্ঞতা, সেই ছেলেমানুষী শপথের ভয়— নাকি আরও ছেলেমানুষী সংকোচ একটা, বৃথা চক্ষুলজ্জা? কে জানে— আজও ঠিক মনের এ-খবরটা পান নি শরৎ— আজও প্রশ্নের কোন উত্তর নিশ্চিত করে দিতে পারেন না।

কে জানে— যখন সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল ওঁদের— যখন কিছুটা কাছাকাছি এসেছিলেন, তখন এ পক্ষ থেকে যদি একটু জোর দেওয়া হ'ত—এদিক থেকে যদি সঙ্কোচ ভাঙবার চেষ্টা করা হত, তাহলে কী করতেন উনি। আজ ঠিক করে বলা শক্ত! কে জানে তখনও শপথের ভয় থাকত কি না।

কিন্তু সে কিছুই হয়ে ওঠে নি। কিছুই করা হয় নি। শুধু দুহাতে এই জীবনটা উড়িয়ে দিয়েছেন, নষ্ট করেছেন। নিজেরই শুধু নয়— এঁরও। দুটি দুর্লভ জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আজ তার জন্য অনুতাপ হয় বৈকি। আজ মনে হয় তিনিও ঠকেছেন। সে যতই ভালবাসুক, তার কাছ থেকে যতই পান— দাম্পত্য-সুখ সেখানে পান নি তিনি। এ আলাদা জিনিস। ঘর-সংসার করেছেন, সন্তানও হয়েছে— তবু গৃহ-সুখে বঞ্চিতই থেকে গেছেন চিরকাল। ছোট একটি নিজস্ব সংসারে সর্বময় কর্তা, একেশ্বর হয়ে থাকার যে তৃপ্তি, তা অনাস্বাদিতই রয়ে গেল এ-জীবনে। ভদ্রসমাজে সাধারণ গৃহস্থ হয়ে বাস করার মধ্যে যে সম্মান, তারও কি মূল্য কম?

না, অনেক কিছুই হারিয়েছেন তিন। অনেকখানি। আজ মনে হয়, কোনমতে যদি জীবনের এই কটা বছর ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা যেত! অন্তত কিছুটা সময় যদি পিছিয়ে যাওয়া যেত— যখন স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি এতটা কঠিন হতে পরতেন না, সে-ক্ষমা পাওয়া যেত।

এখন এই স্ত্রীর সামান্য কিছু প্রয়োজনে লাগতে পারলেও ধন্য হয়ে যান তিনি, কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু আজ বুঝি কোথাও কোন পথ খোলা নেই তার।

স্ত্রীর প্রিয়-সাধনের জন্যেই তিনি খোকাকে এনে রেখেছেন, কান্তিকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে আর কতটুকু?

বরং মনে হয় এখানে এসে এই চোখের সামনে থাকাটাই উমার পক্ষে আরও যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে। কোন দিন সামান্য কোন যত্ন করলে, কোন মিষ্টি কথা বললে, কি ওর কাজে কোন সাহায্য করতে গেলে উমার চোখে জল এসে যায় তা তিনি লক্ষ্য করেছেন বহুদিন। যেদিন ঐ কাজ ছেড়ে দেবার কথা তোলেন সেদিন শেষ রাত্রে ঘরের বাইরে

BanglaBook.org

উঠোনের দিক থেকে চাপা কান্নার আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল— খুবই সামান্য শব্দ— কিন্তু তাঁরও হাঁপানির টানের মধ্যে বসে বসে ঘুম— ভাঙ্গতে দেরি হয় নি। অন্ধকারেই উঠে এসে দেখেছেন রকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছেন উমা। মুখে কাপড় গোঁজা— তবু সে কান্নার শব্দ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি, এমনই আকুল সে-কান্না।

এক একবার মনে হয় এর চেয়ে তিনি দূরে কোথাও চলে যাবেন— বহু দূর কোন দেশে— সেখানে তাঁর অদৃষ্টে যা হয় হবে, উমাকে তো মুক্তি দেওয়া যাবে। কিন্তু তা-ও পারেন না, বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে। লোভও হয়— যদি কোনদিন কোনকাজে লাগতে পারেন, যদি কোন একটি সামান্যতম বেদনার কাঁটাও তুলে দিতে পারেন ওর এই বিড়ম্বিত জীবন থেকে। সেই তো পরম লাভ। সে সম্ভাবনাটুকু নষ্ট করতে মন চায় না।

॥ ৪ ॥

গলির ওপাশে ঘোষেদের বাড়ির সাদা দেওয়ালটায় ভোরের আভাস লাগামাত্র উমা উঠে পড়লেন। এমনিই ওঠেন তিনি প্রত্যহ। কোন কোন দিন আরও আগে ওঠে। বেশ খানিকটা রাত থাকতেই উঠতেন এতকাল কিন্তু তাতে আলো জ্বেলে ঘরের কাজ সারতে হয়। শরৎ আসার পর সে-ব্যবস্থায় একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। দেশলাই জ্বালার আওয়াজে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়, চোখে আলোটাও লাগে। শরতের যেদিন হাঁপানির টান ওঠে, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন, ভোরের দিকেই যা একটু তন্দ্রা আসে। সেটুকু ভাঙ্গাতে মায়া হয় উমার। আর সেই জন্যই— একটু অন্তত আবছা আলো আসার অপেক্ষা করতে হয়।

তা নইলে রাত থাকতে ওঠাই সুবিধা তাঁর। গঙ্গাস্নানের অভ্যাস করেছেন মার মতো। তাতে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয়, শরীরটাও ভাল থাকে। আসলে, শরতের বিশ্বাস, মার মতোই নিরিবিলিতে চোখের জল ফেলে মনটা হালকা করতে যান ওখানে— গঙ্গাজলে চোখের জলে একাকার হয়ে যায়, সে-কান্না কেউ টের পায় না।

গঙ্গাস্নানের জন্যই এত ভোরে উঠতে হয় তাঁকে। আরও ভোরে উঠলেই ভাল হয়, ফরসা হলে ভিড় বেড়ে যায়, সে বড় অসুবিধা। পাঁচটা মেয়ে এক জায়গায় হলেই পাঁচটা বাজে প্রসঙ্গ— ও আর উমার ভাল লাগে না। অথচ এক ঘাটে যাঁরা প্রত্যহ স্নান করতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে একটু মুখচেনা গোছেরও পরিচয় হয়ে যায়— তাঁরা কথা কইলে মুখ ফিরিয়ে চলে আসা যায় না, দুটো কথা ওঁকেও বলতে হয়। এইটেই এড়াতে চান উমা। অথচ এখানেও কিছু কাজ থাকে— বিছানা ঠিক করা, দুটো ঘর বাইরের রকটুকু মোছা, নিজের প্রাতঃকৃত্য সারা— খুব কম করেও এক-ঘণ্টার ধাক্কা। একটু রাত থাকতে না উঠলে সবদিক সামলাতে পারেন না।

আজও উঠে ঠাকুরদের নাম সেরে বিছানা থেকে নামতে যাবেন, হঠাৎ শরতের বিছানার দিকে চোখ পড়ে গেল। মনে হল শরৎ তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। শরৎ জানলার দিকটায় শোন্, যেটুকু আলো ঐদিক থেকেই আসে। তাই আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট কিছু বোঝা আগেই উঠেছেন। নেমে কাছে এসে দেখলেন সত্যিই চেয়ে আছেন শরৎ, চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই, সম্ভবত অনেক আগেই উঠেছেন।

'ওমা তুমি জেগে আছ! আমি বলি ঘুমোচ্ছ। পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায় বলে—

শরৎ তেমনি স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আর গঙ্গাচানে না-ই বা গেলে। সারা রাত তো ঘুমোও নি— এখন একটু ভোরাই হাওয়ায় ঘুমিয়ে নাও না!

'সারারাত যার ঘুম হয় নি— এখন এই সকালের আলোয় শুলে তার ঘুম হবে?

BanglaBook.org

তোমার কি বুদ্ধি!.... কিন্তু তুমি জানলে কি করে আমার ঘুম হয় নি? তুমিও কি জেগে ছিলে? কৈ, আমি তো টের পাই নি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চান উমা।

'তুমি ঘুমোও নি কেন? শরীর খারাপ করেছে?'

কাছে এসে কপালে হাত দেন।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে ফেলেন শরৎ। খুব কোমলকণ্ঠে বলেন, 'আমার কিছু হয় নি, বেশ আছি। কিন্তু তোমার শরীর সত্যিই খারাপ হয়েছে। আজ আর বেরিও না, ঘুম না হয়, এমনিই একটু বিশ্রাম কর।'

'হ্যাঁ, শুয়ে থাকলেই আমার চতুর্বর্গ হবে! ছাড় ছাড়, অসুমর কাজ পড়ে— এমনিই বেলা হয়ে গেছে। গঙ্গায় গিয়ে সেই মাগীর দঙ্গলে পড়তে হবে।'

তবু হাতটা ছাড়েন না শরৎ। বলেন, 'একদিন গঙ্গায় না গেলে কি হয়?'

'তা কিছু হয় না। এই তো কতদিন যাই না। তবে সারারাত না ঘুমিয়ে আজ এখন মাথা আগুন হয়ে আছে, গঙ্গায় না গেলে ভীষণ মাথা ধরবে, কোন কাজ করতে পারব না।'

আর বাধা দিলেন না শরৎ। একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে হাতখানা ছেড়ে দিলেন।

বাধা দেবার কোন অধিকারই রাখেন নি তিনি। এ হাত ধরারও কোন যোগ্যতা নেই। এটুকু সময়ও যে সহ্য করেছে, কটু কথা বলে নি এই ঢের।...

বালতি-ন্যাতা এনে ঘর মুছতে মুছতে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে হেসে উমাই আবার কথাটা তুললেন।

'আমি ভাবছি আজ পড়িয়ে আসবার সময় খোকাটাকে নিয়ে আসব। কাল তো বড় বৌমার আসবার কথা গেছে— আর না এলেও, একটা দিন বড়দি বেশ চালিয়ে নিতে পারবে।'

খোকা এক মাসেরও ওপর কমলার বাড়ি আছে। গোবিন্দর বৌ বাপের বাড়ি, ছেলেমেয়েসুদ্ধ নিয়ে গেছে সে— কমলা টিকতে না পেরে খোকাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। নাতি-নাতনি হবার পর আজকাল আর একা থাকতে পারেন না তিনি। গোবিন্দ কোনদিনই রাত নটার আগে আসে না, এক-একদিন আরও দেরি করে— কমলার বড় কষ্ট হয় অত রাত অবধি একা একা বসে থাকতে।

'একটা দিন আমিও চালিয়ে নিতে পারব—তার জন্যে নয়। কিন্তু একদিনের অত চিন্তা কেন? তরুর ওখানে যেতে হবে বুঝি?'

সলজ্জ হেসে উমা বলেন, 'হ্যাঁ— ভাবছিলুম কাল রবিবার আছে, পড়ানো নেই, একটু ঘুরেই আসি।'

'তা খোকাকে আনবার কী দরকার— আমার জন্যে? না সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'না, তোমারই জন্যে। আজকাল ও তো সব পারে, তোমার অনেক সুসার হবে।'

'আমার জন্যে অত কাণ্ড করবার দরকার নেই। আমি বেশ থাকব, তুমিই বরং নিয়ে যাও— একলা গিয়ে পথঘাট খুঁজে পাবে না— আতান্তরে পড়বে।'

'না, না। সে আমি একরকম করে খুঁজে নেব এখন। তোমারই কাছেই একজন থাকা দরকার। সারাদিনের ফের, কখন ফিরব—মানে ফিরতে পারব কিনা তারও তো ঠিক নেই। তুমি অসুস্থ মানুষ— কখন শরীর খারাপ হয়ে পড়বে কি হবে, হাঁপ শুরু হলে তো নড়তে পারো না। খোকা থাকলে এদিকে তোমার ফাই-ফরমাশ খাটা কি বুকে একটু মালিশ করা— এগুলো তো পারবে, উনুন জ্বেলে চা-টাগুলোও করে দিতে পারবে।'

'এখন ভালই আছি, সে সব কিছু হবে না। সে যেদিন শুরু হবে আগে থাকতেই টের পাই।... এই তো কদিন একা রয়েছি, তুমি তো রাত আটটার আগে ফেরো না। তা যদি

BanglaBook.org

পারি তো আরও না হয় দুটো ঘণ্টা পারব 'খন থাকতে। তা অতশতরই বা দরকার কি, চল না আমিও যাই তোমার সঙ্গে—'

'তুমি যাবে? যেতে পারবে অতটা? ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হয় শুনেছি—'

মুখচোখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে উমার।

'তা পারব না কেন? এখন তো শুনেছি গাড়ি হয়েছে। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে, খোকা বলছিল। তা তাই চল তাহ'লে। সেই বেশ হবে। তাহলে আর কোন পেছটান থাকে না। তোমাকে রেখে গেলে ঐ একটা দুর্ভাবনা থাকবে—'

কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ গাঢ়স্বরে শরৎ বললেন, 'তুমি আমার জন্যে এত ভাব—? সত্যি? এইটে শুনলে মনে বড় বল পাই। আমার তো কোন জোরই নেই— এই কথা শুনলে তবু মনে হয়— আমি যত অপরাধই করে থাকি না কেন তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখবে, তাড়িয়ে দেবে না। আজকাল বড় ভাবনা হয় জান— যতদিন একা ছিলুম সে একরকম সয়ে গিয়েছিল, এখন মনে হয়, তুমি ছেড়ে দিলে আমার একদিনও চলবে না। আর অমন করে থাকতে পারব না আমি— একা একা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে হয়ে—'

আজ আবার সকাল থেকে কী আদিখ্যেতা শুরু হল তোমার!' ঝঙকার দিয়ে ওঠেন উমা। কণ্ঠস্বরে যথা সম্ভব স্বাভাবিক রূঢ়তা আনবার চেষ্টা সত্ত্বেও আশা ও আশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ করেন শরৎ— মনের আবেগটা ধরা পড়ে যায়। তাতেই একটু বেশি রূঢ় শোনায় যেন। তারপর যখন কথা বলেন তখন আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় সেটা।— 'তোমাকে ছেড়ে দিতে আর পারলুম কৈ? তাহ'লে আর যেচে ঘরে নিয়ে আসব কেন? এখন একবার যখন বোঝা ঘাড়ে নিয়েছি তখন আর নামাব কি করে? কার ঘাড়ে চাপাব আর? এক—'

'হ্যাঁ', শরৎ তাড়াতাড়ি ওরই কথার সূত্র ধরে যেন বলেন, 'সেইদিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রো— দোহাই তোমার! একেবারে যমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিও, তাহলেই তোমার ছুটি। সেইটুকুই আমি চাইছি!'

'ও আবার কি কথা! বলে এত দুঃখ দিয়েও আশ মিটল না বুঝি? দেবার মধ্যে দিয়েছ তো এই লোহা আর সিঁদুরটুকু— সেটাও সইছে না?.... ও আশীর্বাদে আর কাজ নেই।

'কিন্তু তুমি গেলে আমার কি গতি হবে?.... এই তো— একবেলা কে দেখবে সেই ভাবনায় অস্থির হচ্ছ— তখন কে দেখবে?'

অনেকক্ষণ উমা কোন উত্তর দেন না, নীরবে বাকি ঘরটুকু মুছে নেন। তারপর মুখ টিপে হেসে বলেন, 'তা যম এলে তাকে কি বলব শিখিয়ে দিও।.... কখনও তো আমার হয়ে কাউকে কিছু বললে না— পারো তো তাকে বলে ব্যবস্থা করো— যাতে দুজনেই এক সঙ্গে যেতে পারি।... না কি, সেখানে তো আবার আর একজন বসে আছেন! আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়বে না তো?'

শরৎ প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'না না, আর কেউ নেই। সে যা ঋণ ছিল তার কাছে এ জন্মেই শোধ হয়ে গেছে, পরকালে আর কোন দাবি তার নেই। আর যদিই বা বসে থাকে, দাবি করে— তোমার হক্ তুমি ছাড়বে কেন? তোমার তো জোরের জিনিস— এবার জোর ক'রেই তোমার পাওনা আদায় করবে, এমন ভাল মানুষের মতো ছেড়ে দিও না—'

'তবু ভাল!' বলে উমা আর একটু হেসে বাল্‌তি হাতে কলতলায় চলে যান।

খেয়ে দেয়ে পান মুখে দিয়ে বেরোবার সময় হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়ান উমা। 'দ্যাখো গো, গোটা-দুই টাকা হবে তোমার কাছে?'

BanglaBook.org

'তা হবে।... হঠাৎ টাকা চাইলে যে?'

'মাসের শেষ, হাতে যে কিছু নেই। ধারই চাইতুম, তা তুমি মেসো সঙ্গে যাচ্ছ— তোমারও তো কিছু কর্তব্য আছে। একটু লেবুটেবু কিনে নেবো আর কি।'....

'তা সে আজ কি—?' শরৎ টাকা দুটো বালিশের তলা থেকে বার করে দিতে দিতে প্রশ্ন করেন, যাবে তে কাল?'

'আজই এনে রাখব মনে করছি। কাল ভাবছি রাত থাকতে উঠে যা হয় দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নটা দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। নইলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আর না খেয়ে গেলে সে বড় পীড়ন করা হয়— তার যা অবস্থা শুনছি— মেয়েটা তো জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছে— সেখানে না খেয়ে গিয়ে হাজির হওয়া— সে বড় লজ্জা করে!'

'না না—খেয়েই যাব। তা দু'টাকাতেই হবে?'

'ঢের ঢের। বইবে কে অত?.... তাছাড়া খরচাও তো হবে ঢের। ... ট্রেন-ভাড়া আছে, গাড়ি-ভাড়া আছে—একগাদা খরচা। তোমার তো আর কুবেরের ভাণ্ডার নয় — ধর যদি কাল আমি মরেই যাই— তখন তো মাইনে করে লোক রাখতে হবে, এমন আপ-খোরাকী বিনে-মাইনের ঝি আর মিলবে না তো!'

'আবার ঐ কথা? বললুম না যে তোমাকে আমি ছাড়ব না?'

'আচ্ছা, আচ্ছা— ধরেই রেখো। যতদিন পারো খাটিয়ে নিও—আর কি! তবে যমরাজের সঙ্গে ব্যবস্থাটা করে নিও কিন্তু—'

টাকা দুটো আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে যান উমা।

খবরটা পেলেন পাড়ার দু-তিনটি ছেলের মুখে। বাড়িওলাদের একটি ছেলেও ছিল তাদের মধ্যে। ছুটতে ছুটতে এসেছে তারা। বোধ হয় ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এসেছে।

উমার আসবার সময় হয়েছে আন্দাজ করেই— তাঁকে একটু চমক লাগাবার জন্যে — শরৎ তখন গুলের উনুনটায় আঁচ দিয়ে সাগু চাপিয়ে দিয়েছেন। উমা বারোমাসই রাত্রে দুধসাগু খান। একা থাকার সময় ঐ অভ্যাস করেছেন। এখন আর কিছু সহ্য হয় না। আগে সকালেই করে রেখে দিতেন, এখন ফিরে এসে এই উনুনটা জ্বেলে করে নেন। শরৎ যেদিন ভাল থাকেন সেদিন রুটি কিংবা পরোটা খান দুখানা— সেও এই উনুনেই হয়। নইলে তিনিও সাগু খান। তার সঙ্গে হয় কোন সস্তা দামের মিষ্টি, কি দুটো নারকোল নাড়ু— কিংবা নিদেনপক্ষে বাতাসা। সকালের তরকারি একটু-আধটু রাখা থাকে, সেটাও গরম করে নেওয়া হয় একবার। শরৎ রুটি না খেলে সাগুর সঙ্গেই খান দুজনে।

অন্যদিন উমা ফিরলে এই উনুনে আঁচ পড়ে। তিনিই এসে দেন। একটা কেরোসিনের পলতে দেওয়া পুরনো আমলের স্টোভ আছে, সেইটে জ্বেলে শরৎ শুধু একবার নিজের মতো চা করে নেন বিকেলে। আজই হঠাৎ খেয়াল হয়েছে; কালকের ঐ সারারাত জাগার পর আজ তো অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই হয় নি, গঙ্গাস্নান, বাজার, রান্না— তারপর সারাদিন হাঁটা আর বকুনি— সবই তো চলেছে। আসবে তো মড়ার মতো হয়ে। আবার এইসব করবে— তার চেয়ে তিনিই করে রাখবেন। ওরও সুসার হবে খানিকটা, এসে একটু স্থির হয়ে বসতে পারবেন— বিশ্রাম পাবেন, আর শরতেরও একটু বাহাদুরী নেওয়া হবে, দেখিয়ে দেবেন উমাকে যে, তিনি যতটা অকর্মণ্য ভাবেন স্বামীকে ততটা অকর্মণ্য উনি নন।

ভেতরে উনুনের ধারেই বসে ছিলেন— ছেলেরা এসে দোর ঠেলে এক সঙ্গে 'মেসোমশাই' বলে ডাকতেই চমকে উঠেছেন শরৎ। উমা সকলেরই মাসীমা, সেই সূত্রে তিনি মেসোমশাই ঠিকই—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো ওদের বিশেষ আলাপই নেই বলতে গেলে।

BanglaBook.org

কথা-বার্তা বলে ওরা কদাচিৎ। উনি অধিকাংশেরই নামটাও জানেন না। ওরা কেন অমন ভাবে ডাকবে ওঁকে—এত ছেলে এক সঙ্গে—?

তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে আরও চমকে উঠলেন। আগে যেটা ছিল শুধুই বিস্ময় সেটা এবার আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল।

ওরা সবাই ওঁকে দেখে অমন মাথা নামিয়ে দাঁড়াল কেন? কেউই যেন কিছু বলতে পারছে না—?

'কি—কী হয়েছে বিমু? ব্যাপার কী?' একমাত্র যে ছেলেটিকে চেনেন এদের মধ্যে, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। এক পা আরও এগিয়ে আসেন ওদের দিকে।

'তোমাদের মাসীমা— তাঁর কিছু হয় নি তো?'

এইবার ওরা মাথা তুলল। না বললেও নয় আর। কিন্তু বলাও কঠিন। বিমুর চোখ ছলছল করছে, রাস্তা থেকে আসা গ্যাসের আলোতেও তা লক্ষ করলেন শরৎ, চোখের কোণে কোণে চিক্ চিক্ করছে জলের আভাস।

'আপনি— আপনি একটু এই মোড়ে চলুন মেসোমশাই, এই বড় রাস্তার মোড়ে—। একটা— একটা য়্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'য়্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? তা বেশ তো তা আমি যাব কেন? কি য়্যাক্সিডেন্ট?'

ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করেন শরৎ। আর করতে করতেই বুঝতে পারেন যে, ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে খুব। কী হয়েছে, কার হয়েছে—য়্যাক্সিডেন্ট তাও বুঝতে পারেন, তবু সেই বুঝতে পারাটাকেই যেন যতক্ষণ সম্ভব উপলব্ধি থেকে সরিয়ে রাখতে চান। যতক্ষণ না পরিষ্কার শুনছেন ততক্ষণই যেন বাঁচোয়া। যেটুকু সময় পান সেইটুকুই লাভ।

ওরা তাঁর আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে আবারও বলে, 'আপনি একটু চলুন মেসোমশাই। আপনার যাওয়া দরকার।'

'দরকার? অ। তা চল। দরজাটা দিয়ে যাব— না খোলাই থাকবে?'

একেবারে বুঝি ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছেন শরৎ। কি বলছেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন না বাধ হয়।

ভাবছেন, প্রাণপণে ভাবছেন সকালের কথাগুলো। সে ছেড়ে যাবে না কোথাও, যেতে পারে না। তাহলে তাঁকে দেখবে কে?

বাড়িওলাদের ছেলে বিমু আর একজনকে ইশারা করলে। সে ওঁর একটা হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বলল, 'আসুন মেসোমশাই, আমি নিয়ে যাচ্ছি—'

বিমু বলল, 'আপনি চলুন, আমি মাকে বলে যাচ্ছি দরজা বন্ধ করে দেবে—'

কেমন একরকম অসহায় ক্ষীণকণ্ঠে বললেন শরৎ, 'উনুনে সাবু চড়ানো ছিল মানে তোমার মাসীমা খাবেন— তা—'

কথা শেষ করতে পারেন না; ছেলেটি টেনে নিয়ে যায়।

ওঁদের গলি ছাড়িয়ে রামহরি ঘোষ লেন। তারপর বিডন স্ট্রিট। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা?

'কোথায়, কোথায় হল য়্যাক্সিডেন্টটা?'

'ঐ হেঁদোর মোড়টায়— এই কাছেই। আর দূর নেই।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যান শরৎ। এতক্ষণের অভিভূত ভাবটা যেন কেটে যায়। সবল সুস্থ মানুষ হয়ে যান যেন অকস্মাৎ। অনেকটা সহজ কণ্ঠে বলেন, 'এখনও বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ বাবারা—?'

'বোধহয় আছেন।' আস্তে আস্তে বলে বিমু। সে মাকে বলে ছুটে এসে ওঁদের ধরে ফেলেছে।

BanglaBook.org

আর কোন প্রশ্ন করেন না শরৎ। সহজভাবেই হেঁটে যান। একটু জোরেই চলেন বরং।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। ভিড় জমে গিয়েছে। বহুলোক ঘিরে রয়েছে কিছু একটা। ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে একটা। তার পিছু পিছু আরও অনেকগুলো ট্রাম। পুলিশও এসেছে—

হেঁদোর ওদিক থেকে আসছিলেন উমা। হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি এসে পড়ে উল্‌টো দিক থেকে— সেইটে বাঁচাতে গিয়ে ট্রামে ধাক্কা খেয়েছেন। হাতপা কেটে বেরিয়ে যায় নি কোনটা, থেঁতলে গেছে বেশি। মাথাতেও নাকি চোট লেগেছে। রাস্তাতেই পড়ে আছেন, এখনও।

শরতের ভালো করে দেখা হল না। তাঁরও দুর্বল দেহ— মাথা ঘুরে উঠল, সেইখানেই তিনি বসে পড়লেন।

কে একজন যেন বলল, 'ওরই স্বামী।'

'তাই নাকি!' ফিস ফিস করে বলল আর একজন, 'আহা আহা— তাই মাথা ঘুরে উঠেছে অমন করে—। বুড়োমানুষ, দ্যাখো দিকি, এই বয়সে এ শক্! বেচারি।'

এই সবই যেন কত দূর থেকে ভেসে আসছে—এই গলার আওয়াজগুলো। যেন দূরে কোথাও কারা বলাবলি করছে!

কারা সব ওঁকে হাত ধরে তুলে এনে একটা বাড়ির সদরে বসিয়ে দিল।

শুধু একটাই প্রশ্ন করলেন শরৎ, এতক্ষণ চেষ্টা করে করতে পারলেন 'প্রানটা — প্রাণটা আছে বলে কি মনে হল? তাহলে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা — মানে যদি বাঁচত এখনও—'

ভিড়ের মধ্যে থেকেই কে একজন বললে, 'বুকের কাছটা বোধহয় ধুকধুক করছে এখনও। প্রাণটা এখনও আছে বলেই মনে হচ্ছে। আপনি ভাববেন না কিছু— টেলিফোন করা হয়েছে— য়্যাম্বুলেন্স এতক্ষণে এস যাবারই কথা। ঐ বোধহয় আসছেও— যা ভিড়—'

হঠাৎ শরতের মনে হল—সাগুটা? নামিয়েছে তে ওরা? সবসুদ্ধ যদি পুড়ে যায় উমা এসে রাগারাগি করবে—

য়্যাম্বুলেন্সটা সত্যিই এগিয়ে এল। স্ট্রেচার নিয়ে কারা নামছে?

একবার দেখে নিলে হত। তখন তো ভাল করে চাওয়াই হল না— সব যেন ঝাপসা একাকার হয়ে গেল। শুধু নজরে পড়েছিল চওড়া লাল শাড়ির পাড়টা, আর হাতের সাদা শাঁখাটা। সেও চকিতে, তারপর আর কিছু দেখতে পান নি।

কে একজন এসে একটা পুঁটুলি রেখে দিল ওঁর পাশে।

'ওনার হাতেই বোধহয় ছিল পুটুলিটা। দেখুন তো... কী ছিল তা তো জানি না, খুলে ছড়িয়ে গিয়েছিল। যতটা পেরেছি কুড়িয়ে এনেছি—'

পুঁটুলির গেরোটা খোলে নি— এদিকেটা বোধহয় রাস্তায় ঘষড়ে ছিঁড়ে গেছে। কাদা-মাখামাখি— তবু ঝাড়নটা ওঁদের বলেই মনে হল। নতুন ঝাড়নটা, মাত্র কদিন আগে এনেছেন উমা। কে এক ছাত্রীর মা দিয়েছে— ওঁর ঝাড়নটা ছিঁড়ে গেছে দেখে। সেই ঝাড়নের এই অবস্থা দেখলে উমা হায়-হায় করবেন—

কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতোই পুঁটুলি খুলে দেখলেন শরৎ, ছেঁড়ার দিকটাই খুলে দেখলেন। একটা গোল কাঠের বাক্স— আঙুর নিশ্চয়ই, গোটা দুই বেদানার মতোও মনে হচ্ছে, আরও সব কী রয়েছে। একটা খালি শালপাতার ঠোঙ্গা—খালি কেন? ও—এই যে ক্ষীরের বরফি ছিল, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে—এক-পয়সানে চিনি-কচকচে বরফি, যা পূজোয় দেয় সাধারণতঃ, শরৎ ভালবাসেন এগুলো খেতে। দুধসাগু কি পরোটার সঙ্গে খাবেন মনে করেই নিয়েছিল বোধহয়—

BanglaBook.org

চুপ করে বসে রইলেন শরৎ। য়্যাম্বুলেন্সে তোলা হল, একটু পরে তা চলেও গেল। পাহারাওলা ভিড় ঠেলে এসে ওঁর নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলো। ভাগ্যে বিমু কাছে ছিল, সেই বলে দিলে। উনি হয়ত বলতে পারতেন না। নম্বরটা আজও জানেন না বাড়ির, কাউকে কোনদিন ঠিকানা দেবার তো দরকার হয় নি।

পাহারাওলা ঠিকানাটা নিয়ে বোধহয় য়্যাম্বুলেন্সকেই দিলে। কে জানে—য়্যাম্বুলেন্স চলে যেতেই ট্রাম ছেড়ে দিল। পর পর ট্রামগুলো চলল সার বেঁধে। এইবার ভিড়ও হাল্‌কা হয়ে গেল, মজা দেখা মিটে গেছে, অনেকেরই এবার বোধহয় মনে পড়েছে বাড়ির কথা, কাজের কথা। যেটুকু ভিড় রইল এখন ওঁকে ঘিরে।

কে একজন এসে ওঁর হাত ধরল, 'উঠুন মেসে মশাই। বাড়ি চলুন।'

'বাড়ি?...হ্যাঁ, যাব বৈকি। কোন্ হাসপতালে নিয়ে গেল ওরা বাবা—জান কেউ? একটু খবর পাওয়া যাবে না?

'বিমু গেছে মেসোমশাই। বিমু আর তারক। ওরা ফিরলেই সব খবর পাবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি.... আপনি এখন বাড়িতেই যাবেন তো?'

'আর কাউকে খবর-টবর দিতে হবে?' বাড়িওলাদেরই আর একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে। তার মুখটা এতক্ষণে চিনতে পারেন শরৎ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,— খবর দিতে হবে।...এই কাছেই মদন মিত্তিরের লেনে আমার বড় শালি থাকে। কিন্তু নম্বর জানি না... আমার সঙ্গে যাবে কেউ বাবা? তাদেরই খবর দিতে হবে। তারাই ওর আপন—'

'চলুন চলুন, আমরা সবাই সঙ্গে যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে একবার পুঁটলিটার দিকে হাত বাড়ালেন।

'আমরা নিচ্ছি মেসোমশায়। আপনি চলুন।'

মাথাটা এখনও ঘুরছে। একজনের কাঁধে হাত রেখে সামলে নিলেন টালটা। তার কাঁধটা ধরেই চললেন ধীরে ধীরে।... সাগুটা ওরা নামাবে তো? কড়াসুদ্ধ যদি ধরে যায়—উমা বড় বকাবকি করবে—

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

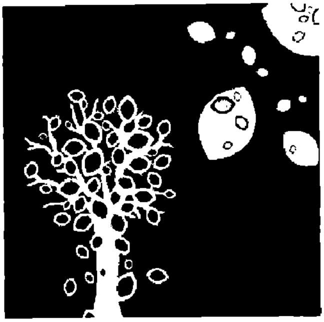

একাদশ পরিচ্ছেদ

এখনও যেন ভাল করে বুঝতে পারেন না শ্যামা। এত দ্রুত, এত অল্প কদিনের মধ্যে এতগুলো ব্যাপার ঘটে গেল— এত সাংঘাতিক, কল্পনাতীত সব ঘটনা— আর সেগুলো একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময় না দিয়েই এমন পর পর প্রবলভাবে ঘা দিয়ে গেল তাঁর মনে ও মস্তিষ্কে যে, ভাল করে ভেবে দেখা তো দূরের কথা, সেগুলো পরিষ্কার ধারণাই করতে পারেন না সম্পূর্ণভাবে। কেমন যেন তালগোল খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে সবটা। এখন ভাবতে গেলে ঠিক ঠিক মাথায় আসে না। সব ঘটনাগুলোই যে সত্যি সত্যি ঘটেছে তাও মনে হয় না। মনে হয় এসব স্বপ্নে দেখছেন তিনি, অসুখের মধ্যেকার বিকার এগুলো। কিম্বা আর কোন লোকের সংসারে এসব ঘটেছে, লোকমুখে শুনছেন। আঘাত পেয়েছেন যে একটা খুব, তাও মনে হয় না। শুধু শরীরটা নয়, মনটাও যেন জড়ভরত হয়ে গেছে কেমন।

শরীরটা তাঁর খুবই ভেঙ্গে গেছে এই কদিনে। সেইটে প্রত্যক্ষ, সেইটে টের পাচ্ছেন তিনিও।

সবাই বলত তাঁর পাথরের শরীর, রোদে, জলে, অনিয়মে, উপবাসে তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনিও তাই জানতেন। এত অত্যাচারে, এত অনাহার ও অপুষ্টিতেও কখনও শক্ত অসুখ তাঁর হয় নি। স্বামী কোন সাংঘাতিক ব্যাধির বীজাণু তাঁর দেহে সংক্রামিত করে গেছেন বলেই তাঁর বিশ্বাস—কিন্তু তাও আজ পর্যন্ত বিশেষ মাথা তুলতে পারে নি। কোন শক্ত অসুখই তাঁর করে নি কখনও। সব অবস্থাতেই নিজের অভ্যস্ত কাজ করে যেতে পারেন—এ অহঙ্কারও ছিল তাঁর মনে। এবার সে সব অহঙ্কারই ঘুচেছে।

উমার ঐ ঘটনাটা যেদিন ঘটে— সেদিন তিনিও একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন। আঘাটায় নেমে শুষুনি শাক তুলতে গিয়ে শামুকের খোলায় পা কেটে রক্তারক্তি। এতখানি ফালা হয়ে কেটে গিয়েছিল গোড়ালির কাছটা। তারই তাড়সে প্রবল জ্বর আসে, পা-টা বোধহয় বিষিয়েই উঠেছিল, ফুলে উঠেছিল সমস্ত পাটাই। গোবিন্দ যখন খোকাকে পাঠিয়ে খবর দিলে, তিনি তখন অজ্ঞান-অচৈতন্য। ভাগ্যে কান্তি ওঁর ঐ জ্বর আর পা ফোলা দেখে সেইদিনই ফকির ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল, নইলে কী হত বলা যায় না। ফকির ডাক্তার নাকি বলে গেছেন আর একদিন দেরি হলে পা কেটে বাদ দিতে হত।

সবাই বলে যে যমজ ভাই কি বোন একজন গেলে অপরজন ঠিক টের পায়। শ্যামা কিছু টের পান নি। অবশ্য টের পাবার মতো অবস্থাও ছিল না তাঁর। চটখণ্ডীদের গিন্নী যেটা বলেছেন সেইটেই ওঁর মনে লেগেছে। যম তাঁকে ধরেও টেনেছিল। যমজের একজন যখন মরে, আর একজনেও প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। নিহাৎ ওঁর সব পাপের সাজা এখনও ভোগ হয় নি বলেই যমদূত ছেড়ে দিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

উমার খবর শুনলেন উনি অনেক পরে। স ঢুকে-বুকে গেছে তখন। একটু ভাল রকম জ্ঞান হতে তবে ওরা বলেছে— তাও একসঙ্গে বলে নি, সইয়ে সইয়ে বলেছে। হেম নাকি কদিন এখানে আসতেই পারে নি। লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল— ওর শ্বশুররা এসে কনককে রেখে গেছেন। অসুখের মধ্যে চোখ খুলে কনককে দেখে প্রথমটা ওঁর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। এরই মধ্যে—? তারপর নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। এই জন্যেই ওরা এনেছে। কে কার মুখে ভাত জল দেয়। কান্তি তো কিছুই পারে না। দুদিন নাকি মুড়ি চিবিয়ে আছে।

এত কাণ্ড হয়ে গেছে উমার, তখনও শোনেন নি। আর দুদিন পরে শুনলেন। হেম সব কাজ শেষ করে ফিরে এসে বলল।

গোবিন্দ খবর পেয়েই হাসপাতালে গিয়েছিল। প্রাণ ছিল তখনও কিন্তু সে প্রাণরক্ষার জন্য কিছুই করেন নি ওরা। কী হয়েছে কতদূর হয়েছে তাও কেউ দেখে নি। অত রাতে নাকি কিছুই করা যাবে না। কাল বড় ডাক্তার না দেখলে তেমন ব্যবস্থা কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু মাথায় বরফ দিয়ে ফেলে রেখেছে। রক্তও মুছিয়ে পরিষ্কার করা হয় নি। নিঃসাড়ে পড়ে আছেন উমা— খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বুকের কাছটা একটু উঠছে নামছে।

অনেক কাণ্ড করে 'আর-এস'-কে খুঁজে বার করেছিল গোবিন্দ—তাতেও কোন লাভ হয় নি। তিনি মুখ বাঁকিয়ে বলছেন 'আমার তো মনে হয় ও আর বাঁচবে না। হাউএভার, বড় সার্জন কেউ না দেখলে ঠিক বলতে পরছি না। তাও এক্স-রে না নিলে তাঁরাও যে কিছু ডেফিনিট বলতে পরবেন— তা মনে হয় না। সেও কাল সকালের আগে তো নয়। আমাদের যেটুকু করবার করেছি— আর কিছু করবার নেই। মরফিন ইঞ্জেকশন পড়েছে, মাথায় বরফ চলছে— আর কী করব বলুন? যদি বাঁচার হয় তো ঠিক সারভাইভ্ করবে— নিত্য দেখছি তো!'

পরের দিন বড় ডাক্তার এলেন যখন তখন বেলা বারোটা বাজে। তখনও প্রাণ আছে কিন্তু আর তখন নাকি কিছু করার নেই। তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে স্কাল্-এ খুব বড় একটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, ব্রেনে সুদ্ধ চোট লেগেছে। তার মানে জটিল অপারেশন। সে সব যন্ত্রপাতিও নেই আমাদের, তা ছাড়া যা অবস্থা পেসেন্টের — এখন এক্স-রে করিয়ে অপরেশনের তোড়জোড় করতে করতেই ও মারা যাবে। বাইরে থেকে টের পচ্ছেন না আপনারা, ভেতরে ভেতরে খুব হেমারেজ হয়েছে। শক্ত হার্ট বলেই এখনও টিকে আছে—'

কিন্তু তখনই শব হাসপাতালের ভাষায় 'লাশ পাওয়া গেল না। এ নাকি পুলিশ কেস, পোষ্টমর্টেম পরীক্ষা করতে হবে। গোবিন্দ আর হেম— হেমকে হাওড়া স্টেশনে ধরে সকালেই খবর দিয়েছিল গোবিন্দ, সে অফিসে সই করেই চলে এসেছে— থানায় গিয়ে দারোগাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করল; ব্রাহ্মণের শব, সকলের সামনেই তো দুর্ঘটনা হয়েছে— মিছিমিছি কাটা-ছেঁড়া করবেন কেন, ডোমে ছোঁবে—যদি দয়া করে এমনিই ছেড়ে দেন উনি, চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এরা ইত্যাদি; কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। পরে সকলে বলল যে কিছু প্রণামী পেলেই ছেড়ে দিত— কিন্তু সেটা হেমরা জানত না। অত মাথাতে যায় নি। সঙ্গে টাকাও ছিল না। তবে জানা থাকলে হয়ত শরতের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যেতে পারত, ধার করেও দিত হয়ত। ওরা কিছুই জানত না, আগে কেউ বলেও দেয় নি। তবে সেও তো অনুমান।

ফলে বাসিমড়া পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত পরের দিন যখন মর্গ থেকে লাশ ছাড়া হল তখন বেলা একটা বাজে।

BanglaBook.org

শরৎ সেই রাত থেকে কমলার ওখানেই আছেন। তাঁকে ও-বাড়ি মানে ওঁদের সে-বাড়ি যাবার কথা কেউ বলে নি, তিনিও তোলেন নি। এখানে যে আছেন— এদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা— তাও জিজ্ঞাসা করেন নি। কোথায় আছেন সেটাও অত মাথাতে যায় নি বোধহয়। সহজ ভাবেই থেকে গেছেন। সেই যে এসেই ধপ করে বসে পড়েছিলেন, সেই ভাবেই বসে ছিলেন। ওঠেন নি, নড়েন নি, কারও সঙ্গে কথা বলেন নি। অনেক রাত্রে— প্রায় শেষ রাত্রে কমলা এসে জোর করে শুইয়ে দিতেই শিশুর মতো শুয়ে পড়েছিলেন। কোন বাধা দেন নি— কোন প্রশ্ন করেন নি। শুধু কিছু খাবেন কিনা গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করাতে একটা অদ্ভুত অনুরোধ করেছিলেন। গোবিন্দকে কিছু না বলে কমলার দিকে চেয়ে অনুরোধের সুরে বলেছিলেন, 'ঐ যে পুঁটুলির মধ্যে ক্ষীরের বরফিগুলো পড়ে আছে—তুলে রেখে দেবেন দিদি? ও এনেছিল আমার জন্যে। আমি ভালবাসি বলে। আজ নয়—কাল সকালে আমি খাবো।'

পরের দিনও চুপ করে বসেই ছিলেন এক জায়গায়। হাসপাতালে যাবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি— কেমন আছে তাও জানতে চান নি। সকালে কমলাই কথাটা তুলেছিলেন, 'একবার দেখতে যাবে না ভাই?'

মৃদু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'না দিদি, কাজ নেই। কাল দেখার চেষ্টা করেছিলুম, দেখতে পাই নি। সব ঝাপসা দেখেছিলুম। ও অবস্থায় দেখতে পারবও না।.... না-ই বা দেখলুম আর। এক যদি—যদি—বাঁচে—'

আর কিছু বলতে পারেন নি। স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুসংবাদটা পাবার পরও চুপ করে বসেছিলেন। কান্নাকাটি করেন নি, কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। গোবিন্দ নিজে থেকেই বলেছিল পোস্টমর্টেমের কথা, তাও কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। স্থির দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালের রঙিন ক্যালেন্ডারটার দিক চেয়ে বসে ছিলেন।

কমলা আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদছিলেন। তাঁকে সান্তনা দিতে গিয়ে হেম গোবিন্দ খোকা সকলেরই চোখে জল এস গিয়েছিল— কিন্তু শরৎ তখন কাঁদেন নি। কেঁদেছিলেন অনেক পরে রাত্রিবেলা। অন্ধকারে বসে কেঁদেছিলেন। রানী দেখেছে, রানীই বলেছে হেমকে, গোবিন্দকে।

রানীকে কেউ খবর দেয় নি, সে এমনই এসে পড়েছিল বিকেলে। এদের ভাগ্যক্রমেই সে এসে পড়েছিল বলতে হবে। সে এসেই জোর করে নিজের ছেলেমেয়ে কোলে দিয়ে কতকটা শান্ত করল কমলাকে। সে না এলে সেদিন সন্ধ্যায় এদের ঘরে বোধহয় আলো জ্বলত না, কারও মুখে জল পড়ত না এক বিন্দু। হেম আর গোবিন্দ তো ছুটোছুটি করছিল। খোকা গিয়েছিল মহাশ্বেতাদের বাড়ি খবর দিতে। কমলা কাঁদছেন— শরৎ চুপ করে বসে আছেন, রানী যখন এল।

রানী বৌ-ই সন্ধ্যার পর চা করে শরৎকে দিতে গিয়ে দেখেছিল তাঁর দু-চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, কান্নার বেগ নেই— শুধু নিঃশব্দে জল পড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে বোধহয়, সামনের গেঞ্জিটা ভিজে গেছে।

রানী ফিরেই আসছিল। কী ভেবে আবার কাছে গিয়ে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, মেসোমশাই, চা এনেছি।'

শরৎ মুখ তুলে চেয়েছিলেন। তারপর নিঃশব্দে চায়ের কাপটা ওর হাত থেকে নিয়ে পাশে নামিয়ে রেখেছিলেন। বোধহয় খেয়েছিলেনও, সেটা আর রানী দেখে নি। দেখতে পারে নি। তার দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এসেছিল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে হয়ত সে-ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত।...

BanglaBook.org

পরের দিন মর্গ থেকে কখন শব পাওয়া যাবে খোঁজ করে সেই মতো লোকজন ঠিক করে হেমকে খাট এবং দুর্গাপদকে ফুল কিনতে পাঠিয়ে গোবিন্দ শরৎকে ডাকতে এল।

'আপনাকে একটু উঠতে হবে মেসোমশাই এবার। একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—'

উনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি—আমি যাব? আমি কেন বাবা?'

একথার জবাব গোবিন্দ দিতে পারত না! এ ধরনের কথার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কমলা আবার হাহাকার করে কাঁদছেন। ওদের সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন রানী বৌ-ই। কাছে এসে পাশে বসে পড়ে বললে, 'শেষবারের মতো সিঁদুরটা যে আপনারই দেবার কথা মেসোমশাই, ঐটুকু না করলে তিনি, পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবেন না। আপনার কাছে এটা তাঁর পাওনা যে। আপনারও তো ঋণ কম নয় তাঁর কাছে!'

হঠাৎ শরতের একটা কথা মনে পড়ে যায়। কে যেন কবে বলেছিল, কোন্ দূরশ্রুত, প্রায়-বিস্মৃত কথাটা— এ জীবনে দেবার মধ্যে দিয়েছ তো এই লোহাটা আর সিঁদুরটুকু, তা সেইটুকুও সহ্য হচ্ছে না বুঝি?'

'আমারই সিঁদুরটা দেওয়ার কথা, না মা? তাহলে যাই। আর কি দিতে হয়? লোহা কি দেয় এ সময়ে? না শুধুই সিঁদুর?.... ঠিকই বলেছ মা, অনেক ঋণ আমার, কিছু শোধ করা হল না!'

তারপরই—এই প্রায় দুদিন পরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল মা— ওর কাছে আসা। আমি না এলে হয়ত এমনভাবে মরত না, এত তাড়াতাড়ি। আমারই নিশ্চয় রাক্ষসগণে জন্ম— আমি যাকে ধরেছি সে-ই মরেছে। আমার কেউ বাঁচে নি, আমার আর কেউ রইল না। আমার জন্যেই সে গেল। কখনও কিছু দিতে পারিনি, অপঘাত মৃত্যুটা দিলুম শেষকালে—'

শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলেন শরৎ, দাঁড়িয়েও ছিলেন শেষ পর্যন্ত—কিন্তু মুখাগ্নি করেন নি। অনেক করে বলেছিল হেম আর গোবিন্দ, অভয়পদ নিজে এসে অনুরোধ করেছিল কিন্তু তিনি রাজি হন নি। বলেছিলেন, মুখ-অগ্নি করলেই শ্রাদ্ধ করতে হয়। আমি ওকে পিণ্ডি দেব না। আমার ভাত খেতে ওর বড় আপত্তি ছিল, দিনরাত ও ভগবানকে ডাকত আমার ভাত না খেতে হয়। আমি সে ভাত দেব না। জ্যান্তেই যখন একদিনও ভাত দিলুম না, মরার পর আর দিই কেন। তাছাড়া ব্রাহ্মণের মেয়ের পিণ্ডি— ব্রাহ্মণের হাতে পাওয়াই উচিত। আমার আর ব্রাহ্মণত্ব কিছু নেই। আমি— আমি অতি নীচ অন্ন খেয়েছি। হেমই দিক— ওকেই সবচেয়ে ভালবাসত, ও-ই করুক শেষ কাজটা। খরচপত্র সব আমি করব— কিন্তু ওটি বলো না তোমরা!

আগত্যা হেমকেই দিতে হয়েছল মুখাগ্নি। সেইজন্যেই এতদিন আসতে পারে নি। অপঘাত মৃত্যুর ত্রি-রাত্র অশৌচ। একেবারে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে নিয়মভঙ্গ সেরে এসেছে।

'কোথায় শ্রাদ্ধ হল?' শ্যামা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কালীঘাটে গিয়েই সেরে এলুম। আর কোথায় হ্যাঙ্গামা করব! অবশ্য জিনিসপত্র মেসোমশাই ভাল ভাল দিয়েছে দানে। বারোটি ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়েছে—সেও বেশ পরিতোষ করে।'

'সেটা কোথায় হল? ঈষৎ যেন সজাগ হয়ে ওঠেন শ্যামা।

'সে ঐ যে-বাড়িতে মাসী থাকত সেইখানেই। মেসোমশাই বললেন, এতকাল ওখানে ছিল, ওখানে কিছু করা দরকার। ব্রাহ্মণ খাওয়ানোই নাকি আসল, সে পুরুতও বললে। তাই ওখানেই করা হল। বাড়িওলারা অনেক করেছে অবশ্য। .... রান্না করলে বড় মাসী আর রানী বৌদি—বামুন রাখতে চেয়েছিলেন মেসোমশাই, ওরা রাজি হল না।'

BanglaBook.org

তা শরৎ জামাই এখন কোথায় রইলেন? ঐ বাড়িতেই?'

'না না। ওখানে কোথায় থাকবেন! বড়দা ওদের ওখানে এনে রেখেছে। বেশিদিন থাকবেন না তো— প্রেসের খদ্দের খুঁজছেন দালালও লাগিয়েছেন, প্রেস বিক্রি করে দিয়ে কাশী চলে যাবেন। সেখানে কে ওর দূর-সম্পর্কের বোন আছে, তার কাছেও থাকবেন না— তাকে লিখেছেন কম ভাড়ায় একটা ঘর খুজতে—'

'তা সব জিনিসপত্তর—?'

হেম একটু অপ্রতিভভাবে হাসল। বলল, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেসোমশাই, যে, তোমরা কিছু নেবে— না সব বেচেকিনে দিয়ে তারই নামে টাকাটা কোথাও দিয়ে দেব—কোন সৎকাজে?

'তা তুই কি বললি?' কথাটা শেষ করতে দেন না শ্যামা—তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে ওঠেন। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বলেন, 'যে মুখে আগুন দেবে, তারই তো সব পাওনা!'

'হ্যাঁ—সব ঐ হাড়পেকের বোঝা কে ঘাড়ে করবে!... আমি বললুম, একেবারে সব বেচে না দিয়ে কিছু কিছু আমাদের কাছে রাখা ভাল—তাঁর স্মৃতি তো।... তা মেসোমশাই ঠিক করেছেন দিদিমার দরুন বাসনের সিন্দুকটা আর মাসীর কাপড়চোপড় সুদ্ধ তোরঙ্গটা আমাদের দেবেন। বড়দাকে দেবেন ঘড়িটা। আর হাতের রুলি দুটো আর দিদিমার দরুন কী সামান্য দু এক কুচি বুঝি আছে—সেগুলো রানী বৌদিকে দিয়ে বাকি সব বেচে দেবেন।'

'তাহ'লে বড়বোয়েরই জিৎ হ'ল বলো।'

'তা সে যা বোঝ।'

'কোন, বাসনকোশন কি আমরা কিছু পেতে পারি না?'

'সে কিছু কিছু বাড়িওলাদের দিয়ে দিয়েছেন, মাসীর ভাতখাবার থালাটা আর জলখাবার ঘটিটা মেসোমশাই নিজে রাখবেন। বাকি সব কালই বিক্রি হয়ে গেছে। সব টাকা বড়মাসীর কাছে থাকবে— মেসোমশাই বলেছেন, তুমি তো রেলের পাস পাও, একসময় গিয়ে ঐ টাকাতে গয়াটা সেরে এসো। অপঘাতে মরেছে— গয়া না করলে মুক্তি নেই। ঐ-ই নাকি আসল। পিণ্ডি দিয়ে ঐখানেই ব্রাহ্মণ খাইয়ে আসতে বলেছেন!'

শেষের দিকের কথাগুলো আর শ্যামার কানে যায় নি। তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা।

সুদূর অতীতে চলে গিয়েছিল তাঁর মন। অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা ভাবছিলেন তিনি।

ওঁদের মা রাসমণি তখন প্রায় মৃত্যু-শয্যায়। ওঁদের সকলকে ডেকে মার যা ছিল ক্ষুদকুঁড়ো— সামান্য একটু সোনা ও বাসন কখানা— ভাগ করে নিতে বলেছিলেন। তাঁর সামনে সব আনতে বলেছিলেন— অর্থাৎ তিনি যাকে যা দেবার বলে দেবেন; সেই মতো নেবেন ওঁরা।

সমান ভাগ করারই কথা। রাসমণির সেই রকমই ইচ্ছা আন্দাজ করেছিলেন শ্যামা। কিন্তু উমাকে ওঁদের সমান ভাগ দিতে শ্যামার আপত্তি ছিল, ওর কেউ নেই, ওঁদের ছেলেপুলে আছে— ওঁর মেয়ে আছে, বিয়ে দিতে হবে, জামাই আসবে কুটুম-সাক্ষাৎ আসবে— উমা কেন ওঁদের সঙ্গে চুল-চেরা ভাগ পাবে? ইঙ্গিতে সে কথাটা জানিয়েও ছিলেন মাকে। মা রাগ করেছিলেন তাতে। বলেছিলেন, ওঁদের ছেলেমেয়ে আছে সেইটেই তো বড় কথা, তারা এরপর ওঁদের দেখবে। উমার তো কেউ নেই, ওর কোন একটা ব্যবস্থাও কিছু করে যেতে পারলেন না তিনি ভালমতো— ওরই তো বেশি দরকার এসবের। দরকার হলে এই বেচেই খেতে পারবে তবু দু-চার মাস।

BanglaBook.org

দিয়েছিলেনও তাই। অন্তত শ্যামার যা বিশ্বাস। উমার দিকেই যেন পাল্লাটা একটু বেশি ঝুঁকল। শ্যামার সেটা পছন্দ হয় নি। মনে মনে রাগ করেছিলেন, মার ভীমরতি হয়েছে মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য প্রকাশ্যে সে বিদ্রোহ জানাবার সাহস ছিল না। রাশভারীলোক ছিলেন রাসমণি— তাঁর স্থির শান্ত দৃষ্টির দিকে চাইলেই মুখের কথা মুখে থেকে যেত। শ্যামা অন্য পথে গিয়েছিলেন, কিছু বাসন সরিয়ে রেখেছিলেন সকলের অজ্ঞাতে, বয়ে নিয়ে আসার অজুহাতে। কিন্তু মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়ায় নি সেটা। তখনও পযন্ত আশ্চর্য রকমের স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। ওঃ, সে নিয়ে কী অপমানটাই করেছিলেন সেদিন শ্যামাকে।

সেই সব বাসনই আজ তাঁর ঘরে আসছে। কোনটাই উমার ভোগে আসে নি। সবই বুকে করে রেখে দিয়েছিল সে, একটিও খোয়ায় নি। অনেক দুঃখ কষ্ট করেছে তবু প্রাণ ধরে বেচতে পারে নি একটা।

সে-ই আসছে তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি কি খুব একটা আনন্দ বোধ করছেন? খুব একটা বিজয়গর্ব? মজ্জাগত অর্থলোলুপতার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এগুলো সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন বটে— কিন্তু এখন যেন কেমন ভয়-ভয় করছে। উমার কোন কাজে লাগে নি, তাঁরই কি লাগবে? এই তো সবই ফেলে চলে যেতে হল একনিমেষে। কাকে কি দেবার ইচ্ছে ছিল তাও বলে যেতে পারল না। কে জানে তাঁরই বা কখন কিভাবে ডাক আসবে। এই যে সব জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকছেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস, আরও চাইছেন, প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা যেন দুই-হাত বাড়িয়ে রয়েছেন— এও কি একদিন এমনি বিনা নোটিশে ছেড়ে যেতে হবে! তাঁর এত কষ্টের এত দুঃখের জিনিস সব পাঁচভূতে নষ্ট করবে— তিনি বাধা পর্যন্ত দিতে পারবেন না, নিজের ইচ্ছাটা পর্যন্ত জানাতে পারবেন না।.... ভাবতে ভাবতে যেন শিউরে ওঠেন শ্যামা।.... এসব কি ভাবতে শুরু করলেন তিনি? দুর্বল শরীর বলেই বোধ হয় এইসব ছাইভস্ম কথা মনে আসছে!....

জোর করে মনকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন।

এই তো দুনিয়ার নিয়ম— তাই বলে কি সকলে সব বিলিয়ে নাগা-ফকির হয়ে যাচ্ছে? তুমিও যেমন!

কান দেন হেমের দিকে। কী যেন বলছে হেম—?

'বরাত বটে ছোট মাসীর — মরেও কি শান্তি আছে? শেষ পর্যন্ত পোড়াটাও সুশৃঙ্খলে হল না পুরো দেহটা পোড়ানোই গেল না।'

'সে আবার কী রে? কি বলছিস?'

'আর কি বলছি! শয়ে তো চাপানো হল, বেশ জ্বলছে, আমরা একটু এদিকে সরে আছি, কাছাকাছি আছেন বরং মেসোমশাইই—অকস্মাৎ একটা সোরগোল, মেসোমশাইও চিৎকার করে উঠলেন। কী ব্যাপার— না চেয়ে দেখি একটা সন্নিসী-মতো লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে আর তার পিছুপিছু কতকগুলো লোক দৌড়চ্ছে তাকে ধরবার জন্যে। কিছুই বুঝতে পারি না— কী হল জিজ্ঞাসা করতে একজন বললে, আপনাদের চিতা থেকে ঠ্যাং নিয়ে গেল যে মশাই! মেসোমশাই কোথায়? চেয়ে দেখি তিনিও দৌড়েছিলেন, শ্মশানের বাইরেটায় এসে বুক চেপে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছেন। একে ওঁর হাঁপানির ব্যায়রাম তায় বুড়ো মানুষ, পারবেন কেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম— ঐ লোকটা আস্তে আস্তে এসে একটা কাঠ দিয়ে মাসীর একটা ঝলসানো পা টেনে বার করে সেই আগ-জ্বলন্ত পা-টা নিয়েই দৌড় দিয়েছে—'

'সে কি রে? কে সে? করবেই বা কি ওটা দিয়ে?'

BanglaBook.org

ভয়ে শিউরে ওঠেন তিনি। কনকও পিছনে বসে শুনছিল, সে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কাঠ হয়ে যায় একেবারে।

'কী করবে জানো? সে তোমরা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে না।... খাবে, খাবে। খাবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিল।'

'ধ্যেৎ! খাবে কি? ওসব গল্প-কথা রামায়ণে লেখা আছে। এখনকার দিনে বুঝি রাক্ষস আছে—'

'রাক্ষস কেন হবে— সন্ন্যিসী। একজন গঙ্গাপুত্তুর আমাদের বললে, ওদের বলে অঘোরপন্থী সন্ন্যিসী— কোন ঘোর থাকে না, আপন মনেই থাকে, যখন হুঁস হয় খিদে পেয়েছে— তখন সামনে যা পায় তাই খায়। একবার অনেকদিন আগে নাকি এমনি এক অঘোরপন্থী জ্যান্ত গোখ্‌রো সাপ ধরে খেতে শুরু করেছিল—তাও ধরেছিল ল্যাজের দিক থেকে, সেও ছোবল দিয়েছে তিন-চারটে — পরের দিন দেখা গেল দুটোই মরে পড়ে আছে!

'বলিস কি— পিশাচ বল!'

'তবে আর বলিছ কি! এ লোকটা নাকি কদিন ধরেই ওখানে আছে। শ্মশানের বাইরে একটা গাছতলায় বসে থাকে থুম হয়ে— তা সন্ন্যিসী তো অমন কতই থাকে শ্মশানের ধারে, বিশেষত নিমতলায় তো লেগেই আছে— কেউ তাই অত গ্রাহ্য করে নি। পরে শোনা গেল এ লোকটা দিনকতক খড়দা না পেনেটি কোথায় গঙ্গার ঘাটে বসেছিল অমনি। কেউই তত লক্ষ করে নি,— হঠাৎ একদিন মার সঙ্গে একটা চারপাঁচ বছরের ছেলে যাচ্ছিল গঙ্গা নাইতে, তাকে ধরে হাতটা কামড়ে এতখানি মাংস তুলে নিয়েছে একেবারে। তারা সব ধরে খুব গোবেড়েন মার দিয়েছে—তাইতেই পালিয়ে এখানে এসেছে!'

এতক্ষণে কনক কথা বলে। শাশুড়ী স্বামী একত্রে থাকলে আগে সে কথাই কইত না, এঁরা পছন্দ করেন না বলে— এখন দু-চারটে কথা বলে, যদিচ খুব জরুরি অবস্থায় না পড়লে সোজাসুজি স্বামীর সঙ্গে বলে না, শাশুড়ীকে উপলক্ষ করে বলে। আজও তাই বলল, 'তা যার হুশ নেই, খিদে পেলে যা সামনে পাবে তাই খাবে— সে তো গু-গোবরও খেতে পারে। বেছে বেছে মাংসটি খাবে, তা আবার মানুষের মাংস— চুপিচুপি এসে চিতা থেকে ঝলসানো মাংস নিয়ে পালাবে— এ আবার কেমন অঘোর—হ্যাঁ মা?'

'তুমি রেখে ব'সো দিকি বৌমা? ও বজ্জাতী, বেজ্জাতী। সন্ন্যিসী না হাতী — ধরে গরম সাঁড়াশি দিয়ে ঐ জিভ টেনে বার করলে তবে ও নোলা জব্দ হয়।'

তারপর মনে পড়ে গেল আসল কথাটা—'তা হ্যাঁরে, শেষ অবধি কি হল তারপর? পাওয়া গেল?'

'পাওয়া গেল—কিন্তু পুরোটা নয়। তখন দু-তিন কামড় খেয়ে ফেলেছে। বেগতিক দেখে বেশ খানিকটা কামড়ে তুলে নিয়ে বাকিটা গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। আবার একজন গঙ্গাপুত্তুর গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আসে।'

কনকের ছেলে কেঁদে উঠতে সে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল। তার নিজেরও যেন হঠাৎ নতুন করে চোখে জল এসে গেল আবার। খুব বেশি দেখে নি সে ছোট মাসীমাকে কিন্তু তার সব কথাই শুনেছে সে। কী বরাত নিয়েই এসে ছিল মানুষটা, এমন ভাগ্য যেন অতিবড় শত্রুরও না হয়। জীবনের একটা দিনও মানুষ অন্তত সুখী হয়— এঁর অদৃষ্টে ও জিনিসটা যেন দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন বিধাতা।... সারা জীবনটাই তো দগ্ধে গেলেন, আবার মরেও শান্তি পেলেন না। মরণটা এল—তাও একটা ভয়ানক কাণ্ড করে, মরার পরে পুরো দেহটা পর্যন্ত দাহ করা গেল না। এমন কখনও শোনে নি কনক, আর

BanglaBook.org

কারও মুখে শুনলে বিশ্বাস করত না।... লোকে বলে গতজন্মের পাপে নাকি এ জন্মে দুঃখ পায়। সারা গতজন্ম ধরেই কি পাপ করে এসেছিলেন উনি?—যাকে বলে নির্জনে বসে আপন মনে পাপ করেছিলেন, বাধা দেবার কেউ ছিল না? তাই মরার পরেও সে পাপ ধাওয়া করল?....

কে জানে এ-জন্মেই শেষ হল কিনা। আর যেন সে পাপের ফল পরজন্ম পর্যন্ত না জের টানে। এ-জন্মে তো কোন পাপ করেন নি, সতীসাধ্বী—সাধ্য মতো পরের ভালই করে গেছেন; আসছে জন্মে যেন সুখী হন্, স্বামীপুত্র নিয়ে যেন মনের শান্তিতে ঘর করতে পারেন— হে ভগবান!

মনে মনে উদ্দেশে প্রণাম করে সে ভগবানকে।

বাইরে প্রথম অপরাহ্নের সোনালী আলো গাছপালার পত্রপল্লবে ঝলমল করছে— জানালার বাইরে সজনে গাছের পাতাগুলো খেলা করছে সে আলোতে—একটা সিরসির শব্দ হচ্ছে তার। মৃদু বাতাসে পুকুরের কাকচক্ষু জলে অতি সামান্য লহর উঠেছে— অদ্ভুত দেখাচ্ছে জলটা। ঠিক লহর বললেও ভুল বলা হবে— যেন পুলক-শিহরণ। সে শিহরণ শুধু পুকুরের জলেই সীমাবদ্ধ নেই, জলের ধারে শুষুনিকলমী দলেও তা বিচিত্র আলোড়ন জাগিয়েছে। শান্তি, শান্তি। চারিদিকেই অপূর্ব শান্তি একটা। কোলে তার আধোঘুমন্ত দেবশিশুর মতো ছেলে, স্তন্য পান করতে করতে চোখ দুটো বুজে আসছে ওর— এখনও যেটুকু খোলা আছে, সেই অর্ধনিমীলিত-অক্ষিপল্লবের ভেতরকার ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে অপরিসীম তৃপ্তি ও মার প্রতি নির্ভরতা। এ সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে কোথাও কোন দুঃখ, কোন অশান্তি আছে। কনকেরও যেন নিজের মনেই একটা আশ্বাস জাগে।... সুখী হবে, নিশ্চয় সুখী হবে এ জন্মে মাসীমা। আর এমন করে দুঃখ পাবে না।

ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে হঠাৎ মনে হল, 'আচ্ছা যদি আমার কাছেই আসে আবার!... মাগো, তা আসবে নাকি? অতবড় মানুষটা আবার এতটুকু হয়ে আমার কোলে শুয়ে দুধ খাবে?'

পরক্ষণেই বিষম লজ্জা করতে লাগল তার— কথাটা কল্পনা করার জন্যে। আচ্ছা কাণ্ড বটে! যত কি বিদ্‌ঘুটে কথা তার মাথাতে আসে!

॥ ২ ॥

বাইরে তত প্রকাশ না পাক— উমার মৃত্যুতে একটা বড় রকমেরই আঘাত পেয়েছিলেন শ্যামা। সংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তত বোঝা যায় নি; এতই আকস্মিক যে সংবাদের সম্পূর্ণ অভিঘাতটা তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেটা ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে করলেন। শূন্যতাটা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে অনেকখানি সময় লাগল তাঁর। দীর্ঘজীবনের পৃষ্ঠপটে স্মৃতির রেখায় আঁকা যে ছবিটা অল্পে অল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর মনের পর্দায়— তার মধ্যে উমা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। সেই উমা তাঁর জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সেই উমা আর নেই— আর কোনদিন আর দেখা পাবেন না, আর কোনদিন তার কাছে ছুটে যেতে পারবেন না দুঃখ জানাতে, তার কাছ থেকে কোন কিছু আর আশা করারও রইল না— দ্বেষ-রোষ-কলহ-ঈর্ষা— সমস্ত রকম মানবিক ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল সে—এই নির্মম সত্যটা অতি ধীরে ধীরে অনুভূত হতে লাগল তাঁর। আর যেমন সেটা একটু অনুভব করতে পারলেন, অমনি যেন হাঁফিয়ে ছটফট করে উঠলেন এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না কথাটা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বিস্ময়ও বোধ হয়। সেটা বোধহয় অন্য কারণে। উমা যে

BanglaBook.org

এতখানি জড়িয়ে ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গে—আজও, এটাও একটা নূতন উপলব্ধি। সেই জন্যেই বিস্ময়।

কিন্তু এ আঘাত সামলাবার মতো সাতটা দিনও সময় পেলেন না শ্যামা। এ আঘাতে দুঃখ ছিল, সেই সঙ্গে স্মৃতি-রোমন্থনের একটা অভিনবতাও ছিল। এবার যে আঘাত এল তা শুধুই তিক্ততা এবং মর্মান্তিকতা নিয়ে এল— তার মধ্যে কোথাও কোন আশ্রয় কি অবকাশ রইল না।

কদিন এইসব হ্যাঙ্গামে হারানের খবর কেউ বিশেষ নিতে পারে নি। কান্তির ওখানে থাকার কথা ছিল কিন্তু সেও থাকতে পারে নি মার অসুখের জন্যে। তবু মধ্যে মধ্যে গিয়ে সে-ই খবর নিয়ে আসত। ভালই ছিল হারান। কথাও দুটো একটা কইতে পারছিল ইদানীং জড়িয়ে জড়িয়ে— কেউ কিছু বললে বুঝতেও পারছিল। উমা তার এখানে আসার জন্য ফল কিনে ফিরছিলেন— গাড়ি চাপা পড়েছেন শুনে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। এইসব দেখে সবাই আশা করেছিল যে এ-যাত্রা বেঁচে উঠবে। হেম এর মধ্যে একদিন রাত্রে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছিল। তিনিও বলেছিলেন, 'বোধহয় এ ধাক্কাটা সামলে গেল। এখন কথাটা যদি ঠিকমতো ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে ধীরে ধীরে হাত-পাও ফিরে পাবে। তবে সময় লাগবে। আর খুব সাবধানে থাকতে হবে এখন দীর্ঘকাল। কোন রকম উত্তেজনা কি দৌড়ঝাঁপ চলবে না।'

অকস্মাৎ খবর এল একেবারে সব শেষ হয়ে গেছে।

সেদিন রবিবার, খোকাকে সঙ্গে নিয়ে উমার দরুন মালপত্র আনতে গিয়েছিল। শরতের ছাপাখানা বিক্রি হয়ে গেছে, এধারেও সব গুছিয়ে এনেছেন তিনি, কাশী চলে যাবেন দু'একদিনের মধ্যে— মাল সরানো দরকার। ঠেলাগাড়ির ওপর সিন্দুক আর তোরঙ্গ চাপিয়ে পাথরের ভারি বাসনগুলো পুঁটুলি বেঁধে হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকছে হেম, তরুদের পাড়ার একটি ছেলে এসে খবর দিলে।

শ্যামা আছড়ে পড়লেন কিনা সেদিকে আর তাকায় নি হেম। কনক আছে— যা হয় করবে। খোকাও থাক— এইমাত্র এই চার-পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছে, ছেলেমানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়— কান্তিকে মহাশ্বেতাদের বাড়ি পাঠিয়ে হেম একাই ছুটল সেখানে।

তখন অবশ্য কিছুই জানা যায় নি। এমন আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কি, বা শেষ উপসর্গ কি হল— সেটা জানা গেল অনেক পরে। তরুর মুখ থেকেও সব জানা যেত না— কারণ প্রথমত সে ঠিক সেই সময়টায় ছিল না— দ্বিতীয়ত তার তখন একটা স্তম্ভিত অবস্থা। বললেন, ওদের পাশের বাড়ির দত্তগিন্নী। তরুর কথাও তিনিই বললেন। সেই সময়টা— অর্থাৎ যখন ঠিক প্রাণটা বেরিয়ে গেল—নাকি একটা বুকফাটা চিৎকার করে উঠেই ফিট হয়ে যায় ওর। তখন কে কাকে দেখে কী ব্যবস্থা করে, কোথায় লোকজন, পাড়ার ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া— একটা আতান্তর অবস্থা, তবু তারই মধ্যে ওরা মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন বটে কিন্তু তার পর থেকেই ঐ অবস্থা। চুপ করে বসে আছে—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে। কথাও কইছে না কাঁদছেও না। অনেক প্রশ্ন করলে একটা আধটা জবাব দিচ্ছে। এ অবস্থা হেম জানে, আগেও একবার হয়েছিল। ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা এ অবস্থায় বৃথা। সে চেষ্টাও সে করে নি।

হারানের খবরটাও দত্তগিন্নীর কাছে শোনা গেল। তিনি তরুকে ভালবাসেন তাই বড়বৌ পছন্দ করেন না জেনেও না এসে থাকতে পারেন না। মধ্যে মধ্যেই আসেন, বিশেষত দুপুরের দিকটা তিনি এসে বসলে তরু অনেকটা কাজ পায়।

BanglaBook.org

সেদিনও খাওয়া-দাওয়া সেরেই একটা পান মুখে দিয়ে এসে বসেছিলেন। তরু গিয়েছিল এক বালতি ক্ষারসিদ্ধ নিয়ে পুকুরে কাচতে। ইত্যবসরে হারানের শ্বশুর এসে ঘরে ঢুকেছিলেন।

হারানকে ওর শ্বশুরের কীর্তি-কলাপ কেউ বলে নি। অসুস্থ অবস্থা, ডাক্তারে পই-পই করে বলে দিয়েছে যে রাগ হয় কি উত্তেজনা হয় এমন কোন কথা না ওর কানে যায়। আজকাল বুঝতে পারছে যখন সব কথা, তখন বুঝে সমঝে চলতে হবে। ওঁরাও সাবধান ছিলেন সকলে। কিন্তু হারান বোধহয় এদের কথাবার্তার মধ্যে বা এদের আচারে-আচরণে কিছু আঁচ করে থাকবে। আরও কথা যে টাকাকড়ির ব্যাপারটা একেবারে গোপন করা যায় নি। দত্তগিন্নীর এক ছেলেই বাজার-হাট করে দিত, সে এসে একদিন টাকা চাইতে তরুর মুখটা একটু বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই দেখে হারান উঁ-উঁ শব্দ করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলমারীটার দিকে বার-বার চায়। অর্থাৎ আলমারী খুলে টাকা বার করে দিতে বলে। তরু কিছু বলে নি কিন্তু আলমারীও খুলতে পারে নি ওর সামনে। কী একটা বাজে কথা বলে দত্তগিন্নীর ছেলেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। সম্ভবত সে বাজে কথায় হারান ভোলে নি, সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিল খানিকটা। বোধহয় তরুর মুখের চেহারা দেখেই আঁচ করেছিল। কারণ ও বেরিয়ে চলে যাবার পরই অব্যক্ত কতকগুলো শব্দ করে খুব অস্থির হয়ে ঘন ঘন মাথা চালতে শুরু করে। সেদিনও ঠিক সেই সময়টাতেই দত্তগিন্নী এসে পড়েছিলেন, তিনিই বকে ধমকে ভুলিয়ে ওকে শান্ত করেছিলেন।

কিন্তু ঠিক অতটা যে বুঝেছিল তা কেউ ভাবে নি। তাছাড়া ওর শ্বশুর অনেক দিন আসেন নি, হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকবেন তাও কেউ জানত না। আগে দেখতে পেয়েছিল হারানই, দত্তগিন্নী দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন, তিনি দেখলেও ফিরিয়ে দিতে পারতেন আগেই। শ্বশুরকে দেখেই হারান বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর সেই উত্তেজনারই ফলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাক্‌শক্তি ফিরে পায়। চিৎকার করে ওঠে, 'নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও হামারা বাড়িসে—শুয়ার কাঁহাকা! গেট আউট!'

দত্তগিন্নী ওকে থামাবার কি ওর শ্বশুরকে ঘর থেকে বার ক'রে দেবার কোন চেষ্টা করবার আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। কথা বলতে বলতে মাথাটা একটু উঁচু করেছিল, হঠাৎ ধপ্ করে পড়ে গেল। গলার কাছে কী একটা ঘড়ঘড় শব্দ হ'ল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক দিয়ে ও মুখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তারপরই সব স্থির হয়ে গেল। ডাক্তার অবশ্য ওর শ্বশুরই ছুটে ডাকতে গিয়েছিলেন, দত্তগিন্নীর চিৎকারে পাড়ার লোকজনও জড়ো হয়েছিল, তাদের কে একজন দৌড়ে গিয়ে পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারকেও ডেকে আনলে কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। ডাক্তার দেখে বললেন, এসময়ই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।...

তরুকে এবার পাকাপাকিভাবেই এ বাড়িতে এনে তুলতে হবে। ওখানে থাকার উপায় নেই। কার কাছে থাকবে এবং কিসের ওপর নির্ভর করে থাকবে? জমিজমা যা আছে তা নিজেরা তদ্বির করলে কিছু আয় হয়—নইলে কিছুই না। লোকও নেই কেউ। ওর সতীনকে তার বাবা এসে পরের দিনই নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘাট করাবার জন্যও এখানে আনেন নি। শ্রাদ্ধ করল তরুই—ছেলে নিতান্তই ছোট, শ্রাদ্ধ করবার মতো নয়। তরু এখনও সেইরকম জড়ভরত হয়ে আছে—পাশে বসে জোর করে করাতে হ'ল হেমকে। বস্তুত হেমই করল কাজটা। তরু বোধহয় ভাল করে কিছু বুঝতেও পারল না—কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। তার কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল তাও মাথায় পুরো ঢুকেছে বলে মনে হল না।

BanglaBook.org

শ্রাদ্ধের আগেই একদিন লোকজন এনে ওর সতীনের বাবা জিনিস-পত্র অর্ধেক বার করে নিয়ে গেছেন। অর্ধেক অবশ্য তাঁর মতে, পাড়ার লোকের মতে বেশিই নিয়ে চলে গেছেন তিনি। হঠাৎ এসেছেন, তরু তো অমনি চুপ, কান্তি ছিল বটে, সে একা কি করবে ভেবে না পেয়ে মহাদের বাড়ি ছুটেছিল খবর দিতে—কিন্তু যাওয়া আসায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, মহার ছেলেরা আসতে আসতে সব কাজ সেরে চলে গেছেন তাঁরা। অভয়পদদের তখন বাড়ি থাকার সময় নয়, আর থাকলেও তাঁরা ছেলেদের আগে আসতে পারতেন না।

শোনা গেল দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই মাল নিয়ে গেছেন ওঁরা। আলমারী, বাক্স—বহু জিনিস। সবই নিয়ে যেতেন বোধহয়, দত্তগিন্নীর আর আশপাশের বাড়ি থেকে আরও দু-চারজন মহিলা এসে খুব রাগারাগি চেঁচামেচি করায় বাসনকোশন কিছু কিছু রেখে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পাড়ার লোকেরা পরামর্শ দিলেন, 'কেস করো। আমরা সাক্ষী দেব। জেল হয়ে যাবে ও শালার। যেমনকে তেমনি। চশমখোর শয়তান!'

দত্তবাবু বললেন, 'আমার হাতে ভাল উকিল আছে, তুলো ধুনে ছেড়ে দেবে বাছাধনকে। ওর মালে হাত দেবার অধিকার কি? তাছাড়া টাকা ছিল অনেক, আমরা জানি। সে টাকা কি করলে হিসেবে দিক! টাকা ঐ ছেলের, নাবালকের টাকা—চালাকি নাকি?'

কিন্তু অভয়পদ বারণ করলে, 'ও কাজ ক'রো না। অগাধ জলে গিয়ে পড়বে। আলমারী সিন্দুকে যে টাকা ছিল তা প্রমাণ করতে পারবে না। ওসব সাক্ষীর কোন দাম নেই, ওরা উড়ো উড়ো জানত যে বুড়ির হাতে টাকা ছিল, সঠিক কেউ বলতে পারবে না। দু-তিনজন একরকম না বললে কিছুই টিকবে না। থাকলেও ওরাই যে নিয়েছে—সে কে দেখেছে? এক অফিসের ঐ টাকাটা নিয়ে এসেছে প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সে এমন কিছু নয় যে তার জন্যে কেস করা পোষাবে! একটা যা হয় খরচের হিসেব তো দেবেই, আর সত্যি কিছু খরচ হয়েছেও, জামানো টাকার কথাটা প্রমাণ না হ'লে এ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না। যেটুকু আদালত দেবে তাতে এত কাণ্ড করার মজুরি পোষাবে না। এক জিনিসপত্তর—তা তারই বা কত দাম, দাম ঠিক করবে কে? তাছাড়া তারও মেয়ে আছে, কিছু তো পাওনা হয়ই। গেরস্তালির জিনিস আটকানো যায়ও না বোধহয়। অর্ধেকের বেশি নিয়েছে তাই বা প্রমাণ করা যাবে কি করে?...আমার তো মনে হয় জমিজায়গাতেও বোধহয় টান দিতে পারে ওরা।... যাইহোক, সে পরের কথা, পরে দেখা যাবে, জমি কিছু উঠিয়ে নিয়ে পকেটে পোরা যায় না—এখন এসব নিয়ে কেস করতে গিয়ে লাভ নেই। ও আশা ছেড়ে দাও।'

হেম তা জানে। তাদের মতো লোকের কোন আশাই রাখতে নেই। আর এসব করবেই বা কে, পুঁজি কৈ? তদ্বির আর টাকার অভাবেই তো রতনের অতবড় সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে গেল, মামলার ঝুঁকি নিতে ভরসা হ'ল না! তার তো তবু কিছু সাক্ষীসাবুদ ছিল।....

অফিসেও গণ্ডগোল কম নয়। মাইনের টাকা ছাড়াও হারানের [illegible] প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা খানিকটা বার করে এনেছে। সেটা বে-আইনী। কিন্তু আইনের প্রশ্ন তুলতে গেলে ওর সেকশ্যানের তিনজন বাবু বিপদে পড়েন। তাঁরা সরল বিশ্বাসে হারানের চিকিৎসা আটকে গেছে শুনে জামিন হয়ে টাকাটা বার করে দিয়েছেন। শুধু শুধু তাদের বিপন্ন করে লাভ নেই।

এই টাকাটা তোলার ফলেও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা খুব কমার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল কিছুদিন আগে হারান নিজেই বেশ খানিকটা টাকা ধার নিয়েছিল। তার সইসাবুদ সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে, সে নিজেই নিয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। কী করল এ টাকাটা নিয়ে তা কেউ বলতে পারল না। ওর সেকশ্যানের একটি বাবু বললেন, 'একবার আমায়

BanglaBook.org

বলেছিল কোন্ বন্ধুর বোনের বিয়ে হচ্ছে না, কিছু টাকা ধার দেবে। তা আমি তো পই পই করে বারণ করেছিলুম, তখন আমার সামনে বলেছিল—তা তুমি যখন বারণ করছ প্রকাশদা, তখন আর দেব না। কিন্তু তারপর বোধহয় মুখ এড়াতে পারে নি—লুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কে বন্ধু তা তো বলে নি। এর মধ্যে আমাদের আপিসে তিনজনের বোনের বে হয়েছে, হয়ত ওর পাড়া-ঘরেও কাউকে দিয়ে থাকতে পারে—ক্লাবের বন্ধুও তো বেস্তর, তিনটে ক্লাবে থিয়েটার করত ও—কাকে ধরব বলুন?'

এসব বাদ দিয়ে বাকি যা—তাও সবটা পেল না তরু।

সাহেবরা বললেন, 'তাহলে আদালত থেকে সাক্‌সেশ্যন্ সার্টিফিকেট দিতে হবে। নইলে যেখানে দুই স্ত্রী বর্তমান এবং প্রথম স্ত্রী ইতিমধ্যেই নোটিশ নিয়ে এর অর্ধেক দাবি করেছেন—সেখানে আমরা ওকে সব টাকাটা তো দিতে পারি না।'

ঐ টাকার জন্য সাকসেশ্যন সার্টিফিকেটই বা নেয় কে! ওরা হয়ত সেখানেও আপত্তি করবে, সেও দীর্ঘকাল কোর্টঘর করতে হবে। হারানের প্রথম পক্ষের শ্বশুর নাকি বিখ্যাত মামলাবাজ, তার পয়সাও আছে সময়ও আছে—তার সঙ্গে হেম পেরে উঠবে কেন? অতএব বিনা মামলায় যে অর্ধেক টাকা পাওয়া গেল তাই নিয়ে এল হেম।

টাকাটা নেবার সময় হেমের সঙ্গে তরুকে যেতে হয়েছিল। মূর্তিমতী বিষাদের মতো নির্বাক স্তম্ভিত তরুকে দেখে ওর অল্পবয়সের কথা চিন্তা করে সাহেবরা খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন—নিজেরা পকেট থেকে যে যা পারলেন দিয়ে আরও শ আড়াই টাকা করে দিলেন—কিন্তু তা মিলিয়েও দু হাজার টাকা পুরো হল না।

ঐ সামান্য টাকা, কিছু বাসনকোশন, একটা সিন্দুক এবং কিছু কাপড়জামা ও গোটা দুই পুরনো তোরঙ্গ নিয়ে এক মেঘমেদুর অপরাহ্নে তরু আবারও বাপের বাড়ি এসে উঠল—দীর্ঘকাল হয়ত বা চিরকালের জন্যই। ঐ একরত্তি গুঁড়োটুকু যদি মানুষ হয়ে উঠে কোন দিন আবার সংসার পাততে পারে, তবেই আবার স্বাধীন হবে তরু—না হলে আর কোন আশা আর ওর জীবনে রইল না কোথাও।

ওকে দেখে শ্যাম ও কনক হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন কিন্তু তরু কাঁদল না, কাঁদতে পারল না—শান্তভাবে এসে রান্নাঘরের দাওয়াটায় বসে পড়ল। তার শূন্য উদাস দৃষ্টির দিকে চেয়ে কনকের যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এইরকমই হয়ে থাকবে নাকি?

আবার মনে হল—না, ছেলে যখন আছে তখন ওকে অবলম্বন করেই আবার বুক বাঁধতে পারবে, শক্ত হয়ে দাঁড়াবে আবার।...

॥ ৩ ॥

এবার তরু আসার কয়েকদিন পরেই কোথা থেকে ঐন্দ্রিলা এসে হাজির হল। কেন এল কদিনের জন্য এল, তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না তাকে, সেও বলল না। তবে সঙ্গে কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটা দেখে মনে হল হয়ত যেখানে কাজ করছিল এতদিন, সেখানকার কাজ ছেড়েই চলে এসেছে।

অর্থাৎ বেশ কিছুকাল স্থিতি এবার।

ওকে দেখেই যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন এঁরা, কিন্তু এবার আর সে তরুর দুর্ভাগ্যে সে রকম উল্লাস প্রকাশ করল না, বরং দু'ফোঁটা চোখের জলই ফেলল। তবে এও বলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, 'তাও তো তুই জিতে গেলি বোন। হাজার হোক তোর তো ছেলে, কোনমতে যদি বেঁচে থাকে বড় হয়ে মোট বয়েও খাওয়াবে। একদিন স্বাধীনভাবে বেটার সংসারে বসে খেতে পারবি। আমার মতো মেয়ে নিয়ে তো জ্বলেপুড়ে মরতে হবে না।

এই পরের বাড়ি হাঁড়ি-হেঁসেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে যা ঐ পাঠাচ্ছি, তাই মেয়ে খেতে পাচ্ছে। খুব বিয়ে হ'ল মেয়ের! জামাইয়ের ছেলেরা তো দয়া করে দুটি চাল ফেলে দেয় ভিক্ষের মতো। তাও বলে, বাপকে খাওয়াতে পারি—তার মেয়েমানুষকে খাওয়াতে যাব কিসের জন্যে? নতুন মা কে ছোট মা বলে না—বলে বাপের মেয়েমানুষ!'

এ খবরটা এদের জানা ছিল না। তাই যদি হয় তো কাজ ছেড়ে দিয়ে এল কিসের ভরসায় তাও বুঝতে পারে না। অবশেষে কনকই কথাটা বার করলে। অথবা ঐন্দ্রিলাই বলবার সুযোগ খুঁজছিল, বলতে পেয়ে বেঁচে গেল সে। কারণ, তারও না বললে নয়। ও পক্ষ থেকে কৌতূহল প্রকাশ পাওয়াতে তার সুবিধাই হ'ল।

আর, সে জানে এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র কনকই যা সহানুভূতির সঙ্গে শুনবে সব কথা। মা কি দাদাকে বলতে গেলে হয়ত সূচনাতেই থামিয়ে দেবে বরং কনকই তাদের শোনাতে পারবে। কনকের দ্বারা তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হতে পারে।

কাজ ঐন্দ্রিলা ছেড়ে আসে নি, তারাই ছাড়িয়ে দিয়েছে।

মেয়েকে টাকা পাঠাতে হয় নিয়মিত। কিন্তু কীই বা পাঠাতে পারে সে। পায়ই তো খাওয়া-পরা আর মোটে আটটি টাকা মাইনে। আট টাকাই পাঠাত সে, নিজের জন্যে এক পয়সাও না রেখে—কিন্তু তাতেও সীতার কুলোয় না। শুধু ধান ছাড়া সতাতো ছেলেরা কিছু দেবে না, ধান ভেনে চাল ক'রে নিতে হয় সীতাকে। ঐ চাল আর বাগানে যা আনাজ-পাতি হয়—এই ভরসা। তাও দেয় ভিক্ষের মতো, নিজে থেকে নিতে গেলে যাচ্ছে তাই অপমান করে। বলে, 'এ কী তোর বাপের সম্পত্তি পেয়েছিস?' বুড়ো কিছু বলতে সাহস পায় না—ছেলেরা গুণ্ডার মতো রাগী, বদমেজাজী—তারা বাপের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, মামলা-মোকদ্দমা করতে গেলে প্রাণে বাঁচবে না। ওরা 'গুম-খুন' করে ফেলবে। বুড়োমানুষ প্রাণের ভয়ে যেন জন্তুর মতো হয়ে গেছে—সব অপমান নিঃশব্দে হজম করে।... এর ভেতর গত শীতের সময় সীতা চিঠি লিখল যে, গায়ে দেবার লেপ কুটি কুটি হয়ে গেছে, পরনে একটা গোটা কাপড় পর্যন্ত নেই; শীতে বিষম কষ্ট পাচ্ছে। ছেলেদের বলতে দুখানা পুরনো কাঁথা বার করে দিয়েছে, তাতে শীত ভাঙ্গে না। আরও, সীতার মা টাকা পাঠায় একথা তারা টের পেয়েছে—সেই জন্যে এখন কিছুই দিতে চায় না। ওদের ধারণা মোটামুটি কিছু পাঠায়। দোষ এদেরই—সীতা পাড়ার একটি ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়েছিল, ঐন্দ্রিলা সেখানেই টাকা পাঠাত মনিঅর্ডার ক'রে, তিনি নিয়ে ওকে দিতেন। তাইতেই কত পাঠায় তা তারা জানতে পারে নি—পাঠায় এটা জেনেছে। না জানিয়ে উপায়ও নেই তো, এক বাড়িতে থাকা, খরচ করলেই ধরা পড়বে যে কোথাও থেকে টাকা আসছে। এখন বাড়িতেই পাঠায় অবশ্য, তাও তারা বিশ্বাস করে না—ভাবে, যে ওখানে লুকিয়ে আরও কিছু আসে। এখন কিছু চাইতে গেলে বলে, বড়লোক মা মোট-মোট টাকা পাঠাচ্ছে, সেটা জমিয়ে আমাদের কাছে ভাগের ভাগ চাইতে এসেছ বুঝি? ও-সব হবে-টবে না, ঐ টাকা ভাঙ্গিয়ে খরচ করগে!'.....

সীতার ঐ চিঠি পেয়ে ঐন্দ্রিলার মাথা খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবল এখানে এসে এদের কাছ থেকে কিছু চায়। কিন্তু মা কিছু দেবে না তা সে জানত। এক দিলে দিতে পারে দিদি—তা সে হয়ত বড়জোর দশটা টাকা দেবে—ওর যাওয়া-আসায় গাড়ি-ভাড়াই পড়ে যাবে ছ'টাকার ওপর—লাভ কী হবে?

অকূল-পাথার ভাবনা—কাউকে জানাবার কি পরামর্শ করবার লোক নেই। বাবুরা আগাম দিতে পারে—কিন্তু তাতে মাসের টাকা পাঠাতে পারবে না। কোন লোক না পেয়ে সে ওদের ঝি-স্থানীয় একটি মেয়ে একাদশীকে মনের কথা জানিয়েছিল, পরামর্শ চেয়েছিল

BanglaBook.org

তার কাছে। একাদশী বোধ হয় এই সুযোগই খুঁজছিল বহুদিন থেকে—ঐন্দ্রিলার চাল-চলন দেখে কিছু বলতে সাহস করে নি। সে বললে, 'তেল-ঘি-চাল-ডাল সবই তো তোমার হাতে, কিছু কিছু সরাও, আমি লুকিয়ে বেচে দেব।' প্রথমটা খুব আপত্তি করেছিল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু একাদশী বোঝাল যে, এতে কোন দোষ নেই, সবাই তাই করে। তাছাড়া ব্রাহ্মণের মেয়ে দু-বেলা আগুন-তাতে মুখের রক্ত তুলে মরছে—তাকে ঐ আটটি টাকা দেওয়া এদের মানুষের মতো কাজ হচ্ছে? এদের কি টাকার অভাব আছে কিছু? যেমন-কে-তেমনি-জব্দ করা উচিত চুরি করেই।

ক্রমশ ঐন্দ্রিলাও বুঝল, গরজ বড় বালাই। না বুঝে তখন আর উপায় ছিল না। অন্তত কোন উপায় সে দেখতে পায় নি।

ঐন্দ্রিলা কিছু কিছু সরাতে শুরু করতেই একাদশী আগাম দশটা টাকা এনে দিল কোথা থেকে। সে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেল। কিন্তু তারপরই ভুল বুঝতে পারল। একাদশীর চাপ বড় বেশি, তার খাঁই আর মেটে না। সে চায় ঐন্দ্রিলা পুকুর চুরি করুক। ঐন্দ্রিলার অত সাহস হত না। তা ছাড়া, সে বুঝেছিল যে এর বেশির ভাগই—টাকায় বারো আনা—উঠছে একাদশীর ঘরে। শেষে একাদশী ওকে ভয় দেখাতে শুরু করল। চুরি না করলে বাবুদের বলে দেবে এমন ভয়ও দেখাল। ঐন্দ্রিলা ভয়ে দিশেহারা হয়ে একাদশীকে খুশি করতে—অর্থাৎ চুরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হল।

টাকাটা যেত মনিঅর্ডারে—ঠিকানাটা থাকত একাদশীর। স্থানীয় ডাকঘর—পোস্ট-মাস্টার বাবুদের সবাইকে চেনেন। তাঁর সন্দেহ হতে তিনি গোপনে এঁদের জানালেন। বাবুরা তক্কে তক্কে থেকে যে মুদীর দোকানে একাদশী আধাকড়িতে মাল বেচত—তাকে ও একাদশীকে হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। মারের চোটে সব কথাই বেরিয়ে পড়ল। ঐন্দ্রিলা সামনা-সামনি অস্বীকার করতে পারল না। করলেই বা তাঁরা শুনবেন কেন? ওর যোগসাজস ছাড়া এসব জিনিস বেরোনো সম্ভব নয়। ওকেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশি, ঝি-চাকরের ভাঁড়ারে যাওয়ার নিয়ম ছিল না।

বামুনের মেয়ে ব'লে মার-ধোর করলেন না—শুধু তখনই বিদায় করে দিলেন—খাড়া খাড়া, সেই দিনই।

অথচ বিপদের ওপর বিপদ—মাসখানেক আগেই চিঠি পেয়েছে—সীতা অন্তঃসত্ত্বা। কিছু বেশি টাকা তাকে না পাঠালেই নয়। এমনিই তো মাস-কাবারে টাকা না পাঠালে তারা শুকিয়ে মরবে। অথচ সে টাকাই বা কোথা থেকে পাবে। বাবুরা টিকিটটা কিনে দিয়েছেন তবু দয়া করে—নইলে তো ভিক্ষে করে আসতে হত!...

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করে কনকের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চায়, 'তুমি ভাই দাও একটা ব্যবস্থা করে—নইলে মেয়েটা শুকিয়ে মরবে। এই প্রথম পোয়াতী, কোথায় ভাল-মন্দ খাওয়াবার কথা, তায় একেবারেই উপোসের ব্যবস্থা। লক্ষ্মী ভাই বৌদি, আমি কাজকর্ম খুঁজে নেবই একটা, মাসে এক টাকা করেও অন্ততঃ শোধ করব; তোমার কোন ভয় নেই!'

কনক তো অবাক।

'তুমি কি ভাই ঠাকুরঝি তোমার দাদাকে চেন না? একটা টাকাও কি আমার হাতে দেয় কোন দিন? সেই মানুষ কি? আমি কোথায় পাব?'

'কিচ্ছু দেয় না তোমাকে? তুমি কিচ্ছু জমাও নি? ওমা, তবে আর বরকে কি হাত করলে? ছেলে হয়েছে—এখন তো তোমার জোর।... কিছু নেই তোমার হাতে এ আমি বিশ্বাস করি না। দেবে না তাই বলো!'

অনেক দিব্যি-দিলেশার পর খানিকটা বিশ্বাস করে।

BanglaBook.org

তখন অন্য অনুরোধ, 'তুমি একটু মাকে কি দাদাকে বুঝিয়ে বলো। মা তো সুদে টাকা খাটায়—আমি সুদ দোব। কুড়িটা টাকা আমাকে ধারই দিক!'

এ অনুরোধের ফল কি হবে তা তো জানাই—ঐন্দ্রিলারও জানা উচিত, কারণ সে মাকে কনকের চেয়ে অনেক বেশি দিন দেখেছে—তবু ওর অনুনয় ও মিনতি এড়াতে না পেরে বলবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

রাত্রে হেমের কাছে কথাটা পাড়বার উপক্রম করতেই সে বলে, 'ওসব প্যান-প্যানানিতে কান দেবার তোমার দরকার কী? ওর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে যাও কেন? কী গুণের বোন আমার! খাচ্ছে-দাচ্ছে সে-ই ঢের, তার ওপর আবার দক্ষিণে দিতে পারব না। টাকা এত সস্তা নয় আমার!'

হেমের এ গলার আওয়াজ এতদিনে ভালই চিনেছে কনক। এর ওপর কথা কইতে যাওয়াই বৃথা।

পরের দিন শাশুড়ীকে বলতে গিয়ে আরও কর্কশ কথা শুনতে হ'ল।

'কেন, তোমাকে উকীল পাক্ড়ে বলতে হ'ল কেন? তাঁর মুখ কি হ'ল? সে পোড়ার-মুখ তো এখনও পোড়ে নি, সে তো ঠিক আছে।... আসলে বুঝেছে যে এখন বৌদিই বাড়ির গিন্নী, গিন্নী বললে মা মাগী ভয়ে ভয়ে দিতে পথ পাবে না। দাসী-বাঁদী বৈ তো নয় মা।... তা এতই যখন গিন্নী হয়েছ বাছা, টাকার জন্যে সুপারিশ করতে এসেছ কেন—তুমিই ফেলে দাও না টাকা কটা! ভাতার তো মোট মোট টাকা এনে শ্রীপাদপদ্মে ঢালছে, সে কি আর আমরা টের পাই না?—না, আমরা ধানের চালের ভাত খাই না। বেটা বিইয়ে দিয়ে ভাতারের সো হয়েছ—এখন তো হাতের মুঠোর মধ্যে ভাতার।... টাকাটা ফেলে দিলেই পারতে—ছলনা করে আবার আমাকে বলতে এসেছ কেন? লোক-দেখানো কাষ্টনৌকতা না করলেই নয়?'

অবশ্য মেয়ের উদ্দেশ্যেও হ'ল তারপর, 'সুদের কড়ারে টাকা ধার করতে এসেছেন উনি—দেবে কে ওঁকে, কিসের ভরসায় দেবে? ভারী তো ওঁর মুরোদ—বলে টিকে ধরাতে জামিন লাগে, সম্পত্তি বলতে আধ পয়সার জিনিস নেই কোথাও—উনি আবার বড় গলায় সুদের লোভ দেখান। এত যখন দরের মানুষ হয়েছেন উনি—যান না, বাজারে মহাজনের অভাব আছে! কাকে কত সুদের লোভ দেখাতে পারেন—দেখিয়ে আসুন না!'

এসব কথা বলা যায় না ঐন্দ্রিলাকে, বলতে পারেও না কনক। শুধু টাকাটা পাওয়া যাবে না, ওঁরা দিতে পারবেন না—এই কথাটাই বলে। ফলে ঐন্দ্রিলা মনে করে, কনক বিশেষ কোন চেষ্টাই করে নি—হয়ত আদৌ কোন চেষ্টা করে নি। সে কনকের ওপর পর্যন্ত বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে।

দিনকতক ছট-ফট ক'রে শেষে একদিন তরুকে গিয়ে ধরে, 'এই তোর হাতে তো টাকা আছে—হাতে না থাক, তোরই তো টাকা—মাকে বল্ আমায় কুড়িটা টাকা ধার দিতে—আমি তোকে দুটাকা বাড়িয়ে বাইশ টাকা ক'রে শোধ দোব। হয়ত এক মাসেই পারব না—তিন-চার মাসে শোধ করব, তবে ঐ টাকাটা পুষিয়ে দোব।

তরু হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না, উদাসীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আজকাল তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে বক্তার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে বটে, তবে তার মুখ দেখে বোঝা যায় না কথাগুলো সে শুনতে পাচ্ছে কি না।

'কী লো দিবি—না দিবি না? সেইটে পষ্ট বলে দে না বাবু।'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ঐন্দ্রিলা অল্পক্ষণেই।

তাতেও কোন জবাব না পেয়ে নিজমূর্তি ধরে সে, 'নেকী! কত কল্লাই জানিস্ মাইরি!... এই কল্লা ক'রে মা-ভাইকে তো ভুলিয়েও রাখিস! আমরা এসব কিছু শিখলুম না বলেই আমরা চিরকাল পাজি বদমাইশ হয়ে রইলুম সকলের কাছে। আমরাও একদিন হাত-শুধু করে এসেছিলুম এ বাড়িতে—তোর চেয়ে ঢের কম বয়েস—তবু কেউ আহা-উহু করে নি। আমরা যে কল্লা শিখি নি-তার কী হবে '

কিন্তু এসব কথারও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না—অব্যর্থ অস্ত্র পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে যেন। এবার ঐন্দ্রিলা ছিটকে উঠোনে নামে, গলা চড়িয়ে মাকে উদ্দেশ করে বলে, 'এত টাকা আসছে—এক-এক জন গিয়ে শয়ে চড়ছে আর সিন্দুক-ভরা বাসন, বাক্স-ভরা টাকা তো এসে ঢুকছে ওঁর :পেটে—তবু পয়সার মায়া এত! নিজের মেয়ে-নাতনীকে একটা পয়সা দেওয়া যায় না! আর কত লোকের সব্বনাশের পয়সা খাবেন উনি, কত খেলে ওঁর পেট ভরে—সেইটে জানতে পারলে যে হ'ত! কাউকে রেখে যাবেন না উনি, সব কটিকে গব্বায় পুরবেন—তবে যাবেন। তখন ঐ বাসন আর পয়সা পাঁচভূতে খাবে, এই বলে দিলুম। আমাদের সঞ্চে-বঞ্চে করা ঐ পয়সা!'

মর্মান্তিক আঘাত, শ্যামার বুকেও তা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। কদিন আগে তরুর বাসনের সিন্দুক যখন নামছে তখন তিনি নিজেই সেই কথা ভেবেছেন। এত জিনিসের শখ তাঁর—কিন্তু এ কী জিনিস আসছে, এ তো তিনি চান নি। ভগবান তার আকাঙ্ক্ষাকে এ কী পরিহাস করছেন। আর মেয়ের এই কথায় সেই ক্ষতটাই আবার দগ্‌দগিয়ে উঠল যেন। তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠে আবার তা বিবর্ণ হয়ে গেল। চোখে জলও এসে পড়ল। তবু তিনি প্রাণপণে আত্মসম্বরণই করলেন। তরল ময়লায় ঢিল ছুড়লে সে ময়লা ছিটকে নিজের গায়েও এসে লাগে। দরকার নেই।

এর পর ঐন্দ্রিলার হিংসা ও হিংস্রতা নিরাবরণ হয়ে উঠল। একটু শান্ত থাকত শুধু হেমের বাড়ি থাকার সময়টায়। সে অফিসে চলে গেলেই নিজমূর্তি ধারণ করত। অকারণ গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করত—সেটা ঠিক বাধত না বলেই আরও ক্ষেপে যেত যেন। গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে অভিসম্পাত করে জীবন দুর্বহ ক'রে তুলত সবাইকার। বোধ হয় এটুকু সে বুঝে নিয়েছিল যে, যাকে লাগানো-ভাঙ্গানো বলে—কনক তা করবে না। অন্তত তার সব অত্যাচারের কথা পুরোপুরি হেমের কাছে বলবে না। মা-ও—বললে খানিকটা বলবে, সবটা বলতে পারবে না।

অসহ্য হ'ত অবশ্য শ্যামারই। শুধু তাঁকে বললে অত গায়ে লাগত না তাঁর—কিন্তু সদ্যোবিধবা ঐ মেয়েটা—একে শোকে-দুঃখে নীরব নিথর হয়ে গেছে—ওকে যখন আক্রমণ করত, অসহ্য কটু কথা শোনাত—তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ রাখা অসম্ভব হয়ে উঠত এক একদিন। কিন্তু প্রতিবাদ বা তিরস্কারে কোনই ফল হ'ত না। এমন কাণ্ড করত ঐন্দ্রিলা, আরও অজস্র কুবাক্য এমন জলপ্রপাতের মতো অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসত তার মুখ দিয়ে—যথাযথ অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের সহযোগিতায় যে, সেদিক দিয়ে তার ওপরে ওঠা কোন ভদ্রমহিলার পক্ষেই সম্ভব নয়। কনক অবাক হয়ে যেত এইসব শুনে। সে ভেবে পেত না যে ও এত শিখলে কোথায়, শিখলে কার কাছে! এ সবই কি অন্যত্র শুনে শেখা ওর—না স্বকপোল -কল্পনা?

'বেরিয়ে যাও', 'দূর হয়ে যাও' এসব বলেও কোন ফল হ'ত না। সদম্ভে জবাব দিত ঐন্দ্রিলা, 'কেন, কিসের জন্যে বেরোব আমি? আমি শুনেছি মায়ের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার বেশি। বাড়ি তোমার নামে—আমি তো জোরের সঙ্গে থাকব। চিরকাল বাঁচবে নাকি তুমি? আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে এসেছ?.... মরতে হবে না একদিন ভেবেছ? তখন

BanglaBook.org

তো এ-সব আমাদের হবে।.... তবে কিসের জোর তোমার? এক মেয়ে যখন বসে আছে আমিই বা বসে থাকব না কেন? আমি তোমার মেয়ে নই? তাড়াতে হলে ওকেও তাড়াও।' ইত্যাদি।

পাগলকে যুক্তি দিতে যাওয়া বৃথা। বিশেষ সে এমনই চিৎকার করে যে তার ওপর গলা চড়িয়ে ওকে কোন কথা শোনাবেন—সে ক্ষমতা শ্যামার আর আজকাল নেই। অত চেঁচাতে গেলে তাঁর কষ্ট হয়।

এক উপায় হেমকে বলা। কিন্তু সে হয়ত মার-ধোর করবে শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে। সে এক কেলেঙ্কারী। এমনিই তো পাড়াঘরে মুখ দেখাতে লজ্জা করে তাঁর। তা-ছাড়া, বয়স হ'লেও ঐন্দ্রিলার সে অসামান্য রূপ এখনও এমন কিছু নষ্ট হয় নি—শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আর পথ নেই তার, মেয়ে তো বলতে গেলে ভিখিরী —তাড়িয়ে দিলেই বা কোথায় কার কাছে গিয়ে উঠবে। হয়ত গুণ্ডা-বাদমাইশের পাল্লায় পড়বে—কে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক কি! আরও সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন। চাকরি-বাকরি কি আর একটা জুটবে না। সে তবু কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকা, কতকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। পাজি হোক—বজ্জাত হোক—নিজে থেকে স্বেচ্ছায় খারাপ পথে পা দেবে না ও —সে বিষয়ে শ্যামা নিশ্চিন্ত।

মধ্যে মধ্যে আজকাল বেরিয়েও যায়—তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, কোন কোন দিন বা আরও বেশিক্ষণ অনুপস্থিত থাকে। কাজের জন্য ঘুরছে কি টাকা ধার করতে—তা ঠিক বুঝতে পারেন না। সম্ভবত দুই উদ্দেশ্যেই।... যাই হোক—সেই সময়টা একটু শান্তিতে, একটু স্বস্তিতে থাকেন।....

এর মধ্যে একদিন একখানা মনিঅর্ডারের রসিদ ফিরে এল। সীতার নামে কুড়ি টাকা পাঠানো হয়েছিল, তারই রসিদ। কোথা থেকে টাকাটা পেলে ও? দুর্ভাবনায় মুখটা কালো হয়ে উঠল শ্যামার! অন্য কোথাও ধার করে করুক—কুটুমবাড়িতে মুখটা পোড়াচ্ছে না তো? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি খোকাকে পাঠালেন মহাশ্বেতার কাছে। চুপি চুপি জিজ্ঞসা করে আসবে।

খোকাকে এখানের স্কুলে ভর্তি করা হয় নি। ওখান থেকে ছাড়িয়ে সার্টিফিকেট আনিয়ে এখানে ভর্তি করতে গেলে নাকি এক গাদা টাকা খরচা। হেম বলেছে, এখন বাড়িতে পড়ুক, আসছে জানুয়ারিতে কোথাও পড়ে না বলে এখানকার ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে—তাতে টাকা অনেক কম লাগবে। শ্যামা আপত্তি করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে কমলার ওখানেই থাক, কমলাও রাজি ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ রাজি হয় নি। অল্প যে ক'দিন ছিল ওখানে—গোবিন্দ ওকে লক্ষ করেছে। সে নাকি বলেছে যে, 'ও ছেলের হাবভাব ভাল নয়, বাইরে অমনি ঠাণ্ডা ভিজে বেড়ালের মতো থাকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও বিগড়ে গেছে। ওকে রাখবে—তারপর যদি কিছু হয়, আরও বেঁকে যায় তো আজীবন খোঁটা শুনতে হবে মাসীর কাছ থেকে। পয়সা কে পয়সাও যাবে—একটা ছেলেকে রেখে তার খরচা টানা কি সোজা—আমার গুনিও তো বড় হচ্ছে—মিছিমিছি তার ওপর দুর্নাম কিনি কেন!'

গোবিন্দর এ কথা হেম গোপন করে নি। শ্যামা খুবই চটে গেছেন তাতে। বলেছেন, 'আসলে খরচার কথাই বড় কথা। অতগুলো লোক খাচ্ছে, আমার ছেলে কি একেবারে য়্যাত য়্যাত খেত.... না হয় ইস্কুলের মাইনে, জামা-কাপড় আমিই দিতুম। শুধু খোরাকিটা—তাও দিতে পারলে না!.... সেই বলে না—ধান ভানাবি গা?—না না ভানাবার গা! তা পারবি না পারবি না—মিছি-মিছি একটা দুর্নাম দেবার দরকার কি? আমার ঐটুকু গুয়ের গোবলা ছেলে—চোদ্দ-পনরো বছর বয়স হয়েছে—এর মধ্যে ও কী বিগড়ে গেল? কী

BanglaBook.org

বিগড়ে যেতে দেখলেন তিনি! একটা গেছে বলে কি সব কটাই যাবে? তাও সে গেছে বলে কি আর ঐ বয়সে গেছে!' ইত্যাদি—

এ তো শুধু হেমের সামনে। হেমের আড়ালে গোবিন্দ সম্বন্ধে আরও যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা ভদ্রতার সীমায় আবদ্ধ থাকে নি—বলাই বাহুল্য।

খোকা ফিরে আসতে বোঝা গেল, তাঁর আশঙ্কাই ঠিক। তাও মহাশ্বেতা নয়—চেয়েছে জামাইয়ের কাছেই, তাঁর মুখটা ভাল করেই পুড়িয়ে এসেছে।

মহাশ্বেতা বলেছে, 'আমিই তো বললুম ছুঁড়িকে—যা না, তোর দাদাবাবুকে গিয়ে ধর না। আমিও হয়ত দিতে পারি—কিন্তু সে আর কত, পাঁচটা সাতটা না হয় বড় জোর দশটা। তা সে থাক না, তোর কি আর দরকার হবে না? এযাত্রা তোর দাদাবাবুকে গিয়ে বলগে যা সব দুঃখু জানিয়ে—দিয়ে দিতে পারে। তা মিনসেও তো তেমনি, নিজের কাছে কি এক পয়সা রাখে—সব তো এনে ঐ মহারাজার শ্রীপাদপদ্মে। সুদে খাটায় যে টাকা সেই টাকা শুধু থাকে, তা তা থেকে দেবে না আমি জানি—আর সে পড়েও থাকে না। সে খাটেও তো আমার টাকাই বেশি। তা বলবামাত্তরই ওর দাদাবাবু মেজকত্তাকে গিয়ে বললে—এক রকম দায়ে পড়েই, কী করবে এখন? কী ভাগ্যি মেজভাই সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে টাকাটা বার করে দিলে। এও বলে দিয়েছে যে—এ আর শোধ দিতে হবে না, এ তোমার মেয়েকে আমরা দিলুম। দিয়েছে তাই—না দিলে কি আমি অমনি ছাড়তুম নাকি, ওর শালীর ছেলেকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে না?'

আবার বলেছে, 'তা মারই বা কী আক্কেল—হাজার হোক পেটের মেয়েই তো—পর তো আর নয়! মেয়ে আর নাতনী—একটা দুঃসময়ে পড়েছে—ঐ কটা টাকা দিতে পারলে না! এই যে সুদে খাটাচ্ছে টাকা—কিছু কি আর মারা পড়ে না? না হয় ভাবত যে তেমনি মারাই পড়েছে। বলিস মাকে যে কথাটা শুনে দিদি খুব অসন্তোষ হয়েছে!'

খোকা আনুপূর্বিক এসে বলে মাকে—যা যা দিদি বলেছে, সব।

শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে শ্যামা, 'তবেই তো আমি তাঁর ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে বেরোলুম আর কি—লুকোবার জন্যে। এত যদি তোর টান নিজে দিলি নে কেন—আমার মুখটা পোড়াতে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে গেলি কেন।.... সারা কুটুমবাড়িময় জানাজানি হয়ে গেল—মুখটা পুড়তে কোথাও আর বাকি রইল না। বুদ্ধি না থাকে, হায়াপিত্তিও তো থাকে মানুষের—তুই কী বলে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে গেলি! হাত্তোর ভাল হোক রে!'

তিনি বহুক্ষণ পর্যন্ত গজরাতে থাকেন।

॥ ৪ ॥

অশান্তি কমে না—বেড়েই যায় দিন দিন। ঐন্দ্রিলা খুবই ঘুরছে চাকরির জন্যে কিন্তু চাকরি কোথাও পাচ্ছে না ভালমতো। একজন রাজি হয়েছিলেন, মাইনেও পুরো দশটা টাকাই দিতে চেয়েছিলেন—তাছাড়া একাদশীতে একাদশীতে দু'আনা করে পয়সা —কিন্তু ঐন্দ্রিলাই পিছিয়ে এল শেষ পর্যন্ত। শোনা গেল লোকপরম্পরায় সে বাড়িতে নাকি কোন ঝি-রাঁধুনী দশদিনের বেশি টেকে না—কর্তার দোষ আছে। কর্তাই দেখে শুনে পছন্দ করে নেন—অল্পবয়সী না হলে পছন্দ হয় না তাঁর, ইত্যাদি। এসব শুনে আর সাহস হয় না সে বাড়িতে কাজে যেতে।

এধারে যত দেরি হয়—ততই মেজাজ আরও খারাপ হতে থাকে তার। মাস শেষ হতে চলল—মেয়েকে আবার টাকা পাঠাবার সময় হয়ে এল—আর কোথায়ই বা পাবে টাকা। এখন কাজ ধরলেও এক মাস পরে টাকা—অথচ এখন কাজই ধরতে পারল না। ফলে মনের

banglabook.org

সব দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বিষ হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। সারাদিনই চেঁচামেচি করে সে—যতক্ষণ বাড়িতে থাকে। কাকচিল বসতে দেয় না বাড়িতে —এমন চিৎকার করে।

কনকের আর যেন সহ্য হয় না। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সারাদিনে ছেলেকে ঘুম পড়াতে পারে না সে, ননদের চেঁচানির চোটে।

আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে ইদানীং—শাশুড়ীর অহেতুক বিদ্বেষ তার প্রতি

এটার কোন মানেই বুঝতে পারে না কনক। সে কি দোষ করল? প্রাণপণে খাটছে সংসারে, সকলের সেবা করছে—শাশুড়ীও তার বিশেষ খুঁত ধরতে পারেন না আজকাল। সেও তো তাঁর মন-যুগিয়ে চলবারই চেষ্টা করছে অহরহ।... মেয়ের প্রতি যে রোষ রুদ্ধ আবেগে জমতে থাকে মনের মধ্যে, প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না—সেটাই যেন তির্যক গতিতে এসে ওর ওপর আছড়ে পড়ে। বৌয়ের ওপর আক্রোশ চেপে থাকার প্রয়োজন হয় না—কারণ সে প্রতিবাদ করতে পারবে না, করতে সাহস করবে না—সেই ভরসাতে নিশ্চিন্ত হয়েই সব বিষটা ঐখানে উদ্গার করেন। দিনে দিনে সে আক্রোশটা যেন বড় বেশি উগ্র বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠছে। কনক অনেক সয়েছে এ-বাড়িতে এসে, অনেক কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকে সে আজকাল—কিন্তু তারও সহ্যের সীমা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আগে সে ভাবত যে সব রকম লাঞ্ছনাই তার গা-সওয়া হয়ে গেছে—এখন চোখের জলে বুঝেছে যে তার অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ। এমনই কথা বলেন শ্যামা—এমন চোখা চোখা আঘাত করেন কথার দ্বারা—যে কনকের মনে হয় এর চেয়ে হাত দিয়ে মারা ঢের ভাল ছিল। 'বাক্যবাণ' শব্দটা বহু লোকেই ব্যবহার করেন বটে কিন্তু সে বস্তুটি ঠিক কি তা কেউ জানে না। এখানে না এলে জানা সম্ভব নয়।

সবচেয়ে দুঃখ এই, আঘাতগুলো আসে সম্পূর্ণ অকারণেই—তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষ ধরে। এ কেউ বিশ্বাসও করবে না বললে। সেই জন্যেই সে বলেও না হেমকে। তাছাড়াও, কেমন যেন বাধে তার—মার নামে নালিশ করবে ছেলের কাছে? ছেলে যদি ভুল বোঝে? হাজার হোক তার মা। এখনও সে স্বামীর মনোরাজ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না তার। হয়ত সে কনকের ওপরই বিমুখ হয়ে উঠবে।

বলে না—তবে হেম তার মুখ দেখে কিছু কিছু বুঝতে পরে বৈকি। প্রদীপের সামান্য আলোতেও ঢাকা পড়ে না এক একদিন। বোঝে যে তা মুখে না বললেও তার ব্যবহারে প্রকাশ পায়। হয়ত মুখে বলে না বলেই হেমের সহানুভূতি বেশি। সে যে সহ্য করছে—নালিশ করছে না, লাগাচ্ছে না তার কাছে—এতে শ্রদ্ধাই বাড়ছে হেমের। রানী বৌদি ঠিকই বলেছিল—এ রত্ন হেমই চিনতে পারে নি।

হেম একদিন নিজের কানেও শুনল। শনিবার বিকেলে কলকাতা যাবে বলে বেরিয়েও ফিরে এসেছিল সে—শরীরটা খারাপ লাগাতে। জ্বর জ্বর ভাব বলে এসে অন্ধকারেই শুয়ে পড়েছিল। শ্যামা টের পান নি। ছেলের সামনে একটু সতর্কই থাকেন তিনি। কত তুচ্ছ কারণে কী বিষ তিনি ঢালছেন শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে ওঠাতে হেম তেড়ে বেরিয়ে এল, 'ও কি হচ্ছে কি! ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো বুঝি? শক্ত মাটিতে দাঁত বসাতে পারো না—মেয়ের কাছে ধ্যাতানি খেয়ে সেই ঝালটা ওর ওপর ঝেড়ে গায়ের জ্বালা মেটাও—না?'

এর ফল যে ভাল হল না—তা সহজেই অনুমেয়। ছেলেকে মনে মনে একটু সমীহ করলেও সামনাসামনি সেটা অস্বীকার করবার লোক নন শ্যামা। তিনি জানেন যে একেবার মেনে নিলে আর কোন দিন নিজের অধিকার মানাতে পারবেন না।

তিনি সমান তেজের সঙ্গেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা মেটাই তো। তার জন্যে কী করবি কি? মারবি নাকি? সেইটে হলেই মাগপূজোর ষোড়শোপচার পূর্ণ হয়।... তুই তোর

BanglaBook.org

মেগের পা ধুয়ে পাদোক জল খেতে পারিস—আমি কেন খেতে যাব? আমার বাড়ি আমার ঘর। .... বেশ করব বলব—না পোষায়, ভাল না লাগে মাগ ঘাড়ে করে বেরিয়ে যা। ভাবিস নি যে ঐ কুড়ি টেক্‌লো করে মাসে ঠেকিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছিস—না দিলে আমার দিন চলবে না। ব'লে তোর জন্মদাতাই আমাকে উপোস করিয়ে মারতে পারলে না—তা তুই!'

বৌয়ের ওপর ঝালটাও আর গোপন করবার দরকার হয় না।

'ভেড়ুয়া ভাতার পেয়েছিস, ভাবছিস দুনিয়ার সবাই তোকে ভয় করে চলবে, না? বলা হয়েছে ওঁৎ পেতে শোন তোমার মা মাগী কি রকম বলে, দ্যাখো ব্যাভারটা।...তা শোনানো তো হ'ল—এইবার কি হবে কি? আমার কাঁচা মাথাটা উলিয়ে নেবে তোর ভাতার? নাকি হেঁটে-কাঁটা ওপরে-কাঁটা দিয়ে উঠোনে পুঁতবে আমায়? যা পারে করতে বল—আর সাধ্যি থাকে তুইও আয়! হারামজাদার বংশ—হারামজাদী আমার সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দিলে গা! যেদিন থেকে ভিটেয় পা দিয়েছে সেইদিন থেকে অশান্তি। কী আয়পয় দেখেই বৌ এনেছি আহা! এসে পর্যন্ত মড়াই মরছে শুধু। সবাইকে খেয়ে উনি একা এখানে রাজত্ব করবেন! করাচ্ছি রাজত্ব তোমাকে। তেমন তেমন দেখব—খ্যাংরা মারতে মারতে বাড়ি থেকে দূর করে দেব। দেখি তোর কোন্ বাবা রাখে।'...

ঘরের মধ্যে রুদ্ধস্বরে কনক হেমকে বলে, 'কেন তুমি কথা কইতে গেলে। এই সওয়া আমি নিত্যি চার প্রহর সইছি—তুমি একদিন সইতে পারলে না? আরও বিষ বাড়লই শুধু। তোমার কি, তুমি তো দিনে বারো ঘণ্টার ওপর বাইরে থাক—আমায় তো দিনরাত থাকতে হয়। এর পর আরও কি কাণ্ড হবে তা বুঝতে পারছ!' হেম গুম হয়ে বসে থাকে তখন, কথা কয় না।

রাত্রে স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'পীড়ন হচ্ছে বুঝতে পারি কিন্তু এতটা বুঝি নি। তুমিও তো বল নি কখনও?'

এ কথার কি উত্তর দেবে কনক! এইটুকুই হেমের পক্ষে যথেষ্ট সপ্রেম ব্যবহার, এই সামান্য স্নেহের সুরেই তার চোখে জল এসে গেছে। কথা কওয়ার শক্তিও নেই তখন।

হেম একটু চুপ করে থেকে আবারও বলে, 'কেন এমন করছে মা—যেন কী এক বিষের জ্বালায় ছিটফিটিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করলে কি তুমি?'

এ কথারও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ওর যা মাঝে মাঝে মনে হয় তা কাউকেই বলা সম্ভব নয়। ওর মনে হয় বিষ নয়—রীষ এটা... ওঁর মেয়েরা একে একে এ জন্মের মতো সব সৌভাগ্য ঘুচিয়ে এসে ঢুকছে তাঁর কাছে—বৌ পরের মেয়ে, স্বামী পুত্র নিয়ে মনের সুখে ঘর করবে কেন—যেন এই ধরনেরই ঈর্ষা একটা ওঁর!

কথাটা ভাববে না বলেই মনে করে কনক, বড় নোংরা কথা, বড় খারাপ কথা—তবু ঘুরে-ফিরে বারবারই মাথায় আসে কথাটা। আজও, হেমের এই প্রশ্নে কথাটা মনে হতেই, শিউরে উঠে কথাটাকে মন থেকে তাড়াতে চাইল সে।

হেম ওর মনের কথাটা বুঝল না কিন্তু শিহরণটা টের পেল। সে আরও সস্নেহে ওকে একটু কাছে টেনে বলল, 'আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো। আমি চেষ্টা করছি কিছুদিন থেকেই—বদলির অর্ডারও হয়ে গেছে—সেখানে কোয়ার্টার এখনও তৈরি হয় নি সব, কোয়ার্টার পেলেই চলে যাব। যা শুনছি, বড়জোর আর দুটো মাস।'

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত, এত আনন্দের যে, কনকের মনে হল একটা চিৎকার করে সে উল্লাস প্রকাশ করে। পাবে সে—একদিন মুক্তি পাবে! তোমরা সবাই শোন—সে চলে যেতে পারবে এই জীবন্ত সমাধি থেকে!

BanglaBook.org

কিন্তু এ সব আনন্দ ও অধীরতা মুখে প্রকাশ করতে নেই—এই অসহ সুখের মধ্যে সে জ্ঞান তার ছিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণই করল সে, মুখে শুধু প্রশ্ন করল, 'তারপর, এখানে?'

'এখানে মা রইল, তরু রইল—কান্তি রইল। যা হয় হবে—আমি আর ওদের কথা ভাবতে পারব না। ঢের ভেবেছি। কান্তেটা বলেছে সামনের বার এগজামিন দেবে, দিতে পারে দিক। মেসোমশাই বলেছেন যে, ও যদি এগজামিন দিতে চায় তো তাঁকে জানালেই তিনি ফিয়ের টাকা পাঠিয়ে দেবেন। পারে পাস করতে, একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। বড়দাকে বলেছি কোন বাঙ্গালী বাড়ির কাজ খুঁজতে—যা দু-চার পয়সা দেয়। সাহেবের চাকরি তো আর হবে না ওর দ্বারা। সরকারি কাজও পাবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'খোকাটাকে মনে করছি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমার হাত-নুড়কুৎ হবে একটু—ওখানের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব! তবু চোখে চোখে রাখা যাবে। কে জানে বড়দা কী বোঝে, সে তো বলে, ওর পিপুল পেকেছে, ওর আর কিছু হবে না।'...

কিন্তু গোবিন্দ যা-ই বলুক তার কথাটা যে এত শিগ্‌গির ফলে যাবে তা বোধহয় সেও ভাবে নি।

ঘটনাটা ত্বরান্বিত করলেন অবশ্য শ্যামাই।

অনেকদিন পরে এক কাঁদি ভাল কালীবৌ কলা পড়েছিল বাগানে। কদিন আগে কান্তিই সেটা কেটে নামিয়ে রেখেছে। সেদিন সকালে উঠে ছালা সরিয়ে শ্যামা দেখলেন, যে সবগুলোই পেকে উঠেছে, সেদিনই বিক্রির ব্যবস্থা না করলে কালো হয়ে যাবে সব।

তিনি কান্তিকে বললেন, ওপর দিককার মাথার ছড়াগুলো কেটে সাবধানে একটা ধামাতে সাজাতে, আর খোকাকে বললেন ধামাটা নিয়ে বাজারে গিয়ে ফলওয়ালাদের কাছে বেচে আসতে।

কথাটা তাঁর কাছে এতই স্বাভাবিক যে, কোন প্রতিবাদ আশাও করেন নি। কিন্তু খোকা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'সে আমি পারব না।'

'পারবি না!' আশ্চর্য হয়ে যান শ্যামা, 'পারবি না কেন?.... ও কালা-মানুষ কি শুনতে কি শোনে, ওকে ঠকিয়ে দেয়—তুই রয়েছিস তুই যাবি, এই তো সোজা কথা। বেশ ভাল ফল হয়েছে, ভাল দাম পাওয়া যাবে দরদস্তুর করতে পারলে। তা তোমার কি হ'ল কি?'

সে তেমনি মুখ ফিরিয়েই উত্তর দিলে, 'বাজারে মোট ঘাড়ে করে বেচা বেচতে যাব—আমি কি ছোটলোক!'

'ও আবার কি কথা! নিজের বাগানের জিনিস নিজে বেচবি—তাও তো আমি তোকে বাজারে বসে খুচরো বেচতে বলছি না, তাতে তো দু'পয়সা বেশিই পাওয়া যায়—পাইকিরি বেচবি একজনকে, তা আবার ছোটলোক ভদ্দরলোক কি! যা বলছি শোন। কান্তি এই তো কতদিন ধরে করছে, ও পারে—তুমি পার না? ও ছোটলোক হয়ে গেছে—না?'

'যে পারে পারে—আমি পারব না। এমনিই আমাদের দেখলে পাড়ার ছেলেরা হাসে। তার ওপর ধামা মাথায় করে কলা বেচতে গেলে আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

শ্যামা এই কথাতে আরও ক্ষেপে যান। পাড়ার লোক তাকে একটু বিদ্রূপের চোখে, অবহেলার চেখে দেখে তা তিনি জানেন। কিন্তু সেই কথাটারই কেউ ইঙ্গিত দিলে সহ্য করতে পারেন না।

'পারবি না কি, পারতেই হবে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!... আমার মুখের ওপর পারব না বলা! গোবিন্দ দেখছি ঠিকই বলেছে, পিপুল পেকেছে তোমার!.... দুদিন

BanglaBook.org

কলকাতার জল গায়ে পড়ে ধরাকে সরা দেখছ, না? চাল বেড়েছে! চাল বার করছি। দুদিন ধানের চাল পেটে না পড়লেই সব চাল চলে যাবে। ভিরকুট-বীচি ও, ওর বড় দাম; পাড়ার ছেলেরা কি বলবে এই ভয়ে আমার দুটো পয়সা আয় বন্ধ করে দেব, না? এত বড় সংসারটা চলবে কিসে? পাড়ার ছেলেরা খেতে দেবে তোকে—না, আমাকে দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করবে! যাদের ছেলেরা হাসে তারাই দেখিস না মাথা হেঁট করে টাকা ধার করতে আসে আমার কাছে?...নে ওঠ বলছি, ভাল চাস তো! মাথায় করতে হবে কেন, হাতে ক'রেই নিয়ে যাও না।'

কিন্তু শ্যামা যতই যা বলুন, খোকা নড়ে না। বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। কথা যে সে শুনবে না সেটা স্পষ্ট সবাইকার কাছেই—

এত বেয়াদপি শ্যামার সহ্য হয় না। তিনি এক চড় বসিয়ে দেন ওর গালে। পাতা-কুড়নো আর পাতা-চাঁচা, মাটি কোপানো হাত—পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় ওর গালে।

কিন্তু এতেও এক ইঞ্চিও নড়ে না সে।

তখন পাগলের মতো মারতে থাকেন শ্যামা। কনক ধরতে এসে পিছিয়ে যায়—শ্যামার সে সময় রণরঙ্গিনী মূর্তি! পাখার বাঁটের এক ঘা সজোরে তার হাতেও পড়ে ঝনঝনিয়ে ওঠে হাত। ছুটে আসে ঐন্দ্রিলাও। কান্তি এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

'আমি যাচ্ছি মা। আমিই তো যাই।... ওকে ছেড়ে দাও।'

ঐন্দ্রিলার ব্যঙ্গেই বেশি কাজ হয়, 'কেন গো, তোমার ছেলেমেয়ে সবাই তো লক্ষ্মী, সব ভাল। যত বদ তো আমি। তবে আবার এ মূর্তি কেন? কেউ তোমার কথা শুনবে না, কেউ না—এটি মনে রেখো। মারের চোটে আর কদিন শোনাবে? এর পর ওরাই ধরে মারবে যখন?'

শ্যামার হাতের মুঠো থেকে এইবার পাখাটা টেনে নেয় কনক।

'আচ্ছা, আমিও দেখে নোব তোমার এ ভিরকুটি কদিন থাকে। ও ভিরকুটি ভাঙ্গতে আমি জানি। বালাম চাল পেটে পড়ে কদিনেই বড় বাড় হয়েছে তোমার। ঐ চাল বন্ধ করলেই টিট্ হয়ে যাবে তুমি! আজ থেকে ভাত বন্ধ তোমার এ বাড়িতে। মাথায় করে আনাজ নিয়ে বাজারে গিয়ে বেচে আসবে তবে ভাত পাবে আবার। যে কথা সেই কাজ আমার—আমাকে তুমি চেন না!'

সত্যিই সেদিন ভাত দেন না শ্যামা। দালানের জানালায় সেই যে কাঠ হয়ে বসে থাকে খোকা—বসেই থাকে তেমনি। ঘামে গা ভিজে যায়—কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল বেরোয় না। সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ হয়ে গেছে, দেখে কনকের মন-কেমন করে। আহা, ঐটুকু ছেলে—কী চোরের মারই খেলো। ইচ্ছে হয় কাছে টেনে নিয়ে গা মুছিয়ে দেয়—সান্ত্বনা দেয় একটু—কিন্তু শ্যামার ভয়ে পারে না। তবু শ্যামা যে সত্যিই ওকে খেতে দেবেন না—তা কখনও ভাবে নি ওরা। সবাই শুকিয়ে বসে আছে, শুধু তরুকে ডেকে খাইয়ে দিয়েছে কনক। বেলা দেড়টা নাগাদ শ্যামা গম্ভীরভাবে নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে যখন খেতে বসলেন, ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বললেন, ডাল-তরকারি কি কি হয়েছে দিয়ে যেতে—তখন সে সুদ্ধ অবাক হয়ে গেল।

'তা ও—?' কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে ইঙ্গিতে দালানের দিক দেখিয়ে প্রশ্ন করে সে।

'ওর কথা তো একবার বলে দিয়েছি বাছা। আমার কথা না শুনলে এ বাড়িতে ওর অন্ন নেই—সাফ্ কথা। কেউ যেন কোন রকম দয়াধম্ম না করতে যায়—শুনলে আমি কিন্তু তাকে সুদ্ধ সেই দণ্ডে বাড়ির বার ক'রে দেব!'

BanglaBook.org

এর পর ওকে ডেকে ভাত দেবে সে সাহস কারও নেই।

অনেক ইতস্তত করে ঐন্দ্রিলা ভাত নিয়ে নিজেও খেতে বসল। কিন্তু কনক পারল না। তারও সেদিন দুপুরে খাওয়া হ'ল না।

শ্যামা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়েই যথারীতি প্রশান্ত বদনে বাইরের রকে গিয়ে পাতা নিয়ে বসলেন।

ঐন্দ্রিলা খেয়ে এসে ছোট ভাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে বলল, 'এই—যা না, গিয়ে একবার মাপ চাইগে যা না। উপোস করে থাকবি নাকি! এখনই তো তোকে বাজারে পাঠাচ্ছে না। আর কী আছে ঘরে যে পাঠাবে? সে কলা তো কান্তি বেচেই এল।... যা ওঠ—। ... আ মর, তেজ দ্যাখো, কথা শোনে না। মরুক গে, মরলে তুই-ই মরবি—আমার কি! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে!'

হেসে অঙ্গভঙ্গি করে ঘরে চলে গেল ঐন্দ্রিলা।....

কনক দাওয়াতেই বসে ছিল চুপ করে। সে-ই দেখল খানিক পরে খোকা উঠে খিড়কীর দোর দিয়ে বাগানের দিকে গেল। সে ভাবল পাইখানায় যাচ্ছে বোধহয়, এসে স্নান করবে। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল যখন—এদিকে ফিরল না, পুকুরেও কারুর স্নান করার সাড়া পাওয়া গেল না—তখন সে উদ্বিগ্ন বোধ করল। বাগানে বেরিয়ে দেখল পাইখানার দিকে কেউ যায় নি—পিছনটা সব দেখে এল—যদি কোন গাছতলা-টলায় বসে থাকে, সেখানেও নেই। তখন বাইরে এসে সাহসে ভর করে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'মা—ছোট্ ঠাকুরপো কোথায় গেল বলুন তো?'

'গেল?' একটু চমকেই উঠলেন শ্যামা, 'কোথায় যাবে? কই—এদিকে তো আসে নি। ওখানে নেই?'

তখন কনক বল, উঠে বাগানের দিকে যাবার কথাটা।

'তাহলে বোধহয় ওদিক দিয়ে বাইরে চলে গেছে—আমার সামনে দিয়ে যাবে না বলে। যাক না—বন্ধুবান্ধব ঢের হয়েছে পাড়ায়, কে কত খাওয়াতে পারে খাওয়াক না! যাবে কোথায় বাছা, ঠিক ফিরে আসবে। তুমি খেয়ে নাও গে—একজন সোহাগ করে বসে আছে দেখলে জব্দ হবে না।'

কনক যে খায় নি তা শ্যামা লক্ষ করেছেন। গলার কোমল সুরে বোধ হল মনে মনে খুশিই হয়েছেন তাতে।

কিন্তু বিকেলেও ফিরল না খোকা। সন্ধ্যার পরও না। এবার শ্যামা সুদ্ধ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। তিনি নিজেই বেরোলেন পাড়ায় খোঁজ করতে। ঐন্দ্রিলাও কতকগুলো বাড়িতে গেল। খালি গায়ে এক কাপড়ে বেরিয়েছে, কোথায়ই বা যাবে?... কিন্তু পাড়াঘরে কোথাও খবর পাওয়া গেল না। কেউ দেখে নি তাকে।

হেম এসে সব শুনে খুব বকাবকি করল মাকে। শ্যামা চুপ করে রইলেন। তাঁর ভয় হয়েছে—অনুশোচনাও হয়েছে। ইতিমধ্যে কান্তিকে পাঠানো হয়েছিল মহাদের বাড়ি, সে ফিরে এল। সেখানেও যায় নি। ওর সঙ্গে বুড়ো ন্যাড়ারা এসেছিল খবর পেয়ে—তারা আলো নিয়ে স্টেশন লাইনের ধার খুঁজে এল। হেম তখনই গেল কলকাতায় বড়মাসীর বাড়ি। সেখানেও নেই।

জানাশুনো কোন জায়গাতেই খবর পাওয়া গেল না তার। পরের দিনও সবাই যতটা পারল ঘোরাঘুরি করল। হেম আপিস কামাই করে থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে বেড়াল—কিন্তু কেউই কোন খোঁজ দিতে পারল না। অত বড় ছেলেটা যেন উবে গেল একেবারে।

BanglaBook.org

শ্যামা পরের দিন থেকে অন্নজল ত্যাগ করলেন; কান্নাকাটিও ঢের করলেন। গালাগাল দিলেন সদ্য-মৃতা বোনকে! বিশ্বাস করে তার কাছে রেখেছিলেন, সে এত ছেলে-মেয়ে চরাত সে লক্ষ করে নি যে ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে? গোবিন্দ তো একদিনেই চিনল!.... বিশ্বাস করতে নেই কাউকে, খুব শিক্ষা হল তাঁর। তার নিজের ছেলে হয় নি তো, কী বুঝবে পেটের একটা নষ্ট হলে কী দুঃখ হয়।

কদিন পরে আবার ঠেলে উঠলেন নিজেই। আবার শুরু হল নিয়মিত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। যেমন চলছিল সব তেমনই চলতে লাগল। সবাইকে শুনিয়ে বোধ করি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন, 'যাবে আর কোথায়? মরে নি এটা তো ঠিক, মরলে হয় এখানেই রেলে গলা দিত, নয়ত কোন পুকুরে ডুবত।... সে খবর পাওয়াই যেত এতদিনে। কলকাতার হাসপাতালেও তো খবর নেওয়া হল।.... না মরে নি। আমার মন বলছে ফিরে আসবে সে। তবে কী মূর্তিতে আসবে সে-ই হল কথা। কোন্ গুণ্ডাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালী শিখে আসবে—চোর ডাকাত খুনে হবে—সেই এক ভাবনা।... তা আমি আর কি করব। মায়ের পেটের বোনকে দিলুম বিশ্বাস করে সে-ই যখন—' ইত্যাদি।

কিন্তু শ্যামার আশা বা আশঙ্কা কোনটারই আশু কোন চেহারা দেখা যায় না। দিন সপ্তাহ-মাস কেটে যায়—গাছপালায় প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্তনের ইতিহাস রচিত হতে থাকে—তবু খোকা ফেরে না। শ্যামার মন ভার হয় আবার, সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে বসে চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলেকে ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় খুঁজে পান না। কোথায় আছে যদি জানতে পারতেন!

মন খারাপ হয় সকলকারই। কনকের তো আরও বেশি, নূতন সংসারে তার সঙ্গে থাকবার কথা। কোথায় গেল কে জানে, দুটো দিন যদি ধৈর্য ধরে থাকত! অতবড় ছেলেটা বরবাদে চলে গেল!

তার কথা ভাবলেই সেই মার-খাওয়া ম্লানমুখ চেহারাটা মনে পড়ে যায়। চোখ ফেটে জল আসে যেন। আহা, যেখানেই থাক, সুখে থাক, মানুষ হোক!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

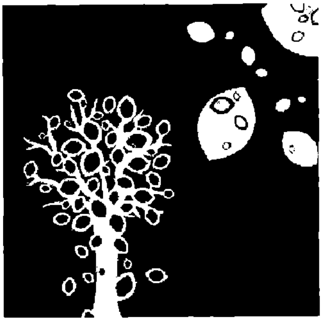

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খবরটা যখন পৌঁছল তখন অরুণকে দেখা গেল না। সে যে কোথায় লুকিয়ে বসে আছে তা কেউ জানে না। খবর সেদিন বেরোবে তা অরুণও জানত—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে দেখে আসার সাহস হয় নি। এমনিই গত কদিনে যেন শুকিয়ে উঠেছে সে, মুখ-চোখের এমন ম্লান অবস্থা যে তাকানো যায় না। তিন-চারদিন ধরে বলতে গেলে ভাতের সামনে বসেছে শুধু। তাও সাধ্য-সাধনা করে বসানো, বুঁচি গিয়ে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসে তাই—বাগানের কোন্ কোণে লুকিয়ে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধই করে দিয়েছে এক রকম।

বুঁচি খুঁজতেও আসে—আবার সে জন্যে ফৈজতও কম নয়।

মুখের সামনে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে, 'বলি, তুমি পেয়েছ কী আমায়? কত মাইনে দাও যে পেত্যহ এমনি করে খুঁজে পেতে সাধ্যিসাধনা করে নিয়ে যেতে হবে! ভাত খেয়ে কি আমার মাথাটা কিনবে?'

ওর সেই তিরস্কারের ভঙ্গিতে রাগ হয় না অরুণের, বরং তার সেই অপরিসীম শুষ্ক মুখেও প্রসন্ন হাসি ফোটে।

'তুমি খোঁজো কেন—আমি কি বলি খুঁজতে? কৈ, আর তো কেউ খোঁজে না।'

'তুমি বলবে কেন, তুমি যদি দুটো কথা বলতে কি একটা দুটো ফরমাশ করতে কাউকে তাহলেও তো বুঝতুম যে খানিকটা মানুষের মতো কাজ হ'ল।.... আমার যে হয়েছে যত জ্বালা। আর তো কারুর মাথাব্যথা নেই। একটা মনিষ্যি খাচ্ছে না চান করছে না, মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে তা কি কারুর হুঁশপব্ব আছে?—আচ্ছা, তাও বলি, এত ভাবনার কি আছে, ফেল তো তুমি করবে না বাপু।'

'তা কি বলা যায়—যদি ফেল করি! এদের এতগুলো পয়সা খরচ করালুম, ফেল করলে আর মুখ দেখাতে পারব না। একে তো এই বুড়ো বয়সে এগজামিন দেওয়া বলতে গেলে—'

'নাও, তুমি আর হাসিও নি বাপু। আঠারো-উনিশ বছরে একটা পাস করে যাবে—সেটা কি কম কথা হল! ঐ-তো মজুমদারদের গ্যাঁড়া—ওর তো বয়সের গাছ পাথর নেই—ফি বছর এগজামিন দিচ্ছে ফেল করছে আর বিড়ি ফুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। .... নাও, এখন ওঠো, দয়া করে নেয়ে খেয়ে আমায় উদ্ধার করবে চলো। তুমি যেদিন ফেল করবে সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠবে।'

'কেন আমি কি একবারে বিদ্যের জাহাজ—ফেল করতে পারি না!.... আমার তো মনে হচ্ছে কিছুতেই পাস করতে পারব না।'

BanglaBook.org

'রেখে বোস দিকি বাপু! এমন পাগলামী ছেমো কে তোমার মাথায় ঢোকালে! তুমি যদি ফেল করো তাহলে বুঝব সাক্ষেৎ মা সরস্বতীর সাধ্যি নেই এ এগ্‌জামিনে পাস করার। বিদ্যের জাহাজ কি বলছ—বাব্‌বা, যে পড়াটা তুমি পড়লে আমি তো মনে করি এক জাহাজ বিদ্যে তোমার পেটে ঢুকে গেছে।.... নাও নাও ওঠো—খেয়ে আমার মাথা কিনবে চলো, তোমার সঙ্গে এত বাজে বকবার সময় নেই আমার।'

অগত্যা অরুণকে উঠতে হয়, স্নানাহারও করতে হয়। অন্তত ভাতের সামনে বসতে হয় একবার। এই ভাবেই চলছে কদিন। স্বর্ণলতা ধরে না আনলে বোধহয় এর মধ্যে তার একবারও খাওয়া হ'ত না—খাওয়ার কথা মনেই পড়ত না। রকমসকম দেখে প্রমীলা হেসে বলত, 'মা-লক্ষ্মীর আমার চাকরিটি হয়েছে ভাল! ও বুঝি তোমার খাস তালুকের প্রজা—হ্যাঁ-গা গিন্নীমা, তাই তুমি না বললে উঠবে না খাবে না?'

মহাশ্বেতা আড়ালে গজরাত, 'মুয়ে আগুন মেয়ের। ঘরজ্বালানি পরভালানি। নিজের ভেয়েরা খেলে কিনা—তা একবারও খোঁজ নিস? পরের জন্যে তো মাথাব্যথার সীমে-পরিসীমে নেই একেবারে।'

'নিজের ভেয়েদের খবর নোব কি, নিত্যি-তো চোখে দেখছি—চারবার, সদরে চারবার চুরি করে—এই আটবার খাওয়া তো বাঁধা! খবর নিতে গেলে তো চুরি-বিদ্যের খবরও রাখতে হয় গো—বাপ-কাকাকে জানাতেও হয়। সেটা কি ভাল হবে—বুঝে দ্যাখো।'

ঝঙ্কার দিয়ে চলে যেত স্বর্ণলতা। মহাশ্বেতার শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া উপায় থাকত না। চারবার না হোক, চুরি করে এটা-ওটা খাওয়া যে তার ছেলেদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তা সেও জানে। বরং বলা যায়, সে-ই শিখিয়েছে।...

সেদিন খবর বেরোবে, ইউনিভার্সিটির দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবে—এ খবরটা রটে গিয়েছিল আগের দিনই। দুর্গাপদ অরুণকে ডেকে বলেছিল, 'তাহলে আমি বলি কি অরুণচন্দর, আমার মান্থলী টিকিটটা নিয়ে ভোরের গড়িতে চলে যাও তুমি—দেখে সাতটার মধ্যে ফিরতে পারবে না?.... না হয় আটটার গাড়িতে এসো, আমি ইস্টিশানে টিকিটটা নিয়ে নেব'খন্ তোমার কাছ থেকে।'

কথাটা শুনে অরুণের মুখ বিবর্ণতর হয়ে উঠল। স্বর্ণলতা লক্ষ করল, তার পা দুটো ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে।

সে বললে, 'খুব লোককে গিয়ে খবর নিতে বলছ ছোটকা, দেখছ না ওর অবস্থা। হাওড়া ইস্টিশানে পৌঁছে কোথায় ভিরমি লেগে দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকবে—তখন তোমার আপিস যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ও বাপু তুমিই একটু কষ্ট করে জেনে দাও—'

স্বর্ণলতা কর্তাদের সকলেরই প্রিয়। দুর্গাপদর একটু ভুরু কুচকে উঠেছিল আগে প্রস্তাবটা শুনে—কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল শেষ পর্যন্ত, তোমাকেই খবরটা জেনে দিতে হবে?.... তা দেব। তবে বাছা ভোরে গিয়ে ফিরে এসে সাত-তাড়াতাড়ি বেরোনো, সে আমার দ্বারা হবে না, বরং একটা ট্রেন আগে, কি মেজদার সঙ্গেই, খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে যাব—খবরটা জেনে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব! কেমন?'

স্বর্ণলতা খুশি হয়ে বলে, 'সেই ভাল।'

তখন থেকে অরুণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে শোচনীয়। রাত্রে নাকি ঘুমোয় নি এক বিন্দুও, যারা ওর ঘরে শোয় তারা সবাই বলেছে সে কথা; যে যখন উঠেছে রাত্রে ওকে দেখেছে বসে থাকতে। তার ওপর ভোর-না হতেই এমন উধাও হয়েছে যে বহু খুঁজেও কেউ পাত্তা পাচ্ছে না। বাগান, পুকুরপাড়, ওধারের বাগান—সব নাকি দেখা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

পাত্তা কে পাবে তা অবশ্য গিন্নীরা সকলেই জানে। প্রমীলা মুখ টিপে হেসে বলে, 'তোদের ব্যস্ত হতে হবে না—তোরা নিজের ধান্দায় যা। আমার গিন্নীমায়ের দুধ জ্বাল দেওয়াটা শেষ হোক—এখবর সে-ই পৌঁছে দেবে এখন।'

লজ্জা পায় স্বর্ণলতা, 'বেশ বলছ তো বাপু, কেউ খুজে পেলে না যেকালে সেকালে আমিই বা পাব কি করে? আমি তাকে ট্যাঁকে পুরে রেখেছি, না সিন্দুকে চাবি দে রেখেছি?'

'কোথায় রেখেছ—কোথায় রাখো তা তুমিই জান মা—তুমিই তো খুঁজে পাও দেখি ঠিক!'

স্বর্ণলতার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তরলা তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বলে, 'আসলে ওর স্বভাবটা লক্ষ করেছে আর কি, কোথায় বসে থাকতে পারে সেটা ওর জানা হয়ে গেছে।.... তা তুই যা না বাপু, আমি দুধ দেখছি।'

'সে বাপু আজ বলা শক্ত।' নরম হয়ে আসে স্বর্ণ, 'আজ সে মোক্ষম লুকোন লুকিয়েছে—বেশ বুঝতে পারছি।.... তা এসো তাহলে তুমি, দুধ দেখসে। ভ্যালা জ্বালা হয়েছে বাপু, দেখি আবার, কোন সাপের গর্ত্তে কি ব্যাঙের গর্ত্তে লুকোলো!'

সে কিন্তু সোজাই খুঁজে বার করলে ওকে—একবারেই। সবাই সব জায়গা দেখেছে যখন—তখন আবার নতুন করে দেখতে গিয়ে লাভ নেই সেই সব জায়গাই। সে এমন কিছু দূরবীন চোখে এঁটে যাচ্ছে না যে অপরের চোখে যা পড়ে নি তা তার চোখে পড়বে। সে জানত যে পাইখানার দিকটা কেউ যাবে না, অথচ ঐখানে পগারের ধারে নোনাগাছে আর জামরুল গাছে জড়াজড়ি করা বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ একটি নিরাপদ জায়গা আছে—লোকচক্ষুর আড়ালে।

আর সত্যিই সেইখানে পাওয়া গেল অরুণকে।

'বলি তেমার ব্যাওরাটা কী বলো দিকি! তুমি মনিষ্যি না ভূত! বলি কাউকে খুন করে ফেরার হয়েছ নাকি যে এমন জায়গায় এই গুয়ের বনে এসে নুকোতে হবে! ধন্যি বাবা, ধন্যি!'

ওকে দেকে অরুণ উঠে এল অবশ্য। কিন্তু ভয়ে বোধ করি তার পা অবশ হয়ে গেছে তখন—আসতে আসতে দু-তিনবার টাল খেল সে।

'ওগো ভয় নেই—পাস করেছ! পাস করেছ! ছোট-কা নিজের চোখে দেখে খবর পাঠেছে। খুব ভাল পাস করেছ নাকি, কী একদাঁড়ি না কি বলে—তাই পেয়েছ। একদাঁড়ি কাকে বলে গা?

'ফা-ফার্স্ট ডিভিসন। প্রথম বিভাগ। খ-খবরটা কে দিলে বুঁচি?'

'যে দিয়েছে ভাল লোক। ছেলেছোকরা কেউ নয়। মতি ভট্চাযের ছেলেও তো এই এগজামিন দিয়েছিল, ছেলের সঙ্গে সেও গিয়েছিল দেখতে, তাকে দিয়েই বলে দিয়েছে। মতিবাবুর ছেলে নাকি তিন দাঁড়ি পেয়েছে। দুঃখ করছিল খুব। আমি তো জানি বেশি পেলেই ভাল—তা এ বাপু দেখছি তোমার এই পাসের পড়ার সবই বিপরীত।'

'ছোট-কা—ছোট-কা ঠিক দেখেছেন তো—ভুল হয়নি?'

'তোমার বাপু ধরনধারণ দেখলে আমার গা জ্বালা করে। এ কি ভুল দেখবার জিনিস? তার এ জ্ঞান নেই? তোমার যা কাণ্ড তা তো নিজে চোক্ষে দেখেছে সে, ভুল খবর দিলে যে তোমার ধাত ছেড়ে যাবে তা জানে না? মতিবাবুও দেখেছে—ছোটকা দেখিয়েছে তাকে। ওরা আপিসে কাজ করে—কত সায়েবের কাজ ওদের হাতে, ওদের ভুল করলে চলে না—জানো! তাহলে য়্যাদ্দিন চাকরি করে খেতে হ'ত না।'

এবার অরুণের মুখ পরিষ্কার হয়। মুখে হাসি ফোটে তার! হঠাৎ কি মনে করে—সম্ভবত ধারে-কাছে জনপ্রাণী ছিল না বলেই ভরসা হয় কতকটা—স্বর্ণলতার একটা হাত ধরে বলে, 'তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে—না বুঁচি?'

BanglaBook.org

'তা বাপু হচ্ছে একটু মিছে কথা বলব না।... তা এ কথাটা জিগ্যেস করলে কেন হঠাৎ? তুমি এগজামিন দিয়ে পাস করেছ, আমার আনন্দ হবে কেন?'

ওর মুঠির মধ্যে থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না, শুধু একটু বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে চায় ওর মুখের দিকে।

কিন্তু অরুণের ভরসার পুঁজি ততক্ষণে ফুরিয়ে এসেছে। সে অপ্রতিভভাবে নিজেই হাতটা ছেড়ে দেয়, অন্যদিকে চেয়ে বলে, 'না—তুমিই তো এর মূলে,—তুমি চাড় না করলে আমার পড়াই হত না হয়ত। তোমার দয়াতেই আমার পাস করা হ'ল—সে কথা আমি ভুলব না কোনদিন।'

স্বর্ণলতা তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ধমক দিয়ে ওঠে, 'তুমি আর ঐ সব নেকচার ঝাড়তে বসো নি বাপু!.... ঐ সব দয়া-ধম্ম হ্যানো ত্যানো—কথাগুলো শুনলে আমার রাগ ধরে যায়। চলো দিকি, এখন বাড়িতে চলো। মুখ-চোখের কী ছিরিই হয়েছে। আহা!.... দয়া করে এখন গিয়ে মুখে একটু কিছু দেবে চলো, ব্যাগত্তা করি। আমার এখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ নেকচার শোনবার সময় নেই—এখুনি খাড়া-খাড়া হরিন্নুট পাঠাতে হবে ঠাকুরঘরে—মানসিক রয়েছে!'

'কে মানসিক করেছিল—তুমি? আমার পাসের জন্যে?' যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় অরুণ। তার গলার কাছে কী যেন একটা ঠেলে উঠছে, কথা বেরোতে চাইছে না ঠিকমতো।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ! নইলে আর কার মানসিকের জন্যে মাথাব্যথা পড়ে যাবে শুনি! বলি কাউকে তো করতে হয় একটা। পাসটা কি অমনি হয় নাকি? দেবতা-ঠাকুরকে না জানালে চলে? মেজকাকীও হয়ত করতে পারে—তা জানি না। মা-মাসীরই তো করবার কথা। তবে আমি বাবার কাছ থেকে চেয়ে নে স' পাঁচ আনা পয়সা আলাদা করিয়ে রেখেছি। সুভালাভালি ভাল খবর এলে সেই দণ্ডে হরিন্নুট দেব —এই মানসিক!.... নাও নাও—চলো, আবার দাঁড়ালে কেন!'

'যাচ্ছি। চলো।' অস্পষ্ট ধরা গলায় উত্তর দেয় অরুণ। তার চোখ দুটো কে জানে কেন, ঝাপসা হয়ে গেছে! একটু মুছে নিতে পারলে হত। কিন্তু পাছে মুছতে গেলে জল বেরিয়ে যায়—জলের চিহ্ন ধরা পড়ে, সেইজন্যে সাহস হচ্ছে না তার।

কয়েক পা গিয়ে স্বর্ণলতাই দাঁড়িয়ে পড়ে।

তা এবার তা'হলে তুমি কি করবে?'

তেমনি ধরা-গলায়ই অরুণ উত্তর দেয়, 'দেখি মেসোমশাই কি বলেন। একটা চাকরি-বাকরিরই চেষ্টা দেখতে হয়।'

'কেন—আর পড়বে না? বি-এ পাস করার অত শখ তোমার—!'

'কত দিন আর পরের ঘাড়ে চেপে এমন বসে বসে খাব বলো? কলেজে পড়ার যে অনেক খরচা?'

'জলপানি পাবে না? ছোট-কা বলেছিল সেদিন, ও জলপানি পেতে পারে।'

'কী জানি, আমার কি আর অত ভাগ্য হবে?'

তারপর একটু থেমে বলে, 'স্কলারশিপ পেলেও, হয়ত একটা দশ টাকার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাব। তাতে তো কলেজের খরচাই চলে যাবে। যদি ফ্রি হতে পারি তাহলেও না হয় কথা। তাতেও—ভর্তির টাকা তো আর ফ্রি হয় না, সেও একগাদা টাকা লাগবে। আর এদের ঘাড়ে এমনভাবে বসে খাওয়া কি ঠিক?'

BanglaBook.org

'দ্যাখো, এ তো নারদের গুষ্টি দেখতেই পাচ্ছ—রান্নাঘরে রাবণের চিতে জ্বলছেই —তা যেখানে এতগুনো লোক বসে খাচ্ছে সেখানে আর একটা লোককে খাওয়াতে কি আমার বাপ-কাকারা দেউলে হয়ে যাবে?... আমার ভাইগুনিকেও তো দেখছ —না পড়াশুনো না রোজগার, কোন চেষ্টাই নেই, হল্লো হল্লো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু। তারাও তো খাচ্ছে চারবেলা! তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? তুমি এ সংসারে দুটো ভাত খেলে তবু তো বুঝব ভাল কাজে গেল।.. তোমার দিন তুমি কিনে নাও। জলপানি পাও তো উত্তম কথা, না হলেও তুমি মেজ-কাকে কিছু জিগ্যেস করতে যেও নি। মেজকাকে আগে বললেই বলবে চাকরিতে ঢুকে পড়ো, আর একবার বলে ফেললে মুশকিল।... কথা যা পাড়বার আমিই পাড়ব। এখন কলেজে ভর্তির কত টাকা লাগে চুপি চুপি আমাকে বলো—'

আবার চলতে শুরু করল ওরা। চলতে চলতেই অরুণ বলল, 'দেখি—।'

'না না, দেখি-টেখি নয়। ও ঠিক করেই ফ্যালো। তুমি কালই খোঁজ ক'রে আমাকে বলবে। তোমার ভত্তির টাকা—বই-খাতা—কী কী লাগবে সব বলে দিও। মেজ-কাকে বলে আমি সব আদায় করে দিয়ে যাব যাবার আগে। আমার তো আবার শিয়রে সংক্রান্তি—গোনা-গাঁথা দিন আর থাকা এখানে!'

'তার—তার মানে? তুমি কোথাও যাবে নাকি?' কথাগুলো উচ্চারণ করতে অরুণের যেন রীতিমতো কষ্ট হয়। উত্তরটা যেন সে আগেই আশঙ্কা করে, 'কোথায় যাবে—কত দিনের জন্যে?'

'কতদিন কি গো? তুমি কিচ্ছু জান না? একেবারেই তো যাচ্ছি। কোথায় আর যাব বলো, মেয়েরা কোথায় যায় বড় হলে? আমায় যে এরা বিদেয় করে দিচ্ছে এ বাড়ি থেকে।'

এতক্ষণে জিনিসটা কি মনে পড়ে তার লজ্জা হয় একটু, সে মাথা নামায়।

'তোমার—তোমার বিয়ে হচ্ছে? আশ্চর্য। আমি কিছু শুনি নি তো!'

'শুনবে কি ক'রে বল, তুমি কি আর মনিষ্যির সংসারে বাস করো? তুমি তো শ্যালের মতো গত্তে ঢুকে বসে থাক চৌপর দিন!... ও কি, আবার দাঁড়ালে কেন, চলো চলো—'

এবার স্বর্ণই অসহিষ্ণু হয়ে ওর একটা হাত ধরে টানে।

আবার চলতে শুরু করে অরুণ—কিন্তু মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোথাও কোন জিনিস সম্বন্ধে তার আগ্রহ নেই। পাস হল কিনা এখন যেন তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। এই বাড়িতে, এই পৃথিবীতে একমাত্র যে অবলম্বন ছিল,—সে চলে যাচ্ছে, অবলম্বন বলতে আশ্রয় বলতে আর কিছু রইল না, পায়ের নিচের মাটিটাই যেন সরে যাচ্ছে তার।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধু জিগ্যেস করে, 'সে—সে কবে হবে?'

'কী হবে, বে?...এই তো সামনের মাসের আটুই। এদের এত তাড়াতাড়ি করবার ইচ্ছে ছিল না। তারাই জোর করছে। মুয়ে আগুন! তাদের যেন ঘর চলছে না একেবারে। এ তারিখের পরই বুঝি কি অকাল পড়ছে, তার আগে সারতে চায় তারা।'

আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ অরুণের মুখের দিকে চোখ পড়ে যেন চমকে উঠল সে।

হয়ত কারণটাও আনুমান করল সে—সঙ্গে সঙ্গেই।

'ও মা, কী হল গো তোমার? তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন আমার বের কথা শুনে? তুমি কি ভাবতে আমি চিরকাল এখানে থেকে তোমাকে আগলে আগলে রাখব? কোন কালে আমার বে-থা, ঘর-কন্না হবে না?'

তারপর গলা নামিয়ে—ছেলেমানুষকে যেমনভাবে সান্ত্বনা দেয়—তেমিনভাবে বলে, 'ওগো বাবু, এখন থেকেই তোমাকে অত ভাবতে হবে না তা বলে! যাব বলে কি আমি সেই দিন থেকেই একেবারে চলে যাব? আটদিন বাদে ফিরে এসে তো এখন তিন-চার মাস

BanglaBook.org

থাকবই, সে বাবা যাচ্যেই নিয়েছে তাদের সঙ্গে—তারপরও আসব যাব। এই কাছেই তো—শিবপুরে বে হচ্ছে। তবে তুমি এবার থেকে একটু সেয়ানা-শঠ্‌ঠ হও বাপু। চিরদিনই কি এমনি গো-বেচারা ভাল-মানুষ থাকবে?'

বাড়ির মধ্যে থেকে প্রমীলা হাঁক পাড়ে, 'কৈ লো বুঁচি, পেলি সে ছোঁড়াকে?'

'পেয়েছি মেজকাকী—যাচ্ছি। ... চলো চলো, ওরা ভাবছে।'

সে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে যায় অরুণকে।

॥ ২ ॥

স্বর্ণলতার বিয়ের চেষ্টা চলছে অনেকদিন ধরে। অরুণই শুধু খবর রাখত না, নইলে সবাই জানে। ইদানীং বড় দুই কর্তা ছুটির দিনেও অফিসের মতো সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন পাত্রের খোঁজে, চেনা-জানা যত ব্রাহ্মণ পরিবার আছে সকলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। বলতেন, সামনে গিয়ে না পড়লে গরজ হবে না। খিদিরপুর, বেহালা, কালীঘাট, ঢাকুরে মায় বারুইপুর, মল্লিকপুর—এদিকে এই, ওদিকে শ্রীরামপুর, গোঁদলপাড়া, বরানগর, নৈহাটী—সব চষে ফেলেছেন। একটি মেয়ে তাঁদের, ভাল পাত্রে দেবেন, তাতে কিছু খরচ হয় হোক্—এই জন্যেই এত খোঁজাখুঁজি। আবার তাঁদের পছন্দমতো পাত্রপক্ষ মেয়ে পছন্দ করে না। কটা চোখ, মানানসই যা তার চেয়েও বেঁটে—এই সব আপত্তি হয় তাদের।

অনেক কাণ্ডর পর এই পাত্র ঠিক হয়েছে। পাত্র খুব সুন্দর দেখতে, শিবপুরে নিজেদের বাড়ি, দুটো পাস, কোন্ বিলিতী ফার্মে চাকরি করে। এর চেয়ে ভাল পাত্র গৃহস্থ সংসারে আশা করা যায় না। খরচ কিছু বেশিই পড়বে, সব রকম গহনা, খাট-বিছানা, আলমারী ছাড়াও তিন হাজার টাকা নগদ দিতে হবে। এটা কিছুতেই কমাতে চাইলেন না হরেনের মা। মেজকর্তা দাদাকে বললেন, 'আমি শুনেছি ওর মার কিছু দেনা আছে, সেই জন্যেই জোর করছে টাকাটার জন্যে। মানুষটা একটু মেয়ে-কাপ্তেন গোছের আর কি!.... নগদ টাকাটা পাবার আশাতেই এক কথায় ওরা পছন্দও করেছে, নইলে অমন সুন্দর ছেলে, আমাদের মেয়ে ওর পাশে মানায় না, সে তো আমরাই বুঝছি। ওটার জন্যে এ পাত্র হাতছাড়া করো না।'

'টাকার কথা তুমি জান' অভয়পদ চিন্তিত মুখে উত্তর দিলে, 'কিন্তু শাশুড়ীর যে রকম হাত—এর পরে? আবারও যদি দেনা করে? এখানে দেবে মেয়ে?'

'এর পর দেনা করে সে বুঝবে! আমি খুব ভাল করে খোঁজ নিয়েছি—বাড়ি ছিল হরেনের বাবার নামে—চার ভাই ওরা, ছোট এখনও নাবালক, বাড়ি তো আর বাঁধা দিতে পারবে না। তাছাড়া, বুঁচিই তো হবে বড় বৌ, ছেলে-পুলে হলে ও-ই বাড়ির গিন্নী হবে—তখন আর শাশুড়ীর কী জোরই বা থাকবে। ছেলে ভাল চাকরি করে—আপনার গণ্ডা আপনি বুঝে নিতে পারলেই হল!'

'দ্যাখো যা ভাল বোঝ।' অভয় নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ভাইয়ের ওপর ছেড়ে দেয় সব।

সেইখানেই বিয়ে ঠিক হয়েছে, সামনের আটই বিয়ে।

ঘটা করেই বিয়ে দেবে কর্তারা। এ গ্রামের সব বাড়ি থেকেই একটি করে বলা হবে, পাড়ায় বাড়িসুদ্ধ সবাই। এ ছাড়া আত্মীয়-কুটুম্ব তো আছেই। পৈতে-টৈতে যা এর আগে হয়ে গেছে, এই বলতে গেলে প্রথম কাজ—সকলকে আনা চাই-ই, ক্ষীরোদা বার বার করে বলে দিয়েছেন। তিনি এখন আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। কিন্তু চোখ কান, দুই-ই ভাল আছে। বসে বসে তিনিই সব ফর্দ করলেন—কোথায় কোথায় বলতে হবে। সবসুদ্ধ পাঁচশ' লোক দাঁড়াল।

BanglaBook.org

মহাশ্বেতা এরই মধ্যে একদিন স্বামীকে ধরে বললে, 'হ্যাঁ গা, তা তোমরা অত বোকা কেন?'

স্ত্রীর মুখে অপরের সম্বন্ধে বুদ্ধিহীনতার অভিযোগ এতই অভিনব যে, এই প্রথম না হলেও, অভয় বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর স্বামীর এই বিস্ময় তার নিজের বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি ভেবে মহাশ্বেতা যৎপরোনাস্তি পুলকিত হয়ে ওঠে।

'বলি সেই যেকালে এতটি খরচ হচ্ছে—ও পাঁচশ' লোক ধরছ, শেষ পজ্জন্ত ছশ, সাতশ'য় দাঁড়াবে—তখন এক কাজে দুই কাজ সেরে নিলে না কেন?'

'তার মানে?'

তবুও বুঝতে পারে না অভয়পদ।

'একেবারে এই সঙ্গে আমাদের বুড়োর বিয়েটা দিয়ে কাজ চুকিয়ে দিলে না কেন?'

'বুড়োর বিয়ে? বুড়োর বিয়ে দোব?' অভয়পদ প্রায় বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ গো। ছেলের বিয়ে দিতে হবে না?'

'তা সে এরই মধ্যে কি?'

'ওমা, তা ওর কি বিয়ের বয়স হয় নি? তুমি তো পেরায় ঐ বয়সেই বিয়ে করেছিলে!'

'আমি রোজগার করতুম, তাছাড়া তখন সংসারে করবার কেউ ছিল না।'

'হাঁ তাই সাত বছরের মেয়ে এনেছিলে! আর আমিই কি আর বুড়ো ধাড়ী মেয়ে আনতে বলছি, ছোটখাটো দেখেই একটি আনতে চাই আমি। আমার এক মেয়ে যাচ্ছে আর এক মেয়ে আসবে। এই তো সোজা কথা।'

'তা তোমার ছেলে বিয়ে করবে—বৌকে খাওয়াবে কি? না লেখাপড়া শিখল, না কোন কাজকম্ম। কিছু তো একটা করে খেতে হবে।'

'নাও! তোমার ছেলের বৌকে তুমি দু-মুঠো ভাত দিতে পারবে না বুঝি? এ বাড়িতে যে ভাত রোজ গরুর ডাবায় যায় সে ভাতে একটা ছোট-খাট সংসার প্রিতিপালন হয়। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি মেয়ে দ্যাখো!'

'আমরা না হয় এখন খেতে দিলুম। এর পর? সংসার বাড়বে না ওর?'

'সে যখন বাড়বে তখন নিজেরই জ্ঞানচৈতন্যি হবে। মাথার ওপর চাপ পড়লেই বাপও বলবে।.... লেখাপড়া তো আমার কোন ছেলেই শেখে নি—তাই বলে ওদের বিয়ে হবে না? বেটার বিয়ে আবার লেখাপড়ার জন্যে আটকায়?'

যেন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বিজয়গর্বে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় মহাশ্বেতা।

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না, আপাতত প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে অভয়পদ বলে, 'আচ্ছা সে হবে এখন!

স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় করুণা হয় মহাশ্বেতার, 'ওমা, অবাক করেছে! সে হবে কি গো! এই তো আটুই বুচির বে, দিলে তো ছ তারিখেই বুড়োরটা দিতে হয়—তবে তো বে-বৌভাত এক যজ্জিতে হবে!'

'তা সে তো আর মাঝে দশটি দিন বাকি—মেয়ে কোথায়? মেয়ে কিছু ঠিক করেছ?'

'আমি ঠিক করব কি? আমি কি ঠিক করবার কত্তা? এ বাড়িতে আমার ঠিকে কিছু হয়? যাঁরা করবার কত্তা সেই আসল কত্তাগিন্নীকে বলো!'

'তাঁদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই আট-দশ দিন সময় আছে হাতে,—এখন কোথায় মেয়ে কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াক!'

'কী তুমি বলো—আমার ছেলের বে দেব শুনলে পঞ্চাশ গণ্ডা মেয়ে এসে পায়ে গড়াবে—'

BanglaBook.org

'তা আগে গড়াক, মেয়ে ঠিক করো—তারপর দেখা যাবে। আর ছেলের বিয়ে দিয়ে যদি চিরকাল তার সংসার টানতে পারি তো বৌ-ভাতে দু'-একশ' লোকও খাওয়াতে পারব। তার জন্যে তোমায় এত মাথা ঘামাতে হবে না।'

ঐখানেই ও প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে যায় অভয়পদ।

মহাশ্বেতা গজ-গজ করতে থাকে আপনমনেই, 'দেবে না তাই বলো! মহারানীদের মত নেই তাই বলো। নইলে মেয়ের আবার ভাবনা! দশ দিন কেন, তিন দিনে মেয়ে ঠিক হয়। খবরটা একবার চাউর হলে হয়—বলে কত মেয়ের বাপ হাত ধুয়ে বসে আছে এ বাড়িতে মেয়ে দেবে বলে—।'

অরুণকে সবাই মুখ-চোরা, লাজুক, ঘরকুনো বলেই জানত—কিন্তু স্বর্ণলতার বিয়েতে যেন নবকলেবর ধারণ করল সে। এ যেন সে অরুণই নয়। হঠাৎ যেন তার উৎসাহই শুধু নয়—সপ্রতিভতাও বেড়ে গেল। সে-ই খাটল সবচেয়ে বেশি, দৌড়ঝাঁপ ছুটেছুটিতেও সে কারুর চেয়ে কম গেল না। ওর কর্মক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

অরুণের এই সক্রিয় সহযোগিতায় কর্তাদেরই উপকার হল সবচেয়ে বেশি। আর কোন ছেলেই মানুষের মতো নয়, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মতো তো নয়ই। সবচেয়ে যেটা বিপদের কথা—পয়সাকড়ির ব্যাপার তাদের দিয়ে আদৌ বিশ্বাস নেই। ওদের যা বয়স তাতে হাত-খরচা দরকার হবার কথা, অথচ এ বাড়িতে সে কথা কেউ চিন্তাও করে না। এই বিবাহে তাদের অনেকখানি আশা-ভরসা ছিল। যে ভাগাড়ে মড়া পড়ে কদাচিৎ, সেই ভাগাড়ের শকুনিদের মতোই ক্ষুধার্ত অবস্থা তাদের। সে সম্বন্ধে কর্তারাও সচেতন, তাই হাতে করে পয়সা খরচ করার, যা কাজ তার বেশির ভাগই এসে পড়ল অরুণের ঘাড়ে। এতে করে ছেলের দল আর একদফা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল তার ওপর। কিন্তু কর্তারা উপকৃত হলেন।

অরুণের সেই অমানুষিক পরিশ্রম সকলেরই চোখে পড়ল। বলাবলিও করতে লাগল সকলে, 'দ্যাখো, কার ভেতর কি গুণ থাকে কেউ বলতে পারে না! করছে তো বাপু, সময়ে খাওয়া নেই ঘুম নেই—ভূতের মতো খাটছে উদয়-অস্ত চৌপরদিন!'

স্বর্ণলতার বিয়ে—সে সম্বন্ধে তার নিজের উদাসীন থাকারই কথা, তার ছোট কাকী তাকে সে কথা বলেও দিয়েছে, 'খবরদার, তুই কোন কথায় কথা কইতে যাস নি যেন—তাহ'লে ভারি নিন্দে হবে। বলবে মেয়ে বড় বেহায়া, পাঁচটা কুটুম-সাক্ষেৎ আসছে তো.... তোমার তো আবার সব তাতেই ফোড়ন দেওয়া স্বভাব, তাই আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি!'

তা এ কদিন মুখে 'গো' দিয়ে ছিলও সে। কিন্তু একটা মানুষ মুখে রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে তার দিকে কেউ তাকাবার লোক নেই—দেখেই বা সে চুপ করে থাকে কী করে? সে ওকে আড়ালে ডেকে বলে, 'বলি, ও কী আদিখ্যেতা হচ্ছে একটা ভারী অসুখ না বাধালে বুঝি চলছে না? এ সব আমাকে জব্দ করার মতলব আঁটা—নয়?'

আগের মতো কাঁচু-মাচু মুখে ঘাড় হেট করল না অরুণ, বেশ সপ্রতিভ হাসিমুখেই বলল, 'কেন—কী করলুম?'

'কী করলুম! সময়ে না হোক, দিনান্তে দুটো ভাতও তো মুখে তুলতে হয়! খাওয়া-দাওয়া যে ছেড়েই দিলে একেবারে... আর তার ওপর এই ভূতের খাটুনি। দুটো খেয়ে অন্তত আমায় কেতাত্ত করো!'

'খাওয়া তো আছেই—রইলও; তোমার বিয়ে তো আর হবে না, এই একবার!'

'আমার বে-তে তোমার কি হাত বেরোচ্ছে শুনি যে, তোমায় ওপোস করতে হবে? আর দুটো ভাতে বসলেই বা কত দুপোর সময় নষ্ট হয়? না না, ও-সব চালাকি ছাড় বলছি,

BanglaBook.org

নইলে আমাকেই সেই ধরে নে গে রান্নাঘরে জোর করে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। তা সে লোকে আমাকে বেহায়া বলুক আর যাই বলুক!'

'ও, বেহায়া বলবার ভয়ে এই কটা দিন চুপ করে আছ বুঝি?'

'আছিই তো, নইলে দেখিয়ে দিতুম মজা। আদিখ্যেতা করে না খেয়ে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করে দিতুম একেবারে। তা কথা তো কেবল এইড়ে যাচ্ছ—খাবে না কি?'

'খাব খাব।.... কিন্তু বুঁচি, তুমি যখন থাকবে না—তখন কে আমার খাওয়ার খবরদারি করবে?'

'সে তো আমি দেখতে আসব না—কী করছ! আর সেদিন তো আমাকে কথা দিয়েছ—ঠিক ঠিক খাওয়া-দাওয়া করবে, শরীরের দিকে নজর রাখবে!'

'কথা দিয়েছি নাকি?'

'বা-রে ছেলে! এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছ! তাহলে তুমি যা করবে এর পরে—তা বুঝতেই পারছি! কিন্তু আমি আসব মধ্যে মধ্যে সেটি মনে রেখো—এসে যদি দেখি অমনি শুক্‌নো চেহারা, তাহলে কিন্তু পুঁথি-পত্তর সব টান মেরে পুকুরের জলে ফেলে দেব!'

'দিও দিও, তাই দিও। সে রকম চেহারা দেখলে তো দেবে।' হাসতে থাকে সে।....

অরুণ জলপানি পেয়েছে পনেরো টাকা করে। সে খবরটা পাওয়া গেছে কদিন আগেই। স্বর্ণলতাকে আর কিছু বলতে হয় নি, অম্বিকাপদ নিজেই ডেকে বলেছে অরুণকে, 'কোন্ কলেজে পড়বে এবার—কিছু ঠিক করলে?.... বিয়েটা চুকে যাক্ আর দেরি করে দরকার নেই, কোন্ কলেজে পড়বে, আই-এ না আই-এস-সি ঠিক করে ভর্তি হয়ে যাও, টাকা-পয়সা কি লাগবে জানিও, আমি দিয়ে দোব। আমি কাজে থাকি—তোমার মাসীর কাছ থেকে চেয়ে নিও, কোন লজ্জা করো না।'

পুঁথি-পত্রের কথাতেই বোধহয় কথাটা মনে পড়ে যায় স্বর্ণর, হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার জলপানির টাকা থেকে আমাকে কি দেবে অরুণদা?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অরুণ, সে কোন উত্তর দেয় না। স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে শুধু।

'কৈ বললে না?' অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঝঙ্কার দিয়েই ওঠে স্বর্ণ 'বাব্‌বা, এরই মধ্যে পয়সায় এত টান! খরচার কথা উঠতেই মুখে কুলুপ পড়ে গেল!'

'তোমাকে?' অরুণের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গে, 'তোমাকে তো পুরো টাকাটাই দিতে পারি। কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে আর আমি কোথায় থাকব— ।'

'ওমা, এই তো এ-পাড়া ও-পাড়া বলতে গেলে। কত নশ পঞ্চাশ কোশ দূরে যাচ্ছি গা?.... তা কি দেবে সেইটেই বলো না বাপু!'

'আর যদি জলপানি না পাই?' কেমন একটা বিচিত্রদৃষ্টিতে চায় অরুণ।

'সে আবার কি কথা! সরকারি কাগজে নাম উঠে গেল, মেজ-কা ছোট-কা—দু-দুজনে স্বচক্ষে দেখেছে—পাবে না কেন? —তোমার যত সব উদ্‌ঘুটি কথা বাপু!.... চলো চলো—তুমি যা জিনিস দেবে তা খুব বুঝেছি, সেই থেকে হেজ্জাহিজ্জি, মুখের কথা একটা তাই বেরোল না—তা পয়সা বেরোবে! এখন দয়া করে দুটো খাবে চলো দিকি!'

'তুমি বেড়ে দেবে ভাত?.... বেহায়া বলবে না লোকে?'

'ওমা ভাত-বেড়ে দিলে বেহায়া বলবে কেন? কথা কইতেই দোষ। যার বে তার সেই বে-র কথায় থাকতে নেই—বুঝলে?'

বিয়ের রাত্রেও একা যেন দশ হাতে কাজ করল অরুণ। কোন মানুষ যে এত খাটতে পারে, বিশেষ তার মতো ঘরকুনো গ্রন্থকীট মানুষ—তা কেউ ধারণাই করতে পারে নি এর

BanglaBook.org

আগে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করত না কেউ। শুধু বিয়ের সময় যখন পিঁড়ি ঘোরাতে বলেছিল—সে রাজি হয় নি। বলেছিল, 'আমার যে এদিকে অনেক কাজ, তোমরা আর কাউকে দ্যাখো বরং—'। অবশ্য তারপরই কে কথা তুলিছিল, 'যাদের বে হয়েছে—গুষ্টির জামাইরাই পিঁড়ি ধরবে। এতগুলো জামাই থাকতে আইবুড়োরা ধরবে কিসের জন্যে! তবে দেখো বাপু, যাদের বৌ মরেছে তারা যেন ধরো নি।'

সন্ধ্যের আগে থেকে, কনে-সাজানোর শুরু থেকেই—আর তার দেখা পায় নি স্বর্ণ। উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়েছে বারবার, বারবারই প্রত্যাশা করেছে তাকে। বিশেষত সাজানোর সময় অনেকেই এসে দেখে গেল, ভাইয়েরা সবাই এল—অরুণদা আসতে পারল না। 'কেমন দেখাচ্ছে' অনুচ্চারিত এই প্রশ্ন সব মেয়ের মনেই থাকে এ সময়টা, এবং সকলের মুখ থেকেই শুনতে চায় সে। অরুণ আসবে এবং প্রশংসা করবে—এটা খুবই আশা ছিল স্বর্ণর কিন্তু সে যেন এ দিক দিয়েই হাঁটল না।

শেষে আর থাকতে না পেরে ছোটভাই গুপোকে ডেকে একসময় প্রশ্ন করল সে, 'হ্যাঁ রে, অরুণদাকে একবারও দেখতে পাচ্ছি না কেন রে? কোথায় কী করছে সে?'

'ও বাবা, তার কি কাজের অন্ত আছে আজ—সে-ই তো ম্যানেজার গো। মেজকাকা তাকেই সব বুঝ্যে দিয়েছে যে!'

'তবেই তো মাথা কিনেছে! এই শোন্ না, তোকে কাল যাবার সময় একটা পয়সা দোব, একবার ছুট্টে গে ডেকে আনবি অরুণদাকে?'

একটা গোটা পয়সার লোভেও গুপো উৎসাহিত হয়ে উঠল না তেমন। সন্দিগ্ধ সুরে বলল, আসবে কি—দেখি! তার আজ পাত্তা পাওয়াই দায়!'

সে গেল কিন্তু আর ফিরল না। বর আসাতে যখন তাকে বরের চাদরের ওপর বসিয়ে রেখে যে যার মত চলে গেল তখন একা একা বসে ভাবতে লাগল—দুপুর-বেলা ছোট কাকী ওকে ডেকে খাইয়েছিল কি না। পই-পই করে তো বলে দিয়েছিল। ও যা ছেলে, ওকে জোর করে না খাওয়ালে খাবেই না কখনও, তা সে তুমি কেন তিন-দিন শুকিয়ে রাখো না! তবু ভাগ্যিস দুপুরবেলা দুধ-সন্দেশ খাবার সময় জোর করে সে একটা সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছিল। তাই কি খেতে চায়, কত বকা-ধমকা ক'রে খাইয়েছে সে।... হয়ত ঐ পর্যন্তই। আর কিছুই পেটে পড়ে নি।... বাবুরা সব ফোড়ন কাটতেই আছেন—একটু নজর রাখতে পারেন না কেউ। তাই সেই সন্দেশ খাওয়ানোর সময় ছোটকাকার কী কথা—বলে, 'হ্যাঁরে, তা ওর গার্জেনতো পরের বাড়ি চলল, এখন ওকে কে দেখবে?.... তুই বরং এক কাজ কর—ওকে তোর তোরঙ্গের মধ্যে করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যা!'

শোন কথা একবার। সে নিয়ে যাবার হলে ও ঠিকই নিয়ে যেত—নিজের ভাইয়ের মতো—দোষই বা কি? কিন্তু কিছুদিন পুরনো না হলে, তাদের চিনে না নিতে পারলে কি আর সাহস করা যায়? তা সেও খুব শুনিয়ে দিয়েছে ছোট কাকাকে, কেন তোমরা একটু দেখতে পার না? দেখা তো উচিত। একটা বামুনের ছেলে উপোস করে থাকলে পাপটা মন্যিটা কার লাগবে শুনি? আমি তো পরের ঘরে চললুম, পর গোত্তর হয়ে যাব আজ থেকে!'

বিয়ের সময় কোন দিকে চাইতে পারে নি স্বর্ণ, তবে অরুণ ছিল না সেখানে। থাকলে অন্তত গলা পেত সে। রাত্রে বাসর ঘরে সবাই এসে একবার করে উঁকি মেরে মেয়েদের কাছে তাড়া খেয়ে চলে গেল—অরুণ ছাড়া। তার খবরও পেলে না, বর-মিন্সে পাশে বসে, লজ্জায় সে কথাই কইতে পারল না করুর সঙ্গে।

BanglaBook.org

একেবারে সকালে একবার খুঁজে বার করেছিল সে। কী চেহারাই হয়েছে বাবুর — অসুরের মতো খেটে আর না খেয়ে। চোখ-মুখ বসে গেছে একেবারে—দৃষ্টি রক্তবর্ণ, চোখের কোলে তিন বুরুল কালি।

'বা, চেহারার তো বেশ খোলতাই হয়েছে! বলি এবার এ দেহ ত্যাগ করবে বলে মতলব এঁটেছ নাকি! কী পেয়েছ কি!'

সে কথার উত্তর দেয় নি অরুণ, ম্লান হেসেছিল একটু! অবসন্ন, ক্লান্ত হাসি।

'বলি কাল থেকে তো কিছুই পেটে নেই, তা সকালে একটু চা-টাও কি খেতে নেই! হাঁড়ি হাঁড়ি চা ফুটছে তো দেখতে পাই, যেমন মেজকা চা দুচোক্ষে দেখতে পারত না—তেমনি চায়ের রেলা হয়েছে আজকাল। তা একটু চা, দুটো মিষ্টিও তো খেতে পারো?'

'খাবই এখন। খেতে তো হবেই। তোমারই বা চেহারার কী ছিরি হয়েছে। আয়নায় দেখেছ?'

'দেখেছি! রুক্ষু চুল, রাতজাগা—ও অমন হয়। কাল ছিলে কোথায়—কাল যখন সাজলুম গুজলুম তখন দেখতে পারলে না?'

সে কথার উত্তর দিল না অরুণ। বলল, 'তা তুমি কি খাবে এখন?'

'ওমা, আমি খাব কি। এখন কুশুণ্ডিঙেয় বসতে হবে না? খাওয়া আজ যার নাম ধরো গে সেই তিনটেয়—। কিন্তু তুমি এক কাজ করো দিকি, চট্ করে দুটো পান্তুয়া নিয়ে এসো দিকি!'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায় অরুণ।

'কেন বলো তো? কার জন্যে?'

'নিয়েই এসো না বাপু। আমি কি এ বাড়ির দুটো পান্তুয়াও খরচ করতে পারি না—তার জন্যে এত কৈফেৎ দিতে হবে!'

অগত্যা নিয়ে আসে অরুণ। একটা মাটির গেলাসে করে।

'নাও, খাও।' মুখের সামনে ধরে স্বর্ণ।

'পাগল নাকি? আমার এখনও মুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয় নি।'

'খাও বলছি, নইলে অনথ্থ কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করব। আমাকে চেন না!'

অগত্যা খেতে হয়। কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খায় সে—স্বর্ণর মুখের দিকে চাইতে পারে না। স্বর্ণর মনে হয় ওষুধ-গেলা পাঁচনগেলা করে খাচ্ছে—তাই এদিকে চায় না।

নরম গলায় বলে, 'মিষ্টি খেতে ভাল লাগছে না—না? দুখানা মাছ খাবে? আমিই নিয়ে আসছি নয়?'

কিন্তু অরুণ আর উত্তর দেয় না, স্বর্ণ কিছু বোঝবার কি বাধা দেবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায় সেখানে থেকে!....

সেই যা ওর সঙ্গে দেখা। আর সারা দিনে ধারে কাছেও আসে নি স্বর্ণর।

যাত্রাকালে মেয়ে-জামাই আশীর্বাদের সময় অন্তত সে এসে দাঁড়াবে আশীর্বাদ করবে—সবাই আশা করেছিল, তাও এল না। স্বর্ণর সে সময় অবশ্য কোনো জ্ঞান নেই—সে কেঁদে ভাসাচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করেছিল মহাশ্বেতাই, কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, 'অরুণটা কোথায় গেল, সে আশীব্বাদ করবে না? ওরে, তোরা কেউ দ্যাখ্ না!'

প্রমীলা বলেছিল, 'হ্যাঁ, সে যা ছেলে—এই কান্নাকাটির ভেতরে সে আসবে সে যা ভালবাসে ওকে, দ্যাখো গে যাও বাগানের কোন্ কোণে সেঁদিয়ে বসে আছে—মাটি ভাসাচ্ছে সেখানকার। এমনিই তো চোখ দুটো জবাফুলের মতো হয়ে রয়েছে সকাল থেকে—'

তবু, গাড়িতে ওঠার সময় অন্তত তাকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাবে ভেবেছিল সকলে, তাও এল না। তারপর অবশ্য অত কারও খেয়ালও ছিল না। বড়রা কান্নাকাটি করছে তখনও, কুটুম্বিনীরা এলিয়ে পড়েছে—কর্তারা বসে গিয়েছিল পরের দিন ফুলশয্যার

BanglaBook.org

তত্ত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। কী কী আছে—কী কী কিনতে হবে, ক্ষীরের ছাঁচগুলো মেয়েরা তুলতে পারবে কি না—এই নিয়েই তাদের চিন্তা।

আজ রাতটুকু পোয়ালে কালই তো তত্ত্ব গুছনো—সময়ই বা আর কই?

খেয়াল পড়ল অনেক রাত্রে, খেতে দেবার সময়ে। তরলাই সকলকে ভাত দিচ্ছিল, সে-ই বললে, 'অরুণ? অরুণ কোথায় গেল রে?'

বুড়ো মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'কে জানে বাবা তোমাদের ভালছেলের খবর আমরা রাখব কেমন করে? দ্যাখো গে যাও, হয়ত বাগানে গিয়ে বসে আছে কোথাও!'

'তা যা, কেউ খুঁজে গিয়ে নিয়ে আয় তোরা—'

'কে যায় এই এত রাত্তিরে বাগানে খুঁজতে। সে বুঁচিরই পোষায়, আমরা কোথায় খুঁজব!'

কেষ্ট বললে, 'থাক না—দুপুর রাত্তিরে যখন শ্যালে এসে ঠ্যাং ধরে টানবে তখন হুঁশ হবে বাছাধনের, বাগানে গিয়ে থাকার মজা টের পাবেন।'

'ও কি কথা রে!' মহাশ্বেতা ধমক দিয়ে ওঠে। এই কদিন তার মেয়ের বিয়েতে অরুণ যা অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তা সে চোখেই দেখেছে। তারপর তার সম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। মহাশ্বেতার তো বিশেষ করে, রাগ বা দ্বেষ সে কারুর সম্বন্ধেই বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারে না, দুটি লোক ছাড়া। সে বলে, 'দ্যাখ্ খুঁজে ভাল করে, যা গাধার খাটুনি খাটল কদিন, খাওয়া নেই ঘুম নেই —হয়ত কোথাও ঘুমিয়েই পড়েছে বাছা। ছাদটা দেখে আয় দিকি, চিলেকোঠার ঘরটা আগে দ্যাখ—'

ছাদ, চিলেকোঠার ঘর, উপর, নিচে, বাগান সব খোঁজা হল—অরুণ নেই। আলো নিয়ে হৈ হৈ করে একপাল ছেলে বেরিয়ে পড়ল বাগানে—শেষের দিকে অভয়পদ অম্বিকাপদও বেরোল—যেখানে যত সম্ভাব্যস্থান ছিল বসে থাকার মতো সব দেখা হল, অভয়পদ পাইখানা তার পিছনের বাঁশঝাড় সব দেখে এল নিজে—কোথাও কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

এবার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল! গেল কোথায় ছোকরা?

এখন অনেকেরই মনে হল যে ওর ভাবভঙ্গিটা কদিন ধরেই খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তাই বলে—এমন নিঃশব্দে কোথায় যাবে, করবেই বা কি?

কে একজন বললে, 'বুঁচির শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল না তো? খুব ভালবাসত তো বুঁচি—দ্যাখো, হয়ত কাঁদতে কাঁদতে সেইখানেই চলে গেছে!'

'দূর, পাগল নাকি—সে যা লাজুক!' কথাটা উড়িয়ে দিল প্রমীলা।

হঠাৎ মনে পড়ল অম্বিকাপদর—বিকেলের দিকে, ঠিক আশীর্বাদের আগে কী একটা কাগজে-মোড়া প্যাকেট মতো ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'এটা একটু বাক্সয় তুলে রাখবেন মেসোমশাই?'—কী জিনিস সেটা সেও বলে নি, অম্বিকাপদও জিজ্ঞাসা করে নি। তখন জিজ্ঞাসা করার সময়ও ছিল না তার। প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে নি অবশ্য। এই কদিনেই যেন সাবালক হয়ে উঠেছিল অরুণ, ওর ওপর একটা আশ্চর্য নির্ভরতা এসেছিল সকলের। অকারণে সে কিছু বলছে না বা করছে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল অম্বিকাপদ।

এখন গিয়ে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে দেখল, বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন কাজ বাবদ ওকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তারই জমা খরচ—নির্ভুল হিসাব, যেখানে যা রসিদ, ক্যাশমেমো বা ফর্দ পাওয়া গেছে—তাও আছে সেইসঙ্গে একটা পিনে গাঁথা—আর বাকি টাকা পয়সা। এগারোটি পয়সা মেলে নি, তাও লেখা আছে গরমিল বলে।

এত কাজ এত ব্যস্ততার মধ্যে এমনভাবে হিসাব দিতে গেল কেন?

এই প্রথম একটা সন্দেহ দেখা দিল সকলকার মনে।

BanglaBook.org

তবে কি আগে থাকতেই ছোকরার কোথাও সরে পড়বার মতলব ছিল মনে মনে?

কিন্তু এভাবে কোথায় যায়? কিছুই তো নিয়ে যায় নি। খোঁজ করে দেখা গেল—যা জামা কাপড় তার পরনে ছিল তাছাড়া বাড়তি জামা-কাপড়ও নেয় নি।...

সে রাত্রে আর কিছু করা সম্ভব নয়। সকলেই মানসিক একটা থমথমে অবস্থায় চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন কি ছেলের দলও কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল—তারাও নির্বাক হয়ে গেল। এ আবার কী হল, এরকম একটা-কিছুর জন্যে তো প্রস্তুত ছিল না তারা!

পরের দিনও একটু আধটু খোঁজ করা হ'ল পাড়াঘরে। কেউই দেখে নি। তাকে বিশেষ কেউ চিনত না, কারণ বাড়ির বাইরে যেত সে কদাচিৎ।

তার পরের দিন ডাকে একটা চিঠি এল অম্বিকাপদর নামে। হাওড়া স্টেশন থেকে ফেলা হয়েছে, হাওড়া আর, এম, এস্-এর ছাপ রয়েছে।

চিঠিতে লেখাঃ

"শ্রীচরণেষু, মেসোমশাই, আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভালই আছি। আপনারা আমার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার ঋণ শোধ হওয়ার নয়। যদি পারি তো মানুষ হইয়া সে ঋণ শোধের চেষ্টা করিব। বলিয়া আসিতে পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি প্রণাম লইবেন, প্রণম্য ও প্রণম্যাদের প্রণাম দিবেন।

ইতি—সেবক অরুণ।'

এ চিঠিতে কৌতূহল বেড়েই গেল, শুধু কিছুই জানা গেল না।

কেন গেল সে—এ প্রশ্ন নিরুত্তরিতই থেকে গেল। কেন এবং কোথায় গেল।

কেন? কেন? কী দুঃখে? কী ভাবল সে, কী মনে করে এমনভাবে সরে পড়ল?

সে কি কারও ওপর অভিমানে? ছেলেদের ওপর রাগ করে?

সম্ভব অসম্ভব বহু জল্পনা-কল্পনা ও বহু উত্তরেও সমস্যাটা যেমন অমীমাংসিত ছিল তেমনই রয়ে গেল।

শেষ অবধি দুর্গাপদ এক কথায় আলোচনার উপসংহার টেনে দিল, 'গ্রহ! গ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। ওর জন্মলগ্নে বোধহয় সবকটা গ্রহই বিরূপ ছিল—নইলে বাপ-মাই বা এমন বাদে-ছরাদে যাবে কেন? এখানে এমন ভাল ব্যবস্থা—মেজদা কলেজে পড়াতে চাইলে, জলপানি পেয়েছিল, হয়ত ফ্রিও পড়তে পারত কলেজে—কোথায় লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে ভাল দেখে—জীবনে উন্নতি করবে, তা নয় ভাগ্যাবন্ডের খাতায় নাম লেখাতে গেল। গ্রহ ছাড়া আর কী বলব! দ্যাখো, যদি দিনকতক বাদে ফিরে আসে, সুমতি হয় আবার!'....

স্বর্ণলতাকে ওখানে কেউ কিছু বলে নি, এখানে এসে শুনল। শ্বশুরবাড়ির হাজারো গল্প করবে বলে পেট ফুলছিল তার, কলকল করতে করতে নেমেছিল পাল্‌কি থেকে, খবরটা শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার সমস্ত আনন্দ, মনের মতো সুন্দর বর পাওয়ার সমস্ত সৌভাগ্য-বোধ যেন নিমেষে ম্লান হয়ে গেল।

অরুণদা এমন করলে! কলেজে পড়ল না। কত শখ তার বি-এ পাস করার! সেই জন্যে অমনভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, যদি জলপানি না পাই! এই মতলব ছিল তাহলে!

কিন্তু কেন এমন করলে সে? কেন? কেন?

তার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা নামল। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে।

আহা, কোথায় আছে, কী খাচ্ছে সে। কেউ কি তাকে ডেকে খাওয়াচ্ছে? যা লাজুক, হয়ত না খেয়েই মরে যাবে। সে যে কারুর কাছ থেকে চেয়ে কিছু খাবে তা তো মনে হয় না।.....

তবে একেবারে নিঃসম্বল যায় নি সে। দুতিন-দিন পরে মনে পড়ল স্বর্ণলতার। এক পয়সা এক পয়সা করে জমানো সাতটা টাকা ছিল ওর। ভায়েদের ভয়ে অনেক কষ্টে

BanglaBook.org

লুকিয়ে রাখত। বিয়ের দুদিন আগে সেই টাকা-সাতটা সে অরুণের জিম্মা করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি তো কদিন থাকব না, এরা সব উট্‌কে পাট্‌কে বার করে নেবে। এ কটা টাকা তুমি একটু ঠিকানা করে রেখে দাও অরুণদা—'

অরুণ বলেছিল, 'বেশ লোককে জিম্মে করছ! কেন, তোমার তো নতুন পোর্টম্যান্ট কেনা হয়েছে—তুমি নিয়ে যাও না।'

'না না—তুমি বোঝ না। ওরা যদি বাক্সপ্যাঁট্‌রা খুলে দেখে? শুনেছি অনেক শ্বশুরবাড়িতে বৌয়ের বাক্সে মুখদেখানি আশীব্বাদী টাকা যা থাকে বার করে নেয়। এটাও যদি সেই সঙ্গে বার করে নেয়?'

'আর আমাকে দিচ্ছ, আমি যদি মেরে দিই? খরচ করে ফেলি?'

'সে তো খুব ভাল। তুমি এক্ষুনি খরচ করো না—আমার কোন দুঃখ নেই!' বলেছিল স্বর্ণ। অবশ্য তখন স্বপ্নেও ভাবে নি অরুণ প্রাণ ধরে তার টাকা খরচ করতে পারবে!

সেই টাকা সাতটাই সঙ্গে আছে নিশ্চয়। সব পাই-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে—সেটা তো দেয় নি! হয়ত এটুকু সুমতি হয়েছে তার, হয়ত ওর টাকাতে তার জোর আছে, নিয়ে গেলেও কিছু মনে করবে না—এ বিশ্বাস হয়েছে শেষ পর্যন্ত। হে ভগবান, তাই যেন হয়, হে মা কালীঘাটের কালী, টাকা কটা যেন নিয়ে থাকে সঙ্গে, এখানে যেন না কোথাও ফেলে গিয়ে থাকে। হে বাবা তারকনাথ—তাকে দেখো।

কথাটা কিন্তু কাউকে বলে না স্বর্ণ। কী দরকার, হয়ত ভুল বুঝবে সবাই, ভায়েরা রটাবে বুঁচির টাকা ভেঙ্গে পালিয়েছে।

স্বর্ণ তো জানে—সে তেমন ছেলেই নয়।

যদি এমন হবে জানত তো তার আশীর্বাদী টাকা থেকেও আর কটা টাকা দিয়ে যেত ওকে!

॥ ৩ ॥

অভয়পদ ভেবেছিল স্বর্ণলতার বিয়ের গোলমালে বুড়োর বিয়ের হুজুগটা মহাশ্বেতা ভুলে যাবে। ভুলে গিয়েও ছিল অনেকটা—বেশ কটা মাস চুপচাপ ছিল—হঠাৎ পাড়াতে কোন্ ছেলের বিয়ে হচ্ছে শুনে আবার মনে পড়ে গেল তার।

তখনই খুঁজে খুঁজে গিয়ে স্বামীকে ধরলে, 'বলি কৈ গো, আমার বুড়োর বে দেবার কী করলে?'

সেদিন রবিবার, বাইরের রকে বসে কী একটা হিসেব দেখছিল অভয়পদ, অন্যমনস্কভাবে মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, 'মেয়ে ঠিক হয়েছে?'

'পোড়া কপাল আমার। মেয়ে তোমাদের না জানিয়ে না দেখিয়ে আমরা ঠিক করে ফেলব!'

'তা কৈ সে মেয়ে?' সেই রকম অন্যমনস্কভাবেই আবার বলে সে।

'মেয়ে কৈ তা আমরা কী জানি, মেয়ে কি আমি খুঁজব?... বাঃ, বেশ কথা তোমাদের! আমরা মেয়েছেলে মেয়ে দেখে বেড়াব পাড়ায় পাড়ায়—না?'

'তাহলে দুদিন সবুর করো। এই তো এখনও মেয়ের বিয়ের ধাক্কাই কাটে নি, তত্ত্ব-তাবাসে জেরবার হয়ে যাচ্ছি—এরই মধ্যে ছেলের বিয়ে দেব কি করে? আর এত তাড়াই বা কি—ছেলে তো আর অরক্ষণা হয়ে যাচ্ছে না।'

'ও মা, তা ছেলের বে'তে কি ঘর থেকে খরচ করব নাকি? সে তো ঘরে আনবে উল্‌টে!'

হ্যাঁ, তা আর নয়! কত গুণের ছেলে তোমার, তাই আবার একগাদা টাকা-পয়সা ঢেলে বিয়ে দেবে লোকে!'

'ছেলে যেমনই হোক, বংশটা কেমন? তোমাদের একটা নাম নেই? সবাই জানে তোমরা বড়লোক, তোমাদের অবস্থা ভাল। দেখো, এ বাড়িতে মেয়ে দিতে পারবে জানলে হন্যে হয়ে ছুটে আসবে সব—'

BanglaBook.org

'দেখি।' বলে আবার হিসেবে মন দেয় অভয়পদ....

এবার কিন্তু আর কথাটা জুড়োতে দেয় না মহাশ্বেতা। দুদিন একদিন অন্তরই তাগাদা করে। যতই প্রতিজ্ঞা করুক 'মহারাজ-মহারানীকে কোন দিন কোন কাজে সুপারিশ করবে না—সে নিচু হতে যাবে ওদের কাছে কিসের জন্যে গা, সে কি এ বাড়ির বড়বৌ নয়?'—সে প্রতিজ্ঞাও শেষ অবধি রাখতে পারে না। মেজবৌকে গিয়ে বলে, 'কতদিন খেটে খেটে মরবি লো এমন করে—একটা বৌ আন!'

'বৌ—?' এক মুহূর্ত সময় লাগে প্রমীলার কথাটা বুঝতে, ও, বুড়োর বে'র কথা বলছ? সে তো ভাল কথা। লাগাও দিদি। সত্যি বুঁচিটা চলে গিয়ে যেন বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে, অমনি একটি ছোটোখাটো মেয়ে ঘুরে বেড়াবে, তবে না!'

এবার শুরু হয়ে যায় ডবল তাগাদা। প্রমীলারও যেন উৎসাহের অন্ত নেই।

অগত্যা মেয়ে খুঁজতে বেরোন ছাড়া উপায় থাকে না কর্তাদের।

অবশ্য ওদের খুব চেষ্টা করতে হয়ও না। মহাশ্বেতাই ঠিক বলেছিল, কথাটা প্রচার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক-হাঁটাহাঁটি শুরু হয়ে গেল। সকাল বিকেল বাড়িতে বসতে পারে না কর্তারা। অনেক সময় কুটুমের সূত্র ধরে লোক আসে, তাদের জলখাবার দিতে হয়, খরচাও হয়ে যায় বিস্তর।

মহাশ্বেতা বিজয়গর্বে বলে 'কী গো, মেয়ে দেবে কে এই ভেবে তো অস্থির হচ্ছিলে! এ তো সদরের জমি চষে ফেলছে দেখি মেয়ের বাপরা। বলি সংসারটা আমি বেশি চিনি না তুমি বেশি চেনো—এবার টের পাচ্ছ কিছু?'

মেয়ে দেখলও এরা খুব।

মেয়ে পছন্দ হয় তো ঘর পছন্দ হয় না—আবার এদের পছন্দ তো তারা পিছিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। এদের পয়সার কথা শুনে ছুটে আসে—কিন্তু ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বেশভূষা দেখে ভয় পেয়ে যায়। পয়সাটার নাম আছে কিন্তু ঠিক যে কত তা কেউই জানে না। কেউ কাউকে সিন্দুক খুলে দেখায় না—জিগ্যেসও করা যায় না সোজাসুজি। আর জিগ্যেস করলেই বা সত্যি কথা বলবে তার ঠিক কি? খুব পয়সা থাকলে কি কেউ এভাবে থাকে?

এদের যতই পয়সা হোক, কাপড়-জামা দেখে বোঝার উপায় নেই। বড়কর্তা বারোমাস 'গুণচট'-এর মতো একটি ধুতি পরে, সেটাও হাঁটুর উপর উঠে থাকে সর্বদা, তার সঙ্গে একটি পুরু জিনের কোট। এ কোটগুলো নাকি রেলের—কোন্ বাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা করে সামান্য কিছু দিয়ে কেনে, এই জামা ভারী পছন্দ অভয়পদর —কারণ এ এক-একটা জামা দুবছর করে যায়। ধোপার বাড়ি দেবার বালাই নেই, সপ্তাহে একদিন ক্ষারে কেচে নেয়। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তিনশ' ষাট দিনই ঐ একই পোশাক। বিয়ে-পৈতে নেমতন্ন বাড়িতেও ঐ পোশাকেই যায় সে, তখনও ধুতিটা হাঁটুর নিচে নামানো প্রয়োজন বোধ করে না। একটা গেঞ্জিও কখনও ব্যবহার করে না কোটের নিচে। মেজকর্তা সাধারণত টুইলের হাফশার্ট পরে, তার ধুতিটাও অপেক্ষাকৃত ভদ্র। তবে সে ধুতিও হাঁটুর নিচে নামে না। লম্বা কোঁচায় নাকি যতরাজ্যের পথের ধূলো ঘরে আসে—তা ছাড়া রাস্তায় লুটিয়ে কাপড়ও নষ্ট হয়। পায়ে বেঁধে পড়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে।

এদের মধ্যে ছোটকর্তাই একটু শৌখিন, ছিটের শার্ট পরে। ধুতিও তার পাতলা, শুধু তাই নয়, সামনের কোঁচা পাট করে নিচের অংশ ওপরে গুঁজলেও তার কাপড় গোছ পর্যন্ত নামে। দু'একখানা দেশী ধুতিও বেরোবে তার বাক্স খুঁজলে।

ছেলেদের মধ্যে একবারে ছোটরা এখনও পাঠশালায় বা স্থানীয় মিড্‌ল্ স্কুলে যায় কেউ কেউ, মেজোর ছেলেরা দু'একবার করে সব ক্লাসেই ফেল করলেও খাতায় নাম আছে

BanglaBook.org

তাদের হাই স্কুলেও—তাদের জামা আছে, তবু সেও যৎপরোনাস্তি সাধারণ ও সামান্য। বড়রা কোন কাজই করে না, লেখাপড়ারও কোন পাট নেই—তারা জামাও গায়ে দেয় না বিশেষ কেউ। বাড়িতে খালি গায়েই থাকে, শীতকাল হ'লে কিছু একটা গায়ে দেয়, ছেঁড়া গায়ের কাপড় কি বড়দের পরিত্যক্ত জামা—যে যা পায়। বাইরে বেরোবার জামা আছে প্রত্যেকেরই কিন্তু সেও ক্ষারে কেচে তুলে রাখা, ইস্ত্রী করা হয় না—বার করে কোনদিন পরে বেরোলে এই গ্রামের ছেলেরাও হাসে। বাড়িতে ইস্ত্রী আছে—অভয়পদ কোন জিনিসেরই অভাব রাখে নি—কিন্তু এত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন বোঝে না ওরা। একমাত্র ন্যাড়া এবং মেজকর্তার দুই ছেলে যতটা পারে ইস্ত্রী করে নেয়, নিজেরা, ওদের জামা ছমাসে-নমাসে ধোপার বাড়িতেও যায়। ধুতি যা পরে ওরা সবাই প্রমাণ দশহাত-চুয়াল্লিশ ইঞ্চি, কিন্তু বাড়িতে যখন থাকে চলাচলের সুবিধার জন্য কোমরের দুদিকে খানিকটা ক'রে তুলে, কোঁচা ভাঁজ করে নিয়ে কিংবা কোমরে জড়িয়ে হাঁটুর ওপরে রাখে সর্বদা। সে অবস্থায় তাদের দেখলে—আর যারা হঠাৎ এসে পড়ে তারা তো দেখেই—এদের পয়সা আছে বলে মনে হয় না, এদের কারও হাতে মেয়ে দিতেও ইচ্ছে করে না। বুড়ো যখন ছেলে-দেখা দিতে আসে তখন জামাও গায়ে দেয় একটা, একখানা কাচা ধুতিও পরে—তবু তাতে বিশেষ কোন উন্নতি হয় না তার আকৃতির। ফলে অনেক মেয়ের বাপই মেয়ে কাঁটা হয়ে গলায় বিঁধে থাকা সত্ত্বেও—এ পাত্রে মেয়ে দিতে সাহস করে না, বৃহত্তর কাঁটা হয়ে চিরজীবন বিঁধে থাকবার ভয়ে।

অনেক খুঁজে অভয়পদ অবশেষে তার এক পুরনো বন্ধুর মেয়েকেই ঠিক করে ফেলল। অভয়ের সঙ্গেই কাজ করতেন ভদ্রলোক, অবশ্য তার চেয়ে বয়সে বড়—কিছুদিন আগে অবসর নিতে হয়েছে তাঁকে। বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছে—মেয়ের বাবা এসে হাতদুটো জড়িয়ে ধরতে আর 'না' বলতে পারল না। বিশেষ করে কী টাকা সম্বল করে বাড়িতে এসে বসতে হয়েছে তা অভয়পদ ভালই জানে। মেয়েটিও অবশ্য এদের বেশ পছন্দ হল—তিন ভায়েরই। মেয়েরা কেউ দেখতে গেল না, একবার প্রমীলা কথা তুলেছিল, 'চল না ভাই দিদি দেখে আসি, এই তো কাছেই—?' কিন্তু মহাশ্বেতা সেটা বলতে গিয়ে ধমক খেলে অভয়ের কাছে, 'তোমাদের যা পছন্দর নমুনা —তা তো ছোট বৌমার বেলাই দেখেছি, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই।... তাছাড়া আমাদের সকলের পছন্দ হয়েছে—কথা দেওয়া হয়ে গেছে—এখন গিয়ে কি করবে তোমরা?'

সুতরাং বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কিছুই দিতে পারবেন না পাত্রীপক্ষরা। একশ' একান্ন টাকা নগদ। মেয়ের চুড়ি হার, চারখানি নমস্কারী আর সামান্য কিছু দানের বাসন। এ বাসন নাকি দীর্ঘকাল সিন্দুকে তোলা ছিল, সেইগুলোই রসান দিইয়ে নেবেন—মেয়ের বাবা স্পষ্টই বলে দিলেন।

অম্বিকাপদ একটু খুঁত-খুঁত করছিল কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। যদিও বেশ বারকতকই শুনিয়ে দিল যে, 'তাই তো, এখনই তো দেখছি তাহলে স্যাকরা ডেকে তাগা বালা গড়াতে দিতে হয়। বাড়ির বড় বৌ—মোটামুটি গা-সাজানো না হলে এদের সঙ্গে বেরোতেও তো পারবে না কোথাও—এটা তো আগেই করাতে হবে। তার ওপর লোকজন খাওয়া, গায়ে হলুদ—ধরো একটি হাজার টাকা খরচ—কম পক্ষে। সবটাই তো দেখছি ঘর থেকে বার করতে হবে।'

অভয়পদ কিন্তু চুপ করেই রইল। মেজভাই দাদাকে চেনে, কথা দেওয়া হয়ে গেছে, আর সে কথার নড়চড় হবে না। অগত্যা অপ্রসন্ন মনে হলেও সব ব্যবস্থাই এ বাড়ির মাপে করতে হয় তাকে।

Banglabook.org

কন্যাপক্ষ গায়ে-হলুদ ফুলশয্যার তত্ত্ব গায়ে-গায়ে কাটাবার প্রস্তাব করেছিল, অম্বিকাপদরও খুব আপত্তি ছিল না তাতে, কারণ সে জানে তত্ত্ব যা আসে তাতে খরচের কিছু কম্‌তি হয় না, যা যায় তা নগদ টাকা বার করে নিয়ে যায়—কিন্তু প্রমীলাই ঘোরতর আপত্তি করল, 'আমাদের প্রথম ছেলের বে, সাধআহ্লাদ কিছু মিট্‌বে না, এ আবার কি কথা? তত্ত্ব আমরা ছাড়ব না।'

অর্থাৎ তাদেরও গায়ে-হলুদের তত্ত্ব পাঠাতে হবে। খুব নমো নমো করে সারলেও কোন্ না সওয়াশ' দেড়শ' টাকা খরচা! মেয়েবুদ্ধি আর কাকে বলে!

মুখখানা বিকৃত করলেও স্ত্রীর মুখের ওপর বেশি প্রতিবাদ করার সাহস হল না, অবশ্য। তত্ত্বের ফর্দ করতে বসতে হল।

বুড়োর বিয়ে হয়ে গেল বেশ সমারোহ সহকারেই। স্বর্ণর বিয়ের মতো অত লোক না হলেও—শেষ পর্যন্ত চার শ' সাড়ে চারশ' লোক খেল। অবশ্য বৌভাতের দিনটা কী একটা ছুটির দিন পড়ায় মেজকর্তা 'ভেতো যজ্ঞি' করে সারল। দুপুরবেলা মাছভাত খাওয়ার ব্যবস্থা। এইটেই যা একটু মন খুঁত-খুঁত করতে লাগল মহাশ্বেতার। তার বিয়েতেও এরা এই কাণ্ড করেছিল, তখনও পছন্দ হয় নি তার। কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল বিবাহের উৎসবটা। এটুকু ছেলেবেলার সংস্কার এখনও আছে। কিন্তু মেজকর্তা অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, 'পয়সা তো কিছু ঘরে আসে নি, ঘর থেকে খরচা করে আর কাঁহাতক কী করব? রাত্তিরে লুচির যজ্ঞিতে যে শুধু ঘি খরচা হয় তাই তো নয়—কুটুম-সাক্ষাতের অর্ধেক লোক রাতটা থেকে যাবে। তাদের শোবার ব্যবস্থা রে, পরের দিন খাওয়া জলখাবারের পাট রে—অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে এ দিনে দিনে চুকে যাবে, যতই দেরি হোক্ সন্ধ্যের বেশি তো নয়—সবাইকে যে যার বাড়িতে চালান করে দেওয়া যাবে।

অগত্যা চুপ করে যেতে হল মহাশ্বেতাকে।

তা অবশ্য তার বিয়ের যজ্ঞির মতো কিছু নয়; বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছিল মেজকর্তা। প্রথম পাতে শাক সুক্তো থেকে শুরু করে মুড়িঘণ্ট ছ্যাঁচড়া ভাজা—কিছু বাদ দেয় নি। মিষ্টিও করেছিল দুরকম—সন্দেশ লেডিকেনি। উপরন্তু নগদ পাঁচসের দুধ কিনে পায়েস করিয়েছিল, তাও প্রায় সবাইকে এক চামচ এক চামচ বাটা হল—শুধু যা একেবারে শেষ 'ব্যাচ' আর বাড়ির লোকদেরই কুলোয় নি। তা না হোক, তাতে দুঃখ নেই, শেষের দিকে কম পড়েই—এ পাড়ায় তো যত বাড়িই কাজ হয় মহাশ্বেতা দেখে—শেষের দিকে মাছই থাকে না, আলু আর কাঁটা পড়ে পাতে।

এ তো মাছের এলকেল একেবারে।

না মোটামুটি খুশিই হয়েছে মহাশ্বেতা।

শুধু একটা নিরানন্দর কথা সে কাউকে মুখ ফুটে বলতে না পারলেও কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল। এত কাণ্ড হল—এত লোক খেয়ে গেল তার বাড়ি এউ-ঢেউ করে, কেবল তার বাপের বাড়ির লোকই কেউ এল না। হেম নতুন বদলি হয়ে গেছে জামালপুরে, মধ্যে একবার ছুটি নিয়ে এসে বৌ আর ছেলেকে নিয়ে গেছে —তার পক্ষে এখনই ছুটি নেওয়া নাকি সম্ভব নয়। সে বুঁচির বিয়েতেও আসতে পারে নি। দুর্গাপদ অবশ্য বাঁকা কথা বলে। সে বলে: 'তুমি রেখে বোস দিকি, বৌ-ছেলে আনবার পাস আর ছুটি তো গুনতির বাইরে। তার যা ছুটি পাওনা আছে তাতে তিনবার আসতে পারে ওরা। পাসও তো একগাদা পাওনা, ঢুকে এস্তক পাস তো কখনই নিলে না। তা নয়, আসল কথাটা আলাদা, পাসে না হয় গাড়ি ভাড়াটাই বাঁচল, বলি আসা-যাওয়ার আর খরচা নেই? অতদূর থেকে আসা! ওখানকার নতুন খরচ বেড়েছে, সস্তাগণ্ডার দেশ বটে—তবু তো একটা সংসার পেতে

BanglaBook.org

বসা, এখানে তোমার মাও তো তাঁর হোটেল খরচা ছাড়েন নি, সেটি তো ঠিক গুণে নিচ্ছেন। পাবেই বা কোথা থেকে?'

তা হয়ত হবে। তবে বিশ্বাস হয় না কথাটা ঠিক। দাদা কেন মিছে কথা লিখবে? এরা নিজেদের মতোই জগৎ দেখে!

আবার ভাবে সত্যিই, টাকা তো আর টানলে বাড়ে না, পাবেই বা অত কোথা থেকে।...

তবু তো দাদার নজর আছে। দুটো টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠিয়েছে —মুখদেকানি। মা টাকার আন্ডিলে বসে থেকেও একখানা কোরা ধুতি আর কখানা চিনির পুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন আইবুড়ো ভাত! এই বড় নাতি, সব্বার বড় এ। তাও একদিন নাতি-নাতবৌকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করতে পারলেন না! কে জানে করবে কিনা —এখনও তো সে নাম মুখে আনে নি..... গজগজ করে মহাশ্বেতা আপন মনে।

তা হোক, কেউ যদি আসতও! এত মাছ এত মিষ্টি, ফেলা-ছড়া গেল। কে যে সব কোথায় রইল! সীতার শ্বশুরবাড়িতেও নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল ন্যাড়া। তারা কেউ আসে নি। সীতা আসতে পারে নি টাকার অভাবে। ন্যাড়াকে সে চুপিচুপি বলেই দিয়েছে, 'ভিক্ষের অন্নে তো বেঁচে আছি, নৌকতা করব কী দিয়ে? যাওয়া আসার গাড়ি-ভাড়াও তো আছে! না মেজদা, সে আর হবে না। তুমি বড় মাসীকে বুঝিয়ে বলো।'

কান্তি আসতে পারত, সেও এল না। তার আবার লজ্জা। একে ঐ অবস্থা, লোকের কথা শুনতে পায় না, তার ওপর এবার যাহোক মরিবাঁচি করে এগজামিন দিয়েছিল—পাস করতে পারে নি। সেই লজ্জাই বড়। বড় অসুখটা শুধু ওর কান নিয়েই যায় নি, মাথারও সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে.... হতভাগা যারা হয়, তাদের সবদিক দিয়েই যে মারেন ভগবান।

এদিকে যা হোক—বুড়োর স্ত্রী-ভাগ্যটা খুব ভাল—তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল। অভয়পদরও পছন্দর তারিফ করল সবাই। বৌ শুধু যে ফুটফুটে হয়েছে তাই নয়, এই তো মোটে বছর বারো তেরো বয়স, এরই মধ্যে যা ছেয়ালো গড়ন দেখা যাচ্ছে তাতে বয়সকালে বেশ ভালো চেহারাই দাঁড়াবে, রীতিমতো রূপসী হয়ে উঠবে।

মহাশ্বেতার আড়ালে প্রমীলা বললে, 'হ্যাঁলো ও ছুটকী—এ কী করলেন বট্ ঠাকুর—বেছে বেছে মুক্তোর মালা এনে বানরের গলায় ঝোলালেন?

তরলার নিজের একদিন এ বাড়িতে এসে যে অবস্থা হয়েছিল তা সে এখনও ভোলে নি, বুড়োর বৌ এত ভাল না হলে বোধহয় তার কিছু সান্ত্বনা থাকত—সুশ্রী বৌ আসাতে কোথায় যেন তার একটু আশাভঙ্গও হয়েছে মনে-মনে, বিশেষ করে বড় ভাসুরের মন্তব্যটা কাঁটার মতো খচখচ করছে—সে একটু ম্লান হেসে বলে, 'এ বাড়ির এই ধারা যে মেজদি, নইলে আমাকে আপনারা বেছে বেছে নিয়ে এসে ঐ সুন্দর মানুষের ঘাড়ে চাপাবেন কেন?'

'তা হোক! উত্তেজিত হয়ে ওঠে প্রমীলা, 'ছোট কত্তার মহাভাগ্যি যে তোমার মতো বৌ পেছে। জা-দেইজী চিরকেলে শত্তুর, তবু একথা যদি গরমান্যি যাই তো মহাপাতক হবে। ও কটা রঙে কী এসে গেল। মানুষটা তো শিমুল ফুল!'

তরলা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'দিদি, ভগবান কখনও দুটো জিনিস মেয়েদের একসঙ্গে দেন না! রূপ দিলে আর বরাত দেন না। ও মেয়ে ভাল পাত্তরে পড়বার নয়—কথাতেই তো আছে, অতিবড় রূপসী না পায় বর! তাছাড়া হাজার হোক বট্‌ঠাকুরের প্রথম সন্তান তো—তিনি কি আর ছেলের বিদ্যেবুদ্ধির কথা ভেবে কুচ্ছিত মেয়ে আনবেন? তাঁর প্রথম বৌ! মানুষটা যতই চাপা হোক, বাপ তো!'

তারপর আরও একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তবে কালোকুচ্ছিত আনলেই ভাল করতেন হয়ত; সে নিজের বরাত ফলিয়ে হয়ত ঐ বরেরই লক্ষ্মী উছলে দিত!'

BanglaBook.org

'বলা যায় না। দ্যাখ্। বড়গিন্নীর এখন পাথরে পাঁচ কীল, ঐ মেয়েই হয়ত কপাল ফলাবে দেখিস!'

ঈষৎ একটু প্রচ্ছন্ন-ঈর্ষাতুর কণ্ঠে বলে প্রমীলা।....

বৌ মহাশ্বেতারও খুব পছন্দ হয়েছিল গোড়ায়। বেশ একটু বিজয়গর্বও অনুভব করেছিল সে। তার ছেলে অক্ষম, মূর্খ—ওর আবার মেয়ে জুটবে কি?—একথা মুখ ফুটে ঠিক সকলে না বললেও মনের ভাব যে সকলকারই এই রকম ছিল তা তো আর অজানা নেই। আর লোকেরই বা অপরাধ কি, ওর জন্মদাতাই যদি তাই বলে তো তারা বলবে না কেন? এবার তারা দেখুক—মেয়ে জোটে কি না। শুধু জোটা নয়, কী মেয়ে এনেছে ওই ছেলে তাও দেখে যাক সবাই। এ মেয়ে রাজারাজড়ার ঘর থেকে এসে সেধে নিয়ে যেত সবাই—সন্ধান পেলে।

কিন্তু সে আনন্দ আর গর্ব বেশিদিন থাকে না। নতুনের চমক কেটে গেলে তার একটু দুশ্চিন্তাই হয়। এ কী মেয়ে, একে সে সামলাবে কেমন করে?

মেয়েটা যেন দস্যি একেবারে—যেমন সদা সপ্রতিভ, তেমনি চঞ্চল-স্বভাব। কতকটা মেজগিন্নীরই ধরন। প্রথম যখন মেজবৌ আসে অমনি ছিল। অপছন্দটা হয়ত আরও বেশি সেই কারণেই। কিন্তু মেজবৌও ঠিক এতটা চঞ্চল এতটা সপ্রতিভ ছিল না। এ যেন বড় বেশি চঞ্চল। ছেলেমানুষ বলে মানিয়ে যাচ্ছে, সকলে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু বড় হয়েও যদি না শোধরায়?

মহা চেয়েছিল তার এক মেয়ে গিয়ে আর এক মেয়ে আসবে। বরং সে ছিল ঘর-জ্বালানে পর-ভালানে, মাকে মানত না, ওদের—মানে 'শত্তুর'দের বশ হয়েছিল, এ ব্যাটার বৌ, তাকে ভয় ক'রে চলবে—মনের মতো করে গড়ে নিতে পারবে। কিন্তু এ যে এল এককাঠি সরেস! স্বর্ণর স্বভাবের বিপরীত একেবারে। সে ছিল ছেলেবেলা থেকেই যেন গিন্নীবান্নী, ঘর-সংসারের কাজে ঝোঁক বেশি, রান্নাঘরে থাকতেই ভালবাসত। এ এক মিনিট কোথাও স্থির থাকতে পারে না। এধারে খাটতে চায় না যে তা নয়—গতরও খুব, এই ছেলেমানুষ মেয়ে বোধহয় ওর চেয়ে বেশি ওজনের ঘড়া করে দমাদম জল আনে ঘাট থেকে, বড় বড় শীলনোড়া পেড়ে তাল তাল বাটনা বেটে দেয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে, কিন্তু বসে বসে ধীর কাজ একদম করতে চায় না। কড়াইশুঁটি ছাড়াতে বললে কি শাক বাছতে বললে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয় একেবারে, মুখ শুকিয়ে যায়—কোনমতে জোর করে এনে বসালেও একটু এদিক ওদিক দেখেই উঠে পালায়।

তা সে কাজকর্ম যাই হোক, স্বভাবটা নিয়েই বেশি চিন্তা মহার। 'একটু যেন বেহায়া-মতো বাপু, যা-ই বলো। বেহায়া আর বাচাল। এখন তোমরা যাই বলে ঢাকো না কেন, আমাদের কালে এসব রীতি-ধরনকে বেহায়াপনাই বলত!' এক এক সময় মনের ভাবটা প্রকাশ ক'রেই ফেলে।

মেজগিন্নী বলে, 'ছেলেমানুষ, মেয়ের মতো। ও যে বৌ, এটা এখনও ওর মাথায় যায় নি। কীই বা বয়স। একটু সেয়ানা হোক, জ্ঞানগম্যি হোক, আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। এখন থেকে অত ভাবতে হবে না!'

কিন্তু মহাশ্বেতা তা মানতে পারে না।

হোক্‌গে ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলে কি সাতখুন মাপ নাকি? ছেলেবেলা থেকেই সহবৎ শেখাতে হয়। কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ!

তাছাড়া কীই বা এমন ছেলেমানুষ? মহাশ্বেতা তো আরও ছেলেমানুষ এসেছিল এ বাড়িতে। তখন ওর শাশুড়ী বড় বড় দেওরদের সঙ্গেই কথা কইতে দিতেন না। বলতেন,

BanglaBook.org

'ভাসুরের মতো দেওর ওসব—ওদের সঙ্গে কথা কয়ো না বৌমা, পাড়াঘরে নিন্দে হবে!' মেজবৌ নিজেও তো এমন কিছু বয়সে আসে নি, প্রায় এই রকম বয়সেই তো এসে ঢুকেছিল এ বাড়িতে—কৈ, হাটিপাটি পেড়ে ভাসুরের সঙ্গে গল্প করেছিল কি? আর এ মেয়ে ভাসুর তো ভাসুর—শ্বশুরদের সঙ্গেই কথা কয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ মহাশ্বেতা শাসন করবে কি, যারা বড়—শাসন করার কর্তা, তারাই কিছু বলে না। অমন যে রাশভারী লোক অভয়পদ, তা তার সঙ্গেই বসে কলকল করে এক গঙ্গা কথা বলে—সেও বেশ বসে বসে শোনে, হাসেও মধ্যে মধ্যে—শাসন করা তো চুলোয় যাক! মেজকর্তার সঙ্গেই যা আলাপটা খুব জমে না, তবে দুটো-চারটে কথা সেও যে না কয় তা নয়—ছোট কর্তা তো গলে গেছে একেবারে। আপিস থেকে ফিরে রোজ এক ঘণ্টা ধরে গল্প করা চাই ঐটুকু মেয়ের সঙ্গে। ওরাই যদি এমন ধারা করে প্রশ্রয় দেয় তো সে শাশুড়ীর শাসন মানবে কেন?

মহাশ্বেতার সত্যিই ভাবনা হয় এক এক সময়ে।

অথচ কী যে করবে তাও ভেবে পায় না। কাউকে বলবারও যো নেই। সকলেই হেসে উড়িয়ে দেয়, ওকেই বরং পাগল বলে, উপহাস করে। জায়েরা বলে, 'দিদির যেমন কথা! এখনই যেন ছিষ্টি রসাতলে গেল একেবারে বোয়ের বেহায়াপনায়। দুদিন যাক না বাপু, তারপর ভাবতে বসো। এই তো সবে এয়েছে। এখানাকার জল গায়ে বসুক। এখনই অত কেন?'

না, ওদিকে কারও সহানুভূতি নেই। মেয়েটা যেন সবাইকে জাদু করেছে বাড়িতে পা দিতে না দিতে। সবচেয়ে রাগ হয় যখন শাশুড়ী বলেন, 'আ বড়বৌমা, ও ছেলেমানুষ, মেয়ের মতো হেসেখেলে বেড়াচ্ছে বেড়াক না—দুটো একটা পেটে আসুক, একটু গিন্নীবান্নী হোক, আপনিই শুধ্‌রে যাবে। বলি মেজবৌও কি কম গেছো ছিল!'

ও ছেলেমানুষ, আর মহাশ্বেতা এসেছিল বুঝি তিনকেলে বুড়ি! তখন এসব বিবেচনা কোথায় ছিল!

না, শাসন করলে তাকে একাই করতে হবে। সাধারণভাবে যেটুকু করবার তা সে করেও মধ্যে মধ্যে, আবার কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রেও বোঝাবার চেষ্টা করে—কিন্তু মেয়েটা কোনটাই যেন গায়ে মাখে না। কথা তো শোনেই না, তার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিতও নয়। অনুযোগ করলে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

অথচ ওকে যে ভয় করে বা এড়িয়ে চলে তাও নয়। এক পেট খেয়ে উঠেও শাশুড়ীর পাতের কাছে বসে অনায়াসে টকের বড়ি চেয়ে খায়। কাসুন্দির হাঁড়ি রোদে দিলেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে, 'হেইমা আমাকে একটু দাও, তোমার পায়ে পড়ি!' এ মেয়েকে শাসন করবে সে কী করে?

তড়িৎপ্রভা নাম বৌয়ের। তড়িৎ মানে নাকি আকাশে ঐ যে বিদ্যুৎ চমকায়, ঐ বিদ্যুৎ। ছোটবৌ বলেছে তাকে। তা নাম সার্থক করেছে বটে। বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল, এই আছে এই নেই।.....

'মুয়ে আগুন বাপ মিন্‌সের! রাখার মতো আর নাম খুঁজে পেলে না! আমাদের হাড় ভাজা ভাজা করতে ঐ নাম দিয়ে বসে রইল!'

মাঝে মাঝে তার অরুণের কথাও মনে হয়।

'কোথায় যে গেল ছেলেটা। কী যে দুর্মতি হল! থাকলে তার কাছে বই নিয়ে বসাতুম। আজকাল তো মেয়েদের লেখাপড়া শেখা হয়েছে—তবু একটু লেখাপড়া করলে যদি শান্ত হত!'

BanglaBook.org

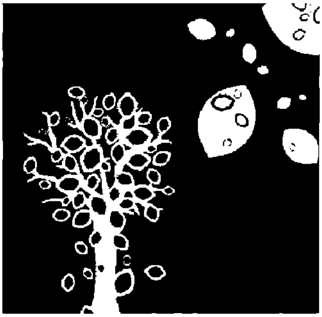

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এ নতুন হুজুগটা যে কী তা বুঝতেই বেশ একটু সময় লাগল এদের। কারণ 'আইন মানব না' একথা পাগল ছাড়া যে আর কেউ বলতে পারে, তা কখনও ভাবে নি এরা। বাইরে যে বাতাস পাল্‌টেছে—বাতাস যে দ্রুত পালটাচ্ছে সে খবর এখানে পৌঁছয় না। ইংরেজের আইন মানবে না, আইন ভেঙ্গে জেলে যাবে—এই নাকি ঢেউ উঠেছে শহর-বাজারে, সে ঢেউ নাকি ওদের গাঁয়েও এসে পৌঁচেছে। সে তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছে ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গাই ওদের আশেপাশে; সে ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়েছে ওদিকে সাঁতরাগাছি রামরাজাতলা এদিকে ডোমজুড় মাকড়দা—সর্বত্র। সে ঢেউ নাকি ওদের গাঁয়ে এসে আছড়ে পড়েছে। তার তরঙ্গে নাচছে দুলছে এই গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনও।

কিন্তু আইন মানবে না! আইন ভেঙ্গে জেলে যাবে! এ আবার কি কথা! এ যে অবিশ্বাস্য। এতবড় বুকের পাটা কার? জেল মানে কি, সেখানে পাথরভাঙ্গায়, ঘানি টানায়, রাস্তা পেটায়—সেখানে এতটুকু বদমাইশি করলে বুকের ওপর বাঁশ দিয়ে ডলে।

হ্যাঁ তাই করছে। আরও করছে। ঠেকো রদ্দুরে সূর্যের দিকে মুখ করে ফেলে রাখছে, নখের মুড়িতে মুড়িতে পিন ফোটাচ্ছে, পায়ের নিচে দিচ্ছে বিছের কামড়—আরও কত কী। তবু জেলে যাচ্ছে দলে দলে সবাই, বড়লোকের ছেলেরা, বাবুদের ছেলেরা। বুড়োরাও নাকি যাচ্ছে। উকিল ব্যারিস্টার মাস্টার জমিদার—সব এক সঙ্গে। মার খেয়ে কত লোক পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে জন্মের মতো—তবু যাচ্ছে।

তাদের ওপর অত্যাচার দেখে বাঙালি পুলিশ নাকি ক্ষেপে গেছে—সরকার তাই, গুর্খা পুলিশ আমদানি করেছেন। তবু তাঁরা পেরে উঠছে না। মার খাবার এত লোক যে তারা মেরে শেষ করতে পারছে না।....

চোখ বড় বড় করে খবরটা দেয় মহাশ্বেতা তার মাকে। খবরটা দিতেই ছুটে এসেছে সে। সেও বেশিদিন খবরটা পায় নি। তার জগৎ তার ঐ সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ শুধু নয়—একরকম সম্পূর্ণও। সংসারকেন্দ্রিক মনের শক্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে তা ঘেরা, তার মধ্যে বাইরের বাতাস ঢোকে কদাচিৎ। বাইরের খবর নিয়ে পুরুষরা মধ্যে মধ্যে আলোচনা করে বটে—কিন্তু সে যেন সুদূর কোন দেশের খবর, কারা যেন, কাদের যেন কথা—তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ক্ষণিক কৌতূহলের শুধু। বিলেতে কি মার্কিন মুলুকে কি হচ্ছে তাও যেমন—পাঞ্জাব বা কাশ্মীরের ঘটনাও তেমনি ওদের কাছে। সে কোন্ দেশ কতদূরে, স্পষ্ট কোন ধারণা নেই—ধারণা করার কোন চেষ্টা বা আগ্রহও নেই। কী প্রয়োজন ওদের?

এ খবরেও প্রথমটা ওরা কান দেয় নি। দেবার সুযোগও হয় নি।

BanglaBook.org

এসব খবর মেজকর্তা আর ছোটকর্তাতেই আলোচনা করে বেশির ভাগ। ছোটকর্তাই এ বাড়ির গেজেট চিরকাল—কারণ সেই যা পাঁচজনের সঙ্গে মেশে, পাঁচ জায়গায় যায়। মেজকর্তা তাই মধ্যে মধ্যে ছোটভাইকে ধরেই মোটামুটি খবর সংগ্রহ করে। বড় কোন দিনই কারুর সঙ্গে বসে গল্প করে না, বাড়িতে যতক্ষণ থাকে কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকে। তাকে কেউ গিয়ে কোন কথা 'ওপরপড়া' হয়ে না শোনালে সে শোনে না। দরকারি কথা ছাড়া অত গরজ করে তাকে শোনাবেই বা কে? তা এবার নাকি তাও শোনাচ্ছে ছোটকর্তা। বাগানে গিয়ে তাকে শুনিয়ে আসে এসব খবর—কোথায় কী ঘটছে।

'তা তাদের ভেয়েভেয়ে কত কী কথা হয় বাপু বুঝিনে তো! কী কথা তো কী কথা। ওসব কথায় কান দিতে গেলে এ সংসার ঠেল্‌বে কে বলো! এই নারদের গুষ্টির ডানহাতের ব্যাপার দুবেলা চালানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।... কাল আমাদের ছোটকত্তা শোনালে ধরে তাই শুনলুম। ছোঁড়াগুলোও অবিশ্যি বলছিল কদিন ধরে—বলছিল আর হাসাহাসি করছিল—তা আমি বলি দূর হ, যে কথা নয় সেই কথা! তোরা সব যা পণ্ডিত, কী শুনতে কি—ধান শুনতে কান শুনেছিস। মুখ্‌খুর ডিম, তোরা বুঝিসও তো খুব, তোদের কারা বোকা বানিয়েছে। ইংরেজের রাজত্বে বাস করে তাদের আইন মানব না, পুলিশকে কেয়ার করব না, যা খুশি তাই করব, মনময় রাজত্বি—এ আবার নাকি হয়। বলি পুলিশের রুলের গুঁতো খেয়ে আর জেলে গিয়ে যদি ইংরেজ তাড়ানো যেত তো চোর-ডাকাতরা কবে ইংরেজকে তাড়িয়ে এদেশের রাজা হয়ে বসত।... তা ছোঁড়ারা বলে বিশ্বাস না হয় ছোটকাকে জিজ্ঞেস করো।... ওমা, কাল ছোটকত্তা নিজেই এসে বললে, ব্যাপার গতিক ভাল নয়, এমনি ধারাই সব হচ্ছে, সত্যিই নাকি। পুলিশও নাকি গেছে ক্ষেপে, যাকে পাচ্ছে তাকে ধরছে আর তেমনি নাকি বেধড়ক ঠেঙ্গাচ্ছেও। ছোটকর্তা আরও বললে অল্পবয়িসী ছেলে একজায়গায় দু'তিনজন দেখলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—ও আর কিছু বাচছে না।... বিশেষ যদি হিঁদুর ছেলে হ'ল তো নাকি, কথাই নেই। বলে—তোমাদের বাড়ির এ যা দঙ্গল এর খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না, সামলে সুমলে রাখো কদিন।.... তা কোথায় সামলাই বলো দিকি। এ কি আর এতটুকুটি আছে যে আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখব?'

ভুরু কুঁচকে—যেন একটু উৎসুকভাবে মায়ের মুখের দিকে চায় মহাশ্বেতা, বুদ্ধিটা নিতেই চায় হয়ত, সেইজন্যেই ছুটে এসেচে। কিন্তু তারও বলা শেষ হয় নি। মাকে উত্তর দেবার মতো অবসর না দিয়েই তাই আবার শুরু করে সে, 'মুখপোড়ারা কি কারও কথা শোনে! বলতে গেলে উল্‌টে আমায় দাবড়ায়, বলে থামো থামো তুমি আর বকো নি, আমাদের যারা ধরবে তারা এখনও মায়ের গব্‌ভে!... শোন কথা। বড় বড় দামড়া হয়েছে সব, ওদের কি কুলুপ দিয়ে রাখব গা? তাও বললুম আমার পাঁটাগুলোকে, দিনকতক নয় তোদের দিদ্‌মার কাছে গিয়ে থাক্‌গে যা না! তা বলে কি, হ্যাঁ, যাচ্ছি ঐ কিপটে বুড়ির কাছে, আমাদের না খাইয়ে মেরে ফেলবে! যদ্দিন মামী ছিল তদ্দিন তবু যা হোক—এখন তো বুড়ির মজা।... এদের আমি কী করে সামলাই বল দিকিনি! ভেবে ভেবে তো পেটের ভাত চাল হয়ে গেল!

আবারও একটু থামে। একটু উদ্বিগ্নভাবে মায়ের মুখের দিকে চায় কিন্তু এবারও তাঁর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। উদ্বেগের বদলে একটু গর্বের সুরই বরং ফোটে এবার। বলে, 'তবে তাও বলি, মুখ্‌খুই হোক আর যাই হোক, এদিকে ছোঁড়াগুনো চালাক আছে খুব। ওরা ক'ভাই দাঁড়িয়ে যদি মুখ ছোটায় তাহলে পুলিশ তো পুলিশ—জজ ম্যাজিস্টারও ভেসে যাবে সে কথার তোড়ে।... আরও গুণ আছে বাপু, হক্ কথা যা

BanglaBook.org

বলব—ওরা বাইরে বিশেষ যায় না, নিজেদের মধ্যেই যা কিছু আড্ডা। পাড়া-ঘরে ঘুরে বেড়ানো কি বাজারে গিয়ে মুড়ুলি করা—সে সবে ওরা থাকে না। কোন খারাপ নজরও নেই, আর নেশাভাঙেও তেমন রত নয় ওরা। তাই ভাবি মরুক গে, নিজেদের জমিতে বসে থাকবে না বাড়ির ছেলেরা তো কি যে যার ঘরে খিল এঁটে থাকবে? এটুকু কি আর বুদ্ধি নেই পুলিশের, কে বজ্জাত আর কে ভাল—তারা খবর নেবে না? তবে তারা এতবড় রাজত্বিটা চালাচ্ছে কি করে? আবার ভয়ও হয়—কে জানে বাপু কী হবে, বুঝিও না তো কিছু!'

এবার অসহিষ্ণু হয়ে থামিয়ে দেন তাকে শ্যামা।

'তুই একটু চুপ কর দিকি। তোর ঐ একঘেয়ে থগ্‌বগানি আর আমার ভাগ লাগে না! ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? অনেক দেখলুম এ পর্যন্ত! এ বয়সে হুজুগ কি আর কম দেখলুম! হুজুগ না তুললে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না তারাই মধ্যে মধ্যে এই সব হুজুগ তোলে।... ও তুই রেখে বোস, রেখে বোস! অনেক দেখলুম এই বয়েসে। হুজুগ কি আর একটা—না একরকম! সেই এক রেলা দেখলুম দিনকতক—কী সমাচার, না বিলিতী কাপড় পরব না, বিলিতী চিনি খাব না। বিলিতী কাপড় পুড়েই নষ্ট হল দেদার—তারপর তো আবার যে-কে সেই! আবার এক ঢেউ উঠল কি না, চরকা কাটো, খদ্দর পরো—তাহলেই দেশ স্বাধীন হবে! আর সব ইস্কুল কলেজ ছেড়ে দাও, ইংরেজদের ইস্কুলে পড়ব না! আ মর —তাতে লাভ হল কার? মাঝখান থেকে কতকগুলো ছেলের ইহকাল পরকাল মাটি। সে সব চরকা তো কোথায় কি গেল—উনুনে পুড়ে ভাত রান্না হয়ে নিশ্চিন্তি।.... ঐ যে তোদের গুষ্টি বলত না—ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সদ্দার! তা এও তাই!... আর বাপু তোদের কি ক্ষ্যামতা তোরা লড়বি ইংরেজদের সঙ্গে, কী আছে তোদের, কামানবন্দুক আছে? তাও তো অতবড় জার্মানিরা পারলে না! হু! যে মহারানীর রাজত্বে সূয্যি অস্ত যেতে সাহস করে না সেই মাহারানীর ফৌজের সঙ্গে লড়বি তোরা?'

দীর্ঘ বক্তৃতা দেন শ্যামাও। কিন্তু তাতেই যেন মনে মনে একটু বল পায় মহাশ্বেতা। তবু খানিকটা চুপ করে থেকে বলে, 'কিন্তু তা যাই বল বাবু, সেবার তো ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিয়ে ছিল ঐসব করে।'

'হ্যাঁ—তা আর নয়! ওদের সুবিধের জন্যে দুখানা করেছিল, সুবিধে হল না—আবার জুড়ে দিলে। তোদের এইসব তালপাতার সেপাইদের ভয়ে তো তারা শ্যালের গত্তে গিয়ে লুকিয়ে থাকে একেবারে!'

মহাশ্বেতা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে কী ভাবে, বুঝি মার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করে। তারপরই আসল কথা মনে পড়ে যায়। বলে, 'মরুক গে, সে তো পরের কথা! এখন এ পাঁটাগুলোকে সামলাই কী করে তাই একটা যুক্তি দাও দিকিনি। দুষ্টু গোরুর সঙ্গে যদি কপ্‌লে গাইও বাঁধা পড়ে? বাবা অমনি করে চোরের মার মারবে নাকি গো!'

বিরক্ত হয়ে ওঠেন শ্যামা, 'তোর যেমন কথা! শুধু শুধু সুখ-সোমন্দা ওদের ধরবে কিসের জন্যে রে? ওরা যদি ওসব হ্যাঙ্গামে না যায় তো ধরবে কেন? জেলে পুরলে তো খেতে দিতে হবে—বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কেন শুধু শুধু? আর খাওয়ালে তো ভালই—তবু জামাইয়ের দুটো পয়সা বাঁচে, ওদের সুখে হয়। বেকার বসে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্ছে বৈ তো নয়! তবে সে ভয় নেই, তোর ও পাঁটাদের যমেও ছোঁবে না, তুই নিশ্চিন্ত থাক্!'

'ষাট্ ষাট্!' রাগ করে উঠে দাঁড়ায় মহাশ্বেতা, 'যমের কথা আবার কী গা এর মধ্যে! ওরা তোমার কী করলে যে ওদের যমের অরুচি বলছ! ওরা কি তোমার খাচ্ছে, না তোমার

BanglaBook.org

পয়সা খসাচ্ছে?.... তোমাকে কিপ্‌টে বলেছে বলে তুমি অত বড় গালটা দিলে? দুর্গা দুর্গা, এখানে আসাই আমার ঝকমারি হয়েছে!'

সে আর দাঁড়ায় না। দালানের জানলায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বিধবা বোন, আসার আগে ভেবেছিল তার সঙ্গে বসে দুটো গল্প করে যাবে—এবেলার মতো ছুটি নিয়েই এসেছে জায়েদের কাছে, বলে এসেছে, এখন তো একটিনি দিয়ে রেখেছি আমার বৌকে, আমি যদি দুদণ্ড না-ই থাকি, সংসারটা চলবে না? আমি কি চিরজন্ম খাটব?'—এই ভেবেই ছুটি নিয়ে এসেছিল। এখন মার এই কথার পর আর সে প্রবৃত্তি রইল না। সে যখন আসে তখন কান্তি দেখতে পায় নি, পেছন ফিরে বাগানে কাজ করছিল, শব্দ তো পায়ই না—এখন ওকে দেখতে পেয়ে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল কথা কইবার জন্য—কিন্তু মহাশ্বেতা কোন দিকে তাকাল না, চোখ মুছতে মুছতে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেল সোজা একেবারে রাস্তায়।

এ দৃশ্য নতুন নয়, বুঝলে যে মা কিছু বলেছেন, মর্মান্তিক কিছু। তার কান নেই, শুনতে পায় না, তবে বুঝতে পারে। মার মুখের কথা যে কী সাংঘাতিক, ইচ্ছে করলে যে তিনি সত্যি সত্যি বাক্যবাণই প্রয়োগ করতে পারেন তা সে জানে। ইদানীং আরও বেড়েছে, বৌদি—অমন ভালমানুষ শান্ত মেয়েও অস্থির হয়ে পড়েছিল দুবেলা কথা শুনতে শুনতে। চলে গিয়ে বেঁচেছে। কিসের যেন একটা সাংঘাতিক জ্বালায় জ্বলছেন দিবারাত্র, সেই দাহই—চারিদিকে যারা থাকে—তাদের দগ্ধ করে। খুব দুঃখের দিনেও এত জ্বালা ছিল না, এখন যেন ঢের বেড়েছে। হয়ত কান্তিই এর প্রধান কারণ। ছোড়দিও। মেজদি—মেজদির মেয়ে। সব জড়িয়েই যে এ জ্বালা তা কান্তি বোঝে। তবু মনে হয়, এতদিন এতই সহ্য করলেন, মিছিমিছি এই শেষ বয়সে এমন করে সকলকে দুঃখ দিয়ে কী সান্ত্বনা পান উনি? ওঁর জ্বালা কি এদের চোখের জলে কমে?

দিদির মুখখানা মনে করে কান্তির চোখ ছল ছল করতে থাকে।

মনে পড়ে যায় ওর—বৌদিরা যেদিন জামালপুর চলে যাবে তার আগের দিনের কথাটা। ছোটখাটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস নিয়ে সেদিন সকাল থেকেই তার পিছনে লেগেছিলেন মা। ঘরমোছার সময় বুঝি পাপোশটা ঝাড়া হয় নি ঠিকমতো—যদিও কান্তি নিজের চোখে দেখেছিল বৌদিকে পাপোশ ঠুকেঠুকে ঝাড়তে, বাটনা বাটাও নাকি দায়-ঠেলা-গোছের হয়েছে (মায়ের ভায়ায় কি তা জানে কান্তি, মা বলেন দুই সতীনে চিবিয়ে রাখা!) —এমনি নিতান্ত ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট উপলক্ষ।... সবচেয়ে শেষকালে কী কাণ্ডটাই না করলেন! দুপুরবেলা ওঁর কাজ করতে দেরি হবে বলে বৌদিকে খেয়ে নিতে বলেছিলেন, বৌদি খায় নি–বোধহয় শেষ দিনটা বলেই; মা আরও যেন কতকটা ইচ্ছে করেই সেদিন চরম দেরি করলেন, একেবারে বেলা সাড়ে তিনটেয় খেতে এলেন। এটাও যেন বৌদির অপরাধ, খেতে বসে এই নিয়েই কী না শোনালেন এক ঝুড়ি কথা। কান্তি শুনতে পায় না তবে ঠোঁট-নাড়া দেখে আজকাল অনেক কথাই বুঝতে পারে, বিশেষ করে পরিচিত লোকদের কথা, যাদের ঠোঁটের ভঙ্গিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে হল, মা এটাকে লোকদেখানো আদিখ্যেতা, কাষ্ঠনৌকতা ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করছেন। কিন্তু শুধু বিদ্রূপেই শেষ হল না, সেটা শুধু শুরু। ক্রমশ কথাগুলো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, তা ওঁর ওষ্ঠের ভঙ্গিতেই শুধু নয়—দৃষ্টির পরুষ কঠোরতা থেকেও বুঝতে পারা গেল। বৌদি ওঁর ছেলেকে নাতিকে ওঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সন্তানকে পর করে দিচ্ছে—তার ষড়যন্ত্রেই ওঁর অমন বাধ্য মাতৃভক্ত ছেলে ওঁকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে বিদেশ চলে যাচ্ছে; ইচ্ছে করে তদ্বির করিয়েই নাকি এই বদলির ব্যবস্থা করিয়েছে

BanglaBook.org

বৌদি—শাশুড়ীকে জব্দ করবে বলে—এইসব অভিযোগ করতে লাগলেন। অন্তত কান্তির তাই অনুমান। সে স্পষ্ট দেখেছে—ঝরঝর করে বৌদির চোখের জল ঝরে পড়েছে ভাতের ওপর; একে তো সেই কোন ভোরের চাল-হয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত—তবু সেই চোখের জলমাখা কদন্নগুলোই গিলতে হয়েছে বৌদিকে, মার ভয়েই ফেলে উঠতে পারে নি। অথচ কী লাভই বা হয় এতে!

মানুষ তো আরও দূরে সরে যায় মনের মধ্যে।

মা এত বোঝেন, এটা কেন বোঝেন না।

ওর অমন বৌদি, দুটো মিষ্টি কথা বললেই চিরকাল তাকে বেঁধে রাখা যেত।

॥ ২ ॥

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েও অমনি দ্রুত হন হন করে হাঁটছিল মহাশ্বেতা। পথের মাঝে মাঝে জটলা বা তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা কোনটাই লক্ষ করে নি। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীতলা ছাড়িয়ে বাজারের মোড়ে এসে ওদের বাড়ির রাস্তা ধরতে গিয়েই চমকে উঠল। থামতেও হল ওকে।

'বাবা, এত ভিড় কিসের গা? এ যে লোকে লোকারণ্যি একেবারে!'

কতকটা যেন মনে মনেই প্রশ্ন করে সে।

সত্যিই এ রাস্তায় এমন ভিড় কোনদিন দেখে নি মহাশ্বেতা, মেলার সময়ও না। তখন লোক এ পথে বিস্তর হাঁটে বটে কিন্তু সে এমন দাঁড়িয়ে থাকে না এক জায়গায় —স্রোতের মতো দু'দিকে দুমুখো এগিয়ে চলে ক্রমাগত। আর এ তো কোন মেলার দিনও নয়—অন্তত কৈ মনে তো পড়ছে না তেমন কোন মেলার কথা! তার যদি-বা ভুল হয়, মেলাটেলা কিছু হলে এতক্ষণ দু'দিকের সার সার তেলেভাজা খাবারের দোকান বসে যেত, বেগুনি ফুলুরি পাঁপরের পাহাড় জমে যেত এক-একটা বারকোশের ওপর—আর সবচেয়ে ঐ অনামুখো মাগীগুলো, এই দিন দুপুরেও তাহলে মুখে খড়ি মেখে ঠোঁটে-গালে আলতা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত গড়াগ্‌গড়!

না, মেলা-ফেলা কিছু নয়। এ অন্য কোন ব্যাপার!......

মহাশ্বেতার স্বভাবে কৌতূহলটাই প্রবল।

প্রায় শিশুর মতোই সব বিষয়ে কৌতূহল তার।

'ব্যাওরা'টা কি জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে। এত পুরুষের ভিড়ের মধ্যে তার এগোবার কথা নয়, সাধারণত বাইরের অপরিচিত পুরুষকে যতদূর সম্ভব দূরেই রাখে সে—সেই শিক্ষা পেয়ে এসেছে জ্ঞান হওয়া অবধি—কিন্তু আজ তার স্বভাব-কৌতূহল সে সংস্কারও ভুলিয়ে দিল। এ ভিড় এড়ানো চলত অনায়াসেই। ওদিক দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে রাজবাড়িকে বাঁয়ে রেখে পোলের কোল দিয়ে শ্মশানের ধার দিয়ে যেতে পারত—এমন কিছু ঘুর-পাক নয় সেটা, সেদিকে এখন ভিড়ও কম—কিন্তু এদিকে ব্যাপারটা কি ঘটছে সেটা না জেনে চলে যেতে পারল না কিছুতেই।

পুরুষের ভিড় ঠেলে এগোনো মুশকিল, তবু ঘোমটাটা আর একটু সামনের দিকে টেনে দিয়ে চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে একেবারে দোকানগুলোর কোল ঘেঁষে এগোবার চেষ্টা করল। এতক্ষণে তার লক্ষ হল এদিকের দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, সবাই ঝাঁপ ফেলে বা দোর বন্ধ করে বসে আছে ভেতরে, শুধু চোখ বার করে একটু দেখবার মতো ফাঁক রেখেছে একটু একটু। তবে কি লুটতরাজ কিছু হচ্ছে? ডাকাত পড়ে নি তো কাছে-পিঠে কোথাও? কিন্তু এত লোকের সামনে ডাকাতি বা লুটতরাজই বা হবে কী

BanglaBook.org

করে? না কি হরতাল? আজকাল তো আবার ঐ এক হুজুগ বেরিয়েছে। ছেলেরা বলে এস্ট্রাইক। কিন্তু সে রকম কিছু হলে তো সব বাজারই বন্ধ থাকত। আর হরতাল তো সকাল থেকেই শুরু হয়—বরং সন্ধ্যের দিকে তাতে কেউ কেউ দোকান খোলে। আজ তো এই একটু আগেও আসার পথে দেখে এসেছে দিব্যি সব খোলা। এখনও তো ওদিকের সব দোকান খোলা রয়েছে দেখে এল। এখান থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে, ভোঁদা গয়লার দোকানের ওপাশ থেকে ওধারের দোকানগুলো তো এখনও খোলা।

তবে? এটা হচ্ছে কী এখানে?

পথের ওপর কেউ বেদের ভেল্‌কি-টেল্‌কি দেখাচ্ছে না তো? তাই বোধহয় হবে। অনেকদিন আগে আর একবার দুটো ভেল্‌কীওলা এসেছিল—মনে আছে ওর। ওঃ, সে কী কাণ্ড! একটা ঝুড়ির মধ্যে একটা মেয়েকে পুরে তার বর কী কোপানোটাই না কোপালো তলোয়ার দিয়ে—'রক্তে রক্তাকির্নি' একেবারে—আর মেয়েটার সে কী চিচ্‌কার প্রথম প্রথম, তার পরে সব চুপ। ওমা, ভয়ে মরে সবাই, এ কী খুনো-খুনি ব্যাপার রে বাবা, খেলা দেখতে গিয়ে থানা-পুলিশ ছুটোছুটি করতে হবে নাকি? তা সে মিন্‌সে তো খোঁচাখুঁচি করে বৌটাকে মারলে, তারপর তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল বৌয়ের শোকে—কাঁদে আর কী সব হিন্দী-মিন্দীতে বলে—এই কাণ্ড চলছে, ওরা সবাই ভয়ে ভাবনায় কাঠ, তারই মধ্যে কিনা পেছন থেকে ভিড় সরিয়ে সে মেয়েটা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে হাজির। দিব্যি জ্যান্ত। ওদিকে তখনও তলোয়ারটা পড়ে রয়েছে, তাতে রক্ত মাখামাখি! তা খেলা বাপু মন্দ নয়, সে কথা মহাশ্বেতাও মানতে বাধ্য—তবে সে যতই ভাল হোক, পাড়াঘরে এসে দেখায় সে আলাদা কিন্তু সরকারি সদর রাস্তা জোড়া করে বসে খেলা দেখানো—এ আবার কী অনাছিষ্টি কাণ্ড।

মহাশ্বেতার কেমন সত্যি-সত্যিই ধারণা হয়ে গেল যে, বেদের ভেল্‌কীই দেখানো হচ্ছে। আর যে কিছু হতে পারে, অন্য কোন কারণ থাকতে পারে এ ভিড়ের—তা একবারও মনে হল না ওর। তাই, আরও যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই আর একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। অবশ্য চেষ্টা করাও খুব সহজ নয়—কারণ রৈরাবণের ব্যাপার যেন চারিদিকে, বাপ্‌রে বাপ্, মনিষ্যি যেন কারও বাড়ির মধ্যে নেই আর, সব্বাই বেইরে পড়েছে। আর সবাই তো দেখছি মদ্দ মিনসে—যেতে দেবে কি এগিয়ে—?' মনে মনে বলে মহাশ্বেতা।

তবু ওরই মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই কে একজন রুষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ সব খুন-খারাবি থানা-পুলিশের কাণ্ড, চারদিকে র-র করছে গুর্খা পুলিশ, এর মধ্যে মেয়েছেলে সেঁধুচ্ছ কেন বাছা! বলি তেমার কি একটু ভয়ডর হুঁশপব্ব নেই? কেমন ধারা মেয়েছেলে তুমি?... যাও যাও, পালাও শিগগির।

ওমা কী হবে! এ যে আরশোলা মল্লিকের গলা। চিনে ফেলে নি তো?

ঘোমটাটা আগেই যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল, এখন টানাটানি করে আরও খানিকটা বাড়াতে গিয়ে পিঠের দিকটাই অনাবৃত হয়ে পড়বার উপক্রম হল। সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু পেছনো আর হল না, তার আগেই আর একটা হৈ-হৈ—লোকগুলো যারা সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারাও যেন পিছু হটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে চাপ ওর ওপরেও এসে পড়ল এবার। সে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল সেখানে দেওয়াল নেই ফলে একটা দোকানের ঝুলনো —বাইরে বেরিয়ে আসা কাঠের পাটাতনের ধারে লেগে পা দুটো ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হল।

BanglaBook.org

যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল ও, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হল।

যে দোকানে এই কাণ্ড—তার মালিক ও কর্মচারীরা সবগুলো কাঠ বন্ধ করে নি—একটা কাঠ ফাঁক করে রেখে তার মধ্যে দিয়ে সব দেখছিল। তারা এখন এই ব্যাপার দেখে একজন চট্ করে কাঠটা সরিয়ে এক হ্যাঁচকায় ওকে টেনে নিল পাটাতনের ওপর—তারপর ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সে কাঠটা যথাস্থানে পরিয়ে দিল আবার।

'ওমা, এ আবার কী?.... কে গা তোমরা?... ওমা এ কী কাণ্ড! রাহাজানি নাকি? এমন করে ভদ্দরলোকের মেয়েছেলের হাত ধরে টানো—তোমাদের সাহস তো কম নয়! এতো ভারী আস্পদ্দা দেখতে পাচ্ছি।'

মহাশ্বেতা চেঁচামেচি করে ওঠে, পায়ে তখনও যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু তার চেয়েও ভয়টা বেশি।

'ভদ্দরলোকের মেয়েছেলে তো মরতে এসেছিলে কেন? পাটা যে ভেঙ্গে এতক্ষণে নড়নড় করত! সেইটে বুঝি ভাল হত? তার ওপর চারদিকে গুর্খা পুলিশ, তাদের হাতে পড়লে ভদ্দরতা থাকত কোথায়; মান-ইজ্জৎ নিয়ে ফিরতে পারতে?

দোকানদার চাপা গলায় খিঁচিয়ে উঠল।

মহাশ্বেতা থতমত খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি তো এত কাণ্ড জানি না। যাবার সময় তো অত দেখি নি কিছু। তাহলে কি আর এ পথে আসতুম!... তা হ্যাঁগা বাছা, পুলিশ-টুলিশ এসেছে কেন—কী হয়েছে কি এখানে? কী সব গুখ্খা-মুখ্খা বলছ—তা তাদের আনতে হল কেন? আমাদের খোট্টা পুলিশ সব কোথায় গেল? এখানে কী হচ্ছে কী? ডাকাত পড়েছে নাকি কোথাও? না কি খুন জখম হয়েছে?'

বিপদের মধ্যেও কৌতূহলটাই প্রবল হয়ে ওঠে আবার।

'খুন জখম হবে কেন! পিকেটিং হচ্ছে কদিন থেকে শুঁড়িখানায়—জান না? বলি কোন্ দেশে থাক গা মেয়ে?'

'কি—হচ্ছে? কি টিং বললে?... শুঁড়িখানায় কি হয়েছে কি?'

'পিকেটিং, পিকেটিং!..... স্বদেশী ছেলেরা মদের দোকানে পিকেটিং করছে, কাউকে মদ খেতে দেবে না!'

'তা সে তো ভাল কথাই, তার আবার অত থানা-পুলিশ কিসের?

'ভাল কথা তো তোমার আমার কাছে। যারা এক গাদা টাকা দিয়ে সরকারি লাইসিং নিয়েছে মদ বেচবে বলে—? তাদের কাছে কি ভাল? তারাই পুলিশ ডেকেছে, তাদের যে ভাতে হাত পড়ে নইলে! আর কোম্পানিও তো মুকিয়ে আছে, স্বদেশী ছেলেদের জব্দ করতে পেলে তো আর কিছু চায় না... তাছাড়া তাদেরও তো ক্ষেতি, লোকে মদ না খেলে তাদের রোজগারও তো বন্ধ। কোম্পানির ঘরে মোটা টাকা যে যোগান দেয় এরা!'

আর কোন কথার অবকাশ হল না। বাইরের হৈ-চৈটা যেন আরও বেড়ে গেছে। এর পর আর নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। মহাশ্বেতা দোকানের কারিগরদের এক রকম ঠেলে সরিয়েই কাঠের ফাঁকে চোখ লাগাল।

এবার ঠেলাঠেলির কারণটা বোঝা গেল। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে —বোধ হয় ভিড় সরাতে। ফলে লোকগুলো সব পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছে।

'আ মরণ, কী সব বীরপুরুষ রে! তাই আবার আরশোলা মল্লিক আমাকে বকছিল, মেয়েমানুষ এর ভেতরে কেন!.... তোরাও তো পোঁ পোঁ দৌড়াচ্ছিস। অবিশ্যি বলেছে একটা কথা ঠিক, আমি কি আর ওদের মতো পালাতে পারতুম। এমনিই তো পা-টা যেতে বসেছিল।'

BanglaBook.org

কিন্তু সে যা হোক, এ আবার কি হচ্ছে! মহাশ্বেতার চোখ সেই আবছা অন্ধকারেই বিস্ফারিত হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড় হল। তিনটে ছেলেকে টানাটানি করছে পুলিশ, তারা আসবে না, শুয়ে পড়েছে। তাদের পা ধরে রাস্তার ওপর দিয়েই টেনে নিয়ে চলল হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে। আহা রে, এবড়ো-খেবড়ো খোয়া বারকরা রাস্তা—পিঠের জামা ছিঁড়ে এতক্ষণে বোধ হয় ক্ষতবিক্ষত রক্তারক্তি হয়ে গেল। ছাল-চামড়া কি আর রইল কিছু! তাও তো মোটা জামা—কোট ফোট কারুর গায়ে নেই। অভয়পদ যে মোটা জিনের কোট পরে বারো মাস্—যেটা এতদিন পর্যন্ত চক্ষশূল ছিল ওর কাছে—তার উপকারিতা এবার বেশ বুঝতে পারল মহাশ্বেতা। সব তো বেশ ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে তবে এ দুর্মতি কেন বাপু!... খা-দা বাড়িতে বসে থাক, নিজের ধান্দা দ্যাখ, তা নয়—এই সব হুজুগ করতে আসা। চাকরি-বাকরি করে বাপ-মায়ের দুঃখ ঘোচাবি তবে তো ছেলের জন্ম —কে মদ খেলে না খেলে তা নিয়ে তোদের অত মাথাব্যথা কেন? বিশেষ যখন কোম্পানি চায় না!.... তোরা না খেলেই তো হল!

দূরে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ছেলেগুলোকে টেনে নিয়ে চলল সেই দিকেই। ঐ তো, রাস্তাতেই রক্তের দাগ পড়েছে, মাটি লাল হয়ে গেছে ওদের রক্তে।

'মরে যাই, মরে যাই—কাদের বাছা রে!'

আপন মনেই সহানুভূতিসূচক আওয়াজ করে মহাশ্বেতা।

তবু, তখনও ওদের লাঞ্ছনার শেষ হয় নি। গাড়ির দরজা অবধি টেনে নিয়ে গিয়ে ওদের পা ছেড়ে দিলে সিপাইরা, তারপর বোধ হয় গাড়িতে উঠতে বললে। ছেলে তিনটে কিন্তু শুয়েই রইল চুপচাপ, যেন শুনতেই পায় নি। দুবার-তিনবার বললে—ওরা তেমনি নির্বিকার, নিস্পৃহ। একজন ওপরওলা ছিল ওদের সঙ্গে, সে এবার কী যেন বললে, সিপাহিগুলো দমাদম বুটসুদ্ধ লাথি মারতে লাগল ওদের। .... একজনের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, আর একজনের বুঝি দাঁতই ভেঙ্গে গেল দু-তিনটে। নিশ্চয়ই পেটে লাথি পড়েছে—ও ছেলেটা নইলে অমন ধনুকের মতো বেঁকে উঠবে কেন! এ কী প্রহারী গো। ওমা, ওদের কি দয়ামায়া নেই একরত্তি! কিন্তু তবু কৈ তো কেউ টুঁ শব্দ করছে না একটা। ঐ ভারী ভারী বুটের লাথি সইছে কী করে? ওদের কি পাথরের জান!

আহা রে, ঐ ছেলেটার পেটেই লেগেছে সত্যি, সত্যি কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে যন্ত্রণায়—

এততেও কিন্তু ওঠানো গেল না ওদের। আবারও সেই ওপরও'লা কি বললেন, গাড়ির দোর খুলে ধরল একজন, চারজনে চারদিক থেকে ধরে গাড়ির মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, চালের বস্তার মতো। তারপর তারাও গাড়িতে উঠে দোর বন্ধ করে দিল। কতক উঠতে পারল না, তারা হেঁটে যেতে লাগল। গাড়ি চলে গেল।

এতক্ষণ চারিদিকের ভিড় যেন পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল, ভয়ে ও কৌতূহলে। নিঃশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তারা। চোর-ডাকাতকে মারে সে আলাদা কথা। ভদ্রলোকের ছেলেদের এমন প্রকাশ্য নির্যাতন, এমন অমানুষিক লাঞ্ছনা তারা কখনও দেখে নি, শোনেও নি বোধ হয়। পুলিশের রুদ্রমূর্তি তাদের মনে ও মুখে এক সুগভীর আতঙ্কের ছাপ ফেলেছে গত কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে। তারা পালাতে পারলে বাঁচে, এতক্ষণ সে চেষ্টা করে নি পাছে সামান্যমাত্রও নড়াচড়ায় সিপাইদের দৃষ্টি তাদের ওপর এসে পড়ে—এই ভয়।

এইবার—পুলিশের গাড়ি সরস্বতীর পুলের বাঁকে অদৃশ্য হতেই একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সবাই। ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল দেখতে দেখতে । তবু, লোক একেবারে

BanglaBook.org

গেল না, পুলিশের বড় দল গাড়ির সঙ্গে চলে যেতে তাদের মনে বোধহয় আশ্বাসের ভাব ফিরে এসেছে খানিকটা। তারা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগল।

তবে রাস্তা এবার অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার যাওয়া চলবে। দোকানদার ওদিকের দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'নাও, এবার ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও গো বাছা ভাল-মানুষের মেয়ে। এখন হ্যাঙ্গামা-হুর্জ্জুতের সময় অমন হুট করতে বেরিও না। দিনকাল ভাল নয়, এসব সময়ে যে যার ঘরে বসে থাকতে হবে।.... যাও, বেরিয়ে পড়ো এই বেলা। এখন ভালয় ভালয় মানে মানে ঘরে ফিরতে পারো তো গুরুবল।'

মহাশ্বেতা কোন মতে দেওয়াল ধরে ধরে দোকানের মালপত্র বাঁচিয়ে ভেতর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাজারে পড়ল। পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে তার, ভয়ে আর কী এক রকমের উত্তেজনায়, এখনও সেই কাঠের কোণের সঙ্গে চেপে যাওয়ার ব্যথাটা টনটন করছে—কিন্তু অপেক্ষা করার সাহসও আর নেই। সত্যিই এখন মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। যদি কিছু কেলেঙ্কারি হয়—কর্তারা কী বলবে। পাড়া-ঘরে কি আর মুখ দেখানো যাবে?

বাজারের ওপাশের ফটক দিয়ে বেরিয়ে, যতটা দূর দিয়ে হয় এগিয়ে এসে চেয়ে দেখল—মদের দোকানটার সামনে তখনও চার-পাঁচজন সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। ফলে রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে সেখানটায়। ওদের সামনে দিয়ে পথ চলবারও সাহস হচ্ছে না কারও। মদের দোকান খুলে রেখেছে বটে দোকানি মিন্‌সে—কিন্তু যমদূতের দল অমন করে সামনে পাহারা দিলে কার একটা ঘাড়ে তিনটে মাথা আছে যে ওখানে মদ গিলতে যাবে? মরণদশা বুদ্ধির!

অদম্য কৌতূহলে কখন বুঝি একটু সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে মহাশ্বেতা, তা খেয়ালও নেই। হঠাৎ একটা সিপাই মুখ তুলে সোজা ওর দিকে চাইতেই চমকে উঠল। বুকের মধ্যে গুর-গুর করে উঠল ভয়ে—মাগো, চাইছে দ্যাখো না চোখ পাকিয়ে—সাক্ষাৎ যমের দূত একেবারে!—ছুটে এসে ধরবে না তো? তাকেও যদি অমনি মারধোর করে, হাজতে নিয়ে যায়? বাপ রে, তাহলে শুধু ভয়েই মরে যাবে সে।

কেন তাকে ধরবে আর কেনই বা মারবে—তা একবারও মনে হল না ওর। কিছুক্ষণ আগেকার দেখা দৃশ্যটাই বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শুধু, ফলে যখন সবচেয়ে ক্ষিপ্রপদের প্রয়োজন তখনই যেন পাদুটো সবচেয়ে অবশ হয়ে পড়ল।

কী করবে, চিৎকার করবে কিনা—চিৎকার করে আশপাশের লোককে ডেকে বলবে কিনা 'আমাকে বাঁচাও আমি অমুকদের বাড়ির বৌ' কিংবা মাটিতে বসে পড়ে সামলে নেবে কিছুই বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। কিন্তু পা দুটাতেও সত্যিই আর কিছুমাত্র জোর নেই, দাঁড়িয়ে থাকাও বেশিক্ষণ যাবে না— তা বেশ বুঝতে পারল। মাথাটার মধ্যেও যেন কেমন করছে, ফাঁকা লাগছে সব।

ঠিক সেই মুহূর্তে—অন্তত মহাশ্বেতার মনে হল—যে সিপাইটা তার দিকে চেয়ে দেখেছিল, সে যেন তার দিকে এগিয়ে এল দু পা, মনে হল আরও এগোচ্ছে—

অধিকতর আতঙ্কের এই বৈদ্যুতিক আঘাতেরই প্রয়োজন ছিল বুঝি তার। ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে এইবার ছুটল সে। পা-দুটো যে অবশ লাগছিল, তা তার মনে রইল না, সে রকম কিছু আর বোধও করল না সে। বাজার ছাড়িয়ে, রাজবাড়ি ছাড়িয়ে খালধার দিয়ে একেবারে শ্মশানের সামনে পড়ে একবার থামল শুধু—কেউ পেছনে আসছে কিনা, সেই সেপাইটাও দৌড়চ্ছে কিনা তার পিছু পিছু তাই দেখবার জন্যে—তাহলে বোধ হয় সে সোজা শ্মশানেই ঢুকে সেখানে দিয়ে খালে নেমে পড়ত। ওদের হাতে পড়ার চেয়ে ডুবে

BanglaBook.org

মরাও শ্রেয়। কিন্তু দেখল যে, কেউই আসছে না তেড়ে, এ দিকের দোকানদারগুলোই শুধু মজা-দেখবার মতো করে হাসিহাসি মুখে চেয়ে আছে দু'-চারজন, বোধ হয় পাগলী ভেবেছে তাকে। তা ভাবুক, মহাশ্বেতা আর থামল না; আবার তেমনি করে—অত জোরে না হোক—দৌড়তে শুরু করল।

বাড়িতে পৌঁছে অবশ্য আর দালানে কি রকেও উঠতে পারল না, যেন প্রাণপণ চেষ্টায় এই শক্তিটুকুই জিইয়ে রেখেছিল, কোনমতে বাড়িতে পৌঁছবার কথাই ভেবেছে সারাক্ষণ, রাস্তায় না মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হয় সেইটুকুর জন্যেই একাগ্র প্রার্থনা জানিয়েছে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে—সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পর তাই আর বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট রইল না। খিড়কির দরজা পেরিয়ে ভেতরের উঠোনে ঢুকেই সেই মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পড়েই রইল। ঠিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে নি হয়ত কিন্তু জ্ঞানও পুরোপুরি ছিল না, সত্যিই যেন মাথার মধ্যে চিন্তা-শক্তি ধারণা-শক্তি কেমন ঝাপ্সা একাকার হয়ে গেছে, কথা কইবার অবস্থা তো ছিলই না। কী হয়েছে, কোথাও কোন চোট লেগেছে কিনা—কিংবা পথে আসতে আসতে কোন অসুখ বিসুখ করেছে—উগ্র ধরনের পেট ব্যথা কি শূলব্যথা বা ঐ রকম কিছু—নাকি শুধু মাথা ঘুরেই পড়ে গেল—তাও কিছু জানা গেল না।—একটি কথাও কইতে পারল না মহাশ্বেতা, চোখ বুজে মূর্ছিতের মতোই পড়ে রইল।

কারণ যা-ই হোক, ভয় পাবার মতোই অবস্থা—ভয়ই পেল সকলে। যে যেখানে ছিল ছুটে এল, ছোটবৌ এক ঘটি জল এনে মুখে মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগল, বুড়োর বৌকে বললে একটা পাখা এনে জোরে জোরে বাতাস করতে—এমন কি স্বয়ং মেজবৌ এসে মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ঝিনুকে করে করে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিলে।

কিন্তু তারপর একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসে যখন ঘটনাটা খুলে বলল সব তখন লাঞ্ছনার আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। কর্তারা তো যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলই, ছেলের দলও—মহাশ্বেতার নিজের ভাষায় তারা পাঁঠারাও—যা মুখে এল তাই বলল। এক কথায় তিরস্কার ও ধিক্কারের একটা ঝড় বয়ে গেল তার ওপর দিয়ে।

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট ক'রে সব তিরস্কারই মেনে নিল। একথা একবারও সে বলতে পারল না যে, এতে তার কোন দোষ নেই, এমন তো হামেশাই যায় সে বাপের বাড়ি, পথে যে এমন কাণ্ড হবে তা সে জানবে কেমন করে? আজকাল যে এই সব কাণ্ড ঘটছে তা তাকে কেউ বলে নি, তার জানবার কথা নয়। সে কিছু বলল না এই জন্যে যে, এই প্রথম সে সম্মিলিত তিরস্কারে একটা মাধুর্যও অনুভব করছে। আজ যেন তার পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে এবং এই কটুমিষ্ট তিরস্কারগুলো সেই নবজন্মেরই অভিবাদন! যদি কোন বিপদ্-আপদ ঘটত তার, যদি পুলিশের হাতে পড়ে তাকে লাঞ্ছনা সইতে হত, যদি এমন করে ছুটে আসতে গিয়ে দম আটকে মরেই যেত—কী সর্বনাশ হত, তিরস্কারের শব্দে যাই তফাত থাক, মূল বক্তব্য একই। তার অভাবে এদের সর্বনাশ বোধ হত, তার জন্যে এদের মনে এত উদ্বেগ এত দুশ্চিন্তা—এইটুকু জেনেই তার মন ভরে গেছে—এই আন্তরিকতাতেই সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার আর কোন ক্ষোভ নেই কোথাও, কিছুর জন্যেই। শুধু মনে হচ্ছে যে সত্যি সত্যিই দম আটকে মারা গেলে এইটেই চরম ক্ষতি হত—এই তিরস্কারটাই শুনতে পেত না সে, তার জন্য এদের মনে এমন আন্তরিক উদ্বেগ আছে সেইটেই জানতে পারত না। বিশেষত এসে যখন অমন করে পড়েছে—তখন সেই অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থাতেও তরলার আর বুড়োর বৌয়ের চোখের জলটুকু সে লক্ষ করেছে—সেইটুকুই জীবনের পরম সম্পদ বলে বোধ হচ্ছে তার। সেই সম্পদই কোথায় যেন বাইরে একটা বর্ম পরিয়ে দিয়েছে, আর কোন আঘাতই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

BanglaBook.org

এরই মধ্যে খবরটা দিল ছোটকর্তা। আজই অফিস থেকে শুনে এসেছে সে। অরুণের খবর। অরুণ নাকি অনেক ঘুরে শেষ পর্যন্ত কলকাতাতে কাদের বাড়ি ছেলে পড়াবার কাজ নিয়েছিল। ছোট ছোট চার-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে পড়াবে—তার বদলে খাওয়া-থাকা আর মাসে দু'টাকা হাত-খরচা পাবে—এই বন্দোবস্ত হয়েছিল। যাদের বাড়ি—সেই গাঙ্গুলীবাবুদের এক ভগ্নীপতি বোল্‌তা চাটুয্যে ওদের অফিসে কাজ করেন, তিনিই খবরটা দিয়েছেন। অরুণের দেশের অনেকে দুর্গাপদদের অফিসে কাজ করে—সেই সূত্রে অরুণকে চিনতে খুব অসুবিধা হয় নি তাঁর। গাঙ্গুলীবাবুরা ওর ব্যবহারে নাকি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা ক-ভাইই ভাল চাকরে, টিকে থাকলে তাঁরাই একটা কোথাও চাকরি-বাকরিতে বসিয়ে দিতে পারতেন, সে কথাও নাকি তাঁদের আলোচনা হয়েছিল—কিন্তু ছেলেটার জন্মলগ্নে বোধহয় একসঙ্গে শনি আর রাহুর দৃষ্টি আছে—কোথায় কোন বাসা বাঁধা বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ওর ভাগ্যে নেই, তাই সেখানেও টিকতে পারল না। এই স্বদেশী হুজুগে মেতে নাকি কাদের সঙ্গে মহিষবাথান চলে গিয়েছিল নুন তৈরি করতে—পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। মারধোর তো যথেষ্ট খেয়েছেই, জেলেও পুরেছে তারা। মারধোরের চোটেই কোথায় কী করত সব বার করে নিয়েছে, তারপর এদের নিয়ে টানাটানি, পঞ্চাশ রকম জেরা, ওকে কোথায় পেলে, ওর কে আছে, কী জানো ওর কথা—এই সব ঠিকুজী-কুলুজী—থানায় যাওয়া এজাহার দেওয়া—একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে গাঙ্গুলী বাবুদের। তাতে ওঁরা খুব চটে গেছেন, আর কখনও কোন অজানা অচেনা লোককে বাড়িতে আশ্রয় দেবেন না তাঁরা—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জেল থেকে বেরিয়ে আর ও-মুখো হতে হচ্ছে না বাবুকে—এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

খবরটা ফলাও করেই বিবৃত করল দুর্গাপদ। তারপর বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসির সঙ্গেই বক্তব্য শেষ করল তার, 'যাদের বাড়া ভাত তেতো লাগে, সুখশয্যেয় শয্যেকণ্টকী হয়—তাদের তো এমনি দুগ্‌গতি হবেই গো, হতে বাধ্য। ওদের সেই যাকে বলে না—রাহুর দশা, তাই। কোথাও স্থির থাকতে দেবে না, সুখে আছে দেখলেই পেছনে চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে আর বলে কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলানো। সত্যিই ভূতে কিলোয় ওদের। নইলে এ বাড়ি ছেড়ে অমন ভূতে তাড়ানোর মতো পালাবে কেন বলো তোমরা। আমরা কি ওর পাকা ধানে মই দিচ্ছিলুম, না বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছিলুম দুবেলা। তা নয়, বরাত। ওর বরাতে আছে পাঁচ দোর ঝাঁট দিয়ে বেড়ানো, ভিক্ষে করে খাওয়া—তুমি আমি চেষ্টা করলে কি আর তা বন্ধ হয়? বরাত এমন না হলে বাপ-মায়েরই বা অমন হাল হবে কেন? ও-সব লোককে যারা বাড়িতে ঠাঁই দেবে তাদেরও মন্দ হবে। হয় না হয়—গাঙ্গুলীবাবুদেরই ব্যাপারটা দ্যাখো না। আমাদের যে কোন বড় ক্ষেতি হয় নি সেই গুরুবল!'

ছোটকর্তা আরও কত কি বকে যায় কিন্তু মহাশ্বেতার কানে ঢোকে না সে সব কথা। মহাশ্বেতার যেন দু'চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে ছেলেটার কথা ভেবে। আহা অমন ভাল ছেলেটা কী থানছাড়া মানছাড়া হয়েই না ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী দরকার ছিল বাপু, বেশ তো ছিলি এখানে, খাচ্ছিলি দাচ্ছিলি থাকছিলি—কেউ তো কিছু বলেও নি। চেপে থাকলে এতদিনে পড়াশুনো কতদূর এগিয়ে যেত, আর একটা পাস দিতে পারত। চাকরি-বাকরি যা হোক একটা জুটিয়ে নিয়ে বিয়ে-থা করে ঘরবাসী হতে পারত চাই কি! তা নয়—এ ওর কী দুর্মতি হল বাপু!

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল বুঁচির কথা। বুঁচি শুনলে দুঃখ পাবে, হয়ত কান্নাকাটি করবে। ওর ওপর টানটা খুবই ছিল। নিজের ভায়েদের চেয়েও বেশি দেখত ওকে। সে থাকলে ও ছোঁড়াও বোধহয় অমন করে পালাতে পারত না।

BanglaBook.org

অনেকদিন বুঁচিরও কোন খবর পাওয়া যায় নি। কে জানে সব কে কেমন আছে। এইসব হ্যাঙ্গামা হুজ্জুত ওদিকেও হচ্ছে কিনা কে জানে। ওর দেওরেরেই তো পাল একেবারে—খুড়তুতো-জাঠতুতো মিলিয়ে সোমত্থ দেওর একগাদা। তারা যদি এইসব হুজুগে মেতে থাকে? মাগো, শেষে জামাইয়ের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো?....

কালই পাঠাবে বড়কর্তাকে খবরটা নিয়ে আসবার জন্যে।

বরং অমনি বলে আসবে যদি দিনকতকের জন্যে পাঠায় এখানে।..... তা কি আর পাঠাবে!

'মুয়ে আগুন! ঐ হয়েছে এক কুটুম। এক মিনিটের জন্যেও বৌকে কোথাও পাঠাবে না। পাঠাবার কথা তুললেই সাত কাহন ওজর ফেঁদে বসবে। মা-বেটা সব সমান। বৌ না হলে ওদের যেন ত্রিভুবন অন্ধকার, সংসার বন্ধ একদম। আ-মরণ বৌ যখন হয় নি—তখন চলত কী করে? তোরা কি সব ওপস করে থাকতিস নাকি?..... এবার আমি আনবই, তাতে ঝগড়া হয় সেও ভাল!'

॥ ৩ ॥

বুড়োর ইচ্ছে, বাবুদের বাড়ির আসন্ন উৎসবে তার শালাশালীদের নিয়ে আসে ছাঁদার জন্যে। এবার যদিও লুচি ও সন্দেশের সংখ্যা নাকি কমিয়ে দেওয়া হবে, মাথাপিছু বারোখানা লুচি এবং আটটা সন্দেশ মাত্র বরাদ্দ হয়েছে—আর সে জন্যে ঘোঁটও চলছে খুব, একদল বলছে আমরা যাব ঠিক নিয়ম মতো তবে কম ছাঁদা দিতে এলে নেব না, চলে আসব; আর একদল বলছে—না নেবে তো ওদের বড় বয়ে গেল, যারা নেবে না সামনের বারে তাদের নাম কাটা যাবে, তাতে ক্ষতিটা কার হবে? এ তো আর জোর কিছু নেই, কবুলতি দলিলদস্তাবেজও কিছু করে দেয় নি ওরা—ইচ্ছেসুখের দেওয়া, একেবারে এ পাট তুলে দিলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? ওরা বোকা তাই এ বাজারে দিয়ে যাচ্ছে এখনও, বন্ধ করাই তো উচিত ছিল! এই সব নিয়ে নানান কথা তক্কাতক্কি, আলোচনা চলছে পাড়ায় পাড়ায়—কিন্তু কম দিলেও, এবারে নাকি একটু বিশেষ ব্যাপারও আছে। এবার শুধুই লুচি আর মোণ্ডা নয়, সেই সঙ্গে নাকি নগদ পয়সাও কিছু করে দেওয়া হবে। আর তার অঙ্কও খুব সামান্য নয়—কেউ বলছে একটা করে সিকি বন্দোবস্ত হয়েছে, কেউ বলছে আধুলি। যাই দিক, কলকাতার টাকশালে লোক পাঠানো হয়েছে, নতুন সিকি বা আধুলি তারা গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তবে সিকিই হোক আর আধুলিই হোক, এটা ঠিক যে মাথাপিছু প্রত্যেকেরই দেওয়া হবে, এক মাসের শিশু হলেও পাবে। বাবুদের কার নাকি একটা বড় মকদ্দমায় জিত হয়েছে, তারই মানসিক ছিল, সেই হিসেবেই এবার এই দমকা খরচের ব্যবস্থা। তা ছাড়াও শোনা যাচ্ছে, এবারের সামাজিক অন্যবারের মতো পেতলের সরা দিয়ে সারা হবে না, একখানা করে ভরুণ্ডে থালা দেওয়া হবে প্রত্যেক বাড়িতে। অবশ্য সবাই তা বিশ্বাস করছে না এখনও, কেউ কেউ বলছে থালা না হাতি, দেখো শেষ পর্যন্ত একটা করে জলখাবারের মতো রেকাবি বেরোবে।

সে যাই হোক, পাওনা এবার কিছু বেশি হবেই—এত যখন শোনা যাচ্ছে, কিছু কি তার ফলবে না?

'যা রটে তার কিছুটাও তো বটে।' বুড়ো বলে, 'আর বারোখানা নুচি আটটা সন্দেশই বা কম কি। নুচির সাইজ তো আর পাল্‌টাবে না, অন্তত তেমন তো কই শোনা যাচ্ছে না এখনও। একোখানা বারকোশের মতো নুচি—আটখানা খেলেই পেট ভরে যায়। আনলে—ওরা যদি কজন আসে তো বেশ বড় এক পুঁটলি ছাঁদা নিয়ে যেতে পারে—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় বুড়ো। বক্তব্যটা এইখানেই শেষ ধরে নেওয়া যেতে পারত যদি না বলবার ভঙ্গিতে অসমাপ্ত সুর একটা প্রকাশ পেত। আরও কিছু বলবার আছে ওর—সেটা কোথায় বাধা পেয়ে আটকে যাচ্ছে। ওর মনের এই এত বড় বাসনাটা চরিতার্থ হবার পথে একটা অন্তরায় ঘটেছে—সেটা কারুর কাছেই আর অস্পষ্ট নেই, শুধু সেই অন্তরায়ের কথাটা খুলে বলতে কেন ইতস্তত করছে সে, সেইটেই কারও ঠাওর হচ্ছে না।

ওর খুড়তুতো ভাই হাবলা বলে, 'তা আনিয়েই নাও না। এখনও তো সময় আছে। একটা খবর পাঠালে ওরা তো নিজেরাই চলে আসতে পারে!'

'দূর! বাড়ির মত না নিয়ে আমি অমনি খপ করে খবর পাঠাতে পারি!'

'তা বাড়ির মতটা নিয়ে নাও না, কী হয়েছে!'

'সে বড় লজ্জা করে। শ্বশুরবাড়ির কথা কি আর বলা যায়।'

কয়েক মিনিট সবাই চুপ করে থাকে। কী বলবে চট করে ভেবে পায় না বোধহয়।

ওদের আসর বসেছে চিরাচরিতভাবে ওদের ভেতরের বাগানে। গোল হয়ে বসেছে সবাই, মাঝখানের খানিকটা জায়গা ফাঁক রেখে। হাবলারা তিন ভাই ইস্কুলে যায়, অন্য দিন তাই এ সময় আসর বসতে পারে না। আজ কী একটা ছুটির দিন বলে মজলিসের সভ্যসংখ্যা পুরো হয়েছে। বুদ্ধি বা যুক্তি নেবার পক্ষে এটাই সবচেয়ে অনুকূল অবসর।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ বাইরের জীবনমূলে যতই নাড়া দিক, এ বাড়ির এই কটি দেওয়াল ভেদ করে সে তরঙ্গের স্পন্দন পৌছয় না। এদের জীবন পুরনো নিয়মেই চলে, প্রতিদিন কাটে চিরদিনের মতো। কর্তারা চাকরি করে, সাবধানে চাকরি বাঁচিয়ে চলে। চাক্‌রেরা অবশ্য সর্বত্রই হুঁশিয়ার—প্রথম সেই অসহযোগ আন্দোলনে কয়েকজন যা চাকরি ছেড়েছিল—কিন্তু তাইতেই, তাদের দুর্দশা দেখেই বোধহয় সকলের চোখ খুলেছে, এ আন্দোলনে বিশেষ কেউ চাকরি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। যাঁরা আগের আন্দোলনের মার্কামারা—তাঁরাই এবার নেতৃস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরাই যা আছেন বড়দের মধ্যে। বাকি সবাই তরুণের দল। ছাত্ররা এবং যারা ইস্কুল কলেজ ছেড়ে বেকার বসে আছে, চাকরিতে বা অন্য কোন কাজকর্মে লেগে পড়ার অবসর পায় নি—তারা। এরাই মার খাচ্ছে জেলে যাচ্ছে দলে দলে, এমন কি প্রাণের মায়াও করছে না, জান দিতে ও নিতে প্রস্তুত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—স্বাধীনতা-যুদ্ধের এ আহ্বানে।

কিন্তু এসব কোন নিয়মই এ বাড়িতে খাটে না। এদের কথা স্বতন্ত্র সব ব্যাপারেই। এ বাড়ির এত বড় ছেলের দল—যার অধিকাংশই বেকার—এরা ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধদের মতোই সন্তর্পণে দূরে সরে আছে। এদের মধ্যে এ হুজুগ বা ওদের অভিভাবকদের মতে পাগলামী ঢোকে নি। ওরা সব এসব খবর শোনে, আলোচনা করে, মজা দেখে। শোনেও লোকপরম্পরায় কারণ এ বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না। পাড়ার মধ্যে কোন কোন বাড়িতে আসে—ইচ্ছে করলে চেয়ে পড়তে পারে কিন্তু এদের সে ঔৎসুক্য নেই। পড়ার ক্ষমতা কম—ইচ্ছা আরও কম। তাই ওদের জীবনে রাজনৈতিক ঘটনা-সংঘর্ষের সংবাদের চেয়ে বাবুদের বাড়ির চার আনা দক্ষিণার খবর বেশি চিত্তাকর্ষক। ওদের জীবন যে অতি পুরাতন বৃত্তে আবর্তিত হয় সেখানে বাবুদের বাড়ির ছাঁদার পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলে বিপুল তরঙ্গ ওঠে। এ ঘটনা—এই পাওনার দিনগুলো বছরে আসে মাত্র তিন-চারবার, তাই এর আগমনের বহু পূর্ব থেকে এদের থিতিয়ে আসা জীবনে আলোড়ন জাগে—আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অবসান থাকে না।

আজও সেই প্রসঙ্গ উঠেছে। কদিনই উঠছে। কিন্তু বুড়োর এই গোপন ইচ্ছাটার কথা জানা যায় নি। অথচ এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। এই ছাঁদার সময় হলে এবাড়িতে বহু

BanglaBook.org

আত্মীয়সমাগম হয়, কুটুম্বদেরও আনানো হয় অনেককে। যাদের অভাবের সংসার—আর অভাব এখনকার দিনে নেই কার—তাদেরই আনানো হয়। বুড়োর বড়পিসিদের সচ্ছল অবস্থা, তবু সেবাড়ির ছেলেরাও আসে। পিসতুতো ভাইয়ের খুড়তুতো ভাইদেরও আসতে বাধা নেই। তাতে করে সেই একটা দিন এবাড়িতে যে পরিমাণ ভাত-ডাল-তরকারির খরচা হয় সেটাও খুব অকিঞ্চিৎকর নয়—তবু বাবুদের বাি থেকে যে আদায় হয় সেটাই বড় কথা, সেটাই বাঞ্ছনীয় এদের কাছে।

সুতরাং বুড়ো বলতে পারত অনায়াসেই। তবু বলে নি। বলতে পারে নি—সঙ্কোচে বেধেছিল বোধ হয়। আজ খুলে বলতে পেরে বাঁচল। যে সমস্যাটা ওর মনে দেখা দিয়েছে তার সমাধান ওর বুদ্ধির সাধ্য নয়। এদেরই পরামর্শ নিতে হবে তাও সে জানে—সুতরাং যত তাড়াতাড়ি এদের জানানো যায় ততই ভাল। সেই জানানো হয়ে যেতে তাই সে প্রাণপণে ভুরু ও কপালে কুঁচকে কেমন এক রকমের উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভাইদের মুখের দিকে।

প্রথম মুখ খুললে ওদের মধ্যে কেষ্টপদ অর্থাৎ ন্যাড়া।

'তুমিও যেমন! মার কাছে আগে ছোটমাসীর ছেলেটার কথা পাড়ো না। বল যে কেউ গিয়ে ছাঁদার দিন কোলে করে নিয়ে আসবে—আবার পৌঁছে দেবে। ওদের তবু তো একটা ছাঁদা আদায় হবে। ছোটমাসী না থাক বুড়ি তো দশ দিন ধরে তাংড়ে তাংড়ে খেয়ে বাঁচবে!'

'তা তো বললুম। তারপর? ছোটমামাও তো থাকবে—সে কী আর কোলে করে নিয়ে আসবে না?'

'তা আনুক না। আসবে যে তার কোন ঠিকও তো নেই। কথাটা তুমি পাড়োই না। তারপর সেই কথার সুত্তুর ধরে তোমার শ্বশুরবাড়ির কথাটা তুলব অখন!'

বুড়ো খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একেবারে। এইটেই সে চাইছিল। আর একজনকে দিয়ে বলাতে পারলে সঙ্কোচের কোন কারণ থাকে না। তার পর কথার পৃষ্ঠে কথা—নিজেও বেশ গুছিয়ে বলা যায়, তাতে কেউ তত দোষ ধরতে পারবে না।

তখনই সে হয়ত উঠে যেত কিন্তু ভোম্বলের একটা কথাতে আবার যেন কেমন চুপসে গেল। ভোম্বল বললে, 'আবার দল ভারী করছ মেজদা, মনে আছে গত বছর রাসের সময় অনেক বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিল। বড়পিসির বাড়ি থেকে গেল বার এক গাদা ছেলে এসেছিল, তাইতেই বলেছিল—এদের বাড়ি কি ছারপোকার বেয়ান নাকি রে বাবা, নাকি খোদা ছপ্পর ফুঁড়ে দেয় এই সময়টা হলে? কোথাও থেকে ভাড়া ক'রে আনে নাকি আদ্দেক ভাগ দেবার বন্দোবস্তয়!'

কেষ্ট বললে, 'হ্যাঁ—বলেছিল যেমন তেমনি তার জবাবও তো পেয়েছে। জবাব কি দিয়েছিলুম মনে নেই?.... ওদের মাথায় ডাঙ্গশ মেরে রেখেছি, আর কোনদিন মুখ খুলতে সাহস করবে না!'

জবাবটার কথা মনে আছে বৈকি। সকলেরই মনে আছে। কেষ্টই দিয়েছিল জবাবটা, সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিল, যেন সাক্ষাৎ দুষ্ট সরস্বতী এসে ওর জিভে ভর করেছিলেন। কেষ্ট বলেছিল, 'এত বড় গুষ্টিটার ভাগ্না-ভাগ্নী দৌউত্তুর মিলিয়ে কি কম হয়—না কম হবার কথা? বাড়বাড়ন্ত সংসার হলে এমনিই হয়। এ তো আর আঁটকুড়োর ঘর নয়—ছেলেমরার বংশও নয়। আমাদের সব জেঁওজ পোয়াতীর ঘর!'

যিনি শোনাতে এসেছিলেন কথাটা—বাবুদের হেড সরকার সুরেন পাল—তাঁর মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠেছিল কথাটা শুনে, কিন্তু কোন জবাব দিতে পারেন নি। তাঁর ছেলেপুলে হয় নি। এক ভাইঝির ছেলেকে পোষ্য নিয়েছিলেন সেও মরে গেছে। আর তাঁর মনিবদের

BanglaBook.org

মধ্যে যিনি মেজবাবু তাঁর পাঁচটি ছেলের মধ্যে এখন একটিতে ঠেকেছে, শিবরাত্রির সলতে যাকে বলে। সেই জন্যেই জবাব কিছু দিতে পারেন নি সুরেন পাল। হঠাৎ কোন কথা মুখে যোগায় নি। কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়েছে।

কথাটা বলার জন্যে অবশ্য বাপের কাছে ধমক খেয়েছে কেষ্ট পরে। অভয়পদ সাধারণত সাংসারিক ব্যাপারে, বিশেষ করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও, এ কথাটায় চুপ করে থাকতে পারে নি, বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিল, 'অমন করে লোকের আঁতে ঘা দিয়ে কথা কইতে নেই, ছিঃ!.... এ তো আর মানুষের হাত কিছু নয়—ভগবানের মর্জি। কার কখন কী হয় কেউ বলতে পারে? আমাদের বাড়ি এত ছেলে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে হলে এই বাড়ি ফাঁকা হয়ে যেতেও দেরি লাগবে না। মুনির শাপ আর মনস্তাপ দুইই সমান—ও কুড়োতে নেই অমন করে। এবার থেকে সাবধান হয়ে কথা কয়ো।'

তা অভয়পদ যাই বলুক, ভায়েদের কাছে বাহবার অভাব হয় নি। তারা একবাক্যে প্রশংসা করেছে ওর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের।

কিন্তু আজ ভোম্বল অন্য সুরে কথা বলল। খানিকটা চুপ থেকে বলল, 'তা হোক, আর হয়ত কিছু বলবে না—কিন্তু কী দরকারই বা এত কাণ্ড করবার তাও তো বুঝি না। বড়দার শালারা আসবে কত দূর থেকে—তার মজুরি পোষাবে? বুঝলুম না হয় গাড়ি পালকি করবে না, হেঁটেই মেরে দেবে—তবু এতটা পথ হেঁটে লাভ কি হবে?... এই তো কাল থেকেই ভিয়েন বসবে শুনছি, তেবাস্‌টে চতুব্বাস্‌টে লুচি খানকত, তার জন্যে এ দুক্‌চেটেপনার দরকার কি?'

ভোম্বলের কথার জবাব অবশ্য কেষ্টপদকে আর দিতে হয় না। তার নিজের ভাই চাঁদাই টাকরা আর জিভে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বলে ওঠে, 'ইল্‌লো—দেখিস! বড্ড বড়লোক হয়েছিস যে দেখতে পাই। ঐ চতুব্বাস্‌টে নুচিই তো পড়তে পায় না। কৈ সামনে ধরে দিলে পড়ে থাকতে তো দেখি না কোন দিন। পরম পদাথ্ব করে উঠে যায় যে।.... আর ঘিয়ে ভাজা নুচি কি বাসি হয় নাকি? ও যেদিন পাবে সেদিনই টাটকা।'

ভোম্বল আর চাঁদা পিঠোপিঠি—এক বছরের ছোট-বড়। পিঠোপিঠি বলেই বোধ হয়, দিন-রাত টক্‌রা-টক্‌রি ওদের লেগেই থাকে।

পিঠোপিঠি ভাই-বোনে বা ভায়ে ভায়ে এমন অবশ্য হয়েই থাকে কিন্তু ভোম্বলের এই অকারণ খোঁচা তোলায় বা 'ফুট কাটা'য় সব ভাই-ই তার ওপর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। ওরা কেউই বৌদিকে খুশি করবার এই হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। এই ছাঁদার জন্যে এতদূর আসা তাদের পোষাবে কিনা সে তাদের বিবেচ্য, কিন্তু ভাই-বোনদের অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পেলে বৌদি যে খুশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সুযোগ দেবার জন্য তারা মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল বুড়োর কাছে।

এতকাল পর্যন্ত এবাড়ির ছেলেরা এবাড়ির মেয়েদের সম্পর্ক নির্বিশেষে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। মেয়েদের কাছাকাছি থাকা মানেই সংসারের খাটুনি ঘাড়ে চাপা—এবং অনেক অপ্রীতিকর কথা শোনা। কোন-না-কোন উপলক্ষ ধরে 'খ্যাচ-খ্যাচ' করা তাদের স্বভাব। হয় পড়ার জন্যে—লেখাপড়া হচ্ছে না বলে, নয় চাকরির জন্যে—চাকরি জুটিয়ে নেবার জন্যে তাদের যথেষ্ট উদ্যম দেখা যাচ্ছে না বলে, নয়ত সংসারের কাজের জন্যে—অবিরত খ্যাচ-খ্যাচ তারা করবেই। কিন্তু বুড়োর বৌ এবাড়িতে পা দেবার পর থেকেই সব ধারণা যেন গোলমাল হয়ে গেছে। হঠাৎ ওরা আবিষ্কার করেছে যে, এমন মেয়েও আছে যার সাহচর্য রুচিকর, যার ফরমাশ ভার মনে হয় না বরং সে ফরমাশ খেটে

BanglaBook.org

সুখ পাওয়া যায়, খ্যাচখ্যাচানিও এমন কি মিষ্টি লাগে। সুতরাং তার প্রিয় হবার জন্যে সকলেই উৎসুক, ব্যগ্র। এদের মধ্যে একমাত্র বোধ হয় ভোম্বলই দলছাড়া, তারই বৌদির প্রিয়সাধনে উৎসাহ কম তাই সে এদের এই আকস্মিক উষ্মার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল।

অবশ্য উষ্মা প্রকাশের বা ঝাল ঝাড়ার খুব অবসরও মিলল না। কারণ—কথা যে পাড়ে পাড়ুক, সে তো পাড়ুবে বুড়ো আর ন্যাড়া, সে যখন হয় হবে, আর সে হবেই জানা কথা—এখন সবচেয়ে যেটা বেশি দরকারি সেটা হচ্ছে বৌদিকে শুভ সংবাদটা দেওয়া। তিন-চারজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হৈ-হৈ করে উঠে পড়ল। কেউই মুখে যদিচ খুলে বলছে না, কিন্তু সকলকারই ইচ্ছে বাকি সকলের আগে গিয়ে খবরটা দেবে বৌদিকে।

তবে সে সৌভাগ্য সেদিন বিধাতা ওদের কারও অদৃষ্টেই লেখেন নি। বাগান পেরিয়ে উঠোন পার হয়ে দালানে ঢোকবার মুখেই দেখা গেল ছোটকাকাকে। সে যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, ওদের দেখেই বলে উঠল, 'এই যে! এতক্ষণে গুণধরদের টিকি দেখা গেল।.... এই শোন্ তোরা কেউ গিয়ে বৌমার বাপের বাড়িতে খবর দিয়ে আসবি, কালই বরং ভোরে গিয়ে একেবারে ওর ভাই-বোনদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবি!'

বোধহয় পাথর হতে বাকি আছে ওদের, এমনি আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে। এত জল্পনা-কল্পনা, বুড়োর এত দুশ্চিন্তা ও তার নিরসন, ওদের এত আশা উৎসাহ—সব কি তাহলে মাটি হয়ে গেল! সকলেই যেন বিমূঢ় জড়বৎ দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'কী হল কি তোদের? অমন কাঠ হয়ে গেলি কেন? কেউ কি কোন দিন ওখানে হেঁটে যাস নি?'

'না—তা নয়। ইয়ে—', হাবলা বলে ফেলে, 'বৌদিকে বলা হয়েছে? বৌদি জানে?'

'বৌদির জানাজানির কী হয়েছে এতে?' তেড়ে ওঠে দুর্গাপদ, 'তার অনুমতি চাইতে হবে নাকি?... তোদের যা বলছি শোন, অত কত্তাত্তি করতে ডাকে নি কেউ তোদের! আ গেল যা! আমাকে জেরা করতে এসেছ!.... সে আমি সক্কাল বেলা উঠেই বলে দিয়েছি, তোমার ভাই-বোনদের সব আনিয়ে নিচ্ছি—দুদিন রেখে ছাঁদা দিয়ে ফেরত পাঠাবে, তার আগে নয়... এ তো তার আনন্দের কথা!'

'না তাই বলছি!' অনুচ্চ ক্ষীণকণ্ঠে বলে হাবলা। কিন্তু তারপর—কে যাবে, কখন যাবে সে কথা আর কেউ কিছু বলে না। হঠাৎ সব উৎসাহ যেন তাদের মিইয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একে একে সরে পড়ে তারা।

একেবারে আবার সেই বাগানে নিজেদের 'কোটে' ফিরে গিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করে—অথবা বলা যায় সে মনোভাব যেন ফেটে বেরিয়ে আসে তাদের মুখ দিয়ে।

'ছোট্কার সব তাইতে আগ বাড়িয়ে মুড়ুলি করতে যাওয়া! কর্তামো করা যেন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এ আমাদের ছোটদের ব্যাপার—আমরা যা হয় করতুম! তোমার এত নাক-গলানোর কী আছে! এটুকু কি আর আমরা পারতুম না! সেই তো যেতে হবে সাত কোশ পথ ভেঙ্গে তাদের ঘাড়ে করে নিয়ে আসতে আমাদেরই।... কেন, অত যদি শখ তো নিজেই যাও না!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে সে কথাগুলো বাঁশ বাগানের ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতাতেই আটকে থাকে, চারিদিকের কাঁঠাল জাম কলাগাছের প্রাচীর ভেদ করে ছোট্কার কানে পৌঁছয় না তাই রক্ষা।

পৌঁছবে না তা বক্তারাও জানে।

BanglaBook.org

ক্ষোভ শুধু ওদের মনেই নয়, বিচিত্র জটিল পথে এসে অন্যত্রও কিছু জমা হয়েছিল। সে ক্ষোভের কারণ এমন কিছু স্পষ্ট নয়, ঠিক অভিযোগ করার মতো তো কিছু নয়ই—তবু কোথায় একটা মেঘ জমে উঠল এই তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ করেই।

দালানের মুখে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কে জানে, হয়ত ইচ্ছে করেই দুর্গাপদ গলা একটু চড়িয়ে দিয়েছিল স্বাভাবিক পর্দার চেয়ে। সোজাসুজি শোনানোর দায়িত্ব স্বীকার না করেও যাতে কাজটা সারা যায়—বোধহয় সেই উদ্দেশ্যই ছিল। সুতরাং রান্নাঘরে যারা ছিল তাদের শুনতে কোন অসুবিধা হয় নি। মহাশ্বেতা তখন ছিল না, সেদিন তার ঠাকুরঘরে 'ডিউটি' (এ কথাটা সে সম্প্রতি শিখেছে)। সে সময়ে ছিল মেজ আর ছোট। কথার সূচনাতেই ছোট বৌয়ের হাতের কাজ থেমে গিয়েছিল, সে বেশ মন দিয়েই শুনেছিল কথাগুলো। শুনেছিল মেজবৌও, তাই তরলার হাত থেমে যাওয়ায় তত বিস্মিত হয় নি, সত্যি সত্যিই বিস্মিত হল—যখন ওদিকের কথা শেষ হতেও এদিকে এক জোড়া হাত থেমে রইল। এবার ভাল করে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল প্রমীলা, ছোটবৌ যেন কেমন কাঠ হয়ে উঠেছে, তার দৃষ্টি নত কিন্তু হাতের কাজে আবদ্ধ নয়—কিছু দূরের খালি মেঝেতেই তা স্থির।

মেজবৌ কুটনো কুটছিল, সে বঁটিখানা কাত করে উঠে দালানে এল। দুর্গাপদও কী এক দুর্বোধ্য কারণে তখনও দালান ছেড়ে যেতে পারে নি, সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রমীলা কোন ভুমিকা করল না। দুজনেই দুজনের মনের চেহারা জানে—দীর্ঘকাল ধরে, ভূমিকার কোন প্রয়োজন হয় না আর। সে একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'তুমি একথা আমাদের কাউকে না জানিয়ে একেবারে বৌমাকে গিয়ে বলতে গেলে কেন?'

ঠিক এই ধরনের স্পষ্ট প্রশ্নের জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না দুর্গাপদ। সে একটু চমকে উঠল। উত্তর দিতেও খানিকটা সময় লাগল তার। উত্তর যখন দিল, তখনও খুব ভালভাবে দিতে পারল না, জড়িয়ে জড়িয়ে আমতা-আমতা করেই বলল, 'কেন—মানে—তা তাতে দোষ কি হয়েছে?'

'দোষ হয়েছে বৈকি! আর কী দোষ হয়েছে তা কি তুমিই বুঝতে পারছ না? কুটুমবাড়ির ব্যাপার, তার ভায়েদের আনব কি না আনব সে আমরা বুঝব। তার শ্বশুর আছে, শাশুড়ী আছে—তাদের মত নেওয়া দরকার ছিল, আর বলবার হলে তারাই বলতে পারত—এ ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাবার কি দরকার পড়ল তোমার শুনতে পাই?'

বলতে বলতে ক্রমশ প্রমীলার কণ্ঠস্বর যেন বেশ রূঢ় হয়ে আসে।

এবার কিন্তু দুর্গাপদও ছেড়ে কথা কইল না। এতক্ষণে সে সামলে নিয়েছে নিজেকে। সেও বেশ একটু চড়া সুরেই বলল, 'বেশ তো, তারা বলে নি, না হয় আমিই বলেছি। এর আর ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার কি আছে! আমি কি এ বাড়ির কেউ নই?.... আমিও তো তার শ্বশুর একজন!... আর বেশ তো কথাটা তোমাদের অপছন্দ হয়, মান-মর্য্যেদায় আঘাত লাগবে মনে করো তো—বারণ করে দাও না। এখনও তো কাজটা হাতের বাইরে চলে গিয়ে চুকে-বুকে যায় নি! আমিই না হয় বারণ করে দিচ্ছি।'

'সে যদি বারণ করতে হয় তো আমরাই করতে পারব, তা নিয়ে আর তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।.... আর তুমি শ্বশুর বলেই তো বলছি, তুমি একশোবার বৌয়ের সঙ্গে ছুতোয়-নাতায় কথা কইতে যাও কেন? যদি এতই দরকার মনে করেছিলে—আমাদের কাউকে দিয়েও তো বলাতে পারতে, ছোটবৌও তো ছিল!'

'তাও কি দোষের নাকি?'

BanglaBook.org

একটা ব্যঙ্গের সুরই ফোটাতে চেষ্টা করে দুর্গাপদ, যেন ওদের সঙ্কীর্ণতাকে ধিক্কার দিতে চায়—কিন্তু সে সুর সে ধিক্কার যেন গলায় ঠিক ফোটে না। কেমন বিকৃত শোনায় গলাটা নিজের কানেই।

'হ্যাঁ—দোষের। খুবই দোষের। এ-বাড়িতে এ অঞ্চলে এসব রেওয়াজ এখনও যে হয় নি তা তুমিও জান। তুমি তো কচি খোকা নও, এবাড়িতে কিছু নতুনও আসো নি।... তার নিজের শ্বশুর তার সঙ্গে কটা কথা কয়?'

'ঐ লাও! তোমাদের মনের মধ্যে এত প্যাঁচ তা জানতুম না বলেই—। এত ছিষ্টির কথা উঠবে এই তুচ্ছ কথা থেকে, এমন তিল থেকে তাল হবে জানলে কি আর—!'

কথাটা শেষ করে না দুর্গাপদ, যেন উত্যক্ত বিরক্তভাবেই মেজবৌকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যেতে চায়।

কিন্তু অত সহজে তাকে অব্যাহতি দেয় না প্রমীলা। তেমনি শানিত শীতল কণ্ঠেই বলে, 'প্যাঁচটা কারণে কি অকারণে জন্মেছে তা নিজের মনেই বুঝে দ্যাখো না।... বলি তোমাকে তো আর নতুন দেখছি না, তোমার হাবভাবও আমার কিছু অজানা নেই।... সে যাক গে মরুক গে, কথা বাড়ালেই বাড়বে, বয়স হচ্ছে—এখন একটু বুঝে সমঝে চলো, ব্যাগত্তা করি!'

এই বলে, আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই প্রমীলা আবার যখন রান্নাঘরে ফিরে আসে তখনও তরলা তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে।

'ও কি লো! এখনও অমনি করে বসে আছিস! চচ্চড়ি যে ধরে উঠল, নাড়, নাড়। এতগুলো লোকের কুঁড়ে-পাতর উঠবে কি দিয়ে! সত্যি-সত্যিই আঙুলঠেলায় ভাত নামাবি নাকি? কী এত ধ্যান করছিলি এতক্ষণ ধরে?'

অপ্রতিভ তরলা তাড়াতাড়ি চচ্চড়ির কড়ায় চাপা দেওয়া বড় কাঁসিখানা খুন্তির ডগা দিয়ে উল্‌টে দেয়।

সত্যিই নিচের দিকটা তখন ধরে উঠেছে। গন্ধটা ঢাকতে তাড়াতাড়ি খানিকটা কাঁচা তেল ঢেলে দেয় সে।

॥ ৪ ॥

আঘাতটা এল একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই। কেউ প্রস্তুত ছিল না। সেদিন শনিবার—সকাল করেই ফেরার কথা সকলের, মেজ-ছোট ফিরলও যথাসময়ে, ফিরল না খালি অভয়পদ—বড়কর্তা। যে লোকটা ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক তিনটেতে বাড়ি এসে হাজির হয় অন্য শনিবারে—সে আসছে না, কোন খবরও দেয় নি, ভাবনার কথা বৈকি। তবু প্রথমটা এক মহাশ্বেতা ছাড়া কেউ তত ভাবে নি। কিন্তু যখন সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল, পাড়াঘরে শাঁখ বাজল আলো জ্বলল, ওদের ঠাকুরঘরেও আলো দিয়ে গেল ওদের খুড়তুতো জা—তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠল।

মেজকর্তা আর স্থির থাকতে না পেরে তার চিরাভ্যস্ত হিসাবের খাতা ফেলে (অফিস থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়েই এই খাতা নিয়ে বসা তার অভ্যাস) বাইরের রকে এসে দাঁড়াল—অন্ধকারে যতটা দৃষ্টি যায় প্রাণপণে বিস্ফারিত চক্ষু মেলে চেয়ে রইল ওদের বাড়ির মোড়ে ছোট্ট পুকুরটার দিকে। এলে ঐ পথ দিয়েই আসবে।.... ছোটকর্তা দুর্গাপদ এর আগে থেকেই ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছে আর পায়চারি করছে। সকলের মুখেই উদ্বেগের ছায়া। মহাশ্বেতা বিকেল থেকেই ঘরবার করছিল, এখন—এদেরও এই দুশ্চিন্তা লক্ষ করেই সম্ভবত—উপরি উপরি বাগানে যেতে লাগল। মেজবৌ বেগতিক দেখে রান্নাঘরের ভার

BanglaBook.org

তরলা আর তড়িতের ওপর ছেড়ে দিয়ে বড় জায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তারও মুখ শুকিয়ে উঠেছে এতক্ষণে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—মহাশ্বেতার সঙ্গে সঙ্গে কারও থাকা দরকার, কোথায় পড়ে মরবে, কি হবে!

শেষে যখন কুণ্ডু বাবুদের কাছারির ঘড়িতে নটা বেজে গেল তখন আর মহাশ্বেতা স্থির থাকতে পারল না। ছেলেরা ভেতরের দালানের যেখানটায় বসে জটলা করছিল সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদ্‌মা বলতেন না যে, যে আঁটকুড়ো হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে— তা তাই হয়েছে আমার! সর্বনাশ হবে বলে ছেলেগুলোকেও ভগবান পাঠিয়েছেন এক একটি পাঁঠা করে!.... মুয়ে আগুন তোমাদের! বাপ এখনও আসছে না, তা একটা ভাবনা-চিন্তেও কি থাকতে নেই তোদের?... —হ্যা হ্যা করে বত্তিশপাটি দাঁত মেলে হাসছেন আর ইয়ার্কিবোটকেরা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! .... ওরে এটা জেনে রাখিস—গেলে আর কারুরই কিছু হবে না, তোদেরই মুখে ভাত ওঠা বন্ধ হবে। খেতে পাবি না, রাস্তার ধারে গামছা পেতে বসে ভিক্ষে করতে হবে —এই বলে রাখলুম, তাও জুটবে না!'

কতকটা কেষ্টকে উদ্দেশ্য করেই বলা, সে-ই সামনে ছিল, অকস্মাৎ এই তাড়া খেয়ে সে একটু দিশাহারাই হয়ে উঠল। বলল, 'বা রে! তা আমাকে খিঁচোচ্ছ কেন, আমি কি করব?'

'কি করবি তার আমি কি জানি!.... দ্যাখ্ খোঁজ নিয়ে মানুষটা কোথায় গেল। তার আপিসেই নয়ত যা একবার! ইস্টিশনে দেখগে যা, থানায় খবর নে। আমি মেয়েছেলে, আমি বলে দেব কি করবি তোরা?..... তোদেরই তো গরজ! আর কার মাথাব্যথা আছে যে ছুটোছুটি করবে? গেলে তোদেরই যাবে—আর কারুর নয়, এটা মাথায় ঢুকছে না গব্‌ভছেরাবের দল! মুখে আগুন তোমাদের। জ্যান্তে নুড়ে-জ্বেলে দিত হয় তোমাদের মুখে! যত রেলে গলা দেওয়া মড়া, খালে ডোবা ভাগাড়ের মড়া কি আমার পেটে এসে জুটেছে গা!'

এবার মেজকর্তা ওকেই ধমক দিয়ে ওঠে।

'বলি আপিসে গিয়ে কি করবে শুনি? সে তো বন্ধ হয়ে গেছে সেই বেলা একটায়। এতক্ষণে দারোয়ানরা সুদ্ধ ফটক বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। সেখানে যাবার হলে আমরাই যেতুম। আজ আটমাস ওপর-টাইম বন্ধ আর সে ওপর-টাইম থাকলেও এতক্ষণে বন্ধ হয়ে যেত।.... দেখি আর একটু, তারপর বেরোতে হবে বৈকি। থানা হাসপাতালে সব জায়গাতেই খবর নিতে হবে।... সে আর ওরা কি নেবে? থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে কথা কইতে পারবে কি হাসপাতালে গিয়ে খবর নেবে—তেমনভাবে কি মানুষ করেছ ছেলেদের?'

ধমক খেয়ে মহাশ্বেতা অনেকটা নরম হয়ে আসে। বলে, 'বেশ তো, ওদিকে যেতে না পারুক, পিসির বাড়ি মামার বাড়িও তো খবর নিতে পারে! সেখানে কারও কোন বিপদের খবর পেয়েই সোজা চলে গেল কিনা তাই বা কে জানে। এমন যে এর আগে যায় নি মানুষটা—তাও তো নয়।.... যা হোক একটা খবর নিক—ঠুঁটো করে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এমনি পর রাত?'

পাগল-ছাগল যা-ই হোক, মহাশ্বেতার এ কথায় যুক্তি আছে তা মেজকর্তাকেও মানতে হয়। সে তখন ন্যাড়া আর নিজের বড় ছেলেকে পাঠায় বড় বোনের বাড়ি। বুড়ো আর হাবলা যায় শ্যামা-ঠাক্‌রুনের ওখানে। আরও যা দু-একটা সম্ভাব্য জায়গা আছে—নিকট-আত্মীয়দের বাড়ি—সেখানেও পাঠানো হয় দুজন দুজন করে। অনেক রাত হয়েছে, চাপা অন্ধকার রাস্তা—একা কারুর পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

কিন্তু এদের পাঠিয়ে দিয়ে যেন যন্ত্রণা আরও বাড়ে। এতবড় বাড়িটা যেন খালি হয়ে গেছে একেবারে; নিজেদের উদ্বেগের জন্যেই হয়ত আরও—থম থম করছে। সেইটেই বেশি ভয়াবহ লাগছে। বাইরে এরা দুভাই নিঃশব্দে পায়চারি করছে, ভেতরে রান্নাঘরে তিনটি মেয়েছেলে যেন এক জায়গায় ডেলা পাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে। ছোটর দল প্রায় সবাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কথা কইবার কি শব্দ করবার মতো কেউ আর নেই। শুধু আপস-তাপস করে বিলাপ করছে মহাশ্বেতা একা। কিন্তু এই শব্দহীন প্রকাণ্ড বাড়িটায় নিজের গলাই যেন বেখাপ্পা রকমের তীক্ষ্ণ আর তীব্র শোনাচ্ছে, কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম নিজের কাছেই কটু কর্কশ মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারও কথা বন্ধ হয়ে গেল এক সময়ে —বোবা ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে চুপ করে বাইরের রকের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল শুধু।.....

অবশেষে, দশটা বেজে যাবারও পরে, ওদিকের রাস্তায় একটা পায়ের শব্দ উঠল যেন। খুব আস্তে কে যেন একটা চটিজুতো টেনে টেনে আসছে। সেই ক্ষীণ শব্দ এবং ঘাসের ওপর শুকনো পাতা পিষ্ট হবার ক্ষীণতর শব্দে বোঝা গেল কোন মানুষই আসছে। অন্য সময় হলে এ আওয়াজ কানে লাগত না—বর্তমানে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার জন্যই শুনতে পেল এরা।

আশা করার মতো এমন কিছু অবলম্বন নয় এটা আরও অনেক লোক হতে পারে। যে-সব ছেলেরা বেরিয়েছে তাদেরও কেউ ফিরে আসা বিচিত্র নয়, তবু, এত মৃদু পদক্ষেপের শব্দই কে জানে কেন এদের মনে হয়—অভয়পদই আসছে।

আবার পরক্ষণেই মনে হয়—এত আস্তেই বা সে আসবে কেন?

মানুষটা শান্ত ধীর চলনবলনও সে রকমই —তাই বলে এমন নির্বীর্য ধরনেরও তো নয়। তার ভারী পায়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এরা সকলেই শুনে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে এ পা ফেলার তো কোনই মিল নেই। তবে—!.....

যেটুকু শব্দ উঠেছিল, সেটুকুও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল ক্রমশ। যেন সেই অপরিমাণ শব্দহীনতার সমুদ্রে এক বিন্দু শব্দ—এক বিন্দু জলের মতোই মিলিয়ে গেল।

তবে কি ওরা ভুল শুনল?

ছোটকর্তা আর চুপ করে থাকতে পারল না, ঘরের মধ্যে থেকে হ্যারিকেনটা টেনে নিয়ে অধীরভাবেই নেমে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল।

হ্যাঁ অভয়পদই তো বটে।

কিন্তু এ কোন অভয়পদ? যে অভয়পদকে জন্মাবধি দেখে আসছে তারা—এ যে তার প্রচণ্ড ব্যতিক্রম! অভয়পদের শ্রান্তি বা অবসাদ বলে যে কিছু আছে তা তো তারা জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত কখনও দেখে নি। অথচ—

ওদের বাড়ি ঢুকতেই মজুমদারদের ছোট্ট পুকুরটা—তারই কোণাচে একফালি বাঁধা ঘাটের ওপরের পৈঠেটায় চুপ করে বসে আছে অভয়পদ। কিন্তু সে সাধারণ বসে থাকা নয়—কোন অপরিসীম শ্রান্তিতে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে সে। ওর এ রকম অবসন্নভাবে বসে পড়া কিছুতেই স্বাভাবিক কোন কারণে সম্ভব নয়। তাছাড়া—লণ্ঠনের ম্লান আলোতে স্পষ্ট চোখে পড়ল—কে যেন ওর সারা মুখে এক পোঁচড়া কালি ছিটিয়ে দিয়েছে—এমনই কালো হয়ে উঠেছে তা। এত দুঃখ-কষ্টেও, এমন দুঃসহ জীবনসংগ্রামেও যে মুখের সুশুভ্র বর্ণাভা সম্পূর্ণ ম্লান করতে পারে নি—সেই মুখ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এমন কালো হয়ে উঠল কি করে?

'এ কি কাণ্ড! দাদা—কী হয়েছে কি তোমার? রাস্তায় পড়ে-টড়ে গিছেলে নাকি? কোন য়্যাকসিডেন্ট হয় নি তো?'

একটা চাপা আর্তনাদের মতো আওয়াজ করে ছুটে কাছে যায় দুর্গাপদ। আলোটা তুলে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে—কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নজরে পড়ে কি না।

সে আর্তনাদ এবং সেই দ্রুত উদ্বিগ্ন প্রশ্নের শব্দ ওদের কানেও পৌঁচেছিল। এরাও ছুটে কাছে এল। রান্নাঘর থেকে তরলা-তড়িৎ ওরাও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সকলেরই মনে এতক্ষণ ধরে যেটা বড় হয়ে ছিল সেটা এই দুর্ঘটনারই ভয়—প্রাণপণে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করার ছলে সেই আশঙ্কাটাকেই লালন করছিল এরা—এবার সেইটে সর্ববাধামুক্ত হয়ে তার সম্পূর্ণ, বীভৎস চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—সেই সম্ভাবনাটাই সমর্থিত হয়েছে দুর্গাপদর অস্ফুট আর্তনাদে—কী হয়েছে, কতটা হয়েছে, কী দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত, সেইটেই এখন বড় প্রশ্ন। কাছে এলেও তাই সামনে গিয়ে ভাল করে দেখবার সাহস নেই কারও, বুক কাঁপছে, পায়ের জোর গেছে ফুরিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেই তরলার মাথা ঘুরে উঠেছিল। সে কোনমতে রকের ধারের লোহার সরু থামটা ধরে সামলে নিলে নিজেকে কিন্তু মহাশ্বেতা আর পারল না। সে একবার চকিতে অভয়পদর দিকে চেয়েই 'বাবা গো' বলে ঘাটে ওঠবার পথে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল।

ভয় দুর্গাপদরও কম হয় নি। কিন্তু তার ভেঙ্গে পড়লে চলে না বলেই সে সামনে এসে লণ্ঠনটা তুলে ভাল করে দেখল।

না, আঘাতের কোন চিহ্ন কোথাও নজরে পড়ে না। পায়ের দিকগুলোও ভাল করে দেখল দুর্গাপদ। সেখানেও কোন গোলমাল নেই। এ আর কিছু, আঘাত ছাড়া এমন চেহারা হবার কোন্ কারণ থাকতে পারে,—সেই কথাটা একসঙ্গেই যেন সকলের মনে পড়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যেটা।

তবে কি কোন খারাপ খবর আছে? কারও কোন অসুখ-বিসুখ করেছে?

নাকি মারাই গেছে কেউ?

প্রশ্ন করতে যেন সাহসে কুলোয় না কারও। সকলেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। এরই মধ্যে ক্ষীরোদা কখন উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কেউ লক্ষ করে নি। তিনি সন্ধ্যা হলেই শুয়ে পড়েন প্রত্যহ—আজও পড়েছিলেন। ঘুম আসে না তাঁর অত সকালে কোনদিনই—কিন্তু জেগেও থাকতে পারেন না। ঝিমিয়ে থাকেন। তারই মধ্যে এদের সকলের খাওয়া হলে ছোট বৌ একটু দুধ খাইয়ে যায়, কিংবা ঘরে থাকলে তার সঙ্গে একআধটা মিষ্টি। সামান্যই খান—তবু সেটুকু না পেটে পড়া পর্যন্ত নাকি ওঁর পাকা ঘুম আসে না। সেটা অবশ্য অন্যদিন ঢের আগেই হয়ে যায় কিন্তু আজ তাঁকে দুধ খাওয়ানোর কথা এদের কারও মনে পড়ে নি। আরও মনে হয় নি কারণ এদেরও তো খাওয়া হয় নি তখনও পর্যন্ত।

ঘুম তো হয়ই নি—অন্যদিনের মতো ঝিমিয়েও থাকতে পারেন নি পুরোপুরি। কারণ সন্ধ্যা পর্যন্ত অভয়পদ ফেরেনি তা তিনি শুতে যাবার আগে শুনে গেছেন। নিথর হয়ে পড়ে থাকলেও মনটা সজাগ ও সক্রিয় ছিল। তাছাড়া বয়স যতই হোক —কান দুটো তাঁর এখনও খুব পরিষ্কার আছে। এধারের এই সামান্য আওয়াজ—দুর্গাপদর অস্ফুট উদ্বিগ্ন উক্তি এবং এদের খালি পায়ে দৌড়ে যাবার মৃদু শব্দও কানে গেছে ওঁর। তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন নি। উঠে বাইরে এসেছেন অন্ধকারেই। হাতড়াতে হাতড়াতে সেইভাবেই ঘর থেকে দালানে, দালান থেকে রকে পড়েছেন, তখনও কেউ দেখতে পায় নি। কিন্তু রক থেকে নিচে মাটিতে পড়বার সময়ই হুড়মুড় করে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেলেন।

এবার সকলে সচকিত হয়ে উঠল। মেজকর্তা দাদার কাছেও যেতে পারে নি—রকেও থাকতে পারে নি—ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল —সে ছুটে

BanglaBook.org

এসে তাড়াতাড়ি মাকে টেনে তুলল, 'এ কী কাণ্ড, তুমি আবার এমন করে আসতে গেলে কেন? আমরা কি আর খবর দিতুম না?.... ডাকলেও তো হ'ত কাউকে! ... দ্যাখো দিকিনি কী মুশকিল বাধালে। হাত-পা ভাঙ্গল কিনা—। এই বয়সে হাড় ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগবে?'

অম্বিকাপদ তিরস্কার করতে থাকে।

ততক্ষণে তড়িৎ দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লম্পটা নিয়ে এসেছে। দুর্গাপদও হ্যারিকেন নিয়ে এদিকে ফিরেছে।

যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলেও ছেলের হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলেন ক্ষীরোদা। বললেন, 'না, না, ও কিছু না। কিন্তু অভয়ের কী হল তাই বল্ না আগে। তার হল কি? সে কোথায়? বেঁচে আছে তো?

মায়ের এই আকুল প্রশ্ন কানে যেতেই বোধহয় অভয়ের সম্বিৎ ফিরল। সে পুকুর পাড় থেকে উঠে এসে তাড়াতাড়ি মাকে ধরল, হাত ধরে সাবধানে রকে বসিয়ে দিল।

ক্ষীরোদার হাত-পা বা হাড়-গোড় কিছু ভাঙ্গে নি কিন্তু লেগেছে খুব। বাঁপাটা বিশ্রীভাবে মচকে গেছে। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যাচ্ছে বার বার। তবু সেই ঝাপসা চোখেই, হ্যারিকেন ও লম্পর মিলিত আলোকে প্রাণপণে বড় ছেলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর, এদের যে কথাটা মাথায় যায় নি এতক্ষণ, অথবা যে প্রশ্নকে মনে মনে প্রশ্রয় দেবারও সাহস হয় নি, সেই প্রশ্নই খুব সহজভাবে করে বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমার কাছে নুকুস নি—তোর কি চাকরি গেছে?'

প্রশ্নটা শুনেই এরা চমকে উঠল। তবু, তখনও বোধ করি উত্তরটা শোনবার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। অভয়পদকে এভাবে কথা কইতে কেউ কখনও শোনে নি। সে প্রাণপণে সহজ হবারই চেষ্টা করল, খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বলতে গেল কিন্তু গলা কেমন যেন কেঁপে বিকৃত হয়ে উচ্চারণগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে গেল। সে মার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'না, চাকরি যায় নি, তবে বহু টাকা ডুবেছে। বাকি জীবনটা—যদি আরও বিশ-পঁচিশ বছরও বাঁচি—রোজগার করেও এর অর্ধেক হাতে পাব না। এতগুলো টাকা কখনও একসঙ্গে দেখব তা-ই কোন দিন মনে করি নি।... নিজের বুদ্ধির দোষে সেই সব টাকাই ক্ষুইয়ে এলুম।'

সকলেই নির্বাক। কি টাকা, কিসের টাকা প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। টাকার অঙ্কটা না জানা থাকলেও সে যে কীভাবে টাকা খাটায় অফিসে তা এতদিনে এ বাড়ির সকলেই জেনেছে।

বুঝেছে সবাই—মহাশ্বেতা ছাড়া। অভয়পদর সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে এসেছে পুকুর ধার থেকে, ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে সে, কথাগুলো শুনতে বোধ হয় কোন অসুবিধা হয় নি—শুধু তাদের শব্দগত অর্থটা যেন এখনও হৃদয়ঙ্গম হয় নি তার। অথবা সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সেও সকলের মতোই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তবে তার চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে মনে হতে লাগল যে যা শুনেছে তার একবর্ণও মাথায় ঢোকে নি।

অভয়পদ এবার মেজভাইয়ের দিকে চাইল। বলল, 'তুমিই ঠিক বলেছিলে খোকা, অতি লোভ করতে গিয়েই সর্বস্ব গেল! সবটাই ডুবল একেবারে। শুধু তাই নয়—টাকাটা সব আমারও ছিল না তো—বেশির ভাগই পরের টাকা খাটছিল—এর, আমার শাশুড়ীর, আরও দুএকজন বন্ধুবান্ধবের। সে দেনাও আমাকে শোধ করতে হবে কিনা কে জানে—তারা তো আমাকে দেখেই দিয়েছিল! কিন্তু সে তো আমি আর এ জন্মে পেরে উঠব বলে মনে হচ্ছে না।... ওঃ!'

BanglaBook.org

এবার আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না কোথাও।

'কী সর্বনাশ। য়্যাঁ!' বলে একটা শব্দ করে অম্বিকাপদ সত্যি-সত্যিই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রকে। টাকা তার নয়, সে ঘর থেকেও বার করে দেয় নি—তবু সে তো জানে তাদের ঘরে একটি টাকা সঞ্চয়ের জন্যও কী প্রাণপণ এবং মর্মান্তিক প্রয়াস করতে হয়। টাকা যারই হোক, বহু দুঃখের টাকা তাতে কোন সন্দেহ নেই। টাকা এমন কি শত্রুর লোকসান যাচ্ছে শুনলেও বুকে বাজে, এ তো নিকট-আত্মীয়ের টাকা। বিশেষত দাদাকে তারা চেনে—তার সারা জীবনটাই তো সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস। নিজেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করা পয়সা তার। এর একাংশও যদি নিজের ভোগসুখের জন্য ব্যয় করত তো এদের বোধহয় এতটা কষ্ট হত না। এই সংবাদটা তাই অম্বিকাপদর নিজের টাকা খোয়া যাবার মতোই বাজল।

এবার মহাশ্বেতাও বুঝেছিল নিঃসংশয়ে। সর্বনাশের পরিমাণটা এত তাড়াতাড়ি হিসাব করা সম্ভব নয়—তবু মোটামুটি আব্‌ছা আব্‌ছা একটা ধারণা করতে পারল বৈকি! আর তাই তো যথেষ্ট। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল একেবারে, মড়াকান্নার মতো। এই গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে এই কান্নার শব্দ উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। এখনই পাড়াপড়শীরা জেগে উঠবে, কী হয়েছে সেই কৌতূহলে ছুটে বেরোবে সবাই এবং সংবাদটা শুনে মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরবে। এ সবই জানা কথা। সকলেরই জানা। বাঁধা ছকের ব্যাপার। মহাশ্বেতারও অজানা নয়, মাথার ঠিক থাকলে সেও এ-কান্নার ফলাফল বুঝতে পারত। কিন্তু তার কাছে তখন এত বিবেচনা আশা করা যায় না। মেজবৌও তাকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল না, 'চুপ! চুপ!' করে তার মুখে নিজের আঁচলেরই খানিকটা গুঁজে দিয়ে একরকম টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

তার এই সময়োচিত সতর্কতায় বাকি সকলেরও জ্ঞান হল।

'চল চল, যা হবার তা তো হয়েছেই—এখন ভেতরে চল।'

দুর্গাপদ একরকম সকলকে তাড়িয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল। ক্ষীরোদাকে অভয়পদই ধরে ধরে এনে শুইয়ে দিলে আবার।

সে রাত্রে কারও খাওয়া হল না। শুধু তড়িৎকে জোর করে দুগাল খাইয়ে দিলে মেজ বৌ। মহাশ্বেতা প্রথম কান্নার বেগটা সামলাবার পর অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল, তারপর—সর্বনাশের পরিমাণটা সম্পূর্ণ জানা হয়ে গেলে, যখন আর সন্দেহ বা আঁকড়ে ধরবার মতো এতটুকু আশা কোথাও অবশিষ্ট রইল না তখন—ঢিব্ ঢিব্ করে মাথা খুড়ে বুক চাপড়ে রক্তগঙ্গা করে তুলল একেবারে।

বলল অভয়পদই। সে এবার অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে, আগেকার অবিচলিত প্রশান্তি ফিরে না পেলেও কথাবার্তা সহজ হয়ে এসেছে বেশ। অম্বিকাপদর প্রশ্নের উত্তরে সবই খুলে বলল সে।

না, আশা বলতে আর কোথাও কিছু নেই। যে দুটি সাহেব ওর কাছ থেকে নিয়মিত ধার নিত তাদের দুজনেই দেওয়া নেওয়া করতে করতে অনেক টাকা বাকি ফেলে দিয়েছিল। শুধু অভয়পদর কাছেই না—আরও অনেকের কাছেই। এরা আগে কেউ কাউকে কিছু বলে নি। শেষে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে দেওয়াটা যখন অনেকদিন ধরে বন্ধ হয়ে রইল তখন সকলেই সজাগ হয়ে উঠল। তখন জানাজানি হয়ে সকলেই প্রমাদ গুনল, কারণ টাকার পরিমাণ ভয়াবহ। এখানে এই চাকরি করে সে ঋণ শোধ করা যায় না। যারা যারা ধার দিয়েছিল তারা বিপদ বুঝে ওপরওলা সাহেবদের কাছে গিয়ে পড়ল। সেটাই হল আরও ভুল। তাঁরা ওদের হাঁকিয়ে দিলেন, শাসালেন যে এরকম অমানুষিক সুদে যারা টাকা

BanglaBook.org

খাটায় তাদের প্রতি কোন সহানুভূতিই নেই তাঁদের—ওরা বারদিগর ঐ টাকার কথা মুখে আনলে পুলিশে খবর দেবেন তাঁরা। আর খাতকদের গোপনে বলে দিলেন যে, 'তোমরা যে কাণ্ড করেছ, এর পর আর তোমাদের চাকরিতে বহাল রাখা সম্ভব নয়, এদেরও বেশিদিন সামলে রাখা যাবে না। তোমরা অপমানিত হলে আমাদের সকলেরই অপমান। তার চেয়ে এইবেলা মানে মানে সরে পড়ো—clear out! নইলে শেষ অবধি তোমাদের জবাব দিতে বাধ্য হবো।'

তাঁদের এ উপদেশের কথা অভয়পদরা কিছুই জানত না। হঠাৎ একদিন শুনল যে দুজনের একজন বোম্বাইতে চলে গেছে—বলে গেছে সেখানে কে দেশের লোক আছে আত্মীয়—তার কাছ থেকে টাকা এনে এখানকার দেনা শোধ করবে। আর একজন এখানেই ছিল, সে সময় নিয়েছিল গতকাল পর্যন্ত। গতকালই রাত্রে সে আত্মহত্যা করেছে। তার নাকি দেশেও এই অবস্থা—সেখানেও মুখ দেখাবার উপায় নেই। তাছাড়া সে নানা কৌশলে নাকি তার প্রভিডেন্ট ফান্ডেরও বেশির ভাগ টাকা বার করে নিয়েছে—অবলম্বন বলতে তার আর কোথাও কিছু ছিল না।

সকালে অফিসে গিয়ে এই খবর শুনেই ওরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল, এইমাত্র সন্ধ্যাবেলায় আরও খবর এল—সে সাহেবটিও বোম্বে থেকেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পাওনা টাকাকড়ি সব চুকিয়ে নিয়ে নিরাপদে বিলেতে রওনা হয়ে গেছে। তাকে আর ধরা-ছোঁওয়া যাবে না কোন রকমেই।

সব ইতিহাস শুনে আর একদফা নিথর হয়ে রইল সবাই। শেষে অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করে অম্বিকাপদ প্রশ্ন করল, 'তোমার—মানে তোমার হাত দিয়ে কত গেল দাদা, সবসুদ্ধ? হিসেব আছে কিছু?'

'আছে বৈকি।' বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল অভয়পদ, 'প্রায় সাত হাজার টাকা।'

'সা-ত-হা-জা-র!' দম বন্ধ হয়ে আসে যেন অম্বিকাপদর, অতিকষ্টে টেনে টেনে অক্ষর কটা উচ্চারণ করে সে।

দমবন্ধ হয়ে আসে উপস্থিত সকলেরই। অঙ্কটা তাদের ধারণার অতীত, অবিশ্বাস্য। খানিকটা চুপ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অম্বিকাপদ কতকটা আপনমনেই বললে, 'গেল সপ্তাহে আমার ভায়রাভায়ের এক মামা একখানা দোতলা কোঠাবাড়ি বিক্রি করলে—হাওড়া খুরুট রোডের ওপর—সাড়ে ছ হাজার টাকায়। বাড়িটায় ভাড়া ওঠে প্রায় চল্লিশ টাকার মতন!'

আরও একবার বুক চাপড়ে হাহাকার ক'রে ওঠে মহাশ্বেতা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

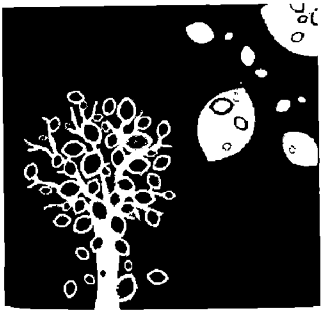

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

খবরটা স্বর্ণলতাকে হরেনই এনে দিলে। কথাটা অভয়পদর অফিস থেকে শুনে এসেছিল হরেনের এক ভগ্নিপতি, সে আবার একদিন কী কাজে এসে শুনিয়ে গেল ওকে! সেদিন অবশ্য হরেন কিছু বলে নি—পরে একটা শনিবার দেখে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, সেখান থেকে পাকা খবর শুনে এসেছে। চোখে দেখেও এসেছে অবস্থাটা। বললে, 'তোমার বাবাকে আর চেনা যায় না। অমন সাজোয়ান পুরুষটা কদিনেই যেন এতটুকু হয়ে গেছেন! সামনে ঝুঁকে পড়েছেন একেবারে। মেজ কাকীমার মুখে শুনলুম—খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন সব। এমনি তো কিছু খাওয়া ছিলই না—দুবেলা দুমুঠো ছাড়া; জীবনে নাকি জলখাবার কাকে বলে তা জানেন না, বাড়িতে যজ্ঞিটজ্ঞি হলে যখন বাড়িতে মিষ্টির এউঢেউ চলে তখনও নাকি কেউ কোন দিন সকালে বিকেলে একটা খাওয়াতে পারে না কখনও, ঐ যা করে দুবেলা ভাতপাতে;—তা সে ভাতও এমন কমিয়ে দিয়েছেন যে ওঁরা সবাই ভয় পেয়ে গেছেন, সে খাওয়া খেয়ে মানুষটা বাঁচবে কী করে। অথচ যেমন অফিস-ঠেলা তা তো ঠিকই আছে; হাঁটারও কমতি নেই—বিকেলে নাকি ফেরেন মড়ার মতো নির্জীব হয়ে।.... মেজ কাকী বলছিলেন যে মানুষটা যেন আত্মহত্যা করছে একেবারে!'

'তা ওরা জোর করে খাওয়াতে পারছে না? মা কী করছে? আড় হয়ে পড়তে পারছে না খাওয়ার সময়?'

স্বর্ণলতা বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'সেই তো হয়েছে আরও মুশকিল! মা নাকি এর ওপরও সামনে হাহুতাশ ক'রে যাচ্ছেন—ঐ টাকার জন্যে, ওঁকে যা-নয়-তাই শোনাচ্ছেন দুবেলা! ঐ সামান্য খাওয়া—তাও এক একদিন নাকি খেতে পারেন না মার বাক্যি-যন্ত্রণায় আর চেঁচামেচি কান্না-কাটিতে। ওঁর পাতের সামনে এসে টিপটিপ ক'রে মাথা খুঁড়লে কি কেউ খেতে পারে বসে? অথচ ওঁর যত কান্না আর যত মাথাখোঁড়া নাকি সেই সময়েই। এমন অবুঝ, কেউ বললেও বুঝতে পারেন না যে অনিষ্টটাও ওঁরই হচ্ছে!... তোমার দিদিমা নাকি পইপই ক'রে বারণ করেছিলেন—মা শোনেন নি, নিজের গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে দিয়েছিলেন বাবাকে—সেই হয়েছে ওঁর আরও বেশি জ্বালা, কেবল বলছেন যে শত্রু হাসল। টাকার শোকের চেয়েও ঐটে বড় হয়ে উঠেছে।...নিজের মা নাকি ওঁর শত্রু—বোঝো ঠেলা।'

হরেন হাসে কিন্তু স্বর্ণলতা হাসতে পারে না। সে মাকে চেনে। কী যে করছে মহাশ্বেতা—কী পমিাণ চেঁচাচ্ছে আর তুড়িলাফ খাচ্ছে তা সে এখানে থেকেই বলে দিতে পারে। মানুষটা চিরকালের নির্বোধ, নিজের ভালমন্দ ভবিষ্যৎ কখনও দেখতে পায় না

BanglaBook.org

চোখে। যেটা একেবারে প্রত্যক্ষ, সেটাও না। অভয়পদর কিছু হলে ওর কি হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—কী অবস্থা হবে সংসারের—ঐ একপাল মুখ্খুকে খাওয়াবে কোথা থেকে তা একবারও ভাববে না মহাশ্বেতা, সে লোকই নয়। এখন—এই এত বড় লোকসানটার পর বরং আরও বেশি ক'রে যত্ন করা দরকার তাও বুঝবে না সে। বোঝাতে যাওয়াও বিপদ। দরকার হ'লে ওর গলার ওপর গলা চড়াতে পারে এক মেজ কাকী—তা সে কিছু বলতে গেলে উল্‌টো উৎপত্তি হবে। ওরাও তো শত্তুর!

কী হচ্ছে বাড়িতে—তা যেন এখানে বসেই স্পষ্ট দেখতে পায় স্বর্ণ। তার দুই চোখে জল ভরে আসে। বলে, 'আমি যাই একবার, কদিন থেকে আসি গে।... দুবেলা দুমুঠো ভাত, তাও যদি এমন করে ছেড়ে দেয় তাহ'লে সত্যিই বাঁচবে না বাবা। আর কেউ খাওয়াতে পারবে না, আমি ছাড়া। আড় হয়ে পড়তে হবে, নিজে অন্নজল ত্যাগ করতে হবে—তবে খাবে। আমি গিয়ে অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা দিন খাইয়ে আসি সামনে বসে, তারপর বরং বৌদিকে শিখিয়ে দিয়ে আসব—সেই খাওয়াবে অমনি জোর করে। বৌদিকেও বাবা ভালবাসে মেয়ের মতো, মুখে কিছু না বললেও সেটা আমি বুঝি। কিন্তু সে তো কিছু জানে না, ছেলেমানুষ, অত বড় বড় শাশুড়ীদের সামনে সে আর কি বলবে, তাকে শিখ্‌কে পড়িয়ে আসতে হবে। প্রথমটা আমি না গেলে চলবে না। যাবো? পাঁচসাতটা দিন?'

উৎসুক মিনতিভরা কণ্ঠে বলে স্বর্ণ।

হরেনের মুখ কিন্তু গম্ভীর হয়ে ওঠে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তুমি যাবে—তারপর? এধারে?'

মুখ ম্লান হয়ে যায় স্বর্ণর।

'কোনমতে উপায় হয় না—হ্যাঁ গো?'

'উপায় কি আর হবে বল। এক উপায় আমার বসে বসে হাঁড়ি-ঠেলা। এই গুষ্টির হাঁড়ি ঠেলা কি সোজা কথা! আপিস তো আছে, আটটায় বেরোতে হয়—দেখতেই তো পাচ্ছ!... তা ছাড়া ওখান থেকে বলে পাঠায় নি, কেউ নিতে আসে নি—মা কি পাঠাবে?'

এবার স্বর্ণ একটু রাগ করে।

'কেউ নিতে আসে নি—বড্ড অন্যায় কথা বটে। কিন্তু এলেই কি তোমার মা পাঠান হুট্ বলতে? এই তো ছোট ভাইটার পৈতে গেল—তাও যেতে পেলুম না। তোমাদের সংসার নিয়েই পড়ে থাকতে হ'ল।...বাপের অসুখ, বাপ যদি মরেই যায়—একবার দেখতে যেতে পাবো না? কেন, আমি কি কইদী নাকি? তাও জেলখানার কইদীরাও তো এক-আধবেলা ছুটি পায় শুনেছি!'

'অতশত আমি জানি না!' হরেনও একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'পারো মাকে ব'লে যাবার হুকুম করিয়ে নাও গে। আমি বলতে-টলতে পারব না।... আমরা না হয় হোটেলে-টোটেলে খেলুম, রাত্রে বাজারের খাবারও খেতে পারি—কিন্তু মার কি ব্যবস্থা করব? তাহ'লে তাঁকে কদিনই দই চিঁড়ে খেয়ে থাকতে হয়।'

স্বর্ণ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তা তিনি কি কটা দিনও চালাতে পারবেন না? এককালে তো সবই করেছেন একহাতে—'

'সে যখন করছেন তকন করেছেন, মানুষের শরীর কি চিরদিন সমান যায়? এখন যদি শরীরে না বয় তাঁর—তো কি চাবুক মেরে চালাবে?'

হরেন রাগ ক'রে উঠে চলে যায়।

উত্তরটা মুখের কাছে এসেছিল তবু চুপ ক'রে যায় স্বর্ণ। স্পষ্ট কথা বলেও কোন লাভ নেই, তিক্ততা বাড়বে। মার দোষ ছেলেকে দেখাতেও নেই, মহাপাপ। ছোট কাকী বার বার

BanglaBook.org

বলে দিয়েছে। নইলে সে বলতে পারত যে শরীর যদি অতই খারাপ তাহলে অমন ডবল খোরাক একা হজম করেন কি করে? কোন রোগও তো দেখা যায় না কোথাও!

কিন্তু বলে কোন লাভও নেই। ও হরেনের কাছে বলতে পারে বড়জোর—শাশুড়ীর মুখের ওপর কিছু বলতে পারবে না এটা ঠিক। আর বলেই বা কি হবে, শাশুড়ী যে তাতে কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা বোধ করবেন সে সম্ভাবনা নেই। তিনি পারবেন কি কিছুই, চিঁড়ে-দইও খাবেন না—হয়ত হরেনকেই শেষ পর্যন্ত রেঁধে দিতে হবে মায়ের জন্যে। সে জন্যে যদি আপিস কামাই হয় তো তাও করতে হবে। মা বলবেও না যে, তুই যা, আমার যা হয় হবে এখন!

না, যাওয়া ওর হবে না কোথাও কোনদিন। এইখান এই চার দেওয়ালের মধ্যেই আটক থেকে হাঁড়িবেড়ি ধরে কাটাতে হবে চারকাল। যেমন ওর হাঁড়িবেড়ি ধরার সাধ ছেলেবেলা থেকে—তেমনিই ভগবান তাকে এই বাড়িতে এনে ফেলেছেন। সাধটা মিটিয়ে দিচ্ছেন ভালরকম ক'রেই।

স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ি পা দিয়েই শুনেছে ওর শাশুড়ীর শরীর খারাপ—সংসারের কাজকর্ম তিনি কিছুই দেখতে পারেন না। তবু তখনও অতটা বোঝে নি, কারণ সে সময় ওর এক পিসতুতো ননদ সুশীলা এখানে ছিল, সংসারের হাল ধরে ছিল সে-ই। অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে—কিন্তু তাই বলে কারও গলগ্রহ নয়। স্বর্ণর শাশুড়ী সে কথাটা প্রথম দিনেই ওকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, 'ও অক্ষ্যাম নয় বৌমা, পেটের দায়ে পড়ে নেই এখানে। ওর বর খুব সেয়ানা ছিল, ঐ যে বিদ্যেসাগরের কী এক কোম্পানি আছে না—বিধবাদের জন্যে?—সেইখানে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কী সব টাকাকড়ি দিয়ে বোয়ের নামে আট্‌কে বেঁধে রেখেছিল। এখন ও মাসে মাসে সেখান থেকে মাসোহারা পাচ্ছে। যতদিন বাঁচবে মাসে পনেরো টাকা ক'রে পাবে। ছোঁড়া যেন দেখতে পেয়েছিল চোখে যে বেশিদিন বাঁচবে না।...ও টাকা ছাড়াও, ওর শ্বশুরের মস্ত বাড়ি কলকাতার বৌ-বাজারে, তারও একটা ভাগ সে ভদ্দরলোক ওকে লিখে দিয়ে গেছেন। বেশ পাকা ব্যবস্থা, ওর সে অংশ ও ইচ্ছে করলে ভাড়া দিতে পারবে, এমন কি বেচতেও পারবে। অবিশ্যি সেসব কিছুই করে নি ও, তেমনি ওর ভাশুর-দেওররা জোড়-হস্তে থাকে সর্বদা। কোথাও তিথ্‌ধম্ম করতে যেতে চাইলে মড়মড় টাকা গুনে দেয়। ও এখানে আছে স্বেচ্ছাসুখে, নেহাৎ মামীকে ভালবাসে ব'লেই তাই। ওকে যেন অবীরে বিধবা ভেবে হেনস্তা কি অছেদ্দা ক'রো নি বাপু!'

অছেদ্দা কি হেনস্তা করার কথা স্বর্ণর মাথাতেও যেত না কখনও। গলগ্রহ আশ্রিত হ'লেও সে হেনস্তা করতে পারত না, সে রকম মানসিক গঠনই নয় ওর। তার ওপর সুশীলা মানুষটা তো খুবই ভাল। স্বর্ণর তাকে খুবই ভাল লেগেছিল। সে যতদিন ছিল—টুকরো-টুকরো ফায়ফরমাস খাটা ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে হয় নি ওকে—হাঁড়ি-হেঁশেল ঠেলার মোটা কাজ সুশীলাই করত।

কিন্তু, বোধহয় স্বর্ণরই বরাত, মাস ছয়েক যেতে না যেতেই খবর এল সুশীলার বড় জায়ের মরণাপন্ন অসুখ, তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই, আতান্তর অবস্থা। সুশীলাকে তারা সবাই খুব ভালবাসে, খুবই অনুগত। সুতরাং সে খবর পাওয়ার পর সুশীলার পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকা সম্ভব নয়। সে বলতে গেলে তখনই একবস্ত্রে চলে গেল—যে খবর এনেছিল তার সঙ্গেই। তার সে জা তারপর মারাও গেল—সুশীলার হাতেই পড়ল সেই সংসার, তার আর আসাও হ'ল না। এখন কখনও সখনও দৈবেসৈবে আসে মামীকে দেখতে—এক-আধঘণ্টার জন্য। পাঁচ দশদিন এসে থাকার মতো তার অবস্থা নেই আর।

BanglaBook.org

সেই সুশীলা চলে যাওয়ার দিনটি থেকেই গোটা সংসারটার ভার এসে পড়ল স্বর্ণর মাথায়। তাতেও আপত্তি ছিল না, যদি সাধারণ খাওয়া-দাওয়া হ'ত এদের। একটা ঠিকে ঝি আছে, সে শুধু বাসন মেজে ঘরদোর মুছে চলে যায়, তার হাতের জল-বাটনা নেন না এঁরা। একটু শুচিবায়ুও আছে, ঝি বাসন-মেজে বাসন উপুড় করে রেখে যায় রোয়াকে, দুবেলা সেইসব বাসন আবার ভিজে কাপড় পরে জলে ধুয়ে নিতে হবে। এর পর খাওয়া! খাওয়ার এত তরিবৎও জানে এরা। হরেনের দুবেলা পোস্ত চাই। যদি কালিয়া পোলও-ও রান্না হয় কোনদিন—তবু পোস্ত না দেখলে পাতে বসবে না সে। তাছাড়া ধোঁকা, ছানার ডালনা, এঁচোড়ের গুলি-কাবাব, মোচার দম-পোক্ত—নানান্ ঝঞ্ঝাটের রান্না সব ফরমাশ করবে সে। নিজেও জানে রাঁধতে। সে-ই দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে। এর ওপর আবার পুরুষরা কাছারি-ইস্কুলে বেরিয়ে গেলে শাশুড়ীর জন্যে ছত্রিশ ব্যঞ্জন রান্না আছে। তাঁর আবার প্রত্যহ ঘি-ভাত চাই দুটিখানি। তাঁর নাকি পেট খারাপ, ঘি ভাত ছাড়া সহ্য হয় না। এমন কথাও স্বর্ণ শোনে নি কোন-কালে। ঘি-ভাত খেলেই পেট খারাপ হয়—এইতো সে জানত, এদের সবই উল্‌টো।

শুধু কি ঘি-ভাত! তার সঙ্গে আবার দুটি সাদা ভাত। বাজারের ভাজামুগের ডাল তিনি খান না, তাঁর জন্যে কাঁচামুগের ডাল ধুয়ে রোদে দিয়ে শুকিয়ে তুলে রাখা হয়—সে-ই কাঠখোলায় ভেজে নিয়ে রাঁধতে হবে। তাও, পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। একটু কম ভাজা হ'লে বলবেন, 'আজ বুঝি ডাল কটা ভাজো নি বৌমা?' আবার একটু কড়া ভাজা হ'লে বলবেন, 'এঃ, ডালগুলো পুড়ে যে আঙ্‌রা হয়ে গেছে বৌমা, সেই জন্যে ভাল ক'রে গলে নি। কট্‌কট্ ক'রে লাগছে দাঁতে।...যদি ভাজতে এত কষ্ট হয় বৌমা তো এ ডাল আর রেঁধো না, যা হয় ঐ অড়র ছোলাই ভাল আমার। রোজ খেয়ে পেট চাড়ে না হয় দুদিন খাবো না—উপোস দেব! কী আর হবে!"

একটি তো কাজ করবেন না, কোনদিন সংসারের কুটি ভেঙে দুটি করতে দেখল না স্বর্ণ, অথচ বাক্যির বেলায় ষোল আনা আছেন! আজকাল আর এসব ক্ষেত্রে মেজাজ সামলাতে পারে না স্বর্ণলতা, রান্নাঘরে এসে আপন-মনে গজগজ করে—'উঃ উনি আবার উপোস দেবেন! তবেই হয়েছে। এখনও তো ছেলে বৌ সকলের চেয়ে বেশি খান—ঠিক ডবল খোরাক।...বসে বসে হজমও তো করে। পেটও তো ছাড়ে না! মুয়ে-আগুন, নোলা-সব্বস্ব মেয়ে-মানুষ! ভাতার খেয়ে বসে আছে, গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ে খেয়েছে—তবু নোলার কম্‌তি নেই। আমাদের সব্বাইকে খেয়ে তবে যাবে—তুমি দেখে নিও!'

সত্যিই আর পেরে ওঠে না সে। দুরকম ভাত, ডাল, আবার তার সঙ্গে বড়ি-বড়া দিয়ে ঝোল একটা (লোককে বলেন, 'কী আর খাওয়া, দিনান্তরে দুটো ঝোল-ভাত, এটুকুও যে কেন ভগবান রেখেছেন তা জানি না। এর জন্যেই লোকের মুখ-নাড়া আর খোঁটা খাওয়া!'--কে যে খোঁটা আর মুখনাড়া দেয় তা স্বর্ণ জানে না, এ বাড়িতে কারও সে সাহস নেই, সবাই তো তটস্থ!), ডালনা চচ্চড়ি অম্বল-একেবারে সাধের খাওয়ার ব্যবস্থা চাই প্রত্যহ। নিহাৎ বোধহয় লোকলজ্জার ভয়ে মাছের মুড়োটা খেতে পারেন না, নইলে তাও আনতে বলতেন। পায়েস তো লেগেই আছে, কোনদিন যদি একটু দুধ বাঁচল খবর পেলেন তো আর রক্ষা নেই, ঠিক বলে বসবেন, 'তাহ'লে একটু পায়েস কেন বসিয়ে দাও না বৌমা, তোমরা খেতে!'

ছেলেপুলের সংসারে দুধ যা বাঁচে তাতে পায়েস ক'রে গুষ্টিসুদ্ধ খাওয়া যায় না—তা উনি ভালরকমই জানেন। তবু ন্যাকামি ক'রে ঐটুকু বলা চাই। সে পায়েস যখন সামনে ধরে দেয় স্বর্ণ তখন কিন্তু একবারও জিজ্ঞাসা করেন না, কোনদিন ভুলেও না—যে,

Banglabook.org

'তোমাদের জন্যে রেখেছ তো?'...জিজ্ঞাসা করেন একেবারে সন্ধ্যে বেলা, 'ছেলেদের পায়েস দিয়েছিলে তো বৌমা মনে ক'রে? তোমার যা আবার ভুলো মন।'

আগে আগে, নতুন নতুন ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে থাকত, হুঁ-হাঁ বিশেষ করত না। এখন আর রেয়াৎ করে না, কট্‌কট্ ক'রে শুনিয়ে দেয়, 'কী আমার এত ভুলো মন দেখছেন মা রোজ রোজ কী এমন জিনিস আমি আপনার ছেলেদের না দিয়ে পরে নিজে বসে দশহাতে খাচ্ছি!...একপো দেড়পো দুধ ছিল, তা তো আপনিও দেখেছেন—তাতে কত পায়েস হবে যে সবাইকে বেটে দোব? যেটুকু হয়েছিল বাটিসুদ্ধু আপনাকেই তো ধরে দিলুম। আর আসবে কোথেকে।'

'ওমা তাই নাকি। তা তো জানি না।' শাশুড়ী অপ্রস্তুতভাবে বলেন, 'তা তাহলে আমাকেই বা ধরে দাও কেন বৌমা অমনভাবে? সবাইকে বঞ্চেসঞ্চে নিজে খাব—এমন নোলা আমার নয় বৌমা। আগে ছেলেরা আমার—তারপর তো নিজে!... আমি কি আর অতশত হিসেবে ক'রে রাখতে পারি বাছা—শোকাতাপা মানুষ, তার ওপর চিরকাল রোগে ভুগছি, আমার মাথায় কি আছে। বলে মানুষের মতো চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি যে এই ঢের! না বৌমা, কাজটা ভাল করো নি বাছা!'

বলেন কিন্তু আবারও যেদিন পায়েস তাঁর সামনে ধরে দেওয়া হয়, আবারও তেমনি নিঃশব্দে খেয়ে নেন, খোঁজ পড়ে আবার সেই বিকেলের দিকে কিংবা তার পরের দিন। একবার ইচ্ছে ক'রেই স্বর্ণ সন্ধ্যেবেলা এইরকম কথা শোনার পর পরের দিনই একটু পায়েস করে দিয়েছিল, বলতে গেলে শিশুদের ভাগ কমিয়েই—কিন্তু সেদিনও কোন প্রশ্ন করার কথা মনে পড়ে নি তাঁর। তবে সেদিন আর বিকেলেও কোন কথা উত্থাপন করেন নি, বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন।

অবশ্য এমন অনেক জিনিসই এ সংসারে শুধু ওঁর জন্যে আসে বা রান্না হয়। সকালে আহ্নিক ক'রে উঠে একটু ফল আর মিষ্টি খাওয়া অভ্যেস নাকি ওঁর চিরদিনের! যে দুটি ক'রে সন্দেশ কি রসগোল্লা আসে প্রত্যহ—তার বেশি আনবার ক্ষমতা নেই এদের—সেগুলো খাওয়ার সময় কিন্তু নাতিনাতনীদের কথা একবারও মনে পড়ে না। ফল, শরবৎ, মিষ্টি—পূজোর নৈবিদ্যির মতো পরিপাটি ঠাঁই ক'রে সাজিয়ে দিতে হয় তাঁকে। শুধু দয়া করে বিকেলটাতেই কিছু খান না, সন্ধ্যেবেলা আহ্নিক ক'রে উঠে শুধু এক কাপ চা-ই খান। আবার কিন্তু রাত্রিবেলা ষোড়শো-পচার আছে। আটখানা ফুলকো লুচি, অন্তত দু-রকম ভাজা—একটু আলুচচ্চড়ি। তাও ক'রে রেখে দিলে চলবে না। যখন খাবেন তখনই গরম গরম ভেজে দিতে হবে। শুধু লুচিই যে গরম চাই তা নয়, বেগুন পটল ভাজাও তখন-তখনই ভেজে দিতে হবে, 'ঠাণ্ডা হ'লে ওর আর কি সোয়াদ থাকে বৌমা! সে তো অখাদ্যি! খাওয়ার কোন বাঁধা সময়ও নেই, কোনদিন রাত নটায় বলবেন খোলা চাপাতে, কোনদিন বা সাড়ে দশটায়। সব খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলেও ও'র জন্যে চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে, কখন মর্জি হবে বলবেন, 'বৌমা কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি বাছা!... কী দেবে দাও এবার, যা হয় কিছু গালে ফেলে শুয়ে পড়ি। বসে বসে ঢুলুনি আসছে!' বসে যে আছেন সে যেন স্বর্ণরই দোষ। অনেক আগেই ওঁকে শুইয়ে দিতে পারলে স্বর্ণ বাঁচে। ওঁর খাওয়ার আগে তার খাওয়া সম্ভব নয়—যদিও শাশুড়ী মাঝে মাঝে বলেন, 'তুমি এত রাত অবধি বসে থাক কেন বৌমা, বালস্পোয়াতী—তুমি তো পাট চুকিয়ে নিলেই পারো।' কিন্তু সে জানে যে ওঁর উপদেশ শুনলে উনিই বাঁকা বাঁকা এতটি কথা শোনাবেন! আরও অনেক শোনাবে। এ ঝাড়কে চিনতে বাকি নেই তার। একদিন দুপুরবেলা থাকতে না পেরে খেয়ে নিয়েছিল—তা জেনে হরেন বলেছিল, 'খাও তো লুকিয়ে খেও, মার খাওয়া হয়ে গেলে

আর একবার লোক-দেখানো সদুরেও খেতে বসো।...নইলে শাশুড়ীর আগে বোয়ের খেয়ে নিলে বড় নিন্দে হয়।'

ফলে এক একদিন স্বর্ণর খেয়ে হাঁড়ি হেঁশেল তুলে ঘরে ঢুকতে রাত বারোটা বেজে যায়। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ে একেবারে, হাত-পা যেন কুকুরে চিবুতে থাকে! তবু তখনই কি ছুটি আছে, কোন্‌টা কি অকর্ম করেছে, কোনটাকে সোজা করে শোওয়াতে হবে—কাকে দুধ খাওয়ানো বাকি এসব সেরে তবে শোওয়া। তখন আছেন স্বামী। যত রাত্রেই আসুক, হরেনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। হরেন ভালবাসে ওকে ঠিকই—একটু বেশি ভালবাসে। আর একটু কম বাসলেই যেন বাঁচত স্বর্ণ। বছর বছর আঁতুড় ঘরে ঢোকা—এ যেন ভাল লাগে না ওর। এদিক দিয়ে সে মা কাকী সকলকে টেক্কা দিয়েছে। তারা কেউই বছর বিয়োনী ছিল না। ওর বছর বছর। ফলে ছেলেমেয়েগুলোর স্বাস্থ্য ভাল না, এরই মধ্যে একটা গেছে। আবার সেজন্যে দোষী হয় স্বর্ণই—হরেন বলে, 'কই এত তো আছে আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন—এমন কাণ্ড তো কারও দেখি নি!' কাণ্ডটা যে হরেন ইচ্ছে করলেই বন্ধ করতে পারে, সে কথাটা ঠোঁটের ডগায় এলেও মুখ ফুটে বলতে পরে না স্বর্ণ। ছিঃ, এসব কি পুরুষের সঙ্গে বলবার মতো কথা! কী ভাববে মানুষটা। এমনিই তো, একটু চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে বাপের বাড়িতে—এখন আর খুব গলা নামাতে পারে না, সেজন্যে বেহায়া দুর্নাম রটেছে। শাশুড়ী হেসেই বলেন, কিন্তু কথাগুলো গায়ে বেঁধে ঠিকই। বলেন, বৌমা আমার বাপের বংশের এক মেয়ে তো—একটু আদুরে হয়ে গেছেন—ঝিউড়ী বেলার অভ্যেসটা ছাড়তে পরেন না, শ্বশুরবাড়ি যে গলা খাটো করতে হয়, সেটা একেবারেই মনে থাকে না। তবে তাও বলি—ও ছেলে-মানুষ, তাঁদেরই একটু হুঁশ রাখা উচিত ছিল। মেয়ে একদিন পরের বাড়ি যাবে জানতেন তো তাঁরা! আমাদের বাড়ি বলে তাই—ও আমার মেয়ের মতোই থাকে—বাড়িতে আলশোলও বিশেষ কেউ নেই—নইলে খোয়ার হ'ত এর জন্যে!'

মুখে 'পারব না' বললেও শেষ পর্যন্ত হরেনই গিয়ে মার কাছে কথাটা পাড়ল। তিনি সব শুনে মুখটা বিরস ক'রে বললেন, 'এসব আর আমাকে বলতে এসেছে কেন বাছা। তোমরাই এখন কর্তাগিন্নী এ বাড়ির, যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি তো মনিষ্যির বার, আমি যখন কিছু পারব না—তখন বলবই বা কি বলো! ব্যবস্থা ক'রে পাঠাতে পার পাঠাও। সত্যিই তো, ছেলেমানুষ বাপের বাড়ি যেতে পায় না —বাপের শরীর খারাপ, পাঠানো উচিত। কিন্তু এদিকেই বা করে কে! আমার এক পোড়া শরীর-একটু আগুন-তাত সয় না, করতে গেলেও বিপুয্যেয়ে কাণ্ড হবে, সে ভুগতে হবে তোমাদেরই।..আর কে আসবে তাও তো জানি না। এক তো বছর বছর তোমার বোয়ের আঁতুড়-ঘরে ঢোকা আছে—সে সময় একে ওকে তাকে পায়ে ধরে আনতে হয়, তাতেই বিরক্ত হয় সবাই। আমার সুখসোমন্দা কি আসতে চাইবে কেউ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'আমার সর্বনাশ ক'রে দিয়ে গেছেন যে তোমাদের গুষ্টি। মোটা মাইনের চাকরি করতেন—ভেবেছিলেন চার কাল বাঁচবেন আর এমনি আদরে রাখতে পারবেন। একটু যদি কোনদিন শখ ক'রে তাঁর জন্যে কিছু রাঁধতে যেতুম তো মহামারী কাণ্ড বাধাতেন একেবারে। কী সমাচার, না তোমার শরীর খারাপ, উনুনশালে গেলে আধকপালে ধরে—তুমি এ বাহাদুরী করতে যাও কেন! তারপর ঠেলা সামলাবে কে, ম্যাও ধরতে গেলেই তো সেই আমাকেই ধরতে হবে।...আর কেনই বা—এত সাতগুষ্টি বসিয়ে খাওয়াচ্ছি, তারা পারে না? তা কথাটাও সত্যি, তখন তো

BanglaBook.org

তোর পিসী-খুড়ির দল কম ছিল না এ বাড়িতে। বসিয়ে খাওয়াতেন আবার জনা-জাত হাতখরচা ব্যবস্থা ছিল। কম কি উড়িয়েছেন ঐ ক'রে। ফল কি হ'ল—নিজে নবাবী করে চলে গেলেন, আমাকেই পথে বসিয়ে গেলেন। একপয়সা রেখে যেতে পারলেন না—অব্যেসটি খারাপ ক'রে দিয়ে গেলেন। এমন মুখ ক'রে দিয়ে গেছেন যে যা-তা কিছু গলা দিয়ে ওলে না!'

দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি চুপ ক'রে গেলেন একেবারেই। প্রশ্নটার কোন মীমাংসাই হ'ল না। হরেনও খানিকটা চুপ করে বসে থেকে থেকে উঠে এল। কাছাকাছির মধ্যে আছে এক ওর খুড়তুতো বোন নন্দ—তা সে এই সেদিন আঁতুড় তুলে গেছে একমাস থেকে, আবার তাকে আনতে গেলে সে কি আসবে! তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বা বলবে কি?

কথাটা চাপা পড়ে যায় একেবারেই। তুলতে যাওয়া বৃথা বলেই স্বর্ণও আর তোলে না। কথা তুললে ব্যবস্থাটা বাত্‌লে দিতে হবে ওকেই। সে ব্যবস্থা কিছু খুঁজেও পায় না। এঁরা রাঁধুনীর হাতে নাকি খেতে পারেন না। খাবেন কি—কোন্ রাঁধুনী এত নানান্-খানা তোয়াজের রান্না ক'রে খাওয়াবে সারাদিন ধরে? করলেও মাইনে হাঁকবে কত। সুশীলা ঠাকুঝির মুখে শুনেছে যে সে চেষ্টা বার কতক ক'রে দেখেছেন, কোন বাম্‌নীই টেঁকে নি। এক উড়ে ঠাকুরও রেখেছিলেন, সে চুরি ক'রে ভুষ্টিনাশ ক'রে দিয়েছিল একেবারে—দুদিনে একমাসের উট্‌নো শেষ ক'রে দিয়েছিল। তাকে ছাড়াতে পথ পান নি এঁরা...

সুতরাং যাওয়া হ'ল না। একদিনের জন্যে যাওয়া যেত হয়ত কিন্তু তাতে লাভ নেই বলেই গেল না স্বর্ণলতা। শুধু শুধু মনখারাপ করতে যাওয়া। তার চেয়ে এই হাঁড়িবেড়ির মধ্যেই জীবনটা যখন কাটাতে হবে তখন এই নিয়ে ভুলে থাকাই ভাল।

তাই ভুলতেই চেষ্টা করে। থাকেও ভুলে—শুধু সকালের খাওয়া চুকে গেলে, ছেলেমেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নির্জন দুপুরে—কিংবা রাত্রে সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে শাশুড়ির মর্জির জন্য অপেক্ষা করতে করতে অন্ধকারে বসে আর সামলাতে পারে না নিজেকে। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। দেবতার মতো বাপ তার, সর্বংসহ। কাউকে কিছু বলবে না, কোনদিন কোন অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করবে না—নিঃশব্দে মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করবে! আর হয়ত দেখাই হবে না এ জন্মে—কে জানে! অত আদরের এক মেয়ে তাঁর—তবু সে কিছুই করতে পারল না, কাছে গিয়ে একটু সান্ত্বনা দেওয়া তাও হয়ে উঠল না!...

এক এক সময়ে আর থাকতে পারে না—প্রাণ ভরে গালাগাল দেয় শাশুড়ীকে, 'মর, মর! ওলাউঠা হোক তোর। ঐ নোলা চিরকালের জন্যে ঘুচে যাক!.... গলা দিয়ে যা-তা নামে না! আ মর্—আমি যখন আঁতুড়ে থাকি মেয়েরা ভাইঝি দেওর-ঝিরা এসে যখন থাকে তখন কে অমন ষোড়শোপচারে ক'রে দেয় শুনি, সে তো তখন যা দেয় তাই সোনা-হেন মুখ ক'রে উঠে যায় গপাগপ্। আবার সে কি সুখ্যেত!

আসলে গতর নেই যে গতরখাগীর! তাই তখন যা পায় তাই ভাল বলতে হয়। যত টাঁইস আমার ওপর। আমারই নিকড়ে গতর পেয়েছে যে। আঁতুর ওঠার পর আর একদিনও তর্ সয় না, গঙ্গা চান করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমনি হেঁশেলে জুতে দেবে!.. রক্ত শুষে খেয়ে নিলে আমার, ডাইনী কোথাকার!'

এক একদিন এই সময় ওর অরুণদার কথাও মনে পড়ে যায়। মনটা হু হু ক'রে ওঠে। মুখচোরা লাজুক মানুষ—কোথায় যে গেল, দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটছে কি না জুটছে। কী যে মতি হ'ল, কী করতে গেল অমন ক'রে। যদি থাকত তো আজ তিনটে না হোক আরও

BanglaBook.org

দুটো পাস দিয়ে ভাল চাকরি পেয়ে যেতে পারত। এখানে না থাকলেও, স্বর্ণ বললে ছুটে এসে দেখত সে।

আহা, কোথায় আছে সে—ঠিকানাটাও যদি জানত!

॥ ২ ॥

তবে অরুণের খবর মধ্যে একজন পেয়েছিল। তার সঙ্গে একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলার। কিন্তু সে এমন একটা সময় যে, সে কোথায় থাকে কী করে তা জিজ্ঞাসা করার কথা মনেও পড়ে নি ওর।

এর ভেতর বহু জায়গা ঘুরেছে ঐন্দ্রিলা। ভাল রাঁধতে পারে বলে যেমন তার কাজেরও অভাব হয় না, তেমনি টিক্‌তেও পারে না বেশিদিন কোথাও। প্রধান অন্তরায় তার রূপ; এত বয়সে এত দুঃখকষ্টেও তা এখনও বহ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল—পতঙ্গ মনকে দুর্বার আকর্ষণে টানে। দ্বিতীয় অন্তরায় তার প্রখর রসনা; বলা-মুখ আর চলা-পা নাকি কোনমতেই সংযত করা যায় না—এ প্রবাদ ঐন্দ্রিলার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে অনেকটাই। চণ্ডাল রাগ তার, একবার মাথা গরম হ'লে আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, লঘুগুরু হিসেব থাকে না। অবশ্য মনিবেরা অনেক ক্ষেত্রে সহ্য করেন—বাধ্য হয়ে। লোক চাই বললেই সব সময় লোক মেলে না। কোন কোন বাড়িতে এমন অবস্থা যে, রান্নার লোক ছাড়া এক মিনিটও চলে না। হয়ত বিরাট সংসার, গৃহিণী অসুস্থ, তেমন কোন বয়স্কা মেয়েও নেই—কি বিধবা আত্মীয়-স্বজন—সে সব ক্ষেত্রে অনেকটাই সইতে হয় মুখ বুজে। ঐন্দ্রিলার হাতের রান্না ভাল, কাজকর্ম পরিষ্কার, চেহারা দেখলে 'ছেদ্দা' হয়—হাতে খেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ চুরি করে না—সেদিক দিয়ে বিবেচনা করার মতো গুণও আছে ঢের। তবু সহ্যেরও সীমা আছে, যারা পয়সা দেবে তারা আর কতটা সইতে পারে!.... সুতরাং কোথাও তিন মাস কোথাও বা চার মাস, এর বেশি টিকতে পারে না ঐন্দ্রিলা। খুব বেশি হ'লে আট মাস। বছর পোরে নি কোথাও।

চাকরি ছাড়া আর নতুন ক'রে পাবার মধ্যের সময়গুলো বেশির ভাগ তাকে মার কাছে এসেই উঠতে হয়। কিন্তু এখন কনক নেই—যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে ওখানের আশ্রয়। শ্যামা বরং আজকাল ধরে রাখতেই চান, কারণ তাঁরও আর কেউ নেই। তরু জড়ভরত জন্তুর মতো হয়ে গেছে, চুপ ক'রে বসে থাকে সর্বসা, খেতে দিলে খায় শুইয়ে দিলে শোয়—না দিলে সারা দিনরাতই বসে থাকে ঠায় এক জায়গায়। তার ছেলে বলাইটা হয়েছে শ্যামার এক বোঝা, পোড়া মেয়ে যদি নিজের ছেলেটার দিকেও তাকাত একবার। বুড়ো বয়সে তাঁর এক কী খোয়ার!... কান্তিটাও ফেল করার পর থেকে যেন কী রকম হয়ে গেছে। টো টো ক'রে ঘোরে চাকরির জন্যে—কিন্তু একে ম্যাট্রিক ফেল তায় বদ্ধ কালা—তাকে চাকরি কে দেবে? গোবিন্দ মধ্যে ম্যানেজার কাজ শেখাবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেও কিছুদিন পরে ওদের বাবু বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়ে দিলেন। কার এত সময় আছে কর্মচারীদের মধ্যে যে হাত-পা নেড়ে ইশারায় কাজ শেখাবে ওকে বসে বসে!

ওদিকেও কিছু হয় না, এদিকেও শ্যামার কাজে লাগে না। অবসর সময়ে বাগান-বাগিচার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করে এই মাত্র—ফল-ফসল বিক্রির কাজ বিশেষ ওকে দিয়ে হয় না। শ্যামা আজকাল নিজেই যান বাজারে—ফোড়েদের সঙ্গে দর-দস্তুর ক'রে হয় তাদের ডেকে নিয়ে আসেন, নয়তো, কান্তি থাকলে তাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সংসারের উনখুটি-চৌষট্টি কাজ করতে করতে বাগান দেখবারও সময় হয় না, অসুমর কাজ

BanglaBook.org

পড়ে থাকে, পাতার পাহাড় জমতে থাকে, কোন কাজটাই হয়ে ওঠে না। ঐন্দ্রিলা এলে আজকাল তাই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি যেন বেঁচে যান।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা টিকতে পারে না। তার পিছুটান আছে, নগদ টাকা চাই। মেয়েকে না পাঠালে চলবে না। তাছাড়া খাওয়ার মুখটাও বড় হয়ে গেছে। যারা রাঁধুনী রেখে চালায় তাদের অবস্থা ভাল, খাওয়া-দাওয়াও সেই অনুপাতে ভাল। ঐন্দ্রিলার হাতেই তা তৈরি হয়—সুতরাং নিজের নিরামিষ রান্না একটু তেল-ঘি বেশি দিয়ে ভাল ক'রেই করে। যেখানে বুড়ো বিধবা গিন্নী বা কর্তাদের মধ্যে কেউ নিরামিষ খাবার লোক থাকে সেখানে তো কথাই নেই—নিত্য-নতুন রান্না ক'রে তাদের তাক্ লাগিয়ে দেয়, নিজেরও সুবিধা হয়।... এখানে দিনদিনই যেন খাওয়ার কষ্ট বাড়ছে। ওর দাদা এখানে থাকতেও যে টাকা দিত এখনও সেই টাকাই দিচ্ছে, তবু ক্রমশ কৃপণতা বেড়েই চলেছে শ্যামার। এখন সব দিকেই হাত টান তাঁর। তেল মাসে আধ সের আসে কিনা সন্দেহ। আজকাল আর এত কম তেল-মশলায় রাঁধতে পারে না ঐন্দ্রিলা—সে অভ্যাসটাই চলে গেছে। তাছাড়া এখানে থাকলেই ভূতের খাটুনি, এও আর ভাল লাগে না। সে পালাই-পালাই করে। কোথাও একটা নতুন কাজের সন্ধান পেলেই সরে পড়ে।

না বলেও চলে যায় কখনও কখনও। সে সময়গুলোর শ্যামা ক্ষেপে যান, আবার নতুন করে ছড়া বেঁধে উদ্দেশে গাল দেন মেয়েকে। বলেন, 'চেপে ধরলেই চিঁ-চিঁ করেন ছেড়ে দিলেই লাফ মারেন! যখন মাথার ওপর চাল থাকে না, পেটে ভাত জোটে না তখন মনে পড়ে মাকে, তারপর একটা কিছু হলেই মার মুখে লাথি মেরে চলে যাবেন। কেন, একটা বেলাও কি আর থাকা যেত না, বলে-কয়ে গেলে কী হ'ত? আমি কি ওর ন্যাজ ধরে ঝুলে পড়তুম—না দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতুম!... মুখে আগুন মেয়ের! অমন মেয়ের মুখে জ্যান্তে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।... ভাত দেবে না আকার ছাই দেবে। আসুক না এবার, ঐ সদর থেকে না যদি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিই তো কী বলছি। বলে, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলুম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি। কাজের সময় কাজী কাজ ফুরুলেই পাজী।.... মা ছাড়া তো গতি নেই, ঘুরে-ফিরেই তো আসতে হয় এখানে—এলতলা বেলতলা সেই বুড়ির পাছতলা! তা তার দিকেও তো চাইতে হয় এক-আধবার! জুতো পায়ে থাকে—তবু সে জুতোরও যত্ন করে লোকে। মা-টা মুখের রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে তা একবার ভাবে না। যেমন দিন কিনে নেওয়া হয়ে গেল অমনি মার মুখে লাথি। ঝ্যাটা মারো এমন সব সন্তানের মুখে। কী ঝাড়ে জন্ম সব, ঝাড় দেখতে হবে তো! উচিত ছিল আঁতুড়ে নুন দিয়ে মেরে ফেলা। হাত্তোর ভাল হোক রে!'

বলেন—কিন্তু আবার যখন আসে—দূর দূর ক'রে তাড়াতেও পারে না। ওরই দুঃসময়ে শুধু নয়—তাঁরও বড় দুঃসময়ে আসে যে!

এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় খড়গপুরে রেলের এক অফিসারের বাড়ি কাজ মিলেছিল। সে ভদ্রলোকের স্ত্রী রুগ্ন, কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, হয়ত কোনদিন আর ভাল হবে না। তার ওপর পাঁচ-ছটি ছেলে-মেয়ে, নেহাৎই ছোট ছোট, বড়টিরই বয়স আট নয় হবে। খুবই বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, ওঁর গৃহপতি ঐন্দ্রিলাকে জানতেন, তাঁর কোন্ আত্মীয়ের বাড়ি দেখেছেন ওকে, খোঁজ-খবর ক'রে আনিয়ে দিয়েছিলেন। ঐন্দ্রিলারও সে সময় চরম দুরবস্থা। দু মাস মেয়েকে টাকা পাঠাতে পারে নি। সে এক নজরে অবস্থাটা দেখে নিয়ে নিজে থেকেই প্রস্তাব করল যে—রান্না ছাড়াও ছেলে-মেয়েদের নাওয়ানো-খাওয়ানো, স্ত্রীর পরিচর্যা সব করবে সে—মাইনে বেশি চাই এবং এক মাসের মাইনে

BanglaBook.org

আগাম চাই। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন একবারে। তিনি নিজে থেকেই ত্রিশ টাকা মাইনে বললেন; তা ছাড়া একাদশীতে চার আনা ক'রে নগদা পয়সা। পান-সুপুরী যা চায় সব পাবে। বছরে চারখানা কাপড়। ত্রিশ টাকা তখনই বার করে দিলেন। তাও—নোংরা কাজ কিছু করতে হবে না—সেটা এক জমাদারের বৌয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে, সে সকালে দুপুরে সন্ধ্যেয় তিনবার ক'রে আসে—সন্ধ্যার সময় এসে থাকেও অনেকক্ষণ। তবে ঐ বাঁধা সময় ছাড়াও যদি কখনও এক-আধবার দরকার হয়, তখন হয়ত করতেই হবে। ভদ্রলোক নিজে বাড়ি থাকতে থাকতে সে রকম দরকার হ'লে তিনিই ক'রে নেবেন—তাও জানিয়ে দিলেন।

ঐন্দ্রিলার ভাল লেগেছিল জায়গাটা। মেয়েটি বড় শান্ত, এমনভাবে সবাইকে বিব্রত করার জন্যে যেন নিজেকে সকলের কাছে অপরাধী মনে করত সর্বদা, চোরের মতোই থাকত। ছেলে-মেয়েগুলো খুব দুর্দান্ত নয়—সহজেই সামলানো যেত। কিছুদিন যাবার পর ঐন্দ্রিলার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়াতেও খুব ক্ষতি হয় নি—ভদ্রলোক, ছেলেমেয়েদের যত্ন হচ্ছে এবং নিজেও সময়ে ভাত-জল পাচ্ছেন দেখে ওর মেজাজ হাসিমুখেই সহ্য করতেন। বৌকে বলতেন, 'ওসব তুমি গায়ে মেখো না। গিন্নীবান্নীর মতো বাড়িতে আছেন, একটু আধটু বকাঝকা করবেন বইকি। তোমার ননদ ছিল না. মনে করো যে বড় বিধবা ননদ এসে আছেন একজন। সংসারটার চার চালের ভার তুলে নিয়েছেন সেটা তো কম কথা নয়! যে গরু দুধ দেয় তার চাট সহ্য করতেই হবে—উপায় কি বলো!'

কিন্তু তিন মাস না কাটতেই হঠাৎ একদিন খবর এল সীতা বিধবা হয়েছে। সীতার বড় সতীন-পো চিঠি দিয়েছে জামাই মরবারও তিন-চার দিন পরে। চিঠি পৌছতেও দু-দিন চলে গেছে—অর্থাৎ আর দিন তিনেক পরেই কাজ।

এ খবরের পর আর ঐন্দ্রিলার জ্ঞান থাকবার কথা নয়। রইলও না। বিচার-বিবেচনা মুহূর্তে তলিয়ে গেল। চিঠি যখন পৌছল তখন বেলা দশটা। ঐন্দ্রিলা বললে, 'আমি এখ্খুনি যাব সেখানে। ইস্টিশানে যাই—প্রথম যে গাড়ি পাব তাতেই চলে যাব।'

সেদিনই ভদ্রলোকের বড় সাহেব আসবেন, তাঁর সঙ্গে লাইনে বেরোবার কথা—কোনমতেই কামাই করা চলবে না। এদিকে শয্যাশায়ী স্ত্রী ও অসহায় কটা শিশু। তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন একেবারে। মিনতি করে বললেন, 'আপনি এ বেলাটা অন্তত থাকুন, দেখছেনই তো এই আতান্তর—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। আমি আজকের দিনটা সামলে নিই—কাল পরশু কামাই করলে অতটা ক্ষতি হবে না। না হয় সিক-রিপোর্ট ক'রে তিন-চার দিনই ছুটি নেব। এখন আপনাকে ছাড়ি কি ক'রে? আর যা হবার তা তো হয়েই গেছে—আপনার পক্ষে আজ যাওয়াও যা কাল যাওয়াও তা। কাল ভোরের ট্রেনেই যাবেন বরং আমি নিজে গিয়ে তুলে দিয়ে আসব। কিম্বা আজ রাত্রের কোন প্যাসেঞ্জার ধরবেন, ভোরে হাওড়া পৌছে যাবেন, বেলা নটা-দশটার মধ্যে মেয়ের বাড়ি পৌছতে পারবেন।'

কিন্তু সে সব কোন কথাই শুনল না ঐন্দ্রিলা, তার তখন পাগলের মতো অবস্থা। কাঁদতে কাঁদতে তখনই বেরিয়ে গেল—ছেলে-মেয়েগুলোর, অসুস্থ বৌটার পর্যন্ত খাওয়া হয় নি তখনও। দুশ্চিন্তায় ভদ্রলোকের চোখে জল এসে পড়েছিল—শেষে বৌটিই বুদ্ধি দিলে, পাশের কোয়ার্টারের মাদ্রাজী অফিসারটির স্ত্রীকে সব জানিয়ে মিনতি করতে তিনি তখনই এ বাড়িতে চলে এলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে ভদ্রলোক না ফেরা পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকবেন। রাত্রের ডাল-ভাত তাঁর বাড়িতেই হবে—ভদ্রলোক যেন কিছু না

BanglaBook.org

ভাবেন—। একটা লোকও তিনি তিন-চার দিনের মধ্যে যোগাড় করে দিতে পারবেন—এমন আশ্বাসও দিলেন।

ওখানে শ্রাদ্ধ-শান্তির পর ঐন্দ্রিলা মেয়েকে ও নাতিকে নিয়ে যাবে, মনে মনে ঠিক ক'রেই রেখেছিল। সেইটেই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা বলে মনে হয়েছিল ওর। এমন কি সীতার পক্ষে অন্য কিছু ভাবা যে সম্ভব তা-ই মাথায় আসে নি ওর।

সেইভাবেই সে কথাটা তুলেছিল। একেবারে এখানকার পাট উঠিয়ে চলে যাবার কথা।

কিন্তু সীতা রাজি হ'ল না। সে এখনও, বাইরের আচরণে, তেমনি শান্ত ও ভালমানুষ আছে, কিন্তু তার ভেতরের কাদার তালটা যে শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে, তাকে দিয়ে আর যে কেউ যা-খুশি করাতে পারবে না—সে খবরটা ঐন্দ্রিলা জানত না। ঐন্দ্রিলা কেন অনেকেই সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। সীতার বয়স আজও খুবই কম—তার যে কোন পুত্রবধূর থেকেই বয়সে ছোট সে—কিন্তু গত কবছরের চরম দুঃখ ও মর্মান্তিক আঘাত তাকে ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা বয়স্ক করে দিয়েছে। ও বয়সের অন্য মেয়ের থেকে ঢের বেশি পরিণতবুদ্ধি হয়ে উঠেছে সে। যে সব প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়ে তার জীবন কেটেছে—তাতে এক এক বছরে বহু বছরের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। এখন সে অনেক কিছুই তলিয়ে ভাবতে শিখেছে। আর একটা ধারণা তার মনে দৃঢ়মূল হয়েছে যে তার জীবনের ভার তাকেই বইতে হবে—অন্য কারও ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না।

সে মার প্রস্তাবের উত্তরে একান্ত অনুত্তেজিত ও নির্বিকার কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

ঐন্দ্রিলা বুঝতে পারল না, থতমত খেয়ে গেল কেমন। সেও ভ্রূ কুঁচকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তারপর কি আবার?'

'মানে তোমার সঙ্গে যাব কোথায়? তোমার মনিব-বাড়ি?'

'না না, সেখানে যাবি কি? তা নয়—। কেন, তোর বাপের বাড়ি? কাকাদের কাছে যাবি। এখন তো জোর করে যাবি। তারাই তো জেনে-শুনে এই সর্বনাশ করলে তোর—এখন এ দায় অপরে কেন বইবে। তাদেরই ঘাড়ে গিয়ে চাপগে যা, যেমনকে তেমনি!'

'হ্যাঁ, এই গুঁড়োটুকু—আমার জীবনের শেষ ভরসা, তারপর তাকেও নিকেশ করুক। ওরা সব পারে। যারা এ কাজ করেছে তাদের অসাধ্য কি আছে বলো। ...না, আর তাদের মুখ দেখতে পারব না আমি, হয়ত হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না, কী করতে কি করে বসব। আমি জেনে রেখেছি যে আমার কেউ কোত্থাও নেই, সে-ই ভাল। তা ছাড়া তারা তো সব ভেন্ন হয়ে গেছে, কার ঘাড়ে গিয়ে চাপব, কেই বা ঘাড়ে করবে। তারা কি অত সহজে ঘাড় পাতবার লোক?'

একটু চুপ করে রইল ঐন্দ্রিলা। নিয়ে যেতে হবে এই কথাটাই মনে বড় হয়ে ছিল, কোথায় নিয়ে যেতে হবে তা বোধ হয় ভাল করে ভাবে নি। খানিকটা পরে বললে, 'তাহলে দিদিমার কাছেই চল্, তারও লোকের দরকার। এ বয়সে দুটো ভাত রেঁধে দেয় এমন লোক নেই, সে ফেলবে না।'

'না মা, সে আমি যাব না।' সীতা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'সেখানেও গতর খাটিয়ে ঝি-গিরি করতে হবে—হয়ত এখানেও তাই। তবু এ আমার স্বামী-শ্বশুরের ভিটে, খানিকটা জোর আছেই, এখানে ঝিগিরি করাও সম্মানের। তা ছাড়া যদি বনিয়ে মন যুগিয়ে চলতে পারি—শেষ পর্যন্ত হয়ত ছেলেটাকে দেখবে ওরা। হাজার হোক—ওদেরই ভাই, ওদেরই কাকা। দিদিমার ওখানে গেলে দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটবে হয়ত—তার বেশি কিছু

BanglaBook.org

না। ছেলে মানুষ হবে না। দিদিমা যে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখাবে তা মনে হয় না। অথচ একবার বেরোলে আর এ বাড়ি ঢুকতে পারবো না, চিরদিনের মতো এ আশ্রয়টাও যাবে।'

'তা বলে এখানে এই বাঁদীর বাঁদী হয়ে থাকবি?'

'তাই তো ছিলুম মা এতকাল। এই গত ক বছরই তো তাই আছি। যে কপাল নিয়ে জন্মেছি সে কপাল আমার সঙ্গেই যাবে, যেখানেই যাই না কেন। গেল জন্মে সারাজিবন ধরেই বোধহয় পাপ করে গেছি, তাই এ জন্মে মায়ের পেট থেকে পড়া ইস্তক শুরু হয়েছে তার শাস্তিভোগ। সে পাপের দেনা শোধ হয়ে যাওয়াই ভাল—আর পরের জন্মের জন্যে না কিছু তোলা থাকে।'

ঐন্দ্রিলা একটু অবাক হয়ে তাকায় মেয়ের মুখের দিকে। গত ক বছরে অনেকবারই আসা-যাওয়া করেছে, কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে তার এতটা পরিবর্তন হয়েছে তা কৈ লক্ষ করে নি তো! আশ্চর্য, এ কোন্ সীতা! এ আবার কবে জন্মাল!...দারুণ একটা বিস্ময় বোধ হতে লাগল ঐন্দ্রিলার।

সীতার মুখে কোন রকমের উত্তেজনার ভাব নেই। খুব একটা দুঃখেরও না। বৈধব্যের যে করুণ অসহায় ভাব থাকে সদ্যোবিধবাদের মুখে—সেটাও নেই। আর কারণ বৈধব্যটা আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, গত দু বছর ধরেই জামাই শয্যাগত ছিলেন। প্রতিদিনই বলতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। ঐন্দ্রিলাও তা জানত, তাই সংবাদটার অভাবনীয়তায় কোন আঘাত সে পায় নি—কিন্তু দুঃখ তো হবেই। সীতার মুখে সেটুকুও যেন নেই।

কোনদিনই ছিল না অবশ্য। ভীতু ভীতু—বোবা রকমের শান্ত নম্রতা নিয়েই যেন জন্মেছে সে। তবু—। এ যেন অন্য এক রকমের অবিচল স্থৈর্য, এর সঙ্গে ঐন্দ্রিলার আগে যেন কোন পরিচয় ছিল না। আরও একটু লক্ষ করে দেখল অপরিচয়ের অন্য কারণও আছে। সেই ভীতু অসহায় ভাবটাও কবে যেন সীতার মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, তার ভাবলেশহীন মুখে কোথায় যেন একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে সে জায়গায়, কোন বিশেষ রেখা বা ভঙ্গিতে তা ধরা যায় না—কিন্তু অনুভব করা যায়।

মেয়ের এই নতুন চেহারার সামনে ঐন্দ্রিলা কেমন একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। খানিকটা পরে, একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই যেন বলে, 'জামালপুরে যাবি? বৌদির কাছে?'

'আমি কোথাও যাব না মা। এইখানেই পড়ে থাকব। পৃথিবীতে এই একটি জায়গাতেই তবু আমার একটু অধিকার আছে, আইনত না হোক ন্যায়ত ধর্মত। অন্য যে জায়গাতেই যাব—সেখান আমায় ভিখারী হয়ে যেতে হবে। আর তাতে দরকার নেই। বলে, এখানেও ঘাস-জল সেখানেও ঘাস-জল। আমার অদৃষ্টে ঘাস-জলে বেশি জুটবে না তা জানি—মিছিমিছি এখান ছাড়ি কেন! এদের তবু এতদিনে ভাগ দেবার ভয়টা ঘুচেছে, বুঝেছে, আমি কোনদিই ওদের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা করব না—সংসারে আছি খাটছি-খুটছি—ওদের সুবিধেই হচ্ছে। এখন অনেকটা ভাল ব্যবহার করে। এ-ই আমার ভাল। যদি কোনদিন তাড়িয়ে দেয়, তখন অন্য জায়গায় যাব। যেখানেই যাই গতর খাটিয়ে খেতে হবে—অমনি বসিয়ে কেউ খাওয়াবে? না কেউ লেখাপড়া শেখাবে পয়সা খরচ করে? একটা পাস দিতে পারলে আমিও চাকরি করে খেতে পারি, আজকাল শহরে অনেক মেয়েই করছে শুনছি। কিন্তু সে তো পাঁচ-ছ বছরের ফের—এতদিন টানবে কে?'

'তা তুই না হয় দাদার কাছে যা। আমি যা পারি পাঠাব—তাতে তোর পড়ার খরচ হবে না?'

BanglaBook.org

'না, না, সে বাংলাদেশ নয়, কোথায় ইস্কুল কোথায় মাস্টার—সেখানে হবে না। তোমারও চাকরির ঠিক নেই। এমনিই—ছেলেটাকে যদি লেখাপড়া শেখাতে হয় সেও খরচ আছে। তুমি আর কত টানবে! তুমি ফিরে যাও, তাঁদের আতান্তরে ফেলে চলে এসেছ শুনছি। কালই বরং চলে যাও!'

অগত্যা ঐন্দ্রিলাকে একাই ফিরে আসতে হ'ল। কিন্তু খড়্গপুরে পৌঁছে দেখল যে তাঁরা কোয়ার্টারে কেউ নেই। শুনল যে ভদ্রলোক এখানে কোনমতে লোক ঠিক করতে না পেরে একেবারে মাস-দুয়েকের টানা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন, সম্ভবত সেখানেই কোন একটা বন্দোবস্ত করে ওদের রেখে আসবেন। উনি একা থাকলে ওঁর ট্রলির ঠেলাওয়ালারাই কেউ রেঁধে দিতে পারে—কিম্বা কোন মেসেও খেতে পারেন। সেই রকমই একটা কিছু করে নেবেন।

এইবার ঐন্দ্রিলার চোখে অন্ধকার দেখার পালা।

টাকা এঁদের কাছে কিছু পাওনা ছিল না, বরাবরই আগাম আগাম নিচ্ছিল ঐন্দ্রিলা। বিশেষ কিছু হাতেও ছিল না, যা ছিল যাবার সময়ে গাড়িভাড়াতেই চলে গেছে। আসবার গাড়িভাড়া সীতার বড় সতীনপোর কাছ থেকে ধার করে এসেছে, এখানে এসেই পাঠিয়ে দেবার কথা। ওর মনে মনে বল ছিল যে যদিও এঁরা নতুন লোক রেখে থাকেন, সে লোক ঐন্দ্রিলার মতো কিছুতেই আপন ক'রে টেনে কাজ করবে না—ও ফিরে এসে নিজের কাজ পাবেই। নিতান্ত না পায়—এঁদের বাসায় থেকে এখানেই কোথাও কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে। ভদ্রলোকই বলে দিতে পারবেন কোথাও না কোথাও। ঠিক এ অবস্থা হবে তা একবারও ভাবে নি।

সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই কাছাকাছি কটা কোয়ার্টারে ঘুরল ঐন্দ্রিলা—কাজের চেষ্টায়। আশ-পাশে বেশি মাইনের লোক যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই মাদ্রাজী—তেলেঙ্গিনী। ও তাঁদের কথাও বোঝে না, তাঁরা যদি-বা বোঝেন—বাঙালি রাঁধুনী নিয়ে তাঁরা কী করবেন? তাঁদের লোক বিশেষ দরকারও হয় না। বাঙালিরা অনেকেই অফিসের বেয়ারা কুলী দিয়ে কাজ সারেন, তাদের শুধু খোরাকী দিলেই চলে। দু-একজনের বাড়ি ঠাকুর থাকে—সে সব বেশির ভাগ জায়গাতেই পুরনো লোক আছে তাদের তাড়িয়ে রাখার কথাই ওঠে না। এক জায়গায় দরকার ছিল, তা সেখানকার গৃহিণী স্পষ্টই বললেন, 'তুমি মিছিমিছি এখানে ঘুরছ গো বাছা বামুন-মেয়ে, অজানা অচেনা মানুষকে তো হুট করে কেউ কাজ দেবে না, আর যারা চেনে তারা তোমাকে রাখবে কোন্ ভরসায় বলো? তুমি যে অবস্থায় বোসবাবুদের ফেলে চলে গিয়েছিলে—সে কথা কি কারুর শুনতে বাকি আছে? জেনে শুনে তোমার মতো নির্মায়িক লোককে কেউ রাখবে না!...ঐ কি একটা মানুষের মতো কাজ হয়েছিল! মানুষের চামড়া গায়ে থাকলে কেউ পারে!'

অপমানে মুখ রাঙা হয়ে উঠলেও বিনীত করুণভাবে বলবার চেষ্টা করে ঐন্দ্রিলা, 'কিন্তু কী অবস্থায় গেছি তাও তো শুনেছেন দিদি, আপনার মেয়ের যদি ঐ খবর আসত—'

'ষাট ষাট! আমার মেয়ের ও খবর আসবেই বা কেন! কী এমন মহাপাপ করেছি আমি!...ই কী কথার ছিরি তোমার বাছা! ও খবর আমার শত্তুরের আসুক। আর যারা তিন পুরুষের রাঁড়ী তাদের আসুক।...তবে অবস্থা যাই হোক বাছা, যারা মনিব যাদের অন্ন খাচ্ছ, তাদের অবস্থাটাও ভাবতে হয় একটু, ভাবা দরকার। এ তো মরণাপন্ন অবস্থার খবর নয় যে ছুটে গেলে শেষ দেখাটা হবে বলে, ছুটে গেছ—হুস্বিদিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না! মরেই গেছে—তাও চার-পাঁচ দিন আগে—তুমি ত্যাখন গিয়ে কী কাজে লাগবে বাছা—ক ঘণ্টা আগুপিছুতে এমন কি এসে যেত? জামাইকে কি তুমি ফিরে পেলে অমন রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে...না বাছা, কাজটা তুমি খুবই গর্হিৎ করেছ। ভদ্দরলোক বামুনের ঘরের মেয়ের

BanglaBook.org

মতো কাজ করো নি। মরণাপন্ন খবর পেলেও মানুষ ও অবস্থায় যেতে পরে না। একটা লোক হাত-পা নাড়তে পারে না, মুখে জল না ঢেলে দিলে গলা শুকিয়ে মরে পড়ে থাকবে—বাচ্ছাগুলো টা-টা করছে তাদের কে দেখে ঠিক নেই, হয়ত কোনটা রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি চাপাই পড়বে—সব জেনেশুনে তুমি আর আট-দশটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারলে না? পরের দিনে পঁওছালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত শুনি?...না বাছা, তুমি এখান থেকে সরে পড়ো—এ শ্বশুরে আর তোমার ঠাঁই হবে না!'

সরে পড়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না হয়ত, কারণ তখনই অপরাহ্ণ গড়িয়ে পড়েছে, সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরি নেই। অন্ধকারে এখানে ঘুরে বেড়ানো নিরাপদ নয় তা সে অনেকের কাছেই শুনছে। শরীরও বইছে না। কোন্ সকালে সেখানে থেকে বেরিয়েছে একটু শরবত খেয়ে—মুখে এখনও জল পড়ে নি। পা ভেঙ্গে আসছে শ্রান্তিতে।

পা-পা ক'রে স্টেশনে এসেই বসে ছিল। মার কাছে যাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। একবার ভাবলে বৌদির কাছেই চলে যাবে—কিছু দিন সেখানে থেকে মনটা দেহটা সারিয়ে আসবে। কিন্তু গাড়ি-ভাড়ার পয়সা কই! আঁচলে সাতটি মাত্র পয়সা বাঁধা আছে, মার কাছেই যাবার ভাড়া হবে না তাতে। বিনা টিকিটে যেতে হবে, ধরা পড়লে ফৈজৎ—হয়ত পুলিশেই দেবে। আজকাল এধারে খুব চেকার হয়েছে। ধরলে যা তা বলে, মেয়েছেলে বলে রেয়াৎ করে না—তা ও নিজের চোখেই দেখেছে।

থার্ড ক্লাস টিকিটঘরের সামনে মেঝেতে পুঁটুলিটা পেতে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে—এমন সময় কে একটি অল্পবয়সী ছেলে সামনে থমকে দঁড়াল, ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'এ কী—খেঁদী-মাসীমা?'

সাগ্রহে মুখ তুলে তাকাল ঐন্দ্রিলা। তার তখন সেই প্রবাদবাক্যের মজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা—একটা তৃণও তার কাছে অবলম্বন। এই নির্বান্ধব অপরিচিতদের রাজ্যে বিপদের সময় একটা পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর শুনলেও অনেকটা ভরসা হয়। কিন্তু বার বার চোখ মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখেও ছেলেটিকে চিনতে পারল না সে। একটু চেনা চেনা বোধ হচ্ছে—অথচ ঠিক ধরতে পারছে না।

আশ্বাসের আলো ম্লান হয়ে আসে কিছুটা—তবু এ-ও মনে হয়, সে না চিনতে পারুক, এ তো চিনেছে। চেনা কেউ নিশ্চয়ই। সে সোৎসুক কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, কিন্তু তুমি—মানে তোমাকে তো ঠিক—'

'চিনতে পারছেন না—না? আমি অরুণ, আপনার দিদির বাড়ি থাকতুম। মেজ-বৌয়ের বোনপো। মনে পড়ছে এবার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়ছে বৈকি! কী আশ্চর্য!...তা তুমি যে পেল্লায় বড় হয়ে পড়েছ বাবা, চিনব কী করে?'

'কিন্তু আপনি এখানে একা—এমনভাবে বসে কান্নাকাটি করছেন—কী হয়েছে বলুন তো?'

ঐন্দ্রিলা উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে সব কথা বলে। শুনতে শুনতে অরুণের চোখ আসে ছলছলিয়ে। নিজের দুর্দিনের কথা, অসহায় অবস্থার কথা আজও ভোলে নি সে। নিজেকে দিয়েই তাই পৃথিবীর তাবৎ দুঃখীর অবস্থা বুঝতে পেরেছে। খেঁদী মাসীমারই বা কী জীবন। আশা বলতে আশ্রয় বলতে অবলম্বন বলতে ঐ তো একটি মাত্র মেয়ে। তারও কী সর্বনাশা বিয়ে হল—কী ভয়াবহ বিয়ে। তবু সাধবা আছে এখনও, এই আশ্বাসটুকু ছিল এতদিন—সেটুকুও ঘুচল। ঐ মেয়েকে বুকে করেই নিজের বৈধব্য একদিন ভুলেছিলেন—সেই মেয়ের বৈধব্য না জানি কী নিদারুণই বেজেছে।...অরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে চোখের জল সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

BanglaBook.org

কিন্তু সেটাকে ভুল বুঝল ঐন্দ্রিলা। নিস্পৃহতা বা ঔদাসীন্য মনে করল। হয়ত বা বিরক্তিও। সে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'দোহাই বাবা, নিদেন আমাকে একটা টিকিট কেটে দাও, মার কাছে চলে যাই, নইলে সত্যি-সত্যিই ভিক্ষে করতে হবে শেষ পর্যন্ত হাত পেতে!'

হঠাৎ যেন অরুণের মনে হ'ল তার কানের কাছে বুঁচি ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি! মেজমাসীর একটা যাহোক ব্যবস্থা করে দাও না। কী মানুষ তুমি! চিরকাল কি তোমার সমান গেল গা!'

যেন চমকে উঠল অরুণ। তাড়াতাড়ি ঐন্দ্রিলার অলক্ষ্যে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, 'এক জায়গায় কাজ করবেন মাসীমা—আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি, কাজ খালি আছে, লোকের খুব দরকার!'

'কোথায় বাবা? ক'রে দাও না—তাহ'লে তো আমি বেঁচে যাই!...তাহলে আর মায়ের কাছে যাই না। দোহাই বাবা, তোমায় ব্যাগত্তা করি—সেখানেই পাঠিয়ে দাও আমায়!'

'কিন্তু একটা কথা। ভদ্রলোক একা থাকেন সেখানে। তাঁর স্ত্রী নেই—ছেলে-বৌ বোম্বেতে, মেয়েরা কেউ কলকাতা—কেউ দিল্লীতে। উনি সরকারি ডাক্তার ছিলেন, পেন্সন নিয়ে ওখানে গিয়ে আছেন—ও জায়গাটায় কোন ডাক্তার নেই, লোকের সেবা করবেন বলে। খুবই ভদ্রলোক, কারও কাছ থেকে—স্বেচ্ছায় না দিলে—এক পয়সাও নেন না, বরং বহু লোককে ওষুধপত্র পর্যন্ত বিনা পয়সায় দেন। পেনসনের টাকা থেকে অর্ধেকেরও বেশি স্বদেশী কাজে খরচ করেন লুকিয়ে লুকিয়ে।...অদ্ভুত মানুষ—দেবতার মতো। তবে একাই থাকেন, কোন মেয়েছেলে নেই বাড়িতে। খেটেখুটে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়—অর্ধেক দিন খাওয়াই হয় না। আজই বলছিলেন আমাকে—লোকের কথা। খুব ভাল মানুষ নির্ঝঞ্ঝাট লোক!'

'একা থাকেন? একেবারে একা!' হতাশায় যেন গলা ভেঙ্গে আসে ঐন্দ্রিলার।

'কিন্তু ওঁর বয়স হয়েছে মাসীমা। ষাট বছর বয়স অন্তত। দু-তিন বছর আগে পেন্সন হয়েছে।'

'তবে আবার কি! যেন গাঢ় অন্ধকারে হঠাৎ আলো দেখতে পায় ঐন্দ্রিলা, 'তাহ'লে আর কে কী বলবে! বুড়োমানুষ—বাবার মতো। তুমি সেখানেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো বাবা।'

'দাঁড়ান। এখুনি গাড়ি আসবে, আমি টিকিট কেটে দিচ্ছি—গিয়ে কোলাঘাটে নামবেন। সেখান থেকে স্টীমারে যেতে হয়, আমি কোলাঘাটের স্টেশনমাস্টারকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাঁর বাড়িতেই রাত্রে থাকবেন—খুব ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ—আমার বিশেষ পরিচিতও—উনি যত্ন ক'রে রাখবেন, কাল ভোরে উনিই লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন সেখানে। তাহলেই হবে তো?'

'খুব হবে বাবা। এ তো আমার আশার অতিরিক্ত। বেঁচে থাকো বাবা, রাজ-রাজেশ্বর হও। একশ বছর পেরমাই হোক। ভগবান তোমার ভাল করুন—কী বলব বাবা, দুঃখিনী অবীরের জীবন রাখলে আজ!'

অজস্র আশীর্বাদ করতে থাকে ঐন্দ্রিলা।

BanglaBook.org

॥৩॥

অনেক কাণ্ড করে আসতে হ'ল বলে প্রথমটা একটু দমেই গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। ট্রেন, স্টীমার, নৌকো—শেষে মাইল-খানেক আবার গরুর গাড়ি—যানবাহনের কিছুই বাকি রইল না। নিতান্ত নিরুপায় বলেই শেষ পর্যন্ত এসেছিল বোধ হয়—নইলে অনেক আগেই ফিরে যেত।

কিন্তু এখানে পৌঁছে ভালই লাগল তার। গ্রামে বেশির ভাগ মাটির বাড়ি, মাটির দোতলাও আছে ঢের—তবে ডাক্তারের বাড়িটা ছোট হলেও পাকা। একটু গ্রামের শেষ দিকেও বটে। বেশ ফাঁকা—বাগানও আছে ছোটখাটো। বাড়িটায় দুটো বড় ঘর, একটা ছোট। একটাতে ডাক্তার নিজে থাকেন, আর একটাতে ডাক্তারখানা। ছোট ঘরটাই ঐন্দ্রিলার জন্য নির্দিষ্ট হ'ল। একটা তক্তাপোশ পাতাই ছিল, ডাক্তারবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ্ করিয়ে একটা পরিষ্কার বিছানা বিছিয়ে দেওয়ালেন। ঝি আছে একজন, কাজ ক'রে দিয়েই চলে যাবার কথা তার—কিন্তু সে কাছেই থাকে। দিনের মধ্যে দশবার আসতেও তার আপত্তি নেই। তাছাড়াও, ঐন্দ্রিলা দু-একদিন থেকেই বুঝে নিল, গ্রামের বহু লোকই ডাক্তারবাবুর কোন কাজ করে দিতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অর্থাৎ সে রাজার হালেই থাকবে, রান্নার কাজ ছাড়া তাকে কুটোটি ভেঙ্গে দুখানা করতে হবে না।

রান্না-ভাঁড়ার ঘর পাকা নয়—মাটির, তবে বেশ বড় বড়। তাতে ঐন্দ্রিলার কিছু অসুবিধা নেই, সে কাঁচা রান্নাঘরই পছন্দ করে, জন্মাবধিই বলতে গেলে তাতে অভ্যস্ত—মধ্যে কটা বছর দিদিমার ওখানে ছাড়া। মাটির ঘর একবার গোবর-ন্যাতা বুলিয়ে নিলেই তকতক করে—পাকা ঘরে অনেক হ্যাঙ্গামা। মাটির ঘরে নিচু উনুন করা যায়, সেও একটা সুবিধা।

সবচেয়ে যেটা এখানে এসে ভাল লাগল তার, সেটা হ'ল অবাধ স্বাধীনতা। ডাক্তারের নাম অমরবাবু, তাদের সজাতি, ব্রাহ্মণ। ভদ্রলোক একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিরোধ মানুষ, কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না—থাকতে চান না। ডাক্তারি—ডাক্তারিও নয় সেবা—কারণ ঐন্দ্রিলা দেখল এতে যা আয় হয় তার থেকে ঢের বেশি ব্যয় হয় ডাক্তারের—এই নিয়েই থাকতে চান তিনি, তার বাইরের কোন কিছু বোঝেন না। ঘরে কি হচ্ছে তার থেকে গ্রামে বা গ্রামান্তরে কোন চাষী কি গোয়ালার ঘরে কি হচ্ছে তাই নিয়ে বেশি চিন্তা তাঁর। তাঁদের খবরই বেশি দরকারি বলে মনে করেন।

ঐন্দ্রিলা এসে কাপড়-চোপড় কেচে একটু সুস্থ হতেই অমরবাবু একেবারে কুড়িটা টাকা তার সামনে নামিয়ে রেখে বললেন, 'ঘরে কি কি আছে জানি না, দেখে-শুনে নাও। বোধ হচ্ছে বিশেষ কিছুই নেই।...যা দরকার হবে—ঝি মঙ্গলা আছে, তার ভাইপো ধনা আছে, তার পাশে অক্রূররা আছে—যাকে যা বলবে সে-ই তা ক'রে দেবে—ওদের দিয়েই যা লাগে আনিয়ে নাও। কাল হাটবার—সেও ওরা করে দিতে পারবে। আমি মাছ খাই না—মাছের পাট নেই, যা হোক দুটো ডালভাত করে দিও তাই আমার ঢের। অবিশ্যি তোমাকেও ডালভাত খেয়ে থাকতে বলছি না, যা খুশি করে খেতে পারো। যদি পান-দোক্তার নেশা থাকে তাও আনিয়ে নিও, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। হিসেবপত্র আমাকে দিতে হবে না, ও তুমিই বুঝে নিও। টাকার দরকার হলে আমাকে বলো!'

ঐন্দ্রিলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। যাকে দীর্ঘকাল ধরে পরের তাঁবে কাজ করতে হয়েছে এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ চলতে হয়েছে—(অধিকাংশ মনিবই ধরে নেন যে তাঁদের বামনী বা রসুয়ে ঠাকুর চুরি করছে)—তার পক্ষে এতখানি বিশ্বাস এবং এই অবাধ স্বাধীনতা একেবারেই কল্পনাতীত। এক কথায় এতদিন পরে একটা সংসারে—তা হোক না কেন ছোট সংসার—সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল। মনে মনে আর এক দফা অরুণকে আশীর্বাদ করল ঐন্দ্রিলা। আর তখনই মনে পড়ে গেল যে তার ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি, কী করছে তাও না।...

এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করল না ঐন্দ্রিলা। মনের মতো করে ভাঁড়ার সাজাল সে। মনের মতো করেই রান্না করল। কাছে বসে যত্ন করে খাওয়াল

BanglaBook.org

ডাক্তারবাবুকে। ভদ্রলোক কিছুই খেতে চান না—নিজে হাত পুড়িয়ে ভাতে-ভাতই খেয়েছেন এতকাল, খাওয়ার শক্তিটাই গেছে কমে। ঐন্দ্রিলা প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচ করেছিল, তার পর বুঝল মানুষটা আপনভোলা উদাসীন—সে জোর করে ধমক দিয়ে খাওয়াতে লাগল। তাতে অমরবাবুরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। মাইনে করা লোক এমন যত্ন করে তা কখনও দেখেন নি তিনি—জানা ছিল না। আরও অবাক হলেন যখন ঐন্দ্রিলা স্বেচ্ছায়—যে সব কাজ তার করবার কথা নয়—তাও করতে লাগল। অমরবাবুর কাপড়-চোপড়ের কোন হিসেব থাকত না, ভাল ভাল কাপড়, ময়লা হবার পর এককোণে গুঁজড়ে হয়ত পড়ে আছে দীর্ঘকাল—তিনি ছেঁড়া কাপড় পরে কাটাচ্ছেন। সে সব কাপড় সেইভাবে থেকে হয়ত মষে ধরে গেছে, হয়ত পোকাতে কেটেছে, তাও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের অস্তিত্বই মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। বিছানারও সেই হাল। ঐন্দ্রিলা কয়েকদিন দেখে নিজেই একদিন ক্ষারে ফুটিয়ে মঙ্গলাকে দিয়ে কাচিয়ে নিল। জামাগুলো অক্রূরকে দিয়ে পাঠাল রজকবাড়ি। বিছানার নতুন চাদর কিনে আনাল হাট থেকে। পরিষ্কার বিছানার ওপর পরিষ্কার পাট-করা জামা-কাপড়ের স্তূপ যখন দেখলেন ডাক্তারবাবু তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

'মঙ্গলা-এত কাপড় জামা কার রে? কোথা থেকে এল? কেউ এসেছে নাকি?' ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন শুনলেন তাঁরই সব—তখনও বিশ্বাস হ'ল না। উল্‌টেপাল্‌টে দেখে যখন মনে হ'ল সত্যিই তাঁর—তখন আবারও প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় ছিল এগুলো রে, কোথা থেকে বেরোল এতদিন বাদে?'

তারপর সব ইতিহাস শুনে খুব একচোট বকাবকি করলেন—ঐন্দ্রিলাকে, ঝিকে, —নিজেকেও।

'দেখ দিকি! এসব করার কী দরকার ছিল এখন। তাও মঙ্গলকে বললেই হ'ত—আর তুইও হয়েছিস তেমনি, তোদের কি নজরে পড়ে না এসব। অক্রূরকে দিয়ে রজক-বাড়ি পাঠালে তো হ'ত!...ছি ছি! বিষম অন্যায় হ'ল। বামুনের মেয়ে—ওঁর কি এই সব করার কথা! আমারও হয়েছে যেমন, কোনদিন হুঁশ থাকে না। এবার থেকে একটু হুঁশ ক'রে চলতেই হবে।...কিন্তু তোমারও এসব করার দরকার নেই—বুঝলে! আমার ভারী খারাপ লাগছে—'

দোরের বাইরে থেকে ঐন্দ্রিলা জবাব দেয়, 'আমি আর কি করলুম—টেনে বার করেছি বই তো নয়, মঙ্গলাই তো করেছে একবেলা ধরে।...পয়সার জিনিস অমনভাবে নষ্ট হওয়া আমরা দেখতে পারি না, গা করকর করে।'

মুখে যাই বলুন—অমরবাবু খুশিই হন ওর আন্তরিকতায়—আর সেটা চাপাও থাকে না। স্বাচ্ছন্দ্য না পেলে চলে যায় অনেকেরই হয়ত সে জন্য চেষ্টা বা উদ্যম করাও পোষায় না তাদের, কিন্তু অযাচিত ভাবে পেলে সকলকারই ভাল লাগে।

অমরবাবুরও ভাল লাগল এবং সে জন্য তিনি তাঁর নতুন বামুন-ঠাকরুনের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করবেন—তাঁর তরফ থেকে কী প্রতিদান দেওয়া উচিত ভেবে পেলেন না। এসব সাংসারিক জ্ঞান তাঁর চিরদিনই কম। শেষ পর্যন্ত, আর কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে, পরের হাট থেকে একজোড়া থান আনিয়ে দিলেন, এক তাঁতি তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য একটি ভাল সাদা উড়ুনি দিয়ে গিয়েছিল সেটা বার ক'রে দিলেন এবং সে ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করছে কি না, তার জলখাবারের ব্যবস্থা কিছু থাকে কি না, চা খাবার অভ্যাস আছে কি না—যখন তখন প্রশ্ন করতে লাগলেন।

BanglaBook.org

প্রথম প্রথম ওঁর এই অতিরিক্ত মনোযোগে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল ঐন্দ্রিলা। কারণ বয়স যতই হোক—ডাক্তারবাবু নিজে মুখে বলেছেন বাষট্টি পেরিয়ে তেষট্টি চলছে তাঁর—কিন্তু বুড়ো তাঁকে আদৌ দেখায় না। বেশ শক্ত-সমর্থই আছেন, চুলও খুব পাকে নি এখনও পর্যন্ত। খাটতে পারেন অসুরের মতো, সকাল থেকে পায়ে হেঁটে আশপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামে রোগী দেখে বেড়ান—দিনে-রাতে হাঁটেন সব মিলিয়ে অন্তত পাঁচ-ছ ক্রোশ। অর্থাৎ বয়স তাঁকে দেহে মনে কোথাও স্পর্শ করতে পারে নি।

তবে—যতই দেখতে লাগল ততই বুঝল ঐন্দ্রিলা—এ মনোযোগের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই ওঁর কাছে। সাংসারিক জ্ঞানের দিক দিয়ে মানুষটা শিশুর মতোই সরল। তাছাড়া এ ধরনের মনোযোগ ওঁর পরিচিত সকলের সম্বন্ধেই। নজরে পড়ে কম—কিন্তু দৈবাৎ যদি কোন কারণে লক্ষ হয় যে মঙ্গলা বা অক্রূর বা অন্য কোন ওঁর অনুগত লোক ছেঁড়া কাপড় পরে আছে তো, তৎক্ষণাৎ তাকে কিছু না বলে অপর কাউকে দিয়ে একেবারে এক জোড়া কাপড় আনিয়ে দেবেন। দয়া এবং মায়া ভদ্রলোকের সকলকার ওপরই, সেও সেই সকলেরই একজন, তার বেশি কিছু নয়।

এখানে এসে অবধি মেয়েকে কিছু পাঠাতে পারে নি—বিশেষ করে ওর সতীন-পোর কাছ থেকে দেড়টা টাকা ধার করে এনেছে—সেটা অবধি শোধ করা হয় নি—কথাটা কাঁটার মতোই খচ্‌খচ করছিল ঐন্দ্রিলার মনে। কিন্তু প্রথম থেকেই ভদ্রলোক যে অমায়িক ও উদার ব্যবহার করছেন, তারপর আগাম মাইনে চাইতেও লজ্জা করছিল ওর। সংসার-খরচের টাকা থেকে ধারের দেড় টাকা অনায়াসে পাঠাতে পারত কিন্তু পাছে কথাটা কানে গেলে তিনি মনে করেন যে চুরি করছে, সেই ভয়ে পাঠাতে পারে নি।...এখন দিন-কুড়ি-বাইশ কাটতে—মানুষটাকে মোটামুটি চিনে নেবার পর—ভরসা ক'রে কথাটা একদিন পেড়েই ফেলল।

খেতে বসার সময় ছাড়া ওঁকে ধরা মুশকিল, তাও খেতে বসারও কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—তবু যখন হোক একবার বসেন—নইলে বিশ্রাম বলে কোন কথা জানেন না ভদ্রলোক, ডাক্তারি ছাড়াও গ্রামের উন্নতি-উন্নতি করে পাগল, সে জন্যেও (ঐন্দ্রিলার মনে হয়) বহু বাজে পরিশ্রম করেন। সুতরাং সেদিন খেতে দিয়েই কথাটা পাড়ল। মাথা নিচু করে বলল, 'একটা কথা বলছিলুম, কিছু মনে করবেন না—নিতান্ত নাচারে পড়েই বলা—আমার মাইনে তো কিছু ঠিক হয় নি, তা সে যা হয় দেবেন, এখন একটা ঠিকানা লিখে দেব, সেইখানে গোটা আষ্টেক টাকা পাঠিয়ে দেবেন? আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন—এক মাসে না হয় দুইমাসেই শোধ হবে—?'

'তা দেব না কেন, নিশ্চয়ই দেব। বা-রে! কিন্তু কাকে পাঠাবে? তোমার কে আছে তাও তো জিজ্ঞাসা করি নি।'

সত্যিই কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন নি উনি—ঐন্দ্রিলার মনে পড়ল। চেনা লোক চিঠি লিখে পাঠিয়েছে, বামুনের মেয়ে, এ-ই যথেষ্ট। পরিচয় কিছু জানবার কথা মনেই পড়ে নি ওঁর।

ঐন্দ্রিলা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমার একটি মেয়ে আছে বাবু। ওকে নিয়েই বিধবা হয়েছি, বলতে গেলে ওর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই—অনেক কষ্টে, ভিক্ষে দুঃখু ক'রে মানুষ করা—তাও দেখুন না, আমি তো এই ঘুরে ঘুরে বেড়াই—ওর আপন-কাকারা সড় ক'রে এমন বিয়েই দিলে যে এরই মধ্যে আমার মতো হাতের দশা করে বসে রইল। এখনও বোধহয় ওর কুড়ি বছরও বয়স হয় নি। এরই মধ্যে—। এই তো এখনও দু-মাসও হয় নি, দু কি বলছি দেড় মাসও হয় নি—এই দশা হয়েছে। সেখান থেকেই আপনার

BanglaBook.org

এখানে এসেছি।...সতীন-পোর ঘর, একটা বাচ্ছা নিয়ে কি করছে কে জানে, খেতে পাচ্ছে কিনা—'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল অমরবাবুর। বলতে বলতে স্বাভাবিকভাবেই ঐন্দ্রিলার গলা অশ্রুকম্পিত হয়ে উঠেছিল, সেই কণ্ঠস্বর এবং ওর একমাত্র কচি মেয়ের সদ্য-বৈধব্যের বিবরণ শোনার পর তাঁর মতো লোকের গলা দিয়ে ভাত নামা সম্ভব নয়।

তিনিও প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'সে কী? কী হয়েছিল জামাইয়ের? এত শিগ্‌গির—?'

তখন মেয়ের এবং ওর নিজের দুর্ভাগ্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস বিবৃত করতে হ'ল ঐন্দ্রিলাকে। খাওয়া যে ডাক্তারবাবুর বন্ধ হয়ে গেছে,—থালার ভাত কড়কড়িয়ে উঠছে, হাত উঠছে শুকিয়ে—তা ওর নজর এড়ায় নি। খাওয়া আর হবেও না। কথাটা হয়ত এ সময় না পাড়াই উচিত ছিল, অন্তত শেষের দিকে পাড়লেও হ'ত—তাও বুঝতে পারল, কিন্তু এখন আর উপায় কি? যা হবার তা তো হয়েই গেছে—মিছিমিছি এ সুযোগ ছাড়ে কেন সে?

অবিশ্বাস্য কাহিনী, কারুরই বিশ্বাস হবার কথা নয়, প্রথমটা ডাক্তারবাবুরও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু ঐন্দ্রিলা যখন ভাত ছুঁয়ে—ইষ্টদেবতার নামে গুরুর নামে দিব্যি গালল তখন আর অবিশ্বাস করার কোন হেতু রইল না। তিনি যেন কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে লাগলেন। বিশেষত সীতার বিবাহের ইতিহাস শুনতে শুনতে তাঁর চোখের জল বাধা মানল না। তিনি ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এসব কথা তুমি এতদিন বলো নি—চেপে রেখেছিলে! আশ্চর্য মা তো!...তোমার পাওনা হোক না হোক—কটা টাকা আমি দিতে পারতুম না? সেই কচি মেয়েটা—ইস্! হয়ত তারা ওকে খেতেই দিচ্ছে না ভাল করে, বাপ ছিল তবু একটা চক্ষুলজ্জা ছিল।...তাই তো। তুমি ঠিকানাটা লিখে দাও। এখনও বোধহয় সময় আছে, আমি ফর্ম লিখে অক্রূরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ডাকঘরে। এ গাঁয়ে ডাকঘরও একটা নেই ছাই—যেতে আসতে দেড় ক্রোশ যার নাম। তা অক্রূর পারবে, ওর খুব পা। আর দেরি হলেও আমার নাম করলে নিশ্চয়ই নেবেন মাস্টারবাবু—'

এই লোককে নিজের স্বার্থের জন্যে আহারে বঞ্চিত করে এমন কি ঐন্দ্রিলার মনেও অনুশোচনা হ'ল। সে একটু ব্যাকুলভাবেই বলল, 'কিন্তু আপনার যে কিছুই খাওয়া হ'ল না বাবু, ও ভাত তো আপনি খেতেও পারবেন না আর!...কেন যে আবাগী এই সময়ে কথাটা পাড়তে গেলুম।...আপনি বরং বসুন—আমি দুখানা লুচি ভেজে দিই—ঘি ময়দা সবই আছে, দশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে!'

'না, না, ওসব কিছু করতে হবে না।' একটু যেন ধমকই দেন ডাক্তারবাবু, 'আমার ওতেই চলে যাবে। ঠিকানা—তুমি আগে ঠিকানাটা দাও, আর মোটে সময় নেই। দুটো বাজে—অক্রূরের যেতে যেতে তিনটে বেজে যাবে হয়ত—। শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!'

আট টাকা নয়, তিনি একেবারেই কুড়ি টাকাই পাঠিয়ে দিলেন সীতার নামে।

BanglaBook.org

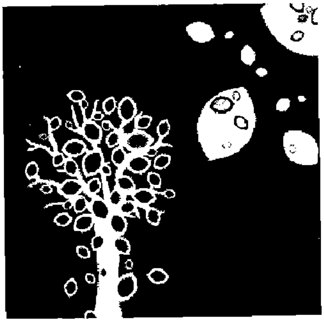

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সীতার সতীন-পোকে চিঠি লিখে নিজের শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে অন্তত মাসখানেকের জন্যে সীতা আর তার ছেলেকে এখানে আনিয়ে নেবে কিনা—এই প্রাচুর্যের মধ্যে মাসখানেক থাকলেও শরীর খানিকটা সেরে যাবে ওদের—এই যখন ভাবতে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলা, তখন একটা অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটল।

এখানে এসে পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর কোন আত্মীয়স্বজনের দেখা যায় নি কোনদিন। তবে তাদের কথা অনেক শুনেছে তাঁর কাছে। ছেলে ভাল চাকরি করে, বোম্বের কোন্ সওদাগরী আপিসে, হাজার টাকার ওপর মাইনে পায়, বাড়ি গাড়ি দিয়ে রেখেছে তারা। খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, এক মিনিটের ফুরসৎ নেই তার। শেষ প্রায় তিন বছর আগে দেখা পেয়েছিলেন ছেলের। সে লেখে সেখানে গিয়ে থাকতে—কিন্তু তাঁর পোষায় না। আর যেন শহরে থাকতে পারেন না তিনি। তাছাড়া অমন করে হাত-পা গুটিয়ে বসে খেলে দুদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন। আর কেনই বা মিছিমিছি জড়ানো? তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন, মানুষ হয়ে গেছে, সেও স্বাধীনভাবে নিজের সংসার নিজে করুক। তিনিও স্বাধীনভাবে থাকুন। ওরা আজকালকার ছেলে ওদের একরকম পছন্দ—তিনি সেকেলে মানুষ তাঁর একরকম—কাছে থাকলেই দুটো কথা বলতে যাবেন, তারা শুনবে না—তখনই অশান্তি। এই বেশ আছেন!

মেয়ে তাঁর দুটি। দুটি মেয়েই ভাল পাত্রে পড়েছে। বড় জামাইও ডাক্তার, সরকারি চাকরি করে, দিল্লীতে থাকে। তার আবার চাকরির বড় ভয়—এর মধ্যেই নাকি দুবার হুম্‌কি দিয়ে শ্বশুরকে চিঠি লিখেছে, তিনি নাকি কী সব স্বদেশী-ওলাদের গোপনে সাহায্য-টাহায্য করেন—এসব দুর্মতি যেন অবিলম্বে ছেড়ে দেন। জানাজানি হ'লে তার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে যে!

'বোঝ ব্যাপার!' ডাক্তারবাবু বলেন, 'তা আমিও তাকে লিখে দিয়েছি—বুঝেছ, যে—বাপু আমি যা কর্তব্য বলে মনে করি তা করবই, করেও এসেছি চিরকাল। সে সময় বাপকেও ভয় করি নি, তা তুমি।...এখন যদি তোমার চাকরির ভয়ে আমাকে কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসতে হয় তাহলে আমার বেঁচে ফায়গা কি, গলায় দড়ি দেওয়াই ভাল।...আর আমিও তো সরকারি পেনসন খাই—আমি বুড়ো মানুষ যদি পেন্‌সন খোয়াবার ভয় না করি—তুমি জোয়ান ছোকরা, তোমার চাকরি খোয়াবার এত ভয় কেন? ডাক্তারি করে খেতে পারবে না, নিজের বিদ্যের এটুকু ভরসা নেই?...আমাকে হুমকি দিতে আসে নিজের চাকরির ভয়ে!...কেন রে বাপু, না হয় সম্পর্কই রাখিস নি এতই যদি ভয়—বলে দিস ও আমার শ্বশুর নয়, ও অন্য কোন লোক! কী বলো, খারাপ লিখেছি কিছু?'

BanglaBook.org

প্রশ্ন করেন কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করেন না—হা হা ক'রে হেসে ওঠেন তার আগেই।

দেখা হয় যা ছোট মেয়ের সঙ্গেই মধ্যে মধ্যে। সে কলকাতায় থাকে, কী তেলের কোম্পানিতে জামাই কাজ করে। মস্ত বড়লোক শ্বশুর—তবু ছেলেকে কোন ব্যবসা ক'রে দিতে পারেন নি, নগদ এক লাখ টাকা জমা দিয়ে ছেলেকে কেশিয়ার ক'রে দিয়ে গেছেন। বছরে দু-একবার ওষুধ আনতে কলকাতা যেতে হয় তাঁকে। সেই সময়ে দেখা হয়। তা মেয়ের বাড়ি থাকেন না তিনি, সে বান্দাই নন—এখানে থেকে থেকে ওঁর তো এই চাষার মতো চালচলন হয়ে গেছে, তারপর কী করতে কী করবেন, শেষে কুটুমবাড়ির লোক হাসবে, মেয়ের মাথা হেঁট হবে। কী দরকার, তিনি হোটেলেই ওঠেন। নিজের একটা ছোট বাড়িও আছে কলকাতায়, সে ভাড়া দেওয়া থাকে, ভাড়াটেরাও বলে গিয়ে উঠতে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক তারা—কিন্তু অমনভাবে যখন তখন গিয়ে উৎপাত করতে ইচ্ছে করে না তাঁর। তার চেয়ে হোটেলেই ভাল—স্বাধীনভাবে থাকা যায়।...

এদের কথা এসে অবধিই শুনছে ঐন্দ্রিলা, অনেকবার শোনা হয়ে গেছে। কিন্তু কখনও যে কাউকে দেখবে সে সম্ভাবনা ছিল না। যা বিবরণ শুনছে, নেহাৎ বাপের অসুখ না করলে এত কাণ্ড ক'রে কেউ দেখতে আসবে বলে মনেও হয় নি। ও তো এই কদিন এসেছে—মঙ্গলাও বলে, 'বাবুর যে সাত কুলে কেউ আছে তা মনে হয় না, কেউ কোনদিন খোঁজখবর করে না। যা করে ঐ চিঠি। তাও কৈ মাসে মোট পাঁচখানা চিঠি আসে তো ঢের, অথচ শুনেছি বাবুর একঘর আপ্তস্বজন। বৌই নেই, তা বই আর সব তো আছে!'

কেউই কোনদিন আসে না—শুধু ঐন্দ্রিলার কপালেই হঠাৎ একদিন কোথা থেকে ডাক্তারবাবুর ছোট শালা এসে হাজির হলেন। তিনি নাকি রেলের কি একজন হোমরা-চোমরা, কোলাঘাটে এসেছিলেন রেলের পুল দেখতে, মাঝে রবিবার পড়ে গেছে দেখে ভগ্নীপতির খবর নিতে এসেছেন। ডাক্তরবাবু অবশ্য খুবই খুশি হয়ে উঠলেন, হৈচৈ চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বললেন, 'আজ কিন্তু মাছ রাঁধতে হবে বাপু, আমাদের রঘুনাথ আবার মাছ-মাংসের বড় ভক্ত, অক্রূরকে পাঠিয়েছি জেলের বাড়ি—জাল ফেলতে বলেছি পুকুরে—দ্যাখো কী পায়।...তা না পেলেও কোন ক্ষতি নেই বুঝলে রঘু, আমাদের এই বামুন ঠাকরুনের নিরিমিষ রান্না অমৃত। খেলে বুঝবে। যা ধোঁকা করে, মাছ ফেলে খাবে!'

রঘুনাথের কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে দেখেই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তিনি তেমনি ভাবেই ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে বললেন, 'তা ইনি—মানে এঁকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। ইনি কবে এলেন, কৈ আমাকে কিছু লেখেন নি তো!'

'কাউকেই লিখি নি।' বোধ করি ওর কথার ধরনটা ভোলানাথ ডাক্তারবাবুরও ভাল লাগল না; তিনি বললেন, 'হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছিলুম নিজে সে কথাও তো তোমাকে কখনও লিখি নি। রাধবার একটা লোক পেয়েছি—এ আর এমন ঘটা করে জানাবার মতো কী খবর। আমার বন্ধু এক স্টেশন মাস্টারের কি জানা-শুনো, তিনিই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই থেকে আছে। বড় স্যাড হিস্ট্রী হে মেয়েটির, শুনলে চোখে জল রাখতে পারবে না। একটিমাত্র মেয়ে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা হয়েছিল, সে মেয়ের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়—সেও বিধবা হয়েছে কুড়ি বছর না পেরোতেই। সমস্ত ইতিহাসটা যদি ওদের শোন তো অবাক হয়ে যাবে, একেবারে উপন্যাসের মতো।'

ঐন্দ্রিলা প্রথম একটু দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁর ভ্রূকুটি দেখেই সরে গিয়েছিল, কিন্তু চোখের আড়ালে গেলেও শ্রুতি-সীমার বাইরে যায় নি। সে শুনতে পেল রঘুনাথ চাপা গলায় বললেন, 'মতো কেন—খুব সম্ভব উপন্যাসই। সত্যিমিথ্যে কে আর যাচাই করছে!'

Banglabook.org

'ছিঃ, অত সিনিক হয়ো না হে। মানুষকে অত অবিশ্বাস করতে নেই। আর আমি এতকাল এত মানুষ চরাচ্ছি, এটুকু কি আর বুঝি না—কে সত্যি বলছে আর কে বানিয়ে বলছে!'

ডাক্তারবাবু মৃদু অনুযোগের সুরেই বলেন কথাগুলো।

রঘুনাথ আর কথা বাড়াল না, শুধু একটা 'হুঁ' বলে চুপ ক'রে যান। সে দীর্ঘছন্দে উচ্চারিত 'হুঁ'-র অর্থ ঢের; অনেকখানি অবিশ্বাস, বিদ্রূপ এবং মানব-চরিত্রে ভগ্নীপতির জ্ঞান সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশ পায় তাতে। অমরবাবু অত বোঝেন কিনা কে জানে, তিনিও চুপ ক'রে যান তখনকার মতো।...

রঘুনাথ পরের দিন ভোরে উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ঐন্দ্রিলার অস্বস্তির ভাবটা যেতে চাইল না। ওর কেমন মনে হ'ল এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ হ'ল না—এর পরের জন্যেও কিছু তোলা রইল।

কথাটা অমরবাবুর কাছেও একবার পাড়ল সে, 'আপনার শালাবাবুর বোধহয় আমাকে রাখাটা খুব মনঃপূত নয়। আপনি একা থাকেন এখানে—'

ওর বক্তব্য শেষ হবার আগেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অমরবাবু, 'ও হো, তুমি বুঝি ওর কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলে? সিলি! চিরকালটা ওর অমনি গেল, যেখানে সেখানে যা-তা বলে বসে দুম্ ক'রে।...ও কিছু না, ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। যখন যা মনে আসে বলে ফেলে—ও পাগল একটা।'

কিন্তু সদাশিব অমরবাবু যত সহজে উড়িয়ে দিলেন তাঁর শালাকে, তত সহজে উড়ে যাবার লোক বলে ঐন্দ্রিলার মনে হ'ল না। আশঙ্কা একটা থেকেই গেল মনে মনে। আর সেটা যে নিতান্ত অমূলক নয়—বোঝা গেল মাত্র কদিন পরেই।

চিঠি আসেই মধ্যে মধ্যে—ডাক্তারবাবু পড়ে কোথাও গুঁজে রেখে দেন, নাতি-নাতনীদের চিঠি পেলে আনন্দ ক'রে শোনান ঐন্দ্রিলাকে। সেদিন যখন চিঠিটা এল তখন দুটো বাজে। খাওয়া-দাওয়ার পর কী একটা জরুরি কাজে বেরোচ্ছিলেন সেই মুখে ডাকঘর থেকে চিঠিটা এনে দিল অক্রূর। খামের চিঠি—স্বাভাবিকভাবেই হাসি হাসি মুখে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়লেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু ঐন্দ্রিলা লক্ষ করল চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। ঐন্দ্রিলা বাইরে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল—সে তখন নিজে খেতে যাচ্ছে—হয়ত কোন দুঃ-সংবাদ মনে ক'রে খানিকটা দাঁড়িয়েই রইল সে। সেরকম হলে ডাক্তারবাবু এখনই ডেকে বলবেন—কিন্তু তিনি কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না, যে জরুরি কাজে যাচ্ছিলেন তার কথাও মনে পড়ল না বোধহয়—চুপ ক'রে যেন গুম হয়ে বসে রইলেন।

খানিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐন্দ্রিলা এসে খেতে বসল। রান্নাঘর থেকে ডাক্তার-খানার ঘরটা—সেইটেই অমরবাবুর বসবার ঘরও বটে—পরিষ্কার দেখা যায়। আরও বহুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন তিনি, তারপর উঠে তেমনি অন্যমনস্কভাবেই বেরিয়ে গেলেন। অন্যদিন যাবার সময় ওকে বলে যান, দোর দিতে বলেন—আজ তাও বললেন না, এমন কি চিঠিখানা খামে পুরে কোথাও সরিয়ে রাখা কি ছিঁড়ে ফেলার কথাও মনে রইল না। সেটা বাতাসে উড়তে লাগল, হয়ত একটু পড়ে উড়ে বাইরেই চলে যাবে।

কোনমতে তাড়াতাড়ি ভাত কটা নাকে-মুখে গুঁজে উঠে পড়ল ঐন্দ্রিলা, নেহাৎ বিধবা মানুষ, একবার পাত থেকে উঠলে আর ফিরে সে পাতে বসতে নেই তাই—নইলে তখনই গিয়ে চিঠিটা কুড়িয়ে পড়ত। কৌতূহলে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। কৌতূহল আর সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও। কে জানে কে কি লিখেছে, কোন সাংঘাতিক রকমের দুঃসংবাদ কিনা।

BanglaBook.org

আঁচিয়ে এসে চিঠিখানা মেজে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পড়ল। লেখা-পড়া তার বিশেষ জানা নেই, ছেলেবেলায় ছোট মাসী অনেক চেষ্টা ক'রেও সেদিকে এগোতে পারেন নি, বই পড়ার থেকে রান্না-বান্নার কাজই বেশি ভাল লাগত তার—তখন কে জানে যে একদিন এই কাজ ক'রে খেতে হবে!—তবু এ চিঠির হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার, গোটা গোটা, পড়তে কোন অসুবিধাই হ'ল না। চিঠিটা লিখেছে রেণু, অমরবাবুর ছোট মেয়ে—নিচে নাম-সই দেখে বুঝতে পারল।

লিখেছে—"শ্রীচরণেষু বাবা, ছোট মামার মুখর শুনিলাম বৃদ্ধবয়সে তুমি একটি মেয়েমানুষ রাখিয়াছ, তাহাকেই গৃহিণীর পদে বসাইয়া সুখে ঘর-সংসার করিতেছ। হয়ত বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু বলিতে বলিতে ছোট মামার মুখে যে বিজাতীয় ঘৃণ্য ও রাগের ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে কথাটা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম। ছি ছি, তোমার এই অধঃপতনের কাহিনী শোনার আগে আমাদের মরণও ঢের ভাল ছিল। ইঁহারা—আমার শ্বশুরবাড়ির লোক জানিতে পারিলে কী বলিবেন, আমি কি আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিব! আমাদের মুখ না চাও, এত শীঘ্র তুমি আমাদের সতীলক্ষ্মী মায়ের কথা ভুলিয়া যাইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি যে স্বামী-অন্ত-প্রাণ ছিলেন। ২৫ বছরেরও উপর তিনি তোমার সহিত ঘর করিয়াছেন, তোমার জন্যই সারা জীবন পাত হইয়াছে তাঁর! এই কাজ করার আগে আমাদের সেই মার কথা মনে পড়িল না। আশ্চর্য! এই জন্যই তাহা হইলে তুমি ওখানে থাক—এই তোমার দেশের কাজ, নরনারায়ণের সেবা! তুমি ভাবিয়াছিলে যে কলিকাতায় বসিয়া এই কীর্তি করিলে বড় জানাজানি হইবে—ঐ বন-জঙ্গলে বসিয়া যা-খুশি করিবে কেহ টের পাইবে না! কিন্তু ধর্মের কল যে বাতাসেই নড়ে, সেটা বুঝি ভাবিয়া দেখ নাই। যাক্—তোমাকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, তোমাকে লইয়া কত গর্ব আমাদের। সে গর্ব ধুলায় মিশাইয়া গেল। তুমি এসব করার আগে একবার ছেলে-জামাইদের কথাও ভাবিলে না। ভালই হইল, তোমার জন্য কোন চিন্তা কি কর্তব্যবোধ রহিল না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কেরও এই শেষ। আজই দাদা ও দিদিকে চিঠি লিখিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারাও না তোমাকে চিঠি দিয়া বা সংবাদ লইয়া বিরক্ত করে। আজ হইতে শুধু তোমার মৃত্যু-সংবাদেরই অপেক্ষা করিব। আর কোন সংবাদে কাজ নাই। ইতি—রেণু।"

চিঠিটা পড়তে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ঐন্দ্রিলার। বার দুই চেষ্টা ক'রে পড়তে হ'ল। তারপর পূর্ণ অর্থটা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা আগুন হয়ে উঠল তার। সেই আগুন, যার সামনে লোকের সমস্ত সহানুভূতি জ্বলে-পুড়ে যায়—ওর অদৃষ্টের আগুন! সেই প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারী ক্রোধ—যা এখানে এসে পর্যন্ত এই কমাস, ওর পক্ষে বহুদিন, অনুভব করে নি—সেই চণ্ডাল ক্রোধে ফেটে পড়ল সে। শূন্য ঘরেই চিৎকার ক'রে গালাগাল দিতে লাগল,—

"মুখে আগুন তোমার! তোমার মরণ হয় নি কেন এ চিঠি লেখার আগে! শয়ে চড়ো নি কেন! বেশ তো, এত যদি ঘেন্নাপিত্তি, এ চিঠি না লিখে কড়িকাঠে ঝুললে না কেন! সেই তো ভাল হ'ত।...মর্ মর্ মর্। নিমতলায় যা। নিমতলায় গেলে উদ্ধার হয়ে যাবি—খাল ধারে যা। ভাতার পুত নিয়ে যা একেবারে। ওলা-উঠায় মর্ তোরা গুষ্টিসুদ্ধ। প্লেগে মর্। মুখে যেন জল দেবার কেউ না থাকে মরবার সময়ে। তোদের বংশের নামসুদ্ধ শয়ের জলে ধুয়ে-মুছে যাক! বংশে বাতি দিতে কেউ যেন না থাকে ত্রিভুবনে। মেয়েমানুষ! কত বড় আস্পদ্দার কথা! বাজারের মেয়েমানুষ আমি! আমার মতো শুধু-হাত সাদা-সিঁথে হোক, সব্বস্ব খুইয়ে পথে বোস্—তবে বুঝবি কী দুঃখে এই কাজ করতে আসে লোকে।...আমি যেখানে পা ধোব সেখানে তোদের মা-শাশুড়ীরা দাঁড়াতে পারবে না। আমাকে মেয়েমানুষ

BanglaBook.org

বলা! আমি রাঁড়, আমি খান্‌কী? তোদের চোদ্দপুরুষে যে যেখানে আছে খান্‌কীগিরি করুক ।...খান্‌কীগিরি করার কত মজা টের পা!'

অনেকক্ষণ ধরে সেই শূন্য বাড়িতে ভয়াবহ চিৎকার করে চলল ঐন্দ্রিলা। মেয়েকে গালাগাল দেওয়া শেষ হ'তে মেয়ের মামাকে নিয়ে পড়ল। তারও সর্বনাশ হবে। ওর হাতে চব্যচোষ্য খেয়েগিয়ে ওর নামে এই অপবাদ রটানো। ওর অবীরে সদ্য-বিধবা কচি মেয়েটাকে তবু যা হোক দয়াধর্ম করছে লোকটা—সেই পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা! ধর্মে সইবে না এ-সব। ওরও যদি সপুরী এক গাড়ে না যায় তো ঐন্দ্রিলা কী বলেছে! কেউ কারও মুখে জল দিতে থাকবে না, মরবার সময় কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি আসা, চিঠি পড়া এবং তার এই প্রতিক্রিয়া যখন ঘটছে, তখন আশপাশে কেউই ছিল না। অক্রূর হাটে গেছে, মঙ্গলাও গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে মেয়ের বাড়ি। সে যখন ফিরল তখনও ঐন্দ্রিলার আস্ফালন এবং চিৎকার চলছে। তার এ চেহারা মঙ্গলা কখনও দেখে নি। শান্তশিষ্ট ভালমানুষ না হোক, দজ্জালও নয় সে—এই ছিল মঙ্গলার ধারণা। সে মনে করল নির্ঘাৎ বামুন-দি পাগল হয়ে গেছে, নয় তো ভূতে পেয়েছে। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল ডাক্তারের খোঁজে, ডাক্তার যদি এসে সামলাতে পারে।

কিন্তু মঙ্গলাকে ঐ ভাবে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে দেখে ঐন্দ্রিলার কতকটা হুঁশ হ'ল। বোধহয় ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল খুব। এইবার চুপ করল সে। খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে, মাথায় খুব ক'রে জল থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে দিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল। তারপর উঠে স্বাভাবিক নিয়মে কাজকর্ম করতে শুরু করল।

প্রথমটা মনে হয়েছিল আজই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু উম্মার উন্মত্ততাটা কমতে, যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল—তখন মনে পড়ল সীতার কথাটা। ভদ্রলোক ওকে মাস মাস মাইনে বলে পনেরো টাকা দিচ্ছেন। তা ছাড়াও সীতাকে আলাদা টাকা পাঠাচ্ছেন—কোন মাসে দশ, কোন মাসে পনেরো। ঐন্দ্রিলা ভদ্রতার খাতিরে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল—উনি শোনেন নি। বলেছেন, 'ওর ভার যখন আমি নিয়েছি, তখন আমার দায়িত্ব। তোমার পাঠাতে হয় তুমি আলাদা পাঠাও গে।'

বলা বাহুল্য ঐন্দ্রিলা তা পাঠায় নি। ওর মাইনের টাকা সবই জমছে। এ রকম এর আগে আর কখনও হয় নি। একটা বাড়তি পয়সা পর্যন্ত থাকত না। কম দুর্ভোগ ভোগে নি তার জন্য। মেয়েটাকেও কম ভুগতে হয় নি। দুঃসময়ে মার কাছে দুটো ভাত মিলেছে বটে—কিন্তু সে শুধুই দুটো ভাত, তার বেশি কিছু নয়। কেঁদে-ককিয়েও কখনও একটা টাকা বার করতে পারে নি মার কাছ থেকে। যদি দু-চারটে টাকা হাতে জমে তো জমুক—বলা তো যায় না—কখন দুঃসময় আসে। অসুখেই যদি পড়ে, সে কিম্বা মেয়ে কিম্বা নাতি—তখন চিকিৎসা লাগবে। এখন বেশি টাকা পাঠালে সতীনপোরা এলাকাঁড়ি দেবে।

না, এ যদি সাধারণ চাকরি হ'ত তো আজই চাকরিতে লাথি মেরে চলে যেত ঐন্দ্রিলা। এ চাকরি ছাড়া চলবে না। অন্তত সে নিজে থেকে ছাড়বে না এটা ঠিক, উনি যদি ছাড়ান সে আলাদা কথা। তবে তাও সহজে ছাড়বে না সে।

সেদিন আর বিশ্রাম নেওয়া হ'ল না ঐন্দ্রিলার। মাঠের দিকে চেয়ে বুঝল বেলা পড়ে এসেছে। তখনই কাজে লেগে গেল। আরও পরিপাটী ক'রে সেদিন ঘরদোর ঝাড়ল মুছল সাজাল। ডাক্তারখানাও যতটা সাফ্ করা সম্ভব করল। তারপর রান্নাঘর নিকিয়ে নিয়ে বিকেলের রান্নায় মন দিল।

ততক্ষণে মঙ্গলা ফিরেছে। ডাক্তারকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সে ভয়ে-ভয়েই আসছিল; কিন্তু দূর থেকে বাড়ি নিস্তব্ধ শুনে ভরসা করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বামুনদিকে

BanglaBook.org

সহজ মানুষের মতো কাজকর্ম করতে দেখে প্রথমটা বেশ একটু অবাকও হয়ে গেল তবে কোন প্রশ্ন করল না। সে শুনেছে এই 'ক্ষ্যাপে-পাগল' লোকগুলোকে তাদের পাগলামীর কথা মনে করিয়ে দিলেই তারা আবার ক্ষেপে ওঠে। কিছু বলল না বটে, তবে একটু দূরে দূরেই রইল। সে রকম লক্ষণ আবার দেখলে সোজা 'রড়' দেবে।

তবে আর তেমন কিছু দেখা গেলও না। স্বাভাবিকভাবেই কথা-বার্তা বলল ঐন্দ্রিলা, কাজ যা করতে হবে তাও বাৎলে দিল। বরং মঙ্গলা দেখল আজ খাওয়ার জুৎ খুব। ছানা কাটানো হচ্ছে, ছানার ডালনা হবে, ভাল করে ছোলার ডাল হচ্ছে। এই মানুষই যে চার দণ্ড আগে অমন ক'রে তুড়ি-লাফ খাচ্ছিল তা মনে হয় না। কে জানে পাগল না ভূতে-পাওয়া। রাম রাম!...বার বার রাম নাম স্মরণ করতে লাগল মঙ্গলা।

সেদিন ডাক্তার ফিরলেন বহু রাত্রি ক'রে। ঐন্দ্রিলা আড়ে চেয়ে দেখল, উস্‌কো-খুস্‌কো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। চোখ-মুখ বসে গিয়েছে এই ক' ঘণ্টাতেই। কে জানে হয়ত এতক্ষণ শুধু শুধুই মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

একটু প্রমাদ গুণল ঐন্দ্রিলা। আঘাতটা যদি এতখানি লেগে থাকে তাহ'লে কী হয় বলা মুশকিল। হাজার হোক ছেলেমেয়ের টান। মা-মরা ছেলে-মেয়ে সব। একটা রাঁধুনী বামনীর জন্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে তা সম্ভব নয়। কিন্তু সেও সহজে ছাড়বে না। এক কথাতেই বা সে যাবে কি জন্যে! তাদের সন্দেহ হয় এসে দেখে যাক না, মামা একবেলা দেখেই সব বুঝে ফেলল একেবারে! বুড়ো তাই কেন লিখুক না, এসে দেখে যেতে!

কিন্তু তখনই মুখে কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি গাড়ু আর গামছা এগিয়ে দিল, মঙ্গলাকে বলল একটু বাতাস করতে। তারপর মুখ-হাত ধোওয়া হ'লে পরিপাটী ক'রে সাজিয়ে খেতে দিল।

খেতে বসে তৃপ্ত হলেন অমরবাবু। ছানার ডালনা তিনি ভালবাসেন কিন্তু এ বামুন ঠাকুরুণের মতো কেউ রাঁধতে পারে না। আর এই ছোলার ডাল, মাংস ফেলে খাওয়া যায়। খেতে খেতে সমস্ত ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার ছাপ মিলিয়ে গেল কপাল থেকে—সে জায়গায় ফুটে উঠল একটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তি।

তৃপ্ত হয়েছেন বাড়িতে পা দিয়েই। বহুদিন লক্ষ্মীছাড়ার মতো বাস করছেন, তবু সাজানো ঘর, শুভ্র শয্যা দেখলে আজও মনটা প্রফুল্ল হয়।

খেয়ে উঠে প্রাচুর্যের উদ্গার এবং পরিতৃপ্তিসূচক শব্দ করতে করতে বাইরের বারান্দায় বসে সবে একটি বিড়ি ধরিয়েছেন—ঐন্দ্রিলা গিয়ে দাঁড়াল।

'ওকি, তুমি খেলে না?'

'যাচ্ছি। আর খাওয়া তো একেবারে উঠল এখান থেকে। সেই কথাই বলতে এসেছি, আমাকে কালই যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন, আমি চলে যাই—'

'চলে যাই? তার মানে—?' ডাক্তার তখনও বুঝতে পারেন না।

'কী করে আর থাকব বলুন! গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি, এমন দুর্নাম কিনে পড়ে থাকব কেন! আমাদের যতদিন খাটবার শক্তি আছে—চার দোর খোলা। বড় বংশের মেয়ে—বড় বংশের বৌ, পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছি বলে এ-সব কথা শুনতে রাজি নই!'

ঠিক এভাবে হয়ত বলবার ইচ্ছে ছিল না, হঠাৎ বলার ঝোঁকে বলা হয়ে গেল। একটু ভয়ও করতে লাগল, বুড়ো যদি রাজি হয়ে যায়।

যদি রাজি হয়ে যায় তো কথাটা কীভাবে ঘোরাবে ভাবছে—কিন্তু তার আগেই অমরবাবু তার দুশ্চিন্তার অবসান করে দিলেন, 'ওঃ, সেই চিঠিটা পড়েছ বুঝি! আমারই উচিত ছিল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাওয়া...নন্‌সেন্স।...যে মেয়ে বাপের চেয়ে মামাকে বেশি

BanglaBook.org

বিশ্বাস করে, এতকালের পরিচয়ের থেকে শোনা কথাকেই বড় মনে করে—তার ও চিঠি আমি গ্রাহ্যই করি না। তার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তো বড় বয়েই গেল। একবার জিজ্ঞেসা করাও দরকার মনে করল না গুজবটা সত্যি কিনা! তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তাদের দিন তারা কিনে নিয়েছে—তাদের প্রতি আমার কর্তব্যেরও শেষ। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কতটুকু—দেখছই তো, তারা কি আমার খোঁজ নিচ্ছে, না কেউ নিজের সংসার ছেড়ে আমার কাছে এসে দুদিন থাকছে। হ্যাঁ, আমি যদি যাই তো তারা দেখবে—ভাত-হাঁড়ির ভাত দুটি দেবে।...না, আমার তাতে দরকার নেই! ঢের করেছি তাদের জন্যে, এখন আমি আমার মতো ক'রে একটু বাঁচতে চাই। আমার যা কর্তব্য বলে মনে করি তাই করব। তাদের ইচ্ছে হয় তারা বাবা বলবে, না ইচ্ছে হয় বলবে না। যদি মরে যাই—এরাই দেখবে। তাদের ইচ্ছা থাকলেও হয়ত তারা আসতে পারবে না।...হুঁ!...নাও, নাও তুমি খেয়ে-দেয়ে নাও গে। ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না!'

সোজাসুজি কথাটা পাড়াতেই বোধহয় ভাল হ'ল। অমরবাবুর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকু কেটে গেল। এসব লোককে তাতালেই কাজ হয়, আর তাতাবার পক্ষে এই সোজাপথই ভাল।

ঐন্দ্রিলা মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে।

॥ ২ ॥

শীতের গোড়ার দিকে একদিন শ্যামার একখানা চিঠি পেল ঐন্দ্রিলা। বহুদিন পরে দেখলেও মার হাতের লেখা চিনতে কোন অসুবিধা হ'ল না। মা চিঠি লিখল কেন? কখনও তো লেখে না! চিঠিই তো আসে না তার নামে। কখনও-কখনও যা মেয়ে লেখে। তার সেই আঁকাবাঁকা গোল গোল হরফ দেখতেই চোখ অভ্যস্ত। এ মায়ের মুক্তোর মতো অক্ষর সাজানো, সোজা লাইন—দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। বয়সে এবং অনভ্যাসে হরফের রেখাগুলো একটু এঁকেবেঁকে গেছে—ঠিক আগের মতো নেই বটে, তবু ছাঁদটা সেইরকমই সুন্দর আছে। ছাপার মতো লেখা ছিল এককালে, এখনও সে আদলটা ধরা যায়।

কিন্তু কী লিখল মা?

নিশ্চয় নতুন কোন দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদ ছাড়া মা পোস্টকার্ডের একটা পয়সা খরচ করে নি।

কিন্তু দুঃসংবাদটাই বা কার?

মার কোন খবর—যত খারাপই হোক, কখনও তো তাকে জানায় না। তবে কি তারই কিছু? সীতার—?

অকস্মাৎ যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে ভয়ে। হেমন্তের সেই প্রায়-শীতল দিনেও কপাল গলা ঘেমে ওঠে।

হাতেই পোস্টকার্ড খানা—তবু পড়তে সাহস হয় না।

বহুক্ষণ সেইভাবে বসে থাকে। শেষ যখন ডাক্তারবাবুই ডেকে বলেন, 'কার চিঠি, কই পড়ছ না তো!' তখন অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। মনে করে, যাট্ বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—দুঃসংবাদ শুনে শুনে তো কানে কড়া পড়ে গেছে, কত আর খারাপ হবে! সে জোর করে চিঠিখানা তুলে ধরে চোখের সামনে।

দীর্ঘ চিঠি, ক্ষুদি ক্ষুদি লেখা। সমান লাইন আর সমান হরফ বলে অনেক কথাই ধরেছে একখানা কার্ডে। এক পয়সায় দুপয়সা খরচের কাজ সেরেছেন শ্যামা।

তিনি লিখেছেনঃ—

BanglaBook.org

"কল্যাণীয়াসু, খেঁদি তোমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনে লিখিতেছি। তোমার ছোট বোন তরু এতদিন গুম্-পাগল ছিল এবার সে রীতিমত পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন মল্লিকদের পুষ্করিণীতে মাছ ধরানো হইয়াছিল, আমার বাড়ি আজকাল ও পাট নাই বলিয়া তাহারা কান্তি ও বলাইয়ের মতো মাছ রান্না করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। উহারা খাইতে বসিয়াছে এমন সময়ে তরু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কান্তির পাত হইতে দুইখানা মাছই তুলিয়া লইয়া খাইতে শুরু করিয়া দিল। আমরা হাঁ হাঁ করিয়া ওঠায় হাসিতে হাসিতে কাপড়ের মধ্যে করিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। ইহার পর হইতে উপদ্রব বাড়িয়াই চলিয়াছে। এটা-ওটা ভাঙ্গিতেছে, পগারে ফেলিয়া দিতেছে—চুরি করিয়া খাওয়া তো আছেই, ভাত-ব্যঞ্জন ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিতেছে প্রত্যহ। মধ্যে মধ্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া ওঠে, ডাক ছাড়িয়া কাঁদেও। সেদিন কখন বাহির হইয়া গিয়া মহাদেবের মার ঘর হইতে মাছের টক চুরি করিয়া খাইয়াছে। আমি একা লোক, কান্তি বাড়ি থাকে না—সে দিনরাত চাকরির খোঁজে টো টো করিয়া ঘোরে, পাগলকেই বা কে দেখে, আর দুটো ভাতই বা কে ফুটাইয়া দেয় তাহার ঠিক নেই। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তো আছেই। ধোওয়া মোছা ঝাঁট দেওয়াই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মহা কান্তির জন্য একটা সম্বন্ধ আনিয়াছিল, মা-মরা মেয়ে—কান্তি কিছুতেই রাজি নয়। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায় হয়, তুমি যদি আসিয়া কিছুদিন থাকো। ইতিপূর্বে তোমার দুঃসময়ে আমি অনেকবার ঠাঁই দিয়াছি, এখন আমার দুঃসময়ে তোমার দেখা উচিত। যদি মেয়ের কথাই বড় হইয়া ওঠে তো আমি তাহার জন্যও মাসে মাসে চার টাকা করিয়া দিতে রাজি আছি। আর তোমার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। আমার আশীর্বাদ লইও। হেমরা পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে আজকাল। ইতি—আশীর্বাদিকা মা।"

চিঠি পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ঐন্দ্রিলা। বিশ্বাস হচ্ছে না, নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। চোখে দেখেও মনে হচ্ছে না যে সেই ঠিক দেখছে। আর একবার উল্‌টেপাল্‌টে দেখল চিঠিটা। মারই হাতের লেখা তো?

মা মাসে মাসে সীতাকে চার টাকা করে পাঠাতে রাজি হয়েছেন—এ যে কতখানি নাচারে পড়ে তা একমাত্র সে-ই বুঝেছে। কোথাও কোন উপায় না দেখেই এই চিঠি লিখেছেন বাইরের লোক, ঝি-চাকর দিয়ে তাঁর সংসারের কাজ হবে না —তা মা বিলক্ষণ জানেন।

প্রাথমিক স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে ঐন্দ্রিলার সর্বপ্রথম যে প্রতিক্রিয়া হল সেটা হচ্ছে উল্লাসের। একটা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতে লাগল সে। বেশ হয়েছে। ..... এই মেয়ের জন্যে এক এক সময় বিপদে পড়ে দুটো একটা টাকা চেয়েছে সে, কাকুতিমিনতি করেছে তবু মা দেন নি—টাকার আণ্ডিলের ওপর থাকেন—ওর সামনেই কত লোককে শুধু হাতে ধার দিয়েছেন, তবু ওকে দেন নি। ওর কচি মেয়েটা সেখানে শুকিয়ে উপোস করে মরছে জেনেও তাঁর এমন স্বত্ব পোরে নি যে একটা টাকা বার করে দেন। কত টাকা তো মারাও যাচ্ছে, সুদ ছেড়ে আসল পর্যন্ত ডুবছে, না হয় নিজের নাতনীকে দানই করতেন! বেশ হয়েছে, মাথার ওপর যে ভগবান আছেন, তা এইতেই প্রমাণ হয়।

ঐন্দ্রিলা চিঠিখানা রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজে রেখে কাজে লেগে গেল। মরুক গে, ও চিঠির জবাবও দেবে না সে।

কিন্তু কাজ করতে করতে বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল সেদিন।

হাজার হোক মা। অনেক করেছেনও—তাতে সন্দেহ নেই। নিজেরই মা ভাই বোন। সমস্ত কথা ছাপিয়েও, সমস্ত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও—রক্তের টানটা যেন মনে মনে প্রবল হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে। বস্তুত রক্তের টান যে এমন হয়, রক্তের টান যে কথার কথা নয়—একটা কিছু সত্যিই আছে—আজ প্রথম অনুভব করল সে। খুবই নাচারে পড়েছেন মা, খুবই বিব্রত হয়ে উঠেছেন। সত্যিই গোটা বাড়িটা ধোয়ামোছা করা নিকোনোই তো একটা মানুষের পক্ষে কষ্টকর। মার শরীরটাও ইদানীং ভাল যাচ্ছে ন., কুঁজো হয়ে পড়েছেন। আজকাল বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে চলেন সামনের দিকে। তার বয়সটাই কি কম হল! তার ওপরে চারটে ভাইবোন হয়েছিল—দাদার বয়সই বোধ হয় পঞ্চাশের ওপর হয়ে গেল। কে জানে, অত হিসেব থাকেন না, কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। তবে মার বয়সও ঢের হয়েছে, তার ওপর কী দুঃখকষ্টটাই না করেছেন সারাজিবন—সেই দশ এগারো বছর বয়স থেকে। কবে ভেঙ্গে পড়বার কথা, অন্য মানুষ হলে মরেই যেত—নয়তো শয্যাশায়ী হয়ে থাকত। এ শুধু ওঁর অসাধারণ মনের জোরেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, এখনও খাটছেন। ....

ভাবতে ভাবতে কখন হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা মনেও নেই ঐন্দ্রিলার। অকস্মাৎ এক সময় হুঁশ হল মঙ্গলা অবাক হয়ে মুখের পানে চেয়ে আছে দেখে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আবার জোরে জোরে হাত চালাতে লাগল সে।

'কী গো, দেশঘাট থেকে কী খবর এল? সেই থেকে অমনি করতে লেগেছ? মঙ্গলা প্রশ্ন করে, 'কে লিখেছে পত্তর?'

'মা লিখেছেন, আমার মা। বোনের খুব অসুখ। তাই লিখেছেন।'

কুটনো কুটতে কুটতে আবারও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ঐন্দ্রিলা। তরুটারই বা কি কপাল! সত্যি বোনে বোনে কপাল নিয়ে ওরা জন্মেছিল বটে। মার গর্ভেরই দোষ। দিদিমার রক্ত। দিদিমার রক্ত যেখানে আছে সেখানে কেউ সুখী হবে না। শুধু দিদিমার দোষ দিয়েই বা কি হবে—তার বাপের বংশ তো আরও চমৎকার।

একসময়ে তরুকে সে হিংসে করত। ছিছি! ...... সে তো তবু যে কদিন হরিনাথকে পেয়েছে পরিপূর্ণভাবেই পেয়েছে, কাউকে ভাগ দিতে হয় নি! শ্বশুরের ভালবাসাও। তার মতো শ্বশুর জন্ম জন্ম তপস্যা করলে তবে পাওয়া যায়। অদৃষ্টে নেই, গেল জন্মে কার পরিপূর্ণ সুখের বাসায় আগুন লাগিয়েছিল, তাই এ জন্মে তারও সুখের বাসায় আগুন লাগল।

না, তরুটা তার চেয়েও হতভাগা। সে তো তবু গতর খাটিয়ে করে কম্মে খাচ্ছে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে আছে—স্বাধীনভাবে। তরুটার কী হাল! সবচেয়ে অভিশাপ পাগল হয়ে যাওয়াটা। তরুটা শেষে পাগল হয়ে গেল। বরাবরই ঐরকম ছিল, গুম্‌পাগল মতো—ঐন্দ্রিলা মনে করত কল্লা (এখন কথাটা মনে হয়ে লজ্জাই করতে লাগল তার)—কেন অমন হল কে জানে। এই ডাক্তারবাবু বলছিলেন সেদিন —কী সব খারাপ ব্যামো থাকলে, লোকে হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। কে জানে হারানের ওসব ছিল কিনা। ডাক্তারবাবু বলেন, হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া, হঠাৎ কালা হয়ে যাওয়া—ওসব রক্তে দোষ থাকার ফল। অবশ্যি অন্য কারণেও হয়—কিন্তু যেখানে সেসব কারণ নেই—? মা তো বলে বাবারও কী সব খারাপ ব্যামো ছিল। বাবা গো, ভাবলেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে। সেও ঐরকম পাগল হয়ে যাবে নাকি কোনদিন?

আবারও একসময় খেয়াল হল যে হাত থামিয়ে সে বসে বসে ভেবেই চলেছে!

দূর হোক গে ছাই। ভেবে আর কী করবে সে। যা হবার তা হবেই। কিন্তু মার চিঠিটা—। চলেই যাবে নাকি? সে নিজেও বুড়ো হ'তে চলেছে, বুড়ো মার অবস্থাটা বুঝতে পারছে বৈকি! বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন নিশ্চয় মা, নইলে এ চিঠি কিছুতে লিখতেন না। বিশেষ করে ঐ টাকার প্রস্তাবটা। এ যে কতখানি কারে পড়ে লিখতে হয়েছে তাঁকে! এক

BanglaBook.org

একটি টাকা তাঁর এক-একখানি বুকের পাঁজরা। সেই টাকা মাসে মাসে চারটে করে বার করতে চেয়েছেন—এখন বেগ দিলে হয়ত পাঁচেও রাজি হ'তে পারেন—এ কী কম কথা!

না হয় ডাক্তারবাবুকে লোক দেখতে ব'লে, একটু সময় দিয়ে চলেই যাবে। মেয়েটার লোকসান হবে তা হোক। এখন তো সীতা লিখেছে—ওর সতীনপোদের সংসারেই একসঙ্গে খাচ্ছে পরছে,—শুধু হাতখরচা আর ছেলেটার জন্যে—তা যেমন ক'রে হোক ঐ চার টাকাতেই চালিয়ে নেবে না হয়।

কিন্তু ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু কি ছাড়তে চাইবেন? উনি যা করছেন তা কোন নিকট-আত্মীয়ও করে না। মাইনে ছাড়াও সীতার টাকা প্রতি মাসে দিয়ে যাচ্ছেন, চাইতে বা মনে করাতে হয় না। শুধু তাই নয়—এখানে সে রাজার হালে আছে। সে-ই যেন কর্ত্রী, ডাক্তারবাবু ওর কর্মচারী, তিনিই সর্বদা জোড়হস্তে থাকেন যেন, ভয়ে ভয়ে। এ সুখ কোথায় পাবে সে? স্বামীর ঘরেও শ্বশুর-শাশুড়ী জা-ননদ থাকলে এত স্বাধীনতা পাওয়া যায় ন। এর মধ্যে ভদ্রলোক ওষুধ আনতে কলকাতা গিয়েছিলেন—ওর জন্যে একখানা তসরের থানধুতি আর একটা সরু হার, ঘষা গোট, কিনে এনেছেন। প্রথমটা চমকে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা, কিছুতেই নিতে চায় নি—মনে মনে কেমন যেন একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল ওর মনে—কিন্তু ডাক্তারবাবুই সব শঙ্কার কারণ দূর করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি এর জন্যে এত "কিন্তু" হচ্ছ কেন? সুতির কাপড় পরে সন্ধ্যে-আহ্নিক করো, সেইজন্যেই ওটা আনা। পুরানো লোককে তো দিতে হয় এসব। আর হার—বলে সন্তানের মাকে শুধু গলায় জল খেতে নেই, তাই। তা ওটা ইচ্ছে না হয় নিও না। যাকে হোক দিয়ে দেব। কিন্তু মনে করো না যে ঘুষ দিয়ে তোমার পালাবার পথ বন্ধ করছি। তোমার কোন বাধ্যবাধকতা রইল তাও ভেবো না। প্রতিবারই কলকাতায় গেলে মেয়েটাকে কিছু না কিছু কিনে দিই—তা এবার তো ওর সঙ্গে দেখাও করি নি—সেই পয়সাতেই কিনে এনেছি। এমন কিছু বেশি খরচা করি নি তোমার জন্যে—'

এর পর নিতে হয়েছে জিনিসগুলো। অথবা বলা যায় বিবেককে শান্ত ক'রেও নিতে পেরেছে। ওর মতো দুঃখীর এমন সব জিনিস স্বপ্নে-দেখা দুরাশার ধন—ছাড়াও মুশকিল বৈকি!

তবু বলেছে যে, 'দেখুন দিকি—কী বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়ে গেল আমার জন্যে, আপনাদের বাপবেটির মধ্যে—'

হেসে উঠেছেন অমরবাবু, 'শুধু একটা বেটি কেন গো, বেটাবেটিরা সবাই পর হয়ে গেল। কেউ তো আর চিঠি দেয় না। ...... কিন্তু তার জন্যে তুমি লজ্জা পেয়ো না—এ ভালই হল, ভগবান যে এত সহজে পিছটানটা কাটিয়ে দিলেন—এই মঙ্গল। মিছিমিছি মায়ায় বদ্ধ হয়ে ছিলুম বই তো নয়। ভগবানই দেখিয়ে দিলেন, সন্তানের স্নেহ কৃতজ্ঞতা কী ঠুনকো জিনিস—কত সহজে অকারণে ভেঙ্গে যায়।.... যাক্, ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই, তারা তো ছেড়েছেই, আবার তার জন্যে তুমিও ছেড়ে যেয়ো না। তাহলে আমার সেই যাকে বলে—'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।'

আবারও হা-হা করে হেসেছে অমরবাবু।

ওঁর কথা বলার ধরনই এই, ভাল করেই চিনেছে ঐন্দ্রিলা, এর মধ্যে কোন গূঢ়ার্থ নেই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনদিন কোন-মুহূর্তে এতটুকু অশোভনতা বা কোন মন্দ অভিপ্রায় দেখে নি ওঁর মধ্যে; নির্মল চরিত্র, দেবতুল্য বললে ছোট করা হয়—দেবতাদের চেয়েও নির্মল। নদীর জলের মতোই—কোথাও কোন ময়লা নেই।

এ লোককে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না। সত্যিই, আবার সেই অর্ধেক দিন উপবাস শুরু হবে। এমনিতেই তো উনি ঠাট্টা ক'রে বলেন যখন তখন, 'যেটুকু ক'রে-কম্মে নেবার অব্যেস ছিল সেটুকুও তো চলে গেল। এরপর যেদিন চলে যাবে —ঠায় উপোস ক'রে

BanglaBook.org

শুকিয়ে মরতে হবে—নয়তো মঙ্গলা ভরসা। তা ও বেটী যা নোংরা, হাতে জল খেতেও ইচ্ছে করে না। বড্ড আয়েস ধরিয়ে দিচ্ছ তুমি!'

কিন্তু সে যতই হোক, ও ধারেও মা বোন ভাই। তাদের ওপরও কি একটা কর্তব্য নেই? ডাক্তারবাবুর কথাই আবার মনে আসে, 'বাপমার ঋণটা কি সোজা জিনিস? অনেক ভাগ্য থাকলে তবে মানুষ বাপমায়ের সেবা করতে পারে, খানিকটা ঋণ শোধ করতে পারে। রাম বাপের জন্যে কী না ত্যাগ করলেন, কৈ, অন্যায় জেনেও তো প্রতিবাদ করেন নি। এগুলো লেখা হয়েছে মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যেই। আর আমার ছেলেমেয়েরা—খুব শিক্ষা পেয়েছে সব! খুব শিক্ষা দিয়েছি!...'

কী করবে সে, কী করা উচিত? নিজেকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পায় না ঐন্দ্রিলা, খুঁজে পায় না গ্রহণযোগ্য কোন পথ। কঠিন দোটানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করে শুধু মনে মনে।

অবশেষে, সেই দ্বিধা ও ভিন্নমুখী আবর্তের মধ্যে অনবরত ক্লিষ্ট হ'তে হ'তে, সেই অবশিষ্ট সারাদিন ও সারারাত অতন্দ্র কাটাবার পর, পরদিন সকালে হঠাৎ একসময় স্থির ক'রে ফেলল ঐন্দ্রিলা। ডাক্তারবাবুকেই বলবে সে, তাঁরই মতামত জিজ্ঞাসা করবে। আশ্চর্য, এই সহজ কথাটা এতক্ষণে মনে আসে নি কেন! নিজের স্বার্থের জন্য তাকে অসৎ পরামর্শ দেবেন বা কর্তব্যভ্রষ্ট করতে চাইবেন সে লোকই নন। যা উচিত, যা তার করা দরকার—সেই কথাটাই নিশ্চয় তিনি বলবেন।

সে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল।

'কী চাই গো—হঠাৎ আমার ডাক্তারখানায়? ওষুধ দিতে হবে?'

জিজ্ঞাসু সহাস্য দৃষ্টিতে চান ওর মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, ওষুধই একরকম। এই চিঠিটা পড়ে দেখুন, তারপর বাত্‌লান কী করব আমি।'

চিঠি দেখেই ভ্রূ কুচকে উঠেছিল, পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে গেলেন অমরবাবু। চিঠি শেষ ক'রেও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন বাইরের তৃণশূন্য মাঠের দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তাহ'লে তো যেতে হয় তোমাকে?'

'কী করব বলুন। আমি কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না বলেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।'

'যাওয়াই তো উচিত। মা যে রকম চিঠি লিখেছেন তোমায়—খুবই বিপন্ন মনে হচ্ছে। মা যাই করুন, মা মা-ই—মায়ের বিপদে যথাসাধ্য করাই সন্তানের উচিত।...... তোমার মুখে যা শুনেছি, কিপ্পন মানুষ ঝাঁ করে টাকার লোভ দেখিয়েছেন যখন—তখন খুবই আতান্তর অবস্থা... তুমি কাল-পরশুই চলে যাও!"

না না, কাল পরশু যাব কি!' কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলে ঐন্দ্রিলা, 'আপনি লোকজন দেখুন, আপনাকেই বা এই আতান্তরে ফেলে যাব কী ক'রে?'

'লোকজন!' হাসলেন ডাক্তারবাবু, 'এই বনদেশে লোকজন পাবি কোথায়, খুঁজবে কে? নিহাৎ কদিনের সুখভোগ কপালে লেখা ছিল তাই সে ছোকরার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গিয়েছিল—আর তুমিও অমনি দৈন্য-দশায় পড়েছিলে, নইলে তুমিই কি আসতে নাকি? ওসব ছেড়ে দাও, আমার নতুন লোক পাবার আশায় থাকতে গেলে এ জন্মে আর তোমার যাওয়া হবে না। তুমি তোমার সুবিধামতো চলে যাও। অক্রূরকে সঙ্গে দিচ্ছি, কোলাঘাট পর্যন্ত গিয়ে তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে'খন।'

'উঁহু'—ঐন্দ্রিলাও দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আপনার কোন সুব্যবস্থা না হ'লে আমি যাব না। সে মার যা-ই হোক!'

BanglaBook.org

'এই দ্যাখো পাগল! আমি যেমন খাচ্ছিলুম তেমনি খাবো—না হয় শেষ অবধি মঙ্গলাই যা পারে ফুটিয়ে দেবে।... আর ওখানে যদি অন্য কোন ব্যবস্থা হয়, তোমার ভায়ের বিয়েই যদি হয়ে যায় এর মধ্যে—তুমি সঙ্গে সংগে ফিরে এসো। একদিনও সেখানে বেশি থাকতে হবে না। আর তোমার মা পাঠান ভালই, আমি যদ্দিন আছি —সীতার দশটা টাকা বন্ধ হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

শেষের দিকে ডাক্তারবাবুর গলাটা কি কেঁপে যায় একটু? না—ওটা ঐন্দ্রিলার শোনবারই দোষ?

কিন্তু অকস্মাৎ—এতদিন পরে ঐন্দিলার দু চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। এ ভাবে যে কোন অপরিচিত—ওদের ভাষায় নিস্পর—মানুষের জন্যে ওর চোখে জল আসা সম্ভব, তা-ই কে ভাবতে পেরেছিল। নিজের দুর্বলতায় নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে এল সেখান থেকে। আর সারাদিন ধরে বার বার এই কথাটাই মনে হ'তে লাগল—এই দেবতার মতো মানুষটাকে এমন আতান্তরে ফেলে যাওয়াটাই কি তার উচিত হচ্ছে? মার তবু আরও অনেক আপনার লোক আছে—এর যে কেউ নেই। তার জন্যেই যে সবাই ত্যাগ করেছে একে!

সারাদিন ধরে তবু এটা ওটা গুছোতে হয়। মঙ্গলাকে ডেকে ভাঁড়ারে কোথায় কী থাকে বুঝিয়ে দেয়। মঙ্গলা তো কেঁদেই আকুল, 'ওগো বামুনদি, তুমি গেলে বাবুর আমার খাওয়া-দাওয়া কিচ্ছু হবে নি, বাবুকে আর বাঁচাতে পারব নি।'

ঐন্দ্রিলা তাকে ধমক দেয়, 'আ মর্ মাগী, তা বলে আমি বাপের বাড়ি যেতে পাবো না? মার কন্না করতে পারব না! তুই—তোরা আছিস কী করতে? একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চানটান ক'রে এসে সব গুছিয়ে দিবি—বুঝলি? একটু চালিয়ে নিবি—যদ্দিন না আমি ফিরি!'

'ও, তুমি আবার আসবে তা হ'লে! তাই বলো। ধড়ে পেরানটা এল তবু। সে আমি যতটা যা পারব ক'রে দুবো। তার জন্যে ভেবো নি।'

মঙ্গলা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ মোছে।....

বোধহয় দুপুরে ঘুম হয় নি বলেই বিকেলের দিকে মাথাটা ধরেছিল। সন্ধ্যার সময় রান্না করতে করতে খুব যন্ত্রণা হ'তে লাগল। ডাক্তার সেদিন একটু সকাল সকাল এসেছিলেন—বোধহয় পরের দিন ঐন্দ্রিলা চলে যাবে বলেই—সকাল ক'রেই তাঁকে খাইয়ে হেঁশেল সেরে নিল ঐন্দ্রিলা। তারপর বাইরের রকে ডাক্তারবাবুরই বেঞ্চির এক পাশে এসে বসল।

'এরই মধ্যে চলে এলে—তুমি খেলে না?'

'না, মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে—মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আজ আর খেতে পারব না কিছু। একটু ঠাণ্ডায় বসে যদি কমে—গিয়ে শুয়ে পড়ব।'

'কেন—হঠাৎ এত মাথার যন্ত্রণা? জ্বরটর আসছে না তো?' ডাক্তারবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, 'কই, নাড়িটা দেখি।'

'না না। জ্বরটর নয়। বোধহয় দুপুরে একটু গড়ানো হয় নি বলেই—মঙ্গলাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিচ্ছিলুম কিনা, কোথায় কি থাকে!'

একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসে সে।

'কী আশ্চর্য! কেন, ও কি খুঁজে-পেতে নিতে পারত না! না না, কাজটা ভাল করো নি। তোমার যখন ঘুমনো অভ্যেস।... তা এতক্ষণই বা বলো নি কেন, আজকাল মাথা-ধরার খুব ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে যে, একটা বড়ি খেলে কখন ছেড়ে যেত। দাঁড়াও, একটা বার করে দিই—'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু ঘরে যাবার আগেই—'উঃ, মাগো—মা!' বলে বেঞ্চি থেকে উঠতে গিয়ে যেন হুমড়ি খেয়ে মেজেতে পড়ে গেল ঐন্দ্রিলা।

BanglaBook.org

'কী হ'ল কী হ'ল—ওরে ও মঙ্গলা—', বলতে বলতে ডাক্তারবাবু উঠে বসতে গেলেন, বসানো গেল না, মাথাটা কেমন নড়নড় করতে লাগল। অগত্যা সেইখানেই শুইয়ে রেখে ছুটে গিয়ে আলোটা নিয়ে এলেন ঘর থেকে—দেখলেন এর মধ্যেই কখন ওর নাক মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে, ওর কোন জ্ঞানও নেই, অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

ডাক্তারবাবু পাগলের মতো মঙ্গলা আর অক্রূরকে ডাকতে লাগলেন।

'ইস্—এ যে —তাইতো। ওরে মঙ্গলা, ও অক্রূর, শিগগির আয় বাবা!'

॥ ৩ ॥

বাঁচবার নাকি কথা নয়,—বাঁচলেও একটা অঙ্গ পড়ে যাবার কথা, কিংবা কথাবার্তা জড়িয়ে যাবার কথা—ডাক্তার যা বললেন। এ রোগে যা হোক একটা গুরুতর ক্ষতি হয়—যদি বা রোগী বেঁচে ওঠে। নিহাৎ ওর বাপমায়ের আশীর্বাদের জোর, অথবা আরও বহু দুঃখভোগ অদৃষ্টে আছে—ঐন্দ্রিলার তাই ধারণা—তাই এমনভাবে গোটা দেহটা সুদ্ধ বেঁচে উঠতে পেরেছে। কিংবা, ডাক্তারবাবু আরও বললেন, খুব খেটে খাওয়া দেহ, ছেলেবেলা থেকেই নিদারুণ পরিশ্রম করেছে বলে দেহটা টন্‌কো আছে—কিছুতেই কাবু করতে পারে নি, স্নায়ুগুলো প্রাণপণে লড়াই ক'রে ঠেলে উঠেছে আবার—ওকেও তুলেছে।

তা ভুগেছেও নাকি অনেকদিন। মঙ্গলার হিসেবে প্রায় একমাস। ডাক্তারবাবু বললেন, পাঁচ সপ্তাহেরও বেশি। ঐন্দ্রিলার এ সব কোন হিসেবই ছিল না। কিছুই বুঝতে পারে নি সে। সেদিনকার সেই মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যাওয়ার পর থেকে আর কোন হুঁশ নেই। যেদিন প্রথম ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল, ভাল ক'রে চোখ মেলে দেখতে এবং সবাইকে চিনতে পারল, সেদিন মনে হ'ল যেন সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। তবে বোধহয় একটু অসাধারণ রকমের ঘুম, বহুক্ষণব্যাপী গাঢ় সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠলে যেমন হয় তেমনি।... মনে হ'ল, বাবা, কতবেলা অবধি ঘুমিয়েছে সে, বাইরের দিকে চাইতেই চোখে পড়ল ঝলমল করছে রোদ জানালার পাশের বড় সজনে গাছটায় —সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে গেল তাড়াতাড়ি। কিন্তু ওঠা গেল না, ভালরকম চেষ্টা করবার আগেই ডাক্তারবাবু জোর করে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে শুইয়ে দিলেন আবার। বললেন, 'উঁহু উঁহু, উঠে বসতে এখনও ঢের দেরি, তার আগে এখন অন্তত আরও এক মাস শুয়ে থাকো, শুয়ে শুয়েই খাও—তারপর ভেবে দেখা যাবে!'

প্রথমটা যারপরনাই বিস্মিত—পরে একটু বিরক্তও হ'ল ঐন্দ্রিলা। এ আবার কী—ফট্ ক'রে গায়ে হাত দেওয়া! তারপর আরও বিস্মিত হ'ল এই দেখে যে, ঐটুকু ওঠবার চেষ্টা করতেই যেন মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ক'রে উঠল, সমস্ত শরীর বিন্‌বিন্‌ ক'রে ঘেমে উঠল দেখতে দেখতে।... অনেকক্ষণ চোখ বুজে থেকে ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করল। তারপর আবার আস্তে আস্তে যখন চোখ খুলল তখন দেখল, ডাক্তারবাবু মুচকি হাসছেন তার দিকে চেয়ে। গা জ্বালা ক'রে ওঠবারই কথা—লোকটার সকাল থেকে এই অসভ্য চালচলন দেখে, জ্বালা ক'রে উঠেও ছিল প্রথমে —কিন্তু তারপরই যেন আব্‌ছা আব্‌ছা মনে পড়ল কথাটা। মনে পড়ল সেই অসহ্য মাথার যন্ত্রণা আগের রাত্রের; মনে পড়ল সেই উঠতে গিয়ে যেন কী একটা—তারপর আর কিছু মনে নেই। তাহলে বোধহয় সে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, এঁরা ধরাধরি ক'রে এনে শুইয়ে দিয়েছেন। সেইজন্যেই বোধহয় এতবেলা অবধি ঘুমিয়েছে সে। কিন্তু—আর একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখে চিনতে পারল—এটা যে ডাক্তারবাবুর ঘর! এ ঘরে, এ বিছানায় কেন সে?...... ও মা, কী মনে করবে লোকে দেখলে! ......

BanglaBook.org

সে আবারও ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে গেল, পারল না। আবারও সেই মাথা ঝিমঝিম-করা, সর্বাঙ্গ-গুলিয়ে-ওঠা ভাবটা।

ডাক্তারবাবু কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'ও কী হচ্ছে কি? অনেক কাণ্ড ক'রে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে—সে সব পরিশ্রম কি পণ্ড করতে চাও? মরবার এত শখ কেন? এখন মুখটি বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকো কিছুদিন—যদি বেঁচে থেকে আবার মেয়ে-নাতিকে দেখতে চাও!'

যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে!

সে কি!

তবে কি সে অনেকদিন ধরে ভুগছে? এমনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে বহুদিন? কতদিন তার এমন চলছে?.... বহু প্রশ্ন একসঙ্গে যেন মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে উঠল—কিন্তু বলতে পারল না। কথা কইতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

এইবার মনে হ'ল—আবার চোখ মেলে দেখে—ডাক্তারবাবু যেন ইতিমধ্যে খুব রোগা হয়ে গেছেন। একরাত্রে বা দুরাত্রে তো এমন হ'তে পারে না। সত্যিই তো। তাহ'লে অনেকদিন ধরেই ভুগেছে নিশ্চয়। আশ্চর্য, কী এমন রোগ হয়েছিল তার?... মঙ্গলা এগিয়ে এল বিছানার কাছে।

'এই যে, বামুনদির হুঁশ হয়েছে দেখছি।.... বাব্বা কী কাণ্ডটাই না করলে বাপু, চৌঘুড়ি মাত্ দেখিয়ে দিলে একেবারে। খুব বরাতজোর আর বাপমার পুণ্যির জোর—তাই আমাদের বাবুর এখানে এটা হ'ল—অপর জায়গায় হ'লে আর বাঁচতে হ'ত না। সাক্ষেৎ যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে বাবু—টানাটানি করেছে দিবেরাত্র, যম একদিকে আর বাবু একদিকে। আহার নিদ্রা কি ছিল এই কদিন? পর পর ঠায় বসে রাত জেগেছে অমন পনেরো দিন। দিনে ঘুম নেই রাতে ঘুম নেই—খাওয়াদাওয়া সে তো ধরো চুলোর দোরে গেছেই—মানুষটা বোধহয় সঞ্জে-আহ্নিক করতেও তোমার শেষের ধার ছেড়ে ওঠে নি—'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে!' ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু, 'ওকে খেতে দিতে হবে এই সময়—বলে রেখেছি না!.... যা যা, নেবুর রস নিয়ে আয়।'

'দুবো। দুবো। খেতে তো দুবোই। না তাই বল্‌তিছি—যা করলে, মানুষে পারে নি বাবু, হক্ কথা যা বলব—এমন সেবা মানুষে করতে পারে—!'

মঙ্গলা বকতে বকতেই চলে যায়।

আবারও যেন মাথাটার মধ্যে কেমন করে ওঠে ঐন্দ্রিলার।

এমন শক্ত অসুখ হয়েছিল তার? এত কঠিন? কী অসুখ?—ডাক্তারবাবু দিনরাত জেগে সেবা করেছিলেন?.... ইস! ..... যতই হোক—পুরুষমানুষ, মেয়েদের সেবা করবেন কী ক'রে। —বিশেষ এমন অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা, যখন নিজের কোনো কাজই নিজের করবার ক্ষমতা থাকে না!

যেন ওর মনের কথা টের পেয়েই ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, 'বাঁচিয়েছে আসলে ও-ই, আমি আর কি করতে পেরেছি, সময়মতো ওষুধ-ইঞ্জেকশন দেওয়া আর বসে থাকা, মাঝে মাঝে নাড়ি দেখা, এই তো! আসল সেবা যেটা—সেটা তো ওকেই করতে হয়েছে। এই ঘরেই শুতে বলেছিলুম, রাত্রেও যে কতবার উঠতে হয়েছে ওকে, তার কি ঠিক আছে!'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে। তবুও কতকটা রক্ষা। নইলে—নইলে সে এরপর লোকের কাছে মুখ দেখাত কী করে!

এবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলঐন্দ্রিলা, 'আমার মেয়েকে কেন খবর দেন নি?....কিম্বা মাকে—?'

'ইচ্ছে করেই দিই নি। মেয়ে তো তোমার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসতেই চায় না। তার

BanglaBook.org

ক্ষতি হতে পারে তাতে—এই তো তার ভয়, হয়ত একবার ছেড়ে এলে আর কখনও ঢুকতেই পাবে না সেখানে। সে ক্ষেত্রে তাকে খবর দিয়ে আনানো কি ভাল হ'ত? তারপর এই দুর্গম-পথ, তাকে আসতে হলে চার-পাঁচবার গাড়ি বদলাতে হবে—কে আনবে সঙ্গে করে, কার সঙ্গে আসবে—সে সব প্রশ্নও তো আছে। যদি আসতে না পারে, খবরের জন্যে ছটফট করবে, কান্নাকাটি করবে, মিছিমিছি সেই এক আতান্তর। কী লাভ তাকে খবর দিয়ে বলো?... তবে তেমন তেমন বুঝলে খবর দিতুম বৈকি, সে ঝুঁকি কি নিজের ঘাড়ে রাখতুম! কিন্তু আর কথা নয়—একেবারে মুখ বুঝে ফেলো। মঙ্গলা ফলের রস করে আনছে, লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও, আর যতটা পারো ঘুমোও। যা দরকার ওরেই বলবে, কাপড়-চোপড় ছাড়তে হ'লে ও-ই ছাড়াবে; যা করতে হবে ওকে বলো। তবে তোমার নিজের কিছু করা চলবে না। একটিও কথা কইবে না, উঠবে না। এখনও অনেকদিন এমনি শুয়ে থাকতে হবে।...

দীর্ঘকাল সময় লাগল উঠে বসতেই। এত দুর্বল যে হাত-পা নাড়তেই যেন ক্লান্তি বোধ হয়। শুনল যে মঙ্গলার এক বোনঝিকে আনানো হয়েছিল পরের দিনই। সে-ই রান্নাবান্না করেছে, এ কদিন তো মঙ্গলাও ওদিকে যেতে পারে নি। ডাক্তারবাবুকেও তার হাতে খেতে হয়েছে। অবশ্য, উনি বলেন নাচারে দোষ নেই, হাসপাতালে গেলে কার ছোঁওয়া না খেতে হয়, তাতে কি আর কারও জাত যায়!

সে বোনঝি এখনও আছে। সে-ই রাঁধছে, কাজকর্মও করছিল সব, মঙ্গলা তো দিনরাত ওর ঘরেই থাকত বলতে গেলে —এই তো সবে কদিন একটু-আধটু ওদিকে যেতে পারছে। তবে রাত যা জাগবার ডাক্তারবাবুই জেগেছেন, কিছু দরকার হলে ওকে ডেকে দিয়েছেন মধ্যে মধ্যে। ওকে কাছে রাখা—মঙ্গলা গলাটা নামিয়ে চুপি চুপি বললে,—'নিহাৎ একা মেয়েছেলের ঘরে থাকলে খারাপ দেখায় বলেই। তা ধরো মানুষটার বিবেচনা তো চারদিকেই! সবদিকে নজর।'

মঙ্গলা বলে, 'এমন সেবা আর এমন চিকিচ্ছে কেউ কখনও দেখে নি বামুনদি। যমরাজও ছাড়বে নি আর ইনিও নিয়ে যেতে দেবেন নি। তোমার জীবন বাবু চিরদিনের তরে কিনে নিয়েছে।... যাকে বলে মরা মানুষ ফিইরে আনা—তাই। অন্য লোক ডাকে নি, সদর থেকে—কি সব বলে ধাই না কি—আনাতে পারত, তাও আনায় নি। বলে, তাতে 'নানান কথা উঠবে। আমার আর কি, ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়—ও ভদ্দলোকের মেয়ে কি শেষে আমার উপকার করতে এসে বদ্‌নাম কিনবে? সে আমি পারব নি।... তা করেছেও বটে। একাই তো সব করলেগো, এই বয়েসে এত খাট্‌নি কাউকে খাটতে দেখি নি। আমি তো শুধু নিতান্ত সকাল-বিকেলের দরকারগুলো, সরা দেবার কাজটা করেছি। আর যা করেছে উনিই করেছে। তা একটুকু বিরক্তি ছিল না বাপু, হাসিমুখে সব করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কত কি ঠাট্টা-তামাশা। বলে, তোর বামুনদির তো এত মেজাজ, এত কথা—তোরা তটস্থ থাকতিস দিনরাত, ভয়ে ভয়ে জীবন যেতো—তা এখন তো তোর হাতে উনি, দেনা এবার খুব ক'রে দুটো অন্তর-টিপুনি, জব্দ হয়ে যাবে।... বলে আর হাসে।... এই খাট্‌নি, কিন্তু তার জন্যে নিত্যিকারের কাজ তো একদিনও বন্ধ নেই গো। সাতখানা গাঁয়ের রুগী দেখা তো সমানে চলেছে। তবে হ্যাঁ—ঘোরঘুরি করতে পারত নি, যা হ'ত এখানে বসেই।.... তবু, নিত্যি পঁচিশ তিরিশটা করে রুগী দেখা—তার ওপর ঘরে তুমি বেঁহুশ হয়ে পড়ে! এর ভেতর আবার বইপড়া আছে, তোমার জন্যে কত মোটা মোটা বই ঘেঁটেছে কদিন—বয়ের পাহাড় জমে গিছল। কী খাট্‌নিটাই না খেটেছে কদিন। চেহারা দেখ্‌তেছ না, আধখানা হয়ে গেছে একেবারে।'

BanglaBook.org

খুবই দেখছে। যত দেখছে আর যত শুনছে তত যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ঐন্দ্রিলার। ওর মতো একটা সামান্য মেয়েছেলের জন্যে কী না করেছেন ভদ্রলোক! নিজের ছেলেমেয়ের জন্যেও বোধহয় কেউ করে না এত! খুব বেশি দয়া হ'লে উনি নিয়ে গিয়ে কোলাঘাটের হাসপাতালে রেখে আসতে পারতেন। তাতেই কৃতজ্ঞ থাকত সে যথেষ্ট করা হ'ল বলে মনে করত। ঝি-চাকরের জন্যে আর কীই বা করে লোকে। সে ভদ্রলোকের মেয়ে হ'তে পারে—কিন্তু রাঁধুনী-বামনীর কাজ করে যখন, তখন বিবেচনা আশাই বা করবে কেন? রাঁধুনী-বামনীকে লোকে ঝি-চাকরের সামিলই মনে করে। ওরই মধ্যে হয়ত একটু উঁচু। নিহাৎ জাতটা উঁচু বলেই সামান্য একটু তফাৎ ধরে। তবে সে সামান্যই। তাদের জন্যে কেউ পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখায় না। সেই যে উকিলবাবুর বাড়ি ছিল সে, যেখান থেকে চুরি করার জন্যে তার চাকরি গেল—সেখানে থাকতে খুব একবার সর্দি-কাশির শব্দে তাঁদেরও কারও কারও ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল বলে—তার একটা চিকিৎসা করা দরকার মনে করেছিলেন তাঁরা। তা ক'রেও ছিলেন চিকিৎসার ব্যবস্থা। পাড়ার কী এক ক্লাবে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সকালে বিনা পয়সায় রোগী দেখতেন ও ওষুধ দিতেন—সেইখানেই পাঠিয়েছিলেন ওকে ঝি সঙ্গে দিয়ে। অবশ্য সে ওষুধে উপকারও হয়েছিল ওর। আর সেজন্য সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাও বোধ করেছিল। সেইটুকু বিবেচনাই পর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছিল।

কৃতজ্ঞ বোধ করার কারণও ছিল। অনেক দেখেছে সে। যতক্ষণ কাজের ক্ষমতা থাকে—ততক্ষণই মনিববাড়ির আদর—অসুখ করলে তাকে কোনমতে সরিয়ে দিয়ে নতুন লোক খোঁজাই সাধারণ রীতি। তার জন্যে ঝি-চাকররাও মনিবদের দোষ দেয় না।

মনিববাড়ির কথাই বা কি? যদি তার মার কাছে থাকতে অসুখ করত, মা কি ডাক্তার দেখাতেন? হয়ত হাসপাতালে দেবার উদ্যমটুকুও প্রকাশ করতেন না। কে-ই বা অত করে? ঘরে পড়ে থেকে বেঘোরে প্রাণটা যেত। এ যা রোগ হয়েছিল তাতে হাসপাতালে গেলেও বাঁচত না হয়ত—এতকাণ্ড সেখানে কে করবে আর কেনই বা করবে—তবু তাতে সান্ত্বনা থাকত একটা। কিন্তু মার বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি এ রকম হ'লে সেটুকুও করত না কেউ।

না, মঙ্গলা ঠিকই বলেছে। তার জীবন—অবশিষ্ট জীবনটাকে কিনেই নিয়েছেন ডাক্তারবাবু। যমের কাছ থেকে কিনেই নিয়েছেন—নিজের ঐকান্তিকতার মূল্যে। তার তরফ থেকে সে যতই করুক এ ঋণ শোধ হবার নয়।....

কিন্তু কেন এত করলেন উনি? কেন এত করছেন! ঐন্দ্রিলা নিজেকে প্রশ্ন করে। প্রশ্নটা বারবার মনে এসে মনটাকে যেন কী একটা অজ্ঞাত কারণে আলোড়িত ক'রে দিয়ে যায় তার।

কীই বা তার দাম। কীই বা করেছে সে!

চিরকাল সর্বত্র শুনে এসেছে সে—শ্বশুরবাড়ির সেই স্বল্প-স্থায়ী কটি সৌভাগ্যের দিন ছাড়া যে—সে অবাঞ্ছিত কোথাও তার স্থান নেই, তাকে কেউ চায় না। সে মুখরা, সে প্রখরা—সে দুর্ভাষিণী, সে দুর্ভাগিনী। যেখানে যায় শুধুই অভিশাপ আর অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়। তাই সে চলে এলেই সকলে বাঁচে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর তাদের সে মনোভাব যে একেবারে অকারণ, তা-ও বলতে পারে না। নিজের জ্বালা নিজেই যে অনুভব করে।

সেই চির-অবাঞ্ছিত মানুষকে উনি কী যত্নই না করলেন।

তার জন্যই সন্তানরা পর হয়ে গেছে ওঁর—হয়ত বা চিরকালের মতোই। মাতৃহারা সন্তান সব ওঁর। তবু, যে এই অনভিপ্রেত অবস্থার জন্য দায়ী তাকেই গৃহিণী করে, সংসারের কর্ত্রী করে রেখে দিয়েছেন বাড়িতে। কিন্তু সেজন্য কোন কিছু অতিরিক্ত দাবি করেন নি। কোন ঘনিষ্ঠতা করতে চান নি। বরং যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায়

BanglaBook.org

রেখেই চলেছেন। স্নেহ করেছেন—তার পরিবর্তে কিন্তু স্নেহ আশা করেন নি। শুধু সামান্য সাধারণ যেটুকু, বাধ্যবাধকতার মধ্যে যা পড়ে— নিতান্তই যেটুকু মাইনে-করা দাসী-চাকরের করার কথা, তার বেশি আশাও করেন না, তার বেশি করেও নি কিছু ঐন্দ্রিলা। তার শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার মতোই রান্নাবান্না করেছে, আর অবসর সময়ে—নিহাৎ অসহ্য হয়েছে বলেই এবং হাতে কোন কাজ থাকত না বলেই—ঘরদোর বিছানা-মাদুর ঝেড়ে মুছে একটু ভদ্রস্থ করেছে। এর জন্যেই উনি কী পর্যন্ত না খুশি হয়েছেন, কী পর্যন্ত না কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন! সেই কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উপহার দেওয়া পট্টবস্ত্রে, গলার হারে এবং সসম্ভ্রম ব্যবহারে।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা জানে যে এর কোন কারণ নেই। সে এমন কিছু করে নি। এ ওঁরই সৌজন্য। ওঁরই ভদ্র মনের পরিচয়। সে নিজে এ যত্ন এ বিবেচনার কিছুই —এক ভগ্নাংশ মাত্রও—দাবি করতে পারে না। বরং আগাগোড়া সে-ই কৃতজ্ঞ। অনেকখানি স্বাধীনতা পেয়েছে সে এখানে এসে, অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য। এ অবাধ কর্তৃত্ব ওর কাছে অভিনব শুধু নয়—অপ্রত্যাশিত।...

তা হ'লে উনি এত করলেন কেন? .....

সেই মূল প্রশ্নটা যে অমীমাংসিতই থেকে যায়। প্রশ্নটা করে নিজেকেই, ক'রেই যায় বারবার, কিন্তু তবু উত্তরটা খুব বেশি খুঁজতেও যেন সাহস হয় না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, বুকের মধ্যে কাঁপন লাগে একটা....

তবু ঘুরে ফিরে মনটা সেই প্রশ্নেই ফিরে যায়।

সম্ভাব্য উত্তরটাও সে এড়াতে পারে না বেশি দিন।

তবে কি, তবে কি—

তবে কি ওঁর আত্মীয়দের, ওঁর ছেলেমেয়েদের সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন—একেবারে অমূলক নয়? কোথায় একটা অদৃশ্য এবং ওদের কাছে অজ্ঞাত কারণ ছিল সন্দেহের, যে সম্বন্ধে ওরা সচেতন না হ'লেও অপরের সন্দেহ গড়ে ওঠবার মতো কিছু ভিত্তি ছিল? .....

আচ্ছা—যদিই তাই হয়—এক সময় মরীয়া হয়েই বোঝায় নিজেকে ঐন্দ্রিলা, যদি তাই হয়, ক্ষতি কি? ঋণ শোধ করার সুযোগ সে ছাড়বে কেন? ঋণ শোধ করাই তো কর্তব্য। যে প্রাণ উনি কিনে নিয়েছেন, বলতে গেলে হাতে ক'রে উপহার দিয়েছেন তাকে—সে প্রাণ এবং প্রাণের আধার এই দেহটাতে তো ওঁর সম্পূর্ণই অধিকার। সে তো একভাবে দেখতে গেলে ওঁর ক্রীতদাসীই। ক্রীতদাসীর স্বাধীনতা কি আত্মরক্ষা করবার?

তাছাড়া কীইবা এমন দায়-দায়িত্ব তার, কার কাছে? সমাজের ঋণ, ধর্মের ঋণ অনেক বহন করেছে সে, অনেকদিন ধরে অনেক দুঃসহ মূল্যে শোধ হয়েছে তা। আর কেন?

সুখী হবার অধিকার সকলকারই আছে—শুধু তার নেই?

না, অন্য কোন সুখ নয়। অন্য কোন সুখে আর তার প্রবৃত্তি নেই। সে প্রবৃত্তির উৎস পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে বুঝি—কোন্‌কালে। এই মানুষটাকে এই দেবতার মতো পবিত্র, ভগবানের মতো দয়াময় মানুষটাকে সুখী করেই সুখী হ'তে চায় সে। এখন শুধু সেইটুকুই তার কাম্য।

এমন দেবতার পায়ে, তাঁর প্রীতিকামনায়, অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হ'তে পারলে জীবন ধন্য সার্থক হয়ে যাবে।

॥ ৪ ॥

কথাটা জিজ্ঞাসা করব করব ক'রেও জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। সঙ্কোচে বেধে ছিল। এই যে প্রায় দু-মাস ও বিছানায় পড়ে—এর মধ্যে কী সীতার টাকাটা পাঠাবার কথা মনে

BanglaBook.org

ছিল ওঁর? থাকার কথা নয়, না থাকলে বিন্দুমাত্র দোষ দিতে পারে না ঐন্দ্রিলা, আর খরচও যে কী পরিমাণ হয়েছে বা হচ্ছে—জলের মতো—তা তো সে নিজের চোখেই দেখছে। এখন যা হচ্ছে তার পরিমাণ দেখেই, যা হয়েছিল তা অনুমান করতে পারে সে। এ ক্ষেত্রে সে টাকার কথা তোলাটাও অন্যায়। উনি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে হয়ত এর মধ্যেই ধার-কর্ম ক'রে কিছু পাঠাতে চেষ্টা করবেন—কিন্তু তাতে বিব্রত করেই তোলা হবে ওঁকে। দু-হাত পেতে এত নেবার পরও এ প্রার্থনা জানানো অসঙ্গত শুধু নয়—নির্লজ্জও।

তবু চুপ ক'রেই থাকতে পারে কই!

ঘুরে ফিরে কেবলই কথাটা মনে পড়ে—কী হচ্ছে মেয়েটার কে জানে। .... দু-মুঠো ভাতের অভাব বোধহয় হবে না। সে তারা দিচ্ছে হয়ত ঠিক, ওর সতীন-পোরা। তার কারণও আছে। ভূতের মতো খাটে সীতা তাদের সংসারে এক মিনিটও হাতপায়ের বিশ্রাম নেই ওর। ছেলেটার দিকে চাইতেই সময় পায় না একটু। বিনা মাইনেয় এমন বিশ্বস্ত ও বিনীত বাঁদী আর কোথায় পাবে তারা।.... সুতরাং খেতে দেবে তারা—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু খেতেই দেবে, আর কোন খরচ দেবে না, সেটা ঐন্দ্রিলা ভাল করেই জানে। আর তার জন্যে পরোক্ষতঃ সে-ই দায়ী। সে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়েই এই বিশ্বাসটা জন্মিয়ে দিয়েছে তাদের। তারা জেনে গেছে—বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে তাদের যে—ওর মা যেমন ক'রেই হোক টাকা পাঠাবে, ধার দেনা ক'রে ভিক্ষে করে—যেভাবে পারুক। মাঝখান থেকে তারা যদি ঘর থেকে কিছু বার ক'রে দেয় তো সেটাই লোকসান, সে আর ফেরত পাবে না তারা।

মেয়ের সেই অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই মাথা গরম হয়ে যায়। কিছুতেই যেন স্থির হ'তে পারে না। দুর্বল শরীরে এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা আরও অসহ্য লাগে, সারা শরীর যেন ঝিম্-ঝিম্ করে ওঠে কথাটা মনে পড়লেই।

শেষে একদিন আর থাকতে পারে না। পেড়েই ফেলে কথাটা। অসুখ থেকে সেরে জ্ঞান হবার পরও কেটে গেছে বেশ কটা দিন। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে ঐন্দ্রিলা। সে আর ডাক্তারবাবুর ঘরে থাকে না, জোর করেই নিজের ছোট ঘরে চলে এসেছে সে। মঙ্গলারও আর থাকবার দরকার হয় না, তাকেও ছুটি দিয়েছে। অর্থাৎ অনেকটা আবার আগের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে যেন।

সেদিনও খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের বেঞ্চে এসে বসেছিলেন ডাক্তারবাবু। ঐন্দ্রিলাও এসে কাছে বসল। আজকাল প্রতি রাত্রেই প্রায় এমনি বসে ওরা, একই বেঞ্চে বসে—তবে একটু ব্যবধান রেখে।

নানা গল্প চলে অন্য দিন। কিন্তু আজ ঐন্দ্রিলা প্রথম থেকেই নীরব। কী একটা বলবে বলেই যেন উশখুশ করছে। একটু পরে ডাক্তারবাবুও সেটা লক্ষ করলেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু কি বলবে? কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে চাও?'

ঐন্দ্রিলা মাথা হেঁট করে বেঞ্চির কাঠটা নখে খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'বলছিলুম কি, আমার কাছে কিছু টাকা ছিল, এখানে তো এক পয়সা খরচ নেই, মাইনের টাকা সবই তো জমেছে—তা তাই থেকে গোটা-কতক টাকা সীতাকে পাঠাব ভাবছি। একটা মনিঅর্ডার ক'রে দেবেন?'

যেন চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, 'কেন, তোর বাড়তি টাকার দরকার কিছু জানিয়েছে? কৈ, চিঠি তো আসে নি এর মধ্যে—?'

'না, বাড়তি নয়। এমনি—এ দু-মাস তো বোধহয় পাঠানো হয় নি—তাই বলছিলুম।'

'কে বললে পাঠানো হয় নি। যেমন হয় তেমনই হয়েছে।... ওর টাকা পাঠাতে ভুলে যাব, ছেলেমানুষ, অমন অসহায় অবস্থায় আছে—! আমাকে এত কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবলে কী ক'রে!'

BanglaBook.org

হঠাৎ মনে হ'ল ঐন্দ্রিলার যে হেঁট হয়ে ওঁকে একটা প্রণাম করে। কিন্তু সম্ভবত অতিরিক্ত আবেগেই মাথাটা কেমন করছে আবার, হেঁট হ'তে সাহস হ'ল না। যদি সেদিনের মতো কিছু হয়? তাছাড়া লজ্জাও করতে লাগল। কখনও প্রণাম করে না—হঠাৎ এত ভক্তির বাড়াবাড়ি কেন—যদি জিজ্ঞাসা ক'রে বসেন।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল, সহসা কোন উত্তর যোগাল না তার। তারপর ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার জন্যে এত টাকা খরচ হয়ে গেল আপনার—আবার ও টাকটা পাঠাতে গেলেন কেন? আমার তো মাইনের টাকা ছিলই—'

'তা তো জানতুম না।.... আর এত টাকাই যেখানে খরচ হয়েছে—অন্ততঃ তুমি তো তাই বলছ—সেখানে আর ওর কটা টাকাতে কী এমন ইতর-বিশেষ হবে বলো!'

বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই বলেন ডাক্তারবাবু।

কিন্তু ঐন্দ্রিলার চোখে বারবার যেন জল আসতে চায়। চুপ করে বসে অন্য দিকে চেয়ে থেকে প্রাণপণে সেই জলটাই সামলাবার চেষ্টা করে সে।

অনেকক্ষণ পরে—যেন বেশ একটু ঝোঁক দিয়েই আবার বলে ওঠে হঠাৎ, 'কাল থেকে আমিই রান্নাবান্না করব কিন্তু। ও মেয়েটিকে ছুটি দিয়ে দেব—মঙ্গলার ঐ বোনঝিকে, মিছিমিছি আর ওকে আটকে রাখার দরকার নেই!'

'সে কি?.... না না, ও সব গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না। শরীর তোমার তত মজবুত হ'তে এখনও ঢের দেরি। এর মধ্যে আগুন-তাতে যাওয়া তোমার চলবে না!'

ডাক্তারবাবু যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

'না না, শরীর আমার বেশ সেরেছে, আর বেশি সারবার দরকার নেই। কতকাল আর বসে বসে খাব! অন্য জায়গা হ'লে কী করতুম? সে তো কবেই কাজে জুততে হ'ত। তাছাড়া খেটেই যখন খেতে হবে—তখন অভ্যেসটা খারাপ করে লাভ কি?' গলায় অস্বাভাবিক জোর দেয় ঐন্দ্রিলা।

'না না —ও সব কী বলছ! পাগলামি করছ কেন?' মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু, 'আমার খরচটা ঐভাবে গতরে খেটে উশুল করতে চাও বুঝি?.... তারপর? আবার যদি পড়ো তখন—? সবই তো বাজে খরচ হবে! সে তো আরও এক গাদা টাকা খরচ!'

'এবার হ'লে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে রেখে আসবেন।'

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকেন। তার পর—যা কখনও করেন না, আজ পর্যন্ত যা করেন নি—তাই করে বসেন। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বেঞ্চিতে রাখা ঐন্দ্রিলার একখানা হাতের ওপর রেখে বলেন, 'হাসপাতালে দিয়ে আসব বলেই কি এত কাণ্ড করে তোমাকে বাঁচালুম ঐন্দ্রিলা?.... হাসপাতালে গেলে বাঁচতেও না—এটা ঠিক।.... আবার যদি পড়ো—এখানেও বাঁচাতে পারব কিনা সন্দেহ!'

সে স্পর্শে শিউরে কেঁপে ওঠে ঐন্দ্রিলা—এই বয়সেও। দীর্ঘদিনের অভ্যাস তার, বহু দিনের অপরিচয় এ স্পর্শের সঙ্গে—তবু সমস্ত দেহের রক্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে যেন। কিন্তু সে হাত সরিয়েও নেয় না, শুধু পূর্ববৎ গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'কেন আমাকে এত করে বাঁচাতে গেলেন, এত খরচ করলেন কেন আমার জন্যে? আমার জীবনের কী দাম!—কারও কাছে কানাকড়িরও তো দাম নেই! কী সুখ ভোগ করতেই বাঁচালেন! সেই অজ্ঞান অবস্থায় শেষ হয়ে যেতুম, সে-ই তো ভাল ছিল।'

ডাক্তারবাবু ওর হাতখানার ওপর যেন সন্তর্পণে—খুব মৃদু একটা চাপ দিয়ে বললেন, 'এমন কোন মানুষ আজও জন্মায় নি ঐন্দ্রিলা যার প্রাণের মূল্য এ পৃথিবীতে কারও কাছে নেই! প্রতিটি মানুষ—তা সে যে দেশে যে ঘরেই জন্ম নিক্ না কেন —যখনই জন্মায়

BanglaBook.org

তখনই তার জন্যে এমন মানুষও কাউকে না কাউকে ভগবান পাঠান —যে তার জন্যে উদ্বিগ্ন হবে, চিন্তিত হবে—চাইবে যে এ বেঁচে থাক দীর্ঘদিন।... কারও না কারও কাছে প্রাণের দাম থাকেই—প্রত্যেকটি লোকের!'

কে জানে সব কথা বুঝল কি না ঐন্দ্রিলা—তবে ওঁর বলবার সেই শান্ত সংযত ভঙ্গিতে ওঁর সেই মৃদু অর্ধ-স্বগত কণ্ঠস্বরে—ওঁর আন্তরিকতাটা তার অনুভূতির অগোচর রইল না। সেও আস্তে আস্তে বলল, 'তবু—মরতে তো একদিন হবেই—না হয় আপনার মতো দেবতার পায়েই মরতুম!'

একটু কি শিউরে উঠলেন ডাক্তারবাবু?

সামান্য একটুখানি?

অন্তত ঐন্দ্রিলার তাই যেন মনে হ'ল। কিন্তু তিনি একটু হেসে কথাটাকে লঘু ক'রে দেবারই চেষ্টা করলেন, 'বাঃ, বেশ লোক তো!... আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আমাকে রেখে এই বয়সে পালিয়ে যেতে চাও?.... তুমি চলে যাবে আর আমরা—বুড়ো হাবড়ারা বেঁচে থাকব?'

তারপর একটু থেমে কেমন যেন এক রকমের বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'না না—দ্যাখো সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন সবাই! তুমি অন্তত আমার মরবার সময়টা একটু কাছে থেকো।.... যাতে তোমার হাতের সেবাটা খেয়ে যেতে পারি।'

কী একটা হৃদয়াবেগে এবার ঐন্দ্রিলাই ওঁর হাতটা দুহাতে চেপে ধরে। বলে, 'ছিঃ, ওসব কথা আমার সামনে কোনদিন মুখে আনবেন না। আমরা কতগুলি প্রাণী আপনার মুখ চেয়ে আছি বলুন তো! কত লোকের কত উপকারে লাগছেন, কত লোকের জীবনদান করছেন, কত লোককে সুখী করছেন। আপনার এখন দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা দরকার। আপনার সব আপদ-বালাই নিয়ে বরং আমরা যেন মরি—'

'আবার! তুমিই বা ও কথাটা বারবার বলছ কেন?' ডাক্তারবাবু মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন।

কিন্তু আর না। আর কোন মতেই না।.... বার বার এই অর্থহীন কথাটাই মনে মনে বলতে থাকেন তিনি। আর কিছুমাত্র সুযোগ দেওয়া এবং নেওয়া উচিত নয়। ঐন্দ্রিলার ঐ হাত দুটো চেপে ধরাতেই তাঁর মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল শুরু হয়েছে। দেহেও। যেন কী একটা উন্মত্ততা অনুভব করছেন তিনি রক্তের মধ্যে—

'অনেক রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়গে।' বলেন ডাক্তারবাবু। নিজেও উঠে দাঁড়ান। কিন্তু গলার আওয়াজটা নিজের কাছেই কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনায়। ঐন্দ্রিলাও বিস্মিত হয়ে তাকায় একটু।

সে বলে, 'আপনি যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'না না, সে কী কথা। এখানে এই অন্ধকারে একলা—', ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

'ও আমার খুব অভ্যাস আছে। একা বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াই, ভয়ডর রাখলে কি চলে। তাছাড়া এখনও মঙ্গলাদের ঘরে আলো জ্বলছে। ওরাও ঘুমোয় নি এখনও—'

'আহা, সে ভয় কেন। তোমার শরীরটাই কি একেবারে সেরে উঠেছে পুরোপুরি! এত রাত করা ঠিক নয়। দশটা বাজে বোধ হয়। চল চল শুয়ে পড়বে চল—'

কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন শেষের দিকে।

অগত্যা ঐন্দ্রিলাকে উঠতে হয়। সে ওঁর বসবার ঘর দিয়ে ডাক্তারবাবুর শোবার ঘরে আসে আগে। বলে, 'দাঁড়ান আপনার মশারিটা ফেলে গুঁজে দিয়ে যাই।'....

'আঃ—কী হচ্ছে তোমার আজ! এতদিন যদি নিজে গুঁজে নিতে পেরে থাকি তো আজও পারব। যাও—শুতে যাও!'

একটু কর্কশই শোনায় গলাটা। বিরক্তিটা স্পষ্ট।

BanglaBook.org

ঐন্দ্রিলা ভয় পেয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর এ চেহারাটা যেন একেবারে অপরিচিত। উনি কি রাগ করলেন তা'হলে?

ঐভাবে ঘুরিয়ে সীতার কথাটা তোলা হয়ত উচিত হয় নি। উনি হয়ত তাতেই দুঃখ পেয়েছেন—ওঁর বিবেচনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে বলে। কিংবা হয়ত একটু বেশি লোলুপতাই প্রকাশ ক'রে ফেলেছে!

সে ভয়ে ভয়ে বলে, আপনি —আপনি যেন বড্ড রাগ করছেন আজ। আমি তো তেমন কিছু বলি নি।... জানি,—আমার বরাতটাই এই, বেশিদিন কেউ সহ্য করতে পারে না আমাকে—'

সে বাইরের দিকে মুখ ফেরায়, নিজের ঘরের দিকেই যেতে উদ্যত হয় বুঝি।

কিন্তু তার আগেই ডাক্তারবাবু এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলেন। একটা হাত ওর কাঁধে রেখে যেন সামান্য একটু আকর্ষণের মতোই করেন নিজের দিকে—তারপর বিকৃত ভগ্নকণ্ঠে বলেন, প্রায় চুপি চুপি, 'তুমি আমাকে বড্ড ভুল বুঝছ ঐন্দ্রিলা, আমি—আমি যে তোমার জন্যই তোমাকে সাবধান হ'তে বলছি, তোমাকে বাঁচাতেই চাইছি যে আমি। তোমার দাম যে আমার কাছে সত্যিই অনেক—এ কি তুমি কিছুতেই বুঝবে না?'

ওঁর বলবার সেই দীন অনুনয়ের ভঙ্গিতে, চোখের সেই করুণ অসহায় চাহনিতে অকস্মাৎ ঐন্দ্রিলার চোখেও জল এসে যায়। সে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করে—বলতে পারে না।

কথা আর বলতে পারে না কেউই। কিন্তু ঐন্দ্রিলার আয়ত বিস্ফারিত সুন্দর দুটি চোখের কূলছাপানো জল প্রৌঢ় ডাক্তারবাবুর শেষ বিবেচনা শেষ সতর্কতাটুকু—নিজেকে প্রতিহত করার শেষ শক্তিটুকুকেও বিনষ্ট ক'রে দেয়। তিনি অভিভূতের মতো ওকে আকর্ষণ করেন শয্যার দিকে, ঐন্দ্রিলাও স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে যায় ওঁর সঙ্গে—

তারপর একসময় তার হাত ধরে টেনে বসান বিছানায়। সেও সেই ভাবেই বসে। একেবারে ওঁর পাশে, কাছাকাছি। এত কাছে যে ওঁর বুকের শব্দটাও শুনতে পায় যেন।

ডাক্তারবাবু তেমনি অভিভূতের মতোই তাকে আরও কাছে টেনে নেন—একেবারে বুকের মধ্যে। ঐন্দ্রিলা বাধা দেয় না। প্রতিবাদ করে না, বরং যেন সে ওঁর সেই আকর্ষণের মধ্যে এলিয়ে পড়ে। অবশ্য তার সেই তখনও অসুস্থ-দুর্বল-শরীরে বাধা দেবার, প্রতিবাদ করবার, এ আকর্ষণ প্রতিনিরোধ করবার মতো শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। এইটুকু উত্তেজনাতেই ঘেমে উঠেছে সে, মাথার মধ্যে যেন একটা যন্ত্রণা হতে শুরু করেছে—। কিন্তু তখন, সেই মহূর্তে বাধা দেবার বুঝি ইচ্ছাও ছিল না তেমন।

সে তো মন স্থির ক'রেই ফেলেছে। ভগবান যদি সুযোগ দেন তো সে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। নিজের জীবনে সার্থকতা লাভ করার ও অপর একটি মহৎ জীবনকে সার্থক ক'রে তোলার এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই। কেন ছাড়বে? বরং তার এত বড় ঋণের কিছুটাও যদি শোধ করতে পারে তো সে-ই তার পরম লাভ বলে মনে করবে সে। পাপপুণ্য?... না, ওসব কুসংস্কার তার নেই। এ জীবন তাকে বিগত দীর্ঘকাল ধরে বারবারই শিখিয়েছে যে ওগুলো কথার কথা মাত্র। ওর কোন সত্যকারের প্রভাব নেই মানুষের জীবনে। ....

BanglaBook.org

আরও একটু আকর্ষণ অনুভব করে সে। ঐন্দ্রিলা চোখে ঝাপ্‌সা দেখছিল অনেকক্ষণ থেকেই। সে চোখ বোজে এবার। নিশ্চিন্তেই চোখ বোজে বুঝি। এ জীবনে আর কোনদিন কিছু ভাববার দরকার হবে না, ভাববেও না সে।...নিজেকে ছেড়ে দেয় সেই বাহুবন্ধনের মধ্যে—

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে—দীর্ঘকাল পরে—হরিনাথের চেহারাটা পরিষ্কার স্পষ্টভাবে ভেসে উঠল ওর দৃষ্টির সামনে। এত স্পষ্টভাবে অনেক-দিন দেখতে পায় নি সে। ইদানীং তার মুখটাই যেন ভাল ক'রে মনে পড়ত না। কেমন একটা আব্‌ছা আব্‌ছা মনে আসত শুধু, আদল একটা মনে পড়ত—এই মাত্র। আজ কিন্তু ভাল ক'রেই দেখতে পেল সে। যেন মনে নয়, সত্যি সত্যিই চোখের সামনে এসেই দাঁড়িয়েছে। সেই হরিনাথ. কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই। সেই হরিনাথ, ওর স্মৃতি মন্থন ক'রে আবেগের সমুদ্রে আলোড়ন জাগিয়ে একেবারে প্রত্যক্ষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই, স্বামী সম্বন্ধে পুরাতন বহু পরিচিত সেই আবেগটা তার পূর্ব পূর্ণশক্তিতে জেগে উঠেছে।

আঃ! আর ঠিক সেই সঙ্গেই হঠাৎ কেন মনে পড়ে যায় স্নেহময় পিতার মতো —বরং পিতার অধিক—শ্বশুর মাধব ঘোষালকে! মনে পড়ে দিদিমা রাসমণির মহিমময়ী মূর্তিটা, মনে পড়ে ছোট মাসীকে....

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে ঐন্দ্রিলা। নিজের প্রতি ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে, আত্মধিক্কারে, অনুশোচনায় সর্বাঙ্গে বিছার কামড় অনুভব করছে সে। আর কোন শারীরিক দুর্বলতাও যেন অনুভব করে না। প্রবল এক ঝট্‌কায় বাহুর বন্ধন ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, তারপর এ ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়ে সশব্দে দোর বন্ধ করে দেয়....

পরের দিন সকালে উঠে আর ডাক্তাবাবুকে দেখতে পেল না ঐন্দ্রিলা। তারও সারারাত ঘুম হয় নি, কেঁদেছে আর ছট্‌ফট করেছে—ক্ষমা চেয়েছে বারবার মৃত স্বামীর কাছে। মনে মনে নয়—অস্ফুটে হ'লেও উচ্চারণ ক'রেই বলেছে মুখে—যে, 'আমাকে মাপ করো, আমাকে মাপ করো। তুমি তো চিরকাল আমার সব অন্যায় মাপ করেছ, সমস্ত ভুল ত্রুটি মানিয়ে নিয়েছ—এবারেও তাই নাও। তুমি তো জানতে পারছ আমার সব অবস্থা, আমি কত দুর্বল কত অসহায় তা তো তোমার জানতে বাকি নেই—সেটা বুঝে আমাকে মাপ করো এবারের মতো। আমি আর পারছি না গো, আমি আর পারছি না। তুমি এবার আমাকে টেনে নাও। যখন দেখা দিয়েছ, একবার মহাবিপদে রক্ষা করেছ তখন আর ভুলে যেও না, আমাকে, নিয়ে যাও—লক্ষ্মীটি'

সারারাতের অনিদ্রা কান্না এবং বিলাপের ফলে মাথার যন্ত্রণা শুরু হ'ল আবার। ভোরে যখন ঘর ছেড়ে বাইরে এল তখন দেহ আরও দুর্বল, আরও অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তবুও আর দেরি করল না সে। ডাক্তারবাবুর ফেরবার জন্যেও অপেক্ষা করল না। তখনই স্নান সেরে নিজের সামান্য যা কাপড়চোপড় ছিল গুছিয়ে নিল। টাকা ওর কাছেই থাকত—বিছানার নিচে, সেজন্যেও ডাক্তারবাবুর মুখাপেক্ষা করতে হ'ল না। স্নান আহ্নিক সেরে সামান্য একটু মিশ্রীর-জল খেয়েই রওনা হ'য়ে পড়ল জাহাজঘাটার দিকে। বিকেলের দিকে একটা স্টীমার ছাড়ে, সেটা ধরা দরকার—নইলে আবার সেই কাল সকালে। জঙ্গলের মধ্যে একা বসে রাত কাটাতে হবে।

গোরুর গাড়ি আগেই ডাকিয়ে আনিয়েছিল, সেই গাড়িতে চেপেই রওনা হ'ল। মঙ্গলাকে বললে, 'আমার মার খুব অসুখ, খবর এসেছে। ডাক্তারবাবু জানেন তবে আমার শরীর বুঝেই উনি বলেছিলেন আর কটা দিন থেকে যাবার জন্যে কিন্তু আমার মন আর মানছে না। কে জানে গিয়ে আর দেখতে পাব কিনা সন্দেহ—মনটায় যা করছে তুই ডাক্তারবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলিস।'

মঙ্গলা সরল হ'লেও নির্বোধ নয়। সে বলল, 'তা মাকে দেখতে যাচ্ছ—সব কাপড়-চোপড় নিয়ে যাচ্ছ কেন? তুমি কি আর আসবে নি এখানে?'

BanglaBook.org

ঐন্দ্রিলা সহজভাবেই জবাব দিল, 'তা মার যদি বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে—কি শেষ পর্যন্ত বলা তো যায় না—ভালমন্দই যদি হয় কিছু—আমি কি আর ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে পারব?

গাড়ি যখন গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়েছে তখন ডাক্তারবাবু ছুটতে ছুটতে এসে ধরলেন ওকে।

দুই হাত জোড় ক'রে বললেন, 'আর কখনও এমন ভুল হবে না ঐন্দ্রিলা, আমি কথা দিচ্ছি! তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে যেও না। আমার আর কেউ নেই, বুড়ো বয়সে তোমার ওপর অনেকখানি ভরসা ক'রে ছিলুম—লক্ষ্মীটি, আর একবার আমাকে বিশ্বাস ক'রে দ্যাখো!'

ওঁকে দেখেছিল আগেই। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল। এই গত কয়েক ঘণ্টাতেই যেন অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন ভদ্রলোক! সেই সদাপ্রফুল্ল উৎসাহোজ্জ্বল মুখে কে যেন দু বুরুল কালি লিপে দিয়েছে। খুব ক্লান্তও দেখাচ্ছে। ক্লান্ত ও অবসন্ন। উনিও নিশ্চয় সারারাত ঘুমোতে পারেন নি।

মনটা দুলে ওঠে বৈকি। ফিরে যেতেই মন চায়। নতুন রকমের একটা উল্‌টো অনুশোচনাও দেখা দেয়। এই লোকটাকে আঘাত দেবার, অসহায়ভাবে ছেড়ে আসবার জন্য অনুশোচনা—

কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যেই। তারপরই নিজেকে সামলে নেয় ঐন্দ্রিলা। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সর্বপ্রকার আবেগহীন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, 'মায়ের অসুখ আপনি তো জানেনই। ... অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল হয়ত... কাল একটা ভারী খারাপ স্বপ্ন দেখেছি তাইতেই মনটা খুব উতলা হয়ে উঠেছে। আমাকে আজ যেতেই হবে।'

গোরুর গাড়ির পিছু পিছু যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু। খুব চুপি চুপি, ভগ্নকণ্ঠে—প্রায় কান্নার মতো করে বললেন, 'আর একবার আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না! কিন্তু এবার করলে আর ঠকতে না। আমার তরফ থেকে আর কোন অন্যায় হ'ত না কোনদিন। তাও যদি ভরসা করতে না পারো, তোমার মেয়েকে এনে রাখো। আমার এখানাকার বাড়ি জমি জায়গা সব তাকে লিখে দিচ্ছি। আশ্রয়ের ভয়েই তো সে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে চায় না—এখানে তার ঢের ভাল আশ্রয় মিলবে। আমাকে শুধু দুটি খেতে দিও—আর কিছু ই চাই না!'

ওঁর বলার ভঙ্গিতে ঐন্দ্রিলার চোখে জল এসে পড়ে। লোভও বড় প্রবল। চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া—মেয়ের চিন্তা থেকেও নিজের চিন্তা থেকেও। নিরাপদ আশ্রয়, নিষ্কণ্টক জীবনযাত্রা.... ক্ষণেকের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যেন। তারপরই আবার প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'সে হবে না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসবে না। তাছাড়া মার শরীর যদি সত্যিই খুব খারাপ হয়ে পড়ে, আমিই কি তাঁকে ছেড়ে আসতে পারব! আপনি আমাকে মাপ করুন, আমার ভরসা আর করবেন না। আমি চিরকালের বেইমান—আপনার সঙ্গেও বেইমানী করে গেলুম—কিন্তু থাকা আর সম্ভব নয় এখানে ওরে যজ্ঞেশ্বর, একটু হেঁকে চলে বাবা। আর মোটে সময় নেই। আচ্ছা আসি। শরীরের যত্ন নেবেন। চলে গেছি জানলে মেয়েরা আসবে নিশ্চয়ই, তাদেরই কাউকে আনিয়ে নেবেন!'

ডাক্তারবাবু আর কথা কইলেন না, সঙ্গে গেলেনও না আর। সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। গাড়িখানা শুষ্ক কঠিন তৃণশূন্য মাঠের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে একসময় তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, কিন্তু তিনি তেমনি সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার কথাও মনে রইল না তাঁর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পৌষ ফাগুনের পালা

দ্বিতীয় খণ্ড

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনেক আশা করে ঐন্দ্রিলাকে চিঠি দিয়েছিলেন শ্যামা। ভেবেছিলেন এত বড় প্রলোভনের পর সে আর একদিনও দেরি করবে না—চলেই আসবে। তিনি তাঁর মাপেই অর্থের মূল্য নির্ধারণ করেন। তাই মাসিক তিন-চার টাকা তাঁর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য মনে হয়েছিল। যদিও মনে মনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করে রেখেছিলেন, সে সব মাসে নিয়মিত ও টাকাটা না দিলেও চলবে—'দিই দিচ্ছি' করে ওটা মধ্যে মধ্যে ফেলে দিলেই হবে। সেখানে তো আর কিছু জলে পড়ে নেই মেয়ে—শ্বশুরবাড়ি আছে, দুবেলা দু মুঠো ভাতও জুটছে—আর চাই কি পরনে একেবারে কিছু না থাকলে ন্যাংটো করেও রেখে দিতে পারবে না, নিজেদের লজ্জা নিজেদেরই ঢাকতে হবে। তাছাড়া—ঠিক অত দুঃখ কষ্ট হলে—মেয়ে পড়েই বা থাকতে চায় কেন? শ্বশুরবাড়ি থেকে নড়তে চায় না যখন, তখন সেখানে মাঝারি রকমের একটা কিছু ব্যবস্থা আছেই নিশ্চয়।

কিন্তু এ সব হিসেবই তাঁর কতকটা কালনেমির লঙ্কা ভাগ হয়ে দাঁড়াল। এক এক করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল—না এল ঐন্দ্রিলা আর না এল তার কাছ থেকে কোন চিঠি। এইবার চোখে যেন অন্ধকার দেখলেন একেবারে। এত বড় বাড়ি, বাগান, পুকুর সামলানো—একাধারে ঝি রাঁধুনীর কাজ, এই বয়সে আর যেন চলে না। খুব মনের জোর তাই একটা ধাধসের ওপর—দেহটাকে যেন চাবুক মেরেই চালান কিন্তু নিজেই মনে মনে বেশ বুঝতে পারেন যে এভাবে মুমূর্ষু ঘোড়াকে জোর করে চালালে এক সময়ে সে এমন মুখ থুবড়ে পড়বে, যখন সহস্র চাবুকেও আর চালানো যাবে না। এমনিতেই তো দীর্ঘকালের দুঃখ দুশ্চিন্তা উপবাস আর কিছু করতে না পারলেও তাঁর কোমরটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে চিরকালের মতো, এখন আর সোজা হয়ে হাঁটতে কি দাঁড়াতে পারেন না। বেশ খানিকটা বেঁকে হুমড়ি খেয়ে চলতে হয় তাঁকে। সে সময় তাঁর পিঠটা ছিলে-চড়ানো ধনুকের মতোই দেখায়। সেভাবে চলা যদি বা যায় —কাজ-কর্ম করা খুব কষ্টকর। মধ্যে মধ্যে পিঠের নিচে একটা হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন পিঠটা ছাড়িয়ে নিতে চান তাও ঠিক পারেন না। এঁকেবেঁকে মুখটা বিকৃত করে অর্থাৎ বহু কষ্টে যা দাঁড়ায় সেটা ছিল ত্রিভঙ্গ গোছের একটা বাঁকাচোরা চেহারা। এমনি বেঁকে চলতেও কোমর ব্যথা করে কিন্তু আবার ঐভাবেও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না—শিরদাঁড়ায় কেমন একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি আবার বেঁকে পড়েন স্বাভাবিক অবস্থায়।

তবুও এক রকম করে চলত হয়ত—যদি শুধু তাঁর আর কান্তির সংসার হ'ত। তরু আর তার দামাল ছেলেকে নিয়েই হয়েছে যত মুস্কিল। সবচেয়ে তরুকে সামলানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে। দুর্দান্ত পাগল কিছু নয়—চেঁচামেচি বা ভাঙ্গাচোরা কিছু করে না কিন্তু একটু নজরের আড়াল করলেই বা একটু ফাঁক পেলেই চোখের নিমেষে এবং নিঃশব্দে একটা অকর্ম করে বসে। কাঁহাতকই বা অষ্ট-প্রহর চোখ রাখেন তার ওপর। দেহের এই অবস্থায় সংসারের কাজ সারতেই অনেক সময় চলে যায়। আজকাল তাঁর অত সাধের বাগানে জঞ্জাল জমে থাকে ডাঁই হয়ে পড়ে থাবে পাতা—তাই একটু হাত দেবার সময় পান না।

তবু ঐন্দ্রিলাকে গোড়াতেই কিছু লেখেননি। মেয়েকে চেনেন ভাল রকমই—তার কাছে একবার 'নিনু' হলে আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে মাথার ওপর চড়ে বসবে সে। তার চেয়ে কনক অনেক ভাল। তাই কনককেই মিনতি করে চিঠি লিখেছিলেন একখানা। কনক এসেও ছিল—চিঠি পাওয়া মাত্রই। সে সময়টা সত্যি সত্যিই যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন শ্যামা। কনক নিজের ছেলে সামলেও রান্নাবান্না পাগল সামলানো সব করত—উনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরের কাজ নিয়ে থাকতেন।

কিন্তু কনক মাস দুইয়ের বেশি থাকতে পারে নি। না পারার কারণ অনেক। কনক অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে—সেটা জানতেন না শ্যামা। তাঁকে কেউ বলে নি। এখানে আসবার পর টের পেলেন। জেরা করে জানলেন যে বেশ কয়েক মাস এগিয়ে গেছে ব্যাপারটা। অর্থাৎ এখানে বেশি দিন থাকলেই সাধ দেবার প্রশ্ন উঠবে। তারপরই দেখা দেবে প্রসবের নানাবিধ খরচা এবং ঝঞ্ঝাট। কে সে সব করবে এখানে! সেখানে নাকি হাসপাতালে ভাল ব্যবস্থা আছে—ওখানকার সকলে নাকি এ অবস্থায় হাসপাতালেই যায়। সেখানে এক পয়সা খরচ নেই, লোকজনেরও দরকার হয় না। এখানে যদি বা ঝঞ্ঝাট তিনি ঘাড়ে করতে চান—টাকা কি আর হেম বাড়তি দেবে এক পয়সাও? কনক আর তার ছেলে রয়েছে—কিছু তো বেশি খরচ হচ্ছেই, তার জন্যেও তো কিছু ধরে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে ধার দিয়েই হাঁটে না হেম, আগেও যা দিত এখনও তাই পাঠায়। শ্যামার সেটা খুবই অন্যায্য বলে মনে হয়। এটা তাঁর কিছুতেই মনে পড়ে না যে, ওরা যখন সবাই এখানে ছিল তখনও হেম এই টাকাই দিত মাসে। বাইরে চলে গেছে বলে কমায় নি একটা টাকাও। বরং তারই উচিত, খানিকটা ফেরৎ পাঠানো কিম্বা কম পাঠাতে বলা। সে কথা যে শ্যামার মনে পড়ে না শুধু তাই নয়, ছেলের অবিবেচনার কথা নিয়ে প্রকাশ্যেই গজগজ করেন, কনককে শুনিয়ে শুনিয়ে—। কনক অবশ্য উত্তর দিতে পারত, দিলে শ্যামা বিব্রত বোধ করতেন এটাও ঠিক, কিন্তু সে কখনই কিছু বলে নি, আজ তার স্বামীর টাকা পাঠানো নিয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করবে—তা সম্ভব নয়।

অবশ্য এসব ছাড়াও অন্য কারণ দেখা দিল।

হেমকে সেখানে হাত পুড়িয়ে খেতে হচ্ছে। কনক আসবার সময়ে পাশের কোয়ার্টারের মুখুজ্যেবাবুকে বলে এসেছিল, তাঁরা দেশে যেন কার শক্ত অসুখের খবর পেয়ে চলে এসেছেন, এখন শোনা যাচ্ছে আর যাবেনও না, এইখান থেকেই বদলির ব্যবস্থা করছেন। হেম এধারে যতই দুঃখ-কষ্ট করুক, সংসারের কাজ তাকে কিছু করতে হয় নি কোন দিন—এসব আদৌ অভ্যস্ত নয়। তার খুব কষ্ট হচ্ছে, অর্ধেক দিন নাকি খাওয়াই হয় না। ছাতু গুলে খেয়ে থাকে। ফলে পেট খারাপ হচ্ছে প্রায়ই। এখানে ছেলেটারও পেট ভাল থাকছে না। পশ্চিমের জল-হাওয়ায় অভ্যস্ত শিশুর শরীর এখানের এই জল আর শাকপাতা খাওয়ায় টিকছে না। তার চেহারা দেখে শ্যামাই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এর মধ্যেই দু'তিন

BanglaBook.org

দিন ফকির ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে—আরও যদি খারাপ হয়ে পড়ে তখন বড় ডাক্তার ডাকতে হবে। এত কাণ্ড করে কে! অগত্যা তাঁকেই বলতে হ'ল 'যাও'। কনকও ছেলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিল—ছেলে আর স্বামী দুজনের জন্যেই—সেও আর দ্বিরুক্তি করল না। আবারও শ্যামা একা পড়লেন।

বরং আরও বেশি একা! কান্তি এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে নিজেই একটা কাজ যোগাড় করেছে। ছাপাখানার কম্পোজিটারী কাজ—হরফের বিভিন্ন খোপ থেকে হরফ বেছে নিয়ে পর পর সাজিয়ে দেওয়া, যাতে তা থেকে ছাপ উঠলেই বইয়ের মতো পড়তে পারে লোকে। কান্তিরই কে এক পুরনো সহপাঠীর বাবার প্রেস, সেই ক'রে দিয়েছে—নইলে এও ওর পাবার কথা নয়। সেও কাজ জানে না কিচ্ছুই কখনও চোখে দেখে নি পর্যন্ত। সব নতুন করে শিখতে হবে। বদ্ধ কালা লোককে ইশারা ইঙ্গিতে শেখাবে এত গরজ কার? কান্তির বন্ধুর জিদেই এটা সম্ভব হ'ল। তাও প্রথম দু'মাস নাকি কিছুই দেবে না। তারপর থেকে চার মাস ট্রেনের মান্থলি টিকিটের ভাড়াটা পাওয়া যাবে শুধু। ছমাস পরে, যদি মোটামুটি কাজ শিখে নিতে পারে তো দশ টাকা মাইনে হবে। ওপর-টাইম খাটতে পারে তো ঐ হিসেবেই আর কিছু পাবে।

শ্যামা খুঁত্ খুঁত্ করেছিলেন, এই সামান্য আয়ের জন্যে ছ'মাস ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—কী লাভ এতে! তিনি শুনেছেন যে সীসের হরফ ঘাঁটতে ঘাঁটতে নাকি অনেকের শক্ত ব্যারাম জন্মে যায়। লাভের মধ্যে কি একটা ব্যারাম নিয়ে ঘরে ফিরবে?.... কিন্তু কান্তি অনুনয়-বিনয় করে রাজি করাল তাঁকে। এতটা বয়স হয়ে গেল,—এক পয়সা রোজগার করতে শিখল না। বিধবা মেয়ের মতো ঘরে বসে খাচ্ছে—এমন ক'রে আর কত কাল চলবে। মা যতদিন আছেন ততদিন তবু দাদা টাকা পাঠাচ্ছে—এর পর? সে তো কোন লাইনেরই কাজ শেখে নি, রোজগার করবার তো কোন সম্ভাবনাই নেই কোন দিকে, এ যে একটা কাজ শিখতে পারছে এই তো বড় লাভ। ওর বন্ধুর কাছ থেকে ভাল ক'রেই খবর নিয়েছে সে—ভাল ক'রে কাজ শিখতে পারলে এ লাইনেও ভাল রোজগার হয়। ওদের প্রেসেই এক-একজনের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে আছে, ওপর-টাইম নিয়ে তারা ষাট সত্তর টাকা রোজগার করে মাস গেলে।

এসব কথার ওপর আর কিছু বলতে পারেন নি শ্যামা। ফলে এখন কান্তিও ভাত খেয়ে পৌনে সাতটার গাড়িতে বেরিয়ে যায়, ফেরে এক-একদিন রাত আটটা সাড়ে আটটায়। সে মাইনে করা লোক নয়, ওপর-টাইম খাটবার কথা নয় তার —কিন্তু কান্তি রাত অবধি থাকে নিজের গরজেই। যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শেখবার সুযোগ, বিশেষত রাত্রের দিকে 'কেস' খালি পাওয়া যায় অনেক। সবাই তো ওপর-টাইম করে না, তাদের টুলে বসে কাজ করতে পারে। আগে আগে কেউ কাজ শেখাতে চায় নি, বরং যথেষ্ট অসুবিধেই সৃষ্টি করেছিল কিন্তু কান্তির বিনয়ে আর নেটিপেটি ভাবে অনেকেরই মায়া পড়েছে এখন। তাছাড়া সে নির্বিচারে সকলের ফাইফরমাশ খাটে—চা আনা, বেগুনি কিনে আনা, এটা ওটা হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া —কিছুতেই 'না' বলে না। সে যেন সকলেরই চাকর। তাছাড়া সে ইতিমধ্যে প্রুফ তোলার কাজটা শিখে নিয়েছে বলে দু'মাস পরে শুধু টিকিট ভাড়া নয়—পুরোপুরিই পাঁচ টাকাই বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন মালিক।

কিন্তু সে যা-ই হোক, শ্যামার কাছে ক্রমশঃ দুঃসহ হয়ে উঠেছে এই একান্ত নিঃসঙ্গতা। শুধু একা থাকা একরকম—তাঁর দু'দিন না খেলেও চলে যায়, কিন্তু আরও তিনটি প্রাণীর খাওয়ার প্রশ্ন আছে। আর রান্না খাওয়া থাকলে তার সঙ্গে রকমারি কাজও থাকবে। তার ওপর পাগল-চরানো। মল্লিক-গিন্নী বলেন, ছেলেটার বিয়ে দাও। মেয়ের

অভাব হবে না—অমন অনেক গরিব-দুঃখী মেয়ে আছে যাদের বাপ-মা ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচে।

মেয়ের অভাব হবে না তা শ্যামাও জানেন। তবু মন সায় দেয় না তাঁর। এখনও যে বলতে গেলে কিছুই রোজগার করতে শিখল না, তার মাথায় একটা সংসার চাপিয়ে ন্যাঞ্জারি ক'রে দেওয়া —মা হয়ে শত্রুতাই করা বলতে গেলে। তাছাড়া সে কান্তিও রাজি হবে না কিছুতে। সেটুকু ছেলেকে চেনেন ভাল রকমই।.....

না, সে কোন কাজের কথা নয়।

কাজের কথা যেটা—সেই মতোই কাজ করেছিলেন তাই। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক হিসেব ক'রে ঐন্দ্রিলাকে চিঠি লিখেছিলেন। সাধারণত ঐন্দ্রিলা চিঠি লেখে না তাঁকে—পূজোর সময় ছাড়া। এবারেও লেখে নি। লিখেছিল মহাশ্বেতাকে, অরুণের সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল সেই খবরটা দিয়ে। মহার কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে শ্যামাই তাকে চিঠি দিয়েছিলেন—উপযাচক হয়ে। এটা তাঁর নিজের কাছেই অঘটন বলে মনে হয়েছিল—অপমান বোধ হয়েছিল খুব, নিতান্ত বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়েছিল—কোন দিকে কোন উপায় ছিল না বলেই।

ঐন্দ্রিলার কাছ থেকে যখন কোন উত্তর এল না—প্রায় তিন-চার সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে দেখে সীতাকে একটা চিঠি লিখলেন শ্যামা। সব অবস্থা খুলেই লিখলেন। এককালে তো এখানে সে যথেষ্ট আদর-যত্ন পেয়েছে, এখন তাঁর বিপদের দিনে কয়েকটা মাস এসে কি থাকতে পারে না সে? তিনি ওর চিঠি পেলেই আসবার গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেবেন কিম্বা বুড়ো-কেষ্ট কাউকে পাঠাবেন—এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন। এবারেও তাঁর মনে হ'ল যে তাঁর তরফ থেকে এতখানি বদান্যতার প্রস্তাব যাবার পর আর সীতা না এসে পারবে না।

কিন্তু দেখা গেল যে, আবারও হিসাবে ভুল হ'ল তাঁর।

সীতা এল না। তবে তার কাছ থেকে জবাবটা পাওয়া গেল। সে-ই মার অসুখের খবর দিল। ডাক্তারবাবু তাকে চিঠি দিয়েছেন—বিশেষ কিছু লেখেন নি, শুধু খুব অসুস্থ, উত্থানশক্তি-রহিত এইটুকু জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে, উতলা হবার কোন কারণ নেই, সে-রকম বুঝলে তিনিই জানাবেন। টেলিগ্রাম করবেন বা লোক পাঠাবেন। তবে মনে হয় যে তেমন কোন অবস্থা দেখা দেবে না, রোগী এখন আস্তে আস্তে ভালই হয়ে উঠছে।

মার খবর দিয়ে নিজের কথা লিখেছে সীতা। না আসবার কারণ জানিয়েছে খোলাখুলিই। লিখেছে—

'এখন ইহারা আমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করিতেছে না, বরং ভালই করিতেছে। আমার ছেলেকেও পাঠশালে ভর্তি করিয়া দিয়াছে! অবশ্য মার টাকাতেই আমাদের জামা-কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় বাহিরের খরচা চলে। কিন্তু মার টাকা আসার তো কোন স্থিরতা নাই। মাঝে মাঝে দীর্ঘদিনই বন্ধ থাকে, সে সব সময়ে ইহাদের দয়াতেই দিন চলে। সে অবস্থায় এ আশ্রয় ছাড়া উচিত নয়। একবার চলিয়া গেলে—আর কোন দিন ঢুকিতে পাইব কি না সন্দেহ। বিশেষ যখন আপনার দুই-চারি দিনের ব্যাপার নহে, হয়ত বেশ কিছুকালই থাকিতে হইবে— তখন ইহাদের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়াই যাইতে হইবে বলা যায়। আপনি আমাদের ভার লইতে চাহিয়াছেন কিন্তু আমার ছেলের লেখাপড়া শিখাইবার ভার কি আপনি লইবেন? এখানে থাকিলে—লেখাপড়া না শেখাক ইহারা নিজেদের গরজেই একটা কোন রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আপনার ওখানে সেটুকুও হইবে না। তারপর—কিছু মনে করিবেন না—আপনি আর কদিন—পরে

BanglaBook.org

মামারা যদি দুইটা প্রাণীর ভার না বহিতে পারেন?.... অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার এখান ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয় কোনমতেই। আপনার কাছে আমাদের অনেক ঋণ, আপনার দুঃসময়ে কোনকাজে আসিতে পারিলাম না, সে জন্য লজ্জার সীমা নাই—কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আমাকে এখানে থাকিতে হইতেছে। সকল দিক ভাবিয়া আপনি আমাকে মাপ করিবেন।' ইত্যাদি—

আঁকা-বাঁকা লেখা, বানান ভুলে ভর্তি, কিন্তু বক্তব্যে কোন জড়তা কি অস্পষ্টতা নেই। বরং অদ্ভুত একটা দৃঢ়তাই লক্ষ করলেন শ্যামা। অমন ভালমানুষ ভিতু-ভিতু মেয়েটার মধ্যে এত শক্তি এত বুদ্ধি বিবেচনা কোথা থেকে এল কে জানে। বেশ একটু অবাকই হয়ে গেলেন শ্যামা ওর চিঠিটা পড়ে! ....

কিন্তু মূল সমস্যাটা থেকেই গেল। হয়ত তার সমাধান কোনদিনই হয়ে উঠত না—অন্তত শ্যামার দ্বারা তো হতই না, কথাটা ভাবতেও পারতেন না তিনি—যদি না তাঁর গর্ভের সর্বাপেক্ষা নির্বোধ সন্তানটি এ-বুদ্ধিটা তাঁকে না দিত।

অনেকদিন এ-বাড়ি আসে নি মহাশ্বেতা। সেই অভয়পদর ভরাডুবি হবার পর থেকে বহুকাল আসে নি। মা টিট্‌কিরি দেবে, এই লজ্জাটাই সবচেয়ে প্রবল তার। 'শত্তুর হাসবে', 'শত্তুরের কাছে চিরকালের মতো মুখখানা পুড়ল'—এই আপসোসটাই তার সবচেয়ে বেশি। সে 'শত্তুর'টা যে কে—অনেক ভেবেও এক শ্যামা ছাড়া কাউকে খুঁজে পেত না ওর ছেলেরা। সেই শত্তুরের কাছে টিটকিরি খাবার ভয়েই মহাশ্বেতা এ দিক মাড়াত না। শেষে একদিন নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন শ্যামা। ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাজায় লেগেছিল খুব। ওঠবার সামর্থ্য ছিল না। সেইদিনই রাত্রে কান্তিকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলেন মহাকে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল, দুদিন ছিলও—তবে ঐ গোনা দুদিনই। শ্যামা একটু ওঠবার মতো হ'তেই আর থাকে নি।

বাপ্‌রে—কী বলছ! গুষ্টিটার ধকল কি কম! আমি না থাকলেই বৌটোর প্রেহারী, ওকে দিয়ে দু'টো লোকের কাজ করিয়ে নেবে। বলবে তোর শাশুড়ী নেই তো আমরা কি করব—সে যায় কেন! নাও দিকি—আমি যেন ওদের চোদ্দগুষ্টির পিণ্ডি জোগাবার ইজেরা নিয়ে রেখেছি। আর মুখপোড়া বৌটাও হয়েছে তেমনি বোকা, কাজে না বলতে জানে না। কত শিখিয়ে দিই—তেমন তেমন দেখলে পেট কামড়াচ্ছে বলে গিয়ে শুয়ে পড়বি কিম্বা বলবি বড্ড মাথা ধরেছে—বলি পেট কামড়ানো কি মাথাধরা এ তো ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই যে বলে হয় নি। এ তো আর রবারের নল-টিপে দেখার রোগ নয় গো—তা কে কার কড়ি ধারে। সেই ভূতের মতো খাটবে, বারোমাস তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন—'

তারপর থেকে অবশ্য আসে মধ্যে মধ্যে। স্বামীর নির্বুদ্ধিতার জন্য বিলাপ করে, শাপ-শাপান্ত করে—যদিও সেটা কার উদ্দেশ্যে করা হয় তা ভালো বুঝতে পারেন না শ্যামা, তবে তার গূঢ়ার্থটা যে অভয়পদর কাছেই পৌছয় এ কথাটা বোঝাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়, আরও চেঁচিয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ করে। তাই আর ওকে বিশেষ ঘাঁটান না শ্যামা, 'শত্তুর হাসা'র কথা তিনিও শুনেছিলেন তাই এ কথাটাও মনে করিয়ে দেন না যে তিনি আগেই ওকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন বার বার। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন আর বলে লাভ কি। আবার হয়ত আসা বন্ধ করবে। এলে উপকার বই অপকার নেই, যতটুকুই থাকুক—পাঁচটা কাজ টেনে ক'রে দিয়ে যায়। শ্যামার কাছে এখন সেইটুকুই লাভ, নিজেকেই বোঝান মাঝে মাঝে —'ভাঙ্গা ঘরে জ্যোচ্ছনার আলো, যদ্দিন যায় তদ্দিন ভাল! যেটুকু করে তাই আমার উগ্‌গার।'

BanglaBook.org

মহাশ্বেতাই একদিন এসে বুদ্ধিটা দিলে। অন্য দিনের মতো নয়—সেদিন এল সেই আগেকার মতো—যেন লাফাতে লাফাতে। দূর থেকে আসার ধরন দেখেই বুঝেছিলেন শ্যামা যে আজ কোন বিশেষ বক্তব্য আছে। হয় কোন 'মজার ঘটনা ঘটেছে" (অন্তত মহাশ্বেতার কাছে মজার) কোথাও—নয় তো তাঁকেই কোন বুদ্ধি দিতে আসছে সে। সাধারণত এই বুদ্ধি দিতে আসাটা নিতান্ত বোকার মতোই হয়, সেই অভিজ্ঞতাতেই শ্যামা নিজেকেই একটু কঠিনভাবে প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু মহাশ্বেতার বক্তব্য শুনে এই প্রথম 'তাঁকে স্বীকার করতে হ'ল যে তাঁর বড় মেয়ে ভাল মতলবই দিয়েছে!

মহাশ্বেতা এসে বাইরের রকে বসে ভাল ক'রে দম নেবার আগেই কথাটা পাড়ল, 'বলি তুমি এত বোকা কেন গা! এই তো বুদ্ধি যোগাও এত লোককে—নিজের বেলা মাথাটা খোলে না। একা এক হাতে নাটা-ঝাম্‌টা খাচ্ছ—মুখের রক্ত তুলে মরে যাচ্ছ—বড় মাসীদের আনিয়ে নাও না, তা'হলেই তো সব গোল চুকে যায়।'

'বড় মাসীমাদের—?' কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন না শ্যামা, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে।

'ওমা, ও বাড়ি তো ওদের ছাড়তে হবে, শোন নি? বাড়িও'লারা তো বাড়ি বেচে দিয়েছে, নোটিশ হয়েছে ওদের ওপর ঘর ছাড়তে হবে! নতুন বাড়িও'লাদের বেরৎগুষ্টি, গোটা বাড়িটা না হলে সম্পষ্যি হবে না তাদের। এখন তো হন্যে হয়ে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে বড়দা। তা ও ভাড়াতে আর কোথায় ঘর পাবে বলো, এতকাল ছিল কখনও তো এক পয়সা ভাড়া বাড়ায় নি, এখন যেখানেই যাচ্ছে শুনছে এতটি ভাড়া। অথচ আপিসেও নাকি টলোমলো অবস্থা, লোকজন সব ছাড়িয়ে দিয়েছে, কাজ কম—মাল বিক্কিরি হয় না, ওদের লাইনে নাকি আরও ভাল ভাল লোক এসেছে—তাদের জিনিস এদের থেকে ঢের ভাল। এদের এখন সে জিনিস করতে গেলে আরও এতটি টাকা ঘর থেকে ঢেলে নতুন নতুন যন্তরপাতি আনাতে হবে, তা ছেলেটা পেরস্তুত, বাপ মিন্‌সে রাজি নয়, বলে, যা করেছি এখন বসে খেতে পারব—ঘরের টাকা সব বার ক'রে দিয়ে যদি আর না তুলতে পারি? যদি নতুন মালও না চলে! এহকাল পরকাল দুই-ই যাবে! টাকা তো সব বাপ মিন্‌সের হাতে, সে সই না করলে তো উঠবে না, তাই ছেলেটাও কিছু করতে পারছে না। বড়দাকেও তো বলেছে যে, তুমি যদি ভাল চাকরি পাও অন্য কোথাও, খুঁজে নিয়ে সরে যাও—আমি তোমার ক্ষেতি করব না। কিন্তু বড়দাই বা আর এই বুড়ো বয়সে কোথায় যায় বলো! মাইনে কমিয়ে নিতে রাজি হয়ে চাকরিটা টিকিয়ে রেখেছে।... ওর সঙ্গে আজকাল যে আপিসে এসে প্রায়ই দেখা করে। ইন্দ্রেটা যদি ওদের আপিসে ঢুকতে পারে কোনমতে, হাজার হোক সাহেবের আপিস, এ কোন কালে উঠবে না। কিন্তু এখন আর ও ঢোকাবে কী ক'রে বলো, এখন সব এল-এ বি-এ পাস করা লোক ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে চোদ্দ গণ্ডা, তাদের ফেলে ওকে নেবে কেন। বলি দাদা তো আর গিয়ে নোয়া পিটতে পারবে না এই বয়সে। দিলে লেখাপড়ার কাজই তো দিতে হবে! তাছাড়া, এই ব্যাপারটার পর তোমার জামাইয়ের মুখটাও খুব আর নেই আপিসে!'

এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মতো দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে, বোধ করি দম নেবার জন্যেই থাকে মহাশ্বেতা। শ্যামাও এই প্রথম ফাঁক পান একটু তলিয়ে বুঝতে।

এ সবই শুনেছেন তিনি। দিদি চিঠিতেও লিখেছেন তাঁকে। বাড়ি ছাড়তে হবে অথচ বেশি বাড়িভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই—সংসারই অচল হয়ে উঠেছে দিনকে-দিন—তাও লিখেছেন। কিন্তু তবু—

BanglaBook.org

মহাশ্বেতা অবশ্য বেশিক্ষণ সময় দিল না তাঁকে। আবারও বলল, 'কালই এসে ওকে বলেছে নাকি বড়দা যে, তোমাদের ওদিকে পাঁচ-সাত টাকায় যদি একটা ছোট-খাটো বাড়ি পাওয়া যায় তো তাই নয় দ্যাখো, না হয় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করব তোমাদের মতো। কলকাতায় এখন দশ-পনেরোটা টাকায় যে ঘর পাওয়া যায় সে একেবারে শুয়োর খোঁড়—তাতে ভদ্দরলোক থাকতে পারে না, ছেলেমেয়েগুলোও মরে যাবে সে সব ঘরে থাকলে।... কথাটা শুনেই তো মতলবটা মাথায় গেল গো, বলি ভাড়া নিতে চাও তাও নিতে পারো—নইলে তোমার বাড়ি তো পড়েই আছে, না হয় থাকলই এসে, পর তো নয়। এলে তোমার অন্তত পাগল সামলাবার কাজ তো হবে। বড়-মাসী আর কিছু করতে পারুক না পারুক বসে মেয়েটাকে তো আগলাতে পারবে।'

হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসেন শ্যামা, গলার আওয়াজটা তাঁর নিজের কাছেই তীক্ষ্ণ শোনায়, 'একত্তরে?'

'একত্তরে কেন গো—অতবড় রান্নাঘর পড়ে আছে তোমার, দাদা তো এস্তক নাগাদ শুয়ে গেল ওখানে—সেখানে আর একটা উনুন জ্বেলে তাদের রান্না তারা করতে পারবে না? তারা তাদের মতো খাবে, তোমরা তোমাদের মতো, তা'হলে তো আর কোন গোল থাকবে না। শুধু থাকবে এক জায়গায় এই যা। তাতে তো তোমারই লাভ বেশি, বড়-বৌ থাকলে সে কি আর এক আধ দিন ছড়া-ঝাঁটগুলো দেবে না—না, ঘর দোরগুলো মুছবে না?'

চুপ ক'রে বসে ভাবেন শ্যামা অনেকক্ষণ। মতলবটা মন্দ লাগে না বটে—তবে অসুবিধেও হবে কিছু কিছু! মেয়েগুলো বড় হয়েছে, কলকাতার মেয়ে, গাছপালা ছিঁড়েখুঁড়ে ফল-ফুলুরি তুলে নষ্ট করবে ঢের। তবু, সুবিধাটা তাঁর দিকেই বেশি। চাই কি তিনি না চাইলেও ভাড়া বলে কিছু দিতে পারে গোবিন্দ। আর যদি এক সংসারে খায়—খোরাকি বলে যত টাকাই ধরে দিক—তার মধ্যে থেকে কিছু বাঁচাতে পারবেনই তিনি।

তবু বলেন, 'কিন্তু এই তো একটা ঘর, কোথায় সব থাকবে তাও তো বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বড়দা বৌদি এই বাইরের ঘরে থাকবে। কান্তিকে বরং রান্নাঘরে ব্যবস্থা ক'রে দাও। ঘরে তরু যেমন থাকে থাকবে, তুমি তো দালানেই থাকো নাতিকে নিয়ে, সেখানেই বড়মাসী শোবে এখন। জায়গার আবার অভাব, কলকাতায় কীভাবে আছে সব গিয়ে দ্যাখো না একবার।'

আরও কিছুক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া করবার পর পরামর্শটা ভালই লাগে শ্যামার। তিনি বলেন, তা তুই না হয় তাহলে জামাইকে বলেই দে, তাদের যদি কোন অসুবিধে না হয় তো এসে থাকুক। ভাড়া-ফাড়া দিতে হবে না, ঢের খেয়েছি দিদির, আজ আর এই আধখানা ঘরের জন্যে হাত পেতে ভাড়া নিতে পারব না। সেই টাকাটা জমিয়ে যদি গোবিন্দ এখানে মাথা গোঁজার একটা জায়গা করতে পারে তো করুক।'

মার এতটা সুমতি আশা করে নি মহাশ্বেতা, সে খুশি হয়ে তখনই উঠে পড়ল, 'দেখি বলি গে আজ তোমার জামাইকে, পারে তো কালই গিয়ে খবরটা দিয়ে আসুক!.... ওকে আজকাল নড়ানোই মুশকিল, ঐ সর্বনাশের পর থেকে কোথাও যেতে চায় না—আমিও বলি না, যা পোড়ানো পোড়ালে মুখখানা—আর ও মুখ না দেখানোই ভাল। ছি ছি! আমারই কি এ মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে, জীবনেই যেন ধিৎকার এসে গেছে। রাস্তা দিয়ে আসি, মনে হয় রাস্তার লোক আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বুদ্ধি, তোমরা সবাই বলতে বড় জামাইয়ের এ্যাতো বুদ্ধি ত্যাতো বুদ্ধি! বলে না —অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—তা ওরও হ'ল তাই! হাত্তোর কপাল রে!'

বিলাপ করতে করতে চলে যায় সে। কিন্তু শ্যামা স্থির হয়ে বসেই থাকেন। কে জানে ভাল করলেন কি মন্দ করলেন। আবার হয়ত কী একটা নতুন ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ছেন মিছিমিছি—কিন্তু তিনিও আর পারছেন না, এটাও ঠিক। ঐন্দ্রিলাকে মেয়ের খরচ সুদ্ধ দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন—সে খরচটা তো ষোল আনাই বাঁচবে চাই কি হাতে কিছু আসতেও পারে। এখন তো মনে হচ্ছে সুবিধে তাঁর দিকেই বেশি! তারপর কী দাঁড়ায় কে জানে। তাঁর যা ভাগ্য, শিব গড়তে গেলে বাঁদরই হয় বরাবর—এও হয়ত তাই হবে।

রানী-বৌকে তাঁর ভালই লাগে, ভাল মেয়ে। এলে উপকারই হবে। মধ্যে যে তার সম্বন্ধে বিদ্বেষ এসেছিল মনে, সে শুধু নিজের ছেলের জন্যেই। হেম যদি বড়-বৌদিকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি না করত তাহলে বলবার কিছু ছিল না। রানী-বৌয়ের দোষ তত নয়—যতটা দোষ তাঁর ছেলের। ছেলে এখন নেই—এই একটা সুবিধে, নইলে এখনও ভরসা পেতেন না। রানীর রূপ এখনও অগ্নিশিখার মতো আর তেমনি বুদ্ধি। তার কাছে কনক? চাঁদের কাছে জোনাকি!

আবার অবচেতনে একথাও মনে হয় এক-একবার, মন্দ হয় না, ভাতার-সোহাগী হয়ে বড্ড অহঙ্কার হয়েছে, থোঁতা মুখ যদি আর একবার ভোঁতা ক'রে দিতে পারেন তো খুব জব্দ হয়ে যায়!

অপরাহ্ন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে গাছে-পালায় আব্ছা হয়ে, তবুও শ্যামা বসে থাকেন সেই এক ভাবে।

॥ ২ ॥

রানী-বৌকে অনেকদিন পরে দেখলেন শ্যামা। তার রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে পূর্বেকার ছবিটাই মনের মধ্যে ছিল, এখন তাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে তা শুনেছিলেন, মহাশ্বেতা না কে যেন বলছিল তাঁকে, 'সে দাবদলনী বড়বৌকে আর চিনতে পারবে না এখন দেখলে,' সে কথাটা যে এমন মর্মান্তিকভাবে সত্য, তা কল্পনা করতে পারেন নি তিনি।

অমন ভরা-যুবতী মেয়েটা যেন আধপোড়া চেলা কাঠ হয়ে গেছে একেবারে। তেমনিই শীর্ণ, তেমনিই শ্রীহীন। সবচেয়ে অমন বসরাই গোলাপের মতো রংটা —কী কালিই মেড়ে দিয়েছে সে চামড়ার ওপর। তিনিও এককালে ঐ রকমই ফরসা ছিলেন, এখন কালোও হয়ে গেছেন এটা ঠিক—তবু, সে কতখানি বয়সে এবং কত দুঃখকষ্টে, দেহের ওপর কতখানি অত্যাচারে। এ বয়সে অন্তত এ 'ছিরিমূর্তি' হয় নি তাঁর। শুধু দাঁতগুলো এখনও তেমনি আছে, তেমনি সাজানো সুন্দর—আর থাকার মধ্যে আছে চোখ দুটো, তাতে যেন এখনও তেমনি ভেলকি খেলে। মুখের সেই হাসিটুকুতে আর চোখের চাউনিতে শুধু ধরা যায় যে এ সেই রানী-বৌ, নইলে চেনবার আর কোন উপায় নেই তাকে।

প্রথম দেখে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন শ্যামা, কোন প্রশ্ন করা তো দূরে থাক, মুখ দিয়ে কথাই সরে নি। রানী যখন হেসে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'কী মাসীমা—চিনতে পারছেন না?' তখন যেন সম্বিৎ ফিরল তাঁর। তিনি চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন ক'রে বললেন, 'সত্যিই চিনতে পারি নি মা, এ কী হাল হয়েছে তোমার!'

রানী ম্লান হাসল একটু। জবাব দিল না।

পরে কমলার মুখে কারণটা শুনলেন শ্যামা। এই ছেলেটা হবার পর থেকেই নাকি ভুগছে রানী-বৌ। কিছু হজম হয় না, হাগা-রোগ ধরেছে, তার ওপর প্রায়ই একটু-আধটু জ্বর হচ্ছে ইদানীং। তাইতেই দিন দিন অমন শুকিয়ে বৃষকাঠ হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

শুনে শ্যামা শিউরে উঠলেন, 'তা হ'লে তো সুতিকা হয়েছে বলো! কোন ডাক্তার দেখাও নি?'

কমলা কপালে একটা হাতের ঘা মেরে বললেন, 'ডাক্তার! এক কথায় পনেরো টাকা মাইনে কমে গেল, খেতে দেব ওদের না ডাক্তার দেখাব? তবু তো একটা বাঁচোয়া—বৌমার দূর দূর আঞ্জা, এতদিনে মোটে তিনটি, নইলে তেমন হ'লে তো এতদিনে এক ঘর ছেলে-মেয়ে হবার কথা।... না, ডাক্তার-ফাক্তার দেখানো হয় নি—ঐ পাড়ায় এক হোমিওপাথিক ডাক্তার আছে, এক আনা করে এক পুরিয়া ওষুধ নেয়, তাই এনে খাওয়ানো হয়েছিল কদিন—তা তাতে তো কিছুই হ'ল না। আর কি করব বলো!'

শ্যামা বললেন, 'তা হাসপাতালে-টাসপাতালে নিয়ে গেলেও তো পারতে—কিম্বা ঝামাপুকুরের সেই কবিরাজখানায়? তারা খুব ভাল ওষুধ দেয় শুনেছি। এ সব ব্যারামে তো কবিরাজিই ভাল—সবাই বলে!'

'সে তো বলে। কিন্তু নিয়ে যায় কে সেই তো কথা! আমি ওসব চিনিও না, তাছাড়া আমার ওরকম হুট্ করতে বেরোনো অব্যেসও নেই কোন কালে। এখন তো এমনিও পারব না, হাত-পা যেন সর্বদা কাঁপে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাতে থাকে একটু চললেই। আবার বছর কতক ধরে শুরু হয়েছে, বর্ষা হলেই হাত-পা ফোলে একটু একটু—সে সময়টা বুক-ধড়ফড়ানিটাও বাড়ে। তা আমি তো ধরো কাজের বার সব দিক দিয়েই। কে নিয়ে যাবে, হাসপাতালে তো আর এক-আধ মিনিটে হবে না। তোমার খোকাটা থাকলেও হ'ত। হেম থাকলে তাকে বলতে পারতুম, সে একদিন আপিস কামাই করেও দেখিয়ে আসত!'

শ্যামা একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলেন, 'তা আসলে যার করবার কথা—সেকি করে, তোমার গোবিন্দ!'

'গোবিন্দ! তবেই হয়েছে। ওর আপিস সেই হয়েছে যাকে বলে—ভাত দেবার ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—তাই! এধারে মাইনে কমল, ওধারে কাজ বাড়ল। লোক তো বেশির ভাগই ছাড়িয়ে দিয়েছে—যা ঐ পুরনো আর বুড়ো-হাবড়া কজন আছে—জানে যে এরা কোথাও নড়বে না, কিম্বা নড়লেও কাজ পাবে না কোথাও তাই তাদের নিশ্চিন্তি হয়ে দু'পায়ে থ্যাঁৎলাচ্ছে এখন। গোবিন্দ তো যায় আজকাল সেই সকাল আটটায়, ওর কাছেই চাবি থাকে, গিয়ে আপিস খুলতে হয়, আর একেবারে চাবি দিয়ে বাড়ি আসতে পায়—যার নাম ধরো সেই রাত সাড়ে আটটা নটায়। কাজ নেই নেই শুনছি, অথচ রোজই ওপর-টাইম। লোক কম বলেই নাকি ওপর টাইম দিতে হয় রোজ! এই তো ছেলের হাল—বলে সময়ের অভাবে বাজারই করতে পারে না—ডাল ডালের বড়া দিয়ে ভাত ঠেলতে হয়। ঐ করেই তো বৌটার আরও শরীর যেতে বসেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা প্রশ্ন করেন, 'তা অন্য কোথাও কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারছে না?'

'কৈ আর পারছে। চিরদিনই তো জান—কুনো-মতো স্বভাব! মানুষজনের সঙ্গে ভাব-আলাপ থাকলে তো কাজ-কম্মের চেষ্টা হবে—সে রকম জানাশুনো লোকই বা কই?'

চুপ করে যান শ্যামা। তবে মনটা তাঁর খারাপ হয়েই থাকে।

এক সময় এই বড়বৌ সম্বন্ধে তাঁর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। ছেলেকে পর ক'রে নিচ্ছে ছলাকলায় ভুলিয়ে—এই কারণেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব এসেছিল। সে ভাবটা আর নেই, সেদিক দিয়ে সব গ্লানি পরিষ্কার হয়ে গেছে তাঁর। বরং ছেলে এখন বৌয়ের কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁর মনে হয় যে, এককালে বড়বৌদির বশ ছিল সেটা তবু শোভা পেত, সেইটেই স্বাভাবিক। কিসে আর কিসে। মার বহু-ব্যবহৃত উপমাটা মনে পড়ে তাঁর

BanglaBook.org

এই প্রসঙ্গে—শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার লেজে! ছিঃ! ছেলের প্রবৃত্তিতে ঘৃণা বোধ হয় তাঁর। মনে হয়—রানীর মতো মেয়ের দ্বারা অভিভূত হ'লে কোন পুরুষকেই দোষ দেওয়া যায় না। তবে তাকে যে দেখেছে, তাকে যে ভালবেসেছে, সে আবার কনকের মতো বৌকে মাথায় তুলে নাচে কী ক'রে?

না, রানী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আর নেই তাঁর এখন। বরং সেই ফুটফুটে দেবীপ্রতিমার মতো ছোট্ট বউটি আর তার মুক্তোঝরা হাসি দেখে অকারণেই যে স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল একদা—সেই স্নেহেরই যেন খানিকটা আজ অনুভব করেন আবার। দুঃখ বোধ করেন, উদ্বেগ বোধ করেন বৌটার জন্যে। একথাও মনে হয় এক একবার, উদ্বেলিত স্নেহবোধের সেই সব দুর্বল মুহূর্তে যে, ক্ষমতা থাকলে তিনি নিজেই পয়সা খরচ করে বড় ডাক্তার দেখাতেন। অবশ্য সে ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণাটাও তাঁর খুব অস্পষ্ট, কত টাকা জমলে সেরকম ক্ষমতা হয়েছে তাঁর এটা স্বীকার করবেন, তা কখনও ভেবে দেখেন নি, এ রকম ক্ষমতা যে—তাঁর যতই কেন না টাকা জমুক হাতে—কখনই আসবে না, সেটাও বুঝতে পারেন না। দেখালে এখনই দেখাতে পারেন স্বচ্ছন্দে, বছরে অন্তত ত্রিশ-বত্রিশ টাকা সুদ তাঁর মারাই যায়; আসলও ডোবে গড়ে ঐ পরিমাণই।

যাই হোক—টাকা খরচ সম্ভব নয়, কারুর জন্যেই। যেটা সম্ভব সেইটেই করেন। সূতিকার অনেক টোটকা-টুটকি জানা আছে অনেকেরই—নিজে উদ্যোগী হয়ে পাড়াঘরে খোঁজ-খবর করে মাদুলি এবং খাওয়ার ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। গোটা দুই-তিন মাদুলি পরিয়েও দেন। মাকড়দায় কে একজন স্বপ্নাদ্য ওষুধ দেয়—কেষ্টকে পাঠিয়ে তাও আনিয়ে নেন। আর, মনে হয়—কোন্‌টায় কতটা তা বলা মুশকিল—তবে—এ সবগুলো জড়িয়ে একটু উপকারও হয়। ওরই মধ্যে একটু যেন সুস্থ বোধ করে রানী, আগের লাবণ্যের শতাংশ না হ'লেও একটু চেকনাই ফিরে আসে আবার।

রানী তাঁকে আরও মুগ্ধ করে গুণে। ওর এ দিকটা জানা ছিল না শ্যামার। শরীর এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সে এসেই বহু কাজ টেনে নিয়েছে শ্যামার হাত থেকে। ঘর দালান মোছা, উঠোন ঝাঁট, রান্নাঘর, রান্নাঘরের দাওয়া নিকোনা —কোনটাই করতে হয় না আর। সবচেয়ে বড় উপকার সে করেছে—তরুর জন্যে আর মোটেই মাথা ঘামাতে হয় না তাঁকে। তার ভার সম্পূর্ণই নিয়েছে রানী। তাকে জোর করে তুলে মুখে ধোওয়ানো, কাপড় ছাড়ানো, স্নান করানো, খাওয়ানো—সবই সে করে। সেদিক দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছেন শ্যামা। আগের মতো চোখ রাখতেও হয় না সদা-সর্বদা। সেটা দিদি এবং বড়বৌই করে। মেয়েগুলোও খানিকটা সেয়ানা হয়েছে, তারাও একটু গোলমাল দেখলেই শোরগোল তোলে।

অবশ্য টাকার দিক দিয়ে কোন সুবিধা হয় নি। নগদ কিছু হাতে পান নি শ্যামা। একত্র রান্না করার প্রস্তাবে গোবিন্দ রাজি হয় নি। সে বলেছে, কতকটা শ্যামাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছে যে, 'এক তরকারী খাই, শুধু আলু ভাতে ভাত খাই সেও ভাল—আতেলা আঝালা তিরিশ ব্যান্ননে আমার দরকার নেই। তাছাড়া মাসী কস্মিনকালে আলু কিনবে না—আলু ছাড়া আমার মেয়েরা এক গাল ভাতও মুখে তোলে না, সে তো জানই। না, ও যার যা তার তা থাকাই ভাল। এতকাল পরে খাওয়া নিয়ে অস্‌সরস করতে রাজি নই আমি।'

সুতরাং—সেই প্রথম দিনটা যা ওঁর সংসারে খেয়েছিল ওরা, তারপরই আলাদা উনুন পেতেছে রানী। কয়লার উনুন পেতেছে—পাতার জ্বাল কি কাঠের জ্বাল ওরা দিতে পারবে না। মাসে দু'মণ কয়লাই লাগে। গা-করকর করে শ্যামার—এই একটা টাকা তাঁকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে পাতা জ্বালাতে পারত ওরা!

BanglaBook.org

তবে কয়লার উনুন জ্বলে অনেকক্ষণ। ওদের রান্না হয়ে গেলে যা আঁচ থাকে তাতে প্রায়ই এটা-ওটা-ওটা করে নেন শ্যামা। নিজেকে আর বেলায় নতুন করে পাতার উনুন জ্বালাতে হয় না। তবুও, ওরা যে মধ্যে মধ্যে ওঁর পাতা কাঠ বেলদো ব্যবহার করে উনুন ধরাবার জন্যে—সেটা লক্ষ করে একটা অকারণ উষ্মাও অনুভব করেন। অত পাতা যে কখনও তাঁর শেষ হবে না, তা তিনি মানতে প্রস্তুত নন যদি তিন বছর তিনি বিছানায় পড়েই থাকেন, কে অত গরজ করে পাতা কুড়িয়ে জড়ো করবে? জড়ো করেন বলেই এত দেখায়—নইলে কলসীর জল গড়িয়ে খেলে কদিন থাকে?

খাওয়া-দাওয়া একত্র হ'লে যে টাকাটা জমতে পারত সে টাকার ভরসা আর রইল না। শেষ একটু ক্ষীণ আশা ছিল, মাসকাবারে ভাড়া বলে অন্তত পাঁচটা টাকাও গোবিন্দ দিতে আসবে তাঁকে। উনি নিতে চাইবেন না অবশ্য, তবে গোবিন্দ হয়ত জোর করেই রেখে যাবে। কিন্তু গোবিন্দ সে দিক দিয়েই গেল না। মাস-কাবার হয়ে গেল, মাইনে যে পুরো না পেলেও কতক কতক পাচ্ছে (চিরদিনই তিন-চার কিস্তিতে মাইনে পায় সে —তা শ্যামা শুনেছেন, তবে প্রথম কিস্তিটাই বেশি)—তা ওদের বাজার-হাট, মাসকাবারী উটনো তোলা দেখে আঁচে-আন্দাজে বুঝতে পারেন। অবশেষে যখন পরের মাসের অর্ধেকও কাবার হয়ে গেল গোবিন্দ কোন উচ্চবাচ্য করল না, তখন তিনি বাইরে প্রকাশ না করলেও মনে মনে অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'কেন রে বাপু, খুব তো সাউখুড়ী করে বাড়িভাড়া করতে যাচ্ছিলি—তা সে টাকার গরম আমার বেলা বুঝি একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল! বলিহারী কপাল আমার। বিচার-বিবেচনা আমার বেলাই দেখি লোকের উঠে যায়!' মনে মনে বলেন শ্যামা।

তবে ভেতরে ভেতরে যা-ই হোক বাইরে এ আশাভঙ্গজনিত অপ্রসন্নতা এমন কি ইশারা-ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন না তিনি। দিদিরা আসতে যে সুবিধাটুকু হয়েছে তাঁর, তার মূল্যও কম নয়—ওরা বাড়ি ভাড়া করে অন্যত্র চলে গেলে তাঁর এক পয়সাও আয় বাড়বে না—বরং এই সুবিধা-সুযোগটুকু থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন—এ ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁর খুব আছে। তরুর দিকটা ছাড়াও, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও অনেক সুবিধা হয়েছে তাঁর। কান্তি ডালের বড়া পোস্ত-চচ্চড়ি ভালবাসে—শ্যামা একা এ সব ঝঞ্ঝাট কোন দিনই পেরে ওঠেন না—এখন ওদিকে হ'লে তার জন্যে তোলা থাকে। এমন কি শ্যামাও পান কিছু কিছু। প্রথম প্রথম ওটা ছিল নৈমিত্তিক—পরে নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। শ্যামা যেটুকু তরকারি রাঁধতেন সেটুকুও কমিয়ে দিলেন। আনাজের জন্যে চিন্তা নেই, থোড় ডুমুর ডাঁটা কাঁচকলা—এ তো বাগানে আছেই—শুষুনি কলমীশাক আমড়া এরও অভাব নেই। কিন্তু শুধু আনাজ দিয়েই তরকারি হয় না, তেলমশলা লাগে। যত কমই দিন, ফোড়ন চোঁয়াবার মতো একটু তেল আর অন্তত হলুদ-বাটা—এটা লাগেই। তরকারি কম রাঁধতে হ'লে সেইটেই লাভ। বরং সেই জন্যে, প্রসন্ন মনেই সে সব শাক-ডুমুর-ডাঁটা-আমড়া এদের ঘরে তুলে দেন। রবিবারে কান্তি বা গোবিন্দ বাড়ি থাকলে তিনি নিজেই গরজ ক'রে ছিপ নিয়ে বসতে বলেন, যা দু-একটা মাছ ওঠে। জানেন যে উঠলে এবং ওদিকে রান্না হ'লে তাঁর ছেলে বা নাতি বঞ্চিত হবে না। মাছ তুললে খরচা নেই তাঁর—পাড়ার লোক তো নিত্য চুরি করে বলতে গেলে—ফাঁক পেলেই—কিন্তু মাছ রাঁধতে গেলে এক গাদা তেল লাগে। সে তেল সাত আনা দরে কিনতে হয়।.... বরং এই সব সময়ে কান্তি যখন বড়মাসিমার দেওয়া তরকারি ও মাছ দিয়ে তৃপ্তি ক'রে খেয়ে ওঠে—তখন তাঁর ছোট ছেলেটার কথা মনে হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। কোথায় যে গেল হতভাগা ছেলেটা! বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। মরে গিয়ে থাকে সে একরকম, কতগুলোকেই তো

BanglaBook.org

যমের মুখে দিলেন তিনি—অর্ধেকেরও বেশি দিয়েছেন ঠিক ঠিক হিসেব ধরলে—কিন্তু বেঁচে থেকে কোথাও চাকরের কাজ করছে কিম্বা চুরি ক'রে জেলা খাটছে কিনা—সেই চিন্তাই তাঁর বড়।

লাভ-লোকসান দুটো পাল্লা মিলিয়ে অনেকবার হিসেব ক'রে দেখেছেন শ্যামা, এরা আসাতে অনেক দিক দিয়েই সুবিধা হচ্ছিল তাঁর। সেই মনে করেই ছোটখাটো অসুবিধাগুলো গায়ে মাখছিলেন না, হাসি-মুখটা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে তাঁর চিরশত্রু মেয়েটা আবার হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হয়ে সব গোলমাল ক'রে দিল।

সেই প্রথম চিঠি লেখার পর ঐন্দ্রিলার আর কোনও খবর তিনি করেন নি। সীতার কাছ থেকে চিঠি পেয়েও—সত্যিই খুব ভারি কোন অসুখ করেছিল ওর, এ তিনি বিশ্বাস করেন নি। মেয়ের না আসবার গা—এইটেই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর, যত অসুখই করুক, এতদিন ধরে ভুগছে, এ তিনি একবারও ভাবতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, ভাল চাকরি পেয়েছে সুখে আছে, তাই আর আসতে চায় না। তিনিও আর চান নি যে ও আসুক। বরং ওকে লেখাটাই একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর—এইটেই মনে করতেন ইদানীং। সত্যি সত্যিই এসে গেলে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে যেত হয়ত—অসতর্ক মুহূর্তের নির্মিত খালে যে শেষ পর্যন্ত কুমির ঢোকে নি, এতেই ধন্যবাদ দিতেন নিজের অদৃষ্টকে।

তবু দীর্ঘ দিন পর্যন্ত একটা আশঙ্কা ছিল, একেবারে সম্প্রতি, এই মাসখানেক হ'ল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সে যে এত কাল পরে সেই পূর্ব পত্রের সূত্র ধরে এসে হাজির হবে একদিন, তা একবারও মনে করেন নি। বিশেষত সে যেভাবে কাপড়-চোপড়ের বেশ একটি ডাগর পুঁটুলী নিয়ে এসেছে তাতে স্থায়ীভাবে ঢোকবার মতলব বলেই মনে হ'ল। তাতে আরও গা জ্বলে গেল তাঁর।

মেয়ের প্রণামের বদলে বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন তিনি, 'তারপর? হঠাৎ—? কী মনে করে?'

মার কাছ থেকে খুব হৃদ্য অভ্যর্থনা পাবার আশা অবশ্যই করে নি ঐন্দ্রিলা—কিন্তু তাই বলে এমন আক্রমণাত্মক প্রশ্নের জন্যও সে প্রস্তুত ছিল না। সে একটু থতমতই খেয়ে গেল। তারপর বলল, 'তার মানে? তুমিই তো—বা রে!'

'ও, সেই চিঠি পেয়ে এ্যাদ্দিন পরে তুমি মায়ের উগ্‌গার করতে এসেছ। .... ওরে আমার গোপাল রে! .... বলে, এখন মরে লক্ষ্মণ ওষুধ দেবে ঠিক-দুপুর বেলা! চিঠির উত্তর নেই কিছু নেই—আঠারো মাস পরে উনি এলেন আমার মাথা কিনতে!'

'চিঠির উত্তর দেব কী করে—আমি বলে মরা মরা বাঁচলুম। চিঠি পেয়েই তো চলে আসছিলুম—আসব বলেই তো কোন জবাব দিই নি—হঠাৎ অমন শক্ত অসুখটা ধরে গেল বলেই—'

'তা সে তো আর আমি এখানে বসে হাত গুনব না বাছা!' শ্যামার কণ্ঠে তিক্ততা যেন আরও উগ্র হয়ে ওঠে, 'না কি আমার বিপদটা তোমার অসুখ জেনে চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে!'

ঐন্দ্রিলা যেন হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় বোধ করে নিজেকে। মায়ের মতলবটা ঠিক ধরতে পারে না। সত্যি সত্যিই তাড়িয়ে দেবেন নাকি ওকে?

'তার মানে—তুমি সে সব কথা এখন উল্‌টে দিতে চাও বলো!... আমি যে সোনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

BanglaBook.org

'তোমার চাকরি সোনার কি রূপোর তা তো আমি জানি না বাছা, অত খবরে আমার দরকারও নেই। সোনার চাকরি ছেড়ে আসবেই বা কেন আমার কাছে পেটভাতায় খাটতে? আর তা তুমি ছেড়ে আসও নি—এত বোকা তুমি নও। এলে তখনই আসতে, এই এ্যাদ্দিন পরে উদয় হ'তে না। আসলে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে তাই মায়ের কথা মনে পড়েছে আবার!'

'তাড়িয়ে দিয়েছে!' অমরবাবুর অসহায় মুখখানা মনে পড়ে যেন চোখে জল এসে যায় ঐন্দ্রিলার, 'তেমন লোক নয় তাঁরা। দেবতার মতো মনিব আমার, আসবার সময় চোখের জল ফেলেছে। আমিই বলে তোমার এমন ধারা শুনে তাদের দিকে না তাকিয়ে চলে এলুম। সেইটে আসাই দেখছি অন্যায় হয়েছে। তারা যে সেবা আর চিকিচ্ছে করেছে—'

'তা তোমার অন্যায়ই হয়েছে বাছা। একশ'বার হয়েছে। তোমার মতো ঝগড়াটে কুচক্কুরে লোককে যখন অমন হ্যাঙ্গালি-জ্যাঙ্গালি করে চিঠি দিইছি আসতে তখনই তোমার বোঝা উচিত কী রকম আতান্তর অবস্থা আমার! সে অবস্থাতে—একটা খবর পর্যন্ত না পেয়ে, তুমি চার মাস পরে কি চল্লিশ মাস পরে তোমার মর্জি মতো দয়া করে কবে একদিন আসবে, সেই ভরসায় বসে থাকব তোমার জন্যে—এটা ভাবা খুব অন্যায় হয়েছে!'

'তা আমি কি মিথ্যে বলছি আমার অসুখের কথাটা? হয় না হয় জিগ্যেস করবে চলো না!'

'আমার কী এত গরজ!' শ্যামার কণ্ঠ তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে, আর সত্যি-মিথ্যের কথা উঠছেই বা কেন? যদি সত্যিই হয়—তোমারও তো ভাবা উচিত ছিল যে, এতদিন পরে তাদের অত দরকার এখনও আছে কিনা একখানা পোস্টকার্ড লিখে অন্তত উদ্দেশ করি!'

'তা হলে তুমি সে সব যা বলেছিলে কিছুই দেবে না বলো!'

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ঐন্দ্রিলা।

'দোবই না তো! কিসের জন্যে দোব শুনি! তখন এলে সে কথা থাকত। তোমার মেয়েকেও তো চিঠি দিয়েছিলুম—তাদের দু-দুটো প্রাণীর ভার নিতে চেয়েছিলুম জন্মকালের মতো... তা তার পছন্দ হ'ল না, ঝেড়ে জবাব দিলে। ব্যাস্ চুকে গেল ন্যাটা! আমারও সম্পক্কের ঐখানে ইতি। আর কি তাদের মুখ দেখব ভেবেছ?.... তোমরা মায়ে-ঝিয়ে এলে না বলে তো আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না আর। আমাকে তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে! এদের সে বাড়ি ছাড়িয়ে সংসারটাই টেনে আনতে হ'ল এখানে, আবার আমি তোমার পেছনে এতটি খরচ করতে যাব কী জন্যে শুনি!'

মেয়ের চিঠির কথাটা ঐন্দ্রিলা জানে। সে ওখান থেকে সিধে মেয়ের কাছেই গিয়েছিল। সেখানে কদিন থেকে এখানে এসেছে সে। মেয়ের কাছে তাকেও চিঠি লেখার খবরটা শুনেই আরও নিশ্চিত হয়েছিল। মায়ের দরকারটা খুবই বেশি, নইলে সীতার সব ভার নিতে চেয়ে আসতে বলতেন না।... এর মধ্যে বড়দাদা সংসার তুলে এখানে আসবে তা ভাবে নি সে।...

ঐন্দ্রিলা পাথরের মতো সেইখানেই বসে রইল—অনেকক্ষণ। একবার মনে হ'ল সে মেদিনীপুরেই ফিরে যায়। তা গেলে চিরকালের মতোই হিল্লে হয়ে যেতে পারে, তারও—মেয়েরও। কিন্তু সে ঐ একবারই। সঙ্গে সঙ্গেই মনকে শাসন করল সে। না, আর না! সে সম্ভব নয় আর। যা আছে অদৃষ্টে হবে, না হয় চাকরিই একটা খুঁজে নেবে সে। তার অদৃষ্টই এই—মাঝে কটা মাস সুখভোগ, ওটা স্বপ্নে-দেখা ঘটনা বলে ধরে নেওয়াই উচিত।

শ্যামা হ্যাঁ না আর কিছুই বললেন না। মহাশ্বেতার ভাষায়—আবাহনও না, বিসর্জনও না। ঐন্দ্রিলাকে চলে যেতেও বললেন না, ঘরের মধ্যে আসতেও বললেন না। ব্যাপারটা বিশ্রী দাঁড়াচ্ছে দেখে কমলাই এগিয়ে এলেন এবার। জোর করে ওকে ঘাটে পাঠালেন

কাপড় কেচে আসতে। নিজেই গুড় গুলে একটু শরবত ক'রে দিলেন। তারপর চুপি চুপি ইশারা করলেন একেবারে কাজে লেগে যেতে। সে উদ্যোগী হয়ে রান্নাবান্না শুরু করলে শ্যামা আর কী বলবেন?

ঐন্দ্রিলাও সে ইঙ্গিতটাও বুঝল। নিজেই উঠে চাল মেপে নিয়ে ঘাটে চলে গেল ধুতে।

॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রিলা এবার একটু ঘটা ক'রেই কাজকর্ম শুরু করল। রানীকেও কিছু করতে দেয় না সে, বলে, 'ওমা, কেন, আমি থাকতে—। তোমার তো এই শরীরের হাল। ঘরটা দালানটা মোছা কি ঝাঁট দেওয়া, এটা আর আমার দ্বারা হবে না!'

রান্নাবাড়া ঘরের বাসি পাট সেরেও আজকাল সে এটা-ওটা ক'রে দেয় মায়ের। বাগানে ঠেকো দেওয়া, দু-একটা চারা নেড়ে বসানো, মাচা-টাচাগুলো মেরামত করা—এ সব আগে সে একদমই হাত দিত না, এখন নিজেই ঘুরে ঘুরে করে বেড়ায়। মনে হয় পাতা কুড়োতে বা নারকেলের-পাতা চাঁচাতেও তার আপত্তি নেই—নিহাৎ বড় স্পষ্ট তোষামোদ হয়ে পড়ে বলেই নিজে থেকে এগোয় না, শ্যামা একবার নিজে থেকে বললে তাও করতে পারে।

কিন্তু শ্যামা সেদিক দিয়েই যান না। মেয়েকে তিনি চেনে, তাকে একবার তাঁর তরফ থেকে তুচ্ছতম কাজে লাগালেও জোর পেয়ে যাবে সে। সেই একটা যে-কোন সুযোগেরই অপেক্ষা করছে, তাও তিনি জানেন। সেই সুযোগটাই তিনি দিতে রাজি নন। তার উপস্থিতিটাই যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চান তিনি। একেবারে নিশ্ছিদ্র রকমের উদাসীন থাকেন কন্যা সম্পর্কে। স্নান করে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মেয়ে যদি ঠাঁই করে ভাত বেড়ে না রাখে তাহলে নিজেই সে ভাত বেড়ে নেন, মেয়েকে বলেন না বেড়ে-দিতে, অথবা রানী কি কমলাকে দিয়েও বলান না।

তাঁর এতদূর কাঠিন্যের আরও কারণ ছিল। মেয়ের তরফ থেকে শুধু দাবি বা জোর পেয়ে যাওয়াই সব নয়।

সেটা কমলা বুঝতে পারেন না কিন্তু রানী বোঝে। বলে সে বুঝিয়ে শাশুড়ীকে। যদিও এত ছোট কথা বলতে তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কমলা দরিদ্র কিন্তু ছোট নন, রানীও তাই এত সঙ্কীর্ণতাতে অভ্যস্ত নয়।

এন্দ্রিলা আসার পর থেকে এদিকে পুরোদমে রান্নাবান্না শুরু হয়েছে। ইদানীং দুপুরে রান্নার পাট তুলেই দিয়েছিলেন শ্যামা; কান্তি ভোরে ভাত খেয়ে যায়, সেই সময়েই একেবারে ভাত রান্না করে নেন সকলের মতো। সে অবশ্য ভাতে-ভাতই খায় বেশির ভাগ, কোন দিন একটা তরকারি হয়ে যায়। তাই দিয়েই তরু আর তার ছেলেকে খাইয়ে দেন সকাল সকাল। নিজে যখন খেতে বসেন তখন ওদের উনুনে আঁচের অবস্থা দেখে একটা তরকারি কি একটু বাটি-চচ্চড়ি বসিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে তাই থেকেই একটুখানি ঢেলে রেখে দেন বিকেলের জন্যে। অর্ধেক দিন সেটাও চড়াতে হয় না। কমলাদের হেঁসেল থেকে যা পাওয়া যায় টুকটাক্ তাইতেই চলে যায়। রাত্রেও, ওদের রান্না সকাল করে চোকে। কান্তি আর তার নাতি বলাইয়ের সওয়াখানা প্রাণীর জন্যেটা—এতটুকু ডাল কি একটা কাঁচকলা ভাতে দিয়ে ওদেরই মরা-আঁচে বসিয়ে দেন। অনেক সময় সে বসিয়ে দেবার কাজটাও রানীই সেরে দেয়। তরকারি সকালের না থাকলে আর করবার চেষ্টাও করেন না—ওধার থেকে কান্তির জন্যে যা তোলা থাকে—তাই ঢের। বৈধব্যের অজুহাতে তরুকে রাত্রে কিছুই খেতে দেন না প্রায়, নিজের সঙ্গে ওকেও তেল হাত বুলিয়ে চালভাজা বা ক্ষুদ

BanglaBook.org

ভাজার নাড়ু—এই দেন, সে কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না। সব ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ঐ ডবকা মেয়েটা অমন টাঙ্গিয়ে থাকে—তার সামনে নিজে রুটি নিয়ে খেতে বসতে কমলার লজ্জাই করে। তিনিই প্রায়ই বলেন 'ওকে দুটো ভাত দিলেই পারো, পাগলের আর বিধবা সধবা কি, এমনি তো যার-তার পাত থেকে তুলে খাচ্ছেই—মিছিমিছি খাড়া উপোস দিয়ে রাখা—

শ্যামা সে কথা কানে তোলেন না। বেশি বললে জবাব দেন 'সে নিজে থেকে তুলে খায় আমাদের অজান্তে—সে আলাদা কথা। কিন্তু তাই বলে বামুনের ঘরের বিধবা—তার পাতে আমি ভাত বেড়ে দিতে পারব না। আর লোকে জানলে কি বলবে, সে ভারি নিন্দে হবে পাড়া-ঘরে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলা আসাতে সব উল্টেপাল্টে গেছে। এখন রীতিমতো দুবেলাই রান্না হয়। ডাল হয় একদিন-দুদিন অন্তরই। তাছাড়া তরকারিও—যতই সেদ্দপক্ক রান্না হোক—থোড়-সড়সড়ি, শুষুনি শাকের ডালনা আর কচুর শাক—এক-আধ ফোঁটা তেল লাগেই। তাছাড়া ঐন্দ্রিলা খুব কমিয়েও শ্যামার মতো মিতব্যয় করতে পারে না। এর ওপর, আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে চাল-ডালের ক্ষুদ ভিজিয়ে সরুচাকলি করে সে—আসলে পরের বাড়ি থেকে রাত্রে খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে—শুধু দুগাল মুড়ি চিবিয়ে থাকতে পারে না। এ সবই বাজে খরচ মনে হয় শ্যামার। একটা মানুষ আসাতে একটা মানুষের অনুপাতে খরচা বাড়ে নি, অনেক বেশি বেড়েছে। হেঁসেলে রীতিমতো দুবেলা রান্না হচ্ছে দেখে ও হেঁসেল থেকেও বিশেষ কিছু আর আসে না—বরং ওদের, বিশেষত দিদিকে কিছু কিছু দিতেই হয়। অর্থাৎ ডবল লোকসান। এই সব নানা কারণেই বিরক্ত হয়ে থাকেন শ্যামা, মেয়ের উপস্থিতিটা একটুও পছন্দ হয় না তাঁর।...

শ্যামার এই কঠিন হয়ে থাকার কারণ সবটা না বুঝলেও—কিছু কিছু বুঝেছে ঐন্দ্রিলাও। সে এদিকের এত ছোট ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে নি, বহু দিনের অনুপস্থিতিতে মার স্বভাবের অনেকগুলো কথা ভুলেও গেছে হয়ত। সে ভেবেছে যে সীতার জন্যে মাসকাবারে পাছে সে টাকা চেয়ে বসে—এই ভয়েই তিনি কিছুতে আমল দিতে চান না ওকে।

সেও কঠিন হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। সহজে ছাড়বে না সেও, এস্‌পার-ওস্‌পার দেখে নেবে। যদি যেতেই হয়, যদি চাকরি নিতেই হয় আবার—এদিকে এটা চূড়ান্ত কিছু করে যাবে।

কথাবার্তা দুজনে নেই বললেই হয়, যদিচ সেটা এমন কিছু নিয়মবাঁধা বা প্রতিজ্ঞা করা নয়। ঐন্দ্রিলা কথা কইলে শ্যামা জবাব দেন—যতটা সম্ভব সংক্ষেপে। ঐন্দ্রিলার এখানে আসবার ঠিক এক মাস পূর্ণ হতে সে গিয়ে বিনা ভূমিকাতেই কথাটা পাড়ল মার কাছে, 'সে টাকাটা তো এবার দিতে হয়—পাঠাতে হবে আমাকে।'

তখনই তেতে ওঠেন না শ্যামা। তাঁর মুখের শিরাও কাঁপে না একটি। খুব সহজভাবেই প্রশ্ন করেন, 'কিসের টাকা?'

'ঐ সীতির জন্যে যেটা দেবে বলেছিলে—চার-পাঁচ টাকা। কিছুই হবে না তাদের—তবু, ওটুকুও না পাঠালে আতান্তরে পড়বে।'

'সে তো তোমাকে সেই প্রথম দিনই বলে দিয়েছি বাছা যে, যে-সময়ে যে-অবস্থায় বলেছিলুম, সে সময়ে সে অবস্থায় এলে দিতুম। তুমি তা আসো নি, কখন আসবে—আসবে কিনা—তাও লেখোনি। তার জন্যে আমাকে অন্য পথ খুঁজেতে হয়েছে। কাজেই

BanglaBook.org

সে কথা আর এখন তুলে কোন লাভ নেই। আর এ সমস্তই তো পরিষ্কার করে প্রথম দিনই বলে দিয়েছি। এক কথা একশোবার তুলে লাভ কি?'

শ্যামা স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বললে কোন উষ্মা প্রকাশ পায় না তাঁর কার্যে। তিনি জানেন টাকা তাঁর সিন্দুকে, জোর করে কেউ নিতে পারবে না। মিছিমিছি মাথা গরম করবেন কেন?

কিন্তু ঐন্দ্রিলাও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে বলে, 'অন্য উপায় তো তোমার বড়মাসীদের আনা। সে ওদের ওবাড়ি ছাড়তেই হ'ত, অন্য বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না—এসে উঠেছে। তোমার জন্যে তার কোন ক্ষেতি স্বীকার করে আসে নি। আমি সব শুনেছি—একেবারে তো ছেলেমানুষ নই, অত সহজে আমাকে ভোলাতে এসো না!'

শ্যামা বলেন, 'আমার কাউকেই ভোলাবার দরকার নেই বাছা, তেমনি আমাকেও না কেউ ভোলাতে আসে। আমি এক পয়সা দোব না। তোমাকে সেদিনই সে কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলুম। তার জন্যে সতেরো গণ্ড কৈফিয়ৎ এখন তোমার কাছে দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

এর পর এন্দ্রিলার পক্ষে নিজ-মূর্তি ধারণ করাই স্বাভাবিক, আর তা-ই করে সে। কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে লাফিয়ে মাথা খুঁড়ে শাপশাপান্ত করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসে। বহুদিন পরে আবার এ বাড়িতে লোক জড়ো হয়। কমলা তো কাঠ, রানীও অপ্রস্তুত। একবাড়ি বাইরের লোকের সামনে এই বিসদৃশ কাণ্ডতে সে যেন লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। এতকাল শুনেই এসেছে কিন্তু কোন ভদ্রলোকের মেয়ে যে এমন করতে পারে তা তার ধারণা ছিল না। হাজার হোক তারা ওর আত্মীয়—একথা পাড়ার সবাই জানে। আরও বিচলিত হয় এই কারণে যে, ঐন্দ্রিলার কঠিন কঠিন অভিসম্পাতগুলো নির্বিচারে তার বাচ্ছাদের উদ্দেশেও বর্ষিত হচ্ছে। এরা যেন জেনেশুনে যড়যন্ত্র করেই ওর মেয়ের সর্বনাশ করতে এসে বসেছে। পয়সাও'লা মাসীর মন যোগাচ্ছে। তবে ঐন্দ্রিলাও দেখবে কে কার ধন ভোগ করে। সেও সহজে মরছে না। মরবার হ'লে এবারেই মরে যেত, সেই ব্যামোই হয়েছিল তার। ভগবান অনেক রঙ্গ দেখাবেন বলেই সারিয়ে তুলেছেন!... ঐ সর্বনাশী বুড়ির ধন কাউকেই ভোগ করতে হবে না, ছেলে-মেয়ে নাকি-নাতনী জামাই-বৌ—যে যেখানে আছে গুষ্টিসুদ্ধ খেয়ে পয়সায় গেরো বেঁধে থাকবে যক্ষিবুড়ি। যদি এরা মনে করে থাকে যে মন যুগিয়ে এক পয়সাও ঐ গরো খুলে বার করতে পারবে তো প্রকাণ্ড ভুলই করেছে! উল্‌টে এই মতলব নিয়ে যারা তার অবীরে ছেলেমানুষ মেয়ে আর বাচ্ছা নাকিটার ন্যায্য পাওনা কেড়ে নিতে এসেছে—তাদের সর্বনাশ আগে হবে। ইত্যাদি—

কিন্তু এরা যতই বিচলিত হোক, যাঁর সর্বাধিক লাগবার কথা তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্বিকার থাকেন। শ্যামার হাতের কাজ বন্ধ হয় না। এমন প্রশান্ত মুখে কাজকর্ম সব করে যান যেন তাঁর ধারে-কাছে কোথাও কোন চেঁচামেচি হচ্ছে না, যেন তাঁর বাড়িতে অন্তত কুড়ি-পঁচিশজন লোক এসে জড়ো হয় নি।

সেদিন ঐন্দ্রিলা রাঁধল না, সংসারের কোন কাজকর্ম, এমন কি বাসি পাটও করল না। করবে না তা শ্যামাও জনতেন। মরে মরে নিজেই সব সেরে নিলেন তিনি। পুরুষরা কাজে চলে যাবার পর ঘটনাটা ঘটেছিল, কান্তির ভাত তিনিই রেঁধে দেন চিরকাল। আজও রেঁধে দিলেন, তবে আজকাল বেলায় পুরো এক প্রস্থ রান্না হয় বলে আর সকলের ভাত সেই সাত-সকালে করে রাখেন না। তাই আজ স্নান করে এসে ভাতও চাপাতে হ'ল। অবশ্য ভাতে-ভাতই চাপালেন একেবারে। ছোট মেয়ে নাতিকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে চলে গেলেন। ঐন্দ্রিলার ভাতও নিয়েছিলেন, তবে ভাত বেড়ে ডাকতে গিয়ে গাল-বাড়িয়ে চড়

BanglaBook.org

খাবার মতো বোকা তিনি নন—হাঁড়িতে ভাত পড়ে রইল, ইচ্ছে হ'লে সে বেড়ে খেতে পারবে—এই পর্যন্ত।

ঐন্দ্রিলা অবশ্য উঠলও না, খেলও না অনেকটা চেঁচামেচি করার ফলে—তখন কিছু টের না পেলেও—পরে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাইতেই ভয়ে সে চুপ করে গিয়েছিল একেবারে। আবার যদি সেই রকম হয়—ডাক্তার দেখানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, এখানে এমন কেউ নেই যে গরজ করে হাসপাতালেও দিয়ে আসবে! হাসপাতালে দিলেও বাঁচবে কি না সন্দেহ।

সারা দিন না খেয়ে বসে থাকার পর কমলাই জোর করে হাত ধরে পুকুরে নিয়ে গেলেন, নিজে মাথায় জল ঢেলে দিলেন। তারপর গিয়ে ভাতেও বসালেন। ভাত খেয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ঐন্দ্রিলা, তখনও তার মাথা ব্যথা করছে।

পরের দিন সকালে উঠে কিন্তু অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করল আবার। কমলারা মনে করলেন সুবুদ্ধি হয়েছে, মিছিমিছি ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ নেই বুঝতে পেরেছে—কিন্তু শ্যামা অত সহজে ভুললেন না। তিনি জানতেন এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী তাঁর মেয়ে নয়। হাল ছাড়লে চলবে না ওর। নিশ্চয় বৃহত্তর কোন সংগ্রামের জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি শঙ্কিত হয়েই রইলেন একটু।

আর, দু-একদিন যেতে না যেতে দেখা গেল তাঁর আশঙ্কাই ঠিক। এবার মাকে আঘাত করবার পরোক্ষ কিন্তু অভ্যর্থ পথটাই বেছে নিল ঐন্দ্রিলা। একেবারে যাকে বলে আদাজল খেয়ে লাগল কমলাদের পিছনে!

কমলা এসবে আদৌ অভ্যস্ত নন। তাঁরা বাড়িওলাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল এক বাড়িতে বাস করেছেন, সেখানে তাদেরও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি বা দেইজিঘাঁটা কচকচি না হ'ত, নয়—কিন্তু এ রকম অশান্তির অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। এতটা অশান্তি যে একটা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে এ তাঁদের কল্পনার বাইরে। কথায় যে এত ধার থাকে, তাও জানতেন না।

সত্যিই এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উত্তর তিনি দিতে পারতেন না। দিতে পারত রানী—দু-একবার মোক্ষম উত্তরই দিয়েছে সে কিন্তু যুক্তি-তর্কে হার মানলে ঐন্দ্রিলা মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করত—চিৎকার ও গালিগালাজ। রানী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথা সেও সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারে কিন্তু ইতরতায় সে পেরে ওঠে না ঐন্দ্রিলার সঙ্গে। কখনই করে নি, কমলার কাছে থেকে থেকে—ভুলেই গেছে সে যে, মানুষ এমন চিৎকার গালিগালাজ ও শাপ-শাপান্ত করতে পারে নিকট আত্মীয়কে।

আগে পুরুষদের বাড়ি থাকার সময়টা শান্ত হয়ে থাকত একটু, কিন্তু পরে সে সংযমও রইল না। গোবিন্দ ঠিক হেম নয়—চুলের ঝুঁটি ধরে দু-চার ঘা দেবে কি বাড়ি থেকে বার করে দেবে—সে ক্ষমতা তার নেই। ক্রমশ দিন এবং রাত্রি —দুই-ই দুর্বিষহ করে তুলল সে ওদের।

খবর পেয়ে একদিন মহাশ্বেতাও এল। আগে কোন দিন ওর কোন্ ছেলে যেন নিজে দেখে এবং শুনে গেছে এ বাড়ির অশান্তি, মাকে গিয়ে সে-ই বলেছে, 'ওরে বাপরে, সে কী রৈরক্কার কাণ্ড! মেজমাসী দিন-রাত যেন দশবাই চণ্ডী হয়ে ধেই ধেই নাচছে! বড় দিদ্‌মা তো ঐ ভালমানুষ, সে ভয়ে মরে—এক কোণে বসে চোখের জল ফেলছে, বড়মামী সুদ্দু ঘরের কোণে কাঠ হয়ে বসে। সবচেয়ে দুদ্দশা মেয়েগুলোর, ভয়ে পাঙাশপানা হয়ে ঠকঠক

BanglaBook.org

করে কাঁপছে শুধু। বড় মামী বলে ছেলেটা নাকি দিনে-রেতে একটি বার চোখের পাতা বুজুতে পারে না মাসির চিচ্‌কারের ঠেলায়!

'তা মা কিছু বলতে পারে না?' মহাশ্বেতা ছেলের ওপরই তেড়ে ওঠে কতকটা, 'অন্য সময়ে অন্যের বেলায় তো মার মুখ ছোটে খুব! টিট করতে পারছে না সে মেয়েকে?'

'তুমি রেখে বসো দিকি! টিট করবে! মেজমাসীর যা অবস্থা—তেমন কিছু বলতে গেলে টিবটিবিয়ে দেবে দিদ্‌মাকে। সেখানে আর দিদ্‌মার দাঁত ফোটাতে হচ্ছে নি। কুটুস কুটুস বাক্যি ঝাড়তে দাও—সে বেলায় দিদ্‌মা খুব আছে, এর সঙ্গে কী করবে? তুমিও যেও নি বাপু—অনথক চাটটি গাল খেয়ে আসবে!'

সুপরামর্শ সন্দেহ নেই!... কিন্তু মহাশ্বেতার পক্ষে এই ধরনের পরামর্শ শুনে চুপ করে বসে থাকা হাত-পা গুটিয়ে—সম্ভব নায়। সে পরের দিনই মার বাড়ি ছুটল এবং বুঝিয়ে বলতেও গেল ঐন্দ্রিলাকে। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত, ঐন্দ্রিলা একেবারে ফেটে পড়ল যেন, 'অ. বড্ড প্রাণে লেগেছে, না? আমার মেয়েটা মরে যাক, শোকে দুঃখে আত্মহত্যে করুক, আর আমি নাতির হাত ধরে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াই—এই চেয়েছিলে, না? সেই জন্যেই কুটনী-গিরি করে শত্তুরদের এনে বসিয়েছ! তোমাকে আমি চিনি না, মুড়কীমুখী শয়তান! বাইরে অমনি তোমার মতো ভালমানুষ ভিজেবেড়াল—ভাজা-মাছটি উল্‌টে খেতেও জানি নি—এমনি সেজে থাকতে পারি না বলেই তো আমরা মন্দ সকলের কাছে। তুমি কি কম কুচক্কুরে? তোমাকে আমি দস্তুরমতো চিনে নিয়েছি। মেয়েটার বে থেকে শয়তানি খেলছ আমার সঙ্গে। তোমাদের ও রাবণের ঝাড় গিয়ে দাঁড়ালে ওদের সাধ্যি কি ছিল ঐ ঘাটের মড়ার সঙ্গে বে দেয়! তা তো নয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিলে! বেশ জব্দ হচ্ছে, হোক!... কেন, তোমাদের কী এত শত্তুরতা করেছিলুম আমি, কী এমন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলুম? নাকি বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিলুম তোমাদের!—যে বার বার আমারই সব্বনাশ করতে চাইছ! এত দেখেও আশ মেটে নি, পাছে আমি একটু আশ্রয় পাই, পাচ্ছে অবীরে মেয়েটার একটু হিল্লে হয়—তাই এই কুন্‌কে শত্তুরদের এনে ঢুকিয়েছ কোটনা-গিরি করে!... ভাল হবে না, ভাল হবে না—এই বলে দিলুম। আমার সব্বনাশ করে মজা দেখবে ভেবেছিলে, নিজের সব্বনাশ তো তার আগে দেখতে হ'ল! এখনও চন্দ-সূর্যি উঠছে ভেবে রেখো, পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়! বলি, এতটি তো ডুবল! বড়লোক হবে ভেবেছিলে, সব তো গব্‌ভস্রাবে দিয়ে বসে রইলে! ওতেও হবে না, আরও বাকি আছে বলে দিচ্ছি! আমার মতো হাত হয়ে আমার মতো কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে রাস্তায় রাস্তায়!'

'ষাট! ষাট! ওমা এ কী সর্বনেশে কাণ্ড গো! কী হবে মা, হে মা সিদ্ধেশ্বরী রক্ষে করো মা! হে বাবা কুণ্ডুদের ঠাকুর, মা রাজাদের অন্নপূর্ণো—বাচ্ছাদের বাঁচিয়ে রাখো মা। হাতের নোয়াটুকু বজায় রাখো মা। বৌটাকে দিয়ে নিত্‌সিঁদুরের বরতো নেওয়াবো মা। রাম রাম। বাবা, ঝকমারী হয়েছিল আমার এখানে আসা—'

বলতে বলতেই পা পা করে পিছিয়ে বেরিয়ে যায় মহাশ্বেতা। তার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, তবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়তেই শুরু করে বলতে গেলে—একেবারে সিদ্ধেশ্বরীতলায় গিয়ে প্রথম দম নেয়।

BanglaBook.org

সেখানে অনেকবার নিজের নাক-কান মলে, মন্দিরের রকে নাক-খত দিয়ে কেঁদে পূজো মানসিক করে তবে খানিকটা সুস্থ হয় সে। বাড়ি যেতে যেতে বহুবার আপন মনে প্রতিজ্ঞা করে নেয়, 'বাবা, এই নাক কান মলা, খেঁদি থাকতে আর যদি কোন দিন ওবাড়িমুখো হই! এবার গেলে আমায় নাম বদলে রাখে যেন সকলে!'

॥ ৪ ॥

অবশেষে রানী নিজেই ঘর খুঁজতে বেরোয়। মাত্র কিছুদিন আগেই হেমের চিঠি পেয়েছে সে; হেম খুশি হয়ে লিখেছে, 'তুমি এসে আমাদের বাড়িতে আছ, এ যেন ভাবতেই পারছি না! মনে হচ্ছে এতদিনে আমাদের বাড়ি কেনা সার্থক হ'ল।' বড়মাসিমার অনেক খেয়েছি অনেক নিয়েছি আমরা,—অসময়ে যে এইটুকুও কাজে আসতে পারলুম—এইটেই ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। তোমাদের চিঠি পেয়ে পর্যন্ত ছটফট করছি, এক-বার সকলে মিলে থাকব কটা দিন—তা কিছুতেই ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না। বহু লোক এ সময়ে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে, আর কাউকে ছুটি দিতে চাইছে না শালারা।'.... আরও অনেক কথা লিখেছে। চিঠি পড়তে পড়তে রানীর মনটা চলে গিয়েছিল সেই সুদূর অতীতে, তার প্রথম বিবাহিত জীবনে, মুগ্ধ ভক্ত যখন নিঃশব্দে নীরব দুটি চোখে প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে থাকত শুধু, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রেম?.... না, প্রেম নয় তা রানী জানে। শুধুই মুগ্ধতা, শুধুই তন্ময়তা। সেইটেই আরও ভাল লেগেছিল সেদিন। আজ শরীর ভেঙে আসছে যখন—আরও বেশি করে যেন মনে পড়ছে হেমের কথাটাই। অমনি একটি চিরন্তন ভক্ত দরকার এখন—যার ওপর ভরসা করা যায়, যে স্বার্থের বা প্রয়োজনের খাতিরে ভালবাসে নি, ভাল লেগেছিল বলেই ভালবেসেছিল।

হেমের বাড়ি, তাদের আশ্রয়ে থাকতে পারলে বোধ হয় ভালই হ'ত। রানীদের যা অবস্থা, তাতে পাঁচ-সাতটা টাকা ভাড়া বাঁচলেও যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু তা হ'ল না, হওয়া সম্ভব নয়। এখানে থাকলে তার ছেলেমেয়েরা বাঁচবে না। ঐন্দ্রিলার যা বিষ তাদের সম্বন্ধে—ও সব করতে পারে! বিদ্বেষে আর ঈর্ষায় যেন পাগল হয়ে গেছে। মাসী কিছু বলছেন না, ভালই করছেন—যদি একটা কথাও বলেন তাদের দিক টেনে, কি ওকে বকাবকি করেন, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা তোলেন—তাহলে নির্ঘাৎ ও বিষ দেবে রানীর বাচ্ছাদের।

বাপ রে! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।....

গোবিন্দকে দিয়ে কিছুই হবে না। অনেক বলেছে রানী, কান্নাকাটিও করেছে কিন্তু কিছু ফল হয় নি। গা-ঝেড়ে উঠে কষ্ট করে বাড়ি খোঁজা—তার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। এর মধ্যে দুটো রবিবার রানী ওকে ঠেলে বিকেলে বাইরে পাঠিয়েছিল, ঘোষালদের বাড়ি আর চৌধুরীদের বাড়ি বসে আড্ডা দিয়ে ফিরে এসেছে, বলেছে, ওদের সব বলে রেখেছি, তেমন সুবিধে-মতো পেলেই খবর দেবে।' সুতরাং ওর ভরসায় থাকা বৃথা। ও বাড়ির বড় ঠাকুরজামাই ওদের চিরকালের ভরসা, আগে হ'লে মুখের কথা খসালেই হ'ত, এতদিনে বাড়ি খুঁজে ওদের বসিয়ে দিয়ে আসতেন সেখানে—কিন্তু ইদানীং বড্ড ভেঙে পড়েছেন যেন—তাঁকে ফরমাশ করতেই মায়া হয়।

না, রানীকেই এ ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে ক[illegible]ও সুবিধা, এ কলকাতা শহর নয় যে, পাড়া-ঘরে বেরোলে নিন্দে হবে। সেখানে পথ-ঘাটও চেনা যায় না, হকচকিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া আলাপই বা কার সঙ্গে ছিল তাদের? এখানে—সকল বাড়ি বয়ে সেধে এসে আলাপ করে যায়। আলাপ করে গেছেনও অনেকে—চটখণ্ডী-গিন্নী, মল্লিক-গিন্নী, জীবন

BanglaBook.org

চাটুয্যের মা, অনেকেই দুবার-তিনবার এসে গেছেন এর মধ্যে। এখন তাঁদের বাড়ি একবার বেড়াতে যেতে কোন বাধা নেই, বরং যাওয়াই উচিত।

সে একদিন দুই মেয়েকে শাশুড়ীর হেপাজতে রেখে ছেলে কোলে করে বেরিয়ে পড়ল। কমলা খুবই বিস্মিত হলেন—এ রকম দুঃসাহস তাঁর ধারণারও অতীত—কিন্তু বাধাও দিলেন না। শ্যামাও আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন—সঙ্গে সঙ্গেই এ বেড়াতে যাওয়ার আসল কারণটা অনুমান করে নিলেন তিনি, মনও খারাপ হয়ে গেল খুব—কিন্তু তবু লজ্জায় কোন প্রশ্ন করতে পারলেন না। অথচ এ যা হাড়াই-ডোমাই কাণ্ড নিত্য চলেছে বাড়িতে—তার পর যদি ওরা অন্যত্র উঠে যাবার কথা ভাবে তো ওঁদের দোষ দেন কী করে? অনেক ভেবেছেন শ্যামা, কদিন ধরেই ভাবছেন, অথচ এই কাণ্ড বন্ধ করারও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। একমাত্র ভরসা সেই আশার আলোটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন তিনি—টাকার অভাব হ'লে ওকে চাকরি খুঁজতেই হবে। এবং চাকরি পেলে চলে যেতেও হবে। মেয়েকে টাকা না পাঠালে চলবে না অন্তত ঐন্দ্রিলা না পাঠিয়ে থাকতে পারবে না। চাকরি ছাড়া সেই নগদ টাকা পাওয়ার অন্য পথও কিছু নেই। এই একটি মাত্র সুযোগ ওর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার যাতে কোনমতে না ফসকে যায়, সেজন্যে শ্যামার হুঁশিয়ারিরও শেষ নেই। আজকাল কোমরে একটা ঘুন্‌সী করেছেন। সিন্দুকের চাবি সেখানেই বেঁধে রাখেন দিন-রাত। ও যা মেয়ে, চুরি করার চেষ্টাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয় ওর পক্ষে।

রানী প্রথম দিন বেরিয়েই বাড়ির সন্ধান করল একটা। ভাড়া একটু বেশি, দশ টাকা চাইছে—তবে ছোট হ'লেও প্রায় নতুন বাড়ি। এখান থেকে কাছেও বটে, এই দক্ষিণ পাড়ায়। কিন্তু তার চেয়েও একটা ভাল সন্ধান দিলেন চটখণ্ডীগিন্নী, ঐ দক্ষিণপাড়াতেই একটা ছোট্ট বাড়ি বিক্রি আছে। গোটা দুই ঘর, একটা চালা রান্নাঘর, জমি অবশ্য খুবই কম, চার-পাঁচ কাঠার বেশি হবে না, কিন্তু একটা পুকুরের একটু অংশ আছে ঐ সঙ্গে, আয় তার যেমনই হোক। বছরে একবার মাছ তুললেও খাজনাটা চলে যাবে—ওদের একটা কাঁচা ঘাট আছে ওদের দিকে, সেইটেই বড় লাভ। পুকুরসরা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। দাম কম, হাজার টাকা চাইছে, হয়ত তাড়াতাড়ি বায়না করলে আট-নশ'তেও হয়ে যেতে পারে। কারণ ওপক্ষে একটু গরজ আছে। বাড়িটা অবশ্য নতুন নয়—তবে একেবারে ভাঙা-ঝরঝরেও নয়, এখন একটু চুনকাম করিয়ে নিয়েই বসবাস করতে পারবে ওরা, বছর দু-তিনের মধ্যে হাত না দিলেও চলবে।

রানী আশা-নিরাশায় কণ্টকিত হয়ে ফিরল সংবাদটা নিয়ে। এত সস্তায় বাড়ি, এ তাদের কল্পনাতীত। এও যদি না হয় তাহ'লে এ কাঠামোতে আর হবে না। কিন্তু এই টাকাটাও কি তোলা যাবে? হাতে তো ওদের কিছুই নেই, তবু এ প্রলোভন ছাড়তেও যেন ইচ্ছে করে না। মনে হয় এ দৈবের যোগাযোগ, নইলে আজই বেরিয়ে এ খবরটা পাবে কেন?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কথাটা তুলল। কমলাও ছিলেন। সব শুনে গোবিন্দ হতাশাব্যঞ্জকভাবেই ঘাড় নাড়ল, 'নাঃ, ও আর ভেবে লাভ নেই, অত টাকা কোথায় পাব? কে দেবে?'

ব্যাকুল হয়ে ওঠে রানী, 'ওগো অত সহজে হাল ছেড়ো না। তুমি যেন একেবারেই এলিয়ে দিয়ে আছ। এই তো অবস্থা—একটা মাথাগোঁজার জায়গা থাকলেও তবু বল-ভরসা থাকে খানিকটা। হঠাৎ যদি তোমার চাকরি যায়—কি কোন বিপদ-আপদই হয়, মাসকাবারে বাড়ি ভাড়া টানতে না পারলে তো মাল-পত্তর ক্রোক করে রাস্তায় বার করে দেবে, সেটা ভেবে দেখেছ? এ তবু বুঝলুম, খাই না খাই বুকে হাত দিয়ে পড়ে রইলুম, কেউ বলবার নেই।... একটু ভাবো!'

BanglaBook.org

'কী ভাবব বল', গোবিন্দ একটু ঝেঁঝেই ওঠে, 'আমার হাতে পাই-পয়সাও নেই—পোস্টাপিসের একটা খাতায় বোধ হয় একটা টাকা পড়ে ছিল, সে কী হয়েছে তাও জানি না। ধারও কেউ দেবে না। এখন তোমরা পারো, হাতে কিছু থাকে ভাবো, ভেবে দ্যাখো ভাল করে!'

কোনপ্রকার অপ্রীতির সূত্রপাত দেখলেই কমলা সিঁটিয়ে ওঠেন তিনি একটু ভয়ে ভয়েই বললেন, 'তা হ্যাঁরে, আমার সেই টাকাটা—তার কি কোন গতি হবে না?'

এই টাকাটার ইতিহাস আছে। বিধবা হবার পর প্রায় ষোলশ' টাকার মতো—সব গহনা ও জিনিসপত্র বেচে—কমলা গোবিন্দর মনিবের কাছেই রাখেন, টাকাটা খাটিয়ে মাসে মাসে সুদ হিসেবে তিনি যে টাকাটা দিতেন তাইতেই সংসার চালাতেন কমলা। অবশ্য তখনও তিনি মনিব হন নি, গোবিন্দর বন্ধুর বাবা, এই হিসেবেই জমা দিয়েছিলেন। তারপর গোবিন্দ চাকরিতে ঢোকার পর বিয়ে-থা ব্যাপারে কিছু কিছু আসলও নিয়েছে—কিন্তু কতটা কি নিয়েছে তার কোন ভাল হিসেব বোধ করি কোন পক্ষেই নেই। সে সুদও বন্ধ হয়ে গেছে দীর্ঘকাল। সুদে মাইনেয় মিশে সবটাই তালগোল পাকিয়ে গেছে।

গোবিন্দ মুখ কালি করে অন্যদিকে ফিরে জবাব দেয়, 'সে রকম তো কোন লেখা-পড়া করে রাখো নি, একটা হাতচিটে কি খত—ওরা বলে সব শেষ হয়ে গেছে। অথচ আমার যা হিসেব মনে পড়ে—যত দফায় যা নিয়েছি, তাতে এখনও পাঁচশ'র ওপর পাওনা। সুদের কথা তো বাদই দাও, সুদ তো বলতে গেলে আমার মাইনে বন্দোবস্ত হবার পর থেকেই আর দেয় নি। আমি নিজে একদিন কর্তাকে বলেছিলুম, তিনি বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে কিছু পাওনা নেই, তবু একবার মনে করে দেখব। আর সুদ বাপু, সত্যি কথা বলতে কি, সুদ ধরেই তোমার মাইনে বন্দোবস্ত করেছিলুম, নইলে কি তোমার অত টাকা মাইনে হয় তখন!... এরপর আর কি বলব বলো!'

'ওমা, তা বলবি নি—অতগুলো টাকা জলে যাবে?'

'জলে তো গেছেই, লেখা নেই পড়া নেই—কী নিয়ে লড়ব!'

চুপ করে থাকে সকলেই। একটা হিম হতাশা অনুভব করে রানী, বুকের মধ্যেটায় যেন কেমন ব্যথা করতে থাকে তার। আশাভঙ্গে এমন দৈহিক কষ্ট হয় তা এর আগে সে কোন দিন অনুভব করে নি।

খানিকটা পরে বলে, 'আচ্ছা, আমার এই গহনাগুলো বেচলে কত হবে? সবই যদি খুলে দিই—হাতের পেটিজোড়াটা রেখে?'

'ছাই হবে? কীই বা আছে। কত কাল ভাঙ্গা হয় নি, সবই তো ক্ষয়ে ঝিঁঝির- পাত হয়ে গেছে। সব গলালেও দশ ভরি হবে কিনা সন্দেহ!'

'তা দশ ভরির দাম কত? সেদিনও তো নিতাই সেকরা এসেছিল মার সঙ্গে দেখা করতে—বলে গেল বাইশ টাকা ভরি।'

'হ্যাঁ—বাইশ টাকা কিনতে। বেচতে গেলে আঠারো টাকার বেশি কেউ দেবে না।'

আবারও সেই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

কমলা, কতকটা ভয়ে ভয়েই বলেন শেষ পর্যন্ত, 'তা ওদের কাছে ধার বলে চাইলেও কি কিছু দেবে না? হিসেবটার কথা তোল্ না আর একবার। এধারে তো মাইনে দিলে কমিয়ে—অথচ মুখের রক্ত তুলিয়ে ছাড়ছে! তোরই কি এত গরজ, তুই গেলে তোর মতো অত বিশ্বাসী লোক ঐ মাইনেয় পাবে ওরা?'

BanglaBook.org

'দেখি। একবার বলব না হয়।' কতটা মুখ গোঁজ করে উত্তর দেয় গোবিন্দ।

পরের দিন দুপুরে রানী বলে, 'মা, ওঁর দ্বারা ওসব বলাবলি হবে না। মানুষ চিনি তো। একের নম্বরের মুখচোরা। আপনি একবার কর্তার কাছে যান!'

'ওমা, আমি যাব কি সেখানে।' চমকে যেন ভয় পেয়ে ওঠেন কমলা।

'তাতে দোষ কি। এখন আপনিই তো প্রায় বুড়ো হয়ে গেছেন—তিনি তো আরও বুড়ো শুনেছি। একদিন তো নিজে গিয়েই টাকা দিয়ে এসেছিলেন। আপনি গিয়ে জোর করে বলবেন যে আমার হিসেবে ছশ' টাকা পাওনা হয়, এত বছরের সুদ সব মিলিয়ে আটশ' টাকা করে দিন! আমি শোধ বলে লিখে দিয়ে যাচ্ছি।... ওঁর দ্বারা এক পয়সাও আদায় হবে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কমলা বলেন, 'সে হয়ত গোবিন্দ রাগ করবে কি—কি করবে। রাজিও হবে না হয়ত—গেলে তো ওকে নিয়েই যেতে হবে—'

'না, তাহলে আপনার যাওয়াই হবে না। আমি ও বাড়ির ঠাকুরজামাইকে গিয়ে বলে আসব। তিনিই নিয়ে যাবেন। আর দেরি করবেন না মা—আপনার পায়ে পড়ি। এখন ভাড়াবাড়িতে উঠে গিয়ে দশ টাকা করে ভাড়া গুণলে—আর এমন টাকা জমাতেও পারবেন না যে, কোনদিন মাথা গোঁজার মতো একটু কিছু করবেন।'

'কিন্তু—', কেমন এক রকম ভিত অসহায়ভাবে পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে কমলা বলেন, 'তাতে কোন দোষ হবে না তো?'

'দোষ হওয়া-হওয়ির কি আছে। আপনার হক্কের পাওনা আপনি চাইতে যাচ্ছেন। দেওয়া না-দেওয়া তাঁদের ভদ্রতা। তা বলে আপনি কি ছোট হচ্ছেন? ও কারুর কথা শুনবেন না। উনি হয়ত রাগ করবেন কিন্তু টাকাটা—যদি দুশোটা টাকাও উদ্ধার হয়—সেও ওঁরই উপকার। আপনি রাজি হোন মা। দোহাই আপনার।'

অগত্যা কমলাকে রাজি হতে হয়। কোনদিনই কারুর কোন অনুরোধ-উপরোধ ঠেলতে পারেন না তিনি। আর এ তো নিজের ছেলের বৌ। ঘরণী গৃহিণী বলে নয়—বৌয়ের বুদ্ধি দূরদৃষ্টি এবং বিচার-বিবেচনার বহু পরিচয় বহুবারই পেয়েছেন তিনি। ও যা বলে ভালর জন্যেই বলে, আর তাতে ভালই হয়—এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

রানী সত্যিই একদিন খুঁজে খুঁজে মৌড়ী চলে গেল। বিকেলের দিকে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেল, সন্ধ্যের মধ্যে ন্যাড়ার সঙ্গে ফিরে এল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনই গোবিন্দর রাত হয়েছিল ফিরতে—এ ব্যাপরটা সে টেরও পেল না।

সব শুনে অভয়পদ রাজি হয়েছে কমলাকে নিয়ে যেতে। বহু ছুটি তার পচে যায়, একদিন ছুটি নিয়েই সে যেতে পারবে, কোন অসুবিধা হবে না। রানী ফিরল প্রায় লাফাতে লাফাতে। অভয়পদ অফিস কামাই করে এ কাজ করবে তা কেউ আশা করে নি।

পরের দিনই কমলা গেলেন। একে তো অত বড় জামাইয়ের সঙ্গে যাওয়া—তায় অপরিচিত বাড়িতে, অপরিচিত একটা লোকের কাছে। গোবিন্দর মুখেই শুনেছেন যে বুড়ো কর্তা আজকাল অফিসে বড় একটা আসতে পারেন না। বাড়িতেই বসে হিসেব-নিকেশ দেখেন। অফিস হলেও না হয় কথা ছিল, বাড়িতে যদি মেয়েরা বেরিয়ে আসে, তারা যদি বলে, কি দরকার, কেন, কী বৃত্তান্ত? কি জবাব দেবেন তিনি। যাবার সময়-বরাবর ভয়ে যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি, একবার বলেই ফেললেন, তুমিও না হয় চলো বৌমা, আমি—আমি যদি না সব গুছিয়ে বলতে পারি?'

BanglaBook.org

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন তা সম্ভব নয়। রানীও সেই কথা বলল। সেটা ভাল দেখায় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের দেখবে কে। অভয়পদর আসবার কথা—একেবারে কিছু না-বলা ভাল দেখায় না বলে—গত রাত্রে শ্যামাকেও একটু আভাস দিয়েছে রানী, তাতে শ্যামা আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন। তাঁকে ছেলেমেয়ে দেখতে বলার সাহস আর ওর নেই।

অবশ্য কমলা যতটা ভেবেছিলেন ততটা কিছু হ'ল না। কমলাকে এতকাল পরে নিজে আসতে দেখে বুড়ো কর্তা একটু অপ্রস্তুতই হয়ে পড়লেন। আর সেই অবস্থাতেই কিছু পাওনা আছে, সেটা একবার স্বীকার করে ফেললেন। তারপর অবশ্য কতকটা সামলে নিলেও বলা কথা ফেরাতে পারলেন না—সুদ আর আসল হিসেবে মোট তিনশ টাকা তিনি দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তবে কমলাকে লিখে দিতে হবে যে আর কোন দাবি-দাওয়া তাঁর থাকবে না।

রানী আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল, এরপর কমলা আর দুশটি টাকা ধার দেবার কথা তুললেন। গোবিন্দ লেখাপড়া করে দেবে—সুদ তারা দিতে পারবেন না, তবে মাসে মাসে গোবিন্দর মাইনে থেকে দশ টাকা করে কাটিয়ে দেবে। কী ভেবে তাতেও রাজি হয়ে গেছেন কর্তা, কথা রইল যেদিন দরকার তার আগের দিন খবর দিলে টাকাটা তিনি পুরোপুরি গোবিন্দর হাতে দিয়ে দেবেন।

গোবিন্দ প্রথমটা শুনে বিশ্বাস করতে পারে নি। তার মার এত সাহস হবে এবং বুড়ো কর্তাও এত সহজে টাকা দিতে রাজি হবে—এর কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু যখন বুঝল কথাটা সত্যি তখন সেও একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। রানীর সব গহনা খুলে দিল সে, সোনা-বাঁধানো এক জোড়া পাতলা পেটি ছাড়া, এটি তার মার চিহ্ন বলেই শুধু খুলল না; নইলে তাও দিত হয়ত। সব গহনা গালিয়ে দেখা গেল, গোবিন্দর অনুমানের চেয়ে কিছু বেশিই ছিল ওজনে, সব সুদ্ধ তিনশ টাকার মতোই পাওয়া গেল।

রানী ইতিমধ্যেই চটখণ্ডীদের গিন্নীকে নিয়ে সে বাড়ির মালিকের কাছে গিয়েছিল। অনেক টানা-হেঁচড়া অনেক দরদস্তুরের পর আটশ' টাকাতেই রাজি হয়েছেন তিনি। একরকম অসাধ্যসাধনই বলতে হবে—চটখণ্ডী-গিন্নীর বাক-চাতুর্য এবং রানীর মিষ্টি হাসি ও অনুনয়-বিনয়েই এটা সম্ভব হল। তবে তিনি একটি শর্ত করলেন, দুদিন পরেই ভাল দিন আছে, সেইদিন অন্তত দুশ'টি টাকা দিয়ে বায়না করতে হবে। তবেই ও দামে ছাড়বেন তিনি। রানি তাতেই রাজি হয়ে এল। কর্তাকে বলে টাকা আনতে দেরি হবে, গহনা বেচার টাকা থেকেই সে বায়নার টাকা দিয়ে এল। বায়না লেখাপড়া করিয়ে দিলেন মল্লিক-গিন্নীর মেজ ছেলে। গিন্নী নিজেই বললেন, 'তুমি ভেবো না বৌমা, ও আমার উকিল নয় বটে তবে তাবড়-তাবড় উকিলের নাক কাটতে পারে। ওকেই বলেছি, সার্চ করিয়ে রেজেস্ট্রারি করিয়ে সব ঠিক করে দেবে। বলি মল্লিকদের এতবড় সম্পত্তিটা ওই বজায় রেখেছো তো গা। আইন-কানুন সব ওর হাতের তেলোয়!'

অবশ্য মল্লিক-গিন্নীই বাড়িটা সম্বন্ধে একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন প্রথমটায়। ও বাড়ি নাকি তাঁর দেখতাই এই তিনবার হাতবদল হ'ল। যে যে নিয়েছে কারুরই ভাল হয় নি। এর আগের লোকটি বাড়ি কেনার সঙ্গেসঙ্গে বৌ একটা ছেলে মরেছিল। তারপরেও অবিশ্যি তিন-চার বছর ছিলেন তিনি কিন্তু কাজ-কারবারে কী গোলমাল হয়ে শেষে বেচে যেতে বাধ্য হলেন। অথচ এখন নাকি তাঁর আবার খুব বোলবোলাও হয়েছে। বিয়েও করেছেন আর একটা। এ লোকটার অনেক বিষয় ছিল, রেস খেলে সব উড়িয়েছে। এইটি ছিল, তাও তো গেল।...ও বাড়ি নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে তাদের?

BanglaBook.org

রানী উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা, 'জুয়াড়ি রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়েছে, এটাও নষ্ট করবে, এ তো জানা কথা মাসীমা, তার জন্যে বাড়ির দোষ কি! আর বৌ মরা—', একটু মুচ্‌কি হেসে বলেছে, 'সে তো ভাল কথাই, আপনারা দাঁড়িয়ে আর একটা বিয়ে দিয়ে দেবেন। ভাগ্যবানের বৌ মরে মাসীমা, তার জন্যে আপসোস কি? তবু মাথাগোঁজার জায়গাটা তো হয়ে রইল!'

'ষাট! ষাট! ও কথা বলো না মা, বৌ মলে ঘাটের মড়ারও বে হয় জানি—কিন্তু তোমার মতো বৌ আর পাবে কি আমাদের ছেলে!'

আট শ' টাকা বাড়ির দাম, আট শ' টাকার মতো অবশ্য সংস্থান হয়েছে। কিন্তু আরও কিছু চাই। সার্চ করার খরচা আছে, রেজেস্ট্রি আছে, বাড়ি চুনকামের খরচা আছে। খুব কম করেও অন্তত আর একশটি টাকা প্রয়োজন। এটা আসবে কোথা থেকে?—গোবিন্দ প্রশ্ন করল। শেষে কি ঘটিবাটি বেচতে হবে? তাতেও এত টাকা উঠবে কিনা সন্দেহ। বাসন বেচতে গেলে সিকির সিকি দামও মেলে না।

রানী অবশ্য আগেই জানে। টাকা তো আরও লাগবেই ঢের। কথাটা নিয়ে অনেক ভেবেওছে সে। একটা জোর তার ছিলই মনে মনে—সেই জোরেই এতদূর এগিয়েছে। কিন্তু কাউকেই বলে নি সেটা, নিজের অন্তরের নিভৃততম কোণে সেই আশ্বাসটিকে লালন করছিল সযত্নে। হেম—হেমকে সে লিখলে নিশ্চয়ই টাকাটা দেবে সে—এটা রানী জানত। কিন্তু অতটা জানত বলেই বোধ হয় শেষ মুহূর্তে কেমন একটু সঙ্কোচে বাধল। ওটা তো আছেই—কিন্তু অন্যত্র চেষ্টা শেষ করার আগে ওদিকে সে হাত বাড়াবে না।

এবার রানী বলতে গেলে চরমতম দুঃসাহসেরই পরিচয় দিলে। শ্যামাকে গিয়েই ধরলে সোজাসুজি, বাড়ি কেনার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে জানিয়ে একশটি টাকা ধার চাইলে। একেবারে গোড়াতেই বলে দিলে, 'শুধু হাতে ধার নিচ্ছি মাসীমা, আপনি বরং দেড় টাকা করেই সুদ নেবেন।'

প্রথমটা শ্যামা মনে মনে বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। ওরা বাড়ি করে চলে যাওয়া মানে তাঁর আবার সেই দুরবস্থা। ঐন্দ্রিলার কবলে গিয়ে পড়া। তখন হয়ত সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে তাকে আটকাতে হবে। নিজের অনিষ্ট যাতে হবে তার খরচ তিনি কেন যোগাবেন শুধু শুধু? থাক না—যেখানে পারে নিক না! তিনি কেন নিজের ক্ষতির পথ নিজে প্রশস্ত করে নেবেন?

কিন্তু তারপরই বুঝলেন—এ মেয়ে সহজ নয়। যখন এত কাণ্ড করে বাড়ি এবং বাড়ি কেনার টাকা যোগাড় করতে পেরেছে তখন একশ'টা টাকার জন্যে কিছু ওর সব আটকে থাকবে না। যেমন করেই হোক যোগাড় করে নেবে। মাঝখান থেকে তিনি কেন অপ্রিয় হন—? আর সুদটাও খুব কম দিতে চাইছে না। কী লাভ অস্‌সরস ক'রে—মনকে বোঝান নিজেই।...

চুপ করে আছেন শ্যামা, মনে মনে তোলাপাড়াই করছেন। রানী সেটাকে ভুল বুঝল। সে একেবারে ওঁর একটা পা চেপে ধরল, 'দোহাই মাসীমা, ইনিও আপনার সন্তান, আপনিও এককালে পরের দোরে কম দুঃখ পান নি, আপনি বুঝবেন। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করা—যদি একটু মাথা গোঁজার জায়গা হয় আপনার দয়ায় তো আপনার একটা সৎ কাজই হয়ে থাকবে।'

'ওমা ছি ছি, এর জন্যে পায়ে হাত কেন মা!' একটু যেন অপ্রতিভই হয়ে পড়েন শ্যামা, 'ধার দিচ্ছি, সবাইকেই দিই—তোমাদের কেন দোব না?... তা নয়, তবে আমার

BanglaBook.org

তো নিজের কিছু নেই মা তা তো জানই, যা নাড়াচাড়া করি—দুই মেয়ের টাকা। গোবিন্দকে ব'লো একটা হ্যাণ্ড নোট যেন দেয়—আর বাড়ি রেজেস্টারি হয়ে গেলে পাঠাখানা যেন আমার কাছেই রেখে দেয়, যতদিন না টাকাটা শোধ হয়।'

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল রানী। শেষ অবধি যে হেমের কাছে হাত পাততে হ'ল না—এইটেই পরম লাভ মনে হচ্ছে। যে ভালবাসে সত্যি-সত্যিই, তার কাছে হাত পেতে টাকা নেওয়া? ছিঃ, সে বড় অপমান।

প্রথমটা ঐন্দ্রিলা অতটা বুঝতে পারে নি। কি একটা ব্যাপার চলছে এই পর্যন্ত। তারপরই, যখন জানল যে ওরা বাড়ি কিনছে—দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গেছে তখন থেকেই আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। সে ঝগড়াঝাঁটি গালাগালি—কিছুই রইল না আর, যেন সে মানুষই নয়। শেষের দিকে—বাড়ি সার্চ করা, রেজেস্ট্রি করানো, মেরামত ইত্যাদিতে প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময় লেগে গেল ওদের—ঐন্দ্রিলা আবার গায়ে পড়েই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু, করে দিল—এমন কি নিজে সেধে ওদের অর্ধেক কাজ ক'রে দিতে লাগল। গৃহপ্রবেশের দিন নিজেই ভোরবেলা উঠে গিয়ে পূজোর যোগাড় ক'রে দেওয়া, রান্না করা, ওদের খাওয়ানো—সব কাজ একা হাতেই করল একরকম।

ওর এই পরিবর্তনের কারণটা স্থূল—বুঝতে না পারার কথা নয়—এরাও বুঝল—শ্যামাও বুঝলেন। চলেই যখন যাচ্ছে—যখন তার জেদই বজায় রইল, তখন আর শত্রুতা কি? এবার তো মার আর গতি রইল না তাকে ছাড়া। তাকেই ধরে রাখতে হবে—হয়ত সীতার জন্যে কিছু টাকা দিয়েও।

কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে যে শ্যামার তখনও কিছু চিনতে বাকি ছিল—সেটা বুঝলেন তিনি রানীদের গৃহ প্রবেশের কদিন—সাতদিন না আটদিন পরে। যেভাবে সে এসেছিল সেইভাবেই হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তার নিজস্ব পোঁটলাটি বগলে ক'রে বাইরের রকে যেখানে শ্যামা বসে পাতা চাঁচছিলেন সেইখানে এসে বলল, 'তাহলে চললুম। সুখে থাকো। আপদবালাই ঝগড়াটি অলক্ষ্মী বিদেয় হয়ে যাচ্ছি। ভগবানকে বলো আর যেন এমুখো না হতে হয়।... কাছেই রইলুম অবিশ্যি, এই হাওড়ায় বাজে-শিবপুরে চৌধুরী-গিন্নীর ভাগ্নীজামাইয়ের বাড়ি। ঠিকানার দরকার হয় তো ওখানেই পেতে পারবে।'

এই বলে, স্তম্ভিত শ্যামা ব্যাপারটা কি ঘটছে তা ভাল করে বোঝবার আগেই, দূর থেকে রকে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম ক'রে ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

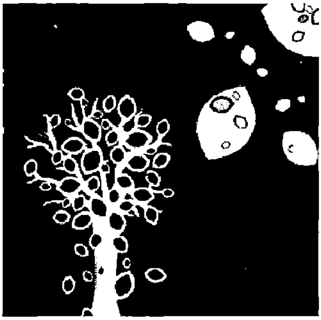

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার খবর কমলারা পেলেন আরও চার-পাঁচ দিন পরে। এই কদিন ঘর-সংসার গুছিয়ে নিতেই কোথা দিয়ে সময় চলে গেছে তা যেন টের পান নি ওঁরা। কমলারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি, তাঁর স্তিমিত জীবনে যেন নব উদ্যমের আর আশার জোয়ার লেগেছে—একা তিনজনের খাটুনি খাটছেন। শরীরটা কলকাতা থেকে আসবার পর আরও খারাপ হয়েছে—আজকাল পেটটা আদৌ ভাল থাকছে না—জ্বরও হচ্ছে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই, তবু খেটে যাচ্ছেন ভূতের মতো। এতদিন পরে, এই জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যে অন্তত নিজেদের বাড়ি বলে একটা জায়গা পেয়েছেন—সেখানে এসে পড়তে পেরেছেন এতে তাঁর তৃপ্তির শেষ নেই যেন। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন বৌকে। বলেন, 'তবু যে শেষ নিঃশ্বেসটুকু ফেলবার মতো একটা জায়গা হ'ল বৌমা—এতেই শান্তি। উনি বলতেন না, ভাড়াটে বাড়িতে থেকে নিশ্চিন্তে খাবি খাবারও জো নেই, তখনও হয়ত দেখ গে বাড়িওলা এসে ভাড়ার তাগাদা দিচ্ছে।.... তারপর যদি বোঝে যে বাড়ির কর্তা গেল, রোজগেরে কেউ নেই—তাহলে আর চোখের জল ফেলবারও সময় দেবে না, অশৌচের মধ্যেই বাড়ি ছাড়বার নোটিশ এসে যাবে!... ঝ্যাটা মারো, বহু জন্মের পাপ থাকলে তবে লোকে পরের দোর ঝাঁট দেয়!'

অভিজ্ঞতাটা এদের সকলের কাছেই অভিনব। হোক ছোট বাড়ি, মোট দুখানা ঘর, তবু নিজের। সামান্যই জমি—তবু এরই মধ্যে রানী রাজ্যের গাছ এনে পুঁতেছে। সব চাই তার—কলা, পেয়ারা, আম, কাঁঠাল, বাতাবি-লেবু—নারকেল সুপুরি ছিলই দুটো দুটো, তাও আবার এনে পুঁতেছে—এদিকে তো ফুলের গাছ যেখানে যত মনে পড়েছে আর পাড়াঘর ঘুরে যত যোগাড় করতে পেরেছে। মল্লিকগিন্নী তো দেখে হেসেই খুন, 'অ আবাগের বেটি, এ করেছিস কি! এত ঘন ঘন বসালে গাছ-গাছালি থাকে কখনও? একটু বড় হ'লেই তো আওতায় আওতায় নষ্ট হয়ে যাবে। এতগুলো গাছ বাঁচাতে হ'লে অন্তত দু বিঘের বাগান চাই। একটা আম গাছ কাঁঠাল গাছ কতটা জায়গা নেয় দেখছিস না?'

সবই দেখেছে রানী, জানেও সব—কারণ তারও পাড়াগাঁয়েই বাপের বাড়ি, তবু আশ মেটে না বলেই তথ্যের দিকে, অভিজ্ঞতার দিকে চোখ বুজে থাকে। মনে হয় হয়ত সবগুলোই লেগে যাবে। এসব গাছ তো চাই-ই, নিজেদের বাড়িতে আম জাম কাঁঠাল গাছ একটা ক'রে না থাকলে চলে!....

এমনি স্বপ্নের মধ্য দিয়েই দিন এবং রাত কাটছিল—তবু তার মধ্যেই একদিন মনে পড়ল, ও বাড়ি থেকে সেই মালপত্র নিয়ে আসার পর থেকে আর একদিনও যাওয়া হয় নি। কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে—অপর কেউ এ ব্যবহার করলে তাঁরাও একে বেইমানি আখ্যাই দিতেন। অবশ্য ওরাও কেউ আসতে পারত। গৃহপ্রবেশের পর একটি দিন মাত্র

BanglaBook.org

ঐন্দ্রিলা এসেছিল, সেও আর আসে না। কমলা বললেন, তুমি একবার যাও মা, দেখে এসো গে। আমার শরীরটা ভাল নেই, কাজও ঢের—আমি বরং মেয়ে দুটোকে সামলাব—তুমি খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো!'

খবরটা অবশ্য যেতে যেতেই পাওয়া গেল মল্লিকগিন্নীর কাছে, তিনিও দক্ষিণ পাড়ায় বেড়াতে আসছিলেন, বললেন, 'ওমা, শোন নি? খেঁদি তো চলে গেছে। এখন তো গিন্নী একা। পাগল মেয়ে আর নাতি নিয়ে সেই হাবুডুবু শুরু হয়েছে!'

'চলে গেছে? সে কি! অত কাণ্ড ক'রে আমাদের তাড়ালে, নিজে পাকাপাকি বসবে বলে—আবার কি হ'ল?'

রানীর যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না কথাটা!

'কিছুই নাকি হয় নি—গিন্নী যা বললেন, একেবারের তলে তলে চাকরি ঠিক করে যাবার সময় বলে গেছে। এই কাছেই নাকি কোথায় আছে হাওড়ায় কোথায়—চৌধুরীগিন্নীর কে কুটুমের বাড়ি। আসলে কি জানো বৌমা, যে লোকগুলো বদ হয় তারা মন্দ করতে চাইলে অনেক সময় ভালো লোকের উপকারই হয়ে যায়। ও অমন ক'রে আদাজল খেয়ে না লাগলে বোধহয় তোমাদের এ বাড়ি কেনার এত চাড় হ'ত না। ও একদিক দিয়ে তোমাদের উপকারই করেছে। বরাতে ছিল বলেই বোধহয় ওর মাথায় ছেমো ছেপেছিল।'

তা বটে। হয়ত সত্যিই তাই। তবু রানী যেন ঐন্দ্রিলার মনের তল খুঁজে পায় না। শ্যামার জন্যে মন খারাপ হয় খুব। আহা বেচারী—অসময়ে ওদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এটা তো ঠিক, অনেকগুলো টাকা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আবার সেই একা একহাতে নাটা-ঝামটা খাওয়া!....

শ্যামা রানীকে দেখে প্রথমটা গম্ভীর হয়েই ছিলেন। ঐন্দ্রিলা চলে যাওয়ার পর আরও যেন বেশি ক'রে রাগটা গিয়ে পড়েছিল এদের ওপর। পড়েছিল কতকটা অবুঝের মতোই। ওঁর মনে হচ্ছিল, 'সেই তো চলে গেল সে, মধ্যে তো বেশ ঠাণ্ডাও হয়ে এসেছিল, এত একেবারে উতলা হবার কী ছিল! আর যাবে না তো কী, যেতে তো তাকে হ'তই—সে তো জানা কথাই! মাঝ-খান থেকে আমারই এখানে ব'সে বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে সব সরে পড়ল!'

তিনি জানেন যে তাদের যাওয়া স্থির না জানলে মেয়ের রাগারাগি কমত না, উনি জানেন যে তার যাওয়ার স্থিরতা সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না—তবু রাগ করেন, জোর ক'রেই যেন সত্যগুলোর দিকে চোখ বুজে থাকেন তিনি।

অবশ্য রাগ বেশিক্ষণ রাখতেও পারেন না। রানী এসে যতটা পারে কাজকর্ম টেনে ক'রে দেয়। তরুকে জোর ক'রে ধরে চুলের জট ছাড়িয়ে চুল বেঁধে দেয়, পুকুরে নিয়ে গিয়ে গা ধুইয়ে আনে, ছেলেটাকেও পরিষ্কার ক'রে দেয়। ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে অনেকখানি সুসার করে দেয় শ্যামার। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বলতে হয়, 'তুমি একটু এবার বসো বৌমা, ছেলেটা ধুলোকাদা ঘাঁটছে, ওকে একটু ধরো।' সেই এসে পর্যন্তই তো খাটছ তোমারও তো শরীর ভাল নয়! আর একদিনে তুমি কতটাই বা আসান করবে মা—ও তো আমার নিত্যকার সমিস্যে। আমার কর্মফল আমাকে ভুগতে হবেই—কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'

রানী অবশেষে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে ওঁর কাছে এসে একটু বসে পা ছড়িয়ে। ঐন্দ্রিলা যাবার আগের দিন ক্ষুদভাজার নাড়ু ক'রে রেখে গিয়েছিল গোটাকতক, এখনও সব ফুরোয় নি, শ্যামা তাই দুটো বার ক'রে ওদের হাতে দিলেন। বাড়িঘরের কথা, বোন-বোনপোর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'আমার তো আর নড়বার পথ রইল না মা, বন্দী একেবারে। রবিবারে কান্তি বাড়ি থাকে বটে, তাও সব রবিবারে নয়, একো-একোদিন

BanglaBook.org

বেরোতেও হয়—আর তাও, না বেরোলেই বা কি, ও বদ্ধ কালা মানুষ, ওর ভরসায় কি পাগলকে রেখে যেতে পারি!.... তোমরাই মধ্যে মধ্যে খবর নিও—মলুম কি বাঁচলুম। এ যা হয়েছে—একটা কারও যদি অসুখ হয়ে পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাক্তারখানায় যেতে পারব না। কত মাসের যে সুদ বাকি পড়েছে চারিদিকে—তাগাদা করবার পথ পর্যন্ত বন্ধ!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে রানী বলে, 'একটা কাজ করবেন মাসীমা, আমার সন্ধানে একটি ভাল মেয়ে আছে, কান্তি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে দেবেন?'

'ওর বিয়ে দেব কি মা, ওর আয় কত যে বিয়ে দেব? ভূতের খাটুনি খেটে—দিন নেই রাত নেই শরীর পাত ক'রে বলতে গেলে—নাকি লাফিয়ে উন্নতি হয়েছে, তাও কিনা যতদিন পরে হবার কথা ছিল তার আগেই হয়েছে—দশ টাকা মাইনে। .... একটা চাকরের মাইনে। ওপরটাইম হ'লে কিছু বেশি পায় তা সেও তো ঐ মাইনের হিসেবেই। দশ টাকা মাইনে আর দু পয়সা জলখাবার। তার এক পয়সা তো খেতেই চলে যায়, বারো চোদ্দ ঘণ্টা পরে বাড়ি আসে, মধ্যে যদি এক পয়সার মুড়িও না খায় তো বাঁচবে কী ক'রে বলো? যা পায় তা থেকে মাসিক টিকিটভাড়া দিয়ে দশ-এগারো টাকার বেশি হাতে দিতে পারে না। এর মধ্যে বৌ এনে খাওয়াবো কি?'

'সে যা হয় হয়েই যাবে মাসীমা,' রানী জেদ করে, 'আপনার ভাত-হাঁড়ির ভাত দুবেলা দুমুঠো খাবে—কেউ টেরও পাবে না। আপনিই তো চালাচ্ছেন, কেউ এসে পড়লে তো দুটো ভাত দিতে কোনদিন আপনাকে কাতর দেখি নি। মনে করবেন যে আপনার সেই মেয়েই এসে আছে। আর আপনি তো বড়লোকের মেয়ে আনবেন না যে রোজ মাছের মুড়ো দিয়ে খেতে দিতে হবে—গরিবের মেয়ে না হ'লে এ পাত্তরে দেবেই বা কেন? আসবে খাটবে খুটবে খাবে। যেমন আপনারা খাচ্ছেন—তেমনিই খাবে।'

তবু শ্যামা মন স্থির করতে পারেন না, বলেন, 'আমার যা বরাত, বৌ এনেই কি সুখ হবে! ঐ তো এক বৌ ছিল, ঘরকন্না সব বুঝেও নিয়েছিল, রইল কি, মুখে লাথি মেরে ভাতারকে নিয়ে সুখভোগ করতে চলে গেল। আজকালকার সব মেয়েই চায় একলা ঘরের গিন্নী হ'তে—মাগটি আর ভাতারটি থাকবে, জোড়ের পায়রার মতো দিনরাত্তির বসে শুধু বক-বকুম করবে, আর কেউ থাকবে না মাথার ওপর আলশোল।'

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর, কনক সম্বন্ধে বিষের পাত্র উপ্‌চে ওঠে যেন গলাতে।

রানী একটু চুপ ক'রে থেকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'সে বৌ গেছে, তার বরের কোমরের জোর ছিল ধরুন—একে আনার তো সেই সুবিধে, আপনার তাঁবে থাকতেই হবে তাকে। ঐ আয় যার সে তো আর ঘর ভাড়া ক'রে গিয়ে আলাদা থাকতে পারবে না।... আপনি ধরুন মেজ-ঠাকুরঝিকে সব খরচ দিয়ে উল্‌টে মেয়ের জন্যে কটা টাকা দিয়েও আনিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, তার চেয়ে একটা বৌ আনলে কি বেশি খরচ হবে বলুন?'

তা বটে। বড় বৌয়ের কথায় যুক্তি আছে—তা মানতেই হয় শ্যামাকে মনে মনে। এইজন্যেই তিনি এত পছন্দ করেন বৌটাকে। রূপেগুণে সমান। তেমনি মিষ্টি স্বভাব। কাজকর্মও যেন হাতে পায়ে লাগে না। আর এই বুদ্ধি। পরিষ্কার কথাবার্তা কয়—সর্বদিকে আটঘাট বেঁধে। যত দেখছেন বৌটাকে তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এ মেয়ে গোবিন্দর চেয়ে ঢের ভাল পাত্রে পড়া উচিত ছিল, তাঁর মনে হয় এক-এক সময়।

খানিকটা চুপ করে থেকে বলেন, 'কান্তি কি রাজি হবে?'

'সে ভার আমার মাসীমা, সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে রাজি করাব। নিদেন হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও—।'

'তা দ্যাখো—', শ্যামা যেন কতকটা অভিভূতের মতোই হয়ে যান, এমন ভাবে কথাগুলো কখনও ভেবে দেখেন নি, এখন যত ভাবছেন ততই ভাল লাগছে তাঁর প্রস্তাবটা, কথাটা এইভাবে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে করতেই জবাব দেন, 'তা দ্যাখো না হয় একটা মেয়েটেয়ে, খোঁজে থাকো না হয়!'

'মেয়ে একটি খোঁজে আছে মাসীমা, ঠিক যেন আপনার মাপেই ভগবান যুগিয়ে রেখেছেন। আমার এক কাকার ভায়রাভায়ের ভাইঝি। সে ভাই নেই, বিধবা ঐ মেয়েসুদ্দ ঐ ভারয়াভাইয়ের ঘাড়ে পড়েছে। তিনি কী এক সামান্য চাকরি করেন কোন্ মাড়োয়ারির গদীতে, খুবই কম মাইনে—নিহাৎ নিজের বৌদি আর ভাইঝি বলেই ফেলতে পারেন নি, নইলে সেরকম অবস্থা নয়। তার ওপর তাঁর নিজেরও ষেটের চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সবাইকেই বলে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। এখানে আসবার আগে যে একবার বাপের বাড়ি গেছলুম, সে সময়ই কাকা বলেছিলেন, দ্যাখ্ না তোদের পাড়াঘরে। দিতে তো কিছুই পারবে না—তবে ওদের তেমনি কোন আহিঙ্কেও নেই, দোজবরে তেজবরে পেলেও দিয়ে দেবে।'

'একেবারে কিচ্ছু দেবে না?' শ্যামার কণ্ঠে হতাশার সুর, সঙ্গে সঙ্গে যেন ঈষৎ বিরূপতারও।

'না, সে বলতে গেলে কিছুই না। মার নাকি একটি জোড়া বালা আছে ভরি পাঁচেকের মতো—তাই ভেঙ্গে রুলি হার ক'রে দেবে শুনেছি—আর কাকা ভিক্ষে দুঃখু ক'রে, যা দানসামিগ্গির বরাভরণ না দিলে নয়, তাই দেবে। তার বেশি তার ক্ষমতা নেই। তবে ধরুন—মেয়েকে আমি দেখেছি, মেয়ে দেখতেও খুব ফেল্না নয়—হতচ্ছিরি তো নয়ই! এধারেও বেশ গ্যাঁট্টাগোঁট্টা আছে, খাটতে পারে নাকি মোষের মতো। আপনি বরং একবার দেখুন মাসীমা—একেবারে অমত করবেন না।'

শ্যামার মনে হয় বুড়োর বৌয়ের কথা। মেয়েটা না কাজ ক'রে যেন থাকতে পারে না। আজকাল তো যত ভারী কাজ গিন্নীরা ঐ বৌটাকে দিয়ে করায়। দমাদম বাটনা বাটছে জল তুলছে, টিন টিন ক্ষার কাচছে—সব তো ঐ বৌ। ওরকম হ'লে সত্যিই মন্দ হয় না। টাকা কিছু খরচ হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি।... একে ঐ বদ্ধ কালা ছেলে তায় এই উপার্জন, শুধু তাঁকে দেখে কে আর পাঁচশ হাজার দিয়ে বিয়ে দেবে এ পাত্রে।

সেই কান্তি। তাঁর গর্ভের সেরা সন্তান। আশা ছিল কান্তির রাজার ঘরে বিয়ে হবে।.... আর সত্যিই, ঐ রূপবান ছেলে—লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হ'লে নিশ্চয়ই বড় বড় জমিদারের ঘর থেকে, রাজার ঘর থেকে সম্বন্ধ আসত, কত হাতিঘোড়া এসে দাঁড়াত তাঁর এই কুঁড়েঘরের সামনে। হয়ত সে বৌ এসে তাঁর পুকুর সরত না—তাঁর ঘর করত না, তবু একটা বলবার মতো সম্বন্ধ হ'ত তো! তার জায়গায় এই!

একটা অর্ধোদ্গাত দীর্ঘনিঃশ্বাস কষ্টে দমন করেন শ্যামা। অনেকক্ষণ পরে মুখে বলেন শুধু, তা দ্যাখো না হয়। সেই মেয়েই কি আর বসে আছে এতদিন?'

দেখা গেল যে সে মেয়ে বসেই ছিল। শ্যামা দেখতে যেতে পারবেন না ব'লে তারাই এসে মেয়ে দেখিয়ে গেল। খুব ফরসা নয়, তবে ময়লাও নয় একেবারে। মাজামাজা রঙ, গড়নপেটনটা একটু যেন কেমন মদ্দাটে গোছের মনে হ'ল শ্যামার, তবে মুখশ্রী মন্দ নয়। মুখে চেহারার দৈন্য মানিয়ে যাবে। যেখানে স্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই, ধারণার প্রশ্ন— যেখানে আর ও গড়নপেটনের প্রশ্নটা তুলে লাভ নেই। তাছাড়া, শ্যামার মনে হ'ল, ওটা হয়ত ছেলেবেলা থেকে খাটাখাটুনির জন্যেই হয়েছে, শারীরিক শক্তি ও কর্মদক্ষতারই পরিচায়ক ওটা। তিনি মেয়ে পছন্দ করলেন। ছেলেও তাদের পছন্দ হয়েছিল, যারা তেজবরেতে পর্যন্ত

BanglaBook.org

বিয়ে দিতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে আর ছেলে খারাপ কি। এক যা কানে শুনতে পায় না—তা মেয়ের কাকা বললেন, 'আমাদের মেয়ে ওখানকার মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে, একেবারে ক-অক্ষর-গোমাংস তো নয়—ও চিঠি লিখে কথা কইতে পারবে!'

তবু শ্যামা ভদ্রতার খাতিরে একবার বললেন, 'মেয়েকে বলে-কয়ে এ কাজ করছেন তো, লুকোচাপা করছেন না তো? শেষে এসে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে না তো?'

'না না —সব বলেই নিয়েছি। এমন সুন্দর বর পাচ্ছে, এ তো ভাগ্যের কথা ওর। এই তো আশার অতীত। আমাদের ঘরে যখন জন্মেছে তখন কী আর রাজপুত্তুর পাবে! আপনারাই একটু দয়া ক'রে মানিয়ে টানিয়ে নেবেন, অনাথ মেয়েটা—'

পাত্রপাত্রী পছন্দর পর দেনাপাওনার প্রশ্ন ওঠে। রানী অবশ্য বলে রেখেছিল যে ওরা এক পয়সাও দিতে পারবে না—কিন্তু শ্যামা সুকৌশলে বেয়াইকে দিয়ে 'যৎসামান্য' দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে' নিলেন। সে যৎসামান্যটা কত তা নিয়ে আর খোঁচাখুচি করলেন না, রানীকে আড়ালে বললেন, 'যতই কম দিক, একশ টাকার কম তো আর দিতে পারবে না—আমি এখন তাই ধরে রাখছি। যথা লাভ! কিছুই তো আশা ছিল না সে জায়গায় পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা জোটে তাই ভাল।'

শুধু যৎসামান্য নগদের কথাই নয়—আরও একটি কথা পাকা ক'রে নিলেন, গায়ে হলুদের তত্ত্ব এঁরা করবেন না, শুধু নিয়মরক্ষার মতো মাছ, হলুদ, একটু মিষ্টি, আর লালপাড় শাড়ি। ওঁদেরও ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাতে হবে না। মেয়ে-জামাইয়ের কাপড়, ক্ষীরমুড়কি বাটিসুদ্ধ, আর ফুল মিষ্টি—এই পাঠালেই চলবে।

কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। শুধু এখন হেমের কাছে খবর পাঠানো যা বাকি, তার ছুটি পাবার সময়টা জানতে পারলে এঁরা পাকা দেখা ও বিয়ের দিন ঠিক করবেন, হেমই এসে আশীর্বাদ করবে, সেই সঙ্গেই বিয়ে সেরে চলে যাবে।...

দীর্ঘদিন পরে ছেলেকে বিস্তৃত চিঠি লিখলেন শ্যামা। ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে, রানীর আত্মীয়ই বলতে গেলে, রানীই জেদ্ ক'রে এ বিয়ে দেওয়াচ্ছে, সে-ই কথাবার্তা ঠিক করেছে—তারই পীড়াপীড়িতে শ্যামাকে রাজি হতে হয়েছে—ইত্যাদি খবর দিয়ে, অর্থাৎ চিঠির মধ্যে 'তোমার বড় বৌদি' শব্দকটি অন্তত পনেরো-ষোলবার ব্যবহার ক'রে, 'যৎসামান্য'র কথাটা বেমালুম চেপে গিয়ে লিখলেন, 'উহারা এক-পয়সাও খরচ করিতে পারিবে না, সে সামর্থ্যও উহাদের নাই। থাকিলে আমার ঐ ছেলেকেই বা মেয়ে দিতে রাজি হইবে কেন? অথচ এধারে সত্যই আমারও দিন চলে না। এবম্বিধায় আমাকে রাজি হইতে হইল। নমো নমো করিয়া সারিলেও দুশ-আড়াইশটি টাকা খরচ হইবে কমপক্ষে। অবশ্য আমিও কিছু খরচ করিব, তবে তোমার নিকট হইতে অন্তত একশটি টাকার ভরসা রাখি। আশা করি তোমার অশক্ত অক্ষম ছোট ভাইয়ের জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না। ইত্যাদি—

কান্তিকে রাজি করানো যতটা সমস্যা হবে ভেবেছিলেন শ্যামা এবার তা আদৌ হ'ল না। হয়ত সে-ও সংসারের সমস্যা ও মায়ের কষ্ট দূর করার একটা উপায় চিন্তা করছিল, বড় বৌদি সেই দোহাই নিয়ে কথাটা পাড়তে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেল। এবং, রাজি হওয়ার পর থেকে যেন একটু উৎসুকভাবেই সেই অভাবনীয় ঘটনাটার অপেক্ষা করতে লাগল। নিজের আগ্রহ দেখে তার নিজেরই অবাক লাগত এক একদিন।

অবশ্য বিয়ের বয়স তার হয়েছে। বরং অনেক আগেই সে বয়সে পৌঁছে গেছে সে, আরও আগে হওয়াই হয়ত উচিত ছিল। কিন্তু বয়সের প্রশ্ন ছাড়াও অভিজ্ঞতার প্রশ্ন আছে। যে বাঘ নররক্ত পান করেছে, সে নররক্তের জন্য অধীর এবং লোলুপ হয়ে উঠবে এইটেই

BanglaBook.org

স্বাভাবিক। রতনদিকে আর যেন খুব ভাল ক'রে মনে পড়ে না—একটা বেদনা-বিজড়িত মধুর স্মৃতিতে মাত্র পরিণত হয়েছেন তিনি, এমন কি তাঁর মুখচোখের ছবিটাও যেন ক্রমশ ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে মনে—তবু সেই সুরনারীদুর্লভ দেবাকাঙ্ক্ষিত বরতনু আলিঙ্গন ও সম্ভোগের স্মৃতি—তার দৈহিক ছবিটা মন থেকে মুছে গেলেও—স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে আজও, ওর প্রতিটি রক্তকণা সে রভসস্মৃতিতে উন্মত্ত অধীর বুভুক্ষু হয়ে ওঠে। ছবিটা মনে নেই, কিন্তু অনুভূতিটা আছে। সেই অনুভূতির পুনরভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা ওকে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে। লজ্জায় কাউকে প্রশ্ন করতে না পারলেও ঘটনাটা ঘটতে কত দেরি আছে এখনও—পরোক্ষে সেটার খোঁজ করে। আজকাল প্রায়ই খেতে বসে মাকে প্রশ্ন করে, 'দাদার চিঠি-টিঠি পাচ্ছ?' এখন যে দাদার ছুটি পাওয়ার ওপরই সবটা নির্ভর করছে—এটুকু সে জানে। আর প্রশ্নটা যে সেইজন্যেই তা শ্যামাও বোঝেন—তিনি মুখ টিপে হাসেন শুধু। পরিতাপও করেন মনে মনে—'কী না পেতে পারত, বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে পায়ে লোটাত এতদিনে—নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করলে। এখন ঐ হাঘরের ঘরের শাঁকচুন্নির জন্যেই লালায়িত। হায় রে!'

অবশ্য হেমের ছুটি পেতে খুব দেরি হ'লও না। অনেকদিন ধরেই ছুটির তাগাদা দিচ্ছিল সে। রানীবৌদিরা এত কাছে এসেছে—বাড়িতে যতদিন ছিল আসা তো হ'লই না, তবু এখনও খুব দূরে নেই, এপাড়া ওপাড়া—সবাই মিলে একসঙ্গে দিনকতক হৈ-চৈ করবার জন্যে মনটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে কবে থেকে। সেই ছুটির তাগাদাই কাজে লাগল, বড়বাবু এবার ছাড়লেন ওকে। পাঁজি দেখে বিয়ে বৌভাত পাকা দেখার দিন হিসেব ক'রে তেরদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এল—রবিবার আর অন্য কী একটা ছুটি মিলিয়ে যাতে ষোল সতেরো দিন পুষিয়ে যায় এই ভাবেই ছুটিটা নিলে।

রাণীকে দেখে ওদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। হেমেরও, কনকেরও। কনক খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমাদের সঙ্গে জামালপুরে চলুন দিদি, টানের জায়গা, মাসখানেক থাকলেই সেরে যাবেন। চলুন—'

ম্লান হেসে রানী বলে, 'আর আমার এইসব ডেয়োঢাক্‌না, এরা? এদের কে দেখবে এখানে?'

'ওমা, ওদেরও নিয়ে যাবেন বৈকি! ছেলেমেয়ে ছেড়ে কি যেতে বলছি।'

একটু চুপ করে থেকে রানী বলে, 'না ভাই, সে হবে না। মারও শরীর খারাপ, ওঁকে ফেলে আমি যদি যাই সে বড় খারাপ দেখাবে, আর ওঁরও কষ্ট হবে খুব। একা একটা বাড়ি পাট করা, ভোরে ভাত দেওয়া, পেরে উঠবেন না।... চারিদিকে দেনা, একটা ঠিকে ঝিও তো রাখতে পাচ্ছি না, সবই তো করতে হয়।'

'তা আপনিই বা এই শরীরে কতদিন বইবেন? শয্যাগত হয়ে পড়লে তখন?'

'তখন তুমি আছ। তোমাকে লিখব—এসে সেবা করবে!' বলে কনকের গাল দুটো টিপে দেয় রানী।

'না দিদি, ও আপনি কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন।... একটু ভেবে দেখুন, জলহাওয়া খুব ভাল ওখানকার। জিনিসপত্তরও সস্তা, তিন আনা সের মাছ, চার আনা সের মাংস। চলুন, আমি বরং মাসীমাকে বুঝিয়ে বলি!'

'না না। তাহলে মা ভাববেন যে আমি বলাচ্ছি তোমাকে দিয়ে। বরং মা যদি দিন-কতক থেকে সেরে আসতেন তারপর আমি যেতুম তো ভাল হ'ত।... তা কি আর মা রাজি হবেন? দেখি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।'

তারপর একটু হেসে বিচিত্র দৃষ্টিতে কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে 'আমাকে যে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিস, ভয় করছে না?'

BanglaBook.org

'না দিদি, একটুও না।' স্থির দৃষ্টি রানীর দৃষ্টির ওপর নিবদ্ধ করেই জবাব দেয় কনক।

'কেন রে, এমনি বিচ্ছিরি হয়ে গেছি বলে? তাই আর ভয় করে না?'

'না দিদি, তা নয়। আপনিও যেমন খোলাখুলি বলছেন আমিও তেমনি খোলাখুলিই জবাব দিচ্ছি, ভয় যখন ছিলও—সে আপনার রূপের জন্যে নয়। আপনাকে যে ভালবাসবে সে রূপগুণ মিলিয়েই ভালবাসবে। আমার মানুষকে আমি চিনে নিয়েছি—সত্যিকার খারাপ চোখে সে কোনদিনই চায় নি আপনার দিকে। আর আপনার কথাও ওঁর মুখ থেকে অনেক শুনেছি, আপনার দ্বারা আমার যাকে অনিষ্ট বলে তা কখনও হবে না—এ জোর খুব আছে মনের মধ্যে!'

চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে রানীর। সে কনকের দুটো হাত চেপে ধরে বলে, 'বাঁচালি ভাই, এ যে কী দুশ্চিন্তা ছিল, কেবলই ভাবতুম না জানি আমার সম্বন্ধে কত কী খারাপ ভেবে বসে আছিস। কিন্তু সত্যিই বলছি, এই বামুনের মেয়ে এয়োস্ত্রী তুই —তোকে ছুঁয়ে বলছি, আমার মনে কোন অনিষ্ট চিন্তা কখনও আসে নি।'

'সে আমি জানি দিদি!' হেঁট হয়ে আর একবার পায়ের ধূলো নেয় কনক।

দুটো চোখ মুছে রানী আবারও কেমন একরকমের গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি কিন্তু তোমার ওপর অনেক ভরসা করে বসে আছি বোন, তুমি আমাকে কথা দাও—বিপদের দিনে কোনদিন, যদি সত্যি সত্যিই তোমাকে ডাকি, তুমি চলে আসবে ঠিক, আমাকে ত্যাগ করবে না!'

'ওমা, তা করব কেন! কিন্তু এসব কথা কেন বলছেন দিদি?' একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই প্রশ্ন করে কনক।

না, ও কিছু না। রানী উড়িয়ে দেয় কথাটা। জোর করে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, জামালপুরের কথা তোলে।

বসে গল্প করার খুব সময়ও ছিল না অবশ্য। রানী বিয়ে উপলক্ষে কদিন—রাতটুকু ছাড়া—এ বাড়িতে এসেই ছিল। সংসারের গৃহিণীর যা কিছু করণীয় বলতে গেলে সে-ই একা সব করেছে।

ওকে যত দেখছেন তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন শ্যামা। সবই করছে কিন্তু খরচপত্রের হাত যতদূর সম্ভব টেনে—আর কোন খরচটাই শ্যামাকে না জিজ্ঞাসা করে করছে না। কনকও অবাক হয়ে যাচ্ছে, গুণের মেয়ে তা সে শুনেছিল কিন্তু এত গুণের তা ধারণা ছিল না। এই শরীরে কী খাটুনিটাই না খাটছে, মনে হয়, একটা মানুষ চারখানা হয়ে বিয়ে বাড়ির সর্বত্র একই সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের সেটা হ'ল ওর মেজাজ। এ বাড়ির সমস্ত লোকগুলির ওপর, সমস্ত ঘটনা ও ক্রিয়াকর্মের ওপর ওর মধুর স্বভাবের আশ্চর্য প্রসন্নতা যেন একখানি স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে রেখেছে সর্বদা, আর সে ছায়া একটি অতি মিষ্টি সুরের আমেজ এনে দিয়েছে সকলের মনে, কোথাও কোন তালভঙ্গ হবার অবসর দিচ্ছে না।... খাটছে সবাই, কিন্তু তার পিছনে আবহসঙ্গীতের মতো তার হাসি, ঠাট্টা, তামাশা ও আন্তরিক সহানুভূতি অহরহ প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

এমন আর কখনও দেখে নি কনক,কখনও কল্পনা করে নি। হেমের কোন দোষ দেওয়া যায় না—মনে মনে বরং বাহবাই দিল হেমকে, এই মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে। অবশ্য তারপরই মনে হ'ল—এই মেয়েই সে মায়া কেটে দিয়েছে। নিজে স্বেচ্ছায় জাল কেটে না দিলে পাখি কোনদিনই উড়তে পারত না, উড়তে চাইতও না।

॥ ২ ॥

কান্তির বৌয়ের নাম নাকি বিনতা—কিন্তু দেখা গেল নত সে কোনখানটাতেই নয়। তার বয়স অল্প—আর কিছুই অল্প নয়। জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা—এ বোধ হয় বয়স্কা মেয়েছেলের মতোই।

BanglaBook.org

বিয়ের কনে পাল্কী থেকে নেমে কড়ি-খেলাটেলা নিয়মকর্মের পরই—রানী যখন তাকে কাপড় ছাড়াতে নিয়ে যাবে—সে চুপি চুপি বলার চেষ্টায় ফ্যাশ ফ্যাশ করে বললে, 'চলো না অমনি একেবারে পুকুর ঘাটটা ঘুরে আসি। দেখে-শুনে নিই, একশ'বার কী আর পরের খোশামোদ করব? শুনেছি তো এখানে কলতলা নেই আমাদের খিদিরপুরের মতো, পুকুরেই যা কিছু!'

যেন গালে একটা চড় খেল রানী। কী সর্বনাশ! এ কাকে নিয়ে এল সে! এই যদি ওর স্বরূপ হয়, তাহ'লে তা প্রকাশ পেতেও দেরি হবে না, মাসীমা কী বলবেন ওকে?

রানী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিনতাই আবার বলে, 'ওমা কী হল, খারাপ কিছু বললুম নাকি? বলি এই ঘরই তো করতে হবে, সব দেখে শুনে নেওয়া ভাল না? ঐ পুকুরই তো সরতে হবে দুবেলা, তা সেটা দেখে নেওয়া আবার দোষের নাকি? আর যদিই দোষের হয়—তুমি তো আমাদের আত্মীয়—তুমি তো বলে দেবে সেটা।'

'না দোষ আর কি। চলো পুকুরেই যাই।' রানী কোনমতে সামলে নেয় নিজেকে। একে তো মেয়েটার গলার আওয়াজ কেমন আধো-আধো—হয়ত আলজিবের বা জিবেরেই কোন দোষ আছে, অল্পবয়সের খুকী হ'লে এ গলা মানায়, এই বয়সের মেয়ের গলায় ঐ রকম স্বর শুনতে বড় খারাপ লাগে; তার ওপর ঐ গলায় এই রকম পাকা পাকা কথা—আরও অসহ্য।

পুকুরে যেতে যেতে কতকটা কথার পৃষ্ঠে কথা বলার মতোই রানী জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার ডাক নাম কী ভাই? বিনতা নামটা বড্ড ভারী না? সব সময় ব্যবহার করা যায় না।'

'হ্যাঁ, বিচ্ছিরি নাম। বাবার কে এক বেম্ম বন্ধু ছিল, সে-ই রেখেছে। কী আর করব, এত বয়সে তো আর নাম বদলানো যায় না। কিন্তু ডাক নামটা আরও খারাপ। মা ডাকে বাঁদী বলে। সে নাম কি কাউকে বলা যায়—বলো না! তা তোমরা বাপু বরং বিনু বলেই ডেকো না কেন। বিনতা থেকে বিনু—মন্দ কি! আমি অনেক ভেবেছি, ঐটেই আমার পছন্দ!'

ততক্ষণে পুকুর ঘাটে পৌঁছে গেছে ওরা। একবার ভ্রূ কুঁচকে ঘাটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওমা ঘাটের ওপর কোন গাছপালা নেই যে একটু ছায়া হয়! এত তো বনজঙ্গল দেখছি এধারে, ঘাটের ওপর বুদ্ধি ক'রে কেউ একটা বড় গাছ দিতে পারে নি?... এ বাড়িতে তো ঝি নেই শুনেছি, আমাকেই তো বাসন-কোসন ছিষ্টি মাজতে হবে, আমি বাপু তা বলে ঠেকো রোদে বসে বাসন মাজতে পারব না। সেই বিকেলে ছায়া পড়লে তবে—'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে রানী, 'এখনই তো তোমাকে কেউ বাসন মাজতে বলছে না, এই বিয়ের আটদিন মাজতে হবেও না। পরের কথা পরে। আর কখানাই বা বাসন, মাজতে চাও সন্ধ্যেবেলাই মেজো না। আমরা অবিশ্যি দুপুরেই মেজেছি, কই পুড়েও তো যাই নি—তবে তুমি কাজ করবে, তোমার সুবিধে মতোই করবে বইকি। মাকে বলে নিও—'

'হ্যাঁ, তাই যা হোক একটা করতে হবে কিছু! .... তবে তুমি আবার বলছ সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলা তো বাবুরা বাড়ি ফেরে, তখন বুঝি কেউ বাসন-কোসন নিয়ে জুবড়ে পড়ে থাকে! সন্ধ্যের আগে কাজকম্ম সেরে না নিলে কখন মাথা বাঁধব গা ধোব! তোমার যা বুদ্ধি!'

রানীর আর সহ্য হয় না। বলে, 'নাও-নাও, যা করবে সেরে নাও। আর দ্যাখো, বিয়ের কনে পাল্‌কী থেকে নেমেই এত কথা বলতে নেই, ওতে বড় নিন্দে হয়।'

'তা বটে।' তৎক্ষণাৎ সায় দেয় বিনু। বলে, 'মাও সেই কথা একশ'বার বলে দিয়েছে পই পই করে। আমার যে কী এক পোড়া স্বভাব, থাকতে পারি নে চুপ করে।'

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে শরবৎ খাইয়ে রানী তাকে ঘরে বসিয়ে চলে এল। মন যতই খারাপ হয়ে থাক, ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, থই থই করছে লোক চারিদিকে, অসংখ্য কাজ পড়ে—মন খারাপ করে বসে থাকবার অবসর নেই।

কিন্তু বিনতাও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবার মানুষ নয়। সে একটু ইতস্তত ক'রেই ঘরের বাইরে দালানে এসে দাঁড়াল। কুশণ্ডিকা কাল রাত্রে সারা হয়ে গেছে ওখান থেকে, সন্ধ্যারাত্রে লগ্ন ছিল বলে হেমই বলেছিল কথাটা, ওদের কটা টাকাও ধরে দিয়েছিল সব যোগাড় করে রাখতে। আজ তাই অনেক'টা নিশ্চিন্ত, এখনই কোন ঝঞ্ঝাট করতে বসতে হবে না। দালানে তখন কনক আর মহাশ্বেতা বসে কুটনো কুটছে। মহাশ্বেতাও তেমনি, ওকে দেখে বলে উঠল, 'কী লো, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিস? আয় না, বসে যা না। আমরাই বা একা তোর বিয়ের কুটনো কুটে মরি কেন? কী বলিস ভাই বৌদি?'

বিনুও তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে সেখানে, 'দিন না, কুটনো কোটা তো ভারী কাজ! ও আমার খুব অব্যেস আছে।'

'থাক, থাক', কনক ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'ওমা, তুমি বিয়ের কনে এসেই কুটনো কুটতে বসবে কেন ভাই—আমরা এত লোক থাকতে! আঙ্গুলে দাগ হয়ে যাবে—কী আঙ্গুল কেটেই ফেলবে হয়ত। তুমি এমনিই বসো, গল্প করো বরং। তোমার বাপের বাড়ির গল্প বলো—'

'বাপের বাড়ির ছাই গল্প। বাপই নেই তার বাপের বাড়ি—আপনি তো আমার বড় জা? এখানকার কথা একটু বলুন দিকি। আপনি তো সব জানেন শোনেন, আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি তো দুদিন বাদেই ড্যাং করে চলে যাবেন—আমাকেই তো তখন এই ঘরকন্না করতে হবে। বুঝে নেওয়া ভাল আগে থাকতে!'

কনক অবাক হয়ে গেল। এ ধরনের কথা কনে-বৌয়ের মুখে—তার কাছে কল্পনাতীত। সে যেন তথমত খেয়ে গিয়ে ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মহাশ্বেতা কথাগুলো ভাল শুনতে পায় নি। ইদানীং সেও একটু কম শুনছে কানে। যদিও সে নিজে সেটা মানতে চায় না। ওর ছেলেরা বলে, 'চেঁচ্যে চেঁচ্যে মায়ের কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে। যা চেঁচান চেঁচায় দিনরাত!' ... সে কনকের দিকে ফিরে বললে, 'কী হ'ল গো—তোমার হাত আবার থেমে গেল কেন! কী বলছে নতুন বৌ ফিস ফিস করে?'

বিনু আর একটু গলা নামিয়ে বলে, 'ইনিই আমার বড় ননদ না? সেবার মেয়ে দেখা দিতে এসে দেখে গিছলুম। কানে কম শোনেন বুঝি? তাহ'লে কালার বংশ বলো! বাঃ, বেশ বে হ'ল আমার। যত রাজ্যের কালা আর পাগলকে নিয়ে কারবার, জম্মে বরের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে পারব না।... তা হ্যাঁ দিদি, আমার একটি পাগল ননদ আছে শুনেছি—সেটি কোথায়?'

তরু তখন দালানেরই একটা জানলার ওপর বসে ছিল চুপ করে।—কনক নিঃশব্দে আঙুল দেখিয়ে দিল।

'ওমা, ওই নাকি? তা কৈ পাগলের মতো তো মনে হচ্ছে না। বেশ তো ভাল মানুষের মতো চুপচাপ বসে আছে। ওকেই বোধহয় গুম্-পাগল বলে—না?'

'না না, ছোট্ ঠাকুরঝি তেমন পাগল কিছু নয়। অতিরিক্ত শোকেদুঃখে অমনি জবুথবু হয়ে গেছে, জোর করে না নাওয়ালে নায় না, না খাওয়ালে খায় না—এই! চেঁচামেচি করা কি ভাঙ্গাচোরা—সে সব কিছু না!'

'সব্বরক্ষে! আমার যা ভয় হয়েছিল, পাগল শুনে। বলি কি না কি, মারধোর করবে কি ঘুমের মধ্যে গলাটাই টিপে দেবে—'

'ষাট! ষাট! ওসব কি অলুক্ষণে কথা। আজকের দিনে ওসব বলতে নেই। ছি!'

BanglaBook.org

'না, তাই বলছি।' একটু অপ্রতিভভাবে জবাব দেয় বিনতা।

ফুলশয্যায় আড়ি পাতবার উৎসাহটা রানীরই বেশি। সে-ই দল পাকিয়েছিল। কনক আগেই বলেছিল, 'একজন তো কানে শুনতে পায় না, কথা আর কী হবে, হয় লিখে বলতে হবে নয় তো ঠারে-ঠোরে—আড়ি পেতে কি লাভ দিদি?'

কিন্তু রানী সেসব কথা কানেই তোলে নি। বাইরের ঘরে ওদের ফুলশয্যা হবার কথা। সে বিকেল থেকে অনেক যত্ন অনেক তদ্বির করে একটা জানলার নর্দমা পরিষ্কার করে চেঁচে বাড়িয়ে চোখ চলবার মতো করে নিয়েছিল। আর একটা জানলায় এমনিই ফাঁক একটু বেশি—সেখান থেকে একজন দেখতে পারে। এদিকে —অর্থাৎ রাস্তার দিকের রক থেকেও যাতে দেখা যায় সেটার জন্যে হেমের শরণাপন্ন হ'ল শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যের দিকে, 'হেই ঠাকুরপো, একটা কিছু করে দাও ব্যবস্থা!'

হেম বলে, 'বেশ লোক তুমি! ভাই-ভাদ্রবৌয়ের ফুলশয্যেয় আড়ি পাতার ব্যবস্থা করবে ভাসুর! লোকে শুনলে বলবে কি!'

'আরে তুমি তো পাতছ না, পাতব তো আমি। তুমি শুধু একটা দোর-জানলার খাঁজটাঁজ ঠিক করে দেবে—এই কথা!'

'ও সব হবে-টবে না আমার দ্বারা। আমার ঢের কাজ আছে এখন, এখনই সব লোকজন এসে পড়বে।'

অগত্যা রানী নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেয়। ঠিক হয়, সে, কনক এবং ও বাড়ির মেজগিন্নী প্রমীলা আড়ি পাতবে, আর কারুর অত উৎসাহ ছিল না—মহাশ্বেতা একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, তা তাকে হেম ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দিল।

খাওয়াদাওয়া চুকে হাতের সুতো খুলতেই রাত দেড়টা বেজে গেল। তারপর ওদের শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে সব বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল প্রকাশ্যে—কিন্তু তারপরই ওরা তিনজনে আড়িপাতা ফোঁকরে চোখ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে বাগানের দিকে রইল রানী আর প্রমীলা, বাইরের দিকে কনক।

ওরা দোর ভেজিয়ে চলে আসবার পর প্রথমটা দুজনেই চুপচাপ পড়ে রইল—বর এবং কনে। বেশ কিছুক্ষণই । এরা যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছে তখন বিনতা হঠাৎ উঠে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিঃশব্দে এসে কপাটটায় খিল দিয়ে দিলে। তারপর জানলার কাছে এসে বেশ একটু শ্রুতিগম্য স্বরেই আপন মনে বললে, 'যে বেটাবেটিরা আজ আড়ি পাতবে তারা কিন্তু ঠকবে—নিজেদেরই ঘুম মাটি। এ তো আর গল্প করার মতো বর নয় যে কথা-বার্তা কইব —শুনবে! আর দেখবারই বা আছে কি প্রেথম রাত্তিরে?'

ঘরে আলো রাখা নাকি নিয়ম—এরা হ্যারিকেনটাই কমিয়ে এক কোণে রেখে এসেছিল। বিনতা সেখান থেকে সেটা তুলে পলতেটা বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে বিছানার পাশে এনে রাখল। তারপর বুকের জামার মধ্যে থেকে একটা পাট করা কাগজ আর এক টুকরো ছোট পেন্সিল বার করে খস্‌খস্‌ করে কি লিখে কান্তির দিকে এগিয়ে দিল। বিস্ময়ে কান্তিরও চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল—বিস্ময়ে আর প্রশংসায়। বধূর বুদ্ধি এবং কর্ম-তৎপরতা লক্ষ করে বুঝি আশ্বস্তও হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সেও উজ্জ্বল মুখে কাগজটা টেনে নিয়ে বৌয়ের লেখাটুকু পড়ে তার নিচে কি লিখে আবার তার দিকে ঠেলে দিলে।

এই ভাবেই চলল ওদের প্রথম প্রেমালাপ। আড়ি যারা পাততে গিয়েছিল তাদের কারুরই আর রুচি ছিল না বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার। তারা যেন অদৃশ্য এক-একটা চড় খেয়েই অপমানে মাথা হেঁট করে সরে এল আস্তে আস্তে। এখন লজ্জাটা তাদেরই।

BanglaBook.org

নিঃশব্দেই এসে উঠোনে দাঁড়াল তিনজন। মুখে কথা ফুটছে না যেন কারও। কথাটা কেউই কাউকে বলতে চাইছে না আসলে—আঘাত দেবার এবং পাবারও ভয়ে। শেষে প্রমীলাই কতকটা সামলে উঠে বলল, 'কখন ঐ কাগজ আর পেন্সিলটা যোগাড় করে জামার মধ্যে রেখে দিয়েছে ভাই, আশ্চর্য! আমরা কেউ টের পেলুম না! বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে সব গুছিয়ে তোরঙ্গের মধ্যে করে নিয়ে এসেছিল। একেবারে!'

রানী প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'খুব শিক্ষা হয়ে গেল আমার! আর যদি কারও বিয়ের কথায় থাকি কোনদিন! লোকের ভিড়ে গোলমালে এখনও অতটা লক্ষ করতে পারেন নি মাসীমা, কিন্তু কাল-পরশুই বুঝতে পারবেন, তারপর আমি মুখ দেখাব কি করে! ছি-ছি!'

'আপনি ভুল করছেন দিদি', ওকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে কনক বলে, 'ওর এমনি বৌই দরকার ছিল। বৌ নয়—ছোট ঠাকুরপোর একটা গার্জেনই দরকার, তাই পেয়েছে। ঐ হাবা কালাকে নিয়ে সংসার করা, বৌ শক্ত না হলে চলত কী করে!'

হয়ত সারারাতই জেগে চিঠি লেখালেখি করেছে ওরা,—কিম্বা বিনতার বাপের বাড়ি থেকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অন্তত প্রথম প্রথম খুব ভোরে উঠতে হয়, গুরুজনদের ওঠবার পর ঘরের দোর খুলে বেরোনো বড় লজ্জার কথা—ছোটবৌ খুব ভোরেই উঠোনের দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু উঠোনে পড়তেই তার নজরে পড়ল যে তরু তারও আগে উঠে পড়েছে এবং কি একটা করছে। আর একটু কাছে আসতে—কী করছে তাও বুঝতে পারল। আগের দিন রাত্রে অভ্যাগতদের পাতা থেকে নিহাৎ কামড়ানো-চট্‌কানো টুকরো টাকরা বাদে অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টগুলো একটা ঝুড়িতে তুলে রাখা হয়েছিল—সকালে ভিখারি কাঙালিদের দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে। তরু তারই মধ্যে থেকে বেছে বেছে মাছগুলো তুলে খাচ্ছে!

'ওমা, ওমা, কি হবে মা! এ কি কাণ্ড!' ছোটবৌ শোরগোল তুলে দিল একেবারে 'বিধবা মানুষ, তায় বামুনের বিধবা মাছ খাচ্ছ কি! তায় সত্তিকজাতের এঁটো। জাতজন্ম রইল কি তোমার? বলে পাগল না ছাই সেয়ানা পাগল—বোঁচকা আগল! পাগলই যদি তো অন্য কিছু না খেয়ে মাছ খাবে কেন। মাছের সোয়াদটি তো ঠিক জানা আছে! বলি ও ছোট ঠাকুরঝি—ই কি কাণ্ড তোমার? এত নোলা!'

গুঁতোগুঁতি ক'রে অল্প জায়গায় শোওয়া—ঘুম ভাল ক'রে কারুরই হয় নি। এই চেঁচামেচিতে প্রায় সকলকারই ঘুম ভেঙ্গে গেল। হেম বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, কনক রানী এরাও ছুটে এল। শ্যামার কোমরটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠতে একটু দেরি হয়—তিনি যখন বেরোলেন তখন হেম হাত ধরে টেনে তরুকে সরিয়ে দিয়েছে, কনক নিয়ে যাচ্ছে ঘাটের দিকে মুখ হাত ধোওয়াতে। ঘটনাটা যাই হোক, নতুন বৌ—বিশেষত ফুলশয্যার কনেবৌকে এতটা চেঁচামেচি করতে নেই, —উপস্থিত সকলকারই এই কথাটা প্রথম মনে হয়েছিল, তরুর আচরণের থেকে ওর আচরণটাই দৃষ্টিকটু শ্রুতিকটু দুই-ই লেগেছিল। কিন্তু শ্যামা সেটা লক্ষ করলেও, নতুন বৌয়ের সামনে তরুর এই কাণ্ডতে অপমান-বোধ এবং লজ্জাটই প্রবল হয়ে উঠল। তাঁর যেন মাথা কাটা গেল এই ব্যাপারে। হয়ত তরুর জন্যেই সবচেয়ে বেশি বিব্রত থাকতে হয়েছে এই ক'মাস, মেজমেয়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েছে অযথা—এই সব কারণে একটা অসহায়, প্রতিকার-হীন বিক্ষোভ মনে জমছিল বহু কাল থেকে;এই উপলক্ষে সেইটেরেই বিস্ফোরণ ঘটল একেবারে। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে দু হাতে ঠাস ঠাস ক'রে গোটাকতক চড় কষিয়ে দিলেন তরুর দুই গালে। বললেন,

BanglaBook.org

'হারামজাদী শুধু আমাকে জ্বালাতে পোড়াতে এসেছিল পেটে! জন্মভোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিলে একেবারে! এত খাও তবু নোলা যায় না! সব্বস্ব খেয়ে বসে আছিস্—এখনও খাওয়ায় এত লালসা! যত অলুক্ষণে আর যত অমঙ্গুলে কাণ্ড ক'রে যাচ্ছ! আর কী বাকি আছে, ঐ ছেলেটা তো? তা তাই না হয় তার মাথাটা কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খা। খেয়ে আমাকে অব্যাহতি দে তুইও বাঁচ আমিও বাঁচি!'

কনক রানী দুজনে মিলে ধরে তাঁকে সরাতে পারে না। বলছেন আর পাগলের মতো মেরেই চলেছেন। কনক বলল, 'ছি মা, ওর কী জ্ঞানবুদ্ধি আছে যে, ওকে অমন ক'রে মারছেন! একটু হুঁশ থাকলে ও কি আর এটা করে। এমনি তো দেখেন জোর ক'রে না খাওয়ালে খেতেই চায় না। একে লোভ বলছেন কেন! আপনিও কি পাগল হয়ে গেলেন। কাকে মারছেন আপনি, ও কি কিছু বুঝছে! সরুন—ওর হাত ধুইয়ে নিয়ে আসি!'

এবার শ্যামা সমস্ত আবেগ নিঃশেষ ক'রেই বোধ হয় কেঁদে ফেললেন, 'না মা, আমার আর সহ্যি হয় না। তোমরা বিষ এনে দাও, খেয়ে আমি শান্তি পাই। এ জ্বালানি পোড়ানি কত কাল ভুগব আর।'

ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে নতুনবৌ বলল, 'সত্যি দিদি, আপনি বলছেন বটে হুঁশ-পব্ব নেই—কিন্তু মুখের তারটি তো ঠিক আছে—কই, কুমড়োর ঘ্যাঁট তো খায় নি, ঠিক মাছটিই বেছে বেছে মুখে দিয়েছে।'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল যেন কনকের; সে একটু কড়া সুরেই বললে, 'তুমি চুপ করো! তুমি কনেবৌ—সব তাইতে তোমার কথা বলার দরকার কি!... এক বাড়ি গুরুজনের মধ্যে তোমার এত কথা বলতে লজ্জা করে না!'

এতক্ষণে শ্যামারও যেন খেয়াল হ'ল তাঁর নবনীতা পুত্রবধূর অশোভন আচরণ। অথবা সক্কালবেলাই এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা ঘটে যাওয়াতে তাঁর মনে ইতিমধ্যে যে অনুতাপ আর অপ্রতিভতার ভাব দেখা দিয়েছিল—তার সম্পূর্ণ চোটটা গিয়ে পড়ল—এই সমস্তটার জন্য দায়ী ঐ মেয়েটির ওপরই। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বললেন, 'তোমাকেও আমি এই সাবধান ক'রে দিচ্ছি ছোটবৌমা—নোলা দু রকমের আছে, এক বেশি খাওয়া আর এক বেশি কথা বলা। ও কোন নোলাই ভাল না। এক ফোঁটা মেয়ের এত কিসের থগবগানি সব তাইতে? ফের যদি ছোট মুখে এমনি বড় বড় কথা শুনি তো সকলের সামনে সাঁড়াশি পুড়িয়ে ঐ নোলা টেনে ছিঁড়ব। তোমার কোনও কাকা এসে রক্ষে করতে পারবে না বলে দিলুম!'

তাঁর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে, এবং কিছু পূর্বের চড় মারার দৃশ্য মনে পড়ায়, ভয় পেয়ে গেল বিনতা। সে দ্রুত পিছন ফিরে তাদের ঘরে ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বারে! সব্বাই এখন আমার ওপরই ঝাল ঝাড়তে শুরু করল। যত দোষ এখন আমারই। বেশ তো!'

এতদিনের এত কথা, এত তিরস্কার এত বকুনি এত অনুরোধ উপরোধ মিষ্ট বাক্যেও তরুর স্তম্ভিত ভাবটা কাটানো যায় নি! মনে হ'ত কিছুই তার কানে যায় না, কিছুই তার প্রাণে লাগে না। তার চিত্ত এবং বুদ্ধি দুই-ই বুঝি জড় হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে ওর মুখ ধোওয়াতে ধোওয়াতে—গালের ওপর যেখানে শ্যামার কর্মকঠিন আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল—সেইগুলোই জল ঘষে দিতে দিতে হঠাৎ নিজের হাতের ওপর গরম গরম কয়েক ফোঁটা কি গড়িয়ে পড়ায় কনক চমকে চেয়ে দেখল, তরুর দুই চোখের কোল উপ্‌চে তপ্ত অশ্রুই ঝরে পড়ছে। কনক তখনই কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না, শুধু নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে তুলে নিয়ে গেল। যেতে যেতে কেবল একবার

BanglaBook.org

বললে, 'শোকেতাপে নানা কারণে মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই ঠাকুরঝি, তুমি মনে কিছু নিয়ো না, লক্ষ্মীটি।'

কথাগুলো তরু ঠিক বুঝতে পারল কিনা, ওর জড়ত্ব সম্পূর্ণ কেটেছে কিনা বোঝা না গেলেও কনক মনে মনে একটু আশ্বস্তই হয়ে উঠল। কারণ তরু কোন উত্তর না দিলেও বা কথা না কইলেও এবার নিজেই নিজের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো শুকনো করে মুছে নিল কনক এরকম এর আগে শুনেছে তার বাবা কাকার মুখে। এই ধরনের গুম পাগল, যারা কোন মানসিক আঘাতে এমনি জড়ভরত হয়ে যায়—তারা আবার কোন কঠিন আঘাতেই নাকি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। ওর মনে আশা হ'ল সম্ভবত তরুও এবার সুস্থ হয়ে উঠবে আপনা-আপনিই।

সে আশা আরও বাড়ল তার দুপুরবেলা, যখন ভাত খাওয়াবার জন্য ওকে নিতে এল কনক। বহু দিন পরে তরু কথা কইল, সামান্য দুটিমাত্র শব্দ—'ভাল লাগছে না, এখন থাক!' কনক ওকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর ক'রে শেষ পর্যন্ত খেতে নিয়ে গেল, বললে, একটা শুভদিন, এখনও চারদিকে লোকজন—তোমার ছোট ভায়ের বিয়ে, এই দুপুরবেলা যদি না খেয়ে পড়ে থাকো, তাদেরও যেমন অকল্যেণ, মার মনেও তেমনি লজ্জার শেষ থাকবে না, ভাববেন তাঁর জন্যেই তুমি খেতে চাইছ না। তিনি তো তোমাদের জন্যে অনেক করেছেন, তাঁকে একটু মানিয়ে মাপ ক'রে নিতে পারছ না?'

আর কোন কথা বলে নি তরু, শান্তভাবেই গিয়ে খেয়েছে, খাওয়া হ'লে বহুকাল পরে নিজেই এঁটো বাসন নিয়ে গিয়ে পুকুরে ভিজিয়ে রেখে মুখ ধুয়ে এসেছে। এ ঘটনাটা আরও অনেকেরই চোখে পড়ল, মহাশ্বেতা আগের দিন রাত্রে এ বাড়িতে থেকে গিয়েছিল, সে শ্যামাকে খুঁজে বার ক'রে উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'বলি তোমার দাওয়াই তো খুব ভালই ঝেড়েছ দেখছি। তরোর তো রোগ সেরে গেল।... হুঁশ তো বেশ খানিকটা ফিরে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে। তোমার কেটো হাতের চড়ের গুণ আছে দেখছি!'

শ্যামা অবশ্য উত্তর দিলেন না, সকালের ব্যাপারটার জন্য তাঁর অনুশোচনার সীমা ছিল না। সত্যিই তো—বেচারি জন্মাভাগী, তাঁর কোলে এসে জন্মে জীবনভোর দুঃখই পেয়ে গেল ওর আর দোষ কি, গ্রহেই করাচ্ছে বৈ তো নয়! তাঁরও গ্রহ, মেয়েরও। না, মারাটা ঠিক হয় নি অমন ক'রে!....

ইচ্ছে হয়েছিল অনেকবারই, গিয়ে একটু কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে আসেন, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসে কেমন একটা আড়ষ্টতা এসে গেছে কোথায়, সেটা আর সম্ভব হবে না বুঝে নিরস্ত হলেন। স্বাভাবিক যে কোমলতা থাকলে অনুতাপের এই বহির্প্রকাশে লজ্জা আসে না—সে কোমলাতাকে উনি অনেক দিন পিছনে ফেলে এসেছেন, এখন নারী-সুলভ যে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করতেই যেন বাধ-বাধ ঠেকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে মহাশ্বেতা নিজের বাড়ি চলে গেল। রানীরাও। বাইরের লোক বলতে আর কেউ ছিল না। কিছু বেঁচে-যাওয়া মিষ্টি নিয়ে আর রানীর ছেলেটাকে কোলে ক'রে হেম গেছে রানীদেরই পৌঁছে দিতে। বাসন-কোসন মাজামাজি ক'রে কনকও ক্লান্ত হয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এক জায়গায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। শ্যামা তার অনেক আগেই শুয়েছেন এসে, সন্ধ্যাবেলা বাড়িটা শুধু নিস্তব্ধ নয়—নির্জনও ছিল। কান্তি গিয়েছিল মুদির দোকানে বাড়তি ময়দা প্রভৃতি ফেরৎ দিয়ে তাদের হিসেব মিটিয়ে আসতে। ছোটবৌ নিজের ঘরে বিছানাপাতা চুলবাঁধা টুকিটাকি কাজ শেষ ক'রে সেইখানেই বসে ছিল। এরই মধ্যে কখন তরু চুপিসাড়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, তা কেউই লক্ষ করে নি।

BanglaBook.org

প্রথম হুঁশ হ'ল কনকেরই। হেম ও কান্তি ফিরল প্রায় এক সঙ্গেই। উঠে ওদের খেতে দিতে গিয়েই তার লক্ষ পড়ল।

'মা, ছোট্ ঠাকুরঝি কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!'

শ্যামা তখনও অত কিছু ভাবেন নি। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'ঘরে নেই? জানলায়? দ্যাখো, হয়ত বাগ্যানে গেছে কি ঘাটে। লম্পটা কোথায়? লম্প নিয়ে যায় নি?'

'কৈ, না তো! বাগান—মানে পাইখানাও দেখে এলুম, কৈ ঘাটেও তো নেই!'

কেমন যেন একটা অশঙ্কার আকুলতা ফুটে ওঠে কনকের কণ্ঠে, ঘুমের ঘোরে শ্যামার কানে সেটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

'কী সর্বনাশ! তাহলে কোথায় গেল সে।' শ্যামা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন।

প্রথমে বাড়িটাই খোঁজা হল তন্নতন্ন ক'রে। কোথাও পাওয়া গেল না। তখন কান্তি ছুটল বড় মাসিমাদের বাড়ি, হেম গেল বাজারের দিকে। চেনা দোকানদারদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে—কারও নজরে পড়েছে কিনা। মহাদের বাড়িতেই যাক, আর খালের দিকেই যাক, ঐ একই রাস্তা।

কিন্তু অত দূর যেতে হ'ল না। সিদ্ধেশ্বরীতলা পর্যন্ত যাবার আগেই খবর পাওয়া গেল। খবর দিতেই আসছিল তিন-চারজন।

নতুন বামুনদের পাগলী মেয়েটা রেলে কাটা পড়েছে।

এই সন্ধ্যের বোম্বে মেল দুখানা ক'রে কেটে দিয়ে গেছে তাকে।

তবে দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা—সেইটেই শেষ পর্যন্তও জানা গেল না। কেউ বললে, লাইন পার হচ্ছিল গাড়ি এসে পড়েছে; কেউ বললে, না ইচ্ছে ক'রেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সামনে।

॥ ৩ ॥

সেদিনের রাত্রিশেষটা বোধ হয় কারুর পক্ষেই সুপ্রভাত হয় নি।

অনেক দিন পরে বাপের বাড়ি থেকে খুশি মনেই ফিরছিল মহাশ্বেতা। সে অতশত বোঝে না, নতুন বৌয়ের কথাবার্তা বিশেষ তার কানে যায় নি; হাবাকালা ভাইটার একটা সদ্গতি হ'ল—সেইটেই তার কাছে বড় কথা। বৌ এমন কিছু খারাপ দেখতেও নয়, বেশ নতুন-বৌ নতুন-বৌই তো দেখাচ্ছিল ছুঁড়িকে বাপু।

আর খুশি হবার কারণ তরুর হুঁশজ্ঞান ফিরে আসবার লক্ষণটা। আহা, যদি ভাল হয়ে যায় মেয়েটা সত্যি সত্যিই —ওরও শান্তি, মায়েরও শান্তি। অনেক তো কষ্ট পেলে, এবার কিছুদিন শান্তিতে থাক। 'যে যেখানে আছে ভাল থাক।' এইটেই বলতে বলতে এসেছে সে প্রায় সারা পথটা।

বাড়িতে পৌঁছেও সে অতটা কিছু লক্ষ করে নি। 'মহারাণী'র সঙ্গে তার খুব সম্প্রীতি নেই দীর্ঘকালই—তবু আজ বাড়িতে ঢুকে তাকে সামনে পেয়ে তার কাছেই হাত-পা নেড়ে গল্প করতে লেগে গেল। বৌভাতের গল্প, কতটি লোক খেয়েছে (যেন ওরা কেউ যায় নি!), কী কী রান্না হয়েছিল—ইত্যাদি; মার কৃপণতা যে দিন দিন বাড়ছে তার কতকগুলি সদ্য-দৃষ্টান্ত; দাদা কীভাবে সারাক্ষণটা বড়বৌদির পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করেছে ('এখনও বাপু টানটা যায় নি যে যতই বলো!') তারই রসালো বিবরণ এবং সর্বোপরি মার তিন-চারটি চড়ে কেমন করে তরুর চৈতন্যোদয়ের লক্ষণ দেখা দিল তারই বিস্তৃত ইতিহাস সালঙ্কারে ও এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করছিল, হঠাৎ অনেকক্ষণ একতরফা বকে যাবার পর একসময় তার খেয়াল হল যে, তার শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা সকলেই কেমন অস্বাভাবিকভাবে চুপ করে আছে, সকলেরই মুখেচোখে কেমন থমথমে ভাব।

BanglaBook.org

প্রথম যা মাথায় ঢুকতে দেরি—তারপর জিনিসটা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। মেজবৌয়ের ভাবভঙ্গির হদিস মহা কোনদিনই ভাল পায় না —ওর কথা না হয় ছেড়েই দিল—কিন্তু ছোটবৌয়েরও বিষণ্ন গম্ভীর ভাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। খানিকটা বোকার মতো এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে ছোটবৌকেই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, কী হয়েছে রে, তোরা অমন মুখ অন্ধকার ক'রে আছিস কেন? সবাই ভাল আছে তো? কোথাও থেকে কোন খারাপ খবর-টবর আসে নি?'

বলতে বলতেই লক্ষ হ'ল মানুষটাকে। রোদ এখনও ও-বাড়ির পাঁচিলের মাথায়—এমন সময় তো কোনদিন ফেরে না। সে মেজ ছেলের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁরে, এই, অ ন্যাড়া। তোদের গুষ্টি আজ এরই মধ্যে বাড়ি ফিরেছে যে? এতক্ষণ ঠাওর করি নি। এত সকালে বাড়ি ফিরল, শরীর ভাল আছে তো? তোরা খবর-টবর নিয়েছিলি একটু?'

এই প্রথম বোধ করি তার ছেলেদেরও চপল ও বাচাল রসনা স্তব্ধ রইল। ন্যাড়া কেন, তার পরের আরও দুটো ভাই উপস্থিত ছিল, কিন্তু কারও মুখে কোন কথা সরল না। ন্যাড়া মাথা হেঁট করে বসে মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল।

ওদের ভাবভঙ্গিতে মহাশ্বেতার উত্তরোত্তর ভয় বেড়ে যাচ্ছিল, সে প্রায় কান্নার মতো ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, 'আ মর, তোরা অমন করে মুখে গো দিয়ে রইলি কেন সকলে মিলে। ভেঙ্গে বলিব তো কি হয়েছে। আমার যে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে তোদের রকমসকম দেখে .... বল না মুখপোড়ারা কী হয়েছে।'

এইবার মেজবৌই কথা বললে, তার স্বভাবসিদ্ধ লঘুভঙ্গি ত্যাগ ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'বট্ঠাকুরের চাকরি শেষ হয়ে গেল আজ থেকে, তাই সকাল করে ফিরে এসেছেন!'

'কী—কী হয়ে গেল বললি?' বিশ্বাস হয় না নিজের কানকে। অভয়পদর কোনদিন চাকরি না থাকতেও পারে—একথাটা এতকাল বোধ হয় এ বাড়ির কারও মাথাতে যায় নি। তাই মহাশ্বেতার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও তেমন করুণ শোনাল না। দৃঢ় অবিশ্বাসই বেশি সে কণ্ঠে। নিজের কানকেই অবিশ্বাস অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

'ওঁর নাকি যতদিন চাকরি করার কথা—তার চেয়ে বেশি দিন হয়ে গেছে, তাই ওঁকে সাহেবরা বসিয়ে দিয়েছে। বলেছে যে, আর কতকাল টুল জোড়া ক'রে বসে থাকবে? নতুন লোকদেরও তো ক'রে খাওয়া দরকার। আর ঢের দিন তো হ'ল—অনেক দিন তো খাটলে, এবার কিছুদিন আরাম করো গে!'

এবার আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অবিশ্বাসেরও না। এমন কথা নিয়ে কিছু তামাশা করবে না মেজবৌ। বিশেষ বড়কর্তার কথা নিয়ে তো করবেই না। তাছাড়া, কিছু একটা হয়েছেই নিশ্চয়—নইলে এমন সময় বাড়িতেই বা ফিরবে কেন? এতকালের মধ্যে, আঙুলে গুনে বলে দিতে পারে মহাশ্বেতা, চারদিন না পাঁচদিন সকাল করে ফিরেছে সে। সেও কোন 'বিপুর্যেয়ে' কাণ্ড কোথাও হয়েছে, সেই জন্যে অফিসই সকাল করে বন্ধ হয়েছে—তবে! তাছাড়া চুপ ক'রে রকের ধারে বসে আছে—কোন কাজকর্মে হাত না দিয়ে—এটাও একটা নিয়মের প্রচণ্ড ব্যতিক্রম।

লক্ষণ সমস্তই মন্দের। আর মন্দটাই বেশি ফলে—এটা মহাশ্বেতা তার গণ্ডীবদ্ধ জীবনেও অনেকবার দেখেছে। যে কথা রটে, যেটা লোকে অনুমান করে—তার মধ্যে যা ভাল, তা কদাচ কখনও সত্য হয়, কিন্তু খারাপ যেগুলো, সেগুলো ঠিক সত্যি হয়ে বসে থাকে।

তবু চাকরিটা সত্যিই নেই, আজ থেকেই নেই—সেটা যেন এখনও বিশ্বাস হয় না।

হয়ত নোটিশ দিয়েছে, হয়ত সময় একটা বেঁধে দিয়েছে। সেটাও যথেষ্ট খারাপ খবর, তবু আজ থেকেই—? না না, তা কখনও হ'তেও পারে? হ'লে যে তাদের চলবে না, তাদের

BanglaBook.org

এতবড় সংসার অচল হয়ে যাবে! এত বড় 'বেরৎ গুষ্টি' খাবে কি? এই জন্যেই মন বিশ্বাস করতে চায় না বোধ হয় চরম দুঃসংবাদটা। মনে মনে কোথায় একটা অস্তিত্বহীন আশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

অভয়পদ অবশ্য নাগালের বাইরে কোথাও নেই—সামনেই বসে আছে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। সে স্ত্রী, তার তো ষোল আনা অধিকারই আছে জিজ্ঞাসা করবার। তবু যেন সাহসে কুলোয় না মহাশ্বেতার। অনেকক্ষণ পরে পা পা ক'রে গিয়ে পেছনে দাঁড়ায় শুধু—কোন প্রশ্ন মুখ ফুটে করতে পারে না।

আজ কিন্তু—বোধ করি এই প্রচণ্ড আঘাতেই—অভয়পদরও একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে মনের মধ্যে। সে-ই খানিকটা পরে, পিছনে না ফিরেও স্ত্রীর উপস্থিতিটা অনুভব করে বলল, 'সত্যিই ছুটি হয়ে গেল এবার—। আজ থেকেই।'

'আজ থেকেই একেবারে—?' কোন মতে ফিসফিস ক'রে বলে মহাশ্বেতা।

'হ্যাঁ। আরও তিন মাসের মাইনে পাব অবশ্য, তবে আপিসে আর যেতে হবে না। শুধু সাত দিন পরে একবার যেতে হবে হিসেবটা চুকিয়ে নিয়ে আসতে।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহাশ্বেতা, কোন প্রশ্নই করতে পারে না।

অভয়পদই একটু পরে আবার বলে, তেমনি ধীরে ধীরে, ভাবলেশহীন কণ্ঠে—'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু এও তো এক রকমের মৃত্যুই —পুরুষ মানুষ ঘরে এসে বসব হাত পা গুটিয়ে—এ আর মৃত্যু ছাড়া কী? —তা সবই সেই লোভ থেকেই হ'ল আর কি! বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর চাকরি হ'ল—বোধ হয় আরও বেশিই হ'বে, আমার হিসেব নেই অত—অফিসেরও সে সব খাতা নষ্ট হয়ে গেছে—তা সবাই মিলে, আমাদের বড়বাবুই উয্যুগী হয়ে বলেছিল, যা হোক দু-চারটে টাকা করেও অন্ততঃ পেনসন দিতে, কিন্তু সাহেবরা কেউ রাজি হ'ল না।... আসলে সেই সাহেব দুটো যে বেইজ্জৎ হ'ল —ওদের জাতের মুখ ডুবল—সে কথাটা ওরা ভুলতে পারছে না। আমার ওপর একটা আক্রোশ পড়েছে ওদের। ওদের মনে হয়েছে যে আমি কসাইয়ের মতো সুদ আদায় ক'রে ক'রে তাদের রক্ত মাংস মায় হাড় কখানা পর্যন্ত চুষে খেয়েছি। আমি অমনভাবে টাকা না যোগালে নাকি তারা অতটা অধঃপাতে যেতে পারত না। তাছাড়া আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি, এও ওরা মানতে চায় না। ওরা স্পষ্টই বলেছে যে, আমি নাকি অনেক টাকা গুছিয়ে নিয়েছি চড়া সুদ খেয়ে খেয়ে। আমার যা ডুবেছে তা নাকি লাভের তুলনায় কিছুই নয়। তাই ওরা কোন রকম দয়া-ধর্ম করতে রাজি হ'ল না কিছুতেই।... প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা অনেকখানিই তো তুলে নিয়েছিলুম —এখন সব মিলে যা পাব, হয়ত হাজার টাকারও কম দাঁড়াবে।'

'তাহ'লে এখন উপায়?'

অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে উচ্চারণ করে মহাশ্বেতা কথাগুলো।

'উপায় ভগবান!' শব্দগুলো অভয়পদর পক্ষে স্বাভাবিক—কিন্তু এই প্রথম, তার অভ্যস্ত শান্ত উদাসীন কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর ধরা পড়ে একটু। একটা নিঃশ্বাসও পড়ে কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

সারা বাড়িটার সেই থমথমে স্তব্ধ আবহাওয়া একটা প্রবল দমকা বাতাসে আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। কান্তি খবরটা নিয়ে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। তরু আজ সন্ধ্যেয় রেলে কাটা পড়েছে, ওদের কারুর একবার যাওয়া দরকার এখনই। দাদা একা—কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বড়দা আজই কোথায় গেছে থিয়েটার দেখতে— কোথায় গেছে

কখন আসবে, তা কেউ জানে না। মা খবর শুনে পর্যন্ত চৌকাঠে মাথা ঠুকছেন—বৌদি তাঁকে সামলাবে, কি ছেলে দেখবে ভেবে পাচ্ছে না। পাড়ার লোকে কেউ কেউ এসেছে বটে—কিন্তু এরা না গেলে দাদা জোর পাচ্ছে না।

ছেলেরা তখনই হৈহৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল। অম্বিকাপদ একবার দাদার মুখের দিকে আড়ে চেয়ে নিয়ে দুর্গাপদকে বললে, 'তুমিও একবার না হয় যাও—ছেলেরা যতই করুক, পাকা মাথা কেউ থাকা দরকার।'

অভয়পদ তখনও পর্যন্ত রকের ধারের সেই জায়গাটিতে চুপ ক'রে বসে ছিল। তার ঐ একভাবে বসে থাকাতে সকলেই একটা অস্বস্তি বোধ করলেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে নি। বোধ হয় কী বলবে, কী বলে সান্ত্বনা দেবে তা ভেবে পায় নি। মহাশ্বেতা অনেকক্ষণ কাছে বসে ছিল চুপ করে, তারপর সেও উঠে গেছে। সংসারের কর্মচক্রে আবর্তিত হওয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আর সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, তাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর ও আর নিস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে নি। তার নিজের ভাষাতেই 'অসুমর' কাজ পড়ে চারিদিকে, দেখে-শুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।

সে চলে যাবার পরে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে, অভয়পদকে আচ্ছন্ন ক'রে ঘনীভূত হয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও অভয়পদ ওঠে নি, নড়ে নি। এইবার প্রথম, সে শুধু নড়লই না, উঠে দাঁড়াল। বলল, 'না দুগ্‌গা থাক বরং আমিই যাচ্ছি। আমারই যাওয়া দরকার। পুলিশের ব্যাপার একটা আছে বোধ হয়—ওরা ছেলেমানুষ সামলাতে পারবে না।'

তার এই মানসিক অবস্থায় এসব ব্যাপারে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে উপস্থিত সকলের মনেই প্রবল সন্দেহ দেখা দিল, মেজবৌ কী একটা ফিসফিস ক'রে বললও অম্বিকাকে—বোধহয় নিরস্ত করারই কথা—কিন্তু অম্বিকা কিছু বলতে পারল না শেষ পর্যন্ত। বহুদিন ধরে এ-বাড়িতে অভয়পদরই সর্বশেষ কথা বলার অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে প্রায় নির্বিচারেই, আজও তাই কেউ কোন কথা বলতে পারল না তার ওপর।....

অভয়পদর সঙ্গে মহাশ্বেতাও যাবে, এইটেই সকলে ধরে নিয়েছিল। স্বাভাবিকও সেটা। কিন্তু বিকেলের ঐ আঘাতের পর এখনই আবার এই আঘাত তাকে একেবার অনড় ক'রে দিল। সে যেন খুব চিৎকার ক'রে কাঁদতেও পারল না —প্রথমটা একবার জোরে কেঁদে উঠেই বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব ক'রে দু'হাতে বুক চেপে শুয়ে পড়ল। ছোট-বৌ তরলা ছাড়া সেটা তখন কেউ লক্ষও করে নি। সংবাদটার অপ্রত্যাশিততা ও আকস্মিকতায় বিস্ময়-বিমূঢ় সকলে সংবাদদাতাকেই ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কৌতূহলী হয়ে। তরলাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তড়িৎকে মাথায় বাতাস করতে বলে নিজে তার বুকে তেল-হাত বুলিয়ে চুঁচে দিল খানিকটা। তাতে একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেও পায়ে বল ফিরে এল না। তার চোখের সামনে দিয়েই ছেলেরা, কান্তি—সবাই চলে গেল, অভয়পদও। সে যেতে পারল না।

অভয়পদ যখন যায়—একবার কাঁদো-কাঁদো গলায় সে বলেছিল অবশ্য, 'ওগো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ওগো আমার মা যে সেখানে দেহড়া পিট্‌ছে গো একা একা—আমি না গেলে কে তাকে দেখবে।... আমি ঠিক যাবো—আমার কিচ্ছু হবে না। আমার মিত্যু নেই। নইলে কোলের বোনটা চলে গেল, ছোট ভাইটা নিখোঁজ হ'ল—দ্যাখো আমি এখনও ঠিক বেঁচে আছি। আমি বেশ যেতে পারব ছোট—আমাকে যেতে দে তোরা!'

বলছিল, কিন্তু উঠতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠতে পারে নি।

হাঁটুটায় কোন জোর ছিল না, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারল না কিছুতেই।

BanglaBook.org

ছেলেরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল, —মেজকর্তার একটি আর ছোট কর্তার একটি ছাড়া। আজ বড়দের কারও খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই মানসিক অবস্থায় ভাত গলা দিয়ে নামবে না কারুরই। শুধু ছোট দুটোকে আর বুড়োর বৌকে ধরে জোর ক'রে যা হয় এক-এক গাল খাইয়ে দিল প্রমীলা। ছোট কর্তাকেও বলেছিল—কিন্তু সে কিছু খেতে রাজি হয় নি। তরলা মহাশ্বেতাকে নিয়ে মহার ঘরে—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মাথায় বাতাস ক'রে সুস্থ করার চেষ্টা করছে। অনেকটা শান্ত ক'রে এনেছেও কিন্তু এখনই তাকে ফেলে ওঠা উচিত নয়।

অগত্যা মেজকর্তা আর মেজ-বৌকেই রান্নাঘর সারা, বাসনপত্র দালানে এনে রাখা, খিড়কীর দোর সদর দোরে চাবি দেওয়া, গোয়াল দেখা প্রভৃতি করতে হ'ল। ওরা কখন আসবে তার ঠিক নেই কিছু। সম্ভবতঃ রাত ভোর হয়ে যাবে। ওদের ভরসায় জেগে বসে থেকে লাভ নেই। কেউ আগে ফেরে, খেতে চায়—হাঁড়িতে ভাত, ঢাকার নিচে ডাল-তরকারি সবই রইল কিছু কিছু—খেতে পারবে।...

সব কাজ সেরে, তালাগুলো বার বার টেনে দেখে, বেঞ্চির তলা, তক্তপোশের তলা 'লম্প'র আলো ফেলে ফেলে দেখে অম্বিকাপদ নিজের ঘরে শুতে গেল। ইদানীং এই 'বাই'টা তার বেড়েছে। সর্বদাই চোরের ভয়। ভেতর থেকে সব দোরে তালা দেওয়া হয়; শুধু খিল-ছিট্‌কিনিতে বিশ্বাস নেই তার। দালান আর নিচের ঘরগুলোর জানালাতে শক্ত মজবুত জাল পরানো হয়েছে। প্রতি দরজায় ডবল ছিটকিনি। অর্থাৎ বাড়িটাকে যতটা সম্ভব দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য ক'রে তুলতে যত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু তাতেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, খাট-চৌকির তলাগুলো না দেখা পর্যন্ত। তার বিশ্বাস, সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রে দরজা বন্ধকরা অবধি এই যে তিন-চার ঘণ্টা সময়, এর ভেতর কেউ যদি কোন বদ মতলবে এসে চৌকি কি খাটের তলায় ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে চায় তো তার সুযোগ-সুবিধার অভাব হবে না। বহু অসতর্ক মুহূর্তে দরজা খোলা হা-হা করে—নিচের তলা বা ওপরের দালানে কেউ থাকে না। হয় নিজের নিজের ঘরে কি ছাদে কি বাগানে থাকে—নয় তো রান্নাঘরে বসে জটলা করে। এর ভেতর অমন দশ-বিশটা লোক এসে বিভিন্ন ঘরে তক্তপোশ-খাটের নিচে ঢুকে যেতে পারে। তারপর সকলে ঘুমোলে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ? আর সেরকম ক্ষেত্রে ভেতর থেকে তালাই দাও, ছিটকিনিই দাও—যথাসর্বস্ব বার ক'রে নিয়ে যেতে তাদের কোনই অসুবিধা নেই। এমন কি—জান-প্রাণও নিরাপদ নয় তেমন কাণ্ড হ'লে। কথাটায় যুক্তি যতই থাক, ছেলেদের হাসি পায় কথাট শুনলে। কিন্তু কারও ঠাট্টা-তামাশা-পরিহাস গ্রাহ্য করবার মানুষ অম্বিকাপদ নয়, নিজে তো যতটা পারে দেখেই—যেটা পারে না, যেমন ভাদ্র-বৌ কি ভাইপো-বৌয়ের ঘর—বার বার ক'রে বলে দেয় দেখে শুতে।

তবু, এত করেও যেন স্বস্তি পায় না আজকাল। ন্যাড়ার কথা যদি সত্যি বলে ধরতে হয় ইদানীং মেজকর্তা নাকি রাত্রে ঘুমোয় না ভাল করে... প্রায়ই উঠে উঠে নিঃশব্দে বাড়িটা ঘুরে দেখে যায়। ন্যাড়াই ব্যাখা করে কারণটা, নিজের মনের মত করেই করে অবশ্য। বলে—'পোস্টাপিসে ব্যাঙ্কে যা টাকা রেখেছে মেজকা, সেটা লোকদেখানি বৈ তো নয়—তার অন্তত দশগুণ টাকা দ্যাখো গে যাও ঘরে রেখে দিয়েছে। ওর ঘরের দ্যালে আর মাটির ইট ক'খানা আছে সবই তো টাকা আর সোনার বাট দিয়ে গাঁথা গো! চুরি-বাটপাড়ির টাকা ব্যাঙ্কে-পোস্টাপিসে মানে সদুরে রাখতে তো সাহস হয় নে—কোন্ ভরসায় রাখবে বলো—তাই অমনি করে রাখা। আর সেই জন্যেই অত পাহারা দেওয়ার বাই! বুঝলে না?

BanglaBook.org

আজ আবার ছেলেরা কেউ নেই, বাড়িতে লোকজন কম বলে আরও বেশি সময় লাগল অম্বিকাপদর সব দেখে-শুনে শুতে। সে ওপরে উঠে যাবার পর নিচের দালানের ছোট টিনের দেওয়াল-আলোটা যথাসম্ভব কমিয়ে (এ বাজে খরচটাও ইদানীং করা হচ্ছে অম্বিকাপদর নির্দেশে) প্রমীলা এসে মহাশ্বেতার দোরের সামনে দাঁড়াল। মহাশ্বেতা এতক্ষণে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়—কিন্তু তরলা এখনও বসে বসে বাতাস করছে। প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেও প্রমীলার উপস্থিতি টের পেল তরলা, সে পাখাখানা নামিয়ে রেখে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। চুপিচুপি বলল, 'এই সবে ঘুমিয়েছে। কিন্তু আজ কি আর ওকে এখন একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে? আমি বরং থাকি, আপনি আপনার দেওরকে একটু বলে দিন, দোর দিয়ে শুয়ে পড়তে!'

প্রমীলা সে কথার কোন উত্তর দিল না, অল্প কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে কেমন একরকম দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শোন, আমার সঙ্গে একবার ওপরে আয়, একটা মজা দেখবি!'

সামান্য আলো, তবু তার বিচিত্র দৃষ্টিটা তরলার চোখ এড়ায় নি। তার মনে হল প্রমীলার দুই ওষ্ঠের প্রান্তে একটা কৌতুকের হাসি, চাপবার চেষ্টা করছে সে। অকারণেই তার বুকটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু প্রমীলা তাকে কিছু ভাবার সময় দিল না। তার একটা বাহুমূল ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল ওপরে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ-দিকে তরলাদের ঘর, কিন্তু সে দিকে গেল না প্রমীলা, ডান দিকে মোড় নিয়ে একেবারে দালানের সর্বশেষ প্রান্তে বুড়োর ঘরের সামনে গিয়ে থামল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল তরলার—যা কিছু দেখবার। যা দেখাতে চায় প্রমীলা, যা দেখাতে এনেছে।

ঘরের মধ্যে আলো থাকে না সাধারণত, কিন্তু আজ ছিল। বোধ হয় ছেলেমানুষ একা থাকবে বলেই মেজ-বৌ বলে দিয়েছিল হ্যারিকেনটা কমিয়ে রাখতে—কিম্বা তখনও শুয়ে পড়ে নি বলেই জ্বেলে রেখেছিল তড়িৎ।

মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে তড়িতের একটা হাত ধরে টানছে দুর্গাপদ, তড়িৎ চেষ্টা করছে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। সম্ভবত মশারির মধ্যেই ছিল সে—দুর্গাপদই তাকে বাইরে টেনে এনেছে, অন্তত অবস্থা দেখে তাই মনে হয়। কারণ তড়িতের গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক অসম্বৃত না হ'লেও অবিন্যস্ত, তার কপালের কোলে কোলে-ঘাম জমে উঠেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সে বেঁকে-চুরে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

ওরা কেউই লক্ষ করে নি এদের। প্রমীলাই জানিয়ে দিল নিজেদের উপস্থিতিটা। নিঃশব্দে চলে যাবে বলে সে আসে নি, এক ঢিলে অনেক পাখি মারবার ব্যবস্থা তার। সে একটা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল যেন, হাসতে হাসতেই তরলার একটা হাত ধরে বলল, 'হ'ল তো? চ, এবার নিচে যাই।'

হাসি যতই চাপা হোক, তার শব্দ মাত্র হাত-তিনেকের ব্যবধানে না পৌছবার কথা নয়। দুজনেই শুনতে পেল। দুর্গাপদ হঠাৎ বিছে-কামড়ানোর মতোই তড়িতের হাতটা ছেড়ে দিল, কিন্তু তখনই কোথাও পালাতে কি আত্মগোপন করতে পারল না, যেন পাথর হয়ে গেল সে। শুধু তড়িৎ ছুটে বাইরে এসে প্রমীলাকে জড়িয়ে ধরল, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'নিত্যি এমনি ফাঁক পেলেই টানাটানি করবে ছোট্-কা। আমি লজ্জায় বলতে পারি না কাউকে, কিন্তু আমার আর ভাল লাগে না বাপু—রোজ রোজ এই জ্বালাতন পোড়াতন।

BanglaBook.org

ওকে বললেও যা, না বললেও তাই—দাঁত বার ক'রে হাসে শুধু।.... তুমি তো এবার নিজে-চক্ষে দেখে গেলে—যা হোক একটা বিহিত করো মেজকাকি।'

॥ ৪ ॥

দুর্গাপদর জীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল। ওর বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণ ভাবে সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে এবং বিশেষ ক'রে নিজের স্ত্রীকে চেনা ওর শেষ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, স্ত্রীর সঙ্গে এই গত উনিশকুড়ি বছর ঘর করেছে সে—তাকে চিনতে এখনও অনেক বাকি।

শুধু দুর্গাপদই নয়, অবাক হয়ে গেল অনেকেই। কারণ তরলা তখন যে শুধু কোনরকম কটূক্তি বা মন্তব্য না ক'রে নিঃশব্দে নিচে নেমে এসে আবার পাখাটা হাতে ক'রে মহাশ্বেতার বিছানার পাশে বসেছিল তাই নয়—পরের দিনও তার নিত্যকার কাজে কি কথাবার্তায় আচারে-আচরণে কোন বৈলক্ষণ্য টের পেতে দিল না কাউকে, যেন এ রকম কিছুই ঘটে নি, অথবা ঘটলেও তরলার কিছু আসে-যায় না তাতে। তবু প্রমীলা অপেক্ষা করেছিল দুপুরটার জন্যে। খাওয়ার সময় ভাতে বসে কিনা সেইটেই বড় প্রশ্ন, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে কত শক্ত মেয়ে সে, কতটা মনের জোর। কিন্তু দুপুরবেলা খেতে ডাকতেই—নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে বসল তরলা; যেমন অন্যদিন এসে বসে। বরং তড়িৎই যেন মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না ছোটকাকির দিকে। সত্যিই তার কোন দোষ নেই—এ বাড়িতে তাকে ধরে টানাটানি করাটা বহু কাল থেকে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্তত মেজবৌয়ের তাই বিশ্বাস—তবু, তরলার এই নিঃশব্দ ঔদাসীন্যেই সে যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, তরলার কাছে অপরাধী মনে করছিল নিজেকে।

অবশ্য খেতে বসলেও, খেল খুব সামান্যই। কিন্তু এমন কম নয় যে বিশেষ কারও চোখে পড়ে। এক প্রমীলা ছাড়া সেটুকু চোখে পড়লও না কারও। দুপুরে রাত্রে সহজভাবেই এসে খেতে বসতে লাগল সে—শুধু দুবেলা জল-খাবারটাই ছেড়ে দিল। অবশ্য এ বাড়ির গিন্নীরা কেউ বিকেলে কি সন্ধ্যায় ওপাট রাখে না, কারণ দুপুরের খাওয়া চুকতেই বেলা তিনটে বাজে, সন্ধ্যা পর্যন্ত অম্বলেই ছট্‌ফট্ করে বড় আর মেজগিন্নী। কোন সুদূর-সম্ভাবিত অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে দুবেলাই দুটি দুটি চাল বেশি নেওয়ার প্রথা আজও এ বাড়িতে অব্যাহত আছে, বোধহয় ক্ষীরোদার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থাকবেও। ফলে সে ভাত প্রায় দুবেলাই পান্তা হয়ে থাকে, আর তা এদেরই খেতে হয়। আর সেই কারণেই এদের এত অম্বল এবং বদহজম। অবশ্য রাত্রে না হ'লেও—সকালে মুড়ি, নারকেল, বাতাসা কি গুড়, দুটো গাছের কলা —এ খাওয়ার রেওয়াজটা আছে এখনও, বস্তুত ছোটবৌয়ের বিয়ের পর থেকেই এটা চালু হয়েছে—কিন্তু সেটা খুব নিয়মমতো কেউই খায় না—হয়ত সময়ই হয়ে ওঠে না এক-এক দিন, তাই সেটা বন্ধ হ'ল কিনা তাও লক্ষ করবার কথা নয় কারও। প্রমীলাই শুধু লক্ষ করল, জলখাবার বাদ দেওয়া এবং দুবেলা আহারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া—দুটো মিলিয়ে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠল একটু।

তরলার তা'হলে মতলবটা কী?

ও কি এমনি ক'রে আস্তে আস্তে নিজেকে ক্ষয় ক'রে আনতে চায় নাকি?

দিনকতক দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। এতখানি দায়িত্ব নিজের ওপর রাখা উচিত নয়। সে এক ফাঁকে ছোট কর্তাকে নিভৃতে ডেকে বলল, 'কী করছ কি, যাহয় ক'রে মিটিয়ে নাও। বৌটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ—কী হয়ে যাচ্ছে?'

কদিন ধরে দিনরাত একটা অস্বস্তি অনুভব করলেও এ দিকটা জানা ছিল না দুর্গাপদর। বস্তুত স্ত্রীর মুখের দিকে সে তাকাতেই পারে নি, আর পাছে সে না-পারাটা কারও কাছে ধরা পড়ে, তাই চোখাচোখি হওয়ার সম্ভাবনাগুলোও এড়িয়ে গেছে সে প্রাণপণে। কী খাচ্ছে না খাচ্ছে তাও অত লক্ষ করা হয়ে ওঠে নি। সেই জন্যে—দুবেলা খেতে বসছে ঠিক-ঠিক, সেইটে আড়ে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে শুধু, আর তাতেই কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। প্রমীলার কথায় সে তাই রীতিমতো চমকেই উঠল। বলল, 'কেন—খাচ্ছে না?... বসে তো দেখি—'

'হ্যাঁ বসে কিন্তু কী খায় কতটুকু খায় তা দ্যখো কি? নামমাত্তরই বসে। ও খাওয়ায় মানুষ বাঁচে না, বিশেষ অমন সাজোয়ান সাডেডাল মেয়ে-মানুষটা! জোর করে জীবনটা নিলে পাছে চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে যায়, একটা কেলেঙ্কার হয়—তাই আস্তে আস্তে চুপি চুপি পাত করছে নিজেকে। ও কি কম চাপা মেয়ে!'

'তুমিই তো এই কাণ্ডটা করলে। বিশ বছরের আকোচটা মেটালো!'

'এ কাণ্ড না করলে কি তুমি শায়েস্তা হ'তে —না তোমার আক্কেল হ'ত? সে যে আরও একটা বড় কেলেঙ্কার হয়ে বসে থাকত—তোমাকে যে গলায় দড়ি দিতে হ'ত সে ক্ষেত্তেরে। তোমাকে বাঁচাতেই এটা করেছি মনে রেখো।'

'হ্যাঁ—তা আর নয়! আমার ওপর কত টান তোমার।... আসলে তোমার রীষ! তোমাকে আমি চিনি না—কত বড় হারামজাদা মেয়ে-মানুষ তুমি!'

প্রমীলা কিন্তু এ বিশেষণে রাগ করল না, বরং মুখ টিপে হাসল একটু। বলল, 'তাই যদি জানো তো বিশ বছর ধরে একটা আকোচ বুকে ক'রে রেখেছি তাই বা ভাবো কেমন করে?... ওগো ঠাকুর, তোমাকে জব্দ করতে—নাকের জলে চোখের জলে করতে আমার একদিনও লাগত না। তুমি আমার হাতের মধ্যেই আছ। তোমার এত দিকে কালি যে—আর ষড় ক'রে কালি ছিটোতে হয় না।... তা নয়, এ-সব আড়ি-আকোচের কথা নয়, যা করতে যাচ্ছিলে তা যে কত গর্হিত কাজ তা তুমি সহজে বুঝতে না—সে চিজই নও তুমি। আজ বলে তো নয়—তোমার ওপর নজর আছে আমার চিরকাল—আমার চোখের আড়ালে যাবার সাধ্যি নেই তোমার। বাড়াবাড়ি করছিলে বলেই একটু জব্দ ক'রে দিলুম। তা সে যাক—এখন যা বলছি তাই শোন, যেমন করে হোক হাতে-পায়ে ধরও অন্তত রাগারাগিটা মিটিয়ে নাও গে।'

অন্যদিকে চেয়ে মুখটা গোঁজ ক'রে বলে দুর্গাপদ, 'রাগারাগিটা কোথায় তাই যে বুঝতে পারি নি—তা মিটিয়ে নেব কি বলো!... কথাও কয় সবই করে—'

'কথা কয়? সহজভাবে কথা বলে?' এবার বিস্মিত হবার পালা প্রমীলার। বিশ্বাস হ'তে চায় না তার কথাটা।

'বলে বৈকি। নিজে থেকে বলে না। তবে আমি যেচে কথা বললে জবাব দেয় তো দেখি—'

'তাই তো!' আরও কি বলতে যাচ্ছিল প্রমীলা কিন্তু ছেলেরা দু-তিনজন এসে পড়ায় আর বলা হ'ল না। শুধু যেতে যেতে বলে গেল, 'তবু নিজে থেকেই ওপর-পড়া হয়েও কথাটা পাড়ো অন্তত। এ সব্বনাশ ফেলে রেখে দিও না—'

বিস্ময়টা দুর্গাপদরও বড় কম নয়। সে ভেবেছিল আর যাই করুক, বাইরে যত স্বাভাবিক আচরণই বজায় রাখুক, কথা সে কইবে না স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই। অন্তত বেশ কয়েকদিন কঠিন হয়ে থাকবে, হয়ত ঘরেই আসবে না, দালানে কি ছাদে গিয়ে শুয়ে থাকবে কোথাও, সাধ্যসাধনা ক'রে কথা বলাতে হবে রাগ ভাঙ্গাতে হবে। কিন্তু সে সব কিছু হ'ল না। যেমন ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সে নিচে বিছানা ক'রে শোয় তেমনিই শুল পরের দিন,

BanglaBook.org

এমন কি কোথাও কোন অস্বাভাবিক কাঠিন্যও প্রকাশ পেল না তার চলা-ফেরায় কি ব্যবহারে। বরং দু-তিন দিন দুর্গাপদই সঙ্কোচে বা ভয়ে কথা কইতে পারে নি। শেষে একদিন, এ নীরবতা তার নিজের ছেলেমেয়ের কাছেই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে উঠছে দেখে—মরিয়া হয়েই কতকটা—কি একটা প্রশ্ন করেছিল সে। প্রশ্ন করার সময় সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবার আশা আদৌ করে নি—কিন্তু খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিয়েছে তরলা সঙ্গে সঙ্গেই। সংক্ষেপে হয়ত—তবে নিঃসঙ্কোচে। এত-সহজে উত্তর পেয়ে চমকে উঠেছিল দুর্গাপদ—যেমন এই মাত্র সে সংবাদে প্রমীলা চমকাল।

তারপরও দু-একটা কথা কয়েছে দুর্গাপদ—উত্তরও পেয়েছে। এমন কি ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে নিজে থেকেও কথা কয়েছে তরলা। সে সময় তার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠস্বর আরও মৃদু হয়েছে বা তাতে কোন ক্ষোভ কি উষ্মা কিম্বা ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে—তাও বলতে পারবে না দুর্গাপদ।

তবে এও ঠিক যে, অস্বস্তিটা তার কাটে নি। কেন কাটে নি তা হয়ত সে বোঝাতে পারবে না। অস্বস্তিটা অকারণ না হলেও আকারহীন—সেইটেই (যুক্তি দিয়ে কাউকে বোঝানো যাবে না সেটা) হয়েছে তার মুশকিল।

ব্যাপারটা যে ঠিক স্বাভাবিক নয়, এটা বোঝবার মতো সাংসারিক জ্ঞান দুর্গাপদর আছে। নিজে থেকে নিষ্প্রয়োজনে কথা কয় নি তরলা একটিও। নিতান্ত খোশগল্পের অবসর অবশ্য কম এ বাড়িতে—তার স্বভাবটাও সে রকম নয়, স্বভাবতই স্বল্পভাষী সে, এমন কি স্বামীর কাছেও—তাই শুধু প্রয়োজনমতো কথা বলাটা আর কারও কাছে তত অস্বাভাবিক ঠেকে নি—কিন্তু দুর্গাপদর কাছে এই সামান্য তফাৎ-টুকুও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

অথচ সে করবেই বা কি—তাও তো ভেবে পায় না।

এর মধ্যে, সাত-আট দিন কেটে যাবার পর, একদিন রাত্রে তাকে শয্যার দিকেও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে দুর্গাপদ, তাতেও বাধা দেয় নি তরলা, তবে স্বেচ্ছাতেও আসে নি। আকর্ষণেই এসেছে শুধু, জড় কোন বস্তুর মতো। এসেছে, বসেওছে বিছানায়। বসেও থেকেছে কিছুক্ষণ—কিন্তু সে সময় ওকে, কাঠের পুতুলও নয়—দাঁড়ায় নি। হয়ত শেষ পর্যন্তও কোন বাধা দিত না। কিন্তু সেটা পরখ ক'রে মড়ার মতোই মনে হয়েছে তার। তবে বাধা দেয় নি সে কোনও সময়, শক্ত হয়ে বেঁকেও দেখতে আর ভরসায় কুলোয় নি। নিজের আচরণ নিজের কাছেই লজ্জাজনক বলে মনে হয়েছে। যা-হোক একটা কিছু বোঝাপড়া হেস্তনেস্ত হয়ে জীবনযাত্রাটা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়ে না এলে এদিকে এগোনোও যাবে না বুঝেছে সে ... স্ত্রীর গায়ে জড়ানো হাত শিথিল হয়ে এসেছে তার নিজে থেকেই। যেন কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা ভয়েই ছেড়ে দিয়েছে সে।

তরলা কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বসে ছিল সেখানে, স্বামীর শয্যায়। তারপর আবার সহজভাবেই এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। কিছুই বলে নি, কোন মনোভাবই তার আন্দাজ করা যায় নি।

বুঝতে পারছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না দুর্গাপদ। হয়ত সেদিন ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি, হয়ত তরলাও তা আশা করে নি—কে জানে! হয়ত সাহস ক'রে আর একটু এগোলেই সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সেদিনও কুলোয় নি, তার পরেও না! কী হবে—কী এবং কতটা প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, কোন্‌দিকে যাচ্ছে তরলা—আসলে তার মতলবটা কি, তাই যে বুঝে উঠতে পারছে না!

BanglaBook.org

যে কুরূপা স্ত্রীকে সে দীর্ঘদিন অবহেলা করেছে, আদৌ তাকে কোনদিন জীবন সঙ্গিনী, শয্যাসঙ্গিনী করবে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ ছিল বহুকাল—সেই স্ত্রীর সামান্য একটু মনোযোগ যে ওর কাছে এমন আরাধনার বস্তু হয়ে উঠবে—তার মনোভাব জানবার জন্যে যে ওর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না—তা কে ভেবেছিল!

অদৃষ্টের পরিহাস—না কী একটা কথা আছে না—নাটকে-টাটকে প্রায়ই ব্যবহার হয়—এও বোধহয় তাই। একেই বোধহয় অদৃষ্টের পরিহাস বলে—মনে মনে ভাবে দুর্গাপদ।

এমনিই যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করছিল, প্রমীলা সচেতন ক'রে দেবার পর থেকে সেটা সত্যিই দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল। আরও দিন দুই ভেতরে ভেতরে ছটফট করবার পর সে স্থির করল যে, মেজবৌয়ের পরামর্শই সে নেবে, ওপরপড়া হয়েই স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট করবে।

সেই দিনই রাত্রে, বাড়িটা মোটামুটি নিস্তব্ধ হয়ে এলে খাটের বিছানা থেকে নেমে এসে স্ত্রীর বিছানার পাশে, মেঝেয় বসল। তরলা জেগেই ছিল, স্বামীর এ নিঃশব্দ ও গোপন সঞ্চার সবই টের পেল সে। হয়ত সে অন্ধকারে চেয়েই ছিল এদিকে!

সে যে জেগে আছে দুর্গাপদও তা জানত। আজকাল অনেক রাত অবধি যে তরলা জেগে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সেটা অজানা ছিল না ওর কাছে। তবু তখনই সাহস হ'ল না কথা কইতে। অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ ক'রে বস রইল সে! কথাটা অপর পক্ষ থেকে শুরু হ'লে বেঁচে যায়। কিন্তু তা হ'ল না। তখন—বেশ কিছুটা সময় চুপ ক'রে বসে থাকবার পর—অতি সন্তর্পণে তরলার গায়ে একটা হাত রাখল। কোথায় হাত রাখবে—সেও একটা সমস্যা। একেবারে পায়ে হাত দিতে লজ্জা করে, অথচ সে যে ক্ষমাপ্রার্থী—তা ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশে হাত দিলে সেটা বোঝবার সম্ভাবনা কম। অনেক ভেবে সে হাঁটুর কাছটাতেই হাত দিল।

'এই শুনছ, জেগে আছ?'

হাতটা সরিয়ে দিল না তরলা, নিজের পাও সরিয়ে নিল না। খুব আস্তে হলেও —খুব স্পষ্টভাবেই উত্তর দিল, 'কি?'

ছোট ছেলে আর মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ—তবু তাদের দিকে, অন্ধকারেই যতটা সম্ভব, তাকিয়ে দেখে নিয়ে তেমনি চুপিচুপি বলল, 'আমাকে—আমাকে এইবারটি মাপ করো, আর কখনও এমন হবে না। এইবারটি শুধু বিশ্বাস করো আমাকে।'

প্রায় মিনিটখানেক চুপ ক'রে রইল তরলা। এসব ব্যাপারে অনভ্যস্ত দুর্গাপদর মনে হ'ল এক যুগ। গোটা বাড়িটা তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এত নিস্তব্ধ যে নিচে মহাশ্বেতার সামান্য নাক-ডাকার শব্দও এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আরও নানা বিচিত্র শব্দ হচ্ছে চারদিকে—ঝিঁঝিপোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক, দূরে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে তার একটানা আওয়াজের সঙ্গে ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ—এতকাল পরে এই যেন প্রথম শুনল দুর্গাপদ। গভীর রাত্রেও এত যে কোলাহল হয় চারদিকে—তা তো সে জানত না!

কিন্তু তরলা চুপ ক'রে ছিল এক মিনিটই। তারপর কেমন যেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কেন, তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে?'

এ আবার কি কথা! কী কথার কি জবাব এটা!

BanglaBook.org

রাগ করলে, অভিমান প্রকাশ করলে, তিরস্কার করলে বুঝতে পারত দুর্গাপদ—কিন্তু এ ধরনের কথার সুদূর গূঢ়ার্থ বোঝা তার সাধ্যাতীত। সে যেন ঘেমে উঠল দেখতে দেখতে।

অনেকবার এদিক-ওদিক চেয়ে, বারকতক মাথা চুলকে, খানিকটা আমতা-আমতা ক'রে বলল, 'না তা নয়—মানে সুবিধে অসুবিধে আর কি—আমরা ধরো অত কিছু অসুবিধে সুবিধের ধারও ধারি না—। তবে, মানে—অত রাখা-ঢাকা ন্যাকামির দরকারই বা কি, সবই তো বুঝতে পারছ, কাজটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, তা আমিও মানছি—অবশ্য করে ফেলেছি একটা ঝোঁকের মাথায়—তবু হাজার হোক আমি তোমার স্বামী তো—এইবারটির মতো আমাকে মাপ করো, এই তোমার পায়ে ধরছি!'

'ছিঃ!' এবার দুর্গাপদর হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে তরলা, 'পায়ে হাত দিও না, ছেলেমেয়ের অকল্যেণ হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—তোমার খুব দোষও দিই না। দোষ আমার অদৃষ্টের—সেইটেই বড়, মানুষের দোষ ধরতে গেলে আমার বাপ-মায়ের দোষ, তোমার বৌদিদের দোষ। আমার মতো কালো কুচ্ছিতকে এনে তোমার পাশে দাঁড় করানোই উচিত হয় নি তাঁদের। রূপের আশা মেটে নি বলেই ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াতে হয়—যেখানে সেখানে হ্যাংলাবিত্তি করতে যাও। আগে থেকেই করছিলে, মেজদি জানতেনও —জেনে-শুনে, তাঁর রূপে-গুণে যে মজেছে, তার বৌ ক'রে আমাকে আনা তাঁর উচিত হয় নি। হয়ত ইচ্ছে ক'রেই এনেছেন, তুমি চিরদিন হাতে থাকবে বলেই—কিন্তু আমিও তো মানুষ, আমার কাছে আমার জীবনের, আমার সুখ-দুঃখের দাম আছে। সেটা উনি ভেবে দেখতে পারতেন। কালো কুচ্ছিত বলে স্বামীর ভাগ ছেড়ে দেব—এটা ভাবা ওঁদের উচিত হয় নি।... সব সময় কিছু আয়নাও বাঁধা নেই মুখের সামনে যে নিজের চেহারার কথাটা অষ্টপ্রহর মনে পড়বে!'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল তরলা। বোধ হয় অবাধ্য চোখের জল সামলে নিতেই। এই স্বামীর সামনে কোন প্রকারে দুর্বল হয়ে পড়া, ভেঙ্গে পড়া চলবে না। তার চেয়ে লজ্জার বা ঘেন্নার কথা আর কিছু নেই।...

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কণ্ঠস্বরটা আগের মতোই আবার নির্লিপ্ত ও ভাবলেশহীন করে নিয়ে বলল, 'যাও, তুমি শুতে যাও। ভয় নেই—আমি এখনই মরছি না। প্রাণের মায়া নয়—যাদের এ সংসারে এনেছি তাদের অন্তত একটুখানি বড় ক'রে দিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলেই মরব না। বেঁচেও থাকব, তোমার সংসারের কাজকর্মও করে যাব ঠিক ঠিক, কোন হুকুম থাকলে জানিও—তাও তামিল করব, কিন্তু তার বেশি আর কিছু আশা ক'রো না। ভালবাসা—? আমার মনে হয়—স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় স্ত্রী যদি স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে না পারে তো সেখানে ভালবাসা সম্ভব নয়, অন্তত স্ত্রীর দিক থেকে তো নয়ই। আর সবই তোমাকে দিতে পারব—কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধা আলাদা জিনিস সেটা মন থেকে আসে। সেটা বোধ হয় আর আসবে না। আজ এই কাণ্ডটা ঘটেছে বলে নয়, বহুকালের বহু আচরণে সে ভক্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছ তুমি।... তবে তুমি তো কখনও এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাও নি, আজই বা ঘামাতে যাচ্ছ কেন? প্রয়োজনের সময় কাছে টেনেছ, প্রয়োজন হ'লেই আবার টেনো—কিছু অসুবিধে হবে না।... তোমার খাচ্ছি পরছি, তোমার কাজে ক্রুটি হ'লে চলবে কেন?'

কথা শেষ করে সে এবার খুব সহজভাবেই, ছেলের যে হাতটা এদিকে এসে পড়েছিল সেটা সরিয়ে দিয়ে—তার দিক ফিরেই শুয়ে পড়ল। চিরদিনই কাপড়জামা গুছিয়ে জড়িয়ে

BanglaBook.org

শোওয়া অভ্যাস তার, আজও তাই শুয়ে ছিল, তবু একবার হাত বাড়িয়ে পায়ের দিকের কাপড়গুলো টেনে নামিয়ে দিল—কিন্তু তারপরই একেবারে নিথর হয়ে গেল। ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে, তা বোঝবার কোন উপায় রইল না।

দুর্গাপদ হতভম্বের মতো সেইখানেই বসে রইল অনেকক্ষণ। প্রথমটা সত্যিই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তরলা যে এত কথা বলবে, এত কথা যে বলতে পারে—সেইটেই আশা করে নি সে। এ ধরনের বক্তব্যও তার কাছে একেবারে নতুন, অপ্রত্যাশিত। এর পুরো অর্থটাও তার বোধগম্য হ'ল না হয়ত। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটতেই সে জায়গায় দেখা দিল অপরিসীম ক্রোধ। মুখের ওপর যেন চাবুক খেয়েছে সে—সত্যি সত্যিই যেন তেমনি জ্বালা করছে মুখটা। স্ত্রীর কাছ থেকে এ রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় সে, এরকম কথাতেও না। অপমানের আঘাতে তাই দারুণ রোষই সৃষ্টি হবার কথা। এক এক সময় মনে হ'তে লাগল যে ঐ মুখখানা নোড়া দিয়ে কিম্বা লাথি মেরে ভেঙ্গে দেয় সে—এই তেজের উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেয় এখনই।

'ওঃ—', মনে মনে বলতে লাগল সে, 'একটু এদিক-উদিক কি করেছি তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে। পুরুষমানুষ অমন কত কী করে। সেকালে যে বামুনের ঘরে পঞ্চাশ-ষাটটা সতীন নিয়ে ঘর করতে হ'ত—তার বেলায়! তেজ, তেজ দেখাতে এসেছেন আমার কাছে,এখনও ইচ্ছে করলে আমি ওর মতো বৌ দুশো পাঁচশটা এনে জড়ো করতে পারি তা জানে না! মেয়েছেলে হ'ল জুতোর জাত, পায়ের নিচে না রাখলে ঢিট থাকে না। হুঁ!'

কিন্তু মনে মনে যতই গজরাক, মুখে একটি কথাও বলতে পারল না সে। মুখ ভেঙ্গে দেওয়া তো দূরের কথা, গায়ে হাতটা পর্যন্ত রাখতে পারল না আর। কেন যে পারল না, কী যে হ'ল তাও বুঝতে পারল না। কোথায় একটা সঙ্কোচ, নাম্-না-জানা একটা সমীহের ভাব তাকে অনড় ক'রে রাখল।

খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে দুর্গাপদ এক সময় গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। তখনও তার রাগটা কমে নি, রুদ্ধ আক্রোশে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল যে, যার জন্যে এত কাণ্ড, এবার থেকে তাই করে বেড়াবে সে। যা-খুশি করবে, যেখানে খুশি যাবে। রীতিমতো বেলেল্লাগিরিই করবে সে, দরকার হয় তো বেশ্যাবাড়িও যাবে, দেখবে কে ঠেকায়। কী করতে পারে তার ও মাগী, দেখে নেবে সে।....

বহুরাত অবধি তারও ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে তেমনি নিষ্ফল শব্দহীন আস্ফালন ক'রে যেতে রাগল। কিন্তু যতই ভেতরে ভেতরে গজরাক সে, যতই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিক—মনের মধ্যে যেন কিছুতেই কোন জোর পেল না। বাইরে চলে গেছে, দয়ার পাত্রী কেমন ক'রে দয়াধাত্রীর আসনে উঠে গেছে—কিছুতেই আপাতবাধ্য শান্ত সহিষ্ণু স্ত্রী তার যেন হঠাৎ কেমন ক'রে হাতের বাইরে নাগালের আর যেন তার ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানে এটা কেমন ক'রে হ'ল।

সেই সমস্যাটাই মস্ত ব্যর্থ আস্ফালনের পিছনে মনের অবচেতনে তাকে পীড়িত করতে লাগল, বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না দুর্গাপদ।

BanglaBook.org

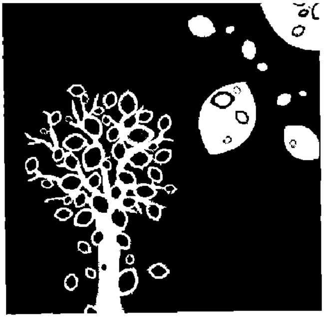

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখেই কথাটা বলেছিলেন শ্যামা। বোধহয় না বলে থাকতে পারেন নি বলেই।

বিনতা পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল নিতান্ত সাধারণভাবেই —শুধুমাত্র সামনের ব্যক্তিটিকে শোনাতে—কিন্তু তাতেই তার কথাগুলো যে সামনের অন্তত দু বিঘের বাগান ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। চেঁচিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে ছাড়া যেন সে কথাই কইতে পারে না।

'এ সম্বন্ধে বহুবার তাকে সতর্ক করেছেন শ্যামা, তিরস্কার করেছেন, কঠিন ব্যঙ্গে বিঁধতে চেয়েছেন—কিন্তু কোন ফল হয় নি। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল মেয়েটা বুঝি শুধুই 'বক্তার' অর্থাৎ বেশি কথা বলে, বা সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে কথা না কয়ে থাকতে পারে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল গলাও তার কম নয়। আর নতুন বৌয়ের যে অত চেঁচানো বা অত কথা বলা অশোভন—একথাটাও তার মাথায় যায় না কিছুতে।

সেদিনও একটু আগেই শ্যামা বলেছেন, 'আমি তো নশো পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে নেই বৌমা—সামনেই আছি, তবে অত গলা বার করছ কেন?... নতুন বৌয়ের গলা পাশের লোকও ভাল শুনতে পাবে না—এই ছিল আগেকার নিয়ম। বৌয়েরা শ্বশুরবাড়ি এসে একটু চড়া গলায় কথা বললে তার নিন্দে হত, বেহায়া বলত সকলে। এখন অবিশ্যি অতটা নেই, তবু এত বাড়াবাড়িও কেউ বরদাস্ত করে না। এরই মধ্যে পাড়ায় বেহায়া নাম রটে গেছে তোমার। কেন—একটু আস্তে কথা বললে কী হয়? আমাকেই তো বলছ, ও পাড়ার ভগবতী গয়লাকে তো বলছ না বাছা।'

'ওমা দুটো কথা কইব—তাও বর নয়, কোন পরপুরুষ নয়—শাশুড়ীর সঙ্গে বসে কথা বলা—অত চেপেই বা বলব কিসের জন্যে? বলি অন্যায় অপরাধ তো কিছু করছি না। এতে আবার বেহায়া বলাবলির কি আছে! আর বলে—যে বেটা-বেটিরা বলে যে তারা নিজেদের মুখেই পাইখানা বসাবে আদের কথা আমি গেরাহ্য করি না।'

বলা বাহুল্য এবার গলা বরং আরও চড়া। যেন সে বেটাবেটিরা পথের ওপারে কোথাও বসে আছে—তাদের শুনিয়েই বলতে চায় সে।

একটু দম নিয়েই সে আবারও বলল, 'আপনি কিন্তু বেশ বলেন আহিরি। হি হি, হাসি পায় আমার শুনলে! বললেন কিনা, নতুন বৌ কথা বলবে পাশের লোকেও শুনতে পাবে না। হি হি—তবে আর কথা বলাই বা কিসের জন্যে, পাশের লোকেও যদি না শুনতে পায়? কাউকে না কাউকে শোনাবার জন্যেই তো বলে মানুষ!.... সেকালের লোকগুলো অমনি বোকা ছিল সব!'

তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ ক'রে হাই তুলে বলল, 'আর নতুনই বা কি, দেখতে দেখতে তো পেরায় এক বছর ঘুরে এল, এখন তো আমি পুরনোর সামিল, আমার তো ঘর-সংসার বুঝে নেবার কথা এতদিনে!'

BanglaBook.org

হাল ছেড়ে দেন শ্যামা। হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিনই। অনেক বৌ-ঝি দেখেছেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে তাঁকে—তার মুখের কাছে দাঁড়াতে তো বোধহয় স্বয়ং নারদমুনিও ভয় পায়—কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখেন নি। এ বৌ সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। এর সঙ্গে তিনি যেন কিছুতেই পেরে ওঠেন না। ঝগড়া করলে তার সঙ্গে ঝগড়া করা যায়, তর্ক করলে যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডন করা চলে; এ সে সব কিছুই করে না, একেবারে সোজাসুজি যেন উড়িয়ে দেয় তাঁকে , সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। আর এমন ভাবেই করে যে মুখের কথাতে আর ওকে শাসন করা যায় না সে সময়। ওর একমাত্র ওষুধ হ'ল সেই সময় ঘা-কতক দেওয়া বা মুখখানা নোড়া দিয়ে থেঁতো করে দেওয়া। কিন্তু সেটা ঠিক ইচ্ছে করে না। চক্ষুলজ্জায় বাধে। অভ্যাসও তত নেই তাঁর, চট ক'রে হাত-পা চলেও না। নিজের ছেলেমেয়েদের গায়েই কখনও হাত দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না তেমন। দিলে খুব অল্প, কদাচিৎ কখনও। তাছাড়া খোকা আর তরু তাঁকে চিরদিনের মতো ছেড়ে গেছে এই উপলক্ষ করেই। কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে তাঁর, আর কারুর গায়ে হাত তুলতে যেন সাহস হয় না।

আরও একটা কথা। একবার একদিন শাসন করলে বাগ মানবে—তেমন মেয়ে নয় এ। প্রতিদিন দিনরাত কিছু কেজিয়া করা যায় না। ছোটলোকদের ঘরেও তা করে না কেউ, করলে তাদের ঘরেও নিন্দে হয়। তাঁর এ তো বামুনের ঘর, ভদ্রলোকের ঘর।

তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতোই সব অসৈরণ হজম করতে হয়। আজও আর বেশি ঘাঁটালেন না শ্যামা। আপন মনে কাজ ক'রে যেতে যেতে এক সময় নিতান্ত ভালমানুষের মতো প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা বৌমা, তোমার নাড়ী কেটেছিল কী দিয়ে জানো?'

'নাড়ী কেটেছিল, আমার? কি দিয়ে—তার মানে?... আপনি কী সব মজার মজার কথা বলেন না এক একসময়! আমার নাড়ী কেটেছিল কি দিয়ে তা আমি কেমন ক'রে জানব বলুন। তখন কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি কিছু হয়েছে যে দেখে রাখব।'

'তা বটে। সত্যি কথাই তো।... না, তাই জিগ্যেস করছিলুম।' আরও নিরীহকণ্ঠে বলেন শ্যামা।

কিন্তু ততক্ষণে বিনতার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে। সে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'কেন বলুন তো মা? ব্যাওরাটা কি?'

'না, ঐ যে বলে না—', পাতা চাঁচতে চাঁচতে বঁটির দিকে নজর রেখেই উত্তর দেন শ্যামা, 'যে চ্যাঁচারি দিয়ে নাড়ী কাটলে খুব চাঁচা-ছোলা পরিষ্কার গলা হয়। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। কথাটা মনে পড়ে গেল তাই—'

'ও, আমার গলার কথা বলছেন! সব্বরক্ষে! আমি বলি কী না কি ব্যাপার! ... তা কে জানে বাপু কী দিয়ে চেঁচেছিল, —মা জানতে পারে হয়ত। আমি কোনদিন মাকে জিজ্ঞেসও করি নি।'

বলতে বলতেই কী একটা কথা মনে পড়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে যেন 'ওমা, সে বুঝি জানেন না—অনেককাল, বোধ-হয় অমন চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কথাই ফোটে নি যে! ওরা তো ভয় পেয়েই গেছল যে বোধহয় বোবাই হবো, জন্মে আর কথা ফুটবে না মুখে। মা নাকি খুব কান্নাকাটি করত সে জন্যে। তারপর মার কান্না দেখেই হোক আর নিজের ধম্ম ভেবেই হোক, কাকা কোন এক বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, সে ডাক্তার এসে গলার মধ্যেটা কম্‌নে কি চিরে দিতে তবে বুলি ফুটল!'

'তাই নাকি! তা সে কে ডাক্তার বৌমা, তার নাম কী?'

BanglaBook.org

'কে জানে বাপু, অতশত আমি খবর রাখি না। জিজ্ঞেসও করি নি কখনও। কাজ হয়ে বয়ে চুকে গেছে কবে—নিশ্চিন্তি। অত—কী কী বিত্তেন্ত তার চোদ্দপুরুষের নিকেশে আমার কি দরকার!'

'তা তোমার মার মনে নেই? কী তোমার কাকার? একটা চিঠি লিখে দ্যাখো না! ... নাম ঠিকানাটা কি, আর এখনও বেঁচে আছেন কিনা!'

'তা লিখতে পারি। কিন্তু সে ডাক্তার দিয়ে আবার আপনার কি হবে! কাকে দেখাবেন—বলাইকে?'

'না, বলাইকে দেখাব কেন, তোমাকেই দেখাব—।'

'আমাকে?'

ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় সে। এতক্ষণে বুঝি কি একটা সংশয় ঘনিয়ে আসে বিনতার মনে।

'দেখাব এই জন্যে যে, যিনি তোমার গলা চিরে বোল ফুটিয়েছিলেন, তিনিই এখন দেখে-শুনে সেটা সেলাই ক'রে আবার বোল বন্ধ করতে পারেন কিনা! তার জন্যে এমন কি যদি ষোল টাকা ভিজিট নেন্ সে ডাক্তার তো আমি দিতে রাজি আছি!'

দেখতে দেখতে ভীষণ আকার ধারণ করল বিনতার মুখ। গলা আরও এক পর্দা চড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কেন বলুন তো আমার বুলি বন্ধ ক'রে দেবেন! কিসের জন্যে!... এসব কি অলুক্ষুণে কথাবার্তা! আমি আপনার কি পাকাধানে মই দিয়েছি তাই শুনি!... আমার কথা যদি এত খারাপ লাগে—আমার সঙ্গে কথা কইতে আসেন কেন? কাল থেকে আর কথা কইবেন না—আমার কথা শুনতেও হবে না... বলে—না যাবে নগর না হবে ঝগড়!... তাও অসহ্যি লাগে ভেন্ন ক'রে দিন না। আপনার খারাপ লাগে বলে আমায় কি মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে নাকি?... ইল্‌লো!... আবদার মন্দ নয়। উনি যেন সাক্ষাৎ ভগবান এলেন একেবারে, কিম্বা খড়দর মাগোঁসাই!... ওঁকে তুষ্টি করতে জিভ কেটে দেব আমি! ... কেন, আমার গলার ওপরই বা এত নজর কেন, নিজের মেয়েদের গলা কি কিছু কম নাকি?... বট-ঠাকুরঝির গলা তো শুনি সেই রাস-তলা থেকে শোনা যায়! মেজ-ঠাকুরঝি যখন আসে তখন তো শুনেছি আরও এক কাটি সরেস —কাক-চিল বসতে পায় না বাড়িতে। —ওগো, শুনেছি সব—চক্ষে নাই বা দেখলুম, কন্যেদের গুণ শুনতে আর আমার বাকি নেই এর মধ্যে কিছু।... তার বেলা তো কিছু বলবার সাধ্যি হয় না। সে বুঝি সব ভাল। নিজের ময়লায় গন্ধ নেই—না? যত চোর দায়ে ধরা পড়ল বৌবেটি হতচ্ছাড়ি!... বাঃ, বেশ তো, বেশ বিচের যা হোক!'

আরও অনেক কথা বলে যায় সে, ঠিক প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষে সে গালাগালও দেয় ছড়া বেঁধে। বলতে বলতে গলার পর্দাও চড়ে, ক্রমশ যেন রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে সে। তার দিকে চেয়ে এমন কি শ্যামাও একটু ভয় পেয়ে যান যেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, মুখের দুই কষে ফেনাল মতো কী জড়ো হয়েছে—এমন কি, চুল-গুলোও যেন খানিকটা খাড়া হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। ভদ্রঘরের মেয়ের এমন উগ্র মূর্তি কখনও দেখেন নি শ্যামা—বস্তি-টস্তিতে ঝগড়া বাধলে হয়ত এই রকম দৃশ্য নজরে পড়ে।

ভয় পেলেও—বেশিক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। শেষে থাকতে না পেরে একসময় তিনি বলেন, 'তা বেশ তো, সে ফিরে আসুক, সেই কথাই ব'লো না বরকে। ভেন্ন হয়ে যেতেই ব'লো। তোমারও হাড় জুড়োয় আমারও হাড়ে বাতাস লাগে। তাছাড়া—সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু সুবিধেও হয়—তোমাদের দুজনকে খাওয়াতে পয়সাও তো কম খরচ হচ্ছে না আমার!'

BanglaBook.org

'অ! জানেন সে অক্ষ্যাম, জানেন সে ভেন্ন হয়ে মাগ-ছেলে পুষতে পারবে না, তাই বুঝি এত টিটকিরি মারছেন!' ভীষণতর হয়ে ওঠে বিনতার কণ্ঠ 'তা এত অক্ষ্যামই যদি জানেন, তবে বে দিয়েছিলেন কেন ঐ হাবাকালা ছেলের! যার এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই তার বে দিয়ে বৌ আনবার শখ জেগেছিল কেন প্রাণে।... না কি ভেবেছিলেন অক্ষ্যাম ছেলে কোনদিন কোথাও চলে যেতে পারবে না—তার বৌকে দু-পায়ে থ্যাঁতলাবেন মনের সুখে!... হুঁঃ! স্বপ্নেও ভাববেন না আমি সেই বান্দা! খাওয়া! ভারী তো খরচ করছেন খাওয়াবার জন্যে। জেলের কইদীরা এর চেয়ে ভাল খায়। দুবেলা দুমুঠো ভিক্ষের ভাত দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন একেবারে। সেই ভয়ে আমায় মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে!... কেন, কিসের জন্যে! অত সুখে আর রাধামণি বাঁচে না!... যদি ভেন্ন হই তো এটি জেনে রাখবেন যে সহজে ছেড়ে দোব না আমি, দস্তুরমতো খোরাকি আদায় ক'রে ছাড়ব। না দেন—জোর করে আদায় করব। দরকার হয় আদালতে গিয়ে দাঁড়াব—ছেলে চাকরি করে বলে ঠকিয়ে বে দিয়েছেন!'

শ্যামা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অসহ্য একটা ক্রোধে তাঁর হাত-পা কাঁপছে ভেতরে ভেতরে—কিন্তু কী করবেন, কী করে বাধা দেবেন একে, সত্যিই দু-চার ঘা কষিয়ে দেবেন কিনা—কিছুতেই ভেবে পেলেন না তিনি। এ যা মেয়ে, এ সব করতে পারে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এই প্রথম তিনি ঐন্দ্রিলার আগমন প্রার্থনা করতে লাগলেন মনে মনে। একমাত্র সেই বোধহয় পারে—এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করতে।

কিছুই বলতে পারলেন না শ্যামা, কোন প্রতিকারই তাঁর মাথায় এল না। এ ধারে কৌতূহলী প্রতিবেশীরা ইতিমধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে—কেউ কেউ সোজাসুজি বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এদিকে। ঐন্দ্রিলার কল্যাণে চেঁচামেচি ঝগড়া এ বাড়িতে নতুন নয়, তবু—এখন যে সে নেই তাও অনেকে জানে। বৌ আর শাশুড়ী থাকে শুধু—বলতে গেলে নতুন বৌ—সুতরাং এখনকার চেঁচামেচি কিছু মুখরোচক নিশ্চয়ই। এ কৌতূহলও তাই নিতান্ত স্বাভাবিক। ওদের দোষ দেন না শ্যামা। আর এও তিনি জানেন যে সে কৌতূহল বেশিক্ষণ দূরত্ব ব্যবধান বজায় রাখতে দেবে না। এখনই হয়ত বেড়ার আগড় ঠেলে কেউ কেউ ভেতরে ঢুকবে ব্যাপারটা ভাল ক'রে উপভোগ করতে। তাঁকে এবং বৌকে নানাবিধ উপদেশ দিতে শুরু করবে তারা এখনই। তাদের সেই বিদ্রূপ-শাণিত দৃষ্টি এবং আপাত -আন্তরিক সহানুভূতি থেকে আত্মরক্ষা করতেই যেন শ্যামা হাতের কাজ সরিয়ে রেখে পিছন দিককার বাগানে চলে গেলেন—একরকম রণে ভঙ্গ দিয়েই। আশা যে, এই বিজয়-গৌরবের তৃপ্তিতে এবং একা একঘেয়ে বকে যাবার ক্লান্তিতেই এবার চুপ করবে বৌ।

সত্যিই বিনতা চুপ করতে বাধ্য হ'ল তখনকার মতো। যতবড়ই যোদ্ধা হোক—প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। কিন্তু সেটা শুধুই নিরুপায়ের শান্তি। মনে মনে একটা ভয়ঙ্করতর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। কান্তি বাড়ি ফিরলে সে একটা হেস্তনেস্ত বিহিত যা হোক করবেই—এই স্থির প্রতিজ্ঞা তার।

কিন্তু তার সব প্রতিজ্ঞা এবং প্রস্তুতি ভেঙ্গে দিল কান্তিই।

সে বাড়ি ফিরল প্রবল জ্বর এবং মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। কাজ করতে করতেই জ্বর এসেছে, তার ওপর জোর করে কাজ করতে গিয়ে বেড়ে গেছে আরও। আর সেই জন্যেই বোধহয় এত যন্ত্রণা। তখন মালিক জোর ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে। ছাপাখানারই একজন সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। গাড়িভাড়ার পয়সা তিনিই দিয়ে

Banglabook.org

দিয়েছেন—'উদিগের টেরাম ভাড়া সুদ্দু'। ফেরার পয়সাও হিসেব করে দিয়েছেন। আর কিছু লাগবে না।

কান্তির বরাত ভাল। বদ্ধকালা হয়েও মনিবের সুনজরে পড়ে গেছে,—ওর সহকর্মীর কণ্ঠে সেই প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাটুকুও চাপা রইল না।

তা সে যাই হোক—ঝগড়াটা তখনকার মতো মুলতুবী রাখতে হ'ল বিনতাকে। কারণ জ্বরটা খুবই বেশি। শ্যামা যখন কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বরের পরিমাণটা অনুমান ক'রে নিয়ে মাথা ধুইয়ে দেবার আয়োজন করলেন, তখন তাকে ভালমানুষের মতো জল-গামছা-কলাপাতা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সাহায্যও করতে হ'ল যথাসম্ভব।

কান্তির জ্বর পরের দিনও কমল না, তার পরের দিনও না।

তখন চিন্তিত হয়ে শ্যামা ফকির ডাক্তারকে ডাকতে বাধ্য হলেন। ফকির এসে মিক্স্চার এবং কী একটা পুরিয়ে দিয়ে বলে গেলেন, 'সাবধানে নজর রাখবেন, জ্বরটা বাঁকা দাঁড়াতে পারে।'

এবার বিনতারও মুখ শুকোল। যার জোরে তার জোর—সে-ই যদি অসহায় হয়ে পড়ে থাকে এমন ক'রে, তাহ'লে আর বিক্রম দেখায় কোথায়? সে অন্যলোকের অভাবে ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে বোধ করি বাসনগুলোকেই শুনিয়ে শুনিয়ে আপসায়, 'যার কপাল খারাপ হয় তার দেখি সব দিকেই মন্দ। অসুখ-বিসুখ জ্বরজারি হয় লোকের—দুদিন খাড়া উপোস দিয়ে পড়ে থাকে—জ্বর ছেড়ে যায়, নিশ্চিন্ত! এঁর যখনই হবে বাঁকা! ... একবার তো শুনেছি এই জ্বর থেকেই কান দুটো গেছে—এবার বোধহয় চোখ দুটোও যাবে! ব্যস্—তবেই আর কি, সুখের ওপর স্বগ্গবাস হয় একেবারে! ভরাভরতি চোদ্দ পোয়া ভাগ্যি উপ্চে পড়ে। ঐটুকু শুধু বাকি আছে দুদ্দশা পুরো হ'তে। ঝাড় মারো বরাতের মুখে—কেন, আমার বরাতেই বা এমন বে হবে কেন? কৈ আর কারুর তো এমন বে হ'তে শুনি নি। ভারী তো ভাতার—পনেরো টেক্লো মাইনের চাকর—তাও গোটা একটা আস্ত মনিষ্যি পেলুম না গা! মুখে আগুন বরাতের, জ্যান্ত নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় এমন বরাতের মুখে। এবার আর একটা অঙ্গ পড়লেই তো বুঝেতে পাচ্ছি মালা হাতে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে!'

শ্যামা ছেলের কাছে বসেছিলেন, অতটা শুনতে পান নি, ওধারের ঘাট থেকে মহাদেবের মা শুনতে পেয়ে ধমক দিয়ে উঠল, 'ওকি হচ্ছে গা বৌদি, ঘরে রোগা ভাইটা আমার পড়ে ছটফট করছে, আর এখানে বসে বসে তুমি তার ষাট বাচাচ্ছ! ওসব কি অলুক্ষুণে কথাবাত্তারা!'

অপ্রতিভ হয়ে তখনকার মতো চুপ ক'রে যায় বিনতা।...

জ্বর পাঁচ-ছ দিন পরে একটু নরম হয়ে আসে। ফকির ডাক্তার অভয় দিয়ে যান, 'না, যা ভেবেছিলুম তা নয়—টাইফয়েড-টয়েড কিছু নয়। হয়—ওরকম হয়। আজকাল আকছার হচ্ছে এই রকম একজ্বরী-মতো। যাই হোক—এবার আস্তে আস্তে ছাড়বে। তবে ছাড়বার মুখটাতে একটু হুঁশিয়ার থাকবেন, দুর্বল শরীর তো, হঠাৎ সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে। সেই সময়টায় একটু গরম দুধ কি একটু গরম চা—নিদেন গরম চিনির জল খাইয়ে দেবেন—'

ফকির ডাক্তার পাসকরা ডাক্তার নন, এক বড় ডাক্তারের কাছে কম্পাউন্ডারী করতে করতে ডাক্তারখানা খুলে বসেছেন। তা অবশ্য হয়েও গেল অনেক দিন। আগে আদৌ ভিজিট নিতেন না, পরে আট আনা করেছিলেন, এখন নাকি এক টাকা ভিজিটের কম কারও কাছে যান না। তবে শ্যামা বহুদিনের মক্কেল বলে এখনও আট আনা নেন, তাও সব দিন দিতে পারেন না শ্যামা, দুদিন ভাঁড়িয়ে একদিন দেন। কিন্তু ফকির কিছু বলেন না—

BanglaBook.org

ডাকলেই আসেনও। ওষুধের দাম ওঁর কাছেই সবচেয়ে কম। অনেক ভেবেই তাঁকে ধরে আছেন শ্যামা।

লোকমুখে খবর পেয়ে বিনতার মা একদিন এলেন জামাইকে দেখতে। এর আগে আর কোন দিন আসেন নি তিনি। শ্যামা অবশ্যই যত্ন-আত্তির ত্রুটি করলেন না, বাজার থেকে বলাইকে দিয়ে মিষ্টি আনিয়ে দিলেন, মায় চা-খাবার অভ্যাস আছে শুনে এক পয়সার গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট আনিয়ে বিনতাকে দিয়ে চা করিয়েও দিলেন।

অত দূর থেকে খুঁজে খুঁজে নতুন জায়গায় আসতেই ভদ্রমহিলার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগেই মাত্র এসে পৌঁচেছেন তিনি। তাই সন্ধ্যার পর বিদায় নেবার প্রস্তাব করতেই শ্যামা সরাসরি তা নাকচ ক'রে দিলেন।

'তা কখনও হয়! এই অন্ধকারে অজানা অচেনা জায়গায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি কখনও।...ও বাড়ির কোন নাতিটাতি এসে পড়লেও না হয় সঙ্গে দিতুম, কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসত। ...আর তার অত দরকারই বা কি, গরীব বেয়ানের কাছে এসে পড়েইছেন যখন—তখন কষ্টসৃষ্ট ক'রে একটা রাত না হয় কাটিয়েই যান না!'

অগত্যা বিনতার মাকে রাজি হ'তে হ'ল। তবে তিনি হাতজোড় ক'রে বললেন, 'কিন্তু ভোরবেলাই ছেড়ে দেবেন বেয়ান, মানে এখানে তো আর—'

'সে আমি জানি। নাতি হয় নি এখনও—এখানে ভাত খেতে বলবই বা কেন?'

কুটুম্ব মানুষ—এই প্রথম এসেছেন। তাঁকে আর কিছু ক্ষুদ-ভাজা কি চাল-ভাজা খাইয়ে রাখা যায় না। অগত্যা শ্যামাকে গিয়ে উনুন জ্বেলে রুটি গড়তে বসতে হ'ল। রুটি আর ভালরকম একটা কিছু তরকারি, ডালনা জাতীয়। বিনতা রাঁধে মন্দ নয়, কিন্তু বৌয়ের মায়ের জন্যে তাঁর সামনেই বৌকে রাঁধতে পাঠানো অনুচিত, তাছাড়া তাদের চিরদিন কয়লার জ্বালে রাঁধা অভ্যাস—কাঠ কি পাতার জ্বালে রুটি ভাল গড়তে পারেও না সে। রুটির পাটও কম এ বাড়িতে—শেখার সুযোগও মেলে নি। সুতরাং শ্যামাকে নিজেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে। বিনতাকে এই অবসরে ঘরদোরের পাট সেরে নিতে বললেন, বিছানা একটা বাড়তি চাই আজ, বেয়ানের জন্যে। আজ আর ছেলের কাছে বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিতেই সে অনেকটা ভাল আছে আজ, তার ওপর শুশ্রূষা করার লোকও আছে আর একজন। তার শাশুড়ীই কাছে বসে বাতাস করছেন, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মিছিমিছি আর একটা লোক সেখানে জোড়া হয়ে বসে থেকে লাভ কি?...

শ্যামা একমনে বসে রান্না করছেন, হঠাৎ বিনতা এসে পিছনে থেকে দারুণ্ উত্তেজিতভাবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে উঠল, 'আমি এ সব কিন্তু ভাল বুধতি না মা, আপনি দা হয় এর একটা বিহিত করুন!'

বিনতার উচ্চারণ এমনিই কেমন একটু আধো-আধো—উত্তেজিত হ'লে আরও জড়িয়ে যায় কথাগুলো। সে উত্তেজনার কারণও যে খুব বেশি—তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ বিছানা করতে করতেই ছুটে এসেছে—হাতে তার এখনও বিছানাঝাড়া খ্যাংরাটা ধরা।

শ্যামা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী ভাল বুঝছ না বৌমা, কী হয়েছে?'

'না, না, মা-ই হোক আর যা-ই হোক, সত্যি কথা বলব তার অত ঢাকাঢাকি কিসের। মার কি উচিত অত বড় জামাইয়ের মশারীর মধ্যে ঢুকে তার মাথা টিপে দেওয়া? হ'লই বা শাশুড়ী—এমন কি বয়স হয়েছে মার!... না না, আপনি বারণ করুন মা!'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শ্যামা। এ বধূ সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়ের বোধ করি শেষ হবে না। বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা নমস্কারের ভঙ্গি করে বললেন, 'ধন্যি মা ধন্যি, তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!...আমার গলা কেটে ফেললেও আমি গিয়ে এমন

Banglabook.org

কথা তোমার মাকে বলতে পারব না, বলতে হয় তুমিই বল গে।...ওঃ, আমার কান্তির বরাতকেও বলিহারি যাই—কোন, নির্জনে বসে এমন বৌয়ের জন্যে তপস্যা করেছিল!'

মেঘের মতো অন্ধকার মুখ ক'রে বিনতা চলে গেল দুপ দুপ ক'রে পা ফেলতে ফেলতে, 'বলবই তো, বেশ—না হয় আমিই বলব। অত ভয় কিসের? নিজের সোয়ামীর ভাল-মন্দর কথা যেখানে, সেখানে অত ঢাক্-ঢাক্ চক্ষুলজ্জা করতে গেলে চলে না। খারাপ দেখায় বলেই বলা! তা নয়—সবই আমার দোষ। ভাল কথা বললেও দোষ।..তপিস্যে—কী তপিস্যের বর রে আমার!'

অনেক্ষণ পর্যন্ত চাপা গলায় গজগজ করে সে। তবে শেষ পর্যন্ত—কে জানে কেন—কান্তির ঘরের দিকে আর যায় না, ও ঘরে গিয়েই বিছানা করতে শুরু করে আবার।

॥ ২ ॥

অভয়পদর পরে অম্বিকাপদর পালা। অভয়পদর চাকরি যাবার মাসকতক পরে তাকেও হিসেবে-নিকেশ চুকিয়ে ঘরে এসে বসতে হ'ল। রিটায়ার করার কথা তার নাকি আরও আগেই—বহু কৌশল ক'রে নানা ব্যক্তিকে ধরে-পাকড়ে, ক্ষেত্রবিশেষে দু'চার টাকা ঘুষ খাইয়ে এতকাল টিকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আর তা কিছুতেই বাঁচানো গেল না। এবার সত্যিসত্যিই গেল চাকরিটা।

অবশ্য তাতেও কোন সান্ত্বনা পেল না মহাশ্বেতা। কারণ চাকরি যাবার কিছুদিন আগেই মেজকর্তা তার বড় ছেলেটিকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এখন শোনা গেল মেজটিরও একটা হিল্লে হবে। খোদ ছোটসাহেব নাকি কথা দিয়েছেন—কোথাও একটা টুল খালি হলেই বসিয়ে দেবেন তাকে।

সুতরাং জ্বালা বেড়েই গেল বরং। মহাশ্বেতার একটি ছেলেরও হিল্লে হয় নি আজ পর্যন্ত। কেষ্টপদর বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে প্রস্তাবটা মুখে আনতে পারে নি মহাশ্বেতা। শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উচ্চ ধারণা থাকলেও এটা সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার বা তার স্বামীর হাতে যখন একটি পয়সাও নেই, তখন তার তরফ থেকে আর কোন খরচা বাড়ানোর কথা মুখে আনা উচিত নয়।

সে অম্বিকাপদর প্রথম ছেলেকে চাকরিতে ঢেকাবার সময় 'শয়তান', 'কুচক্কুরে', 'একচোখো' প্রভৃতি বলে গালাগাল দিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিল, কিন্তু পরেরটির আসন্ন চাকরির সংবাদে একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। তার মানে ওরা সব দিক দিয়েই গুছিয়ে নিলে। চাকরি—তা সে যেমনই হোক—মহাশ্বেতার কাছে চাকরি মানেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান—চাকরি মানেই—নিরাপদ নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছন্দ জীবন; বিয়ে, ছেলেপুলে হওয়া, আবার তাদের মানুষ হয়ে ওঠা—একটার পর একটা আপন নিয়মেই চলবে।

ওদের সব হ'ল—তারই কিছু হ'ল না। কেন হ'ল না তা অবশ্য প্রথম প্রথম যথেষ্ট বোঝাবার চেষ্টা করেছে অম্বিকাপদ। তার ছেলেরা তবু কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ম্যাট্রিক পাস করতে না পারুক, ঘষে ঘষে কোনমতে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত উঠেছে, ইংরেজি হরফ চেনে, সাধারণ দু'-একটা কথার মানে বোঝে—ইংরেজি হরফে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারে। মহার ছেলেরা কিছুই জানে না, বাংলাও পড়তে পারে না ভাল করে। ওদের মধ্যে একমাত্র ন্যাড়াই যা চার-পাঁচ ক্লাস পড়েছিল ইংরেজি ইস্কুলে। এ অবস্থায় ওদের কোন অফিসে চাকরি হওয়া অসম্ভব। বড়বাবুই হোক আর খোদ সাহেবই হোক—এখন আর কারুর দ্বারাই সম্ভব নয় এমন অঘটন ঘটানো। এক বেয়ারার চাকরি হ'তে পারে, পনেরো টাকাতে ঢুকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত মাইনে। —ওতেই জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু

BanglaBook.org

তাও, অম্বিকাপদ যেখানে সসম্মানে এতদিন 'বাবু'র কাজ ক'রে এসেছে, যেখানে তার ছেলেরা 'বাবু'র কাজে বসেছে বা বসবে, —সেখানে নিজের ভাইপোদের সত্তিকজাতের এঁটো গেলাস ধোবার জন্যে বেয়ারার কাজে লাগাতে পারবে না সে।

কিন্তু এসব কথা মহাশ্বেতার বোঝার কথা নয়। তখনও বোঝে নি, এখনও বুঝল না। তখন নিষ্ফল আক্রোশে গজরেছিল এখন কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। জিতে গেল ওরা, জিতে গেল! একপুরুষেই নয়, পুরুষানুক্রমেই ওদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে তাকে বা তাদের। বড় হয়েও কোনদিন বড়র সম্মান পেল না সে। আর কোনদিন পাবে না। কোথায় একটা ব্যর্থ আশা পোষণ করেছিল মহাশ্বেতা এতদিন যে, একদিন না একদিন এই অবিচারের প্রতিকার হবে, একদিন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে সে, নিজের প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কি ক'রে সেটা ঘটবে তা সে জানে না, কখনও তলিয়ে ভেবে দেখে নি, যা হোক ক'রে হবেই কোন উপায়—এই আশ্বাসটুকু ধরে ছিল শুধু। সেই আশাতেই আরও সে পাগলের মতো টাকা ধার ক'রে এনে অভয়পদর হাতে তুলে দিয়েছিল অপরকে ধার দেওয়ার জন্য, অকল্পিত সুদের লোভে। অন্তত টাকাও যদি খানিকটা হাতে আসত তা হ'লে দেখে নিত সে ওদের সামনে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে পারত। তাও হ'ল না, ভগবান চিরদিনই ওদের দিক টেনেছেন, আজও টানছেন।

এক-একবার এই অসহায় নৈরাশ্য—এই দিকদিশাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা যেন নিজে আর বইতে পারে না মহাশ্বেতা—ছুটে যায় স্বামীর কাছে, 'ওগো এদের কথাটা কি ভাবছ? কি গতি হবে এদের? চিরকালই কি ভিক্ষের ভাত খেয়ে কাটাবে? সেও যতদিন তুমি আছ, তারপর তাও জুটবে কি?'

অভয়পদ আজকাল অনেকটা সামলে উঠেছে, প্রথম দিককার মতো স্থবির হয়ে আর বসে থাকে না—বাগানে টুকটাক এটা-ওটা ক'রে বেড়ায়। বলতে গেলে সারা দিনটাই বাগানে কাটায়, সন্ধ্যার পর এসে নিজের চিরাভ্যস্ত বেঞ্চিটাতে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারেই শুয়ে থাকে। তবে ঘুমোয় না যে—সেটা টের পায় এরা। বহু রাত অবধিই ঘুমোয় না। হয়ত বা সারারাতই জেগে থাকে এক একদিন।

স্ত্রীর আকুল প্রশ্নেও তার অবিচল স্থৈর্য নাড়া খায় না। উদাস স্তিমিত চোখ দুটো অপর কোন বস্তুর ওপর নিবদ্ধ ক'রে জবাব দেয় সে, 'কী জানি। আমি আর কি করব বলো, আমার আর কি হাত!'

'তাহ'লে কি এরা উপোস ক'রে মরবে?'

'ভাগ্যে থাকে তাই মরবে। আমি আর কি তাতে বাধা দিতে পারব? ভাগ্যই সব। মানুষের চেষ্টাতে যে কিছু হয় না তা তো দেখলেই।'

'তা কোন কারখানা-মারখানাতেই না হয় ঢুকিয়ে দাও না। মেজকর্তা তার নিজের আপিসে ছেলেকে ঢুকিয়ে ব্যবস্থা করে তবে বেরুলো। তোমাদের তো আসলে কারখানাই—তুমি তো সেখানে ছিলে এতকাল—সেখানে ঢোকাতে পারবে না? আজকাল তো অনেক ভদ্দরঘরের ছেলে শুনেছি লোহাপেটার কাজ করছে।'

'সে আগে চেষ্টা করলে হ'ত। আমি থাকতে থাকতে বললে হয়ত এক-আধটাকে ঢোকাতে পারতুম। তাও ওরা পারত না অবিশ্যি। লোহা পিটিয়ে খেটে খাবার ক্ষমতা ওদের নেই। তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারত। কিন্তু এখন আর আমার কোন হাত নেই। আমার পুরনো সাহেবরা সবাই চলে গেছে। তারা থাকলে আমার চাকরিই বা যাবে কেন? পুরনো বড়বাবুরাও কেউ আর নেই। যারা আছে তারা আমার কথা রাখবে না।'

BanglaBook.org

বক্তব্য শেষ ক'রে নিতান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবেই আবার নিজের কাজে মন দেয় অভয়পদ। যেন আর কোন স্বল্পপরিচিত কারও ভবিষ্যতের কথা, কোন পরস্যাপি পরের প্রসঙ্গ তুলেছিল মহাশ্বেতা। চিরদিন এই রকম। কখনও ওর দিকে, ওর ছেলেদের দিকে তাকাল না মানুষটা। কখনও ওদের কথা ভাবল না। স্ত্রী না হয় শত্রু, না হয় মনের মতো হয় নি—এরা তো নিজের ছেলে। কে জানে, কোনদিনই স্বামীর মনের তল পেল না সে।

নিজের মনের তল অভয়পদই পেয়েছে কি কোনদিন?

ভবিষ্যতের চিন্তা তার স্বভাববিরুদ্ধ, কোনদিনই করে নি—আজ নতুন করে শুরু করবে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু অতীতের চিন্তাও তো আগে কোনদিন করে নি, সেটা কেন এখন নতুন করে পেয়ে বসলে তাকে?

এক একসময় নিজেই অবাক হয়ে যায়—নিজের মনের চেহারা দেখে। গীতা পড়ে নি সে বহুদিন অবধি, গীতা কেন—কোন বই-ই বিশেষ কখনও পড়ে নি—পরে এক-আধদিন দু'চারজনের কাছে গীতার কথা শুনে একটা বাংলা পদ্য গীতা যোগাড় ক'রে পড়েছে, এখনও পড়ে মধ্যে মধ্যে। না, সে সব কিছু নয়।

—নিজের মনে মনে, কবে যেন কোন্ সুদূর কৈশোরে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল সে, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নির্লিপ্ত জীবন যাপন করবে। সংসারে থাকবে কিন্তু তাতে বদ্ধ হবে না। পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। হাঁস যেমন জলে থাকে অথচ জল তার দেহের কোথাও লাগে না—তেমনই থাকবে সে সংসারের সহস্র আসক্তির মধ্যে।

এ কি কারও কথা শুনে কি কোন উপদেশে হয়েছিল? কে জানে, আজ আর তা মনেও নেই। সম্ভবত কারও মুখে এক সাধুর উপদেশের কথাই শুনেছিল সে। তবে সে কোন্ সাধু তা বলতে পারবে না। পরমহংস ঠাকুর কিংবা আর কেউ। তবে ঠিক সেই উপদেশেই এটা হয়েছে কিনা তারই বা ঠিক কি। আজ সবটাই যেন গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে, কিছুই পরিষ্কার মনে পড়ে না। হয়ত কোন একজনের কথায় হয়ও নি। ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে সঙ্কল্পটা মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাতেই বা লাভ কি হল? পারল কি সেদিনের সে প্রতিজ্ঞা পালন করতে? সে সঙ্কল্পে অবিচল থাকতে? আসলে সে শক্তি ওর কোন দিনই ছিল না। একটা মিথ্যা অহঙ্কারকেই বুঝি এতকাল মনে মনে লালন করেছে—নিজেকে স্তোক দিয়েছে। কিছুই হয় নি তার, সাধনার সিদ্ধি মেলা তো দূরর কথা। যা মিলেছে তা হচ্ছে তার স্পর্ধার উত্তরে বিধাতার পরিহাস।

কে, দুর্দান্ত অর্থলোভ তো ছাড়তে পারে নি সে। কিসের নিরাসক্তি যদি এই স্থূল লোভটাই না ত্যাগ করতে পারল। এ লোভই তো তাকে কত না দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত করাল, শেষ অবধি সেই লোভের কাছেই চরম মার খেতে হ'ল তাকে। একেই হয়ত ব'লে ভগবানের মার, বিধাতার বিচার!

অহঙ্কার! আসলে সে অহঙ্কারের সাধনা করেছে বসে বসে। এখনও তার চৈতন্য হয় নি—বসে বসে আহত অহঙ্কারটাকেই সযত্নে লালন করছে সে।

কাজ করতে করতে হাত থেমে যায় তার, মন অতীতের রোমন্থনে মগ্ন হয়ে পড়ে। সে মূর্খ, লেখাপড়া শেখে নি; কারখানায় কাজ করা যাকে বলে—হাতে-কলমে যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা—তাও খুব বেশিদিন করে নি সে—সাহেবদের স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে 'স্টোরে' চলে গেছে সে কবেই। বাবুও নয় বেয়ারাও নয়—এমনি একটা কাজে রেখে দিয়েছিলেন সাহেবরা। পদটা যা-ই হোক, শেষ অবধি কার্যত সে-ই স্টোরের সর্বেসর্বা ছিল আর সেই সুযোগেই যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা রোজগারও করতে পেরেছিল।

BanglaBook.org

সে কথা থাক। তখনকার দিনে সাহেবরা যোগ্যের মর্যাদা বুঝতেন। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক-খ পড়া না থাকলেও যন্ত্রবিদ্যায় অভয়পদর একটা স্বভাবজ জ্ঞান ছিল; ওদিকে মাথা খেলত তার অসম্ভব। শুধু নক্সা দেখে দেখে অনেক জিনিস শিখে গিয়েছিল সে। জটিল যন্ত্রপাতি, কলকজা, তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার ঠেকত। একদিন দৈবাৎ সেই পরিচয় পেয়েই ওদের এক সাহেব কারখানায় কাজ করার দায় থেকে অব্যাহতি দেন ওকে। তিনি ঝোঁকের মাথায় কোম্পানীর খরচে ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন—কিন্তু অভয়পদই রূঢ় তথ্যের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে শেষ পর্যন্ত। যে ইস্কুলেই পড়ে নি বলতে গেলে—তাকে ইঞ্জিনিয়ার করা দু-এক বৎসরের কাজ নয়।

তারপর বহুদিন বহু সাহেবই ওকে নিজেদের কামরায় ডেকে পাঠিয়েছেন—নক্সা খুলে দেখিয়ে ওর পরামর্শ চেয়েছেন। সঙ্গে ক'রে যন্ত্রশালায় নিয়ে গেছেন। —অচল যন্ত্রের কোথায় কি গোলমাল ঘটেছে বুঝিয়ে দিয়েছে সে। নক্সার ভুলত্রুটি ধরে দিয়েছে, দুর্বোধ্য অংশ বুঝে নিতে সহায়তা করেছে। এই তো সেদিনের কথা, হাওড়ার ভাঙ্গা পুল মেরামত করার ঠিকা নিয়েছিল তাদের কোম্পানি। বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখে গিয়ে নক্সা পাঠিয়ে দিয়েছিল, সে নক্সা এদের মাথাতে ঢুকছিল না। তখন অভয়পদ পিঠে একটা প্রকাণ্ড কার্বাঙ্কল হয়ে শয্যাশায়ী, ডাক্তার এসে কেটে দিয়ে গেছে—চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে বলেছে। সাহেবরা স্ট্রেচার আর গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন অফিসে, যে অংশটা এখানকার আট-দশ জন মিলেও বুঝতে পারছিল না—সেই অংশটা ওকে দেখাবামাত্র বুঝিয়ে দিয়েছিল সে, বড়সাহেব খুশি হয়ে ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে—বকশিশ।

সেই কারণেই কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, যতদিন জীবিত থাকবে সে, ততদিন তার চাকরি যাবে না এ আপিস থেকে। আর যদিই কোনদিন অথর্ব হয়ে পড়ে ছুটি চায় তো সাহেবরা তার একটা পেন্‌সনের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—কিম্বা একটা মোটা গোছের থোক টাকা দিয়ে বিদায় দেবেন। এমন দিয়েছেনও ইতিপূর্বে—কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে। কিন্তু কিছুই পেল না সে, কিছুই মিলল না। আবর্জনার মতো সরিয়ে দেওয়া হ'ল তাকে।

এও সেই লোভ। অতিরিক্ত লোভের জন্যই এমন হ'ল। বহুদিন আগেই অবসর নিতে পারত সে। পুরো মাইনের মায়ায় প্রাণপণে চাকরিটা আঁকড়ে ধরে ছিল। তদ্বির করেছে যাতে তার এই দীর্ঘকাল চাকরির কথাটা সাহেবদের কানে না যায়। সে মায়া যদি না করত, পুরনো সাহেবরা থাকতে থাকতে যদি অবসর চাইত, তা'হলে কিছু একটা সুব্যবস্থা তাঁরাই করে দিতেন। এখন নতুন আমল, নতুন লোক। তারা একটা লোককে এতকাল চাকরির সুযোগ দেওয়ার জন্যে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। পুরনো সাহেবদের নির্বোধ খেয়াল বলে ধরে নিয়েছে এরা। কোন এক বৃদ্ধ কর্মচারী অভয়পদর ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানের কথা বলতে গিয়েছিল—তারা হো হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'তখনকার দিনে যে-সব সাহেব এসেছে, তারা নিজেরাও কেউ লেখাপড়া জানত না—তাই ঐ মূর্খ বৃদ্ধকে নিয়ে নাচানাচি করেছে। এটা ইংরেজ জাতি এবং সমগ্রভাবে শিক্ষারই অপমান। আমাদের কোন দরকার নেই ঐ ফসিলকে, আমরা যথেষ্ট পড়াশুনো ক'রে এসেছি।'

শুধু তাই নয়—টাকা ধার-দেওয়ার ব্যাপারেও তারা সমস্ত অপরাধ অভয়পদর ঘাড়েই চাপিয়েছে, একজন স্থানীয় লোকের লোভের ফলে একটি ইংরেজের অকাল-মৃত্যু হল—এ চিন্তাও তাদের কাছে অসহ্য। আরও শুনেছে তারা, গত যুদ্ধের সময় স্টোরের বহু মাল পাহারার মধ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথাও কানে গেছে তাদের। এসব জেনেও আগের সাহেবরা ওকে তাড়িয়ে দেন নি—এইতেই বিস্মিত বোধ করেছে। এমন সন্দেহও

Banglabook.org

প্রকাশ করেছে যে—হয়ত ওর সঙ্গে তাঁদের কোন ভাগের বন্দোবস্ত ছিল নইলে এটা বরদাস্ত করেছিলেন কী ক'রে? তাই কোম্পানীর দেহে পুরাতন বিষাক্ত ক্ষত মনে করেই ওকে সরিয়ে দিয়েছে তারা, ঘৃণা ও অবজ্ঞায়। কোন সহানুভূতি কি বিবেচনার পাত্র মনে করে নি।.... 'দ্যাট্ ওল্ড্ মিসচিভাস্ ম্যান'—দীর্ঘদিন চাকরির পর নিজের সম্বন্ধে ওপরওলাদের এই ধারণা ও অভিযোগ নিয়ে নিঃশব্দেই সরে আসতে হয়েছে ওকে—কোন প্রতিবাদ কি প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় নি।....

অপরিসীম আত্মগ্লানিই বোধ করার কথা। নিজেরই অসংখ্য নির্বুদ্ধিতার গ্লানি আর অনুশোচনা। করছেও তাই। আর বোধ করি সেটা থেকে অব্যাহতি পেতেই তার মন বরাবর চলে যাচ্ছে সেই দূর অতীতে, সেই অহঙ্কারের ক্ষেত্রগুলিতে—যখন বহু শত এমন কি সহস্রাধিক টাকা বেতনের সাহেব মনিবরা উদ্বিগ্ন মুখে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন, আর ও স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ অভিভাবকের মতোই মধুর হাস্যে তাঁদের বরাভয় দিত আর—শিশুদের অকারণ উদ্বেগ যেমন সস্নেহে ও সপ্রশ্রয়ে অথচ অতি সহজে দূর করে দেন তার পিতা-পিতামহরা—তেমনি ভাবেই দূর করে দিত তা। সে সময় বিনয়-হাস্যের মধ্যেও অহঙ্কারের পরিতৃপ্তিতে মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠত ওর।

ন্যাড়ার বিয়ের কথাটা মেজকর্তা নিজেই তুলল। একেবারে হঠাৎ! এ নিয়ে যে কোন কথাবার্তা চলছে বা ছেলে-মেয়ে দেখাদেখি হচ্ছে তা কেউই জানত না—বোধ হয় মেজগিন্নীও না। একেবারেই না-বলা-কওয়া সেদিন মহাশ্বেতাকে ডেকে বলল অম্বিকাপদ, 'ন্যাড়ার জন্যে মেয়ে মোটামুটি আমি একটা দেখে পছন্দ করেছি —তোমরা কেউ দেখেতে চাও? কিম্বা আর কাউকে দেখতে পাঠাবে?'

কথাটা বুঝতে অনেক দেরি লাগল মহাশ্বেতার, সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেওরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কতকটা অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করল, 'কি দেখবে বলছ—? মেয়ে? মানে বে?.... কার বে?'

'কার আবার—ন্যাড়ার বে গো, ন্যাড়ার। ও ছাড়া এখন বের যুগ্যি আর কে আছে বাড়িতে?'

'ন্যাড়ার বে? এখন? বলি আমি তো আর পাগলও হই নি, আর ছন্নও হই নি এখন ওর বের কথায় নেচে উঠব! বে ক'রে খাওয়াবে কি ন্যাড়া মাগ ছেলেকে তাই শুনি? একা একটা পুরুষমানুষের দিন চলে যাবে, নিদেন মোট বয়েও খেতে পারবে, কিন্তু যার এক পয়সার রোজগার নেই সে বে করবে কি অনত্থক ন্যাঞ্জারি হয়ে শুকিয়ে মরবার জন্যে?—না নিজের ছেলেমেয়ে একটা একটা ক'রে চোখের সামনে না খেয়ে মরবে—সেইটে বসে দেখবে বলে?'

'কেন? বুড়োর বৌ কি খেতে পাচ্ছে না?' অম্বিকাপদ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ—তা পাচ্ছে। মানছি! কিন্তু সে তো তোমার দয়া বই নয়। দয়া ক'রে দিচ্ছ তাই। তবে সে হয়ত একটা বলেই দিচ্ছে—গুষ্টিসুদ্ধকে যে তুমি এমনি চারকাল বসে খাওয়াবে—তার কোন লেখাপড়া আছে! পয়সা তো তোমার, তোমাকেই তো বুক-পোঁতা ক'রে দিয়েছে। এখন তুমি দোব না বললে জোর তো কিছু নেই!... তাছাড়া জীবন-মরণের কথাও আছে একটা। তুমি দিচ্ছ—তোমার ছেলেরা যদি না দেয়?....না, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—এর একটা কিছু হিল্লে না হ'লে ওকাজে যেতে দোব না। ....তোমার এত মাথাব্যথা তো তোমার ছেলের জন্যে, আমি বলছি তুমি তোমার বেটার বে দাও গে, তাতে কিছু দোষ হবে না। আমি কোন দোষ ধরব না অন্তত। যে যেমন বরাত নিয়ে এসেছে তাকে তাই ভোগ করতে হবে—মিছিমিছি পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি?'

BanglaBook.org

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না অম্বিকাপদ। বুড়োর বিয়ের কথা মহাশ্বেতাই তুলেছিল, তোলাই শুধু নয়, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উত্ত্যক্ত ক'রে মেরেছিল সকলকে। এত হিসেব-নিকেশ তখন শোনা যায় নি। এ ধরনের কথা ওর মুখে একেবারে বেমানানও।

অম্বিকা জানে না, জানতে পারে নি—মহাশ্বেতা এই গত কমাসে অনেক শিখেছে। এতদিন যে জ্ঞানটা তাকে কেউ দিতে পারে নি—সেটা আপনিই তার মনে উদয় হয়েছে। চারদিক অন্ধকার ঠেকতে নিজে-নিজেই বুঝেছে সব। আগে জানবার চেষ্টা করে নি বলেই জানে নি। এখন ছোটবৌকে আড়ালে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়েছে। ওদের সম্পত্তি বলতে এই বাস্তু ছাড়া তাদের মোট ষোল বিঘে ধান-জমি আছে আর একখানা বাগান। ...তার তিন বখরার এক বখরা পেতে পারে তার ছেলেরা। ছ'জন ছেলের পাঁচ বিঘে জমি—ভরসার মধ্যে তো এই। বাকি যা সবই মেজকর্তার। কোথায় একটা বাড়ি কিনেছে—সে মেজগিন্নীর নামে। ভাগের ভয়েই স্ত্রীর নামে কিনেছে। টাকা কম নেই তো হাতে। বড় ছোট চিরকাল সবই এনে ওকে ধরে দিয়েছে। ছোটর অবশ্য আলাদা কিছু আছে, চাকরি ছাড়লেও মোটা টাকা পাবে আপিস থেকে। তারাই শুধু নিঃস্ব।

অবশ্য, ছোটবৌ যা বলে, মেজকর্তা নিজে টাকা বাড়িয়েছেও ঢের। এদিকে ওর মাথা খুব। তেজারতি তো আছেই, ইদানীং আর একটা কারবার ধরেছে, বাড়ি বেচা কেনার কারবার। পুরনো বাড়ি কম দামে কিনে সারিয়ে-সুরিয়ে চকচকে ক'রে অনেক বেশি দামে বেচে দেয়। বলে, 'এতে লোকসান যাবার ভয় নেই, বসে তো থাকে না—সুবিধেমত দাম পাই ভাল—না পাই ভাড়া বসিয়ে দেব। তাতেও লাভ।' আরও বলে 'শেয়ারের বাজারে ফাটকা খেলে, কি দাদার মতো চড়া সুদের লোভে শুধু-হাতে টাকা দিয়ে হঠাৎ নবাব হ'তে চাই না আমি। তার চেয়ে এ অল্প লাভের কারবার আমার ঢের ভাল!'

মহাশ্বেতা প্রতিপক্ষের অভাবে তরলার ওপরই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'বলি তাতেও তো পয়সা লাগে লো! এ তো সব কারবারই—যা যা বলছিস—মোটা টাকার খেলা। সে টাকা তো আর কেউ যোগায় নি। এই বড়কর্তাই এনে হাতে তুলে দিয়েছে। তাতে তো কোন সন্দ নেই আর।... তবে? ওর উচিত নয় এর ছেলেদের ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া—কি এদের নামে কোন সম্পত্তি ক'রে দেওয়া?'

তরলা কোন উত্তর দিতে পারে নি। শুধু ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলেছিল, 'তা উনি তো তেমনি গোটা সংসারটা টেনেই যাচ্ছেন—বিয়ে পৈতে সব খরচাই তো করছেন, কারও কাছে তো কিছু চান নি কোনদিন'

'হ্যাঁ তা করছেন কিন্তু সে তো ভিক্ষে। আমাদের হক্কের ধন যা তার জন্যে ওদের হাত-তোলায় থাকব কেন আমরা—কিসের জন্যে?'

এ সবই পুরনো কথা, পুরনো যুক্তি।

নতুন যা—তা নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। তাইতেই তার কণ্ঠে এই অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ফোটে আজ।

অম্বিকাপদ একটু অসহায় ভাবেই বলে, 'তা কেন। সে আমার ছেলের বে দু বছর পরে হ'লেও চলবে। একেবারে তো অরক্ষণা হয়ে পড়ে নি। আমি ছোঁড়ার কথাই ভাবছি, বয়স তো ওর ঢের হয়ে গেল। আর কবে বে করবে বলো!'

'তা হোক। বয়স যতই হোক, কিছু একটা না হ'লে—অন্তত মাসে দশটা টাকাও আমদানীর পথ না হ'লে ছেলের বে দিতে দোব না আমি—এই সাফ বলে দিলুম!'

বোধ করি এই দৃঢ়তাতেই খানিকটা কাজ হয়।

BanglaBook.org

দিন-আষ্টেক পরেই একদিন দাদার কাছে এসে কথাটা তুলল অম্বিকাপদ, মহাশ্বেতা সামনেই ছিল, তার শোনবার কোন অসুবিধে নেই দেখেই সে কথাটা সেই সময় পেড়েছিল—নিহাৎ সোজাসুজি বৌদির কাছে কথাটা পাড়তে বোধহয় আত্মসম্মানে আঘাত লাগে ব'লেই। বলল, 'খটির বাজারে একটা ঘর দেখেছি দাদা, মনে করছি এদের একটা ছোটখাটো ডাল-মশলার দোকান ক'রে দেব। ইচ্ছে হ'লে চালও রাখতে পারবে। বুড়ো, ন্যাড়া, ধনা—এরা তো দিনরাত বসেই থাকে, সবাই মিলে যদি লাগে—বাড়তি লোকও লাগবে না, চুরিরও ভয় থাকবে না।'

অভয়ের মুখে কোন ভাব পরিবর্তন হয় না এ প্রস্তাবে। শুধু বলে, 'পারবে কি চালাতে? শুধু শুধু কতকগুলো টাকা নষ্ট করবে না তো? সব জিনিসেরই শিক্ষা দরকার, ব্যবসা করতে গেলেও সেটা শেখা দরকার। ওরা তো কিছুই শিখল না—'

'না, আমি মনে করছি এখন খুব কম টাকা ঢালব, ছোটখাটো দোকান—আমাদের এ বাজারে অশ্বিনী যেমন দোকান করেছে তেমনি। শ'পাঁচেকের মতো খরচ করব আপাতত। তারপর—তেমন বুঝলে, ওদের যদি সে রকম আগ্রহ দেখি, আর কিছু দিলেই হবে। তাছাড়া হিসেব-পত্রগুলোও আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখতে পারব—একেবারে নয় ছয় করতে পারবে না!'

'দ্যাখো—যা ভাল বোঝ করো গে। আমি আর কি বলব।'

সংক্ষেপে এইটুকু বলেই সব দায়িত্ব নামিয়ে দেয় অভয়পদ।

মহাশ্বেতার কাছে প্রস্তাবটা এমনই অভিনব, এমনই অকল্পিত যে প্রথমটা সে কোন কথাই বলতে পারে নি। এইবার সে একটু ক্ষীণ আপত্তির সুরে বলে, 'মুদিখানা! ভদ্দরলোক বামুনের ছেলে মুদির দোকান দেবে!'

অম্বিকা জবাব দেয়, 'ভদ্দরলোক বামুনের ছেলেকে তো লোহাপেটা কারখানায় দিতে চাইছিলে, তার চেয়েও কি এ কাজ খারাপ? এ তো স্বাধীন ব্যবসা। ভেগ্যে থেকে চালাতে পারলে ঐ থেকেই লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে পারবে!'

কথাটা অবিশ্বাস্য, সে বরাত তার নয়—তা মহাশ্বেতা ভাল রকমই জানে। লাখে দরকার নেই, এখন কোনমতে দিনগুজরানের মতো কিছু হলেও তো হয়। তা-ই হবে কি? পারবে কি ব্যাটারা চালাতে?

তবু, সংশয়ের মধ্যেও, কোথায় যেন আশা ও আশ্বাসের আভাস পায়। কিছু তো একটা হচ্ছে। যাই হোক—তবু তাদের নিজস্ব কিছু।

সে মনে মনে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে পূজো মানত করে। যেদিন দোকান খোলা হবে সে দিন সে আলাদা পূজো দেবে। পূজো আর হরির লুট!

BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

রানীর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে সেটা সবাই লক্ষ করলেও ঠিক যে এতটা খারাপ হয়েছে তা কেউ বুঝতে পারে নি। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে সকলকার খেয়াল হ'ল।

আসলে রানীই বুঝতে দেয় নি কিছু, যতটা পেরেছে যতক্ষণ পেরেছে সংসারে খেটে গেছে। এবার আর পারল না—একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল।

কমলা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরও শরীর ভেঙ্গেছে দস্তুর মতো। বর্ষা পড়লেই পেট ছেড়ে দেয়, হাত-পা ফুলে ওঠে। এই বৌই তদ্বির-তদারক করে টোটকা-টুটকি খাইয়ে কোন মতে সারিয়ে তোলে। শীতকালটা ভাল থাকেন তিনি গরমটাও কোন মতে কাটে—

বর্ষা পড়লেই আবার যে-কে সেই। কিন্তু ভালই থাকুন আর মন্দই থাকুন, খাটবার শক্তি তাঁর একেবারেই চলে গেছে। নতুন বাড়িতে এসে উৎসাহের প্রাবল্যে দিনকতক খুব খেটেছিলেন—এখন আর মোটেই পারেন না। কোন মতে বসে রান্না করতেও কষ্ট হয় তাঁর। এই বৌয়ের ওপরই ভরসা। বৌয়ের চেহারা যে দিন দিন শুকিয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে তা তিনিও দেখেছেন—শ্যামা তো বহুবারই বলেছেন তাঁকে, কিন্তু তিনি কি করবেন—কীই বা করতে পারেন! তাঁর যতটুকু সাধ্য-সামান্য সামান্য চিকিৎসা করিয়েছেন, য়্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, টোটকা, দৈব। সাধ্যে আর সময়ে যতটুকু কুলিয়েছে।

গোবিন্দ কিছুই পারে না। তার আপিসের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ভরসা করে ওখানটা ছাড়তে পারলে হয়ত অন্য কোথাও কাজ পায় এখনও—কিন্তু সেই ভরসাটাই ওর নেই। চিরদিন, বলতে গেলে বাল্যকাল থেকে, এক জায়গায় কাজ করে এসে—অন্য কোথাও যে কাজ পাওয়া সম্ভব, বা সে কাজ পাওয়ার জন্যে কীভাবে চেষ্টা করতে হয়—সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তার। এ চাকরিও পেয়েছে সে বিনা-তদ্বিরে, না চাইতেই; বন্ধু এসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে, কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লোকমুখে শুনেছে, নিত্যই শোনে যে চাকরির বাজার খুব খারাপ। ভয়ও হয় তার—এই বাজারে কোথায় আবার চাকরি খুঁজতে বেরোবে সে, কার কাছেই বা যাবে! সুতরাং সেইখানেই পড়ে আছে সে—কাজ কমে নি, মাইনে বরং আরও কমেছে।

না, চাকরি ছাড়তে পারে নি সে। যেটা পেরেছে সেটা হ'ল এক বইওলার কাছে উপরি কিছু কাজ যোগাড় করতে। তঁদের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া, প্রুফ দেখা, কপিবুকের নক্সা করা—মায় ভূগোলের বইয়ের ম্যাপ আঁকা—সবই করতে হয় তাকে প্রয়োজনমতো—তার জন্য পারিশ্রমিক মেলে মাসিক কুড়িটি টাকা, তাও তিন-চার কিস্তিতে। গোবিন্দর হাতের লেখা ভাল—ম্যাপের কাজ করে করে খুব পরিষ্কার লিখতে শিখেছে, ছাপাখানা সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান আছে, সব মিলিয়ে ওকে পেয়ে তাঁদের সুবিধা হয়েছে ঢের, হয়ত চেপে ধরলে তাঁরা আর কিছু বাড়িয়েও দিতে পারেন—কিন্তু সেটুকু জোর করবারও সাহস নেই ওর।

তবু এটা মন্দের ভাল। মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে, পেট বেড়েছে, শুধু খাই-খরচাই কত। এই বাড়তি টাকাটা পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের টানাটানিটা কমেছে, দু টাকা মাইনে দিয়ে একটা ঝিও রাখতে পেরেছেন বাসন মাজার—কিন্তু ঐ থেকে আবার ঘটা করে কারও চিকিৎসা চালানো অসম্ভব। তাছাড়া গোবিন্দর সময়টাও একেবারে কমে গেছে। সকালে স্নানাহার সেরে আটটা আঠারোর ট্রেন ধরতে হয় তাকে—পৌনে আটটায় না বেরোলে গাড়ি ধরা যায় না। ঐ ট্রেনে গিয়েও তার নাকি দেরি হয়ে যায়, লোকজন এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দুটো চাকরি সেরে ফেরে একেবারে শেষ গাড়িতে—বাড়ি পৌঁছতে এগারোটা বেজে যায়। শুধু শনিবারটাতে একটু আগে ফেরা হয়—আটটা দশ কি আটটা চল্লিশের ট্রেন ধরে।

এর মধ্যে তো নিঃশ্বাস ফেলবারই অবকাশ নেই। ছুটি বলতে এক রবিবার—কিন্তু সেদিন আর নড়তে চায় না গোবিন্দ। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কি আড্ডা দিতে যাওয়া তো দূরের কথা—বাজার-উটনোই আনতে পারেন না কমলা। গোবিন্দরও বয়স হয়ে আসছে, এত খাটুনি তার পোষায় না আর, নিতান্ত বাধ্য হয়েই যেটুকু করতে হয়—তার বেশি কিছু করতে চায় না।

তবু রানী একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে তারও টনক নড়ে। মরিয়া হয়ে পাড়ার চার টাকা ভিজিটের বড় ডাক্তারকেই ডেকে আনে সে। কিন্তু তিনি এসে পরীক্ষা করে দেখে ভুরু কোঁচকান। বাইরে এসে বলেন, 'এ করেছেন কি, এ তো শেষ করে এনে তবে ডেকেছেন আমাকে! কতদিন থেকে এমন হয়েছে তা কেউ লক্ষও করেন নি! যা খেয়েছেন

BanglaBook.org

তা কিছুই হজম হয় নি—ওঁর দেহ প্র্যাক্‌টিক্যালি কোন খাবারই পায় নি দীর্ঘকাল। লিভার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, হার্টের অবস্থাও খুব খারাপ। বাড়িতে এর চিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। আপনাদের সাধ্যে কুলোবে না। এখনই যদি কোন বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারেন তো কিছু আশা আছে—কিন্তু সেও আপনাকে ওআর্ন করে দিচ্ছি—এক আনার বেশি নয়। বাড়িতে রাখলে আর বড় জোর দিন কুড়ি-পঁচিশ, এর বাইরে যাবে বলে মনে হচ্ছে না!'

দু-একটা দামি ওষুধ লিখে দিয়ে, তাঁর ফি নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। গোবিন্দ কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখলে একেবারে। সর্বনাশ এত আসন্ন তা সে কল্পনাও করে নি। প্রথম কৈশোর থেকেই স্ত্রীর সেবা-যত্নে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। ভাগ্যক্রমে দুটি স্ত্রীই পেয়েছিল সে সুগৃহিণী, কখনও কোন দিকে তাকাতে হয় নি—দৈহিক আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, এই অল্প আয়ের মধ্যে যতটা পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে বেশিই পেয়েছে। আজ এই এতকাল পরে, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে স্ত্রী থাকবে না—তাকে একা সংসার করতে হবে—একথা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

অনেকটা সামলে নিয়েই ঘরে ঢুকেছিল, তবু তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে রানী বলল, 'কী হ'ল—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল তো? তোমার যেমন মাথা খারাপ, মিছিমিছি এক গাদা টাকা দণ্ড!'

নিতান্তই সহজ শান্ত সুর। যেন আর কারও কথা বলছে সে, আর কোনও কথা। নিজের মৃত্যুর কথা নয়!

গোবিন্দ অবশ্য কথাটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে, 'জবাব দেবার কথা আবার কে বললে! এই তো সব ওষুধ দিয়ে গেল। বাইরে নিয়ে গিয়ে বলছিল—হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার কথা। শক্ত অসুখ, দামি দামি ওষুধ লাগবে—পারবেন কি সে খরচা চালাতে—এই বলছিল।'

কিন্তু সহজে বলতে পারে না শেষ পযন্ত, গলা কেঁপেই যায়। কান্নার মতো আওয়াজ বেরোয়। রানী কিন্তু আর কিছু বলে না, হাসে একটু। ছেলেমানুষদের কাণ্ডকারখানা দেখলে বয়স্করা যেমন হাসেন তেমনি। খানিকটা পরে একেবারে অন্য কথা পাড়ে, 'হ্যাঁ গো, আমাকে একখানা খাম এনে দেবে—ডাকের খাম?'

অনুরোধটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আকস্মিক। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগহীন। গোবিন্দ ঠিক বুঝতে না পেরে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সন্দেহ হয়—মাথার কোন গোলমাল হ'ল কিনা। ভুল বকছে না তো?

কিন্তু রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সেই মুক্তোঝরা হাসিটা এখনও তার আছে বুঝি। বলে, 'ওমা, জন্মের মধ্যে কম্ম, মরণকালে একখানা খাম চেয়েছি, তাতেই যে তোমার বাক্যি হরে গেল দেখতে পাই। বলি কোনকালে কি খামের নাম শোন নি—না নশো পঞ্চাশ টাকা খরচের কথা ভাবছ। আমার কি কাউকে একখানা চিঠি লিখতেও নেই?'

'তা কেন। তা বলছি না। হঠাৎ এর মধ্যে খামের কথা—। বাপের বাড়িতে লিখবে?'

গোবিন্দ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

'থাক, হয়েছে। একখানা চিঠি লিখব তা কাকে কী বিত্তান্ত—ছ বুড়ি ছত্রিশ গণ্ডার কৈফেৎ! দেখছি মেয়েটাকেই পাঠাতে হবে। যা পথ—ডাকঘর কি হেথায়—অন্তত একটি ক্রোশ রাস্তা, মেয়ে বড় হয়েছে—অতদূর পাঠাতে ইচ্ছে করে না। দেখি মল্লিকদের ছোট ছেলেটা যদি এনে দেয়—'

শেষের দিকের কথাগুলো যেন আপন মনেই বলে রানী। কথা বেশিক্ষণ ঠিক মতো বলতে পারে না আজকাল। একসঙ্গে দুটো-চারটে কথা কইলেই শেষের দিকে গলা স্তিমিত

BanglaBook.org

হয়ে আসে, শব্দগুলো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। এইতেই আরও ভয় পেয়ে যাচ্ছেন কমলা। লক্ষণ তাঁর ভাল ঠেকছে না আদৌ।

পরের দিন খাম আনিয়ে কোন মতে কনককে চিঠি লেখে একখানা। একেই হাতের লেখা তত ভাল নয়—তাতে দুর্বল হাতে আরও এঁকেবেঁকে যায়, কলম ধরতেই পারে না ভাল করে। তবু মেয়েকে দিয়ে লেখায় না, নিজেই লেখে চেষ্টা করে করে—অনেকক্ষণ ধরে।

লেখে, কৈ লো, খুব তো বলেছিলি মরণের সময় অবিশ্যি আসবি। এবার আয়! আর দেরি করলে তো দেখাই হবে না। বড়জোর আর সাত-আটটা দিন আছি। শিগগির চলে আয়। বর না আসতে পারে, অন্য কাউকে নিয়ে একাই চলে আসিস!

ব্যস। ঐ দু ছত্র চিঠি। কোন সম্ভাষণ নেই, কুশল প্রশ্ন নেই। এইটুকু লিখতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল তার। আর লেখার প্রয়োজনই বা কি। সচেতন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে আজ যেন সব কিছুই অবান্তর, অর্থহীন ঠেকছে।

কনক চিঠিটা পেয়ে প্রথমে মনে করল তামাশা। রানীর স্বভাবজ কৌতুকপ্রিয়তা। তবু অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল একটা। এ আবার কী ধরনের তামাশা। অথচ ঠিক সত্য বলেও ভাবতে পারে না। সত্যি সত্যিই কি মানুষ নিজের মৃত্যুর কথা এমনভাবে লিখতে পারে?... আবার মনে হয় রানী-বৌতে সবই সম্ভব। জীবনটাই তার কাছে প্রকাণ্ড একটা কৌতুক বলে মনে হয়—মৃত্যুটাও হয়ত তাই। তাছাড়া কান্তির বিয়ের সময় গিয়ে ওর শরীরটা খুবই খারাপ দেখে এসেছে, নিয়ে আসতে চেয়েছিল এখানে—তা তো এল না, তারপর যদি সারতে পেরে না থাকে তো, এতদিনে খুবই খারাপ হয়ে পড়বার কথা। আর সারবেই বা কি করে—কি দিয়ে। অবস্থা তো নিজেই দেখে এসেছে কনক।

চিঠি বিলি হয়েছে বেলা বারোটা নাগাদ। অবশিষ্ট সারা বেলাটা ছটফট করে বেড়াল সে। বিকেলে হেম বাড়ি ফিরতে চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল।

'এর মানে কি বলে দাও আমাকে, আমার মাথাতে তো কিছু ঢুকছে না। সত্যি কথাই লিখেছে, না তামাশা?'

হেমও কিছু বুঝতে পারে না। তবু পড়তে পড়তে তার মুখও বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

'কি করে বলি বলো দিকি। লেখা তো খুবই জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে, তবে সে অনব্যেসেও হতে পারে।.... কিন্তু যার সাত-আট দিনের বেশি বাঁচবার মেয়াদ নেই—তার পক্ষে কি নিজের হাতে চিঠি লেখা সম্ভব?'

'তা হ'লে কী করবে?'

'তাই তো ভাবছি। বড়দাকে একটা চিঠি লিখে দেখব?'

'কিন্তু সত্যিই যদি এমন ধারা এখন-তখন অবস্থা হয়—তাহলে কি অত দেরি সইবে.... চিঠি যাবে উত্তর আসবে, তারপর তুমি পাস লেখাবে—সে তো অন্তত পাঁচ-ছ দিন।'

'তাহলে চলো। কালকেই পাস লেখাই। যদি তেমন হয় তো তোমাকে রেখে চলে আসব, নয়ত তখনই ফিরব। তিন-চার দিনের ছুটি চাইলে হয়তো পাওয়া যাবে।'

কনক বাইরে বেরিয়ে পুরনো দইয়ের হাঁড়িতে বসানো তুলসীগাছটার কাছে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে জানায়, 'ঠাকুর,এই কটা দিন তাকে বাঁচিয়ে রেখো অন্তত—গিয়ে যেন দেখাটা পাই!' এককালে যে স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে তার ঈর্ষার অন্ত ছিল না, আজ তার সম্বন্ধে নিজেরই এই আকুলতা নিজের কাছেও আশ্চর্য লাগে।..

কনক ঘরে ঢুকে সেই ফ্যাকাশে চামড়ায়-ঢাকা কঙ্কালটার দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বটে, কিন্তু রানীর মুখে-চোখে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসিই ফুটে উঠল। সেই হাসি—এখনও তেমনি মিষ্টি আছে, আশ্চর্য। যে হাসির দিকে চেয়ে একদা হেমের মনে হ'ত

BanglaBook.org

সারা জীবন শুধু এই হাসি দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়; তার চেয়ে বড় সার্থকতার কথা সেদিন ভাবতে পারত না সে। রানী যখনই হাসে কেমন একরকম খিলখিল করে হাসে, যেন একটা আনন্দ সে হাসির সঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অতি মধুর একটা সুরের মতো মিষ্টি শব্দ হয় সে হাসির, কানে গেলে সুগীত সঙ্গীতের মতোই একটা আবেশের সৃষ্টি করে।

আজও সেই হাসি তেমনি অম্লান, তেমনি প্রাণবন্ত আছে। দেখলে মনে হয় জীবনে কোনদিন কোন দুঃখ পায় নি সে, কোন আশাভঙ্গের বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, কোন অপূর্ণতা তার ছায়াপাত করতে পারে নি ওর মনে। এই অবিশ্বাস্য রূপ-গুণ নিয়ে যে অনায়াসে রাজা কি রাজার চেয়েও বড় ধনী কি প্রতিপত্তিশালী লোকের ঘরে পড়তে পারত, কোন সম্ভ্রান্ত বা বিখ্যাত লোকের স্ত্রী হ'লেই যাকে বেশি মানাত, তার অসামান্য রূপ-গুণের প্রকৃত সমাদর হ'ত, কাজে লাগত সেগুলো—সামান্য বেতনের উদ্যমহ্যন নিতান্তই সাধারণ একটি কেরাণীর হাতে পড়ে কোনদিকেই কোন সার্থকতা মিলল না জীবনে—তার এই হাসি দেখলে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে। সে হাসি শুধু অপরেরই দুঃখ ভোলায় না শুধু অপরের মনে স্নিগ্ধমধুর মোহের সৃষ্টি করে না—সে হাসি নিজের জীবনেরও পরিপূর্ণতা ঘোষণা করে। সে সুখী, সে তৃপ্ত—কোনও ক্ষোভ, কোন মালিন্য, কোন দৈন্য, কোন রিক্ততা যেন তার জীবনকে কখনও কিছুমাত্র বিড়ম্বিত করে নি, অথবা করলেও সে কথা ভুলে গিয়েছে সে, তার জন্য কাউকে দায়ী মনে করে না—কোথাও সেজন্য এতটুকু অনুযোগ নেই তার মনে।

হাসিটা সামলে কথা কইতে একটু সময় লাগে রানীর। বোধহয় ঐটুকু হাসতে গিয়ে তার দম ফুরিয়ে গেছে সাময়িকভাবে। কিন্তু পরে যখন কথা কয়, একেবারে ধমক দিয়ে ওঠে সে কনককে, 'আ মর—কেঁদে মরছিস কেন এখন থেকে? এরও কি আগাম বায়না চলে নাকি?.... শোন, চোখ মোছ—কান্নার ঢের সময় পাবি, এখন তুলে রাখ্ ওটা... এই এখানে কাছে এসে বোস দিকি, এত জোরে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারি না আর। ভয় নেই, ছোঁয়াচে রোগ নয়। কাছে এলে ক্ষেতি হবে না!'

তারপর, কনক একেবারে বিছানার ধারে এসে বসলে, নিজের শীর্ণ কম্পিত হাত খানি কনকের হাতের ওপর রেখে বলে, 'এসে পড়েছিস না আমি বেঁচেছি। যা ভয় হয়েছিল। মনে হচ্ছিল চিঠিটা হয়ত পাবি না, কিম্বা পেলেও এতটা বাড়াবাড়ি বিশ্বাস করবি না। অথচ গোনা দিন কেটে যাচ্ছে, মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে একটি একটি করে নিত্যই। এরপর এলে হয়ত আর কথা কইতে পারতুম না—বেঁচে থাকলেও!'

তারপর খানিকটা দম নিয়ে আবার বলে, 'কেমন আছিস কী বিত্তান্ত পরে হবে। এখন মন দিয়ে শোন—কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস তা তো জানি না, যদি মরা পর্যন্ত থাকতে পারিস তো ভালই, নইলে আগে গেলে আগেই নিয়ে যাস। ছেলেটার কথা বলছি লো, এবার অতি-অবশ্য ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাবি, কারও কোন কথা শুনবি না। তোকে একবারে দিয়ে গেলুম, আজ থেকে তোর ওপরই পুরো ভার দেওয়া রইল। তোর ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ করবি—যেমন পারিস। খরচ-পত্তর কিছু দিতে পারবে না তোর ভাসুর, সে ভরসা নেই। তবুও তোকে বলতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ হচ্ছে না, তার কারণ তোকে আমি চিনে নিয়েছি, হয়ত ঠাকুরপোর চেয়েও ভাল চিনেছি। একমাত্র তোকেই এ দায় চাপানো যায় অনায়াসে। নইলে আমার বাপের বাড়িতে তো হাটের ফিরিঙ্গি, বোনই রয়েছে একগাদা। তাদের চেয়ে তুই ওকে ঢের বেশি দেখবি তা আমার বিশ্বাস আছে। তাছাড়া ঠাকুরপোও—যত দুঃখীই হোক, পয়সার যত মায়াই হোক ওর—আমার ছেলেকে ও ফেলবে না—আমি জানি।'

আরও খানিকটা চোখ বুজে শুয়ে থাকে রানী—শ্রান্তভাবে, তারপর চুপি চুপি বলে, 'কথা কইতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে আজ। একসঙ্গে এতকথা আজকাল আর বলতে পারি না।

BanglaBook.org

তার ওপর তোদের দেখে এত কথা একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করছে বুকের মধ্যে যে—তাইতেই যেন আরও কষ্ট হচ্ছে, হাঁপ ধরছে।'

কনক এতক্ষণ পরে কথা বলার অবকাশ পায়। ব্যাকুল হয়ে বলে, 'থাক না দিদি, এখনই সব বলতে হবে তার মানে কি—? আমরা তো এখনও আছি কদিন!'

'তোরা আছিস, কিন্তু আমি থাকব কিনা, সেইটেই যে ঠিক পাচ্ছি না। কেবলই ভয় হচ্ছে যদি বা দুটো-একটা দিন আরও থাকি—বুলি হয়ত হরে যাবে। জিভটা কেমন এলিয়ে এলিয়ে যাচ্ছে—দেখছিস না?... না বলেই নিই—যা বলবার।'

তারপর কনকের দিকে কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, 'আমার বড্ড ভয় হ'ত যে তুই হয়ত আমাকে ভুল বুঝে বসে থাকবি! আবার ভাবতুম যে আমি যখন বিবেকের কাছে খালাস আছি—তখন এত ভয়ই বা কিসের? ঠাকুরপোকে দিয়ে আমার ভাইয়ের অভাব বন্ধুর অভাব মিটেছিল। তার চেয়ে বেশি কিছু—অন্য চোখে কোনদিন দেখেছি কি অন্যভাবে ভেবেছি বলে তো আমার মনে হয় না। নিজের মন বেশ ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছি—মনের কাছে পোষ্কার আছি আমি, একথা জোরগলায় বলতে পারি। আর ঠাকুরপোও বোধ হয়—ঠিক যাকে কুদৃষ্টিতে তাকানো বলে তা কোনদিন তাকায় নি। আমাকে দেখে ওর চোখ ধেঁধেঁ গিয়েছিল এই পর্যত। কী চায় তা বোধ হয় নিজেও ভেবে পায় নি কোনদিন!'

আবারও হেসে ওঠে একটু, তবে এবার নিঃশব্দে নয়, অভ্যাসমতো খিল-খিল ক'রেই হেসে ওঠে, বলে, 'তবে ভাই আজ মানছি, মরণের দিকে পা তুলে আর মিথ্যে কথা বলব না, দোষও ছিল একটু। তোর যে কী করে দিন কাটছে তা আমি জানতুম। তবু গোড়াতেই কাটান ছিঁড়েন করে দেবার চেষ্টা করি নি, তোর বরকে সরিয়ে দিতে পারি নি। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে, আমার কাছে থাকতে পেলে ও আর কিছু চায় না—এইটেই মিষ্টি লাগত মনে মনে। কে জানে—মেয়ে জন্মেরই দোষ বোধ হয়, পুরুষ পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে এটা জানতে পারলে আর কিছু চায় না, পুরুষ নাচাতে মেয়েজাতের বড় সুখ। আবার তাতে যদি জানতে পারে সে অপর মেয়ের মনে রীষ হচ্ছে এজন্যে, তো কথাই নেই।...কিন্তু আজ সেজন্যে সত্যিই মনে মনে বড় আপসোস হয়, বিশ্বাস কর! আজ বুঝতে পারি সেদিন কী কষ্ট পেয়েছিস তুই, মনে হয় এটা, খেলার জিনিস নয়। তুই তো মিথ্যে বলে জানতিস না—তোর মনে সেটা সত্যি ছিল,...তবে তাও বলি, তুই বড় বোকাও ছিলি, পুরুষকে জোর ক'রে বশ করতে হয়—কবে তার দয়া হবে বলে বসে থাকতে আছে?...যাক, সে সব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আজ যখন ষোল আনা বুঝে পেয়েছিস তখন মনে আর কোন দুঃখ রাখিস নি বোন—হয়ত সেইটুকু অন্যায়ের জন্যেই আমাকে, ছেলে-মেয়ে স্বামী, নিজের নতুন বাড়ি, এমন পাতানো সংসার ফেলে এমন অসময়ে চলে যেতে হচ্ছে—কে জানে। অন্তত সেই ভেবেই তুই আমাকে মাপ করতে চেষ্টা করিস, আর কোন অভিমান রাখিস নি!'

'কী বলছ দিদি, ছি! আমার মনে আর কোন ময়লা নেই। যখন ছিলও, তখনও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নি।'

'তা জানি। সেইজন্যেই তো এত লোক থাকতে মরবার সময় তোকেই ডেকেছি, সবচেয়ে ভারী বোঝাটা তোর ঘাড়েই চাপিয়ে যাচ্ছি।'

হেম বাইরে গোবিন্দর সঙ্গে কথা কইছিল। এখন দুজনেই কাছে এসে দাঁড়াল। হেমের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'ঠাকুরপো, তোমাদের হাতে ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছি ভাই, যতটা পারো মানুষ ক'রো। মেয়েরা সেয়ানা হয়েছে—ওদের বিয়ে দিতেই হবে তোমার দাদাকে—যেমন করে হোক, আর বিয়ে হয়ে গেলে ওদের দায়ে নিশ্চিন্তি, যে যার শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। ছেলেটার জন্যেই ভাবনা।'

BanglaBook.org

একটু থেমে—স্বামীর দিক তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে আবার হেমকেই বলল, 'তোমার দাদাকে আবার বিয়ে করতেই হবে, বিয়ে না ক'রে থাকতে পারবে না ও, বৌ একটা অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তো!...তা সে মানুষটার ওপর চিরকালের জন্যে সতীনের একটা বোঝা চাপিয়ে যেতে চাই না!'

গোবিন্দ ম্লান হেসে বললে, 'হ্যাঁ—তা আর নয়! আবার বিয়ে করছে না...পঞ্চাশ অনেকদিন পেরিয়ে গেছে...সে হুঁশ আছে?'

'বড্ড আপসোস হচ্ছে, না? মলুমই যদি সেই তো দু'চার বছর আগে মলুম না কেন?...তা বাপু অত ভেবেচিন্তে দেখি নি—দেখলেও না হয় দু'দিন আগে তৈরি হতুম। সে যাকগে মরুক গে—অপরাধটা ক্ষ্যামাঘেন্না করে নিও; কী আর করবে। তবে বিয়ে তোমাকে করতে হবেই, করবেও—তার জন্যে অনত্থক লজ্জা পেও না। ষোল বছর বয়স থেকে ঘরণী গিন্নী বৌ নিয়ে ঘর করছ—এই বুড়ো বয়সে বৌ ছাড়া থাকতে পারবে না।...মার তো ঐ অবস্থা, তাঁকেই কে দেখে তার ঠিক নেই।...ঠাকুরপো, একটা মেয়ে দেখেশুনে দিও তো ভাই, লক্ষ্মীটি। তবে যেন খুঁজে পেতে আমার চেয়ে সুন্দর একটা ধরে এনো না—তাহ'লে মরেও শান্তি পাব না! রূপের গরবটা যেন থাকে আমার।'

অনেক চেষ্টায় অনেক কথা বলে একেবারেই বুঝি শক্তির শেষ সঞ্চয়টুকু ফুরিয়ে যায় তার। শ্রান্ত হয়ে হঠাৎ চোখ বোজে, আর বুজেই থাকে। চোখও খোলে না বা কথা বলার চেষ্টাও করে না আর।

রানীদি যা আশঙ্কা করেছিল তা যে আদৌ অমূলক নয়—সেটা ক্রমশঃ বুঝতে পারে কনক। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে রানীর নির্ভুল হিসাব দেখে অবাক হয়ে যায় সে। সত্যি সত্যিই বুলি হরে গেল ওর—সেইদিন, সেই মুহূর্ত থেকে। তারপর দুটো দিন দুটো রাত একটাও কথা কইল না, একবারও চোখ খুলল না। অথচ সেটা ঘুম নয়—তাও বুঝতে কোন অসুবিধা রইল না কারও। কারণ কনক যতবার ওষুধ কি পথ্য খাওয়াতে গেল—হাঁ করতে বলতেই হাঁ করল সে। খেলও একটু হয়ত—এক আধ ঢোঁক। কিন্তু খেতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল তার, একটু খেয়েই শ্রান্তি বোধ করছিল—একবার দুবারের পরই ঘাড় নেড়ে নিষেধ করছিল কিম্বা মুখ বুজে ফেলেছিল। অর্থাৎ সবই শুনছে সবই বুঝছে—শুধু নিছক শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই চোখ খুলতে বা কথা কইতে পারছে না।

যেমন হঠাৎ মুখ বুজে ছিল, তেমনি হঠাৎই ঐ দুদিন পরে আবার মুখ খুলল সে।

সেদিন সকালে কনক ওর বাসি কাপড়টা ছাড়িয়ে যখন একটা কাচা কাপড় পরাচ্ছে—অকস্মাৎ তাকে চমকে দিয়ে চুপি চুপি বলে উঠল, 'দেরাজের মধ্যে একটা লালপাড় ফরাসডাঙ্গার শাড়ি আছে—আমাকে জন্মের ভাত-কাপড় দিয়েছিল এরা—সেইটে বার ক'রে পরিয়ে দে। ঐ কাপড় পরে মরব—অনেকদিনের ইচ্ছে!'

কনক খুব একটা প্রতিবাদ করতে পারল না, কারণ রানীর কোন কথাই উড়িয়ে দেবার মতো নয়—এটা বুঝেছিল, তবু বলল একবার, 'তা যেদিন মরবে সেদিন মরবে—আজ তার কী?'

'ওলো নেকী, আমার কথাটা শোন। যা বলছি জেনেই বলছি।'

তারপর ওর কথার আওয়াজ পেয়েই, গোবিন্দ এসে দাঁড়াতে, চোখ খুলে একবার তার দিকে চেয়ে বলল, 'একবার কাছে এসো তো, এই বেলা জ্ঞান থাকতে ক্ষমতা থাকতে পায়ের ধুলোটা নিয়ে নিই।...অনেক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে গেলুম—না কি যেন বলতে হয় না মরবার সময়? সে সব কিন্তু বলতে-টলতে পারব না আমি। এমন কিছু জ্বালাতন-পোড়াতন করি নি তোমায়।...কৈ গো, পাথর হয়ে গেলে যে একেবারে, এসো এসো, এইখেনে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়াও! পায়ের ধুলো দেবে বৈ—খরচের ব্যাপার কিছু নয়।...আর মাকেও একবার আসতে বলো, তাঁর পায়ের ধুলোটাও নিয়ে নিই। সত্যি, শাশুড়ী পেয়েছিলুম রে—যদি মেয়েজন্ম আবার নিতেই হয় তো জন্মে জন্মে যেন এমনি শাশুড়ী পাই!'...

আরও খানিক পরে, হেমকে কাছে ডেকে বললে, 'জ্বালাতন বরং তোমাকেই যা একটু করেছি ভাই, পার তো আমাকে মাপ ক'রো! আর মরেই যাচ্ছি যেকালে—মাপ না ক'রে উপায় কি? তোমার একটু দুঃখু হবে জানি।...তবু, তুমিই দাঁড়িয়ে থেকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিও—যাতে শ্মশানেও সকলে তাকিয়ে দেখে।...একটা মজার কথা জানিস কনক, তোর বর জানে, ও ছিল সেখানে—আমার বাবা শ্মশানে দাঁড়িয়েই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল!'

হাসবার চেষ্টা করল সে—কিন্তু হাসির সেই মিষ্টি শব্দটা আর বেরোল না গলা দিয়ে।

একটু পরে আবার হেমের দিকে চেয়েই বলল, 'ছেলেমেয়েগুলোকে সকাল ক'রে খাইয়ে নিয়ে তোমাদের বাড়ি মাসীমার কাছে রেখে এসো গে। মায়ের মৃত্যুটা আর এ বয়সে না-ই দেখল ওরা, শুধু শুধু বিশ্রী স্মৃতি একটা থাকবে।...তোমারাও খেয়ে দেয়ে নাও গে সকাল সকাল। বিকেলের আগেই বাঁশ কাটতে ছুটতে হবে!'

বলতে বলতে কাশির ভঙ্গি হ'ল একটা মুখে। আবার চোখ বুজল।

আবার কথা বলল একেবারে বেলা একটা নাগাদ।

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই—সেটা এরা সকলেই বুঝতে পেরেছিল। ডাক্তারও ডেকে এনেছিল একবার—তিনি অক্সিজেন আনার কথা বলেছিলেন। অবশ্য একথাও বলেছিলেন, কলকাতা থেকে ভাড়া ক'রে আনা পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সে চেষ্টা করা হয় নি। গোবিন্দ ঘটনাটার এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় যেন কেমন জড়ভরতের মতো হয়ে গেছে—তার মাথাতে কিছু আসছেও না। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসবে—তা গোবিন্দ ভাবে নি একবারও। দেখা গেল ডাক্তারের চেয়ে রানী নিজের শরীরের অবস্থা বেশি বুঝেছিল।

একটার সময় কনককে চোখের ইশারায় কাছে ডেকে বলল, 'একবার একটু চুপি চুপি ভগবানের নামটা শুনিয়ে দে তো ভাই—গুচ্ছের চিৎকার আমার ভাল লাগে না। সব যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, এর পর শোনালেও আর শুনতে পাবো না।...আর অমনি, যদি পারিস একটু তো—ডান দিকে পাশ ফিরিয়ে দে। আমার আবার পোড়া অব্যেস—পাশ ফিরে না শুলে ঘুমটা যেন জমে না। সমস্ত শরীর এলিয়ে ঘুম আসছে—এবার একটু আরাম ক'রে ঘুমুই। কতকাল যে ভাল ক'রে ঘুম হয় নি—'

তারপর মুখ টিপে একটু হেসে চোখে সেই চিরপরিচিত কৌতুকের নৃত্যোচ্ছলতা ফুটিয়ে বলে, 'কেমন লো, এবার যমের মুখে দিয়ে নিশ্চিন্তি তো?'

কনক প্রাণপণে চোখের জল চেপে অস্পষ্ট, প্রায় বুজে-আসা কণ্ঠে তিনবার তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে তাকে আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দেয়। রানীও বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে পাশবালিশটা ভাল ক'রে জড়িয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে শুয়ে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর সত্যি-সত্যিই যেন ঘুমিয়ে পড়ে, গাঢ় নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রায়।

তারই মধ্যে যে কখন শেষনিঃশ্বাসটা পড়ে থেমে যায় সব—সেটা এরা ভালমতো বুঝতেও পারে না।

BanglaBook.org

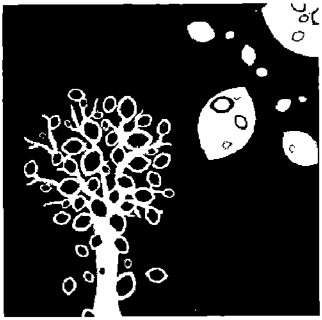

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

'হিড়িক, বুঝলি—ও অমন এক-একটা আসে মধ্যে মধ্যে। ও আমি ঢের দেখেছি। বলি বয়স তো আর আমার কম হ'ল না। কত হিড়িকই এল গেল—আমি ঠিক আছি। কিছুদিন অন্তর অন্তরই এই রকম এক একটা হুজুগ আসে। যারা পাগল যারা ছন্ন, তারাই ঐ সব হুজুগে ধেই ধেই ক'রে নাচে।...ও সব দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলুম।...তোরা বললি তোমরা চলে যাও, আর অমনি ওরা বাপের সুপুত্তুর হয়ে চলে গেল সব।...ওঁরা খুব বাহাদুর হয়েছেন কিনা, সবাই একেবারে ওঁদের ভয়ে জুজু হয়ে গেছে। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। ইংরেজ একটা বন্দুকের শব্দ করলে বাবুরা কে কোথায় থাকবেন সব তার ঠিক নেই—ওঁরা হুমকি দেবেন আর সেই ভয়ে ইংরেজরা অমনি শ্যালের গত্ত খুঁজবে লুকোবার জন্যে।...সেই সেবার—সেই যখন প্রথম স্বদেশী হুজুগ ওঠে—ব্যাংবাবু না কে এক গান বেঁধে ছিল না, খুব চলত গানটা তখন—বাংলা এবার স্বাধীন হবে বক্তৃতার জোরে, বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে* ...সেই বিত্তান্তই তো চলছে দেখছি আজও! কী সমাচার না ওঁরা সব কংগ্রেস-ওলারা অনেক ভেবেচিন্তে বেয়ে চেয়ে দেখে বক্তৃতা দিলেন, ইংরেজ, তোমরা ভারত ছাড়!! ওরা যেন ঐ গান্ধী মুখপোড়ার হুকুমটারই ওয়াস্তায় বসে ছিল এত দিন—মোট-ঘাট বেঁধে জাহাজঘাটায় গিয়ে—হুকুম পাস হয়েছে, সব অমনি দুদ্দাড় পালাবে! রেখে বোস দিকি ওসব কথা!...ঐ ক'রে মাঝে-মাঝে হুজুগ তুলে এক দল লোক নিজের দিন কিনে নিচ্ছে, আর চিরকাল একদল বোকা মুখ্যু আছে তারা মরছে জেল খেটে ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়ে!'

অন্য লোকের অভাবে নাতি বলাইকেই হাত-পা নেড়ে বোঝান শ্যামা। এক-এক সময় দীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাকে ধরে। বলাই উপলক্ষ্য, সে এসব কথা বোঝেও না, বোঝার কোন গরজও নেই তার—কিন্তু তাতে শ্যামার কিছু যায়-আসে না, কেউ না থাকলেও আজ-কাল অমনি বকে যান শ্যামা বয়স বাড়ার জন্যই হোক আর নানা রকম আঘাত সয়ে সয়েই হোক, তাঁর সেই আগেকার স্বভাবগাম্ভীর্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যে বকুনি বা 'থগবগানি' তিনি চিরকাল অপছন্দ করতেন—সেই বকুনি এখন যেন তাঁকেই পেয়ে বসেছে, বকুনি ছাড়া থাকতেই পারেন না আজকাল। কোন কারণ থাকলেও বকেন, না থাকলেও বকেন, কারণ সৃষ্টি ক'রে নেন বকবার জন্যে।

BanglaBook.org

* 'বেজায় আওয়াজ' প্রহসনে গানটি আছে। রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাংবাবু)। দীর্ঘকাল আবুহোসেন গীতিনাট্যর সহিত প্রহসন হিসাবে অভিনীত হইয়াছিল। গানটির পংক্তিগুলি এইরূপ : 'বাংলা এবার স্বাধীন হবে বক্তৃতার জোরে, বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে। বাঙ্গালীর নাইকো একতা, বলো বলে কে একথা? প্ল্যাকার্ড মারো হবে বক্তৃতা, হররঙা পোশাকে অমনি টাউনহল যাবে ভরে।'

বকুনির মধ্যে আবার গালাগালেরই অংশ বেশি। কাউকে না কাউকে গালা গাল দিয়েই যান। ছেলে-বৌ মেয়ে-জামাই পাড়া-পড়শী—মায় দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতারা পর্যন্ত। শেষে, যখন আর কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকে না তখন গাছপালাগুলোকে নিয়ে পড়েন, 'তোরাই কি কম শত্তুর সব! সব বেইমান, একধার থেকে সবাই বেইমান তোরা।...এত ক'রে কন্না করছি, একটা ফল দেবার নাম নেই কারুর! খাচ্ছেন-দাচ্ছেন যেন বনবাগে ধাইছেন সবাই। কেন, অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে তো ফল-ফসল ঢেলে দিয়ে আসতে পারো সব!...আমি কী এমন শত্তুরতা করেছি তোদের সঙ্গে যে আমার ওপর এত আড়ি-আকচ?...মর মর সবাই মর তোরা। দোব নবাবী ঘুচিয়ে একদিন—কাঠওলা ডেকে সব গাছ কাটিয়ে যখন বিক্রি ক'রে দোব—তখন বুঝবেন সব।...কেন, কেন—সুখসোমন্দা আমার মাটি জুড়ে বসে থাকবি শুনি!'...

পাড়ার লোক বলে পাগল। বলে নতুন বামুনদের বুড়িটার শোকে তাপে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলাইয়েরও তাই ধারণা। পাগল সে বেশি দেখে নি বটে তবে পাগলদের কথা শুনেছে সে। এখানে বাজারে যে বুড়ো পাগলটা একেবারে উদোম বসে থাকে ময়রাদের উনুনের ধারে—সেও তো অমনি, দিন-রাত বকে আর গান গায়। এ বুড়ি গান গায় না বটে বকে তার চতুর্গুণ।

বলাইয়ের এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করে না এখানে। নিহাৎ কোথাও তার স্থান নেই বলেই পড়ে থাকতে হয়। বড়মাসী আগে আগে বলত তার ওখানে গিয়ে থাকার কথা—কিন্তু এখন আর উচ্চবাচ্য করে না। তাদের অবস্থা নাকি খারাপ হয়ে পড়েছে—মেসো-মশাইয়ের চাকরি চলে গেছে—এক পয়সা রোজগার নেই, গুষ্টিসুদ্ধ মেজ-কর্তার 'হাততোলা'য় দিন কাটাচ্ছে। ও-বাড়ির মেজদার বিয়ের আগে নাকি মেজকর্তা ওদের একটা মুদির দোকান ক'রে দিয়েছিলেন—ওরা সেটা চালাতে পারে নি, হাজার বারো শ' টাকা ঘুচিয়ে আবার ঘরে এসে বসেছে সবাই। কাজেই সেখানে গিয়ে ওঠবার কোন উপায় নেই।

আর হুট বলতে কোথাও যেতে আর ভরসাও হয় না ওর। ইদানীং দিদিমার মেজাজ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর—তেমনি অর্থপিশাচও হয়ে উঠেছে। মেজমাসীর দুর্দশা তো চোখেই দেখল সে। অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে এসে দাঁড়াল—ঠিক রাস্তার কুকুরের মতো দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে দিদিমা। ঝ্যাঁটা মেরে তাড়ানোটা মুখের কথা নয় ওর—সত্যি-সত্যিই ঝ্যাঁটায় হাত দিয়েছিল, যদি আর একটু দেরি করত উঠতে তো হয়ত সত্যিই ঝ্যাঁটা তুলত বুড়ি। বড়মাসীর বাড়ির কেউ বিশ্বাস করে নি কথাটা—কিন্তু বলাই নিজের চোখে দেখেছে। হ্যাঁ, মেজমাসীর দোষ আছে হয়ত—অসময়ে এসে উঠেছে, তারপর সুযোগ পেলেই চলে গেছে, এদের সুবিধে-অসুবিধেয় দিকে তাকায় নি—কিন্তু তবু পেটের মেয়ে তো হাজার হোক—ঐ মড়ার দশা হয়ে এসে দাঁড়াল, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে দিলে না। বাইরে থেকেই বিদেয় ক'রে দিলে। বাইরের বাগানে বসে পড়েছিল, সেইখান থেকেই উঠে চলে গেল, চোখের জল মুছতে মুছতে। শেষ পর্যন্ত সেই বড়মাসীর বাড়ি গিয়েই উঠতে হ'ল তাকে। বরং মেজকত্তা—সে তো পর বলতে গেলে—সে অনেক ভদ্রতা করেছে। পাঁচ-ছ দিন ওখানে রেখে, ছেলেদেরে দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে, বলে কয়ে একেবারে দশ-পনেরো দিনের মতো ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে ছেড়েছে সে। মায় একখানা নতুন থান ধুতি, মেয়ের বাড়ি যাবার গাড়িভাড়া পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে যাবার সময়। বড়-মাসীকেও মানতে হয়েছে যে, 'হ্যাঁ, মেজকত্তা আমার মানটা রেখেছে বাপু, সেটা গরমান্যি যেতে পারব না।'

বলাই তবু শেষ পর্যন্ত আশা করে ছিল যে দু-চার দিন পরে দিদিমার মনটা নরম হবে, ওবাড়ি থেকে ডেকে পাঠাবে। ডেকে পাঠানো তো দূরের কথা, একটা উদ্দেশও করলে না। বরং মেজদা উপযাচক হয়ে একদিন খবরটা দিতে এলে বলেছিল, 'ওসব কথা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। ওকথা আমি শুনতে চাই নি। আমার মেজ মেয়ে অনেকদিন মরে

BanglaBook.org

গেছে, খাল-ধারে গেছে—এই আমি জানি। তার কথা ছাড়া যদি আর কোন থাকে তো বলো!'

এরপর দিদিমার আশ্রয় ছাড়বার কথা ভাবতেও সাহস হয় না বলাইয়ের। দিদিমা যে বলে, 'কাউকে চাই না আমার, কাউকে দরকার নেই। আমার সগুষ্টি মরে-হেজে গেছে এই জেনে আমি নিশ্চিন্তি আছি'—সেটা কথার কথা নয়। বুড়ি একেবারে একাই থাকতে পারে, সত্যিই হয়ত কাউকে দরকার নেই ওর।

আর গেছেও তো একে একে সবই চলে—নিহাৎ বলাইয়ের কোন উপায় নেই বলেই যেতে পারে নি—কিন্তু শ্যামা তো ঠিক মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছেন। কাউকে কোনদিন কাকুতি-মিনতিও করেন না এসে থাকতে—কারুর বাড়ি গিয়েও ওঠেন না। নিজের গাছ-গাছালি, তরুকলা আমড়া শসা কলা-নারকেল আর নারকেলের পাতা, ঝাঁটার কাঠি এবং সুপুরি নারকেলের বেল্‌দো—শুকনো বাঁশপাতা আমড়া-পাতা, এই সব নিয়েই দিন কেটে যায় তাঁর। পাঁচটা মানুষের মুখও যে না দেখেন তা নয়, অধমর্ণের দল তো আছেই। নিত্যনিয়তই আসে তারা। সব জড়িয়ে একটা নিরন্ধ্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটে বরং।

ওরই মধ্যে এগারোটায় হোক বারোটায় হোক—অথবা তিনটেতেই হোক, উনুনও জ্বালেন একবার ঠিক। নিহাৎ ভাতে-ভাতও খান না—একটা-দুটো তরকারিও রান্না করেন। কারণ তাঁর ঘরেই রান্নার বহু উপকরণ থাকে। তবে রাঁধেন ঐ একবারই। যা রাঁধেন তাই থেকেই খানিকটা সরিয়ে রেখে দেন বলাইয়ের জন্যে। সে সন্ধ্যার পরই খেয়ে নিয়ে ও-পাট চুকিয়ে ফেলে। একটা ছেলের জন্যে দুবেলা উনুন জ্বালার পরিশ্রম আর করেন না।

তবে এখনও পর্যন্ত—এসব পরিশ্রম ওঁর গায়েও লাগে না। শুধু রান্নাই নয় বা ঘরের কাজই নয়—বাসনপত্রও ওঁকেই মেজে নিতে হয়। একটু ঝুঁকে পড়ছেন আজকাল—ভারী জিনিসপত্র বা বাসন নিয়ে আনাগোনা করতে কষ্ট হয় ঠিকই—কিন্তু করে যান উনি মুখ বুজেই। টাকাখানেক মাইনে দিলেই একটা ঠিকে-ঝি পাওয়া যায়—আজকাল এখানেও ঠিকে ঝিয়ের চলন হয়েছে—কিন্তু শ্যামার কাছে এতটা বাজে-খরচ কল্পনাতীত। একটা টাকা মানে তাঁর কাছে মাসে দু পয়সা হিসেবে সুদ, অর্থাৎ বছরে ছ আনা। তিন বছরেরও কম সময়ে সে টাকাটা দুটো টাকায় পরিণত হ'তে পারে। একটা টাকাও এমন কিছু ফেলনা নয়। টাকা তো টাকা, সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা বেরোয় না। একটা টাকা যদি এতই তুচ্ছ হ'ত তা'হলে রাজ্যের লোক সেই এক টাকা ধার করবার জন্যেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত না তাঁর দোরে—তাও ঘর থেকে জিনিস বার ক'রে।

তাছাড়া, দরকারও নেই তাঁর অত সুখে। তিনি বেশ আছেন। ভালই আছেন! একটু ঝুঁকে পড়েছেন বটে, বেশি চলাফেরা বা বেশি কাজকর্ম করলে পিঠটা টনটন ক'রে ওঠে, তখন হাতের কাজ বা বোঝা ফেলে একবার পিঠটা ছাড়িয়ে না নিতে পারলেও চলে না, কিন্তু তাই বলে দিদির মতো একেবারে অথর্ব হয়েও যান নি। হাত-পা এখনও তাঁর তাঁবে আছে। আর তা যতদিন আছে ততদিন কারও সাহায্য চানও না তিনি। বসে খাবার শখ তাঁর নেই। কোন কালেই ছিল না। সুখ যে তাঁর অদৃষ্টে নেই তা তিনি জানেন। অদৃষ্টে না থাকলে সুখভোগ হয় না। ঐ তো দিদিই—ছেলে পর পর তিনটে বিয়ে করল, শেষের বিয়ে তো করলে স্রেফ মায়ের দোহাই দিয়েই, কাজ করার লোক চাই এই অজুহাতেই অমন সোনার প্রতিমার আসনে এনে বসালো কালো 'ব্রেষকাট' ঐ মেয়েছেলেটাকে—তাই কি দিদি বসে খেতে পারছে? উঠতে পারে না, পা দুটো পড়ে যাবার মতো হয়েছে—তবু পাছা-ঘষে-ঘষে, হামাগুড়ি দিয়েও রান্নাবান্না কাজকর্ম করতে হচ্ছে। না ক'রে উপায় কি, এ বৌ যা কাজের—দিনান্তে এক গাল ভাত কারুর জুটত কিনা সন্দেহ, দিদি না সঙ্গে থাকলে।...পঙ্গু হয়ে, মরে মরেও সব করতে হচ্ছে দিদিকে, অথচ ঐ দিদি এককালে এক ঘটি জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় নি নিজে হাতে।...

BanglaBook.org

না, সুখ যার অদৃষ্টে নেই তার সুখভোগ হয় না কিছুতেই। তাঁরও তো বাড়-বাড়ন্ত সংসার দেখে মা বিয়ে দিয়েছিলেন। সব যেন উড়ে-পুড়ে গেল—তিনি যেতে না যেতে।...তাও, বহু দুঃখ, বহু লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে যদি বা আবার একটা সংসার খাড়া করলেন—ভোগে কি এল? বড় ছেলে, বড় বৌ, নাতি-নাতনী—সবাই তাঁকে এই বনবাসে ফেলে রেখে চলে গেল, পর হয়ে গেল হয়ত বা চিরকালের মতোই। আগে বছরে দু-তিনবার আসত—এখন কালেভদ্রে আসে। বছরে একবারও হয় কিনা সন্দেহ। ওঁর এ-বাড়ির খাওয়া খেয়ে নাকি তারা থাকতে পারে না। সেখানে তিন আনা সের মাছ, রোজ মাছ খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে—এখানে থোড়-সড়সড়ি ডুমুরের ঝোল দিয়ে ভাত রোচে না তাদের মুখে। নবাব সব! নবাবপুত্তুর! তার ওপর আবার গোবিন্দর ছেলেটা গিয়ে জুটেছে ঐখানে—তার আরও নবাবী মুখ।—বৌ গিন্নেমো ক'রে নিয়ে গেছেন, কাউকে জিজ্ঞেস নেই, মত নেওয়া নেই। দাসীবাঁদী যা হোক একটা পড়ে আছে তা একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করেন নি। যার সুবাদে সুবাদ সে-ই কিছু টের পেল না, একটা বোঝা চেপে গেল মাথায় চিরকালের মতো। ইচ্ছে করে যেচে সে বোঝা চাপানো হ'ল। আহাম্মক সব। আহাম্মক। নইলে ছেলে-মেয়েদেরই কি ঐভাবে তৈরি করে! কত মাইনে পাস রে বাবা—যে মাছ না হ'লে ভাত ওঠে না মুখে! তোদের বাপের যে ঐ ডুমুরের ডালনা শুষুনি শাকের ঝোল দিয়েও ভাত জোটে নি একককালে। একবেলা শুধু ভাত দুটি পেলেও বেঁচে যেত সে তখন।...তাতেও তার যে স্বাস্থ্য ছিল, যে খাটবার শক্তি—তা কি তোরা অত মাছ দুধ খেয়েও পাবি কখনও?...

না, পাঁচটা মানুষের মধ্যে থাকা কি কারও সাহায্য পাওয়া ভগবান তাঁর অদৃষ্টে লেখেন নি যখন—তখন তিনিও চান না মিছিমিছি টানাটানি করে ছেঁড়া-চুলে খোঁপা বাঁধতে। শুধু বড় ছেলে কেন—ওদের সবাইকেই খরচের খাতায় তুলে রেখেছেন তিনি। নইলে দু-দুটো মেয়ে বিধবা হয়ে শুধু-হাত করে এসে উঠল—তবু, তাদের ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে রাজি হয়েও, তাদের কাউকে ধরে রাখতে পারলেন না কেন, তারা কেউ কাজে এল না কেন?...একজন তো মরেই গেল—মরার বাড়া গাল নেই—আর একজন 'হুতোশনী' মূর্তি ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাত দোরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে, সেও তার ভাল—তবু মার কাছে সম্মানের ভাত বসে-খাওয়া—তাও ভাল লাগে না। বিনা খাটুনীর রাঁধা ভাত তেতো লাগে তার। তা লাগুক—শ্যামা ঠাকরুনের কিছু এসে যায় না তাতে।...

বেশি কথা কি—কালা-হাবা কাজের-বার ছেলেটার বিয়ে দিলেন—বেছে বেছে যার সাত কুলে কেউ নেই—বাপে-মরা মায়ে-খেদানো মেয়ে দেখে—সেও তেজ দেখিয়ে চলে গেল। তেজ যে দেখাল, দেখাতে পারল সেও বিধাতার বাদসাধা বলতে গেলে। ছাপাখানায় পনেরো টাকা মাইনের চাকরি ক'রে আর বাছাধনকে এই বাজার মাগ-ছেলে পুষতে হ'ত না। কোথা থেকে সেই ছাপাখানার মালিকের বন্ধু এক মাড়োয়ারীর নজরে পড়ে গেল তাই। বদ্ধ কালা আর ভালমানুষ-মতো দেখে কী মনে হ'ল—দয়াই হ'ল কিম্বা অন্য কোন মতলব খেলে গেল মাথায়—এক টুকরো কাগজ দিয়ে এক লাইন ইংরিজি লিখতে দিলে। কান্তির হাতের লেখা চিরদিনই ভাল, মুক্তোর মতো—দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। তখনই ওর সেই মনিবকে বলে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল নিজের গদিতে—এক কথায়, সেধে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরিতে বসিয়ে দিলে সেই দিন থেকে। অফিসে বসে অপর বাবুদের সঙ্গে কাজ করতে হয় না—বাবুর বাড়িতে বসেই কাজ ওর। বিকেলে টিফিন পর্যন্ত দেয় বাবুর বাড়ি থেকে—ফল মিষ্টি নানা রকম ঘিয়ে-ভাজা খাবার। মাড়োয়ারী বাবুটির নাকি কি সব নিজস্ব খাতা লেখার কাজ আছে, সে সব হিসেব আলাদা, বাড়িতে বসেই করতে হয়—সেই জন্যেই খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর, বদ্ধ কালা লোক—কারও সঙ্গে চট ক'রে গল্প জমাতে পারবে না, এই দেখেই পছন্দ হয়েছে আরও।

BanglaBook.org

তা সে মাইনে কি আর তাঁর ভোগে লাগল? যেমন চাকরি পাওয়া—সর্বনাশী বৌ যেন টাক করে ছিল ('তা ওরই সিন্নি তো ঠাকুর খেলে বাপু', শ্যামা মনে মনে বলেন, 'ঠাকুর মুখপোড়ারাও তো কম এক-চোখো খোলো নয়!')—সঙ্গে সঙ্গে বরকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। এমন পাকা ঘরে থাকা, এমন নিজের বাড়িতে সম্মানের থাকা ভাল লাগল না তাদের, বালিগঞ্জের দিকে মনোহরপুকুর না কি এক পাড়ায় গিয়ে বস্তিতে উঠেছে—সেইখানেই দু-টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া ক'রে! খুব সুখে আছে। এখানে অর্ধেক কাজ তো শ্যামাই ক'রে দিতেন, উনুনের ধারে তো যেতেই হ'ত না বলতে গেলে—সেখানে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করতে হচ্ছে। ছেলে হয়েছে—হাসপাতালে গিয়ে খালাস হয়ে এসে সেই অবস্থাতেই—আঁতুড়ের মধ্যেই নাকি রান্নাবান্না সব করছে। সেই ভাত ছেলেও খাচ্ছে। তবু সেও নাকি ওদের ভাল।

অথচ কী যে অনিষ্ট ওদের করছিলেন তিনি, তা আজও ভেবে পান না। বৌকে যে তেমন কোন বকাঝকা করতেন তাও নয়—সত্যি কথা বলতে কি করতে সাহসই হ'ত না—ঝগড়া তো কোন দিন করেনই নি। তাও তার এত অসহ্য হ'ল? তার চেয়ে ঢের বেশি সয়েছে বড়বৌ—তা মানতেই হবে। আর কান্তি, কান্তিকে তো বুকে করে রেখেছিলেন, যাকে বলে ডানার আড়ালে, সেও অনায়াসে এতটা বেইমানী করতে পারল! আশ্চর্য!

আবার ভাবেন, আশ্চর্য হবারই বা কি আছে! বেইমানের ঝাড় যে ওরা। যেমন বংশ তেমনি হবে তো।

তা তিনিও তেমনি—এক মাসের ছেলে নিয়ে দেখাতে এসেছিল ওরা, উনি কোন কটু কথা বলেন নি বটে, তবে সে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখেন নি! আর দেখবেনও না কখনও, সেটা স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছেন। ও ছেলে তাঁর নাতি নয়, ওকে তিনি পৌত্র বলে স্বীকার করতে রাজি নন।...

এখন বন্ধনের মধ্যে এক বলাই তবে তার আশাও তিনি রাখেন না আর। বলেন, 'আগ-ন্যাঙলা যেমন গেছে পেছ-ন্যাঙলাও তেমনে যাবে।' ওরা সব বুনো পাখি, খাবে-দাবে বনবাগে ধাইবে।...যে কদিন না খুঁটে খেতে শেখে সেই কদিনই কাছে আছে। তারপর একদিনও থাকবে না আর—তা আমি বেশ জানি।...তাই আশা-ভরসাও ওদের ওপর কিছু রাখি না, মায়া-মমতাও কিছু নেই। নিহাৎ কেষ্টোর জীব পড়ে আছে, তাই দুমুঠো খেতে দিচ্ছি। ঐ পর্যন্ত! মায়া-মমতা কারুর ওপর নেইও, তার কথাও নেই!'

বলাইয়েরও যে ও বস্তুটার জন্যে খুব একটা দুঃখ আছে, তা নয়।

আজন্মই তো বলতে গেলে সে মায়া মমতা স্নেহ-ভালবাসার মুখ দেখে নি। বাপের কথা তো ওঠেই না, মা কিছুদিন ছিল, মায়ের কথা মনেও পড়ে কিন্তু সে থেকেও না থাকারই মধ্যে। মায়ের স্নেহ কাকে বলে তা বলাই জানল না একদিনের জন্যেও। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে আসছে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জড়ভরত। দিদিমার কাছে—কে জানে কেন, সে স্নেহ আশাও করে নি কোনদিন। দিদিমার সঙ্গে জড়িয়ে যেন ও বস্তুটি কল্পনাও করা যায় না। এখানে এসে একটু স্নেহভালবাসা যা পেয়েছে বড়মামীর কাছে—কিন্তু সেও এত দিনের কথা হ'ল যে, তার স্মৃতিটা পর্যন্ত ধূসর হয়ে গেছে মনের মধ্যে। ছোটবেলায় তিন বছরের স্মৃতি ভুলতে তিন দিনের বেশি লাগে না—ও বয়সে মনটাও থাকে সামনের দিকে ঝুঁকে, পেছনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো তার স্বাভাবিক নয়।

সুতরাং, স্নেহ মমতার অভাব নয়—বলাইয়ের দুঃখ অন্যত্র। তার বড় দুঃখ এই বন্দীদশা। এই একটা বাড়ি এবং বেড়া দেওয়া এটুকু জমির মধ্যে আটকে থাকা। অবশ্য এ বন্দীদশা কতকটা তার স্বেচ্ছাকৃত। সে-ই বেরোতে চায় না ইদানীং। শ্যামা বেরোতে বললে বিদ্রোহ করে, সোজাসুজি অস্বীকার করে বেরোতে। কারণ লজ্জা নিবারণের মতো কোন বস্ত্র

BanglaBook.org

তার নেই। এই জন্যেই তার লেখা-পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। যখন খুব ছোট ছিল তখনকার কথা আলাদা। ছেঁড়া পাঁচী ধুতীর ওপর মহাশ্বেতার, ছেলেদের পরিত্যক্ত ঢলঢলে পুরনো জামা পরে (তাদের নতুন জামারও যা ছিরিছাঁদ—ভদ্রসমাজে পরে যাওয়ার মতো কিনা, বলাইয়ের আজকাল সন্দেহ হয়) সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে পাঠশালায় পড়তে যেত—সেখানে তত বেমানান দেখাত না সেটা। কিন্তু ইংরেজি ইস্কুলের কথা আলাদা সেখানে ছেলেরা ফিট-ফাট হয়ে না আসুক, খুব পাগলের মতোও আসে না। অন্তত হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরে আসে একটা করে। পুরানো হলেও তাতে এক-আধটার বেশি সেলাই থাকে না। অথচ বলাইয়ের আগে যাও বা ভদ্রতা রক্ষার মতো সামান্য কিছু ছিল, তাও রইল না ক্রমশ। শ্যামা দিনদিনই খরচের হাত গুটিয়ে আনছেন। বাড়িতে পরার জন্যে ছেঁড়া গামছা বা দুসুতি বরাদ্দ হয়েছে।

এ দুসুতি বহুকাল আগে অভয়পদ দিয়েছে। আগে তাদের অফিসে বস্তা বস্তা আসত এগুলো। কী যেন কলকজা মোছা না কী কাজে লাগত। অভয়পদ মধ্যে মধ্যে কতকগুলো করে নিয়ে আসত। সে আনত বাজারের ঝাড়ন বা রান্নাঘরের হাঁড়ি-কড়া মোছবার জন্য। নিয়ে এলে এ-বাড়িতেও খানকতক করে ফেলে দিয়ে যেত। সেইগুলোই পুতুপুতু করে জমিয়ে রেখে দিয়েছেন শ্যামা। গামছা হিসেবে ব্যবহার করলে গা মোছা যায় হয়ত—কিন্তু পরে লজ্জা নিবারণ হয় না। শ্যামা বলাইকে সেই দুসুতিই মধ্যে মধ্যে একটা ক'রে বার ক'রে দেন। বলেন, 'বাড়িতে তো দ্বিতীয় জনমনিষ্যি নেই—থাকার মধ্যে তো আমি একা, তা আজকাল আমি তো চোখে ভাল দেখতেও পাই না, সব ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখি, কাজকম্ম করি আন্দাজে আন্দাজে—তা এখানে আর অত অ্যালবা-পোশাকে দরকার কি, এ-ই বেশ পরা যাবে। পরে থাক দিকি। অত কাপড় গামছা আমি যোগাতে পারব না। এত আসে কোথা থেকে? তোর বাপ কি জমিদারি রেখে গেছে? আর কী এমন নবাব খাঞ্জা খাঁ তুমি যে সিমলে শান্তিপুরের ধুতি এনে যোগাতে হবে!'

কিছুদিন যাবতই বাড়িতে এই ব্যবস্থা চলছে। আগে কোন খাতকের গলার আওয়াজ পেলে ঘরে ঢুকে বসে থাকত—কিন্তু তাতেও অব্যাহতি মিলত না, ঘরে আছে জেনে শ্যামা ডেকে এটা-ওটা ফরমাশ করতেন—আর ডেকে কোন কথা বললে মুখের ওপর কিছু না বলা যায় না—আর বেরোনো মানেই লজ্জা, মনে হয় এর চেয়ে এই মুহূর্তে মরে যাওয়াও ভাল। আজকাল তাই কাউকে বেড়ার আগড় খুলতে দেখলেই বা কারও গলার আওয়াজ পেলেই একেবারে পিছন দিকের পগারের ধারে গিয়ে বসে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের সঙ্গর থেকে গোসাপ ভাম ভোঁদড়ের সঙ্গও বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

তবু—বাইরে বেরোবার জন্যেও যদি একটা ধুতি দিতেন শ্যামা—অন্তত ওর পড়াশুনোটা বন্ধ হ'ত না। বাপ-মা মরা অনাথ বলে, বিশেষ ওর মা রেলে কাটা পড়ার পর, ওর সম্বন্ধে সকলেই একটু দয়া অনুভব করতেন—প্রথম থেকেই পাঠশালে বা ইস্কুলে ফ্রি পড়ছে। ওর বই-খাতা যা দরকার মাস্টারমশাইরাই চেয়ে-চিন্তে যোগাড় ক'রে দিতেন—পড়াশুনোতেও খুব খারাপ ছিল না—কিন্তু ইস্কুলে যাওয়াই যদি বন্ধ হয় তো লেখাপড়াটা ক'রে সে কী করে!

শ্যামা এ অসুবিধাটা আদৌ বোঝেন না। ও-বাড়ি থেকে কোথার নাম ক'রে ছেঁড়া ধুতিগুলো চেয়ে নেন—তাই আবার সেলাই ক'রে তালি দিয়ে পরতে দেন বলাইকে। সেই কাপড় পরে ইস্কুলে যেতে বলেন তাকে। বলেন, 'তুই যে গরিবের ছেলে অনাথ—সবাই তা জানে, তোর অত ভাল ভাল পোশাক না পরলেও চলবে।' কাপড় ও-ই, জামার অবস্থা আরও খারাপ। কারণ মহাদের ছেলেরা বেঁটে ধরনের, কাঁধগুলো চওড়া—বলাই এই বয়সেই বেশ ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠেছে—ঢ্যাঙ্গা আর রোগা—ওদের জামা একেবারেই তার গায়ে লাগে না। তবু প্রথম প্রথম—কতকটা পড়ার উৎসাহে, কতকটা এই শূন্য পুরী থেকে অব্যাহতি পেয়ে

BanglaBook.org

মানুষের মধ্যে, মানুষের হাসি-গল্প-কোলাহলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগ্রহে—তাও গিয়েছিল বলাই। বেশ কিছুদিনই গিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ ছেলেদের ঠাট্টা-তামাশা টিটকিরি অসহ্য হয়ে উঠল। শুধু সহপাঠীরা নয়—ইস্কুল সুদ্ধ ছেলেরা ঠাট্টা করে, ক্ষেপায়, হাততালি দেয়। এমন এমন কথা বলে যে, মায়ের মতো রেলে গিয়ে গলা দিতে ইচ্ছে করে বলাইয়ের।

তাদেরও খুব দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অপর ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিজের বেশভূষাটা নিজের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হয়েছে বলাইয়ের। উড়ে পুকুরের ধারে ভাঙ্গা চালাটার মধ্যে যে হাজারী বুড়ি থাকে—দোরে দোরে বাসন মেজে অতিকষ্টে দিন কাটে যার—তার নাতি এককড়িও বলাইয়ের চেয়ে ঢের ভদ্র পোশাকে আসে। খাকি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি—কিন্তু এই ঢলঢলে অথচ খাটো সাত-তালি দেওয়া জমা আর শতচ্ছিন্ন কাপড়ের চেয়ে তো ঢের ভাল। তাও শ্যামা আজকাল চোখে দেখতে পান না, তালি বাঁকাচোরা বসে, তার ওপর সেলাইয়ের সুতোর রঙের ঠিক থাকে না। কারণ সুতো সবই ছেঁড়া কাপড় থেকে বার ক'রে নেন শ্যামা, জমির সাদা সুতোর সঙ্গে পাড়ের রঙিন সুতোও মিশে যায়।

যদি সত্যিই না থাকত তো এক রকম। দিদিমারও টাকা খরচ করতে হয় না। বলাই জানে, বড়মামী পূজোর সময় বলাইয়ের নাম ক'রে আলাদা টাকা পাঠান তার কাপড়-জামার জন্যে। সে টাকায় কাপড় কেনা হয় না কস্মিন্ কালে। শ্যামা বলেন, 'গরিবের আবার পুজো কি, পুজো তো বড়লোকের। কাপড় না থাকলে তবেই কাপড় কিনব—যদ্দিন চলে চলুক না। যার বাপ কিছু রেখে যায় নি, নিজে যে লেখাপড়া শিখল না, তার নবাবী অব্যেস করা ঠিক নয়।' মহা মাকে চিনেছে ইদানীং, নগদ টাকা সে দেয় না—যা দিয়েছে দু-একবার কাপড় কিনেই দিয়ে গেছে—কিন্তু সেগুলোও, একবার ক'রে পরিয়েই বাক্সয় তুলে রেখেছেন শ্যামা, শুধু বন্ধ থেকে থেকে সেগুলো বস্তাপচা হয়ে যাচ্ছে। সে কাপড়ের কথা তুললে বলেন, 'থাক না, ওদের তো আর খেতে দিতে হচ্ছে না, অবরে-সবরে কাজে লাগবে এখন। এক-আধটা ভাল কাপড় তুলে রাখা দরকার—নেমন্তন্ন আমন্তন্ন খেতে যেতেও তো কাজে লাগে!'...

বলাই জানে যে, 'অবরে-সবরে' তার কোনদিনই কাজে লাগবে না ও কাপড়। নেমন্তন্নই বা তাকে করছে কে? এই এতকালের মধ্যে একবার ও-বাড়ির মেজদার বিয়েতে যা গিয়েছিল—সে সময় বহুকালের একখানা কাপড় বার ক'রেও দিয়েছিলেন শ্যামা—কিন্তু দীর্ঘকাল আলোর মুখ না দেখার ফলে সে কাপড়ে ভাঁজে ভাঁজে এমন একটা ছোপ ছোপ দাগ পড়ে গিয়েছিল যে তাকে আর যাই হোক ধোপদস্ত কাপড় বলা চলে না কোন মতেই। সকলেই ফিরে ফিরে তার কাপড়ের সেই দাগগুলো দেখছিল বারবার—বলাইয়ের বেশ মনে আছে। তাও, সেই তো শেষ!

কাপড়গুলো নষ্ট হচ্ছে—হয়ে যাবেও, তবু শ্যামা সেগুলো বার ক'রে কোন দিনও পরতে দেবেন না ওকে, তা বলাই জানে। এর কোন প্রতিকারও তার হাতে নেই। এক একবার মনে হয় যে, সে কোথাও পালিয়ে যায়—তার না-দেখা ছোটমামার মতো। কিন্তু সাহস হয় না। সে কিছুই জানে না এ পৃথিবীর—এই ওর পরিচিত দু-তিন ক্রোশ পরিধির বাইরে যে বিপুল জগৎ, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। এতকালের মধ্যে ট্রেনে চড়ে নি কখনও। কথা বলার লোকের অভাবে, না বলে বলে মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাসটাও গড়ে ওঠে নি ভাল ক'রে। লেখাপড়াও জানে না। কোথায় যাবে সে, কি খাবে, কোথায় কে তাকে আশ্রয় দেবে—অনেক ভেবেও সে ঠিক পায় না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কী ভাবে অন্নসংস্থান করা সম্ভব, তা কল্পনা করার মতো অভিজ্ঞতাও নেই ওর। কারও সঙ্গে পরামর্শও করতে পারে না। ওর পরিচিত মানুষ বলতে ও বাড়ির ছেলেরা। তারা সকলেই ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়—তাছাড়া তারা ওকে জানোয়ার বা অর্ধ-মানুষের

BanglaBook.org

মতো কোন প্রাণী মনে করে—ভাল ক'রে কথাই বলে না ওর সঙ্গে। তাদেরও জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি বলাইয়েরও আছে।

এর মধ্যে একবার বড়মামী যখন এখানে আসে তখন কথাটা পেড়েছিল বলাই। অনেক সাহসে ভর করে অনেক কষ্টে বলেছিল, 'আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন মামীমা, আমি—আমি আপনাদের ওখানে চাকরের কাজ করব সেও ভাল, এখানে থাকলে আমার লেখাপড়াটড়া কিচ্ছু হবে না।'

ওর কথাটা বলার অসহায় দীন ভঙ্গিতে কনকের চোখে জল এসে গিয়েছিল—কিন্তু তবু বলাইকে নিয়ে যেতে সে পারে নি। প্রথমত আরও একটা খরচ বাড়াতে সাহস হয় নি। তার নিজের ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে, তার ওপর গোবিন্দর ছেলের দায় চেপেছে। যত সস্তাগণ্ডার দেশই হোক, হেমের মাইনেও এতদিনে সত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছে। এখানে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে যা থাকে তাতে এতগুলো প্রাণীর খরচা চালাতে প্রাণান্ত হয় কনকের। মাসে আট আনা দিলেও বাসন মাজার একটা ঝি পাওয়া যায়—সেটুকুও বিলাস বলে মনে হয়। সর্বদাই টানাটানি করে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে আরও একটা পেট যোগ হওয়া, তার লেখাপড়ার খরচা—অনেকখানি দায়িত্ব এবং বোঝা। বলাই গেলেও মাসিক টাকাটা কমাতে দেবেন না শ্যামা। দু-একবার যে সে চেষ্টা করে নি হেম তা নয়—কিন্তু প্রস্তাব মাত্রে শ্যামা মাথা খুঁড়ে গালিগালাজ দিয়ে শাপ-শাপান্ত ক'রে এমন পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা করেছেন যে তখন মনে হয়েছে যে-কোন মূল্যেও শান্তি কেনা শ্রেয়। সেদিকে কোন সুবিধেই হয় নি—মাসে মাসে সেই কুড়ি টাকাই টেনে যেতে হচ্ছে।

সুতরাং আয় যেখানে বাঁধা, মোটা ব্যয় কিছু সঙ্কোচ করা সম্ভব নয়, সেখানে আবার একটা খরচের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে সাহস হয় নি কনকের। সেই কথাটাই ওকে বুঝিয়ে বলেছিল কনক। বলাই সব বোঝে নি হয়ত—বিশ্বাসও করে নি। তবে মোটা মোদ্দা কথাটা বুঝেছিল। কনক আরও বলেছিল, 'তা ছাড়া মা এখানে একা—একেবারে দোসর-হীন—তুমি চলে গেলে তো দেখবারও কেউ থাকবে না। বুড়ো মানুষ, দিন দিন অথর্ব হয়ে পড়ছেন—এইভাবে একেবারে একা ফেলে রাখা কি উচিত? মরে দুদিন পড়ে থাকলেও তো কেউ একটা খবর পাবে না। আর মা-ই বা কি ভাবেন! পাড়ার লোকেও ছি-ছিক্কার করবে। মা আমাকেই কতকগুলো গালমন্দ শাপ-মন্যি দেবেন। সে আমি পারব না বাবা। তা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

সে অন্য ব্যবস্থাটা যে কী হ'তে পারে, তা কনকও কিছু বলতে পারে নি অবশ্য। বলাই তো বলতে পারেই নি। জামা-কাপড় চেয়ে কোন লাভ নেই। মিছিমিছি ওদের খরচান্ত করে লাভ কি? সুতরাং সে চুপ করেই গিয়েছিল। ম্লান মুখে নয়—বলাইয়ের মুখ ম্লানও হয় না ইদানীং। কেমন যেন ভাবলেশহীন পাথরের মতো হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারাটা। কতকটা ওর মায়ের মতোই। দেখে বুকের মধ্যেটা ছাঁৎ করে ওঠে কনকের।

তবু কনক ওর সমস্যার কোন মীমাংসাই করতে পারে নি। কোন ব্যবস্থাই হয় নি। যেটা হয়েছে—বলাইয়ের সাধ্যর মধ্যে যেটা—সেটাই সে করেছে। ইস্কুলে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন কী হয়েছে—অকারণ বুঝেই হয়ত—কোন কারণও দেখায় নি। হঠাৎই একদিন বলেছে, 'আর যাব না',—বই-খাতাগুলো তাকে তুলে রেখে দিয়েছে খুব সহজভাবে, খুব ঠাণ্ডা মাথাতে—যেন হিসেব করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছে।

তাতে শ্যামারও বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় নি। দু-একবার খুব মৃদু গোছের একটা অনুযোগ ক'রে একেবারে চুপ ক'রে গেছেন। ও প্রসঙ্গই আর উত্থাপন করেন নি। মনের কোন নিভৃত প্রত্যন্ত দেশে যেন তাঁর একটা আপত্তিই ছিল কোথায়—বলাইয়ের

BanglaBook.org

লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধে—একটা অতি ঘোর স্বার্থপর আশঙ্কা। লেখাপড়া শেখার অর্থই হ'ল তাঁর কাছে চাকরি পাওয়া, বিবাহ হওয়া—আবার পাখির ডানা গজানো। তার-পরই সে পৃথক হয়ে উড়ে চলে যাবে! এ সবই জানা কথা। একটার পর একটা। ছবিটা মনের মধ্যে পর পর যেন আঁকা হয়ে আছে তার মর্মান্তিক সত্য চেহারায়। পরিষ্কার দেখতে পান তিনি সেগুলো, ভৃগুসংহিতার ফলাফলের মতো। তাই তাঁর অবচেতন মন একান্ত-ভাবে চাইছিল বলাই মূর্খ হয়ে, অপদার্থ হয়ে থাক। জীবন-ধারণের জন্যে যেন সর্বদা তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় ওকে। কোথাও না পালাতে পারে সে কোনদিন। পাখির পায়ে শিকল দিয়ে রাখলেও কোন দিন সে শিকল কেটে উড়ে পালাতে পারে—কিন্তু যার ডানা কেটে দেওয়া হ'ল বা যার ডানা গজাল না আদবেই—সে কোনদিনই উড়তে পারবে না। এই আশ্বাসটুকুকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান শ্যামা!

বলাই মূর্খ। বলাই অসামাজিক—শহরে-ধরে-আনা বন্য জন্তুর মতোই অসহায় সে—কিন্তু একেবারে নির্বোধ নয়। সহজাত বুদ্ধি কিছুটা তার আছেই। দিদিমার এই স্বার্থপর চেহারাটা তার কাছে ঢাকা থাকে না, এটুকু সেও বুঝতে পারে যে, তিনি ইচ্ছে ক'রেই ওকে অমানুষ ক'রে রাখছেন।

আর কথাটা যখন ভাবে এক-একবার, তখন একটা ব্যর্থ, প্রতিকারহীন অন্ধ রোষে যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে শোধ নিতে ইচ্ছে করে এই অবিচারের। সে সময় ওর মনে হয় এক-একদিন যে—এই বাড়িটায়, তার এই জীবন্তসমাধির জায়গাটায় নিজে হাতে আগুন লাগিয়ে দেয় সে। কঠিনও নয় বিন্দুমাত্র, কোণে কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে থাকা, ঘরে দালানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা পাতার রাশিতে একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেওয়ার ওয়াস্তা। চোখের নিমেষে বেড়াআগুন জ্বলে উঠবে চারিদিকে। বেশ হয়—ঐ বুড়িটা পুড়ে মরে। আর সে-ও। এ জন্তুর জীবন রেখেই বা লাভ কি, তার চেয়ে তার মা যেমন করেছে—এ জন্মের মতো এ জীবন না হয় নিজেই শেষ ক'রে দেবে সে!

॥ ২ ॥

সেদিনকার সে ঝড়ের মধ্যেও এই মনোভাবটাই বোধ হয় প্রকট হয়ে উঠেছিল বলাইয়ের।

প্রথম যখন ঝড়টা ওঠে, তখন বোঝা যায় নি একটুও যে, কোন অঘটন বা এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। পুজোর সময় বাদ্‌লা তো হয়ই—এই সেই রকম একটা কিছু মনে করেছিল সকলে। সারাদিনটাই মেঘলা মেঘলা, মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি—এই ভাবেই চলছিল, বিকেলের দিকে শুধু হাওয়ার বেগটা একটু বেড়েছিল—এই মাত্র। তবু তখনও ঝড় বলে তাকে বোঝা যায় নি।

সেদিন ষষ্ঠী, শ্যামার উপবাস। নিরম্বু নয়, ষষ্ঠীতে নিরম্বু উপোস করতে নেই পোয়াতীদের—তবে ভাতটাও খেতে নেই। সব ষষ্ঠী শ্যামাদের নেই, কিন্তু 'দুগ্‌গো ষষ্ঠীটা' আছে। যদিও ছেলেদের গাল না দিয়ে জল খান না প্রায় কোনদিনই, ঠাকুর দেবতার কাছে আসছে জন্মে আঁটকুড়ো হয়ে জন্মাবারই প্রার্থনা জানান নিত্য—তবু ষষ্ঠীর উপবাস পালনেও ভুল হয় না কখনও। পাঁচ পয়সার পুজোও পাঠিয়ে দেন সিদ্ধেশ্বরীতলায়। বাড়িতে পুজোর পাট অনেকদিনই উঠিয়ে দিয়েছেন, অত কাণ্ড করে কে, লোক কই তাঁর? সিদ্ধেশ্বরী কালী—ওঁর মধ্যেই সব দেব-দেবীর অধিষ্ঠান, তাই ওখানেই যা কিছু পুজো পাঠিয়ে দেন আজকাল। জামাইবাড়ি বিগ্রহ আছে, বারো মাসে তের পার্বন তাদের করতেই হয়—সেখানেও পুজো দেওয়া চলে, কিন্তু জামাইবাড়ি পাঁচ পয়সার পুজো দেওয়া চলে না। সেটুকু চক্ষুলজ্জা এখনও তাঁর যায় নি। সিদ্ধেশ্বরীতলায় অত হিসেব কেউ করবে না, পয়সায় পয়সা মিশে যাবে, ও-ই

BanglaBook.org

তাঁর ভাল। হুঁশও থাকে শ্যামার—ঘরে পাঁজী নেই, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে ষষ্ঠী বা একাদশীর দিনগুলো ঠিক জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন পাড়ার জীবন চাটুয্যেকে।

ভাত খেতে নেই—ময়দা খাওয়াই বিধি, কিন্তু মুখে দেবার মতো একটু কিছু থাকলে আর ওসব হাঙ্গামা করেন না। পাকা কলা প্রায়ই থাকে ঘরে, আর নারকোল। নারকোল কুরে তার সঙ্গে তিন-চারটে কলা চট্‌কে খেয়ে নেন। শেষে একটু গুড় গালে দিয়ে জল খান। ফলের পরই জল খেলে চণ্ডালের আহার হয়, তাই একটু মিষ্টি খাওয়া বিধি। কিন্তু সে যাই হোক, এইতেই চলে যায় তাঁর একটা দিন, এইতেই চালিয়ে নেনও সাধারণত। এবারে বড় বিপদে পড়েই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কলা পাকে নি আজ একমাসের মধ্যে এক কাঁদিও। পাক্‌ত—রঙ ধরব-ধরব হয়েও ছিল—কিন্তু পুরো দুটি কাঁদি কলা 'কোন্ হাভাতের ঘরের বেটাবেটিরা', 'কোন্ আঁটকুড়োর পুষ্যিপুত্তুররা' কেটে নিয়ে গেছে চুরি করে। আর যা আছে নিতান্তই ছোট, অপুষ্ট। কেটে চট জড়িয়ে রাখলেও পাকবে না এখন।

অন্য ব্যবস্থা বলতে রুটি-পরোটা নয় অবশ্য। বাজার থেকে ময়দা-আটা আনিয়ে রুটি গড়তে বসার মানুষ নন শ্যামা। অবশ্য তার একটা অজুহাতও আছে, দাঁত সব থাকলেও জখম হয়েছে একটু—রুটি-পরোটা চিবোতে কষ্ট হয়। আরও কারণ আছে, রুটির সঙ্গে তরকারী চাই। এই সব দিনে যা সাধারণ দস্তুর তাঁর, তাই করেছিলেন। বহুকাল পরেই এ-পাট করলেন তিনি—ক্ষুদের সঙ্গে এক গাল ডাল ভিজিয়ে সরু-চাকলি করেছিলেন খানকতক। তা-ই দিদি-নাতিতে দুপুরবেলা খেয়েছিলেন বাড়তি তিন-চারখানা পড়েছিল বলাইয়ের ও-বেলার মতো।

জিনিসটার ঘটা যত না থাক, ল্যাঠা আছে। এক হাতে চাল-ডাল বাটা, গোলা আবার একখানি একখানি করে তোলা—এইতেই খেয়ে উঠতে উঠতে বেলা চারটে বেজে গিয়েছিল। তারপর বাসন মেজে, রান্নাঘর আর দাওয়া নিকিয়ে কাপড় কেচে আসতে আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাদিন একটানা খাটুনি আজকাল আর পেরে ওঠেন না—ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যে হলে তো আর যেন বয় না, কেবলই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। শুয়েই পড়েন সাধারণত, তবে ঘরদোর তখন সারা হয় না। বলাইয়ের খাওয়ার সময় একবার লম্প জ্বালাই হয়—সেই সময়ই সেসব সেরে নেন। অবশ্য অন্য দিন ভাতের ব্যবস্থা, রান্না-ঘরেই হাঁড়িতে থাকে—সেখানে গিয়ে ঠাঁই করে বেড়ে দিতে হয়। আজ সেসব কোন পাট নেই, সরুচাকলি চারখানা এক চিল্‌তে কলাপাতার ওপর বাটি চাপা আছে দালানের মধ্যে—যখন হোক বাটি তুলে খেয়ে নিতে পারবে। হাওয়ার গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না, ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি তবু হাওয়ার বেগে ছুঁচের মতো বিঁধছে গায়ে এসে। সন্ধ্যা দেবার চেষ্টা কররেন শ্যামা—প্রদীপ জ্বলল না। ঘরে দ্বিতীয় আলোর ব্যবস্থা বলতে অদ্বিতীয় লম্প—সে-ও এ বাতাসে জ্বলবে না। সুতরাং দিনের আলোর শেষ আমেজটা থাকতে থাকতে বাইরের ঘর, রান্নাঘরে তালা দিয়ে সদর দরজা ভেজিয়ে খানকতক ইট সাজিয়ে তা আট্‌কে (খিল নেই বহুকাল) দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে দালানে এসে আশ্রয় নিলেন।

আলো জ্বলে না কোন দিনই, তাতে কোন অসুবিধাও হয় না। শ্যামা শুয়ে পড়েন বটে সকাল সকাল কিন্তু জেগে থাকেন অনেক রাত পর্যন্ত। তিনিই রাজগঞ্জের ভোঁ শুনে শুনে সময় নির্ণয় করেন, যথাসময়ে উঠে খেতে দেন নাতিকে। নিজেরও কিছু খাওয়ার প্রয়োজন থাকলে সেই সময়ই খেয়ে দোর-তাড়া দিয়ে শুয়ে পড়েন। বলাই সন্ধ্যা থেকে—যতক্ষণ না শ্যামা উঠে খেতে দেন—মায়ের মতো দালানের একটা জানলাতে চুপ করে বসে থাকে (শ্যামার ভয় হয় মধ্যে মধ্যে—মায়ের রোগে যাবে না তো শেষ অবধি?)—অন্ধকার-জমাট-

BanglaBook.org

হয়ে থাকা কাঁটাল গাছটার পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিগুলো জ্বলে আর নেভে, বসে বসে তাই দেখে। বাইরে নক্ষত্রের একটা আলো থাকে, এ-বাড়ির উঠানে তাও নামে না, সে ক্ষীণ আলো এই অসংখ্য গাছপালা পত্রপল্লবের দুর্ভেদ্য অন্তরাল ভেদ করতে পারে না। তা হোক, তবু দালানের খোলা দোরের কাছটাতে একটু আলোর আভাস পাওয়া যায়, দিদিমার বিছানাটাও আন্দাজে আন্দাজে ঠাওর করতে পারে।

আজ কিন্তু দুজনেরই আলোর কথাটা মনে হ'ল। হাওয়া আর জলের ঝাপ্‌টায় জানলা খুলে রাখা গেল না, দরজাও বন্ধ করতে হ'ল। তার ফলে ভেতরের অন্ধকার ভয়াবহ হয়ে উঠল একেবারে—যেন কে গলা টিপে ধরছে ওদের। আলো নিভিয়েই শুয়ে পড়ে অন্যদিন দরজা বন্ধ করে, তবু জানলাটা খোলা থাকে—আজ সবই বন্ধ। শ্যামার নিজেরই হাঁফ ধরার মতো হ'ল—তিনিই বলতে বাধ্য হলেন, 'তা না হয় লম্পটাই জ্বাল না বাপু একটু—দোর-জানলা বন্ধ আছে, হাওয়ার ভয় তো নেই।'

কিন্তু লম্পটা জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল তাও আছে। পুরনো বাড়ির জানালা-কপাট কম দামেরই ছিল নিশ্চয়, নিবারণ দাসের সঙ্গতি বেশি ছিল না—একেবারে নিরন্ধ্র চাপা নয়। বেশ একটু-আধটু ফাঁক আছে, কোথাও কোথাও আল্‌গাও হয়ে গেছে কাঠ কিছু কিছু। সেই সব সামান্য সামান্য ফাঁক দিয়েই প্রচুর বাতাস আসছে। সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস ঢোকার ফলে একটা শিস্ দেবার মতো শব্দ হচ্ছে অবিরাম। সে হাওয়ায় বদ্ধ ঘরেও লম্পর শিখা স্থির থাকে না নিভে যাওয়ার মতোই অবস্থা হ'তে লাগল বার বার। বেগতিক দেখে শ্যামা নিজেই বেঁকেচুরে উঠে প্রায় হামা দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি সেটা জলের কলসীর খাঁজে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে নিভে যাওয়াটা বাঁচলেও, শিখার কেঁপে কেঁপে ওঠাটা নিবারিত হ'ল না। আর তার ফলেই ধোঁয়া বেরোতে লাগল প্রচুর, দেখতে দেখতে বিশ্রী কেরোসিনের গন্ধে ঘর ভরে উঠল। অর্থাৎ নতুন এক উপসর্গের সৃষ্টি হ'ল।

বাইরে বাতাসের শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে ওধারে। ক্কড়-ক্কড়কটাৎ—বাঁশবনে শব্দ হচ্ছে। কট্ কট্ শব্দ করে বেঁকে বেঁকে উঠছে বড় বাঁশগুলো। বাঁশে বাঁশে ঠোকাঠুকি হচ্ছে অবিরত। রান্নাঘরের মটকাতে চড় চড় করে টান পড়ছে মধ্যে মধ্যে, সমস্ত চালাটা যেন উঠে পড়ছে খানিকটা ক'রে। আরও বারকতক এমন টান পড়লে উড়েই যাবে হয়ত—পুরনো দড়ি, সে প্রবল আকর্ষণ রুখতে পারবে না। ওদের মিষ্টি-আমড়ার গাছটা বোধ হয় পড়ে গেল পুকুরের মধ্যে অন্তত সেই রকমই একটা বিরাট শব্দ হ'ল। গাছ আরও ভাঙ্গছে বোধহয়—মড় মড় ক'রে বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ছে, সে শব্দ এই হাওয়ার শব্দ ভেদ করেও শুনতে পাচ্ছে ওরা। দুম্‌দাম্ নারকোল পড়ছে, সুপুরি নারকোলের বড় বড় পাতাগুলো বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে এসে আছড়ে পড়ছে ওদের দেওয়ালে, ওদের ছাদে—অন্য গাছের ওপরও। ঝড়ই—এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। রীতিমতো বিরাট ঝড় একটা। শ্যামার মনে পড়ল সেবারের সেই আশ্বিনের ঝড়ের কথা। অস্পষ্ট হ'লেও মনে আছে সে কথাটা। তেমনি প্রলয় কাণ্ড একটা কিছু হবে না তো? আশ্বিন তো শেষ হয়ে আসতে গেল বাপু, আজই বোধহয় সংক্রান্তি কিম্বা আজ কার্তিক মাসের পয়লা। কে জানে বাপু!...

দূরে বোধহয় কার টিনের চালা উড়ে গেল একটা—বিকট ঝনঝন শব্দ হ'তে লাগল কিছুক্ষণ ধরে—গাছে গাছে বা বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে বেধে! গাছও ভেঙ্গে পড়ছে মধ্যে মধ্যে—সে শব্দ ওদের পরিচিত, এখান থেকে ওই ঘরের মধ্যে বসেই বলে দিতে পারে কত বড় গাছ পড়ল! ইস্—সদর দরজাটাও থাকবে না বোধহয়—শুয়ে শুয়েই বিলাপ করতে লাগলেন শ্যামা—সামান্য দশ-বারোখানা ইট এ চাপ আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে?...

ভেতরে কেরোসিনের ধোঁয়া অসহ্য হয়ে উঠছে। ভুষোগুলো বাতাসে উড়ছে ঘরের

মধ্যেই—বলাইয়ের মুখে মাথায় এসে পড়ল কতকগুলো। অবশেষে এক সময় 'দুত্তোর' বলে একটা অস্ফুট শব্দ করে দালানের দরজাটা খুলে ফেলল বলাই। দমকা হাওয়ার সঙ্গে জলের ছাট ঢুকে দালানের অনেকখানি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও গেল দপ্ ক'রে নিভে।

'ওকি, ওকি অ মুখপোড়া—আবার দরজা খুললি কেন, যথাসর্বস্ব যে ভিজে গেল—ও আবার কি ঢং? বাগানে যাবি নাকি এত রাত্তিরে আবার? পেট ব্যথা করছে?'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তবে তখনই উঠতে পারলেন না। আজকাল এক বার শুলে ওঠা বড় কষ্টকর তাঁর পক্ষে। বেশ একটু সময় লাগে। শ্যামা শুয়েই পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'কী রে—সঙ্গে যাব? দাঁড়াতে হবে?'

বলাই কোন উত্তরই দিল না। সাবধানে একটা কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রইল সেটা। দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল সামনে।

বাইরে তখন প্রকৃতির একটা বিরাট পাগলামি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগ যথেষ্ট এমনিতেই, তার মধ্যেই আবার বোঁ-ও-ও ক'রে যেন ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠছে এক একবার। সে সময়ে দোর-জানালাগুলো ঝনঝন ক'রে কেঁপে উঠছে। ভাগ্যে অভয়পদ সব জানলাতে দরজায় লোহার আল্‌তারাপ ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিয়ে গেছে, আগেকার জরাকীর্ণ কাঠের ছিট্‌কিনি থাকলে দোর-জানালা বন্ধ রাখা যেত না।

রান্নাঘরের চালাটার অবস্থাই খুব খারাপ—ক্ষ্যাপা হাওয়ার দমকা আঘাতে ফুলে ফুলে উঠছে, বেশ খানিকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে এক-একবার। মনে হচ্ছে এখনই মটকার বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যাবে চালাটা। অথচ ঠিক ছিঁড়ছেও না, শেষ পর্যন্ত শুধু ওর সেই সহস্র বাড়ির পাকে পাকে প্রবল টান পড়ায় চালাটা যেন কঁকিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠছে সেই সময়টায়।

...দূরে কাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে—বুঝি চেঁচিয়ে কাঁদছে কারা—অবশ্য এই বাতাসের তাণ্ডবে কান্নার মতো শব্দ তো চারিদিকেই—তবু মনে হচ্ছে বাউরীদের নাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ উঠছে একটা। ওদের টিনের চালা—উড়ে গেছে সম্ভবত, কিম্বা ঘরই ভেঙ্গে পড়েছে সবসুদ্ধ। গাছ-পালা তো বোধহয় কারও বাগানে থাকল না—প্রায়ই মড়-মড়-মড়াৎ শব্দ উঠছে, বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ছে কোথাও না কোথাও। এই বোধহয় প্রলয়—বলাই মনে মনে বলল।

এবার শ্যামা উঠে এলেন বেঁকে চুরে কোমরটা সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ওর পেছনে, 'বলি কী হচ্ছে কি, ঘরে যে নদী নালা বয়ে গেল। এমন ক'রে দাঁড়িয়ে ভিজছিস কেন?'

বলাই যেন এতক্ষণে একটু নড়ে চড়ে উঠল আবার। বলল 'তুমি দোর দাও দিদিমা, আমি বাইরে থাকি, ডাকলে দোর খুলে দিও।'

'আ মর, বাইরে থাকবি কি, চারদিকে পাতা উড়ছে বড় বড়, গাছের ডাল ভেঙ্গে এসে পড়েছে, শেষে কি একটা খুন-খারাপি কাণ্ড হবে?'

'তা হোক। তুমি দোর দাও। আমি রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসছি।'

বলতে বলতেই তরতরিয়ে উঠোনে নেমে গেল সে। যেতে গিয়ে সেই জলকাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লও একবার—'মাগো!' বলে অস্ফুট শব্দও ক'রে উঠল ভয়ে, কারণ মনে হ'ল কী যেন একটা বিরাট পত্রপল্লবের স্তূপের মধ্যে জড়িয়ে গেল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকে উঠতে আশ্বস্ত হ'ল। কাদের একটা প্রকাণ্ড পেঁপে গাছ—ফুল-ফল সুদ্ধ উড়ে এসে পড়েছে তাদের উঠোনে। তাদের নয়, তাদের এতবড় পেঁপে গাছ নেই। হয়ত মল্লিকদের বাড়ি কিম্বা চাটুয্যেদের বাড়ি থেকে উপড়ে চলে এসেছে ঝড়ের টানে।

শ্যামা নিরুপায় হয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর এ বয়সে এসব দস্যিপানা সয় না। ভিজে জ্বর হয় ও-ই জব্দ হবে, টাঙিয়ে রেখে দেবেন তিনি, একগাল মুড়ি খাইয়ে। আদর

BanglaBook.org

সোহাগ ক'রে ডাক্তারও ডাকবেন না, কিম্বা সাগু-বার্লি-মিশ্রি এনে তোয়াজ করে খাওয়াতে বসবেন না। পাগল, ছোঁড়াটাও পাগল হয়ে গেছে। মায়ের রোগে গেছে একেবারে।

দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে এসে আবার শুয়ে পড়লেন। যা হবার হোক গে, তাঁর মাথায় ছাদটা না ভেঙ্গে পড়লেই হ'ল।...

বলাইও পেঁপে গাছ থেকে মুক্তি পেয়ে দুটো বড় বড় নারকোল পাতায় হোঁচট খেয়ে দাওয়ায় এসে উঠল। চালটার গতিক ভাল নয়, মনে মনে হিসাব করতে বসল বলাই, বছর চারেক আগে বড় মামা শেষ চাল বাঁধিয়েছিলেন দাঁড়িয়ে থেকে—সে দড়ি কি এতদিনে পচে যায় নি?...তা যাক গে, চালাটা উড়ে গেলেও দেওয়াল চাপা পড়বে না। পাকা দেওয়াল। তবে তার ভয় করতে লাগল অন্য কারণে। সদর দরজায় কে যেন দুম দুম ক'রে লাথি মারছে। বেশ জোরেই মারছে, ঝন-ঝন ক'রে উঠছে কপাট দুটো। ঘর থেকে শোনা যায় নি এতক্ষণ, এখানে এসে বেশ স্পষ্ট শুনছে। কে এল এই রাত্রে—এই দুর্যোগের মধ্যে? ডাকাত নয় তো? তার দিদিমার ধন-অপবাদ বেশ ভালো রকমই আছে, ডাকাতি করতে হ'লে এই প্রকৃষ্ট অবসর—আজ একটি প্রাণীও বেরোবে না ঘর থেকে, ওদের খুন ক'রে মেরে রেখে গেলেও না। শুনতেই পাবে না কেউ তাদের চিৎকার।

আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে রইল বলাই। ওদিকে লাথি মেরেই যাচ্ছে তারা। এখনই হয়ত কপাটটা ভেঙ্গে পড়বে, বেশ বুঝতে পারছে বলাই। তারপর—

কিন্তু কপাটটা ভাঙ্গল না অনেকক্ষণ অবধি। লাথি চলতেই লাগল সমানে। ক্রমে বলাইও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। লাথি কেউই মারছে না, ওটাও হাওয়ার কীর্তি। হাওয়াতেই ঝন-ঝন ক'রে উঠছে দরজাটা। একটু আশ্বস্ত হ'ল সে। আবার নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশ-ভরা মেঘ কিন্তু তারই মধ্যে কেমন যেন একটা অনৈসর্গিক আলো ফুটে উঠেছে দিক্‌চক্ররেখায়। সে আলো মনে কোন অভয়ের বার্তা আনে না, আতঙ্ক জাগায়। এখান থেকে আকাশটা এতখানি দেখা যায় না অন্য দিন, আজ গাছ-পালা বিস্তর ফাঁক হয়ে যাওয়ায় এতটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাছপালা পড়েই যাচ্ছে বিপুল শব্দ ক'রে। ছোটখাটো গাছ অথবা বড় গাছের ডাল মাটির দিক থেকে বাতাসের টানে শূন্যে উঠে যাচ্ছে, শূন্যেই পাক খাচ্ছে ঘূর্ণি হাওয়ায়, পড়ব পড়ব ক'রেও আবার দূরে সরে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে পড়ছে কে জানে, কোথাও পড়বে কিনা আদৌ তাই বা কে জানে! একটা-দুটো বহুক্ষণ ঘুরে—যেন ক্লান্ত হয়েই—ওদের উঠোনে বা ছাদে এসে আছড়ে পড়ছে, আবার চলেও যাচ্ছে হয়ত খানিক পরে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের সময় বড় বড় গাছের ডালগুলোকে ঘুরপাক খেতে দেখলে যেন কেমন ক'রে ওঠে মনের মধ্যে।

ঝড় বেড়েই চলল রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতি সত্যিই যেন ক্ষেপে গিয়েছে। বহু হাজার পাগলা হাতি যেন ছেড়ে দিয়েছে কে আকাশে। এমন দাপাদাপি বলাই জীবনে কখনও দেখে নি বা শোনে নি। ঝড় জল বর্ষাকালে হয়ই, কিন্তু সে ঝড় যে এমন প্রলয়ঙ্কর হ'তে পারে—তার সামনে মানুষের সমস্ত শক্তিকে এত তুচ্ছ এত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়—সে অভিজ্ঞতা ওর ছিল না। কেউ ওকে বলে দেয় নি, বললেও এ জিনিস ধারণা করা সম্ভব নয়।

জলে ভিজে ভিজে শীত করতে লাগল বলাইয়ের, দাঁতে দাঁতে লেগে কাঁপুনি শুরু হ'ল—তবু সে ভেতরে গেল না বা দিদিমাকে দোর খুলে দিতে বলল না। বরং কেমন যেন একটু অদ্ভুত আনন্দ বোধ করতে লাগল সে এই কষ্টের মধ্য থেকেই। পিশাচের মতো এই ধ্বংসলীলা দু চোখ, দুই কান ভরে পান করতে লাগল যেন। যত গাছপালা ভাঙ্গে, যত দূরে পাড়ায় পাড়ায় চালা উড়ে যাবার বা বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার শব্দ হয়, ততই যেন আনন্দ বাড়ে

BanglaBook.org

তার। হি-হি ক'রে হাসে সে কাঁপতে কাঁপতেই। আর আপন মনে বলে, 'মর, মর, সবাই মর। সবাই মিলে সপুরী এক গাড়ে যা। কাল সকালে কেউ না বেঁচে থাকে আর। পড়ুক না, সব বাড়িগুলো ভেঙ্গে পড়ুক—ত'হলে আমি হরির নোট দিই—সব যাক। সব যাক্!'

পরের দিন সকালেও সে ঝড় থামল না। ঝড়ও না, জলও না। ঘর থেকে বেরোতেই পারে না কেউ। বারোয়ারীতলার ঠাকুর নাকি গলে গেছে জল পড়ে পড়ে, মহাদেবের মা ভিজতে ভিজতে এসে খবর দিয়ে গেল, 'এমন অলুক্ষুণে কাণ্ড জম্মে দেখি নি মা, কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে বাঁচাব কেমন ক'রে তাই ভেবে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।...তা এই কি তা'হলে কলিযুগের শেষ হ'ল—হেই বামুন মা?'

সে তথ্য শ্যামাও যোগাতে পারেন না। সকালে উঠে বাগানের চেহারা দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেছে। ফলন্ত গাছ সব—কোথায় যেন কী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। কার একটা নারকেল গাছের মাথা এসে পড়েছে তাঁর পুকুরের জলে, তাঁরও একটা নারকেল গাছ পড়ে গেছে। লোকসান যা হবার তা তো হয়েছেই—এখন এই জঞ্জাল তিনি মুক্ত করাবেন কাকে দিয়ে—কত দিনে? পয়সা খরচ ক'রে লোক লাগাতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত? এসব যে তাঁরা দিদি-নাতিতে পারবেন বলে মনে হয় না!...

রাত্রে জেগে থাকব মনে ক'রেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শ্যামা। শেষরাত্রে হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গাঢ় অন্ধকারে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন একবার, কারণ তখনও সে গর্জন সমানে চলছে বাইরে, দাপাদাপি গর্জনের কিছুমাত্র বিরাম নেই।...তার পর একটু সামলে নিয়ে ব্যাপারটা মনে করবার চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল বলাইয়ের কথা। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অল্প অস্পষ্ট ভোরাই আলোতে দেখলেন সে তখনও দাওয়ায় বসে বসে ভিজছে আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। অগত্যা শ্যামাকেও ভিজে ভিজে নেমে আসতে হয়েছিল, তিনিও হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন একবার পেঁপে গাছটায়—তবে তাঁর খুব লাগে নি—উঠে বলাইয়ের কনুইটা ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন।

'আপদ বালাই! সাত জন্মের আপদ বালাই সব! যত রাজ্যের আপদ-বালাইরা আমার কাছে মরতে আসে একধার থেকে। আর কোথাও তো যেতে পারে না, আর কোন চুলো মনে পড়ে না তো! যেন সার বেঁধে বসে থাকে সব আমাকে জ্বালাবে-পোড়াবে বলে।'

বকতে বকতে ওর কাপড় ছাড়িয়ে গা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন কাঁথা চাপা দিয়ে। বলাইও কোন প্রতিবাদ করে নি, কাঁপতে কাঁপতে তখন রীতিমতোই কষ্ট হচ্ছিল তার, বিছানার উষ্ণতার মধ্যে আসতে পেয়ে বেঁচে গেল সে।

সেই থেকেই সে ঘুমোচ্ছে। কত বেলা হচ্ছে তা শ্যামা ঠাওর পাচ্ছেন না, রাজগঞ্জের ভোঁ-ও বোধহয় বন্ধ আছে—কিম্বা এই আওয়াজে শুনতে পাচ্ছেন না।...

শ্যামা আর এর ভেতরে ঘর-দোর মোছা বাসি-পাটের চেষ্টা করলেন না। অবিরাম আবর্জনা বাড়ছে, কত করবেন তিনি? ঘরের বাইরেই বেরনো যাচ্ছে না, ভিজে ভিজে এসব করতে পারবেন না।

আজ সপ্তমী পুজো-আটটা-নটার মধ্যে দুটি ভাত ফুটিয়ে খেলে খাওয়া যেত—বলির হাঁড়িতে খেতে নেই, তা বলি কি ভোরবেলা হয়? ওসব মানেন না শ্যামা, সকাল ক'রে দুটো খেয়ে নিলেই হ'ল, তাতে বলির হাঁড়ির দোষ হবে কেন!—তা আজ আর সে ব্যবস্থা করা গেল না। কত বেলা তা-ই ঠাওর হচ্ছে না। মনে পড়ল বাসি সরুচাকলি ক'খানা পাতাতে বাটি-ঢাকা পড়ে আছে, বলাই খায় নি—হয়ত এলিয়ে নাল কেটে গেছে একটু একটু—তা হোক্, ঐগুলোই তিনি খাবেন'খন বলাইকে এক গাল ডাল-ভাতে দিয়ে দুটো ভাত খাইয়ে

BanglaBook.org

দেবেন, যখন হোক। বলাই উঠুক। রান্নাঘরের মধ্যেই পাতার জালে তিজেলটা ক'রে ভাত চাপিয়ে দেবেন তখন।

শ্যামাও স্তব্ধ হয়ে বসে বসে প্রকৃতির এই অভাবনীয় তাণ্ডব দেখতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিক থেকেই একটু-একটু করে কমে এল ঝড়-জলের দাপট। পুরো দুদিন ধরে অশোভন মাতামাতি করার পর যেন শ্রান্ত হয়ে পড়লেন প্রকৃতি। অষ্টমীর দিন ভোর থেকে নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল চারিদিক। একটু একটু ক'রে পৃথিবী আবার তার স্বাভাবিক জীবন-স্পন্দন খুঁজতে শুরু করল, থেমে-যাওয়া নিঃশ্বাসটা ভরসা ক'রে টানতে আরম্ভ করল আবার।

কিন্তু এ স্তব্ধতা শ্মশানের স্তব্ধতা। যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্ষতিই চোখে পড়ে শুধু। যা কিছু শোনা যায়—শুধু মানুষের সর্বনাশের বিবরণ। বিশেষত গরিব মানুষের। তাদের ঘর গেছে, বাড়ি গেছে, গরু গেছে, ছাগল গেছে, ধান গেছে, চাল গেছে—প্রাণও গেছে বহু জায়গায়। মা এবার এসেছেন যেন শ্মশানবাসিনী ভৈরবীর বেশে, পুত্র-কন্যা নয়—ডাকিনী-যোগিনীদের সহচরী ক'রে। তাদেরই তাথিয়া তাথিয়া নাচে পৃথিবী টলমল করেছে দুদিন, প্রলয়ের আভাস ঘনিয়ে এসেছে তার বুকে। আজ তারা বিদায় নিয়েছে কিন্তু শ্মশানই করে রেখে গেছে চারিদিক।...

তবু তখনও সর্বনাশের পরিমাণটা পুরো জানা যায় নি। কারণ জানার উপায় ছিল না। খবর পাওয়া গেল কদিন পরে। সত্যি-সত্যিই সর্বনাশ হয়ে গেছে মেদিনীপুরে। সেই চীনাসাগরের হারিকেন বা টাইফুন যেন পথ ভুলে এসে হাজির হয়েছিল বঙ্গোপসাগরের কালো জলে। সে তার চিহ্ন রেখে গেছে মৃত্যুতে আর ধ্বংসেতে। সমুদ্র থেকে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠে বড় বড় দোতলা তেতলা বাড়ি ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, সে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আতঙ্কে মূর্ছাতুর হয়ে পড়েছে অধিকাংশ প্রাণী, প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে হাত-পা ওঠে নি তাদের। এ-রকম যে হয় তাই কারও জানা ছিল না, স্মরণকালের মধ্যে এরকম মূর্তি সাগর-জলের তারা দেখে নি। সাইক্লোন তারা জানে, ঝড় এর আগেও বড় বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এর চেহারা একেবারে আলাদা, এ একেবারে ভিন্ন জাতের। সাগরের জল বহুদূর পর্যন্ত জনপদের মধ্যে চলে এসেছে, সচল পর্বতের মতো ঢেউ এসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের। জল যখন সরে গেছে তখন শুধু সার সার শবদেহই নজরে পড়েছে। জীবিত প্রাণী বিশেষ নয়। কত দেহ ভেসে গেছে তাও কেউ জানে না, কত দেহ পাঁক-কাদা ঘেঁটে বার করতে হয়েছে। এরকম সাংঘাতিক ধ্বংসলীলা এ জেলার লোক কেউ কখনও দেখে নি। মহাপ্রলয়ের স্বাদ পেলে তারা এই ক'ঘণ্টায়।

তাও, সর্বনাশের পূর্ণ পরিমাণটা একেবারেই জানা যায় নি। কারণ বলবার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। যারা বেঁচে ছিল, তাদেরও সংবাদ পাঠানোর মতো অবস্থা ছিল না। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তারা। তাছাড়া সংবাদ আসার পথও রুদ্ধ। টেলিগ্রাম টেলিফোন কিছুই নেই—খুঁটিগুলোরও চিহ্ন নেই কোথাও কোথাও।

বৃটিশ সরকার বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন মেদিনীপুরকে জব্দ করবার—এই সুযোগে তাঁরা মানুষের যাতায়াতও বন্ধ ক'রে দিলেন। বিনা হুকুমে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না সেখানে—সেবাব্রতীরাও কেউ নয়।

দুঃখিত হ'ল সবাই। শিউরে উঠল ভগবানের এই নির্মম মার প্রত্যক্ষ ক'রে—শুধু শ্যামা শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে! কেন—ইরেজের সঙ্গে লড়াই করার তো অত সাধ, কর্ এখন লড়াই। দেখলি তো, ভগবান সুদ্ধু ওদের দিকে। চালাকি করতে গিছলি, দিলে ঠাণ্ডা ক'রে। এখন থাকো কাঁকরমাটি চিবিয়ে—যেমনকে তেমনি!'

BanglaBook.org

তিনি যেন একটা ব্যক্তিগত বিজয়গর্ব অনুভব করেন।—তাঁরই স্বদেশবাসী, স্ব-ভাষাভাষী কতকগুলি মানুষের মর্মান্তিক এই দুর্দশায়।

॥ ৩ ॥

কিন্তু সেই অবস্থাটা যে একদিন তাঁর দোরেও এসে উপস্থিত হ'তে পারে তা একবারও ভাবেন নি শ্যামা। চালের দাম উত্তরোত্তর বাড়ছে দেখেও অতটা ধরতে পারেন নি। অবশ্য সে খবরও তিনি তেমনভাবে পান নি। কিছু চাল কেনা ছিল ঘরে—বহুদিনের মধ্যে কেনবার দরকারও হয় নি। যা ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছেন পাড়া-ঘরে অধমর্ণদের কাছে, সেটা তত মাথাতে যায় নি।

চাল তেল আর নুন, এই লাগে তাঁর উট্‌নোর মধ্যে। আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু হলুদ। লঙ্কা তাঁর উঠোনেই ঢের হয়। অন্য মশলা—ধনে জিরেমরিচ আজকাল কমিয়ে দিয়েছেন একেবারে, একবার এক-এক ছটাক ক'রে আনিয়ে রাখলে তাঁর ছ'মাস চলে যায়। ফোড়নও ব্যবহার করেন না বিশেষ, বলেন, 'যেটুকু তেল খরচ করব তা যদি ঐ লঙ্কা পাঁচফোড়ন কি তেজপাতা চোঁয়াতেই চলে গেল তো ব্যান্ননে রইল কী? আমরা তো বড়লোকদের মতো পলাপলা তেল ঢালতে পারি না, আমাদের অত ফোড়নের শখ ক'রেও দরকার নেই। ফোড়ন তো গন্ধ করার জন্যে, বলি ওর তো কোন স্বদ নেই গা—মিছিমিছি গুচ্ছের পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি?'

সুতরাং দোকানে যাবার দরকার হয় আজকাল তিন মাসে একদিন। কিম্বা আরও বেশিদিন পরে। নিজেই যান অবশ্য। বলাই কোথাও বেরোতে চায় না। তিনি বলেনও না। দোকানে যেতে গেলেও নাকি ফুলবাবু সেজে বেরোতে হবে। এই তো নাকের ডগায় দোকান। সেখানেও কি একটু ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে যাওয়া যায় না? না যায় না যাক। দরকার নেই গিয়ে। এখনও তো ভগবান শ্যামাকে 'অক্ষ্যাম' করেন নি একেবারে। একবার গুটি গুটি গিয়ে দোকানিকে বলে আসা! এই তো! সে তিনি খুব পারেন। একেবারে এক বস্তা ক'রে চাল নেন তিনি, তাতে নাকি কিছু ওয়ারা হয়। কিছু ঢল্‌তাও বাদ পান। দোকানিরা নাকি বস্তা পিছু পাঁচ পো ঢল্‌তা বাদ পায়—তিনি তাদের কাছ থেকে এক সের আদায় করেন। এই চাল—আর সেই সঙ্গে পাঁচ পো তেল, আড়াই সের নুন, পাঁচ ছটাক হলুদ। এইতেই তাঁর দু'তিন মাস চলে যায় আজ-কাল। চাল তখনও থাকে, কাজেই শুধু তেল আর নুন আর হলুদ—মাঝে একবার নিয়ে যেতে হয়। তার সঙ্গে দুটি পাঁচফোড়ন আর দুখানা তেজপাতা চেয়ে নেন দোকানীর কাছ থেকে। কোনদিন কিছু একটা ডাল ক'রে রাঁধতে হ'লে কাজে লাগে।

চাল ঘরে ছিল অনেক দিনের মতো—দু'জনে কতই বা খান—তাই চালের দাম বাড়ছে শুনেও অত গা করেন নি। একেবারে বাড়ন্ত হ'তে যখন গিয়ে শুনলেন চাল পঁচিশ টাকায় উঠেছে ইতিমধ্যে—তখন একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলেন। প্রথমটায় বিশ্বাস হয় নি কথাটা। তামাশা মনে ক'রে দোকানিকে দুটো মিষ্টি গালি-গালাজও করেছিলেন (দিদি-নাতি সম্পর্ক পাতানো তার সঙ্গে) কিন্তু শেষে যখন দেখলেন তা সত্য, তখন তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠল। তখনকার মতো আড়াই সের চাল নিয়ে চলে এলেন। বলরাম বলল, 'এই বেলা নিয়ে যান দিদিমা—এর পর আরও চড়বে। আমার তো ঠাওর হয় আর পাবেনই না, গোটা দেশের লোককে উপোস ক'রে শুকিয়ে মরতে হবে!'

কিন্তু তা আনেন নি শ্যামা। একেবারে অতটা উঠতে পারেন নি। ভরসায় কুলোয় নি। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, সে যুদ্ধেও বেড়েছিল কিন্তু এত

BanglaBook.org

বাড়ে নি। এতটা বাড়া স্বাভাবিক নয়। সরকার যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে।...

তিনি খাওয়াটাই কমিয়ে দিলেন। নিজে নিয়ম-রক্ষার মতো এক গাল ভাত খেতে শুরু করলেন। বাকিটা বাগানের ডুমুর কাঁচকলা থোড় পেঁপে খেয়ে পেট ভরাতে লাগলেন। বলাইকে পুরোপেটা ভাতই দেন, তবে সেও এক-বেলা। বিকেলটা তার জন্যে ঐ শাক-আনাজ সেদ্ধ ব্যবস্থা বলেন, 'কী করবি মুখপোড়া, যেমন বরাত ক'রে এসেছিস তেমনি তো হবে। বরাত খারাপ না হ'লে এমন হবে কেন?'

তাই কি বাগানের ফসলই শান্তিতে ভোগ করতে পারেন। অভাব দুর্দশা শুধু তাঁরই নয়—আরও অনেকের। তাঁর তো তবু সঙ্গতি আছে কিছু—বেশির ভাগই থালা বাসন বেচতে শুরু করেছে। সুতরাং ফল ফুলুরি আনাজ সব চুরি যেতে শুরু হ'ল। চোর সামলাবার মতো ব্যবস্থা কিছু নেই। বেড়া কি পগারে গরু আটকায়—তার বেশি কাউকে ঠেকাবার শক্তি নেই। শ্যামা শেষ পর্যন্ত নিজেই পাহারা দিতে শুরু করলেন রাত্রে। ঘুমই বন্ধ হয়ে গেল তাঁর প্রায়। নিঃশব্দে প্রেতিনীতির মতো অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান—একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে ক'রে। সামান্য কোন শব্দ পেলেই—অনেক সময় দেখা যায় তা বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নয়—তিনি চিৎকার ক'রে গালাগাল দিতে দিতে তেড়ে যান। লাঠি ঠোকেন ঘন ঘন। যেদিক থেকে শব্দ আসছে ঠাওর ক'রে সেই দিকেই ছুটে যান। অবশ্য তাতে কাজও হয়—চোর, যারা চুরি করতে আসে অনেক সময়ই তাদের সে চেষ্টা ত্যাগ ক'রে পালাতে হয়।

শ্যামা সেদিন দোকান থেকে এসে হেমকে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। বাজারের এই অবস্থা, কিছু টাকা না বাড়ালে চলছে না। তার উত্তরে হেম কিছু রূঢ় সত্য কথা লিখে পাঠাল। সে মাইনে পায় মাত্র তিয়াত্তরটি টাকা। তা থেকে ফাণ্ডে কেটে নেয়, মাকে পাঠায় কুড়ি টাকা। বাকি যা থাকে তাতে এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ করা সস্তার দেশেও দুঃসাধ্য। দাম সেখানেও বাড়ছে। ভাত তো কবেই ছেড়ে দিয়েছে ওরা, দুবেলা রুটি খায়। তাও বোধহয় দুদিন পরে মিলবে না। রেল কোম্পানি যদি ওদের জন্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করে তো শুকিয়ে মরতে হবে। হেম আগে পুরো সংসারের জন্য যে টাকা দিত এখনও তাই দেয়, হয়ত আর বেশি দিন তা দিতে পারবে না। শ্যামার হাতে যা আছে—যা তিনি তেজারতিতে খাটান—এখন কিছু দিন তাই ভাঙ্গিয়েই খান তিনি!...

আর যা-ই হোক, এতটা স্পষ্টভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্যামা। তাঁর খুব ভরসা ছিল অন্তত গোটা-চার পাঁচ টাকা হেম বাড়িয়ে দেবেই। তিনি আরও একবার চোখে অন্ধকার দেখলেন।

এবার অগত্যাই পঁচিশটি টাকা হাতে ক'রে চাল কিনতে গেলেন আবার। কিন্তু দেখলেন ততক্ষণে—এই ক'দিনের মধ্যেই সে চাল ছত্রিশ টাকায় পৌঁচেছে।...সুতরাং এবারও কেনা হ'ল না চাল। ছত্রিশ টাকা দরের চাল তিনি কিনে খেতে পারবেন না। সে ভাত তাঁর গলা দিয়ে নামবে না। তিনি নাতির মতো আড়াই সের চাল কিনে সেবারের মতোই, বসে বসে—বুকে ক'রে বয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তার বেশি কিনতে যেন সাহস হ'ল না তাঁর। অথচ এও থাকবে না—বলরাম বার বার সাবধান ক'রে দিল, একেবারেই লোপাট হয়ে যাবে চাল বাজার থেকে—তা শ্যামাও বুঝলেন। বলরামের কথাটা আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল না তাঁর। তবু ছত্রিশ টাকায় এক মণ চাল কেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর পক্ষে যা সম্ভব তাই করলেন। নিজে একেবারেই ছেড়ে দিলেন ভাত। শাক কচু আনাজ সেদ্ধ ধরলেন। বলাইকেও এক গাল ক'রে ভাত দিতে লাগলেন—নইলে হয়ত তার পেট ছাড়বে এই ভয়ে। অত দুটিখানি ভাত রাঁধতে অসুবিধা হয় বলে একদিন ফুটিয়ে

পরের দিনের জন্যে জল দিয়ে রাখতে লাগলেন। নিতান্তই সে পাখির মতো এত কটি—সত্যিই হাতের একগালে ধরবার মতো। বাকিটা ডুমুর আছে, শুষনি শাক আছে। একটা কুমড়ো হয়েছিল—তাতে তিন চার দিন চলে গেল, সেজন্যে ভাবনা নেই তাঁর। নাতিকে বলেন প্রায়ই, 'এমন এক আধ দিন নয়—বুঝলি, গুপ্তিপাড়ায় মাসের পর মাস আমরা এই শাক আনাজ সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়েছি! তোর দাদামশাই কোন্ এক যজমানের দু'মহল বাড়িতে তুলে দিয়ে ডুব মারল, তিনটে মেয়েছেলে আমরা—সঙ্গে একটা বাচ্ছা—একটা পয়সা নেই হাতে। সে যে কী দিন গিয়েছে! এখন তো তবু বয়স হয়েছে, অনেক শক্ত হয়েছি, তিনটে বেটাছেলের কাজ একা করতে পারি। তখন কিছুই জানতুম না, ছেলেমানুষ—তবু দিন কেটে তো গেছে, বেঁচেও তো আছি!

বলতে বলতেই বোধ হয় মনে পড়ে খাওয়া-দাওয়ার ঐ অনিয়মেই তাঁর শাশুড়ীর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই যে পেট ছাড়ল, আর সামলাতে পারলেন না কিছুতেই। অবশ্য বুড়ো মানুষ বলেই—। কিন্তু, তিনিও বুড়ো হয়েছেন এখন। সে সময় শাশুড়ীর যা বয়স ছিল, তার চেয়ে তাঁর বয়স এখন অনেক বেশি। তিনিই কি পারবেন সামলাতে?...স্তব্ধ হয়ে যান শ্যামা—কথাটার মাঝখানেই। কেমন যেন আতঙ্ক বোধ হয় তাঁর।...আবার একটু পরেই জোর ক'রে উড়িয়ে দেন চিন্তাটা। শাশুড়ী সুখী মানুষ ছিলেন, চিরকাল প্রাচুর্যেই অভ্যস্ত তাই সহ্য করতে পারলেন না, শ্যামার শরীর অনেক পাকা, অনেক দুঃখকষ্ট অনিয়ম সহ্য ক'রে পেকে গেছে দেহ—তাঁর কিছু হবে না। শুধু একটা ভয় তাঁর—শাক-আনাজও অফুরন্ত নয়, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সেও—এইবার কি করবেন?

অনেক ভেবে একদিন কিছু আটা কিনতে গেলেন। না হয় দু'বেলা রুটি খেয়েই থাকবেন। কিন্তু তাঁদের বাজারে তখন আটা ময়দাও উধাও হয়েছে। কবে আসবে তবে পাওয়া যাবে আবার—তা বলরাম, রামকমল কেউ বলতে পারলে না। শ্যামা এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। কতকটা দিশাহারা ভাবেই সের দুই গোটা ছোলা কিনে বাড়ি ফিরলেন। কলকাতায় নাকি চিঁড়ে অঢেল পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু সেও পাঁচসিকে সের। জলসা জিনিস চিঁড়ে—এতটার কম পেট ভরে না গায়ে গত্তিও লাগে না। তার চেয়ে ছোলা ভাল। হিন্দুস্থানীরা খায়, ওদের গায়ে জোর কত!...

কিন্তু এই ছোলার ধাক্কা দিদি-নাতি কেউই সামলাতে পারলেন না। অবিরাম শাকপাতা খেয়ে খেয়ে অনভ্যস্ত পেটে বহুদিনই গোলমাল দেখা দিয়েছিল, এবার ভেঙে পড়ল একবারে। তবে দৈব সহায়, এর মধ্যে একদিন মহাশ্বেতা এসে পড়ল মার খবর নিতে।

অভয়পদর চাকরি যাওয়ার পর থেকে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল মহাশ্বেতা—ন্যাড়ার দোকান উঠে যাবার পর বন্ধই করে দিয়েছে প্রায়। বাড়ি থেকে বেরোতেই যেন লজ্জা করে তার আজকাল, "কালা মুখ নীলে করে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।" যে উৎসাহে যে মনের জোরে সে ঘুরে বেড়াত—সে জোর সে উৎসাহের উৎসটাই শুকিয়ে গেছে তার। এ বাড়িতেও আসে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন। এবার তো তবু কিছু ঘনঘনই এসেছে বলতে গেলে। এসেছে কতকটা এই মন্বন্তরের কথা ভেবেই।

'মা যে কেপ্পন মনিষ্যি—মা কি আর এই বাজারে চাল কিনে খাচ্ছে? দ্যাখো গে যাও হয়ত খাড়া ওপোস দিয়ে পড়ে আছে।' বলেও এসেছে সে তরলাকে সে কথা। তরলার উৎসাহেই, এত কটি চালও পেট-কাপড়ে ক'রে বেঁধে এনেছে ও বাড়ি থেকে। পাড়া-ঘরে যার যা হোক, ওদের ঘরে এখনও এ বস্তুটির অভাব হয় নি। অম্বিকাপদ দূরদর্শী লোক, সে বাজারের গতিক বুঝে অনেক আগে থেকে সতর্ক হয়েছে। তাদের চাষের চালও কিছু কিছু আসে—তবে তাতে 'সোম্বচ্ছর' চলে না। কিনতে হয় সাত আট মাসের মতোই। সাধারণত

BanglaBook.org

নতুন চাল ওঠার সময় সে কেনে না, দুচার মাস গেলে ফাল্গুন-চৈত্র নাগাদ সে একেবারে যতটা দরকার কিনে ঘরে তোলে। আগে কেনে না, তার কারণ নতুন চালের রস মরে অনেকটা ওজনে কমে যায়, তাছাড়া তাতে পোকাও ধরে তাড়াতাড়ি। আবার খুচরো খুচরো কেনাও লোকসান, বর্ষার মুখে দাম বাড়ে। তাই চোত-কিস্তির আগে, যখন চাল সস্তা থাকে তখন একেবারে কিনে নেয়।

কিন্তু এবার, যেন বাতাসের মুখে খবর পেয়েই, চাল ওঠার সময়ই পুরো বছরের মতো চাল কিনে রেখেছে। বরং একটু বেশিই কিনেছে। নিজেদের ধানটা অন্য বছর একেবারে ভানিয়ে ঘরে তোলে—এবার এমনিই তুলে রেখেছে, তাতে হাত দিতে দেয় নি কাউকে। রেখেছেও তেমনি কায়দা ক'রে—এমন কি মহাশ্বেতাও তার বুদ্ধি আর বুকের পাটা দেখে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারে না—নিচের ভাঁড়ার ঘরটা খালি করিয়ে তাতেই একেবারে ঠেসে পুরেছে সমস্ত ধান—তারপর আগাগোড়া ইট দিয়ে গেঁথে দিয়েছে তার দোর-জানালার ফাঁকগুলো। মিস্ত্রী ডাকেনি তা বলাবাহুল্য, সেটা বড়কর্তার ওপর দিয়ে গেছে—দু ভাইতে মিলে করেছে অবিশ্যি—মিস্ত্রী ডাকলে জানাজানি চাউর হয়ে যাবে কথাটা, সেও সত্যি; কিন্তু রেখেছে তো বাপু, চারদিকে এই হাহাকার, একটু ফ্যানের জন্যে কী হ্যাঙ্গালি জ্যাঙ্গালি, রাত-দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব, কার বাগানে কচু কার বাগানে ওল এই খুঁজে খুঁজে—কিন্তু ওদের তো এতটুকু চিন্তাও রাখে নি মেজকর্তা। শুধু এ বছর নয়—ও বছরেও বেশ কিছুদিন বসে খেতে পারবে, সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে! ও বছরে বোধহয় আর কিনতেই হবে না, নিজেদেরটা এসে পড়লে পুরো বছর চলে যাবে।

'মেজকর্তা কেপ্পন হোক আর যা হোক বাপু', মার কাছে স্বীকার করে মহাশ্বেতা, 'এদান্তে তো রাত্তির বেলা দু চোখের পাতা এক করে না, সন্ধ্যে থেকে খালি গেলাস গেলাস চা খায় আর ঠায় সারারাত কান খাড়া ক'রে জেগে বসে থাকে। মধ্যে মধ্যে উঠে ভূতের মতো ঘুরেও বেড়ায় গোটা বাড়িটা। আগে যেমন চায়ের পাট দেখলে জ্বলে যেত—ছোট ভাইকে বকত অষ্টপ্রহর—এখন তেমনি নিজেই চোদ্দ পনেরো কাপ চা খায় পেত্যহ। আরও নাকি ভয় তার ঐ ধান-চালের জন্যেই। আঠারো গণ্ডা তালা দিয়েও নিস্তার নেই—বলে যা আকাল, টাকার চেয়ে ধান-চালেই বেশি টাঁক লোকের!'

আবার একটু থেমে বলে, 'আমাদের এঁর তো দিনেরেতেই ঘুম নেই, ওর মতো ঘুরে বেড়ায় না বটে, তবে সারা রাতই যে জেগে থাকে তা দালানে বেরোলেই টের পাই। এমন ক'রে কদিন বাঁচবে কে জানে। খাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে—দুবেলা ভাতে বসে ঐ অব্দি। যেন ঐ কটা চাল বাঁচলেই গেরস্তর সব সুসার হয়ে যাবে!...ওর আরও ভাবনা হয়েছে পাঁটাগুনোর জন্যে। মুখে কিছু না বলুক—বলি ওরই তো ছেলে গা। একটা কারও কোন গতি হ'ল না—সব বসে বসে খাচ্ছে, একি কম ভাবনার কথা। একটা যা হোক দোকানদানী ক'রে দিলে মেজকত্তা, তা এমন গাধা সব—দুদিনে মোট মোট টাকার মাল ধার দিয়ে যথাসব্বস্ব ফুঁকে বসে রইল। আবার যে কে সেই—গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গেরস্তর অন্ন ধ্বংসাচ্ছে!...বড়টার তিন-তিনটে ছানা হয়ে গেল, তবু তো একটা আঁতুড়ে গেল তাই—নইলে চারটে—তাই কি তার একটু হুঁশপব্ব কি ভাবডর আছে। উলটে এখন আর মাগের পাছতলা ছেড়ে নড়ে না এক মিনিট। দিনরাত পাহারা দিচ্ছে বৌকে—মুয়ে আগুন!...আর করবেই বা কি বলো, ওর হয়েছে সেই—দ্যাখ তোর না দ্যাখ মোর, চোর ডাকাতের ভয় পেটে পুরলেই রয়—ভেয়েরা থেকে শুরু ক'রে গুরুজন পজ্জন্ত—সবাই যদি টানাটানি করে ফাঁক পেলেই, ও-ই বা কি ভরসায় নিশ্চিন্তি থাকে বলো।'

কিন্তু এ সব কথা অনেক পরে উঠেছিল। কথা প্রসঙ্গে। মহাশ্বেতা বাপের বাড়ি ঢুকে

BanglaBook.org

মা আর বোনপোর অবস্থা দেখে প্রথমে তো কেঁদেই আকুল। দুজনেই কঙ্কালসার হয়ে গেছে। ঘন ঘন পাইখানা যাচ্ছে আর ফিরে এসে মাদুরে পড়ে ধুঁকছে।

কান্না থামতে একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় মহাশ্বেতার। যেন জ্বলে ওঠে সে। মাকে চিরকাল ভয় ক'রে এসেছে সে, কিন্তু এখন তাঁর প্রতি আন্তরিক টানেই আর সে ভয় থাকে না।

'মরণ তোমার! গলায় দড়ি। মা হও—গুরুজন, বলতে নেই—কিন্তু তোমার এবার মরাই উচিত।...পয়সার আণ্ডিলের ওপর বসে আছ তাও দর দেখে পেছিয়ে এলে, ভাত খাবার চাল দুটো—যা খেয়ে প্রাণ বাঁচবে—সে জিনিসও ভরসা ক'রে কিনতে পারলে না? গুচ্ছের ঘাসপাতা খেয়ে মরতে বসেছ! পয়সার এত মায়া! পয়সা কি তোমার সঙ্গে যাবে? ছালা বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে পয়সা? এ যা অবস্থা—শ্বাস উঠতে যা বাকি, আর দুদিন এইভাবে চললেই তো টেঁসে যাবে—তার পর? ছেলেরা তো খবরও পাবে না, তার আগেই তো পাড়ার বারো ভূতে—এসে লুটপাট ক'রে নিয়ে সরে পড়বে—তোমার এত কষ্টের বুকে ক'রে জমানো পয়সা! সেইটেই খুব ভাল হবে—না? তবু প্রাণে ধরে প্রাণ বাঁচাবার জিনিসটা কিনতে পারবে না। হাত্তোর পয়সার মায়া রে! নিজে তো মরছই—ঐ একরত্তি ছেলেটাকে পর্যন্ত না খাইয়ে মারতে বসেছ!...ছোলা! ছোলা খেয়ে জীবনধারণ করবে! ছোলা খায় ঘোড়ারা, ঐ খেয়েই অমন বিশ পঞ্চাশ কোশ দৌড়য় তারা ভারী ভারী মাল নিয়ে? তোমাদের কি ঘোড়ার পেট—না অত দৌড়ঝাঁপ করো তোমরা? আর এতই বা কি, এক মাসে তো তোমাদের আধমণ চালও লাগে না—না হয় কুড়ি টাকার চালই খেতে। শুধু ভাতও তো খাওয়া যায়, নুন দিয়েও ভাত ওঠে ক্ষিদের সময়। দুধ নয়, ঘি নয়—কেনা আনাজ নয়—কোন খরচই তো নেই—একগাছা ক'রে ট্যানা পরে তো থাকা, দুটো পেটের ভাতের জন্যেও পয়সা খরচ করতে পারো না? এ টাকা তোমার কী কাজে আসবে শুনি? নিজের ছেরাদ্দের জন্যে জমাচ্ছ, না ছেলেমেয়েদের ছেরাদ্দের জন্যে?'

এক নিঃশ্বাসে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে বলে যায় মহাশ্বেতা। এই উপলক্ষে নিজের কিছু পূর্বসঞ্চিত জ্বালাও বোধ হয় বেরিয়ে আসে তার।

কিন্তু শ্যামাও আজ রাগ করেন না। হয় রাগ করার অবস্থা নেই, নয় তো তিনি নিজেই মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছেন এই দুদিনে। তিনি বরং একটু অপ্রস্তুতভাবেই চিঁ চিঁ ক'রে বলেন, 'তা তাই না হয় বাপু কিনব এবার।...মুশকিল, বাজারে তো পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় পাওয়া যাবে—মেজকত্তা তো ঘাঁৎঘোঁৎ জানে শোনে—তাকেই না হয় বলিস না কিছু চাল যদি কিনে দিতে পারে। যা দাম হয় দোব—'

মহাশ্বেতা নিজেই উনুনে পাতা জ্বেলে সঙ্গে-আনা চাল কটি চাপিয়ে দেয়। সবটা চাপায় না—মরা পেট, বেশি ভাত সইবে না—বরং দুটি থাকলে কাল খেতে পারবে। দুটো কাঁচকলাও যোগাড় করে অতিকষ্টে। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলা নিজে বসে থেকে ওদের দিদি-নাতিকে খাইয়ে বাড়ি আসে।...

অম্বিকাপদকে চালের কথা বলতে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলল, 'এখন তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আছে যাদের কাছে, তারাও সহজে বার করবে না। কেন না—একবার খবর পেলে হয়ত লুটপাট হয়ে যাবে। তা না হ'লেও লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি ক'রে, এতকাল নেই নেই বলে এসেছে!...তা এক কাজ করো না হয়, তোমার ছেলেদের বলো—পারে তো খানিকটা চাল এখনকার মতো পৌছে দিয়ে আসুক। ওর আর দাম দিতে হবে না তাঁকে। আপাতত তো ঐ চলুক। তারপর—শুনছি গবর্মেন্ট থেকে চাল দেবার ব্যবস্থা করছে—মাথা পিছু এক সের না দেড়সের ক'রে—তাহ'লে ওঁদের খুব অসুবিধা হবে না। আর না দেয়—তখন খোঁজ-খবর করা যাবে বরং!'

BanglaBook.org

দুর্গাপদ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে, 'হ্যাঁ, গবর্মেন্ট চাল ছাড়ছে, তুমিও যেমন! ওসব কথা রেখে বসো দিকি! ওরাই তো মিলিটারীর জন্যে চড়া দামে কিনে কিনে চাল পাচার করলে দেশ থেকে, আমাদের জব্দ করবে বলে—তবে আবার ছাড়বে কিসের জন্যে?'

'ছাড়বে আরও বেঁধে রাখার জন্যে। তাদের হাতে চাল থাকা মানেই তো টিকি বাঁধা পড়া তাদের কাছে।...আর সবাই যদি মরেই গেল তো ওরা রাজত্ব করবে কাকে নিয়ে। জব্দ করতে চেয়েছিল—জব্দ হয়ে গেছে। যারা ইংরেজ তাড়াতে চেয়েছিল তারাই এখন হামলে পড়েছে চাকরির জন্যে। চাকরি দিচ্ছেও দুহাতে। আমি তো ধনাকে বলেছি—চট্ ক'রে ড্রাইভারিটা শিখে নিতে—তাহলে হয়ত একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারব। এখন মিলিটারীতে ঢুকতে পারলে চাল চিনি এসব ব্যাপারে নিশ্চিন্তি!'

তারপর একটু থেমে অম্বিকা আবার ভাইকে বললে, 'আর এরাই সব চাল টেনে নিয়েছে বলে চাল উবে গেছে—সেটাও ঠিক নয় হয়ত। এ দেশের চালে এ দেশে কুলোত না কখনই। জাহাজ জাহাজ চাল আসত রেঙ্গুন থেকে, তোমরা তার খবরও রাখতে না। সেইটে বন্ধ হয়েই এত মুশকিল হয়েছে। আমি জানি—আমি দেখেছি, আমাদের এক অফিসের বন্ধুর চালের কারবারও ছিল। আমড়াতলার মুসলমানদেরই একচেটে ছিল প্রায় কারবারটা, জাহাজ জাহাজ চাল আনাত, মোটা চাল—পৌনে তিন টাকা দরে সে চাল বিকোত এখানে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চাল খালাস করতে হ'ত জাহাজ থেকে—তা গুদোম-টুদোমের ধার ধারত না তারা। একটা চৌকী পেতে ডকে বসে যেত, চাট্টি চাট্টি নমুনা নিয়ে, খবর পেয়ে ব্যাপারীরাই হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ত—মুখে মুখে কারবার—মোটা মোটা টাকার মাল, কেউ বিশ গাড়ি কেউ চল্লিশ গাড়ি গস্ত ক'রে নগদ টাকা জমা দিয়ে আসত, রসিদ নেই পত্তর নেই পুরনো মক্কেল হ'লে ঠিকানাও জিজ্ঞেস করত না, নতুন হ'লে একটা চিল্‌তে কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিত বড় জোর। বিশ্বাসের ওপর কারবার—কিন্তু ঠিক সময়ে মাল পৌঁছে যেত—এক চুল এদিক ওদিক হ'ত না। প্রথমবার যেবার যাই, আমার সন্দেহ হয়েছিল, বিকেলে পাঠাবার কথা, আমি সকাল ক'রে অফিস থেকে বেরিয়ে দেখতে গিছলুম মালটা পৌঁছয় কিনা। তা চারটেয় পৌঁছবার কথা—পৌনে চারটেয় গিয়ে দেখি সার সার মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তখনই।'

চাল, দুই ছেলে ধনা আর ন্যাড়ার হাতে আন্দাজে দু পুঁটুলি বেঁধে দিলে মেজকর্তা—মহাশ্বেতার মনে হ'ল আধমণের কম নয়। যতই যা বলুক সে, এতদিন মুখের সামনেই নানা কটু কথা বলে এসেছে—গালাগাল-মন্দও কম দেয় নি—কিন্তু এখন এতটা উদারতার সামনে নিজেকেই যেন ছোট মনে হ'তে লাগল। মনে হ'ল—বড়-কর্তা খুব ভুল করে নি হয়ত এত বিশ্বাস ক'রে—দোষেগুণে মানুষটা সত্যিই খুব খারাপ নয়।

সত্যি-সত্যিই এর দিনকতক পর থেকেই কন্ট্রোলে চাল দেওয়া শুরু হ'ল। মাথা পিছু এক সের ক'রে চাল—লাইন বেঁধে দাঁড়াতে হবে তার জন্যে। সেই লাইন শুরু হয় আগের রাত থেকে। ক্রমশ আগের দিন বিকেল থেকে লাইন দেওয়া শুরু হ'ল। প্রথম দিকে না থাকতে পেলে ভরসা থাকে না চাল পাবার। কোন দোকান এক বস্তা কোন দোকান হয়ত দু বস্তা চাল পায়—এক সের ক'রে দিলে আশিজন কি একশ ষাট জনেই মাল কাবার হয়ে যায়। ভোর থেকে যে দাঁড়াল সে হয়ত বেলা বারোটার সময় শুনল যে চাল ফুরিয়ে গেছে সেদিনের মতো—আবার সেই পরের দিন কি অমুক দিন দেওয়া হবে। সেইজন্যেই সবাই চেষ্টা করে অপরের চেয়ে আগে দাঁড়াতে। সকলের সময় নেই এত, তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না লাইনে দাঁড়ানো। ফলে যারা দাঁড়ায় বারো চৌদ্দ ঘণ্টা আগে থেকে, বসবাস করে

BanglaBook.org

সেখানে বলতে গেলে, তারা ছ'আনা সেরে কেনা চাল বারো আনা—একটাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি করে অনায়াসে। এ একটা যেন নতুন ব্যবসা শুরু হয়ে গেল।

খবরটা শ্যামার কানেও পৌছল বৈকি!

লোভে তাঁর স্তিমিত দৃষ্টি জ্বলে উঠল। তিনি বলাইকে বললেন, 'বসেই তো থাকিস, একটা আসন পেতে বসে থাক্ না ওখানে—তবু দু'চার.টে পয়সা আসবে!'

বলাই সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'আমি পারব না।'

'কেন পারবি নি শুনি? বসে বসে তো আছিস। এটুকু পারিস না? খোরাকীটা আসে কোত্থেকে?'

'না পারো দিও না খেতে। তুমি নিজেই খাও গে।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বলাই।

ডাক পেড়ে গালাগাল দেন শ্যামা, 'আ মর্ মুখপোড়া! বাক্যির ছিরি দ্যাকো না! লেখাপড়া শেখা নেই, এক পয়সা রোজগারের চেষ্টা নেই—খাচ্ছেন আর বসে আছেন থুম্ হয়ে—কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যির বেলায় তো ঠিক আছে!...হবে না কেন, কেমন বংশে জন্ম! বেউড় বাঁশের ঝাড় যে! হারামজাদার ছেলে হারামজাদাই হবে। এ তো জানা কথা! আমারই দুর্বুদ্ধি, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছি!' ইত্যাদি—

কিন্তু যতই গালাগাল দিন আর যাই করুন বলাইয়ের অবিচল স্থৈর্য নড়াতে পারেন না। মনে পড়ে যায় নিজের ছোট ছেলের কথা, মারের চোটেও তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেন নি। চোরের মার সহ্য ক'রেও বসে ছিল চুপ ক'রে ঠায়—এই জানলাতেই। নরাণাং মাতুলক্রম—না কি যেন বলে লোকে—সেই মামারই তো ভাগ্নে।

শেষ পর্যন্ত তোষামোদেরও আশ্রয় নেন। ভাল নতুন কাপড় বার করে দেবেন, এমন প্রস্তাবও করেন। কিন্তু বলাইয়ের সেই এক কথা, 'আমি পারব না।'

শেষে রাগ ক'রে নিজেই একদিন যান লাইন দিতে। আগের দিন থেকে দাঁড়াতে পারেন না—রাত চারটেয় রাজগঞ্জের ভোঁ বাজতেই উঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান, কিন্তু তবু চাল পান না। তাঁর থেকে ছ' সাতজন লোক আগে আসতেই চাল বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়েন। দুঃখে ক্ষোভে চোখে জল এসে যায় তাঁর। আর একদফা গাল দেন নাতিকে। ও মুখপোড়া গেলে আগের দিন রাত থেকেই গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে আর এমন শুধু-হাতে ফিরতে হয় না!

চাল তো মেলেই না—উল্‌টে কথাটা প্রচার হয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। ক্রমশ এ বাড়িতেও পৌছয় খবরটা। অম্বিকা অবাক হয়ে তার বৌদিকে বলে, 'সে চাল এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল আঁবুই মার? না, আগে থাকতে সঞ্চয় করতে চাইছেন? তা বলাই থাকতে উনিই বা দাঁড়াতে গেলেন কেন? বলাই যদি না-ই পারে, আমাদের তো বলতে পারতেন, না হয় এরাই কেউ গিয়ে দাঁড়াত!...যাই হোক, মাকে বলে এসো, চাল ফুরোলে যেন আমাদেরই খবর দেন, ওঁকে আর এই বয়সে ঐ সত্তিকজাতের সঙ্গে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে না!'

মহাশ্বেতার মুখ অপমানে কালো হয়ে যায়। সে আবারও মায়ের কাছে এসে ঝাল ঝাড়ে একচোট, 'বলি আর কত মুখখানা পোড়াবে আমার! এতেও কি শান্তি হ'ল না? আমি বেশ বলতে পারি চাল নয়—পয়সার লোভে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি, চড়া দামে বেচবে বলে! ছিঃ ছিঃ! পয়সার এত লালস তোমার? এ পয়সা কাকে দেবে তুমি, প্রাণে ধরে তো জ্যান্তে কাউকে দিতে পারবে না। এ তো দেখছি তোমায় যক করতে হবে। তাই না হয় করো, হাতের কাছে নাতিটা আছে—ওকেই যক্ করে দাও—পয়সা আগলে বসে থাকবে চার যুগ!'

এই প্রথম বোধ করি শ্যামা কোন কথা কইতে পারলেন না—বিশেষত বড়মেয়ের কথার জবাবে—মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

BanglaBook.org

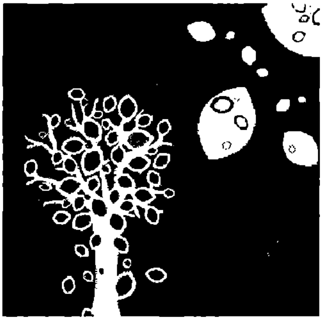

বিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদেশকে অনেক জিনিস শিখিয়েছে, অনেক জিনিস দিয়েছে—বেশির ভাগই মন্দ—তার মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটা সেটা হ'ল ফালতু আলটপ্‌কা টাকা পাওয়ার লোভ। খেটে যা পাওয়া যায় তাতে আর খুশি রইল না এদেশের মানুষ, আরও কিছু তার চাই। যে টাকার আশা ছিল না, হিসেবে যা ধরা নেই, যার হিসেব রাখতেও হবে না—এমন খানিকটা টাকা। এই লোভের পথ ধরেই এল বহু জিনিস—চুরি-জুচ্চুরি, কালোবাজারী, চোরাকারবার, নিষিদ্ধ মাল পাচার, ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া, জালিয়াতি—আরও অনেক। আরও বেশি, অনেক বেশি। অনেক জঘন্য অনেক ঘৃণ্য জিনিস। যে সবের কল্পনা করেও আগে শিউরে উঠত ভদ্র শিক্ষিত মানুষরা। এই টাকার জন্যে, এই লোভের জন্যে সে না করল এমন কাজ নেই, দিল না এমন জিনিস নেই। এই টাকার জন্যে সে বেচল তার সততা, তার সত্যনিষ্ঠা, তার বিবেক, তার ন্যায়-অন্যায়-বিচার—তার আত্মসম্মান, তার সন্তুষ্টি—এমন কি তার অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাও। টাকা চাই তার—বাড়তি টাকা, ফালতু টাকা, যে টাকা নিয়ে সে যা খুশি করতে পারবে; তার সাধ্যের অতীত, তার প্রাপ্যের অতীত সুখে থাকতে পারবে।

ইংরেজ সরকারও তা জানতেন। মানুষ চিনতেন তাঁরা। এদেশের মানুষকেও চিনেছিলেন। তাই তাঁরা এদের আনুগত্য আর এদের মনুষ্যত্ব কিনতে কিছু টাকা উড়িয়ে দিলেন বাতাসে। কার্নিভালের দিনে আকাশে ওড়ানো কাগজের কুচির মতো নোট উড়তে লাগল চারিদিকে। সে টাকা যারা পারল ধরে নিল। 'যুদ্ধের বাজারে দু পয়সা করেছে' সেই ভাগ্যবানদের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই নিবৃত্ত হ'ল দেশের বাদবাকি ভাগ্যহীন লোকেরা। কীভাবে সে দু পয়সা করেছে, যুদ্ধের বাজারে কে কি ভাবে উপার্জন করল—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। সহজ সত্যটাকে সহজেই মেনে নিল। ঈষৎ ঈর্ষা বোধ করল হয়ত, কেউ কেউ 'চুরির পয়সা'য় এই অভিধা দিয়ে সে ঈর্ষা চরিতার্থও করল—কিন্তু সে চুরি ধরিয়ে দিতে, মানুষের সমাজে এই অমানুষদের মুখোস খুলে দিতে চেষ্টা-মাত্র করল না। কারণ যারা গাল দিচ্ছে তারাও আশা রাখে যে তাদের সামনেও একদিন এই 'চুরির পয়সা' উপার্জনের পথ উন্মুক্ত প্রসারিত হয়ে যাবে।...

পয়সা উড়ছে বাতাসে। যারা ভাগ্যবান আর যারা বুদ্ধিমান তারাই ধরে নিচ্ছে। হরেনও ধরল সে টাকা। স্বর্ণর বর হরেন—মহাশ্বেতার জামাই। নানা বিচিত্র পথ ধরল সে। তার অফিসের ক্যাশ ছিল তার হাতে—তারই কিছু হেরফের করে টাকা খাটাতে লাগল। কিসে খাটাল তা কেউ জানে না। স্পষ্ট করে সে বলল না কাউকেই। ভাইয়েরা বড় হয়েছে, তাদেরও বিয়ে হয়েছে, সংসার হয়েছে। প্রধানত তারাই কৌতূহলী। পয়সার আভাস পাচ্ছে, কিন্তু তার চেহারাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। সেটা আসবার পথটাও খুঁজে পাচ্ছে না।

BanglaBook.org

দূরের মানুষ পায় সে আলাদা কথা। এ ঘরের মানুষ—এর এই ধনী হবার পথটা তাদের জানবার কথা—আর জানলে তারাও সে পথে যেতে পারে। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও তারা বার করতে পারল না সে পথের সন্ধানটা।

তাদের আরও কষ্ট—তারা সে পথের ইঙ্গিতটা পাচ্ছে। কারা সব আসে দাদার কাছে, দোর বন্ধ করে কী সব শলা-পরামর্শ আঁটে—আবার বেরিয়ে চলে যায়। অনেক সময় হরেনও চলে যায় তাদের সঙ্গে। হয়ত বা তাদের সঙ্গে করেই নিয়ে আসে। শিবপুরের এই সঙ্কীর্ণ গলিতে বড় বড় মোটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। সে গাড়ি থেকে নামে নানা জাতের নানা বর্ণের লোক। এরা সবাই হরেনের লোক, হয়ত বা তার কারবারের অংশীদার।

হরেন আজকাল ফেরে বহু রাত্রে। সন্ধ্যা রাত্রে ফিরলে লোক সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আবার তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ছুটি পেতে প্রত্যহই গভীর রাত হয়ে যায় তার। কোথায় ঘোরে তা কে জানে। কাউকে বলে, কিছু কিছু ঠিকা নিয়েছে সে অপরের সঙ্গে ভাগে। কিন্তু কিসের ঠিকা তা কখনও বলে না। আবার কাউকে বলে, 'সাপ্লাইয়ের কাজ ধরেছি কিছু কিছু, সময় তো নেই, তাই আপিসের পর ঘুরতে হয়।' কিসের সাপ্লাই, কাকে সাপ্লাই দেয় তা অবশ্য কেউই জানতে পারে না। ওর কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারে না ভাইয়েরা। বেশির ভাগই আসেন পাঞ্জাবী সিন্ধী ভদ্রলোক। মারোয়াড়ীরাও আসেন কেউ কেউ। তাঁরা সহজে কাউকে পাত্তা দেবার মানুষ নন। তাঁদের পেটের কথা টেনে বার করা ওদের অন্তত সাধ্যাতীত! তাঁরা সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। খাতিরও করে হরেন যথেষ্ট। তাঁদের মুহুর্মুহু চা যোগাবার জন্য একটা আলাদা ঝিই রেখেছে সে ইদানীং।

তবে যা-ই করুক, টাকা যে বেশ কিছু আসছে তার, আকাশে ওড়ানো টাকা যে ধরছে সে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে-টাকা গোপন করতে পারে না সে, করতে চায়ও না হয়ত। তাকে কেন্দ্র ক'রে যে একটা প্রাচুর্য উছলে উঠছে সেটা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ, তা চেপে রাখা সম্ভবও নয়। তবে একটা জিনিস তার ভাইয়েরা আঁচ করে ঠিকই, আর তাই থেকে তাদের ঈর্ষাবিষদগ্ধ হৃদয় কিছু সান্ত্বনাও লাভ করে! হরেনের হাতে এমন কোন মূলধন নেই যাতে যুদ্ধের ঠিকা নিয়ে সামাল দিতে পারে। এ টাকা আসছে ওর অফিস থেকে নিশ্চয়। হয়ত ওর সঙ্গে আর যারা ক্যাশে থাকে—কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে কিম্বা লভ্যাংশের লোভ দেখিয়ে মুখ বন্ধ করেছে তাদের। কিন্তু একথা চাপা থাকবে না। একদিন না একদিন ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। আর তহবিল তছরুপ ঘোরতর অপরাধ, ধরা পড়লে বাছাধনের এই হঠাৎ বড়মানুষী বেরিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

কিন্তু সে সান্ত্বনা বা আশ্বাস কোন কাজেই লাগে না বেচারাদের। ধরা পড়বার আগেই ভাঙ্গা ক্যাশ পুরিয়ে দেয় হরেন। মোটা মোটা টাকা যার লাভ হচ্ছে তার সেটা পুরিয়ে দেওয়া কিছু আশ্চর্যও নয়। সুতরাং অফিসে কোন গোলমালই হয় না—বরং টপাটপ মাইনে বাড়ে। মেজভাই জীবেনও ঐ অফিসে কাজ করে, সে-ই সে উন্নতির সাক্ষী দেয়। কালো মুখ আরও কালো হয়ে যায় আত্মীয়দের।

এই সব হুল্লোড়ে—টাকা এবং তার আনুষঙ্গিকে—বেচারী স্বর্ণলতার কথাটা বিশেষ আর মনে থাকে না হরেনের। সে তো আছেই, তার সংসার তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সে ব্যস্ত আছে। সবাইকে তো সে-ই দেখে। তাকে আবার দেখতে হবে কেন? বরং সে ভালই থাকবে এবার—সংসার ভাল করেই চালাতে পারবে—অভাব যখন আর কিছু নেই কোন দিকে। নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার করুক। মাস গেলে শুধু মাইনের টাকা নয়—আরও অনেক টাকা, প্রায় মাইনের দ্বিগুণ টাকা ধরে দেয় স্ত্রীকে। দিন-রাতের ঝি রেখে দিয়েছে হরেন জোর ক'রে। ঠাকুরের রান্না খেতে ঘেন্না করে বলেই রাখে নি। তাদের সংসারের বহু বিচিত্র রান্না, মাইনে করা লোক দিয়ে

BanglaBook.org

হওয়াও শক্ত—তবু প্রয়োজন হ'লে তাও রাখতে পারবে। সে কথা তাকে বলেই রেখেছে হরেন। কোন রকম কষ্ট করার আর দরকার নেই স্বর্ণর। এ সব ছাড়াও কাপড় গয়নার জন্যে মাঝে মাঝে দমকা কিছু টাকা ধরে দেয় হরেন। সময় নেই বলেই নিজে কিনে দিতে পারে না। কিন্তু তাতে তো স্বর্ণরই সুবিধা, পছন্দ-মতো মাল কেনার স্বাধীনতা থাকে।...

এই সব সহৃদয় বিবেচনা এবং অবাধ স্বাধীনতায় স্ত্রীদের ভাল থাকবারই কথা। যে কোন স্ত্রীই এমন বন্দোবস্তে সুখী থাকে। স্বর্ণও ভাল আছে নিশ্চয়। অন্তত হরেন তাই ধরে নিয়েছে।

আসলে আজকাল স্বামী-স্ত্রীর দেখাই হয় কম। অত রাত ক'রে ফেরা নিয়ে প্রথম প্রথম স্বর্ণ কিছু অনুযোগ করেছিল, কিন্তু হরেন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের জীবনে সুযোগ বেশি বার আসে না। তার মতো কেরানীর জীবনে যে সুযোগ এসেছে তা কল্পনাতীত। এই বেলা ভাগ্য ভাল থাকতে থাকতে, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে এর পর আপসোসের সীমা থাকবে না। সুতরাং মিছি-মিছি মূর্খ অজ্ঞ স্ত্রীলোকের মতো স্বর্ণ যেন এই তুচ্ছ কথা নিয়ে অশান্তি না করে। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবন তাদের—এতগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে গেল—মরে-হেজে গিয়েও পাঁচটা—এখনও কি স্বর্ণ স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে?...মদ ভাঙ যে খাচ্ছে না তা তো দেখতেই পাচ্ছে স্বর্ণ—সে গন্ধ তো আর ঢাকা থাকে না। রাত্রে বাইরেও থাকছে না, যখনই হোক, যত রাত্রেই হোক—বাড়িতে ফিরছেই প্রত্যহ—তখন আর অত ভয় কিসের?

স্বর্ণও কথাটা বুঝল। স্বামীর ওপর চিরকালই তার অগাধ বিশ্বাস। হরেন তাকে ভালবাসে ঠিকই। হয়ত একটু বেশিই বাসে। কখনও কখনও সেটা স্বার্থপরতার পর্যায়ে পড়ে যায় বরং। সে বিষয়ে স্বর্ণ নিশ্চিন্ত। সুতরাং হরেনের কথাগুলো সে নিজে তো ষোল আনা বিশ্বাস করেই, অপরে কোন সংশয় প্রকাশ করলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে তাদের সঙ্গে। এ শ্রেণীর সংশয় বা আশঙ্কা প্রকাশ করে তার জায়েরাই বেশি। মেজ জা শোভনা তো প্রকাশ্যেই বলে, 'পুরুষমানুষের রাশে অতটা ঢিল দেওয়া ভাল নয় দিদি। অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না। সত্যি কথা বলতে কি—ভাসুর গুরুজন, বলতে নেই কিছু—কিন্তু ওঁর ভাবভঙ্গিগুলো আমার বাপু আর ভাল লাগছে না কিছুদিন থেকে। তুমি একটু চোখ-কান খুলে রেখো।'

তাতে স্বর্ণ বিষম চটে যায়। বলে, 'তোমাদের চোখ-কান ভাই এত খোলা আছে যে, আমার আর খোলা না রাখলেও চলবে।...পুরুষমানুষ যদি একটু ইদিক-ওদিক করেই—তাতে এমন মহাভারত অশুদ্ধই বা হয়ে গেল কি? আর তাতে কার কি এলো-গেলোই বা? বলি ক্ষেতি হ'লে তো আমারই হবে—বরটা তো আমার, না আর কারুর? অপরের এত মাথাব্যথা কেন তাতে?'

অগত্যা শোভনা চুপ ক'রে যায় তখনকার মতো। কিন্তু হিতৈষী বলতে শোভনা শুধু একা নয়—এমন উৎকণ্ঠা আরও দু'চারজন প্রকাশ করে। সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করে স্বর্ণ। বলে, 'মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে মলো পাড়া-প্রতিবেশী! তা তোদের হয়েছে তাই। বলি আমার চেয়ে তো সে তোদের আপন নয়, তবে তোদের এত চিন্তা কেন? মার চেয়ে ব্যেথিনী, তারে বলে ডান—তা জানিস না?'

আবার হয়ত কাউকে হাসতে হাসতে—একটু বা চোখ-টিপে বলে, 'ওলো, অনেক দিন ঘর করেছি—আমারও অরুচি ধরে গেছে, ওরও। আমার মুখ বদলাবার উপায় নেই তাই, নইলে কি আমিই ছেড়ে কথা কইতুম? যার উপায় আছে—সে দিন-কতক বদলে আসুক না!...আমার অত ভাতার ভাতার বাই নেই তোদের মতো, ভোগও করে নিয়েছি তো ঢের দিন—এখন আর ওতে আছে কি? রসকষ যা ছিল তাতো সব শুক্যে গেছে এ্যাদ্দিনে—কিছু কি আর আছে? এখন তো শুধু পড়ে আছে ছোবড়া-খানা, তা ও যে যা পারে নিক, ওর জন্যে অত আঁচলে গেরো দিয়ে রাখার দরকার নেই।...বরং মানুষটাকে নিয়ে কেউ আর চাট্টি টাকা দেয় তো দিক, আমার টাকাটা এলেই হ'ল!'

BanglaBook.org

কিন্তু ক্রমশ স্বর্ণলতা নিজেও যেন সে অখণ্ড বিশ্বাসটা রাখতে পারে না। ফিরতে রাত হয় বলে শুধু নয়—আজকাল অধিকাংশ দিনই—বাড়িতে খায়ও না হরেন। স্বর্ণলতা এমন বহুদিন খাবার সাজিয়ে বসে থেকেছে দীর্ঘরাত পর্যন্ত—নিজের এবং হরেনের দুজনের খাবারই শোবার ঘরে এনে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে—কিন্তু রাত দেড়টা কি দুটোর সময় এসে হয়ত হরেন জানিয়েছে যে কোন্ বিলিতি হোটেলে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সে জোর করে ডিনার খাইয়ে দিয়েছে। অথবা গুরবচন সিং জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে, সেইখানে খেয়ে এসেছে। ফল হয়েছে এই যে, স্বর্ণরও খাওয়া হয় নি আর। অত রাত অবধি বসে বসে ঢোলবার পর এই সংবাদ শুনে একা বসে আর খেতে ইচ্ছা করে নি! হরেনের খাওয়ার নানা নটখটি, অনেক রকম রান্না না হ'লে সে খেতে পারে না। বহু দুঃখে বহু মেহনতে প্রস্তুত সে সব খাদ্য হরেনের ভোগে এল না—সেটাও কম দুঃখের হেতু নয়। তখন সেগুলো নিজে নিজে গিলতে স্বর্ণর চোখে জল এসে যেত।

তবু—তখন যদি হরেন সামনে বসে দুটো কথা কইত কি গল্প করত, কি খাবার জন্যে পীড়াপীড়িও করত তো আলাদা। সে এতই ক্লান্ত হয়ে আসে যে স্বর্ণর খাওয়া হ'ল কি হ'ল না, সেটাও চেয়ে দেখবার ধৈর্য থাকে না তার তখন। কোনমতে জামা-কাপড় ছেড়েই শুয়ে পড়ে। এমন কি সকালে কোন ছেলেমেয়ের অসুখ দেখে গেলেও কেমন আছে জিজ্ঞাসা করার কথা মনে থাকে না তার। পরের দিন সকালে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

অবশেষে হরেনই প্রস্তাব করল যে, স্বর্ণ যেন তার জন্যে জেগে বসে না থাকে। খাবারও না আর শোবার ঘরে এনে রাখে। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর স্বর্ণর এমনভাবে জেগে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। খাবারটাও এ ঘরে রাখার দরকার নেই—এসে ঢাকা খুলে খাবার খেতে গেলেই স্বর্ণর ঘুম ভেঙে যাবে, স্বভাবতই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে বসবে, বাতাস করতে চেষ্টা করবে—ফলে রাত্রিজাগরণ তার বন্ধ হবে না কোনদিনই। সুতরাং বাইরের ঘরের টেবিলে ভারী লোহার ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেওয়াই ভাল, খেতে ইচ্ছা হ'লে খাবে, নয় তো খাবে না—এক সময় শুধু গিয়ে চুপি চুপি শুয়ে পড়বে হরেন। একবার উঠে দোর খুলে দেওয়াটা এমন কিছু হাঙ্গামা নয়। আর—যেদিন খুব বেশি রাত হবে, আড়াইটে কি তিনটে—সেদিন অত ঝামেলাও করবে না—বাকি দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ঐ বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্বর্ণ অবশ্যই খুব সহজে এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি। এ তার সমস্ত জীবন-সংস্কারের বিরোধী। স্বামী সারাদিন খেটেখুটে এসে বাইরের ঘরে ঢাকা খুলে একা বসে খাবে—আর সে নিশ্চিন্ত হয়ে খাটে শুয়ে ঘুমোবে—এ কেমন করে হয়?...কিন্তু হরেনই জেদ করতে লাগল ক্রমাগত। এবং হয়ত বা কথাটাকে জোর দেবার জন্যেই, পর পর দু তিন দিন আড়াইটেরও পর ফিরল সে, অত রাত্রে যে খেতে বসল না তা বলাই বাহুল্য। অগত্যাই রাজি হ'তে হল স্বর্ণকে। তার বুদ্ধিমতী জায়েরা আর একবার বিজ্ঞর হাসি হাসল আড়ালে।

এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর যেটুকু যোগ ছিল এতদিন—সেটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। আজকাল প্রায়ই শেষ রাত হয়ে যায় হরেনের ফিরতে। ফলে শুধু খাওয়া নয়, শোওয়ার ব্যবস্থাটাও পাকাপাকিভাবে বাইরের ঘরেই ক'রে নিল সে।

কিন্তু রাত হওয়াটাই কি তার একমাত্র কারণ।

বুকের মধ্যে একটা শীতল হতাশা অনুভব ক'রেও স্বীকার করতে হয় স্বর্ণকে শেষ পর্যন্ত যে—তা নয়।

বহুদিন আত্মপ্রতারণার চেষ্টা করেছে সে, দিদিমার ভাষায় 'মনকে আঁখি ঠারতে চেয়েছে—কিন্তু প্রতারিত করা যায় নি শেষ পর্যন্ত। মনের অগোচর পাপ নেই—মনে মনে

মানতেই হয়েছে এক সময়ে যে, তার জায়েদের উপদেশই ঠিক, রাশ অনেক আগেই টানা উচিত ছিল। রাত্রে দেখা হয় না আজকাল আর কোনদিনই—কিন্তু সকালে হয়। চা এনে স্বর্ণকে ঘুম ভাঙ্গাতে হয় প্রত্যহ। বিলাতী সুরার গন্ধ দেশি মদের মতো অত উগ্র নয় হয়ত—তবু পরের দিন সকাল পর্যন্ত তার স্মৃতি রাখার পক্ষে পর্যাপ্ত। গন্ধটা ঠিক না চিনলেও অনুমান করতে পারে। পথে-ঘাটে আসা-যাওয়ার সময় মাতাল দু-একজন পাশ দিয়ে গেছে—সে কথাটাও মনে পড়ে যায় এ গন্ধ থেকে।

আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না স্বর্ণ। সকালে ঘুম ভাঙ্গবার সময় কলহ-কেজিয়া করতে নেই বলে—কিন্তু তারই বা আর অবসর কই এ সময় ছাড়া। অগত্যা তাকে সেই সময়েই কথাটা তুলতে হয়, 'হ্যাঁ গো, কাজ কাজ বলে তুমি সব্বনাশ শুরু করেছ! এই ছাই-ভস্ম ধরেছ! এই জন্যেই বুঝি আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা? এই তোমার ব্যবসা করা? কাজ নেই আর আমার এমন ব্যবসা ক'রে। যাও বা ছিল রয়ে বসে—তাও যাবে বদ্যি এসে, এ নেশা একবার ধরলে পথে বসতে দেরি হবে না। তুমি যেমন চাকরি করছিলে, যেমন সন্ধ্যেয় সন্ধ্যেয় বাড়ি আসছিলে তাই এসো—আমার অত বড়মানুষ হয়ে দরকার নেই আর!'

অপ্রিয় সত্য সকল অবস্থাতেই অরুচিকর, এমন নেশা ভাঙ্গাবার পরের অবস্থার তো কথাই নেই। তবু হরেন কোন রাগারাগি করে না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'এই দ্যাখো! তবে আর মুখ্যু বলেছে কেন! ওরে পাগল, সায়েবী ডিনারের এ একটা প্রধান অঙ্গ, বিশ্বাস না হয়, যে লোক একটু লেখাপড়া জানে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রো। আমি কি আর নেশা করার মতো খাই—যেটুকু না খেলে নয়, সেইটুকুই খাই।'

'কই—এর আগেও তো সায়েবী ডিনার খেয়ে এসেছ কতদিন। তখন তো এমন গন্ধ পাই নি।'

'পাবে কি, মধ্যে যে ও জিনিস একেবারে মিলছিলই না। না দিতে পারলে আর খেতে বলবে কি ক'রে? বোতল-ধোয়া জল খেতে বলবে কি?

'তা অত তোমার রোজ রোজ ডিনার-মিনার খাবার দরকারই বা কি! রোজ রোজ পরের ঘাড়ে চেপে খেতে লজ্জা করে না।'

'পরের ঘাড়ে কী গো। অদ্ধেক দিন তো আমাকেই সব খরচা দিতে হয়। এই তো কালই—একটা ডিনার দিতে সাড়ে আটশো টাকা খরচা হয়ে গেল!'

'ওমা! কারুর বে-পৈতেতেও তো এত খরচা হয় না। এমন ক'রে পয়সা ওড়ালে কদ্দিন চালাতে পারবে? এইভাবে বাজে পয়সা উড়িয়ে কত রাজা-মহারাজা ফতুর হয়ে গেছে জানো? তুমি তো কোন্ ছার!...না না, তোমাকে আর অত ডিনার ফিনার দিতে হবে না! ফের যদি শুনি তুমি এমনি ইয়ার বগ্‌গ নিয়ে মাইফেল ক'রে টাকা ওড়াচ্ছ, তাহলে আমি মাথামুড় খুঁড়ে রক্তগঙ্গা করব বলে দিচ্ছি!'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে হরেন। বলে, 'তুমি একটা আস্ত আবর, মাইরি! ওরে বাবা, ওটা পয়সা ওড়ানো নয়, পয়সার সুতোয় খেলানো। বেনোজল ঢুকিয়ে ঘরোজল বার করতে হয় শোন নি কখনও? এও সেই রকম। আমার আদ্ধেক কাজ তো ঐ ডিনার-লাঞ্চ খেতে-খেতেই হয়। এসব বিলিতি দস্তুর। এই যে ব্যারিস্টার হ'তে সব বিলেতে যায়—কটা ডিনার আর কটা লাঞ্চ খেলেই পড়া শেষ। সেও গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে খেতে হয়—তা জানো!'

অত শত বোঝে না স্বর্ণ, তবু স্বামীকে অবিশ্বাসও ঠিক করতে পারে না, ম্লান মুখে বলে, 'কে জানে বাপু, ও যা জিনিস, ওর নাম শুনলেই ভয় করে। কতলোকের সব্বনাশ যে হ'তে দেখলুম তার কিছু ইয়ত্তা আছে! ঐ একটু আধটু থেকেই শুরু হয়—প্রেথম প্রেথম

BanglaBook.org

সব্বাই বলে যে ও কিছু নয়—তারপর নেশা যখন ঘাড়ে চেপে বসে তখন আর জ্ঞান থাকে না কারুরই! এ পোড়ার লড়াই যে কবে শেষ হবে—এই সব কাণ্ডকারখানা বন্ধ হবে—যুদ্ধ শেষ হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব খাড়া-খাড়া!'

হরেন তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়, 'ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে এনো না বলে দিচ্ছি, খবরদার! যদ্দিন যুদ্ধ চলে তদ্দিনই লাভ। যুদ্ধই লক্ষ্মী আমার!'

তা সত্যি। স্বর্ণ ভাবে, শুধু হরেনের কেন, তারও অনেকের কাছেই এ-যুদ্ধ লক্ষ্মী। ওর ভাইয়েরা যে কেউ কোনকালে রোজগার-পাতি করবে, পয়সা ঘরে আনবে—তা একবারও ভাবে নি সে। এই যুদ্ধের দৌলতেই তা সম্ভব হ'ল! সেজ ভাই ধনা ড্রাইভারী শিখে মিলিটারীতে নাম লিখিয়েছে, সে নাকি কেল্লার লরী চালাচ্ছে আজকাল। শুধু মাইনেই নয়, এদিক ওদিকও বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছে নাকি। বাইরের মাল স্টেশনে জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছে দেবার পথে এক বস্তা চিনি কি এক বস্তা সিগারেট নামিয়ে দিয়ে যায়—মোট মোট টাকা পায় তাতে! অবিশ্যি ভাগ দিতে হয় তা থেকে অনেককে—তবু দিয়ে থুয়েও ঢের থাকে। ধনা এর মধ্যে রেডিও কিনেছে, আবার আলমারি কিনব কিনব করছে। মেজকা তো তারও বে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। ন্যাড়াও কি যেন লেদ্ না কী বলে, তারই কাজ শিখে কোন্ পাঞ্জাবির কারখানাতে ঢুকে পড়েছে। বাকি দুটো ভায়েরও হয়ত কিছু কিছু গতি হয়ে যাবে—লড়াইটা আর কিছুদিন চললে। কিছু হ'ল না শুধু বুড়োরই। আর হবেও না কোন দিন তার কিছু। চিরকালই কাকাদের ভায়েদের হাত-তোলায় জীবন কাটাতে হবে। মুখপোড়া!...স্বর্ণ মনে মনে সাধারণভাবে গুরুজনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বড়ভাইকে গাল দেয়।...মুখপোড়ার যে আবার সন্দ-বাই ধরেছে। দিনরাত নাকি বৌকে পাহারা দেয় আজকাল, আঁচল ধরে ধরে ঘোরে। বৌটারই শতেক ক্ষোয়ার। বিয়েন তো অগুনতি—কটা জন্মাচ্ছে কটা মরছে আর কটা রইল তা বোধ করি ওরাও হিসেবে রাখে না। সেদিন মেজকাকে জিজ্ঞেস করেছিল স্বর্ণ, সেও বলতে পারে নি। অথচ এ গোটা ভূ-ভারতের হিসেব মেজকার নখদর্পণে সে কথা কে না জানে!...এক মাসও বোধ হয় জিরোতে পারে না বেচারী, বারোমাসেই পেটে বোঝা নিয়ে ঘুরছে আর সংসারের খাটুনি ষোল আনা বজায় দিচ্ছে।

'মেয়ে জন্মের শতেক জ্বালা। মুয়ে আগুন মেয়ে জন্মের।' মনে মনে বারবার বলে স্বর্ণ। হয়ত নিজের কথাটা মনে ক'রেই বলে। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে।

॥ ২ ॥

স্বর্ণলতার শরীর ভেঙ্গেছে অনেকদিন; তার স্বাস্থ্য অসাধারণ রকমের ভাল বলেই এতদিন সে তথ্যটা কারও নজরে পড়ে নি। তার প্রসঙ্গে বিশ্রাম বা কর্মহীনতা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সে দিনরাত এই সংসারে খাটবে সেইটেই যেন স্বাভাবিক। সেই কথাই সবাই জানে। সে খাটুনিও উদয়-অস্ত। শাশুড়ী অথর্ব হয়েছেন, অন্ধ হয়ে গেছেন প্রায়—তবু তাঁর খোরাকটি ঠিক বজায় আছে। সে বিচিত্র খাদ্য-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় নি। আর তার আয়োজনের ভারও স্বর্ণরই ওপর চেপে আছে এতাবৎ কাল। অন্য বৌ এসেছে বটে কিন্তু তাদের রান্না তাঁর মুখে রোচে না। তারা নাকি সব ম্লেচ্ছও, তাদের হাতে খেলে বামুনের বিধবার জাতজন্ম থাকে না। তারা নাকি হাত ময়লা হবার ভয়ে গোবরে হাত দিতে চায় না, হাজা হবার ভয়ে হাত ধোয় না। চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখেই টপ্ করে ভাঁড়ারে হাত দেয় তারা। তাঁর পৌনে-চারকাল কেটে গেছে, এখন কি আর এসব অনাচার তাঁর সয়? না হয় না-ই খাবেন তিনি। এ তো আর অল্পবয়সী ছুকরীদের মতো নোলা'র জন্যে খাওয়া নয়—তাঁর খাওয়া এখন 'পেট ব্যাগল্তা'—জীবন-ধারণের জন্য। তা আর

বাঁচার দরকারই বা কী তাঁর? বাঁচতে চানও না তিনি। কেউ যদি দয়া করে খানিক বিষ খাইয়ে দেয় তো তাকে আশীর্বাদই করবেন প্রাণ ভরে।

অর্থাৎ সে-ই এধারে বেলা তিনটে এবং ওধারে রাত এগারোটা পর্যন্ত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে বসে থাকা অব্যাহত আছে। উপরন্তু ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—তাদের জন্যে আরও ঢের খাটুনি বেড়ে গেছে তার। জায়েরা এসেছে বটে একে একে, কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হয় নি। একটু-আধটু ফায়ফরমাশ খাটা ছাড়া কোন কাজ পায় নি তাদের দ্বারা। তাও, তারা কদিনই বা ঝাড়া-হাত-পা থেকেছে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো প্রায় আঁতুড়ঘরের ব্যবস্থা। তারপর এখন তো কথাই নেই—যে যার আলাদা সব। বুড়ো শাশুড়ীকে কোন বৌ-ই নিতে চায় নি। তিনিও যেতে চান নি কারুর ভাগে! তিনি ভালভাবেই জানেন যে তাঁর এত ঝামেলা, এত দাপট আর কোন বৌ সহ্য করবে না।

অবশ্য স্বর্ণ বলেও নি কাউকে কিছু। নিজেই নিঃশব্দে বহন করেছে এ-বাড়ির জ্যেষ্ঠা বধূর যত কিছু দায়-দায়িত্ব। শাশুড়ীকে ও ঘাড় থেকে নামাতে চায় নি। নিজেই মুখ বুজে সহ্য করেছে এই অমানুষিক খাটুনি আর অমানুষিক হৃদয়হীনতা।

কিন্তু এবার শুধু তার মন নয়—দেহও বিদ্রোহ করল। আর নয়, আর পারবে না কিছুতেই এ বোঝা বইতে, এ ভার টানতে। তার সহ্যশক্তি সহনশীলতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে এবার। দড়িতে টান পড়তে পড়তে শেষ তন্তুটিও ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছে। আর সে পারবে না নিত্য নানা লোকের বিবিধ জুলুম সহ্য করতে। এবার পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে দীর্ঘদিনের এই একটানা জীবনযাত্রায়।

জ্বর হচ্ছিল কিছু দিন থেকেই। প্রত্যহই জ্বর আসছিল একটু একটু। বিকেলের দিকে আসত আবার রাত্রে ছেড়ে যেত। কিন্তু ক্রমশ ছাড়াটা বন্ধ হয়ে গেল, সামান্য জ্বর নাড়িতে লেগেই থাকে দিনরাত। উল্‌টে নূতন উপসর্গ দেখা দিল—কাশি। অষ্টপ্রহরই অল্প অল্প খুক্‌খুকে কাশি লেগে থাকে। ইদানীং কাশির বেগও বেড়েছে।

জ্বরের কথা স্বর্ণ কাউকেই বলে নি এতদিন। বিশেষ যে সাবধানে থাকত তাও নয়। স্নানও করত মাঝে মাঝে। ভাত তো খেতই!

অবশ্য সে না খাওয়ারই মধ্যে। ভাতের কাছে বসত শুধু। কিছুই খেতে ইচ্ছে করত না তার। দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তুতে। খাওয়া কমবার ফলেই হয়ত দেহটাও শুকিয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সে বেঁটে হ'লেও চিরদিনই তার গোলালো গোলালো নরম নরম গড়ন, সেজন্যে একটু মোটাই মনে হ'ত তাকে হঠাৎ দেখলে—কিন্তু এখন একেবারেই কঙ্কালসার হয়ে উঠল। ওর সেই মেমসাহেবদের মতো ফরসা রঙেও বিবর্ণতা ঢাকা পড়ল না—স্বভাবগৌর বর্ণ ছাপিয়ে উঠল রক্তহীনতার চিহ্ন।

স্বর্ণ না বললেও এসব লক্ষণগুলো অপরের চোখে পড়তে পারত। কিন্তু কার চোখে পড়বে? শাশুড়ী ভাল দেখতে পান না, পেলেও লক্ষ করতেন কিনা সন্দেহ। আর যার চোখে পড়ার কথা সবচেয়ে বেশি, তার সঙ্গে তো দেখাই হয় না আজকাল ভাল করে। সকালটুকুই যা বাড়িতে থাকে শুধু—ঘণ্টা-দুই বড়জোর—সে সময়েও সর্বদা ব্যস্ত থাকে। লোক আসার বিরাম নেই কোন সময়েই, যদি বা কোন সময় একটু ফাঁক রইল তো কাগজপত্র হিসাবনিকাশ আছে। তাতেই সময় কেটে যায়। কোনমতে এক সময় উঠে মাথায় জল ঢেলে খেতে বসে। তাও, অন্যমনস্কভাবেই খায়, কেউ কথা কইলে অন্যমনস্কভাবেই জবাব দেয়। কারও দিকে ভাল করে তার তাকাবারই অবকাশ নেই।

তবু এক সময় তাকাতে হ'ল। একদিন আর কোনমতেই উঠে দাঁড়াতে পারল না স্বর্ণলতা। মুখ গুঁজড়ে পড়ল একেবারে।

BanglaBook.org

এরকম এ সংসারের ইতিহাসে কখনও ঘটে নি, এক স্বর্ণলতার আঁতুড়ে ঢোকবার সময় ছাড়া। সে সময় তবু কিছু প্রস্তুতি থাকত আগে থেকে, অন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা থাকত। কিন্তু এর কোন প্রস্তুতি ছিল না। মাথাতে আকাশ ভেঙ্গে পড়ল সকলকার। কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। ছেলেরা কিছুই পারে না, এ বাড়িতে কোন বেটাছেলের জল গড়িয়ে খাওয়ারও রীতি নেই। পারত এক মেয়ে—কিন্তু স্বর্ণর বড় মেয়েটিরই বয়স এই সবে বছর-দশেক। সে একটু-আধটু ফায়-ফরমাশ খাটতে পারে মাত্র। তাকে দিয়ে রান্নার কোন কাজ কখনও করায় নি স্বর্ণ, ও দিকেই যেতে দেয় নি। তাছাড়া এখন ইস্কুলে পড়া রেওয়াজ হয়েছে, পাড়াঘরের অধিকাংশ মেয়েই ইস্কুলে পড়ে—রেবাকেও দিতে হয়েছে। স্বর্ণলতার কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। সুতরাং সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে চলে যায়—তাকে কাজকর্ম শেখাবেই বা কখন?

হরেন এতকাল সংসারের দিকে মন দেয় নি—দেবার দরকার হয় নি বলে। এখন আর মন দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। সে দস্তুরমতো বিরক্তও হয়ে উঠল সেজন্য—এটা যেন তার ওপর একটা অবিচার বলেই মনে হ'তে লাগল। বললে, 'কৈ, তোমার এমনধারা অসুখ হয়েছে—এতকাল ধরে ভুগছ, আমাকে বলো নি তো?'

এর উত্তরে অনেক কিছু বলতে পারত—কিন্তু কখনই কোন কটু উত্তর, কথার দ্বারা কোন মর্মান্তিক আঘাত কাউকে দিতে পারে না স্বর্ণ। আজও পারল না, ম্লান হেসে শুধু বলল, 'কী আর বলব, তুমি ব্যস্ত থাকো—তুমিও তো খাট্‌ছ ভূতের মতো, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করব?'

'সামান্য আর কোথায়—এ তো বেশ ভাল রকমই বাধিয়ে বসে আছ দেখতে পাই!'

'বেশ ভাল রকম বলে কিছু তো তেমন বুঝতে পারি নি, তা'হলে বলতুম!'

ইষৎ যেন লজ্জিতভাবে, কৈফিয়তের সুরেই বলে স্বর্ণলতা।

সে যেটা বলতে পারে না, সেটা বলে দেয় জীবেন, ওর মেজ দেওর। বলে, 'এতদিন ধরে ভুগছে, এই চেহারা হয়ে গেছে—তবু মুখ ফুটে বল্‌তে হবে যে অসুখ, তবে তুমি ডাক্তার দেখাবে? বাধিয়েছে—সে তো বৌদির দিকে চাইলেই বোঝা যায়।...তুমি কি একবারও বৌদির দিকে চেয়ে দ্যাখো নি এই একটা বছরে?'

হরেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না সহজে, 'তা তোরা তো দেখেছিলি, তোরাও তো বলতে পারতিস। দেখছিস তো আমার নাইবার খাবার সময় নেই—এদিকে রাত দুটো-আড়াইটেয় ফিরি, ওদিকে নটা না বাজতে বাজতে বেরুই। আমার কি কোনদিকে চাইবার ফুরসুৎ আছে?...একবার কথাটা কানে তুলতে কি হয়েছিল? তোদেরও তো কম করে নি তোদের বৌদি!'

মাকে গিয়েও তিরস্কারের সুরে প্রশ্ন করে হরেন, 'ওর এমন দশা হয়েছে, তা আমাকে একবার বলতে পারো নি!'

ওর মা অবশ্য দমবার পাত্রী নন, সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেন, 'আমি কি চোখে দেখতে পাই যে, কী দশা হয়েছে তা টের পাব?...না কি তোমার বৌই আমাকে বলে কখনও—কী হচ্ছে না হচ্ছে! দাসী বাঁদী পড়ে থাকি, যখন হোক দয়া ক'রে দুটো খেতে দেয় ভিক্ষের ভাত—এই পর্যন্ত।...আমাকে কি গুরুজন আপনার জন বলে মনে করে?...আর আমি যদি বুঝ্‌তেই পারতুম—তোর টিকি দেখতে পাচ্ছি কখন যে বলব। বছরে একদিন দেখা হয় কিনা সন্দেহ।...আর আমাকেই বা এমন চোখ-মুখ রাঙিয়ে তেড়ে এসেছিস কিসের জন্যে? তোর মাগ, রোজ রাত্তিরে গলা জড়িয়ে শুচ্ছিস, তুই টের পাস না?...আ ম'ল যা! আমার কাছে এসেছেন—বৌয়ের কেন অসুখ করল, কেন সে অসুখের কথা ওঁকে জানানো হ'ল না তার কৈফিয়ৎ চাইতে!...বেহায়া বেইমান কমনেকার!'

BanglaBook.org

কিন্তু বকাবকি অনুযোগ অভিযোগের সময় বেশি নেই হাতে। সেদিনের মতো অবশ্য ভাইয়ের বৌরাই চালিয়ে দেবে—একবাড়িতে থাকা—সেটুকু চক্ষুলজ্জা এখনও আছে তাদের—তার পর?

অগত্যা ডাক্তার ডাকারও আগে ঠাকুরের খোঁজ করতে বেরোতে হয়। অফিস কামাই ক'রে সারা বেলা ঘুরে প্রায় ডবল মাইনে কবুল ক'রে শেষপর্যন্ত এক বামুন ঠাকরুণকে ধরে নিয়ে আসে হরেন।...

মধ্যবয়সী বিধবা একটি, তবে অনেকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। পাড়াঘরে যে-সব রাঁধুনী দেখা যায় সে রকম নোংরা নয়। বামুনের মেয়েও বটে—জানাশুনো জায়গা থেকে নিয়ে এসেছে। সেই সুদূর বেহালার কাছে সোরশুনো না কী এক জায়গা আছে, সেইখানে বাড়ি—সেখান থেকে আসতেই নাকি আট টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়েছে হরেনকে—আত্মীয়স্বজন অনেক আছে সেখানে, তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে খোঁজখবর ক'রে এনেছে। মার জন্যেই এত কাণ্ড করা—ঠিক সৎ-ব্রাহ্মণের মেয়ে না জানলে তিনি ওর হাতে খাবেন না।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, পরিষ্কার কাপড়-জামা, কথাবার্তা ভাল—সবই ঠিক, তবু স্বর্ণর এতকালের ঘরকন্না, তার অতি প্রিয় ও অতিপরিচিত হেঁশেলের মধ্যে একটা অপরিচিত মেয়েছেলে গিয়ে ঢুকল—বহুকাল, হয়ত বা চিরকালের জন্যেই; তার পরিপাটী ক'রে নিজের হাতে সাজানো ভাঁড়ার—কী অগোছালো নোংরা ক'রে তুলবে তা-ই বা কে জানে, কী রেঁধে দেবে তার স্বামীপুত্রকে, হয়ত মুখেই তুলতে পারবে না কেউ—না খেয়ে খেয়ে রোগা হ'তে থাকবে বাচ্ছারা;—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে স্বর্ণলতার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল। তার শোবার ঘরের একটা জানলার মধ্য দিয়ে তাদের রান্নাঘরটা দেখা যায়, বামুন-মেয়েকে সেখানে ঢুকতে দেবার পর থেকে আর ওদিকে একবারও চাইতে পারল না সে, দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে রইল সমস্তক্ষণ।...

রাঁধুনী ঠিক হ'তে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ওর চিকিৎসার কথা ভাবতে বসল হরেন। সকালে অবশ্য পাড়ার ডাক্তার—যিনি ওর ছেলেপুলেদের অসুখ হ'লে দেখেন—তাঁকে খবর পাঠিয়েছিল, তিনি এসে দেখে কী সব ওষুধ ইঞ্জেকশনও দিয়ে গেছেন, কিন্তু তার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার আর ফুরসুৎ হয় নি। অবশ্য সেজন্যে খুব ক্ষতিও বোধ করে নি কেউ। কারণ তাঁকে দিয়ে যে শেষ অবধি চলবে না সে বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত। খুব সাংঘাতিক কিছু না হ'লে স্বর্ণ এমনভাবে শুয়ে পড়ত না—এটুকু হরেনও বোঝে।

ভায়েরা পরামর্শ দিল, বত্রিশ টাকা ফিয়ের কোন বড় ডাক্তার ডাকতে। জীবেন বলল, 'স্যাকরার ঠুক-ঠাক কামারের এক ঘা, এসব ডাক্তার দেখিয়ে কোন লাভ হবে না, মিছিমিছি ভোগান্তি। অল্পে যাবার মতো কিছু হয় নি বৌদির। মানুষটা পড়ে থাকলে তোমারই ক্ষেতি, আর ওসব ঢিমেতেতালা চিকিৎসায় শেষ অবধি খরচ কম পড়ে না—মিছিমিছি এখন সামান্যর জন্যে ও দৃষ্টি-কৃপণতা না করাই ভাল!'

হরেনের মা কিন্তু কথাটা শুনে হেসে খুন হলেন। বললেন, 'পোড়া কপাল। ও ওর শুক্‌নো-সূতিকা হয়েছে—কম বিয়েন তো আর বিয়োলো না এই বয়সে। শরীরের বাঁধুনি ভাল, তোয়াজে আছে, ভাল-মন্দ খাচ্ছে তাই—নইলে কবেই পড়ত।...তা ডাক্তারিতে ওর কী করবে? কোন পুরনো বিচক্ষণ দেখে কবিরাজ দেখা—নয়ত হোমিওপাথী কর। হোমিওপাথীতে এসব রোগ আজকাল খুব চটপট আরাম হচ্ছে!'

কথাটা অবশ্য উপস্থিত কারুরই ভাল লাগল না। তাঁর ছোট ছেলে অতুলই জবাব দিল, 'তবে মা সেবার তোমার সামান্য আমাশার সময় দাদা হোমিওপাথিক ডাক্তার এনেছিল যখন—তুমি বেঘোরে মেরে ফেললে বলে ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলে কেন?'

BanglaBook.org

'সে আমার সামান্য রোগ হয়েছিল! আমাশা!...সে তো আধা-কলেরা হয়েছিল বলতে গেলে। সে কি সহজ রোগটি বেধেছিল আমার!...তার সঙ্গে এর তুলনা!...বৌ যে! আসলে আমার এ ক্ষেত্রে কথা কইতে যাওয়াই ভুল হয়েছে। বুড়ো মার জন্যে ডাক্তার ডাকা বাজে খরচা—কিন্তু বোদ্দের বেলা তো আর তা নয়। তাদের যে মহামূল্য জীবন...বেইমান, বেইমান না হলে আর এত দুর্দশা হয়। মা না থাকলে সব এক একটা বৌ পেতিস কী ক'রে আজ? এত বড়্ডা হতিস কী করে!...বলে অসৈরণ সইতে নারি শিকে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ি।...ডাকো বাবা, ডাকো তোমাদের যাকে খুশি, আমার নাকে-কানে খৎ যদি কোন কথা বলি আর। বিলেত থেকে সায়েব ডাক্তার আনাও না, সেই তো ভাল! পয়সা হয়েছে দুটো—খরচ করতে হবে বৈ কি। আধুনিকের ধন হ'লে সে পয়সা ডাক্তার-বদ্যি আর উকিল-বারেস্টারেই খায় চিরকাল—এ তো জানা কথা!'

যাই হোক—শেষ পর্যন্ত বত্রিশ টাকা ফিয়েরই ডাক্তার একজন এলেন। তিনি কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার পরই গম্ভীর হয়ে উঠলেন, আরও খানিকক্ষণ ভাল ক'রে দেখে বাইরে গিয়ে হরেনকে বললেন, 'এ তো দেখছি মোক্ষম রোগ ধরিয়ে বসে আছেন। টি-বি। খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখেন নি আপনারা—হয় কিছু খান নি, নয় খাওয়া হজম হয় নি। দারুণ অপুষ্টি—তাঁর ওপর সাত-আটটি সন্তান প্রসব এবং অমানুষিক খাটুনি—এই জন্যেই এটা হয়েছে। এ রোগ অবশ্য আজকাল আর আয়ত্তের বাইরে নয়—কিন্তু ঘরে রেখে কি পারবেন আপনারা চিকিৎসা করতে? ওষুধের চেয়েও এ রোগের বড় কথা শুশ্রূষা আর পথ্যি।...বরং যদি যাদবপুরে কি মদনাপল্লীতে নিয়ে যেতে পারেন তো দেখুন।'

অক্ষর দুটো শুনেই হরেনের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। সে কোনমতে বার দুই ঢোক গিলে শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'টি-বি?...ঠি-ঠিক বলছেন? মানে ভাল ক'রে দেখেছেন তো? ভুল হয় নি?...মা বলছিলেন যে শুক্‌নো সূতিকা না কি একরকম রোগ আছে—ওরও তাই হয়েছে?'

'সেও একরকমের কন্‌জাম্পটিভ্‌ ডিজিজ—কিন্তু না, ভুল হয়েছে বলে মনে হয় না। টি-বি তো বটেই, বেশ অনেকদিনই হয়েছে। উনি কাউকে কিছু বলেন নি, রোগ চেপে চেপে রেখেছেন।...অবশ্য এক্‌স রে তো করাতেই হবে, আরও কিছু কিছু পরীক্ষা আছে—কিন্তু সে যাই করান, আমার বিশ্বাস ঐ একই রেজাল্‌ট্‌ পাবেন। আমি ওষুধ ইন্‌জেকশন লিখে দিয়ে যাচ্ছি—থুথু রক্তপরীক্ষা এক্‌স্‌রে—এসব কোথায় কীভাবে করাবেন তাও লিখে দিয়ে যাচ্ছি, তবে সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল ওঁকে কোথাও সরানো। বাড়িতে রেখে এ চিকিৎসা করানো শক্ত। তা-ছাড়া ছেলেমেয়েদের এখনই সিগ্রিগেট করা উচিত—সে কি পেরে উঠবেন?'

হরেন তাঁর সব কথা শুনলও না ভাল করে। যন্ত্রচালিতের মতোই প্রেসকৃপ্‌শনগুলো নিল তাঁর হাত থেকে। তার তখন মাথা ঘুরছে। সে যে এত ভীতু তা এতকাল বোধ করি সে নিজেও জানত না। রোগটার নাম শোনা পর্যন্ত তার হাত পায়ের জোর চলে গেছে। খুব স্পষ্ট কোন ধারণা নেই বটে তবে রোগটা যে সাংঘাতিক তা জানে। মারাত্মক রকমের ছোঁয়াচে। যদি ওর থেকে আর কারও হয়? ছেলে-মেয়েদের, কিম্বা তার নিজেরই? এতদিন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া সব ওর হাতেই হয়েছে, শোওয়াও—রোজ না হোক, মাঝে-মধ্যে এক আধদিন ওর পাশে শুয়েছে বৈকি! কতদিন ধরে ঐ রোগ ঢুকেছে ওর মধ্যে তার ঠিক কি, ডাক্তার তো বলে গেল অনেকদিন—তিন-চার ঘণ্টাও যদি শুয়ে থাকে তাই যথেষ্ট, ও রোগের বিষ নিঃশ্বাসে ছড়ায় নাকি; ভাবতেই মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল হরেনের।

সে আতঙ্ক—যেমন দুর্বলচিত্ত লোকের হয়ে থাকে—শিগ্‌গিরই একটা বিজাতীয় আক্রোশের আকার ধারণ করল। ডাক্তার চলে যেতে সে ভেতরে এসে সেই আক্রোশের বিষ প্রায় সমস্তটাই উদ্‌গীরণ করল তার স্ত্রীর ওপর।...কেন সে এতকাল ধরে এই রোগ

BanglaBook.org

ভেতরে ভেতরে পুষে রেখে দিয়েছে—কেন জানায় নি যে রোজ ওর জ্বর আসছে একটু ক'রে—এমনভাবে শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে...হরেন কি চিকিৎসা করাত না শুনলে? না কি সে এতই কৃপণ যে ওর অসুখ হয়েছে শুনেও পয়সা খরচের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত? কখনও কি ডাক্তার ডাকে নি সে স্ত্রীর জন্যে? তার এত কি পয়সার মায়া দেখল স্বর্ণ। কী এমন কৃপণতা করেছে সে এতকালের মধ্যে? এমনভাবে এই রোগটি বাড়িয়ে এখন এইভাবে চারিদিক জজাবার কি দরকার পড়ল? এত আড়ি কার ওপর ওর? মরলে তো নিজের ছেলে-মেয়েরাই মরবে—না কি অপর কেউ...ইত্যাদি ইত্যাদি—

কথাগুলো শুনতে খুবই ভাল, আপাত-বিবেচনায় মনে হয় স্ত্রীর জন্যে উদ্বেগই এ উষ্মার মূল কারণ, কিন্তু যে দীর্ঘকাল এই স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছে তার তা মনে হবার কোন কারণ নেই। স্বর্ণরও তা হ'ল না। সে মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় জল ঝরে পড়তে লাগল। হরেন যে কী পরিমাণ ভয় পেয়েছে এবং সেইজন্যেই যে এমন দিশাহারা হয়ে উঠেছে—একটা আপদ একটা বোঝার মতো মনে হচ্ছে এখন স্ত্রীকে—কোন মতে দূর করে দেবার আশু কোন পথ দেখতে না পেয়েই যে এতটা ক্ষেপে উঠেছে—তা বুঝতে বাকি রইল না তার একটুও।

প্রাথমিক ঝাঁঝটা কেটে যাবার জন্যেই হোক—অথবা স্ত্রীর চোখের জল লক্ষ করেই হোক—অনেকটা প্রকৃতিস্থ হল হরেন। বোধহয় নিজের ভুলও বুঝতে পারল খানিকটা। রাগারাগি করলে ঝগড়া-বিবাদ করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে কিছুটা দেরি হয়—বরং মিষ্টি কথায় কাজ হয় অনেক সহজে, এটা এই কিছুকাল ব্যবসা করার ফলে বেশ বুঝেছে সে। তাই খানিকটা চুপ করে থেকে অনেকখানি নরম গলায় আবার বলল, 'না—রাগ কি আর মানুষের সহজে হয়? দেখছ আমি কী রকম ব্যস্ত থাকি সর্বদা—নাইবার-খাবার সময় নেই—আমাকে একটু মুখ ফুটে বলতে কি হয়েছিল? তুমি চারচালের ভার নিয়ে আছ তাই না আমি এতটা নিশ্চিন্তি হয়ে খাটতে পাচ্ছি। এখন কি আতান্তর অবস্থা হবে ভাব দিকি। ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভেবেও তোমার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যতই ব্যস্ত থাকি—তাদের অসুখ হ'লে আমাকে তো ঠিক বলেছ, আমিও তার ব্যবস্থা করেছি—নিজের অসুখের কথাটা একবার কানে তুলতে পারো নি? সেটা বুঝি চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল তোমার?—না কি?...আমি কি তোমার কুটুম, না দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছি বাড়িতে যে এত চক্ষুলজ্জা?'

খুবই ন্যায্য কথা। শুনলে যে কোন স্ত্রীরই পুলকিত হওয়া উচিত। কিন্তু স্বর্ণর তা হ'ল না। জবাবও দিল না কিছু। পরবর্তী আক্রমণটার জন্যেই অপেক্ষা করতে লাগল শুধু।

সেটা আসতেও অবশ্য আর দেরি হ'ল না। হরেনের ধারণা যে তার স্ত্রী নির্বোধ, অনেকটা ছেলেমানুষ এখনও। তাই বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজনও বোধ করল না। একবার সামান্য কেশে গলাটা সাফ্ করে নিয়ে মাথার পিছন দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'দ্যাখো একটা কথা ডাক্তার তো বারবার বললেন, হাসপাতালে পাঠাবার কথা—আর যতদিন তা না হয়—অন্তত এবাড়ি থেকে ঠাঁইনাড়া করে অন্য কোথাও রাখার কথা। বেশ জোর দিয়েই বললেন—এ রোগ নাকি বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা কঠিন—হাসপাতালেই পাঠাতে হবে। এ রোগের হাসপাতালে খরচা অনেক—তা তাতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু যুদ্ধের বাজার বুঝতেই তো পারছ—অনেক সই-সুপারিশ না ধরলে হাসপাতালে বেড পাওয়া যাবে না। তা আমি বলছিলুম কি ততদিন না হয়—তোমাকে মৌড়ীতে রেখে আসি না—?'

'না।' হরেনের কথা শেষ করতে না দিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল স্বর্ণলতা। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম কথা কইল সে—কিন্তু তার চোখের জলের সঙ্গে কণ্ঠের এই অস্বাভাবিক দৃঢ়তা একেবারেই বেমানান মনে হ'ল হরেনের কাছে। সে বেশ একটু চমকেই উঠল।

BanglaBook.org

'না।' গলায় রীতিমতো জোর দিয়ে বলল স্বর্ণ, 'তোমার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বাড়িতে নেই?...তোমার ছেলেমেয়ের কথা, ভাই-ভাইপোদের কথা—নিজের কথাই ভাবছ শুধু। তোমাদের প্রাণের দাম আছে, আর তারাই একেবারে এত ফেলনা—না? কেনই বা তারা বইবে এ দায়? তোমার লজ্জা করে না একথা তুলতে? তারা একগাদা টাকা খরচ করে বে দিয়েছে তত্ত্বতাবাস লোক-লৌকিকতার কোন ত্রুটি রাখে নি কখনও—তার পরিবর্তে এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত ভূতের মতো খেটে গেছি—একাধারে ঝি আর রাঁধুনীর কাজ করেছি এতবড় সংসারে। উদয়-অস্ত হলেও বাঁচতুম—ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বারোমাস তিনশ পঁয়ষট্টি দিন একভাবে খেটে শরীর পাত করেছি তোমার এখানে—এখন এই রোগ ধরেছে বলে আর একদণ্ডও সহ্য হচ্ছে না?...বাড়ির পুরনো ঝিকেও এত সহজে লোকে ঘাড় থেকে নামাতে পারে না। এত কাল তো একবেলার জন্যেও তাদের বাড়ি যেতে দিতে না, আজ আমি কাজের বার হয়ে গেছি বলেই যেখানে হোক ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে নামিয়ে রেখে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!...কেন যাব আমি—কিসের জন্যে? এ বাড়িতে আমার কোন জোর নেই? তোমার এ অসুখ করলে আমি কোথাও দূরে পাঠাবার কথা ভাবতে পারতুম? না কোন ছেলেমেয়ের অসুখ করলে তুমি একথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতে?'

কাশির ধমকেই চুপ করতে হয় একটু। বোধহয় এতখানি উত্তেজনায় অপরিসীম ক্লান্তও হয়ে পড়ে। খানিকটা চুপ করে থেকে একটু সামলে নিয়ে প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলে, 'বেশ তো, বাড়িতে রাখার যদি এতই অসুবিধে হয় তো—দূর করার অন্য উপায়ও তো আছে। কড়িকাঠও আছে, পরনের ছেঁড়া শাড়িও জুটবে একখানা।...তাতেও যদি মনে করো—পুলিশ-ফুলিশ নানান হ্যাঙ্গামে পড়তে হবে—কোনমতে একখানা রিক্‌শা ডেকে গঙ্গার ধারে পাঠিয়ে দাও, আর কোন দায় বইতে হবে না তোমাদের, কোন ভাবনাও ভাবতে হবে না।...এত পয়সার জোর দেখাও যখন তখন—পয়সা ফেললেও হাসপাতালে জায়গা হয় না? না অনর্থক জেনেই সে বাজে পয়সাটা খরচা করতে চাইচ না? না কি—ভয় পাচ্ছ যদি হাসপাতালে গিয়ে ভাল হয়ে আসি? ঠিক ঘর করতেও সাহস হবে না—অথচ সে ক্ষেত্তেরে আর একটা বৌ আনতে চক্ষুলজ্জায় বাধবে! তাই যদি হয় তো—দুটো দিন সবুর করো—খোরাকী বন্ধ করলে আপনিই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে!'

হরেন অপ্রতিভের মতো চুপ করে বসে থাকে। তখনই যেন কোন কথা যোগায় না তার মুখে। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'ঐ নাও! দ্যাখো এক-বার কাণ্ডখানা। বলে যার জন্যে চুরি করি—সেই বলে চোর। তোমার ভালর জন্যে বলতে গেলুম—'

ততক্ষণে আবারও অশ্রুর বন্যা নেমেছে স্বর্ণর চোখে। সে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'থাক—আমার ভাল আর ভাবতে হবে না তোমাকে। জীবনভোরই তো ভেবে এলে—আর কেন!'

॥ ৩ ॥

বাপের বাড়িতে যেমন সরানো গেল না স্বর্ণকে—তেমনি হাসপাতালেও না। কোন হাসপাতালেই নাকি 'বেড' নেই। অর্থাৎ যতটা উদ্যম থাকলে এই যুদ্ধের বাজারে ভর্তি করানো সম্ভব হ'ত—ততটা উদ্যম হরেনের ছিল না। তার নিজের অবসর কম—এ সব ব্যাপারে তাকে বন্ধু-বান্ধবদের ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশি। তাদেরই বা কী এত গরজ যে, দিন-রাত ঘুরে তদ্বির তদারক করে বেড্-এর ব্যবস্থা করবে অপরের স্ত্রীর জন্য?

সুতরাং কিছুই করা গেল না—পাড়ার এক সাধারণ ডাক্তারকে দিয়ে মামুলী চিকিৎসা ছাড়া। জীবেন বলেছিল নার্স রাখতে কিন্তু তাও হয়ে ওঠে নি। দিনরাত নার্স রাখতে গেলে

অনেক খরচা—খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, দুটি নার্স দিনে চার টাকা ও রাত্রে আট টাকার কমে হবে না। প্রত্যহ এই বারো টাকা খরচা ছাড়াও তাদের খাওয়ার খরচ এবং ঝঞ্ঝাট আছে। মনে মনে একটা আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব ধরেই 'হ্যাঁ'—এই চেষ্টা করছি' 'অমুককে বলে রেখেছি' 'সুবিধে মতো লোক দেখতে হবে তো—বাড়ির মধ্যে ঢোকানো', বলে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। কারণ তারপর আর কথাটা কেউ তুলল না, ভুলেই গেল সকলে।

এধারে স্বভাবতই বাড়ির লোক সন্ত্রস্ত ও সতর্ক হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে নিজেদের ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে সকলে। ছোট ভাই শাশুড়ীর অসুখের অজুহাতে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠল। তার শ্বশুরদের অবস্থা ভাল কিন্তু বাকি দুজনের সে সুবিধা নেই। তারা যতটা সম্ভব এই ঘরখানা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই জায়েরা একবার করে বাইরে থেকে 'আজ কেমন আছ দিদি' জিজ্ঞাসা করে যেত। সেইটুকুর জন্যও সতর্কতার অন্ত ছিল না অবশ্য। মেজবৌ দুই নাকে ইউক্যালিপ্‌টাস তেল দিয়ে তবে ওদিকে যেত। সেই রকমই জীবেনের নির্দেশ। ও রোগের বিজাণু নাকি নিঃশ্বাসেই বেশি আসে।

ওঘর—স্বর্ণদের ঘর সকলেই পরিহার করেছে। স্থানাভাবে হরেনের ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমার ঘরে শোয় এখন। তাঁর অবশ্য প্রবল আপত্তি ছিল কিন্তু হরেন এ ব্যাপারে মায়ের কোন কথাই শোনে নি। পরোক্ষে আভাস দিয়েছে যে তেমন কোন অসুবিধা বোধ করলে তিনি অনায়াসে তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর ঘরে গিয়ে শুতে পারেন। প্রায় সত্তর বছর বয়স হ'তে চলল তাঁর—এত আর এখন জীবনের মায়া কিসের?

ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের কাছেও যেতে পায় না। হরেনের কড়া নিষেধ। শুধু বড় মেয়ে রেবা মধ্যে মধ্যে দুপুরে বা বিকেলে এক-আধবার লুকিয়ে মার ঘরে যায়, এটা ওটা হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়ে আসে।

আগে স্বর্ণ নিজেও বারণ করত ওদের আসতে। ইদানীং আর করে না। এর মধ্যে একদিন ওর খাবার ঘটির জল ফুরিয়ে গিয়েছিল—বার বার ক্ষীণকণ্ঠে 'একটু জল' 'ওগো তোমরা কেউ আমাকে একটু খাবার জল দিয়ে যাও না গো' বলে হেঁকেছে—কিন্তু কেউই আসে নি বা জল দিয়ে যায় নি। জায়েরা সামনেই উঠোন পেরিয়ে কলঘরে গেছে—তারা শুনতে পায় নি, অথবা শোনে নি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে শুকনো কাশিতে বেচারার দম বন্ধ হবার মতো হয়েছিল। মরেই যেত হয়ত—রেবার জন্যেই বেঁচে গিয়েছে সেদিন। কি একটা উপলক্ষে রেবার সকাল করে ছুটি হয়েছিল, বাড়ি ফিরে মার ঐ অবিরাম খুকখুকে কাশি শুনে সে নিজে থেকেই আগে ছুটে এ ঘরে এল। তখন আর জল চাইবার মতো শক্তি ছিল না স্বর্ণর—সে শুধু ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিল জলের গেলাসটা। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার পরে আর স্বর্ণ কাউকে নিষেধ করে নি ওর ঘরে ঢুকতে।

নার্স রাখা তো হয়ই নি—এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল কোন হাসপাতালের আয়া বা দাইকে বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে এনে রাখতে তাও হয়ে ওঠে নি। নিহাৎ স্বর্ণর অদৃষ্টে বেঘোরে মৃত্যু নেই বলেই বোধহয়—ওদের বুড়ি ঝি আয়না দিনকতক পরে এ ঘরের কাজ নিজের হাতে তুলে নিলে। রাত্রেও ওর ঘরে শুতে শুরু করল। তার একটি মেয়ে আছে গিরিবালা বলে,—দেশে থাকে সে—কদাচিৎ কখনও দেখা হয়—তার জন্যেই বুড়ির আরও চাকরি করা,—সে নাকি কতকটা স্বর্ণর মতোই দেখতে। তার মায়াতেই আয়নার এতটা টান স্বর্ণর ওপর। হয়ত এতাবৎকাল স্বর্ণর সস্নেহ ভদ্র ব্যবহারও একটা বড় কারণ।

আয়না স্বর্ণর ভার নিতে হরেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। নিশ্চিন্তও হ'ল অনেকটা। যতই

যা হোক—এই দেড় মাস দু মাস ধরে বিবেকের একটা খোঁচা ভেতরে ভেতরে কোথায় ছিলই তার। স্বর্ণর অস্তিত্বটা একেবারে ভুলে থাকা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এবার সে খোঁচাটুকু আর রইল না, নিশ্চিন্ত হয়েই পিছন ফিরল স্ত্রীর দিকে। ডাক্তার দেখাচ্ছে, সেবা করার জন্য ঝি রেখেছে—তার কর্তব্যের কোন ত্রুটি আছে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না আর। সে সংসারের জন্যে আর একটা ঝি বহাল করল, যাতে আয়নার আর এদিকে কোন দায়-দায়িত্ব না থাকে। বাকি লোকের নিরাপত্তার জন্যেও সেটা আরও দরকার অবশ্য, কিন্তু হরেন তা স্বীকার করল না। আয়নার মাইনে দু টাকা বাড়িয়ে দিল সে নিজে থেকেই। অর্থাৎ খরচের জন্য সে ভাবছে না একবারও, কার্পণ্য করছে না কোন দিকেই। শুধু একদম সময় নেই বলেই—এইসব কারণে আয় বৃদ্ধির দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে বলেই—স্ত্রীর দিকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার।

এই অসুখে পড়ার পর, বা অসুখটা কী ধরা পড়ার পর স্বর্ণরও অন্তরের দিকটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। এসব কোন কিছুই আর তাকে স্পর্শ করতে পারত না—আঘাত দিতে পারত না। এক কলকল্লোলা স্রোতস্বিনী হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে কোন অনুযোগ কোন নালিশ করত না কারও কাছে। এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত স্বার্থের চেহারা সে অনেক রকম দেখেছে—স্বামীর সম্বন্ধেও বিশেষ মোহ তার ছিল না—তবু ঠিক এরকমটা, এতটা জানত না। এমন যে হ'তে পারে তা কখনও ভাবে নি। সারা জীবনটা পাত করেছে সে—সমস্ত শক্তি সমস্ত স্বাস্থ্য—শেষবিন্দু রক্ত ঢেলে দিয়েছে সে এই সংসারে, তার বিনিময়ে এতটা ঔদাসীন্য সে আশা বা আশঙ্কা করে নি। মানুষের এ চেহারাটা তার কল্পনার বাইরে। এই আঘাতেই সে এমন স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে কিছু চাইবার প্রবৃত্তি আর তার নেই।

শুধু একটা বিষয়ে সে এখনও অনমনীয়।

হরেন তার বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল ওকে না জানিয়েই। অর্থাৎ তারা যদি এসে নিয়ে যায় তো যাক। এসেছিলও তারা। বাবা মেজকাকা মা সবাই এসেছিল। এমন কি ওর ভায়েরাও এসেছিল সকলে। নিয়ে যাবার প্রস্তাব অবশ্য তারা করে নি। করে নি ছোঁয়াচে অসুখের ভয়ে নয়—ওখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসা হবে না সেই ভয়ে। মেজকাকা সে কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে জামাইকে। তবে মা থাকতে চেয়েছিল মেয়ের কাছে। এভাবে পড়ে থাকলে হয়ত একটু তেষ্টার জলও পাবে না সময়মতো—এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিল মহাশ্বেতা। কিন্তু স্বর্ণ কিছুতেই রাজি হয় নি সে প্রস্তাবে। বলেছিল, 'তাহ'লে আমি মুখে জল দেবো না, দাঁতে দাঁতে চেপে পড়ে থাকব।...ওপোস ক'রে শুকিয়ে মরব। কেন, কিসের জন্যে তুমি এসে আমার কন্না করতে যাবে তাই শুনি! দেহটা পাত করেছি যাদের জন্যে তাদের শত্তে পোরে তারা দেখবে; না হয় তো মরে পড়ে থাকব—ঠ্যাং ধরে টেনে ফেলে দেবে এরা—ব্যাস্ চুকে যাবে ন্যাটা!..যদ্দিন পেরেছে আমাকে ঘানিগাছে ফেলে সব রক্ত নিংড়ে বার ক'রে নিয়েছে, এখন এই ছিব্ড়েটাতে কোন কাজ নেই, ঘর-জোড়া ক'রে পড়ে আছি বলে বুঝি বাপেদের কথা মনে পড়েছে?...বাবার এমন সব্বনাশের দিনেও একবেলা যেতে দেয় নি এরা—নিদিনিদিখ্যেতে পঞ্চাশ ব্যান্নন রান্নার অসুবিধে হবে বলে—এদের ঝিগিরি বামনীগিরির কাজ আটকে যাচ্ছিল বলে—সে কথা আমি ভুলি নি, কাঁটার মতো বিঁধে আছে বুকে। এখন কেন যাব? আমিও যাব না, তোমরাও এসো না কেউ। জেনে রাখো তোমাদের মেয়ে মরে গেছে।'...

ওরা অবশ্য এসেছে তার পরেও। মহাশ্বেতা এসেছে, তরলা এসেছে। মেজকাকীও এসেছে দু একবার। কিন্তু থাকতে দেয় নি স্বর্ণ কাউকেই। বাপের বাড়ি যেতেও রাজি হয়

BanglaBook.org

নি। বলেছে, 'এদের বাড়ির রোগ তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঢোকাব কিসের জন্যে গা— সুখ-সোমন্দা! এদের বাড়ির রোজগার তো এটা, এখানেই খরচ ক'রে যাই!

তবু, স্বামী যে ঠিক তাকে এইভাবে একেবারে পরিহার করে চলবে অতটা বোধহয় মনে করে নি স্বর্ণ। মনের মধ্যে কোথায় একটা ক্ষীণ আশা ও আশ্বাস ছিল যে এতদিনে একটুখানি মায়াও অন্তত পড়েছে তার ওপর। সামান্য একটা বনের পাখি পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে তার ওপর—গোরু-কুকুর পুষলে তো কথাই নেই। কিন্তু সে আশ্বাস আর রাখা যায় না। দিনের পর দিন যায়,—একটা সপ্তাহের সঙ্গে আর একটা সপ্তাহ যুক্ত হয়, হরেন এসে ওর ঘরের সামনেও দাঁড়ায় না একবার। জায়েরা পরের মেয়ে—কথায় বলে দেইজী শত্রু, তবু তারাও তো একবার করে, বাইরে থেকে হ'লেও, দিনান্তে যখন হোক খবরটা নিয়ে যায়—'কেমন আছ দিদি?...দেওররা চৌকাঠের মধ্যেও ঢোকে এক-আধবার! জীবেন বেশ খানিকটা ভেতরে এসেই দাঁড়ায়। হরেন কি একবারও খোঁজ করতে পারে না? তার কি এতই প্রাণের মায়া? না কি সত্যিই তার এত কাজ?

শেষেরটা বিশ্বাস করতে পারলে হয়ত বেঁচে যেত স্বর্ণ। মানুষের ওপর এমনভাবে আস্থা হারাত না। মনের মধ্যে একটা শেষ অবলম্বন থাকত অন্তত। কিন্তু তাই বা পারে কৈ? সে ভেতরে আসছে, মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কইছে—এইখান দিয়েই কলঘরে ঢুকছে, বামুন ঠাকরুনকে বিবিধ রান্নার ফরমাশ করছে—এসব তো ঘরে শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছে স্বর্ণ, দেখছেও কতক কতক। এর মধ্যে এইখান দিয়ে চোদ্দবার যাতায়াতের সময় কি একবারও একটু থমকে দাঁড়িয়ে তার খোঁজ নিতে পারে না সে?...আয়নাকে ডেকে নাকি তত্ত্ব নেয় মাঝে মাঝে, ডাক্তারের কাছেও নাকি খোঁজ নেয় অসুখের ও চিকিৎসার। কিন্তু আসল মানুষটার খবর নিতে কি হয়? ও যে এইখানেই কাঙ্গালের মতো তার মুখ চেয়ে পড়ে থাকে তা কি একবারও ভেবে দেখে না সে?...বিশ্বাস হয় না ওর, কিচ্ছু বিশ্বাস হয় না। আয়না মিছে ক'রে বানিয়ে বলে, তাকে মিথ্যে স্তোক দেয়। পুরনো চেনা ডাক্তার—সেও ভদ্রতার খাতিরেই মিথ্যে কথা বলে নিশ্চয়।

দিন গোনে একটা একটা ক'রে স্বর্ণ। হরেন শেষ কবে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে তার খবর জিজ্ঞাসা করেছে—সে তারিখটা মনে ক'রে রেখেছে সে স্থান-কাল-পাত্র-একাকার-করা ব্যাধির এই প্রবল বিভ্রান্তির মধ্যেও। পনেরো, ষোল, সতেরো—কুড়িও হয়ে যায় একসময়ে।...আগে একটা তীব্র অভিমান, একটা দিক্‌দিশাহীন উষ্মা, প্রচণ্ড চিত্তক্ষোভ ঠেলে ঠেলে উঠত তার মনের মধ্যে, মনে মনেই সহস্র অনুযোগ তুলত, উত্তর-প্রত্যুত্তরের মহড়া দিত। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইত। কিন্তু ক্রমশঃ অভিমানটুকু রাখার মতোও মূলধন যেন খুঁজে পায় না এখন। একেবারেই দেউলে হয়ে গেছে সে, নিঃস্ব হয়ে গেছে। এখন শুধু তাই একটা অসহায় কান্নাই বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে ওঠে। তার দাম কারুর কাছে ছিল না কখনও—আজও নেই। হয়ত একদিন ছিল তার শৈশবে কৈশোরে—তার মা কাকা কাকীদের কাছে, হয়ত বাবার কাছেও আর সেই দীন অনাথ ছেলেটা,—সেই অরুণের কাছেও—কিন্তু এখানে যেটুকু তার দাম তা শুধু তার কাজের। যতদিন কাজে লেগেছিল ততদিনই তার কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল এ বাড়িতে। আজ তার সে শক্তি গেছে ফুরিয়ে—আজ আর তাই মূল্যও কিছু নেই।

যত কাঁদে, যত মনের মধ্যে মাথা কোটে—ততই অসুখও বাঁকা পথ ধরে। প্রথম প্রথম চিকিৎসাতে মন্দ ফল হয় নি। বিবর্ণ মুখে একটু রক্তাভা দেখা দিয়েছিল, অবশ হাত-পায়েও একটু বল ফিরে এসেছিল কিন্তু তারপরই আবার যেন কোথায় কী একটা গণ্ডগোল বাধে, ওর প্রাণশক্তি সাড়া দেয় না আর কোন ওষুধেই। বরং অবস্থার যেন দিন দিন অবনতিই ঘটতে শুরু করে।

BanglaBook.org

ডাক্তার সে কথা হরেনকে জানান। প্রাণপণে হাসপাতাল ঠিক করতে বলেন। হরেন চিন্তিত হয়, বিরক্ত হয়—কিন্তু তবু তোড়জোড় ক'রে হাসপাতালে বেড্ ব্যবস্থা করতে পারে না।

ডাক্তার অবশ্য আশ্বাস দেন স্বর্ণকে, 'ওঁকে বলেছি—দরকার হ'লে ঘুষ দিয়েও ব্যবস্থা করতে—এবার মনে হচ্ছে একটা সিট পাওয়া যাবে। হাসপাতালে না গেলে সারতে অনেক দেরি হবে কিন্তু। আপনি যেন আবার হাসপাতাল শুনে কাঁদতে শুরু ক'রে দেবেন না।'

স্বর্ণ ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমি কাঁদব না। আমি এখান থেকে বিদেয় হ'তে পারলেই বেঁচে যাই—কিন্তু হাসপাতালে যাওয়াও আমার হবে না ডাক্তারবাবু, আমি এই আপনাকে বলে রাখলুম!'

'কেন—উনি তো চেষ্টা করছেন খুব!'

'মিছে কথা। হাসপাতালে গিয়ে যদি আমি বেঁচে ফিরে আসি আমাকে নিয়ে ও কি করবে বলতে পারেন? ভরসা ক'রে ঘরে নিতে পারবে না—অথচ আর একটা বিয়ের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এ এমনি ক'রে পড়ে থাকলে শিগ্‌গিরই সব পথ খুলে যাবে—বুঝছেন না!...ওর এখনও ঢের বিয়ের বয়স আছে, আমার চেয়ে অনেক ভাল বৌ জুটে যাবে!'

হা হা ক'রে হেসে ওঠেন ডাক্তার।

'এ তো আপনাদের মান অভিমানের কথা হ'ল। ও কোন কাজের কথা নয়। হচ্ছে, হচ্ছে—ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই এর মধ্যে।'

এ-কথার কোন উত্তর দেয় না আর স্বর্ণ। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে। হায়রে! মান অভিমানের কথা বলে যদি এই মর্মান্তিক সত্যটাকে সেও উড়িয়ে দিতে পারত!...কিন্তু সে সব আর এই নিরীহ লোকটাকে বলে লাভ কি? সে প্রাণপণে শুধু ওঁর সামনে থেকে চোখের জলটাকে গোপন করার চেষ্টা করে।

তা হ'লেও, স্বামী সম্বন্ধে স্বর্ণ যতই মোহমুক্ত হোক, হরেন যে আর দুটো দিনও সবুর করতে পারবে না, এত শিগগির এই কেলেঙ্কারি ক'রে বসবে, তা কল্পনাও করতে পারে নি সে।

সন্দেহ করেছিল অবশ্য প্রথম দিন থেকেই। চোখের আড়ালে গেলেও তার মনের আড়ালে যেতে পারে নি হরেন একবারও। স্বর্ণর একটা চোখ আর একটা কান সর্বদা পাতা থাকত হরেনের দিকে, তার মন যেন ছায়ামূর্তি ধরে অনুগমন করত স্বামীকে, বিশ্রামে-অবসরে সমস্ত সময়—ঘরে বাইরে সর্বত্র। ঘরে শুয়ে শুয়েও ওর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ করত সে।...কাজেই হঠাৎ একদিন হরেনের সকাল ক'রে বাড়ি ফেরাটা অগোচর রইল না তার। কোনদিনই যে রাত দুটো-আড়াইটের আগে আসছিল না, বারোটায় আসা তার পক্ষে অপ্রত্যাশিত সকাল।

বিস্মিত হ'লেও বিচলিত হয় নি। নিয়মের ব্যতিক্রম ভেবেছিল।

কিন্তু তার পরের দিনও যখন ঘড়িতে বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়াবার শব্দ হ'ল এবং কড়াটা নড়ে উঠল খুব মৃদুস্বরে, তখনই সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠল স্বর্ণ। এমন তো হয় না, অন্তত বহুদিন হয় নি। ব্যতিক্রমটা নিত্য ঘটতে থাকলে সেটা আর ব্যতিক্রম থাকে না, এ বুদ্ধিটুকু তার এতদিনে হয়েছে। এর অন্য অর্থ আছে কিছু।

সে সম্বন্ধে সজাগ এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবছা কুটিল সন্দেহটা স্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করল মনের মধ্যে। দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সহজ হয়ে এল অঙ্কটা। নতুন যে অল্পবয়সী ঝিটি এসেছে সে শ্যামাঙ্গী হ'লেও লাবণ্যবতী। তবু তার সম্বন্ধে কোন কথা হয়ত এত চট্ ক'রে ভাবত না, যদি না কদিন আগেই অত্যন্ত বেমানান রকমের ফরসা এবং এই যুদ্ধের বাজার হিসেবেও বেশ মাঝারি দামের কালাপাড় শাড়ি একখানা পরতে

BanglaBook.org

দেখত তাকে। একখানা নয়—এক জোড়াই এসেছে মনে হ'ল—কারণ একখানা কেচে আর একখানা পরা চলছে।...

সবাই ঘুমোচ্ছে, গোটা বাড়িটাতে নেমে এসেছে একটা শান্ত নিস্তব্ধতা। অতি সামান্য সামান্য শব্দ—কিন্তু সেগুলোও প্রগাঢ় সুষুপ্তিই সূচিত করে। জীবেনের নাক ডাকে, সেটা এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে অল্প। পাশের বাড়ি তিনতলায় রমার ছেলেই বোধ হয়—খুঁৎ খুঁৎ ক'রে কাঁদছে সেই থেকে। আয়নার নাক ডাকে না—কিন্তু দাঁতপড়া তোবড়ানো মুখে ঠোঁটের বাধা ঠেলে বেরোতে নিঃশ্বাসেরই একটা অস্ফুট শব্দ হয়। সেটাও নিয়মিত—সুতরাং তা আর কানে বাজে না।

নিয়মিত এসব শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে সামান্য যেটি অস্বাভাবিক, নতুন, সেটি ঠিকই কানে এসে পৌছয়। দরজা খুলে ভেতরে এল হরেন। কলঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এল। ফিসফিস ক'রে কাকে কি বলল। বোধহয় ঝিকেই বলল কিছু—কিম্বা রাঁধুনীকে। বামুন ঠাকরুন যে এতরাত পর্যন্ত জেগে আছেন তা মনে হয় না।...এবার বোধহয় ঘরে ঢুকে ঢাকা খুলে খেতে বসল। আবার এল ভেতরে। সম্ভবত আঁচাতে এল এবার।

এ সবই যথাসম্ভব সন্তর্পণে করে হরেন—চিরকাল খুবই সতর্ক সে, আর কারও ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার। কিন্তু তবু যে জেগে কান পেতে আছে তার কাছে সে শব্দ না পৌছবার কথা নয়।...

কিন্তু কলঘর থেকে ফিরে গেল—সেও তো প্রায় মিনিট-পাঁচেকের কথা। দরজা বন্ধ করার শব্দ হ'ল না কেন?

স্বর্ণ আর থাকতে পারল না। প্রাকৃতিক কাজের সুবিধার জন্য কদিন আগে সে-ই ব্যবস্থা ক'রে নিচে মেঝেয় বিছানা করিয়েছে। সুতরাং উঠে হামা দিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে যাওয়ার খুব অসুবিধা হ'ল না স্বর্ণর। বেশি দূর যেতেও হ'ল না তাকে অবশ্য। চৌকাঠের কাছে যেতেই দৃশ্যটা নজরে পড়ল।

ওর এই সারেরই শেষ ঘরখানা হ'ল বৈঠকখানা ঘর। আজকাল পাকাপাকিভাবেই ঐ ঘরে থাকে হরেন। এই রকের ওপরই সে ঘরের দরজা। একটু উঁকি মারলেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সে ঘরের দরজা ছাড়িয়েও—ওদিকের দেওয়াল পর্যন্ত। আর দেখতেও পেল সে। নিঃশব্দে একটা টানাটানি চলছে ঐ দরজারই সামনে। একজন আর একজনকে হাত ধরে টানছে বোধ হয়।...অন্ধকারে মুখ চোখ ঠাওর হবার কথা নয়। হ'লও না। কিছুই ঠাওর হ'ত না এই কৌটোর মতো বাড়িতে, যদি না রাস্তার আলোর একটা আভাস রমাদের সাদা বড় বাড়িটার দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে একটা ঝাপসা রকমের আব্‌ছায়া সৃষ্টি করত। যুদ্ধের আগে আরও ভাল আলো পাওয়া যেত অবশ্য, গ্যাসের আলোর অনেকটা এসে পড়ত ওদের দেওয়ালে। কিন্তু এখন ঠুলি-পরা আলো অতদূর পৌছয় না। এখন যেটুকু আলোর মতো নামে এ বাড়িতে, তাতে চোখ অভ্যস্ত না হ'লে কিছুই দেখতে পেত না।

কিন্তু মুখ চোখ ঠাওর না হ'লেও চলবে। সাদা ধবধবে শাড়িটাই যথেষ্ট। হরেনের পাটকরা ধুতিটাও।

অল্প কিছুক্ষণের টানাটানি। ধ্বস্তাধ্বস্তি কিছু নয়। যে-পক্ষকে টানা হচ্ছে তার যে খুব একটা অনিচ্ছা তাও নয়। বাধাটা খুবই ক্ষীণ, ক্ষীণতর চক্ষুলজ্জার একটা বহির্প্রকাশ মাত্র। কারণ কয়েক মুহূর্তেই সে প্রতিরোধ শেষ হয়ে গেল। দুজনেই নিঃশব্দে গিয়ে ঘরে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আর কিছু দেখতে পেল না স্বর্ণ। আর কিছু দেখতে পারল না।

Banglabook.org

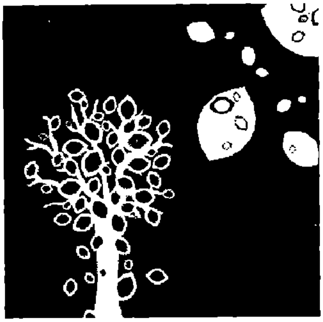

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়নাই ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। তাঁর চেঁচামেচিতে পরে অবশ্য আরও অনেকে ছুটে এল। নতুন ঝি-ই সর্বাগ্রে। গায়ে মাথায় কাপড় জড়াতে জড়াতে এসে দাঁড়াল সে। বাকি যারা এল তারপর, তারা ওর এই আগমনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করল না। কোন্‌খানা থেকে উঠে এল সে তা তো নয়ই। ওরই নিশ্চয় আগে ঘুম ভেঙ্গেছে—এই কথাই বুঝল সকলে।

আয়না ভেবেছিল অন্য ব্যাপার। আরও খারাপ কিছু ভেবেই অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল। শয্যাশায়ী রুগীকে ঐভাবে চৌকাঠের ওপর মুখ থুবড়ে নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে সাধারণত যা মনে হয় আগে—তাই মনে হয়েছিল তার। কিন্তু গায়ে হাত দিয়ে একটুখানি আশ্বস্ত হ'ল সে। গা তখনও গরম। একেবারে প্রাণটা বোধহয় যায় নি এটা ঠিক। তবু, ভয়ানক একটা যে কিছু ঘটেছে তাতেও সন্দেহ নেই। এমনভাবে দাঁতে দাঁত লেগে ভিরমি যেতে স্বর্ণকে কখনও দেখে নি আয়না, এই দুতিন মাসে একদিনও।

আয়নার চেঁচামেচিতে হরেনকেও এসে দাঁড়াতে হ'ল। কিছু দেরি ক'রেই এল সে—এইমাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে সেটা জানাবার জন্য। ব্যাপারটা শুনে বলল, 'তাই তো—বিছানা ছেড়ে এখানেই বা এল কী করে? কলঘরেটরে যাবার চেষ্টা করেছিল নাকি?...তাহ'লে তো বড় অন্যায় কথা। বাড়ির সব জায়গায় রোগ ছড়িয়ে বেড়ানো তো ঠিক নয়?'

জীবেনই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে তাকে, 'আচ্ছা, সেসব নিকেশ পরে নিলেও চলবে। আগে ডাক্তারবাবুকে খবর দেবার ব্যবস্থা করো তো!'

অগত্যা ডাক্তারের কাছেও যেতে হ'ল।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

'কোন শক্-টক্ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। হার্টের যা অবস্থা—এটা খুব খারাপ হ'ল।...কিন্তু কী করে হ'ল কেউ জানেন না আপনারা?'

হরেনের সুগৌর মুখ অকারণেই লাল হয়ে উঠল। বার দুই ঢোক গিলে বলল, 'সেটা আমরা ঠিক—।' মানে আমি তো এ ঘরে থাকি না আজকাল। মাঝরাত্রে উঠে কখন যে—। আয়না মানে আমাদের পুরনো ঝি অবিশ্যি ছিল—তবে জানেন তো—সার্ভেন্টরা য়্যাজ এ ক্লাস ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল্।'

ডাক্তারের চেষ্টায় কিছু পরেই জ্ঞান হ'ল স্বর্ণর, কিন্তু কী ক'রে যে এমন হ'ল তা জানা গেল না। সে কিছুই বলতে চাইল না। তার নাকি কিছুই মনে নেই। কেন উঠে অমনভাবে দোরের দিকে গিয়েছিল তাও বলতে পারল না। কথা কইলও না বিশেষ। দুই একটা কথা বলার পরই সেই যে ক্লান্তভাবে চোখ বুজল আর খুলল না কিছুতেই। এমন কি তার এত

BanglaBook.org

প্রত্যাশিত, এত পথ-চাওয়া স্বামী তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও যেন দেখতে পেল না সে।

বোধ হয় তার উপস্থিতি টের পেয়েই আরও দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল।

ডাক্তারও বেশি কথা বলাতে চাইলেন না। ওদেরও বারণ করলেন বেশি প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করতে। এরকম ফিটের পর অপরিসীম ক্লান্তি আসে, সেইটেই স্বাভাবিক। এখন বরং যেটা সর্বাগ্রে দরকার, সেইটেই করুক তারা—কিছু গরম পানীয় বা পথ্য এনে দিক।

কিন্তু সেইখানেই একটা বড় ররকমের গণ্ডগোল বাধল। কিছুই খেতে চাইল না সে—একবিন্দু কিছু মুখে তুলতে রাজি হ'ল না। তার এক কথা—'আমার কিছু ভাল লাগছে না—আমাকে একটু ঘুমোতে দাও তোমরা, তোমাদের পায়ে পড়ি!'

প্রথমে ঝি পরে জা-দেওররা এল। অনুরোধ অনুযোগ—শেষে কিছু ধমক-ধামকও করল তারা। এমন কি স্বয়ং শাশুড়ীও, প্রাণপণে নিজের শুচিতা ও স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে, বাইরে থেকে নাকি-সুরে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে গেলেন। কিন্তু স্বর্ণ সেই যে দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে ছিল—এদিকে ফিরলও না, কথাও বলল না। খেলও না কিছু।

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার—এই উপলক্ষে বাড়ির প্রায় তাবৎ লোকই এল খাওয়ার জন্য উপরোধ-অনুরোধ, পীড়াপীড়ি করল, কেবল যার সর্বাগ্রে আসবার কথা সেই হরেনই—একবারও এল না বা কেন তার স্ত্রী কিছু খাচ্ছে না—এ প্রশ্ন করল না। বরং সে যেন চেষ্টা করেই একটু আড়ালে আড়ালে রইল। ভাইয়েরা ডাকতে গেলে বলল, 'তোমরা সবাই বলছ তাতে যখন খাচ্ছে না, আমি বললেই কি খাবে? তা নয়, এইসব অসুখে মাঝে মাঝে একটা অকারণ অভিমান হয়। এই ধরনের মনোভাব থেকেই ফিটটাও হয়েছে। এখন আর বেশি বকিয়ে লাভ নেই, বরং খানিকটা ঘুমোতে দাও, ঘুম ভাঙ্গলে মাথা ঠাণ্ডা হ'লে আপনিই খাবে!'

হরেন নিজেও সেদিন বাড়িতে খেল না। দেরি হয়ে গেছে, এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে এক গ্লাস শরবৎ খেয়ে বেরিয়ে গেল। অত্যন্ত নাকি জরুরি কাজ আছে অফিসে, কী সব হিসেবের গোলমাল হয়েছে ক্যাশে—সাহেবরা আসবার আগে সেটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে—অকারণেই সবাইকে শুনিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেল।

কিন্তু খানিকটা ঘুমিয়ে উঠেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হ'ল না। কোন খাদ্যই—জল ছাড়া অন্য কোন পানীয়ও মুখে তুলতে রাজি হ'ল না স্বর্ণ। এমন কি কোন ওষুধও না। যাকে বলে দাঁত দিয়ে থাকা—তাই রইল সে।

জা-দেওরদের মধ্যে জীবেনই চিরদিন বৌদির একটু বেশি অনুগত, আজও সে টানটা তার সম্পূর্ণ যায় নি। অফিসের ফেরৎ বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে ওর এই কঠোর উপবাসের কথা শুনে অফিসের পোশাকসুদ্ধই বৌদির ঘরে এসে ঢুকল। ঝিকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'বলি মতলবটা কি বল তো বৌদি, তুমি কি আত্মহত্যে করতে চাও?'

এবার কথা বলল স্বর্ণ, ওর দিকে মুখও ফেরাল। দেওরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'বাঁচব না বেশিদিন—এটা তো ঠিক? সে তোমরাও বুঝছ, আমিও বুঝছি। মিছিমিছি এই পেরমায়ুটা অনত্থক কটা দিন টেনে বাড়িয়ে লাভ কি? নিজেরও দগ্ধানি—তোমাদেরও জ্বালাতন। আমি বিদেয় হ'লে তোমার দাদা একটা বিয়ে করতে পারবে—সে তবু ভাল। তার দুদ্দশা আমি আর চোখে দেখতে পারছি না ঠাকুরপো। তাই—যেতেই যেকালে হবে—যাওয়াটা একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির করতে চাই।...কটা দিন কোন মতে একটু চোখ-কান বুজে থাকো—তারপর আমারও পোড়ানির শেষ, তোমরাও সব দায়ে নিশ্চিন্তি! আর কারুর জন্যে ভাবতে বসতে হবে না!'

BanglaBook.org

কী বুঝল জীবেন, কে জানে। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল শুধু 'যার দুর্দশা বরাতে আছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না বৌদি। পাঁকের মাছ পাঁকেই ভাল থাকে। কিন্তু তুমি শুধু দাদার কথাই ভাবছ কেন, ছেলেমেয়েগুলোর কথাও ভাবো। একটা সৎমা এসে ঘাড়ে চেপে বসলে কি ওরা মানুষ হবে—না বাঁচবেই কেউ?'

'আমি আর কারুর কথাই ভাবব না ঠাকুরপো', স্বর্ণ দৃঢ়স্বরে বলে, 'সোয়ামী পুত্তুর-সংসার সবেতে আমার ঘেন্না হয়েছে। এবার আমি ছুটি চাই তোমাদের কাছে শুধু। ব্যাগত্তা করি আমাকে ছেড়ে দাও!'

জীবেন এবার চুপ ক'রে গেল। ভাল মানুষ স্বর্ণর এ চেহারা, কণ্ঠের এ দৃঢ়তা তার কাছে একেবারে নতুন। সে হাত-পা নেড়ে চেঁচায়, কথায় কথায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, পীড়াপীড়ি ক'রে বকে-ঝকে লোককে খাওয়ায়; খাওয়া নিয়ে 'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে—সেই স্বর্ণই জীবেনের পরিচিত। সেই সরল, স্নেহ-কোমল মানুষটার এই রূপান্তর কতখানি আঘাতে সম্ভব হয়েছে—তা বুঝেই আর বৃথা কথা বাড়াতে চাইল না সে। এ আঘাত যার কাছ থেকে এসেছে সে নিজে এসে ক্ষমাপ্রার্থনা না করলে, অনুতাপে প্রতিশ্রুতিতে এই নিদারুণ বেদনা মুছে নেবার চেষ্টা না করলে—কোন লাভ হবে না অপর কারুর অনুরোধ-উপরোধ পীড়াপীড়িতে। তার চেয়ে দাদা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। সে এলে তাকে বুঝিয়ে বলে, প্রয়োজন হয় তো জোর করেই তাকে এ ঘরে পাঠাবে। তার জন্যে দরকার হ'লে তাকে ভয় দেখাতেও পশ্চাদ্‌পদ হবে না জীবেন। নতুন ঝি সম্বন্ধে দাদার দুর্বলতাটা বাড়িসুদ্ধ সবাইকার চোখেই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। জীবেনের অনুমান, বৌদির আজকের এই আচরণের সঙ্গে সেই অশোভন পক্ষপাতের কোন নিগূঢ় যোগাযোগ আছে। ঐ দিক দিয়েই হরেনকে জব্দ করতে হবে, লোক-লজ্জা কেলেঙ্কারির ভয় দেখিয়ে!...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত কিছু করতে হ'ল না। তার আগেই সন্ধ্যার সময় একেবারে অপরিচিত একটি আগন্তুক এসে উপস্থিত হ'ল ওদের বাড়িতে, ওদের জীবনে।

কেউই তাকে চিনত না এ বাড়িতে। কেউই দেখে নি। দামি সাহেবী পোশাক-পরা রীতিমতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একটি ভদ্রলোক মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একটা গাড়ি থেকে নেমে হরেনবাবুর বাড়িটা কোন্ দিকে খোঁজ করছেন—এ খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়ি পৌঁচেছিল। স্বর্ণরই বড় ছেলে ভুতু ইস্কুল থেকে ফুটবল খেলে ফিরছিল, সে-ই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে মেজকাকাকে খবরটা দিলে। সে স্পষ্ট শুনেছে হরেনবাবুর নাম—তবে তার সাহস হয় নি এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দেবার বা সঙ্গে ক'রে ডেকে আনবার। অতবড় গাড়ি থেকে অমন ফিটফাট দামি পোশাক পরে যে নেমেছে—সে ভুতুর সঙ্গে কথা কইবে বা ভুতু কথা কইলে জবাব দেবে—এমন ভরসা তার হয় নি। ওদের সঙ্কীর্ণ চার হাত গলি, তার মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না, কিন্তু বাইরের যে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে সেও যথেষ্ট চওড়া নয়। ও গাড়ি সাল্‌কে-শিবপুরের সব রাস্তাতেই বেমানান। তাই শুধু গাড়িখানা দেখতেই বহুলোক জড়ো হয়েছে সেখানে—ভুতু সে খবরটাও দিল কাকাকে।

জীবেন শুনে কৌতূহলী হয়ে বাইরে যাচ্ছে—এমন সময় সদরে কড়া নড়ে উঠল। সে ভদ্রলোক এসেছেন।

জীবেন দেখল ভুতুর বর্ণনা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। সে নিজেও একটু শৌখিন, মোটামুটি ভালো চাকরিই করে—পোশাক-আশাকের দর সম্বন্ধে তার ধারণা অনেকটা নির্ভুল। ভদ্রলোকের গায়ে যে পোশাক—সত্যিই তার দাম অনেক। লোকটি যে অবস্থাপন্ন

BanglaBook.org

তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখতেও বেশ সুপুরুষ, বয়স জীবেনের চেয়ে কমই হবে—যদিচ এই বয়সেই ছোকরা এমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য আয়ত্ত করেছে যে দেখামাত্র সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় মনে—বেশ সমীহ ভাব জাগে।

মিনিটখানেক দুজনেই দুজনকে চেয়ে দেখল নীরবে। তারপর জীবেন যেন একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই আপনার?'

'এটা কি হরেনবাবুর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হরেনবাবু বাড়িতে আছেন?'

'না। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'বলছি। তিনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন?'

'রাত বারোটা-একটার আগে নয়, দুটো-আড়াইটেও হ'তে পারে।'

একটু হাসির ভঙ্গি ক'রে উত্তর দিল জীবেন।

'ও, তাই নাকি?...তা অত রাত্রে তো আর—। তাঁকে অন্য কোন্ সময় বাড়িতে পাওয়া যায়?'

'সকালে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত।'

একটুখানি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, 'আচ্ছা বুঁচি—মানে হরেনবাবুর স্ত্রী কেমন আছে বলতে পারেন?...একটু—একটু ভালর দিকে কি?'

জীবেন ক্রমেই বেশি বিস্মিত হয়ে উঠছে।

'মধ্যে একটু ভালর দিকেই গিয়েছিল কিন্তু আবার এই দিনকয়েক হ'ল—।...আজ তো খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু—আপনি, মানে আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক?'

'আমি ওর সম্পর্কে ভাই হই। ওকে বললেই চিনতে পারবে। আপনার চেনবার কথা নয়, আপনার দাদারও—হরেনবাবু আপনার দাদা তো?—চাক্ষুস চেনেন না আমাকে, পরিচয়ে চেনেন হয়ত, বুঁচি মানে স্বর্ণলতার মুখে শুনে থাকবেন।...আমি একটু ওকে দেখতে চাই, আসলে ওকে দেখতেই আমি এসেছি—ওর এই অসুখের খবর শুনে। আপনি আপনার বৌদিকে গিয়ে বলুন যে, তার অরুণদা এসেছে—তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

আজ কি আর চমকের শেষ হবে না?—জীবেন ভাবে। তার বৌদির ভাই বলতে এতাবৎ কাল যাদের দেখে আসছে—ময়লা খাটো কাপড় আর কোঁচকানো সস্তা দামের ছিটের জামা পরা কতকগুলি নিরক্ষর গ্রাম্য ছোকরা—তাদের সঙ্গে এই সুবেশ সুশ্রী কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকটির কোন সম্পর্ক আছে, তা কেউ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বিশ্বাস করা শক্ত।

'কিন্তু এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, বৌদির শরীর খুব খারাপ,—এখন কথাবার্তা বলা উচিত নয় তার পক্ষে—', এইটেই বলতে যাচ্ছিল জীবেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, যে অসহ্য গুমোট আবহাওয়া চলছে, তাতে বাইরের এই দমকা বাতাস লাগলে কিছু উপকারই হ'তে পারে। বাপের বাড়ির লোককে দেখলে কিছু নরম হয়ে পড়বেই—আর এখন সেইটেই সবচেয়ে দরকার।

সে বাইরের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিয়ে বললে, 'আপনি বসুন একটু—আমি দেখছি তিনি জেগে আছেন কি না!'

স্বর্ণ বহুক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারল না কথাটা, 'কী বলছ তুমি! অরুণদা! কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে—সে যে বহুকাল দেশ-ভুঁই ছাড়া। সেই আমার বের পরদিন উধাও হয়েছে—আজ অব্দি আর কোন খবর নেই। সে কি বেঁচে আছে এখনও? বেঁচে থাকলে এতকালের মধ্যে আমার উদ্দিশ নিত না একবারও?...না, না, নিশ্চয়ই তুমি ভুল শুনেছ

BanglaBook.org

ঠাকুরপো, আর কাউকে খুঁজছে দেখগে যাও, অন্য কোন অমুক বাবুর বৌকে খুঁজতে এসেছে, লোকে এই বাড়ি দেখ্যে দিয়েছে!'

'কিন্তু তোমার নাম বলছে যে মায় তোমার ডাক-নাম সুদ্ধ!'

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণর স্তিমিত নিঃশেষিতপ্রায় সত্তায় যেন একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়েছিল। এখন তার প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল। দুর্বল দেহে সামান্য উত্তেজনাই যথেষ্ট—এ তো একটা ঢেউয়ের মতো এসে পড়েছে সংবাদটা! অরুণদা মানেই তার বাল্যের কৈশোরের সহস্র স্মৃতি। বাপের বাড়িতে সকলের আদরে প্রশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়া, সর্বত্র সমস্ত ব্যাপারে অখণ্ড প্রতাপ, তার বিয়ে, উৎসব সমারোহ—কত কী আশার স্বপ্ন দেখা সেই প্রাণোচ্ছল দিনগুলি—একসঙ্গে যেন ভীড় ক'রে ঢুকতে চাইছে তার মাথায়। ঐ ছেলেটিও—মুখচোরা লাজুক ভীরু ছেলেটি—স্বর্ণর স্নেহচ্ছায়াপ্রত্যাশী, একান্তভাবে নির্ভরশীল অসহায় অনাথ ছেলেটি। যাকে খুঁজে আনতে হ'ত বাঁশবন ডোবার ধার থেকে, জোর ক'রে ধরে না খাওয়ালে যে খেত না।...সে সব স্মৃতি—বিশেষ ক'রে আজকের এই মোহভঙ্গের ও সর্বপ্রকার আশাভঙ্গের দিনে রক্তে যেন কী এক অদ্ভুত বেদনাভরা, চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, সে চাঞ্চল্য তার দুর্বল বুকে গিয়ে সজোরে আঘাত করছে। বুকের মধ্যে কী একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে।...

সে প্রাণপণে বুকটা চেপে ধরে চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ, আগের মতোই স্থির নিশ্চল হয়ে।...

তার সেই যন্ত্রণাবিকৃত বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে জীবেন ভয় পেয়ে যায়, বলে, 'তবে থাকগে। আমি বলে আসি বরং অন্য একদিন আসতে, আজ তোমার শরীর ভাল নেই—'

'উঁহু, উঁহু, চোখ বুজে বুজেই ইঙ্গিতে নিরস্ত করে স্বর্ণ—কিন্তু তখনও কোন কথা বলতে পারে না।

ফলে জীবেনও বিপন্নমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে, কী করা উচিত ভেবে পায় না। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয়; একটু আগেই এ ঘরে এত ঘন ঘন আসার জন্য স্ত্রীর কাছে বকুনি খেয়েছে। 'ছেলেমেয়েগুলোকে সুদ্দু না মজালে তোমার চলছে না বুঝি? চোদ্দবার ঘরে ঢুকে ঐ রুগীর গায়ের ওপর ঢলাঢলি না করলে বুঝি আর বৌদির ওপর সোহাগ জানানো হয় না? যার পরিবার সে কত ঢুকছে ঘরে?' ইত্যাদি। তখন কাপড়-জামা বাইরে ছেড়ে রেখে ভাল ক'রে গা-হাত-পা ধুয়ে তবে ঘরে ঢুকতে পেয়েছিল। এখন আবার এ ঘরে এতক্ষণ থাকতে দেখলে হয়ত বাড়ি মাথায় করবে। আর কিছু নয়—কথাগুলো স্বর্ণর কানে না ওঠে, এই ভয় জীবেনের। মেয়েদের এ সব বিবেচনা নেই, কিন্তু পুরুষদের কাছে এগুলো লজ্জা ও পরিতাপের কারণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে দাঁড়াতে হ'ল না আর, স্বর্ণ একটু সামলে নিয়েই চোখ খুলে বলল, 'আচ্ছা, যে লোকটা এসেছে—কেমন দেখতে বল দিকি? পোশাক-আশাক কেমন দেখলে?'

সুন্দর চেহারা। আর পোশাকও খুব দামি, ভাল সাহেববাড়ির স্যুট মনে হ'ল। বিরাট গাড়ি করে এসেছে—'

—'ধ্যুস!' হতাশভাবে মুখে একটা শব্দ করে স্বর্ণ, 'ও তবে অন্য কেউ। এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছল সে, তিন কুলে কেউ নেই,—কোথায় দাঁড়াবে, কী খাবে তারই ঠিক ছিল না সে অত পয়সা কোথায় পাবে?'

'তা কি বলা যায়! যুদ্ধের বাজারে পয়সা উড়ছে। কে কম্‌নে দিয়ে কী ধরে নিচ্ছে তা কেউ জানে না। তবে অত কথায় দরকারই বা কি, ডেকেই আনি না, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাক।'

BanglaBook.org

'আনবে? কিন্তু আমার এই ব্যায়রামের মধ্যে আনা ঠিক হবে?...তাকে বলেছ আমায় এই রোগ ধরেছে?'

'সে সব জানে। জেনেই দেখতে এসেছে। অন্তত তাই তো বললে।'

'জানে? জেনে দেখতে এসেছে?...কিন্তু তা কী করে হবে? সে কি এ রাজ্যিতে ছিল? কে জানে বাপু আমার মাথার মধ্যে যেন সব গুল্যে যাচ্ছে!...তা আনো না হয় তাকে ডেকে। ভুল হয় তো চলেই যাবে। বুঝব আমার নামে পাড়া-ঘরে আরও লোক আছে।...কিন্তু তিন-তিনটে নাম কি মিলে যেতে পারে এমন করে?'

॥ ২ ॥

অরুণ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতে জীবেনের ইঙ্গিতে আয়না একটা টুল এগিয়ে দিল বিছানার কাছাকাছি। অরুণ কাছে এসেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু টুলটা দেখতে পেল না। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বিছানার দিকে—অথবা বিছানার ওপর শাড়িতে-জড়ানো যে কঙ্কালটা পড়ে আছে, তার দিকে।

ঘরে ষাট বাতির আলো, ভেতরের ঘর বলে ঠুসি পরাবার দরকার হয় নি—বেশ জোরালোভাবেই এসে পড়েছে ওদের ওপর, দুজনেই দুজনকে কাছ থেকে দেখছে—তবু কেউ-ই যেন চিনতে পারছে না কাউকে। চিনতে পারার হয়ত কথাও নয়, কারণ দুজনেরই সেই শেষ দেখার পর অবিশ্বাস্য রকমের পরিবর্তন ঘটেছে।

অরুণদা বলতে সেই ওর বিয়ের দিনের চেহারাটাই মনে আছে স্বর্ণর। ফরসা সে বরাবরই, কিন্তু সে যে এত ভাল দেখতে তা একবারও মনে হয় নি তখন। হয়ত অত রোগা ছিল বলেই বোঝা যেত না। আসলে অরুণের চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য অত লক্ষও করে নি স্বর্ণ কখনও। যে মানুষটা শুধু আত্মীয়, তেমন নিকট-সম্পর্কের কেউ নয়, যে আরও অনেকের মধ্যে একজন হয়ে মিশে থাকে, কখনও সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে না, তার চেহারা ঠিক কেমন তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না বোধহয়। অত কাছাকাছি ছিল বলে ভাল করে তার মুখচোখের দিকে তাকিয়ে দেখার কথা মনেও হয় নি কোনদিন।

কিন্তু তবু, আদল একটা মনে আছে বৈকি! স্বর্ণ এখন এই গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ মানুষটার মধ্যে সেই ভীরু লাজুক ছেলেটির আদলই খুঁজতে লাগল প্রাণপণে। মানুষে মানুষকে চেনে বেশির ভাগই চোখ দেখে, কিন্তু তাও যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে সদা-সঙ্কোচ-বিনম্র চাহনির চিহ্নমাত্রও নেই এই স্থির আত্মপ্রত্যয়ী দৃষ্টিতে।...

পরিবর্তন হয়েছে স্বর্ণরও।

আজকের এই রুগ্ন কঙ্কালসার প্রায়-মধ্যবয়সী স্ত্রী লোকটির মধ্যে সেদিনের সেই প্রাণচঞ্চলা বালিকাটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে অরুণের একেবারে চিনতে না পারার কথা নয়। কারণ সে তার আপাত-নত চোখে সেদিন স্বর্ণকে খুঁটিয়েই দেখেছিল। শুধু স্বর্ণকেই দেখেছে বোধ করি জীবনে, অপর কোন মেয়ের দিকে কোনদিন তাকাবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন বোধ করে নি। তাই স্বর্ণের দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য অতি পরিচিত। বিশেষত ওর ঐ কটা চোখ—সে চোখ আজ কোটরগত হ'তে পারে কিন্তু তার বর্ণান্তর ঘটা সম্ভব নয়।

অবশেষে চিনতে পারল দুজনেই।

দুজনেরই দুজনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এল। দুজনের অবশ্য দুই ভিন্ন কারণে। স্বর্ণর বহু স্মৃতি বহু বেদনা নিঙড়ানো জল এ। তার অশ্রুর উৎস অতীতে। অরুণের অশ্রুর উৎস বর্তমানে। স্বর্ণর এই পরিণাম দেখেই তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ওর চোখেও ছিল সেই বিয়ের আগের দিনগুলোর স্মৃতি। সর্বশেষ স্মৃতি,

BanglaBook.org

বিয়ের সময়কারই। গোলগাল গড়নের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির ছবিই এতকাল মনে ছিল তার। সেই চেহারাটাই মনে করে রাখার চেষ্টা করেছে সে, সেই চেহারারই স্বপ্ন দেখেছে অবসর সময়ে। সে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যর এমন পরিবর্তন হ'তে পারে তা কখনও ভাবে নি।...

বহু কষ্টে গলার কাছের ঠেলে-ওঠা ডেলাটাকে দমন করে স্বর্ণ প্রায় চুপিচুপি বলে, 'এতদিন পরে মনে পড়ল তাহলে বুঁচিকে অরুণদা! ও, কী কষ্টটাই দিয়েছিলে আমাদের তুমি। বাব্বাঃ। তোমার মনে এত ছিল তা কে জানত, তাহলে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে জোর করে সঙ্গে নিয়ে আসতুম শ্বশুরবাড়ি!...কতদিন ভেবেছি তোমার কথা, দুপুর-বেলা একা কাজকর্ম করে বেড়াতে বেড়াতে, কিম্বা রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলেই তোমার কথা মনে পড়ত। কেবলই মনে হ'ত যে কোথায় আছ, কী করছ—মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন জুটছে কিনা, দুবেলা খেতে পাচ্ছ কিনা—এই সব কথা।...মনে হ'ত তুমি বুঝি এখনও তেমনি মুখ-চোরাই আছ। কেউ খেতে না দিলে তো খেতে না কোনদিন, তাই, মনে হ'ত হয়ত কোনদিনই পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না।...সত্যি, বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এই কদিন বিছানায় পড়ে পড়ে বহুবার তোমার কথা ভেবেছি। ভেবেছি যাবার দিন তো ঘনিয়ে আসছে—মরবার আগে যদি জানতে পারতুম যে, তুমি বেঁচে আছ, তা'হলে নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারতুম!'

কথাগুলো বলতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। থেমে থেমে আস্তে বলতে হ'ল স্বর্ণকে। একে দুর্বল শরীর তায় সারাদিন অনাহার—কথা কইতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে ওর তখন।

অরুণেরও উত্তর দিতে সময় লাগল। এ-কথা শোনবার কখনও আশা করে নি সে। এ তার সুদূর কল্পনারও অতীত। দুরাশা—একান্তই দুরাশা। তাই তার পক্ষে উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। সে স্বর্ণর দিকেও চাইতে পারল না আর, জলটা বাইরে যদি উপ্‌চে পড়ে তো সে বড় লজ্জার কথা হবে। ওপাশের পিকদানিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্বর্ণই কথা বলল আবার, 'হ্যাঁ অরুণদা, তুমি নাকি আমার এই ব্যায়রামের খবর পেয়ে দেখতে এসেছ?—ঠাকুরপো বলছিল? তুমি আমার অসুখের খবর পেলে কি করে?...এ টহরনে ছিলে নাকি তুমি?'

এবার অরুণ উত্তর দিল, 'আমি যেখানেই থাকি, তোমার খবর ঠিক পৌঁছয় আমার কাছে। তোমার কোন খবর আমার অজানা নেই।'

আরও অনেক কিছু বলতে পারত সে। বলতে পারত যে, 'আমার একটা চোখ ও একটা কান, মন আর মাথার আধখানাও আমি সর্বদা তোমার কাছেই রেখে দিই। আমার গোচরসীমার বাইরে তুমি একটুখানির জন্যেও যেতে পারো নি কোনদিন। আমি দূরে থাকলেও আমার একটি অতন্দ্র সত্তা দিনরাত তোমার কাছে প্রহরায় থাকে।' কিন্তু নাটক করা তার কোনকালেই অভ্যাস নেই, আজও পারল না। হৃদয়াবেগ সে দমনই করল বহু চেষ্টায়।

'ওমা, তাই নাকি!...কী হবে মা। অথচ তোমার একটা খবরও দাও নি কখনও! কী ছেলে বাবা তুমি। ধন্যি, পাষাণ প্রাণ তোমার!'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'যাক, তবু যে এখনও এলে দয়া করে সে-ও ভাল। নইলে মরবার আগে শেষ-দেখাটাও হত না। এ তবু নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারব।'

অরুণ কেন গলাটাকে কিছুতে আয়ত্তে আনতে পারে না? নিজের ওপরই রাগ হয়ে যায় তার। এত চেষ্টা করেও গলার মধ্যেকার কাঁপনটাকে সংযত করতে পারে না কেন?...

BanglaBook.org

বেশ খানিকটা পরে, প্রায়-বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে এরই মধ্যে? তোমাকে আমি জোর করে বাঁচিয়ে রাখব—সারিয়েও তুলব!'

সেই পুরাতন হাসি ফুটে ওঠে স্বর্ণর মুখে, আর সেই সময়েই চকিতে অরুণের মনে হয়—যাকে সে চিনত, যে তার পরিচিত, এ সেই পুরনো বুঁচি।

স্বর্ণ হেসে বলে, 'কত গেল রথারথী, সেওড়া গাছে চক্কবর্ত্তী।...তুমি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে? তবেই হয়েছে। বলি মন্তরতন্তর, দৈব ওষুধটষুধ কিছু জানো নাকি? নাকি ঝাড়ফুঁক শিখেছ? এত জোরের সঙ্গে কথা বলছ?'

অরুণ এ বিদ্রূপের কোন উত্তর দেয় না। বোধ করি এর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটা ওকে স্পর্শও করে না। সে সহজ শান্তকণ্ঠে বলে, 'আমি পাহাড়ের ওপরে ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে ঘর ঠিক করেছি, তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে। সেই জন্যেই এসেছি আজ, হরেনবাবুকে বলতে। খরচপত্র সব আমি জমা করে দিয়েছি—তাঁর কোন অসুবিধে বা অমত হবে বলে মনে হয় না। তা আজ তো আর দেখা হ'ল না, কাল সকালে এসেই দেখা করব। সময়ও নেই বেশি হাতে, ওদিকে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি, পরশুর ট্রেনে রিজার্ভেশন করা আছে।...হরেনবাবুর এতে আপত্তি হবার কথাও নয়—উনি তো অনেক চেষ্টা করেও এখানে বেড যোগাড় করতে পারেন নি কোন হাসপাতালে, এটা যখন পাওয়া গেছে, তখন নিশ্চয় খুশিই হবেন উনি।...টাকাকড়ি ওখানে যা কিছু ওঁর নামেই জমা দিয়েছি। উনি যদি যেতে চান—তিনটে বার্থই রিজার্ভ করেছি আমি, কাঠগুদাম পর্যন্ত।'

ঠিক এ উত্তরের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না স্বর্ণ। তার মুখে ব্যঙ্গের হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল একটা সুগভীর বিস্ময়। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবারও সেই আগের মতো চুপি-চুপি বলল, 'তুমি আমার জন্যে হাসপাতালে ঘর ঠিক করেছ? তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? নিজের খরচায়?...কেন, কেন এ ছিষ্টি করতে গেলে অরুণদা, আমার যে আর মোটে দেরি নেই মারবার! বাঁচতেও আমি চাই না যে। বাঁচায় আমার ঘেন্না হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। আমি যে—আমি আজ মরব বলেই সারাদিন ওপোস করে পড়ে আছি যে। আমার জন্যে অনথক কেন এত পয়সা খরচ করতে গেলে অরুণদা! ছি ছি। কেন এসব করলে তুমি!'

এবার অরুণ ভরসা করে আবার ওর চোখের দিক চাইল। তেমনি শান্তস্বরে বলল, 'কিন্তু ইচ্ছে করলেই মরতে পারো তুমি—এমন কথাই বা কে তোমার মাথায় ঢোকাল! যা খুশি তুমি করবে, আর আমরা চুপ করে বসে দেখব সবাই, এ তুমি ভাবলে কী করে!...তুমি সুখে থাকবে, ভাল থাকবে—এই আশা করেই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিলুম, ধরে রাখার চেষ্টা করি নি। সেইজন্যেই এতকাল সরে ছিলুম, কখনও সামনে আসবার চেষ্টা করি নি। তোমার সুখের পথে, শান্তির পথে আমার দুর্ভাগ্যের ছায়া না কোনদিন পড়ে, ভগবানের কাছে নিত্য এই প্রার্থনাই করেছি দিনরাত। কিন্তু তাই বলে দুঃখের দিনেও সরে থাকব, এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব—এ তুমি মনে ক'রো না একবারও। এবার জোর করেই ধরে রাখব তোমাকে—দরকার হয় তো। এত সহজে রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে।'

এবার আর চোখের জল বাধা মানে না স্বর্ণর। দুই চোখের কোল উপ্‌চে দরদর ধারে ঝরে পড়ে। এ কতকটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আনন্দেরও। এখনও তার প্রাণের এত মূল্য আছে তাহলে কারুর কাছে! পৃথিবীর সবাই তাহলে স্বার্থপর নয়, নির্মম নয়—অকৃতজ্ঞ নয়। এখনও অন্তত এমন একটি লোক আছে যে কোন প্রতিদানের আশা না রেখেই তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে চায়! তার সুখের জন্যই তাকে রাখতে চায়!

BanglaBook.org

অরুণকে পৌছে দিয়েই, ওরা পরস্পরের পরিচিত এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হবার পরই, জীবেন বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু আয়না ওধারের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল এদের দিকে! অরুণ তাকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'কিছু খেয়েছে ও?' আয়নাও ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না কিছুই মুখে দেয় নি।'

অরুণ তখন—স্বর্ণ শুনতে পায় এমনভাবেই—বলল, 'ওকে দুধ না হর্লিকস্ কি দেবে গরম করে দাও দিকি। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

আয়না ত্রস্তেব্যস্তে গরম জলের সন্ধানে ছুটল। ধরে যেন প্রাণ এল তার...সারাদিন তারও খাওয়া হয় নি। বুড়ো মানুষ সমস্ত দিন অনাহারে কান্নাকাটি করে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

অরুণ এবার স্বর্ণর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'সত্যি সত্যিই তুমি খাও নি সারাদিন?...এ পাগলামি তোমার ঘাড়ে চেপেছিল কেন? ও মানুষটাকেও তো খেতে দাও নি দেখছি!'

'ওসব কথা এখন থাক অরুণদা', অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে উত্তর দেয় স্বর্ণ, সজল চোখে একটু হাসি ফোটাবারও চেষ্টা করে, 'এখন আর ওসব কথা বলব না। ভাবও না।...অন্য কথা বলো। তোমার কথা।...আচ্ছা, তাহলে মেজঠাকুরপো যা বলছিল তাই সত্যি? তুমি খুব বড়লোক হয়েছে?...খু-উ-ব? অনেক পয়সা হয়েছে তোমার?'

'কে বললে এসব কথা? এত সব আবার কবে শুনলে? তবে যে বলছিলে আমার খবর পাও নি—'

'মেজঠাকুরপো বলছিল এই মাত্তর। তুমি নাকি এত বড় মটরগাড়ি করে এসেছ যে, রাস্তার লোক জড়ো হয়ে গেছে' আমার ছেলেও দেখে এসেছে—ভুতু। এত এত পয়সা কী করে কামালে অরুণদা? চাকরি করছ বুঝি আজকাল মোটা মাইনের?'

দূর পাগল! চাকরি করে কি কেউ বড়লোক হয়? যত বড় চাকরিই করুক। ও গাড়ি আমার নয়—যে সাহেবের সঙ্গে কাজ করি, তাঁরই গাড়ি।'

'সাহেবের সঙ্গে কাজ করো? সে আবার কী কাজ!'

একটুখানি চুপ করে থেকে অরুণ বলে, 'সে এক রকমের ব্যবসাই। এই যুদ্ধের নানা জিনিস যোগানো গভর্নমেন্টকে। আমি আর কী করে করব। ম্যাকগ্রেগার ডানকান কোম্পানির বড় সাহেব একা গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, আসানসোলের কাছে য়্যাকসিডেন্ট হয়—এক লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে। সে লরী পালিয়ে আসে, গাড়ি-সুদ্ধ পাশের খানায় পড়ে ছিলেন সাহেব! আমি সাইকেল করে আসছিলাম ঐ পথে—ঐ অবস্থা দেখে গাঁয়ের লোকজন ডেকে সাহেবকে গাড়ি থেকে বার করে কোনমতে একটা গাড়ি যোগাড় করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। সেই আলাপ সাহেবের সঙ্গে। আমার ওপর তাঁর একটা মায়াই পড়ে যায় বোধহয় ঐ ব্যাপারে। তাছাড়া বিশ্বাসী লোকও খুঁজছিলেন একজন—অনেকদিনই ওঁর এই সাপ্লায়ের কাজে নামার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চাকরি করে সোজাসুজি তো আবার কারবার করতে পারেন না, তাই আমাকে অংশীদার করে নিলেন। উনিই তদ্বির করে অর্ডার যোগাড় করেন, টাকাও ওঁর—আমি শুধু খাটি; লেখাপড়ার কাজ, মাল তৈরি করানো, ঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া, এই সবই আমার। খুবই পরিশ্রমের কাজ, অন্য লোকও ছিল না। এতদিন পরে আমিই আর একটি ছেলেকে যোগাড় করে নিয়েছি, বিশ্বাসী ছেলে—সে অনেকটা বুঝে নিয়েছে। তাই তো এখন কদিনের ছুটি পেয়েছি। নইলে তোমার সঙ্গে যাওয়াও হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। এখন আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে দিন-পনেরো-কুড়ি থেকেও আসতে পারব।'

ইতিমধ্যে আয়না এক কাপ হর্লিকস না কি একটা পানীয় তৈরি করে নিয়ে এসেছে। স্বর্ণ আর কোন আপত্তি করল না এবার, অরুণের মুখের দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভভাবে হেসে সেটা খেয়ে ফেলল ভালমানুষের মতো। তারপর অভ্যাস-মতো আয়নাকে একটা ঝঙ্কার দিয়ে

BanglaBook.org

উঠল, 'এবার তুমি দয়া করে মুখে কিছু দিয়ে কেদাত্ত করো আমাকে।...হ'ল তো গেলানো—আজকের মতো প্রাণটা তো ধরে রাখা গেল, এবার নিজের প্রাণটা বাঁচাও গে।'

আয়না চলে গেলে অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

স্বর্ণ যেন এখনও ব্যাপারটা ঠিক ধারণা করতে পারছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। পাহাড়ের ওপর হাসপাতালে যাবে সে, সেখানে গিয়ে ভাল হয়ে উঠবে? কিন্তু এ রোগ কি ভাল হয়? ভাল হওয়া সম্ভব? সত্যি সত্যিই তাকে সারিয়ে তুলতে পারবে অরুণদা?

আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে পাহাড়ের ওপরই বা হাসপাতাল করতে গেল কেন? সেখানের হাওয়া ভাল বলে? কী রকম হাওয়া সেখানকার? এই হাওয়াই তো—হাওয়া কি আবার দুরকম আছে নাকি?...সে পাহাড় কতদূর তাই বা কে জানে। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হয়, রেলগাড়িতে যাওয়া যায় নাকি সবটা? পাহাড়ে তো নাকি হেঁটে উঠতে হয়, সে কি পারবে অতটা হাঁটতে! মরুক গে, সে-ই বা ভেবে মরছে কেন। অরুণদা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে। পাহাড়ে যেতে পারবে, সেইটেই বড় কথা। এতখানি বয়স হ'ল, পাহাড় কখনও দেখল না সে—ছবিতে ছাড়া। চোখে দেখে নি, তবু আকর্ষণও কম নয়। ছবিতে দেখেই তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই সবুজ গাছ-পালায় ঢাকা আকাশ-ছোঁয়া মাটির ঢিপিগুলোর মধ্যে না জানি কি এক গভীর রহস্য আছে লুকিয়ে। কে জানে, বুঝি ঐসব জায়গাতেই দেবতারা থাকেন, মুনি-ঋষিরাও বোধ হয় ওখানে তপস্যা করেন বসে। সে শুধু তাঁদেরই জায়গা। আবার মনে হয় তাই বা কেন, শুনেছি তো পাহাড়ের ওপর এখন বড় বড় শহর হয়েছে, রেলগাড়ি যায়, মটরগাড়ি যায়—বড়-লোকরা গরমের সময় যায় হাওয়া খেতে। হরেনও একবার গিয়েছিল, জষ্টি মাসে শাল-দোশালা, গরম কোট, লেপ নিয়ে গেল। ভারি হাসি পেয়েছিল স্বর্ণর সে সময়, এই গরমে গরম জামা। মেজ জা তাকে বুঝিয়েছিল, পাহাড়ে শহর যে সব খুব উঁচুতে, সেইজন্য বারোমাস ঠাণ্ডা। শীতকালে সেখানে ঘাসের ওপর শিশিরগুলো সুদ্ধ জমে বরফ হয়ে থাকে।

কিন্তু ওসবই তার কাছে গল্প-কথার দেশ হয়েছিল এতকাল। ছবিতে দেখা কল্পলোক মাত্র। সে সব দেশ দেখার সুযোগ কখনও হয় নি, হবে বলেও মনে হয় নি। আজ এই মরণের দিকে পা করে—যমের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে বুঝি সেই সুযোগ এল তার জীবনে। কিন্তু যাওয়া কি হবে শেষ পর্যন্ত? পৌঁছতে কি পারবে সেখানে? কিছুতেই যে বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

কোথাও কখনও যেতে পায় নি সে। বাইরে যাবার মধ্যে একবার বড় নন্দাইয়ের দেশে গিয়েছিল। দক্ষিণ দেশ না কি আছে সেইখানে। গঙ্গাসাগর যাবার পথে পড়ে বুঝি। তাও তাঁরা বারোমাস সেখানে কেউ থাকেন না, এই ঠাকুরুন-বাড়ির কাছে টালিগঞ্জ বলে কি এক জায়গা আছে—সেইখানেই তাঁদের বাড়িঘর, কি এক কারখানা—সেইটেই আসল বাড়ি। দেশে যান কদাচিৎ কখনও। সেবার পুজোর পালা পড়েছিল বলে গিয়েছিলেন। সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যা যাওয়া—'জন্মের মধ্যে কম্ম'।

আর কখনও কোথাও বেরোতে পারে নি। বাপের বাড়ি তাই যেতে দিত না এরা। নমাসে ছমাসে, ক্রিয়াকর্ম পড়লে তবে। তাও এক রাতের বৈ দু রাত্তির নয়। এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত এই চার দেয়ালে ঘেরা কৌটোর মধ্যে বন্ধ আছে। একটা বড় রাস্তার কি গাড়িঘোড়া মানুষজনের পর্যন্ত মুখ দেখতে পায় না। সামনে পাঁচ হাত চওড়া ইঁট-বাঁধানো গলি, রিক্সাই আসতে চায় না। ওদিকে বড় রাস্তা, সে-ই বা কতটুকু, দুখানা গাড়ি দুদিক থেকেই এলেই সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। সামনে তবু এই যা একটু ফাঁকা—পিছনে রমাদের তিন তলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মতো। দুপাশেও তিনতলা না হোক, ওদের মতোই দুতলা বাড়ি এক-একটি মোতায়েন আছে। হাওয়া-বাতাস বলতেই বিশেষ কিছু নেই। অবকাশের মধ্যে

BanglaBook.org

এই এক ফালি উঠোন আর ছাদ। আকাশ দেখতে হ'লে হয় ছাদে উঠতে হয়, নয়তো উঠোনে নামতে হয়। জন্মাবধি সে গাছপালা, বাঁশঝাড়, পুকুর দেখে মানুষ—গাছপালা ছাড়া যে বাড়ি হয়, তাই তো জানত না। এখানে এসে চারিদিকে এ ইঁটের পাঁচিল দেখে হাঁপিয়ে উঠত প্রথম প্রথম। তারপর অবশ্য সবই সয়ে গেছে, একটু একটু করে সইয়ে নিতে হয়েছে—এই চার দেয়ালের বাইরে যে বিশাল বিস্তৃত বসুন্ধরা পড়ে আছে, তার কথা আর মনেও পড়ে না বোধহয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টাই। এই দোতলা বাড়ির মোট সাতখানা ঘরেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ওর জগৎ।

তবু এক এক সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় বৈকি।

কোন নতুন ক্যালেন্ডারে কি ছেলে-মেয়েদের পড়ার বইতে ছবি দেখলে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় যে পৃথিবীতে সবুজ শস্যে ভরা মাঠ আছে, ঘন গাছপালায় ভরা বাগান আছে, পুকুর আছে ডোবা আছে, খানা-খন্দ আছে। সেই সব মুহূর্তগুলোতে ওদের বাগানের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের সেই গো-হাড়গেলে ভরা পগার এবং বাঁশবনের ধারে শিয়ালের গর্তও ভাল লাগে। মন লোভাতুর হয়ে ওঠে সেই বিশেষ গন্ধটার জন্যে, সেই ছায়াঘন স্নিগ্ধ ভূমিখণ্ডটুকুর জন্যে। সন্ধ্যাবেলা—এক একদিন বা বেশ বেলা থাকতেই—কুড়ি পঁচিশটা শিয়াল এসে জড়ো হয় ওদের রান্নাঘরের নর্দমাটার ধারে, এক একটা নির্ভয়ে এগিয়ে আসে দরজা পর্যন্ত, একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। সে সময় ভয় ভয় করত, এখন ঐসব বেদনাবিধুর স্মৃতিমন্থর মুহূর্তগুলিতে তাদেরও পরম বন্ধু বলে মনে হয়।

আরও মনে হয়। দেখে নি সে, তবে কল্পনা করতে পারে। পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র—নিজের মতো ক'রে একটা ছবি খাড়া ক'রে নিয়েছে মনে মনে। নিঃসীম নীল সমুদ্র—ছবি দেখে তাকে ধারণা করা যায় না, তবু সে চেষ্টাও করে মধ্যে মধ্যে। পাহাড়ের ছবি অবশ্য দেখেছে অনেক। দার্জিলিঙের খুব একখানা বড় ছবি বাঁধানো আছে মেজ ঠাকুরপোর ঘরে। অনেকদূরে পশ্চিমে কোথায় সিম্‌লে পাহাড় আছে তার কতকগুলো পোস্টকার্ডে ছাপা ছবি দেখেছে সে, কে যেন পাঠিয়েছিল—হয়ত এখনও প্যাঁটরার মধ্যে খুঁজলে কাপড়ের তলায় পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও নানান পাহাড়ের ছবি চোখে পড়ে মধ্যে মধ্যে। বায়স্কোপে গিয়েও দেখেছে সে।—পাহাড়ের ছবি ঝরনার ছবি। কোন্ দেশে পাহাড়ে বরফ জমে, তাতে সব মেয়েরা পায়ে কাঠ বেঁধে খেলা করে—একবার দেখেছিল ছবিতে।

সেসব ছবি সেসব দৃশ্য ঐ উন্মনা মুহূর্তগুলোতে যেন একসঙ্গে ভিড় ক'রে মনের পর্দায় ফুটে ওঠে আর তারই মায়া যেন দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে থাকে ওকে। মনটা ছটফট ক'রে ওঠে—একটু ফাঁকায়, দুটো গাছপালার মধ্যে—আর কিছু না হোক নীল আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে।...

সেই দুর্লভ সুযোগ আজ এতদিন পরে হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে ওর—একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।...কিন্তু তবু, এমনভাবেই কি যেতে চেয়েছিল সে? এমনি রুগ্ন অসহায় ভাবে,—সকলের অস্পৃশ্য হয়ে, ঘৃণিত অবজ্ঞাত বিতৃষ্ণার পাত্র হয়ে? স্বামী-পুত্র-কন্যা—সকলকে ছেড়ে?...

একেই বুঝি বলে অদৃষ্টের পরিহাস। নইলে এই পরম ঈপ্সিত ক্ষণে, এই চার-দেয়ালে-ঘেরা, শ্বাসরোধকরা সংসারটার আকর্ষণ এমন দুর্নিবার বলে মনে হবে কেন? তাকে ছেড়ে যেতে মনের মধ্যেকার বেদনার তন্ত্রীগুলোতে এমন টান পড়বে কেন?

কানে গেল, অরুণদা আস্তে আস্তে বলছে, 'অত ভাবছ কেন? বড়জোর দু তিন মাস, তার মধ্যেই সেরে গিয়ে আবার তোমার ঘরকন্নার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু এখানে থাকলে কিছুতেই তোমাকে বাঁচাতে পারব না। লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমত ক'রো না!'

BanglaBook.org

স্বর্ণ শিউরে ওঠে। অরুণদা কি অন্তর্যামী? এমন ক'রে মনের নিভৃত কথা টের পায় কি ক'রে?...ওর অসুখের খবরই বা তাকে কে দিলে!...নিশ্চয় কোন সন্ন্যিসী-টন্ন্যিসীকে ধরে কোন দৈবক্ষমতা পেয়েছে অরুণদা, এত পয়সাও তাই থেকে। ওসব সায়েব-টায়েব বাজে কথা।...

কিন্তু সে যাই হোক—অরুণদা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে! দীন উৎসুক চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। যেন ও দয়া ক'রে সেরে উঠে তাকে কৃতার্থ করবে।...

সে কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ—ঘরকন্নার ভাবনায় তো আমার ঘুম হচ্ছে না একেবারে। সংসারে আমার ঘেন্না ধরে গেছে—এককড়ার টান নেই কারও ওপর আর।...কিন্তু তুমি এই ঘাটের মড়ার বোঝা ঘাড়ে তুলছ—সেই কথাই ভাবছি। হয়ত বাঁচাতেও পারবে না শেষ পর্যন্ত, মিছিমিছি এই খরচান্ত আর ব্যতিব্যস্ত হওয়া!'

আস্তে আস্তে বলল অরুণ, 'ওসব আর না-ই ভাবলে এখন, ওসব ভাবার সময় ঢের পড়ে রইল সামনে। এখন চলো তো!'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণ বলল, 'আমি তো বেঁচে যাই। এদিকে বাঁচব কিনা জানি না, মনে মনে বাঁচি অন্তত। কতদিনের শখ আমার পাহাড় দেখার।'

তারপর একটু সলজ্জ হেসে বলে, 'খুব উঁচু পাহাড়—হ্যাঁ অরুণদা? আচ্ছা, কত উঁচু হবে?'

॥ ৩ ॥

এই দুটো দিন মনে মনে যে ছবিই এঁকে থাকুক স্বর্ণ, কল্পনার রাশ যতই ছেড়ে দিয়ে থাকুক, এমনটি কখনও ভাবতে পারে নি। চমক শুরু হয়েছে সেই যাত্রার গোড়া থেকেই, সে চমক যেন শেষ হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আসার কষ্ট তো ছিলই, প্রাণপণেই তাদের অশ্রুছলোছলো অসহায় ঈষৎ-ভীতার্ত দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছিল, প্রাণপণেই চেষ্টা করেছিল বড় মেয়ে রেবার চাপা কান্নার আওয়াজটা না শুনতে। কান চেপেও ধরেছিল দু-হাতে। স্বামীর জন্যে মন কেমন করার কথা নয়—যদিও হরেন আসবার সময় অনেক মিষ্টি কথা বলেছিল, অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল স্ত্রীকে, সঙ্গে যে তারই যাওয়া উচিত—একথা বারবারই স্বীকার করেছিল—বিস্তর পরিতাপ ও দুঃখ প্রকাশও করেছিল যে, এ সময়েও, এই বিপদ জেনেও শালারা ছুটি দিলে না,—কিন্তু সেদিকে কান দেয় নি স্বর্ণ, কোন জবাব দেবারও চেষ্টা করে নি; ঐ বানানো মিষ্টি কথাগুলো তার নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে চাবুকের মতো গিয়ে বক্তার মুখেই বাজবে—এটুকু জ্ঞান তার ছিল; তবু তার জন্যেও মন-কেমন করেছে বৈকি। অনেকদিনের সম্পর্ক যে! ও তো কখনও অন্য কারও কথা ভাবে নি কোনদিন, অন্য কাউকে চায় নি; ঐ একটি মাত্র লোককেই একান্ত আপন জ্ঞানে আঁকড়ে ধরেছিল সেই মিলনের প্রথম দিনটি থেকে। বরং কোনদিক থেকেই সে এই রূপবান কান্তিমান শিক্ষিত ভদ্র স্বামীর উপযুক্ত নয়, এই ভেবে সঙ্কোচই বোধ করেছে চিরকাল, নিজেকে অপরাধী ভেবেছে অকারণেই। অনেক বেশি সেবা দিয়ে, অনেক বেশি ভক্তিতে প্রেমে আত্মত্যাগে, নিজের রূপ গুণ বিদ্যার দৈন্য ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছে। আজ হরেন যা-ই ক'রে থাকুক—ওর মনে সে-ই একেশ্বর যে। এতকাল পরে সেই স্বামীকে ছেড়ে যেতে—দীর্ঘকাল, হয়ত বা চিরদিনের জন্যই—মনে বেজেছিল বৈকি!

এমন কি, ঐ যে খাঁচার মতো বন্দীশালার মতো তার শ্বশুরবাড়ি—সেটা ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয়েছিল তার। অনেক শখের, অনেক সাধনার সংসার তার, আবাল্য-স্বপ্ন-দেখা নিজস্ব ঘর-কন্না; তার নিজের বাড়ি, স্বামী-শ্বশুরের ভিটা। নিজের হাতে গুছোনো হেঁশেল; পাঁচফোড়নের কৌটো, হিংয়ের শিশিটি পর্যন্ত নিজের হাতে সাজানো, এ বাড়ির প্রতিটি

BanglaBook.org

ছোটখাটো বস্তুর সঙ্গেই তার আত্মার বন্ধন, প্রাণের যোগাযোগ। সে এ বাড়িতে আসার পর প্রত্যেকটি ছবি-টাঙ্গানো পেরেক-পোঁতার ইতিহাসও তার মুখস্থ। এর ইট-কাঠ-দোর-জানালা, নোনাধরা দেওয়ালের গর্তগুলোও যেন তার বহুকালের পুরনো বন্ধু...তার আপনজন। এদের ফেলে যেতে কষ্ট হবার কথাই তো।

তবু সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে নি। যে নিবিড় অভিমান সে পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে এমনভাবে এক কথায় অরুণের সঙ্গে অজানা জগতে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে পা বাড়াতে রাজি হয়েছিল—সেই অভিমানই কতকটা বর্মের কাজ করেছিল এই দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা থেকে আত্মরক্ষা করতে। যে-আঘাত খেয়েছে সে তার এই এতকালের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া সংসার থেকে, অতিপ্রিয় তার এই বিশ্বসংসার-থেকে-বিচ্ছিন্ন-হওয়া নিজস্ব জগৎ থেকে, তার এই জগতের সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক আপন মানুষটির কাছ থেকে—সেই আঘাতই যেন কূর্মের আচ্ছদে পরিণত হয়ে তাকে রক্ষা করল এই শেষ মুহূর্তে, তাকে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে দিল না।

কিন্তু কষ্ট যতই হোক, তার জন্য খুব বড় রকমের একটা দৈহিক প্রতিক্রিয়া হ'তে পারল না—বোধ করি তার জীবনে একেবারে অপ্রত্যাশিত এই অভিনবত্বের জন্যেই। অথচ এই প্রতিক্রিয়ারই খুব ভয় করেছিল অরুণ। তার জন্যে তার এক ডাক্তার বন্ধুকে স্টেশনে থাকতে বলেছিল, আপৎকালে যে যে ওষুধ কাজে লাগতে পারে তাও কিছু কিছু সঙ্গে নিয়েছিল। মায় ইঞ্জেকশনের একটা সিরিঞ্জ নিতেও ভোলে নি। কিন্তু সে সব কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন হ'ল না। প্রতিক্রিয়ার পরেও প্রতিক্রিয়া আছে, বোধ করি তাইতেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠল স্বর্ণ।

যে মূল্যবান গাড়ি করে তাকে স্টেশনে নিয়ে আসা হ'ল, সে গাড়িই কখনও চোখে দেখে নি স্বর্ণ। দু-একবার ট্যাক্সিতে না চড়েছে সে তা নয়, কিন্তু সে-সব গাড়ির সঙ্গে এ গাড়ির তুলনাই হয় না। এত বড় যে 'মটর' গাড়ি হয় তা-ই জানা ছিল না কখনও। স্বচ্ছন্দে তাতে শুয়ে আসা চলে, আর শুয়েই এল সে। অরুণ সযত্নে সস্নেহে নিজে হাতে বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে দিল ভেতরে, সে আর জীবেন ড্রাইভারের পাশে বসল। এতটা বয়সের মধ্যে কেউ তাকে এমন যত্ন ক'রে বিছানা পেতে শুইয়েছে বলে মনে পড়ে না। তার মা কাকী যতই ভালবাসুক—এত করবার তাদের অবসরই ছিল না।

সেইটুকু উপভোগ করতে করতেই হাওড়া স্টেশন। বড় একটা হেলানো আধশোয়া চেয়ারে ক'রে এনে তাকে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চড়ানো হ'ল। এর আগে কখনও সেকেন্ড ক্লাসেই চড়ে নি সে, একবার অর্ধোদয় না কী একটা যোগে সে হাওড়ায় গঙ্গা নাইতে এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে, খুব ভীড় দেখে ছোটকা ওদের একটা ইন্টার ক্লাসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। টিকিট বদলানো হয় নি, এমনিই চড়েছিল। ছোটকা বলেছিল, এ ভীড়ে আর কেউ টিকিট দেখবে না। তবু সেদিনও ইন্টার ক্লাসের গদীআঁটা বেঞ্চি চোখেই দেখেছিল, ভীড়ের মধ্যে আর বসবার সুযোগ মেলে নি।...এ নাকি সে সবের চেয়ে ঢের বেশি ভাড়ার গাড়ি, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল স্বর্ণ। পিঠের দিকে ঠেস দেবার জায়গাটা পর্যন্ত গদীআঁটা, মায় মাথার জায়গায় বালিশের মতোই খানিকটা উঁচু করা। আয়নাই কত গণ্ডা। কলঘরের মধ্যেও আয়না। আবার সেখানে এতটুকু একরত্তি একটা পাখা। বেঞ্চির পাশে পাশে জলের গেলাস রাখার কেমন সব আংটা পরানো দ্যাখো। বসে বসে এত ছিষ্টিও তো করেছে বাপু! ভাড়া বেশি নেয় অমনি নয়। এখানে বসবার পর সুখসোমন্দা কত সব তকমা-আঁটা আঁটা লোক সেলাম ক'রে গেল।...

তাও, এ কামরা নাকি একেবারে রিজার্ভ করা। কেউ উঠবে না আর এতে। অনেক

BanglaBook.org

টাকা দিয়ে অরুণদা এই ব্যবস্থা করেছে। অরুণের সেই ডাক্তার বন্ধু (মিলিটারী পোশাক আঁটা সায়েবদের মতো একেবারে—হুবহু! মাগো, প্রথমটা তো তাকে দেখে ভয়ই হয়েছিল স্বর্ণর) ওকে শুইয়ে দেবার পর পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'কোন ভয় নেই, শি ইজ অল রাইট। হাউএভার, আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি, প্রিকশন নেওয়া ভাল।'

যা যত্ন ক'রেই ইঞ্জেকশন দিল লোকটা! একটুও লাগল না, কিছু না! বরং আরামে যেন ঘুমিয়ে পড়ল স্বর্ণ একটু পরে। গাঢ় ঘুম—রাত্রে অরুণ খাওয়ার জন্যে ডেকে না তুললে সে বোধহয় সকাল পর্যন্ত ঘুমোতে পারত। খাবারও এনেছে বটে—একরাশ। গরম থাকা বোতল—ঐ রকম আজকাল তার দেওররাও কিনেছে সব, ঘরে ঘরে—তাতে ঝোলের মতো কী একটা। দিব্যি খেতে, সূপ না কী যেন একটা নাম বললে। তার সঙ্গে ফলের রস সন্দেশ—আরও কত কি। নিজে তো খেলে না কিছুই, স্বর্ণ খুব রাগারাগি করতে একটুখানি কি মুখে দিলে—এই পর্যন্ত। আবার বলে, 'তুমি বকাবকি না করলে আমার খাওয়া হ'ত না তা তো জানোই; খাওয়ার অব্যেসটাই চলে গেছে যে!'

এত আরাম জন্মে অবধি পায় নি কখনও। এত আরাম এত সুখ যে মানুষ ভোগ করে তাই জানত না সে। মন-কেমন করতে লাগল ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে। ওদের বাপও পয়সা রোজগার করছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুখে রাখবার কথা ভাবেও না একবার।...মা বাবা, অভাগা ভাইগুলোর জন্যেও মন কেমন করতে লাগল। ওরা এসব জানতেও পারল না কোন দিন। ফার্স্ট ক্লাস কামরার ভেতরে ঢুকে চেহারাটাও দেখতে পেল না। পাবেও না বোধহয় কোনদিন।

স্বর্ণ যেন হাত-পা মেলে এই যাত্রার প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে করতে চলল। এ যেন একটা সুখস্বপ্ন। ভোর হ'তে না হতে কোথা থেকে সব তক্‌মা-আঁটা উর্দিপরা বেয়ারা এসে কেমন খাবার-দাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। অবশ্য এসব খাবার প্রিয় নয় ওর কোনদিনই। আধকাঁচা ডিমের চেহারা দেখলেই গা-কেমন করে—তবু, মচমচে রুটির ওপর মাখিয়ে অরুণদা যখন নিজে হাতে দিলে, তখন আর 'না' বলতে পারল না। বোতল থেকে হর্লিক্স বার করে গুলে দিলে—এক গেলাস। আবার এক ঘণ্টা না যেতে যেতে ফলের রস সন্দেশ। মাগো, এত কেউ খেতে পারে নাকি? বিশেষ এই মরা পেটে। খাওয়া যদি এতই সহজ তুমি খাচ্ছ না কেন ঠাকুর?...ছেলেটা চিরদিনের পাগল।

সে সুখ-স্বপ্ন একটানা দীর্ঘ ছন্দে তাকে টেনে নিয়ে চলল। একটা বৈচিত্র্য থেকে আর একটা বৈচিত্র্যে। বিলাসের একটা উপকরণ থেকে আর একটায়। সারাদিন এইভাবে চলার পর রাত্রে কী একটা ইস্টিশানে নামতে হ'ল তাদের। এও কী এক বড় ইস্টিশান। তাদের হাওড়ার মতো না হ'লেও বেশ বড়। কত লোকজন। বোরখা পরা-পরা মেয়েছেলের দল। ঘেরাটোপ পরানো আলোতে যেন ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাদের। বেরিলি না কী যেন বললে জায়গাটার নাম।...আবার সেই রকম হেলানো চেয়ার এল, তাকে ঢেকেঢুকে মুড়েসুড়ে কচি ছেলের মতো শুইয়ে দিলে অরুণ। ওখান থেকে নেমে আর একটা গাড়িতে চড়তে হ'ল। এ নাকি ছোট গাড়ি, কিন্তু স্বর্ণর তো মনে হ'ল না তা। এ তো দিব্যি সেই আগের গাড়ির মতোই, ছোট আবার এর কোন্‌খানটায়? কে জানে বাপু, বলছে যখন তখন ছোট হবে নিশ্চয়ই—ওরা কত জানে শোনে, ওদের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে যা অপরের চোখে পড়ে না—কিন্তু এও তো বেশ। শুল তো বেশ আরামেই, হাত পা মেলে।

রাত পোয়াতেই আবার সেই রকমারি খাওয়া। মুখ হাত ধোবার জলটি পর্যন্ত অরুণদা এগিয়ে দিচ্ছে। গামলাই এনেছে একটা তার জন্যে। এমন আরামে থাকলে এক মাসেই কোলা ব্যাং হয়ে যাবে যে। খাওয়া-দাওয়ার পরেই নামতে হ'ল—এই ইস্টিশানই নাকি এ লাইনের শেষ। এখান থেকে মোটরে যাওয়া। বাসেই যেতে হয়, আর তাতে নাকি বড়

BanglaBook.org

কষ্ট। অনেক দূরে পথ তো। তার জন্যে নাকি একটা গোটা বাসই ভাড়া করতে চেয়েছিল অরুণদা দেড়শ' টাকা দিয়ে, ওর সায়েব বারণ করেছে। সেই সায়েবই তার কে এক বড় মিলিটারী সায়েব বন্ধুকে বলে আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। মালপত্তর- একটা কি জীপগাড়ি এসেছে আজকাল এই যুদ্ধের হিড়িকে—তাইতে চাপল ও আর অরুণ অন্য এক গাড়িতে। শুয়ে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে দিব্যি। এ রুগী যাবারই গাড়ি, আগেও দেখেছে স্বর্ণ। পাড়ায় 'ওলা'মার দয়া হ'লে এ গাড়ি তাদের ওখানেও আসে হাসপাতালের গাড়ি, কী সব কড়া ওষুধের গন্ধ গাড়ি-ময়। তা হোক, স্বর্ণর এসব গন্ধ খারাপ লাগে না। এবার ক্যাম্বিশের খাটে ক'রে তুলল তাকে, সেই খাটসুদ্ধই শুইয়ে দিল। ভেতরে শুধু অরুণ রইল,-পাখা জলের জায়গা আর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে।

কী পথ তা কিছু দেখতে পেল না স্বর্ণ, দুদিকঢাকা গাড়িতে শুয়ে শুয়ে যাওয়া—তবে পথটা যে অনবরত এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারল। সে জন্যেই বোধ-হয়, মাঝে খুব কষ্ট হয়েছিল ওর, হয়ত ভিরমিই যেত যদি না ব্যাপারটা চট্ ক'রে বুঝে নিয়ে অরুণদা তাড়াতাড়ি কী একটা ঝাঁঝালো ওষুধ নাকের কাছে ধরত। তাতেই হুঁশ ফিরল আবার, একটু বলও পেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কি ওষুধও খাইয়ে দিল অরুণদা। তারপর আর বিশেষ কষ্ট টের পায় নি।

রাত্রির স্বপ্ন ভাঙ্গে প্রভাতের রূঢ় বাস্তব আলোয়, স্বপ্নের সুখ সত্যকার জীবনে মেলে না সাধারণত। কিন্তু এ যাত্রায় স্বর্ণর ভাগ্যে যেন অঘটনই ঘটছে কেবল। পথের সেই দীর্ঘ সুখ-স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটল নতুন এক স্বপ্নের মধ্যেই। এসে যেখানে পৌঁছল সে, সেও এক স্বপ্নের দেশ। এ যদি হাসপাতাল হয় তো স্বর্গের চেয়ে হাসপাতালই ভাল। গাড়ি থেকে চারদিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেল একেবারে। সব দুঃখ দুশ্চিন্তা দুর্বলতা এমন কি সন্তান-বিচ্ছেদ-বেদনা পর্যন্ত নিমেষে দূর হয়ে গেল। এ কোথায় এল সে? এমন জায়গা যে হয় তাই যে জানা ছিল না তার কোনদিন। পাহাড়ে না আসুক, পাহাড়ের ছবি সে ঢের দেখেছে, তার ঘরেই কত গণ্ডা টাঙ্গানো আছে—তবু সে যে এমন তা তো ভাবতে পারে নি কোন-দিন!

গাঢ় সবুজ গাছপালার আস্তরণে ঢাকা এই এত বড় বড় পাহাড়, চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউয়ের বন, ওপরে ঘন নীল আকাশ (এমন নীল আকাশ তো পোড়ার শিবপুরে কি মৌড়ীতে থাকতে একদিনও নজরে পড়ে নি, আকাশও কি আলাদা আলাদা হয়?)—নিচে রূপোর পাতের মতো নদী। কোশী নদী না কি যেন বললে! একটুখানি নদী কিন্তু তারই কি বিক্রম। তুলোর পাঁজ ধুনতে ধুনতে চলেছে যেন—এমন রাশি রাশি সাদা ফেনা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবে বোঝা যায় ওগুলো তুলো নয়। আসলে পাহাড়ি নদী নামছে নিচের দিকে, জল তীরবেগে ছুটছে—পথে যে অসংখ্য নুড়ি পাথর (পরে জেনেছিল স্বর্ণ নুড়ি নিহাৎ নয়, ওগুলো এক-একটার ওজন একশ মণ পর্যন্ত হবে।) পড়ছে তাতেই ঘা খেয়ে ফেনা কাটছে ওগুলো। বাপ রে কী তোড় জলের, বোধহয় একটা কুটো পড়লেও এখনই খান খান হয়ে যাবে।

কিন্তু নদী অনেক দূর, ঝাউগাছগুলো বড় কাছে, বড় আপন। অরুণদা বলছে ওর নাম পাইন। নাম যাই হোক—ভারি চমৎকার কিন্তু গাছগুলো, কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত ফল ওর, যেন কাঠের খেলনা। আর ওর ডালে কী শনশনে হাওয়া। সে হাওয়া মুখে লাগলেই মনে হয়, বয় বুঝি বেঁচে গেলুম—আর কোন ভয় নেই।

মুখেও বলে সে কথা, অরুণের দিকে চেয়ে বলে, 'না অরুণদা, মনে হচ্ছে আমি বেঁচেই যাব এ-যাত্রা। শাশুড়ী বলেন—শিব-অসাধ্য রোগ বৌমা, এ তো সারবার নয়,

BanglaBook.org

একটা প্রাচিত্তির ক'রে ফ্যালো।...কিন্তু এ তো শুনেছি শিবেরই দেশ, এদেশে বোধহয় বেঁচে যায় এ রুগীও। মনে হচ্ছে এই বাতাসেই সেরে উঠব এবার, ওষুধও খাওয়াতে হবে না। শিবঠাকুর বাঁচাবেন বলেই বোধহয় টেনে এনেছেন তোমাকে দিয়ে!'

হাসতে হাসতেই বলে কিন্তু দুচোখের কোণে একটু যেন জলও চিকচিক করতে থাকে সেই সঙ্গে। সেই জল কি এসে পড়ে সুদূর সংসারের স্মৃতিতে, বেদনায়,—না কি নির্মম অকৃতজ্ঞতার আঘাতে? কিম্বা অরুণের প্রতি স্নেহে-কৃতজ্ঞতায়, সেই সঙ্গে ঈষৎ লজ্জাতেও?...কেন যে আসে তা সে নিজেও বোঝে না। কিন্তু বলতে বলতে বুঝি কৃতজ্ঞতাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। বলে 'ধন্যি ছেলে বাবা তুমি! এতও খবর রাখো, এত ছিষ্টিও জানো।...তুমি যদি লেখাপাড়াটা না ছাড়তে তা'হলে আজ জজ-ম্যাজেস্টার হ'তে পারতে। আমি তো বরাবর বলে এসেছি—তুমি না পারো হেন কাজ নেই। কী যে দুর্বুদ্দি হ'ল তোমার তখন! কিন্তু এ যে অসুমর খরচের ব্যাপার দেখছি সব, সত্যি এত পয়সা হয়েছে তোমার?...তোমার বোনাই যা লোক, মুখে যা-ই বলুক, এক পয়সা দেবে না তোমাকে—তা বলে রাখছি।...তুমি মিছিমিছি একগাদা টাকা দেনায় জড়িয়ে পড়বে না তো?'

অরুণও হাসল এবার। স্বর্ণর শীর্ণ মুখ আর কোটরাগাত চক্ষুর চিক্‌চিকিনির দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বলল, 'পড়লুমই বা—তাতে তোমার দেনাটা শোধ হবে তো খানিকটা। সেইটুকুই লাভ।'

'আমার আবার ছাই দেনা!' অভ্যস্ত ঝঙ্কার কণ্ঠে ফুটে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে, 'আমার কাছে আবার কবে কি ধার করলে তাই শুনি!...ও সেই সাতটা টাকার কথা বলছ?...ভাগ্যিস ওটা নিয়ে গেছলে, কী ভাগ্যিস যে ওটুকু সুবুদ্ধি তোমার হয়েছিল—নইলে সত্যিই বলছি—আমার মুখে আর অন্নজল যেত না।...আচ্ছা, কেন অমন ক'রে চলে গেলে অরুণদা বল তো? আমার বে হ'ল বলে—?...তোমার কি মনে হ'ল আমি না থাকলে তোমার ক্ষোয়ার হবে, কেউ দেখবে না?...তা এই যে পথে পথে ঘুরলে, কে তোমাকে অত দেখল বাপু?...না, না, কাজটা ভাল করো নি!'

আবার কি মনে ক'রে বলে, 'নাকি আমার জন্যে খুব মন কেমন করেছিল? ঠিক ঠিক বল তো। আজও আমি ভেবে পাই নে কথাটা!...তা দুটো দিন অপেক্ষা করলে না কেন, আমি তো আটদিনের মাথাতেই এসে পড়লুম। চাই কি আর একটা বছর কাদায় গুণ ফেলে থাকলে, আমি শ্বশুরবাড়িতে পুরনো হয়ে গেলে—আমার কাছেই গিয়ে থাকতে পারতে!'

'ওকথা এখন থাক বুঁচি, ও তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। ওসব কোন কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। সব ভাবনা চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দাও একেবারে!'

স্বর্ণ হেসে উঠল যেন আপন মনেই 'হি হি, তুমি সেই বুঁচি নামই ধরে রাখলে চিরকাল! তা মন্দ নয় কিন্তু, আগে আগে শ্বশুরবাড়িতে কেউ ও নাম ধরলে লজ্জা করত, মনে হ'ত কী বিচ্ছিরি নাম। কিন্তু এখন বেশ ভাল লাগে, মনে হয় সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। ও নাম ধরে তো এখানে বড় একটা কেউ ডাকে না আর!'

•

চিকিৎসার এই রাজকীয় ব্যবস্থাতে যে 'অসুমর' টাকা খরচ হচ্ছে সেটা তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝেছিল স্বর্ণ, কিন্তু তবু আন্দাজটা সত্যের কাছাকাছি পৌছতে পারে নি। যখন তা পৌছল তখন ব্যাকুলতার সীমা রইল না।

অরুণ বেশিদিন থাকতে পারবে না, ওখানে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এখানে দিন পনেরো থেকে সব বন্দোবস্ত ক'রে চলে যাবে—এ আগে থাকতেই বলা ছিল। একমাস দেড়মাস

BanglaBook.org

অন্তর এসে খবর নিয়ে যাবে এর পর। অবশ্য হরেনের আসবার কথা, ছুটি পেলেই সে আসবে এখানের গেস্ট হাউসে মাসখানেক কাটিয়ে যাবে—বার বার বলে দিয়েছে সে। তারও 'চেঞ্জ' হবে, স্বর্ণরও খোঁজখবর করা হবে। বড় মেয়েকেও নিয়ে আসবে সে। কিন্তু সে কথায় স্বর্ণ বা অরুণ কেউই বিশেষ ভরসা রাখে নি। স্বর্ণ বলেছে, 'আমি একাই বেশ থাকব অরুণদা, তুমি মাঝে মাঝে এসো সময় মতো—তাতেই আমার হবে। তাও কাজের ক্ষেতি ক'রে তোমাকেও আসতে বলি না। এখানে তো এত লোকজন, আমার দিব্যি চলে যাবে!'

অবশ্য তার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেজন্যে অরুণ করেছেও ঢের। বেশি টাকা দিয়ে 'কট' বা আলাদা ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছে। পরিচর্যার জন্যে যত না হোক, সর্বদা কাছে কাছে থাকার জন্যে সঙ্গিনী হিসেবে একজন নার্সও বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। একেবারে তিন মাসের মতো সমস্ত খরচ—মায় নার্সের মাইনে সুদ্ধ আগাম জমা ক'রে দিয়েছে। ওষুধপত্রের জন্যেও আনুমানিক একটা টাকা গচ্ছিত ক'রে দিয়েছে আপিসে অর্থাৎ সে বা অপর কেউ না এলেও যাতে চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়, চিঠি লিখে জানিয়ে তবে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন না হয়।

এই নার্সের মুখেই খরচের বিপুলতার প্রথম একটা আভাস পেল স্বর্ণ। নার্স বাঙালি নয়, যুক্তপ্রদেশের মেয়ে—স্বর্ণর হিসেবে খোঁট্টা—তবে এর আগেই সে আর এক বাঙালি মহিলার পরিচর্যা ক'রে কিছু কিছু বাংলা শিখেছিল, কিছুটা সেই বিদ্যেয় আর কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে ইশারায় কথাবার্তার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। তার কাছেই শুনল, এই যুদ্ধের মধ্যেই কী একটা ওষুধ বেরিয়েছে এই রোগের নাকি সেই ইঞ্জেকশন এখনও বাজারে খুব বেরোয় নি, অনেক কাণ্ড ক'রে যোগাড় করতে হচ্ছে—যা আসছে সরকার মিলিটারীদের জন্যেই কিনে নিচ্ছেন। অরুণ নাকি বহুলোককে ধরে অনেক বেশি দাম দিয়ে সেই ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করেছে। এমনিতেই নাকি তার দাম অনেক, এক-একবার যেটুকু ফোঁড়া হয় তারই দামে নাকি একটা ছোট সংসারের এক মাসের খরচ চলে যায়। নার্স আশার অনুমান, আশি নব্বই টাকার কম পড়ছে না এক-একটা ইঞ্জেকশন।

কিন্তু শুধু তো এই ওষুধ নয়—অন্য অন্য ব্যাপারেও কি খরচ কম হচ্ছে! নার্সের মাইনে, এখানকার খাই-খোরাকী, ঘর-ভাড়া—সব খরচেরই একটা আঁচ পেল স্বর্ণ। শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল সে, বিশ্বাসই হ'তে চাইল না তার। বিশ্বাস হবার কথা নয়, এ তার কাছে রূপকথার মতোই আজগুবি একটা অঙ্ক। এত টাকা কেউ কারও জন্যে খরচ করে—তা সে জানবে কী করে? এত টাকা যে কোন সাধারণ লোক—রাজামহারাজা বা সাহেবসুবো ছাড়া—রোজগার করতে পারে তা-ই যে জানে না সে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনে আসছে যে একটা টাকার অনেক দাম, সাত হাত মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। এ লড়াইয়ের বাজারে অনেকে নাকি অনেক টাকা রোজগার করছে তা সে শুনেছে, হরেনও নাকি বিস্তর টাকা কামাচ্ছে—কিন্তু সে কি এত?

অনেক ভাবল সে। তারপর—তার জানাশুনো প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে পরিমাণ বেড়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে এবারের এই আসবার ব্যবস্থাটার খরচটাও আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। সেও তো কম নয়, রাজরাজড়ার মতোই তো এসেছে সে। যে শুধু পথেই এত টাকা খরচ করতে পারে, তার পক্ষে এ খরচাই বা অস্বাভাবিক কিসের?

বিশ্বাস হবার পর আরও আকুল হয়ে উঠল সে। এ কী করছে অরুণদা, অরুণদা কি পাগল হয়ে গেল না কি! এ যে দেউলে হবার মতলব তার। তার মতো একটা সামান্য মেয়েছেলে—তার নিজের বোন কি আপন কেউ নয়—নিতান্তই নিস্পর একজন, তার জন্যে এ কি বাড়াবাড়ি কাণ্ড করছে ও!...সে আর স্থির থাকতে পারল না; এই বারো চোদ্দ দিনেই

BanglaBook.org

অনেকটা জোর পেয়েছে পায়ে, কাউকে না ধরেও হেঁটে বাইরে বেরোতে পারে—তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে খুঁজে বার করল অরুণকে। বাগানের এই অংশটা অরুণের বিশেষ প্রিয়, থাকলে এখানেই থাকবে তা সে জানত।

অরুণের সামনে গিয়ে ধপাস ক'রে বসে পড়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'এ কী করেছ অরুণদা, তুমি নাকি আমার জন্যে মাসে ছ-সাতশো টাকা খরচের ব্যবস্থা করেছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? নাকি মতিচ্ছন্ন ধরল তোমাকে? তুমি কী এমন লাট-বেলাট দরের মানুষ যে এই খরচটা করছ। শেষে কি একটা অখদ্যে অবদ্যে মেয়েছেলের জন্যে দেউলে হবে তুমি! বলি মতলবটা কী তোমার?'

অরুণের সুগৌর মুখে বুঝি একটা রক্তাভা খেলে যায় মুহূর্তকালের জন্যে। কিন্তু সে স্থির শান্তভাবেই বলে, 'কে বললে তোমাকে এসব কথা? ওসব গালগল্পে কান দাও কেন?'

ওগো মশাই, আমি আর সেই সেকালের কচি খুকীটি নেই, আর দুদিন বাদে আমার মেয়েরই বে দেবার বয়স হয়ে যাবে। আমাকে থাতামুতো দিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা ক'রো না। ছ সাতশ কি হয়ত আরও বেশিই খরচ করছ। এখানে আনতেই তো হাজার বারোশো টাকা খরচ করেছ তুমি—আমি কি কিছু বুঝি না!'

সেই ছেলেবেলাকার মতোই চাপা কৌতুকে অরুণের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'বাবা, তোমার এত বুদ্ধি! ইস!'

'না না, হাসি-তামাশার কথা নয়। এর একটা বিহিত না হ'লে আমি অনর্থ করব বলে দিলুম। তার চেয়ে তুমি আমাকে যেখানকার মানুষ সেইখানে রেখে এসো—যা হবার তা হবে। আমার জন্যে তোমাকে ফতুর হ'তে দোব না কিছুতেই!

এবার অরুণও গম্ভীর হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে স্বর্ণর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বুঁচি, তোমার জন্যে ফতুর হ'তে না পারলে আমার ও টাকারই যে কোন দরকার নেই! কোনদিন তোমার কাজে লাগতে পারে এই ভেবেই তো আমার রোজগার করা। নইলে আর আমার কে আছে বলো! কার জন্যে টাকা। যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি তবেই যে আমার বেঁচে থাকারও সার্থকতা!...তুমি এর জন্যে কিছুমাত্র কিন্তু বোধ করো না, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না। এতে আমারই উপকার হচ্ছে, তোমার কিছু নয়!...আমার জন্যে এটুকু সহ্য করতে পারবে না তুমি?'

আর যা-ই হোক, ঠিক বোধ হয় এ উত্তরের আশা করে নি স্বর্ণ। হঠাৎ সেও যেন আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকবার পর আস্তে আস্তে হাত দুটো অরুণের হাতের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে বললে, 'ছোট কাকী একবার বলেছিল আমাকে, বিশ্বাস করি নি। অনেকদিন পরে—রেবা পেটে সাধ খেতে গেছলুম যেদিন, সেইদিন তোমার কথা উঠতে বলেছিল কথাটা। বলেছিল, "ওলো নেকী, সে আসলে তোকে ভালবেসেছিল। বোধহয় মনে ছিল, লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি করতে পারলে তোর সঙ্গে বের কথা তুলবে। তোর বে হয়ে যাওয়াতেই মনটা ভেঙ্গে গেল—একদিক পানে চলে গেল সব ছেড়েছুড়ে। আর কার জন্যে কী—এই ভাবল বোধহয়।"...আমি ছোট কাকীর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম সেদিন! আজ দেখছি আমি শুধু নেকাই নই, কানাও।...কিন্তু আজ এই মরণপানে পা ক'রে মিথ্যে লজ্জা করব না, সোজাসুজি বলছি, কী দেখে তুমি আমাকে ভালবাসতে গেলে অরুণদা, তোমার চেহারা ভাল—আর একটা দুটা পাস ক'রে যেমন তেমন চাকরিতে বসতে পারলেও কত গণ্ডা ভাল ভাল মেয়ে এসে তোমার পায়ে লুটোত। আমার মধ্যে তুমি কী এমন দেখলে!...তোমার জীবনটা আমার জন্যে নষ্ট হয়ে গেল ভাবলে যে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না অরুণদা!'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে প্রায় চুপি চুপি উত্তর দিল অরুণ, 'নষ্ট

হ'ল তা তোমাকে কে বললে, বুঁচি, এই তো কাজে লাগল। আর কী দেখলুম তোমার মধ্যে? সেও তুমি বুঝবে না। যে দেখে তার চোখ না পেলে অপরে বুঝবে কী ক'রে কে কার মধ্যে কী দেখল!'

আর কথা কথা বাড়াল না স্বর্ণ, দুই চোখ রগড়ে মুছে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

॥ ৪ ॥

ভাল ক'রে সেরে উঠতে প্রায় ছ মাস লাগল স্বর্ণর। এইটেই যথেষ্ট দীর্ঘ সময় কিন্তু অরুণ আরও দুমাস জোর করে ওখানেই রাখল। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছিলেন যে, এই সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠার কালটা অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে কাটাতে। উদয়পুর, ওয়ালটেয়ারের নামও করেছিলেন তাঁরা। স্বর্ণরও—প্রথম দিককার এই স্বর্গপুরী ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু উপায় নেই বুঝেই, সেও চুপ করে ছিল। হাসপাতালে অনেক অভিভাবক, অনেক রক্ষাকবচ আছে—অন্যত্র কে তাকে নিয়ে থাকবে? অরুণের পক্ষে দুতিন মাস একনাগাড়ে থাকা সম্ভব নয়, শোভনও নয় সেটা। ওদের কারুর এখনও দুর্নামের বয়স যায় নি।

এই সময়টুকুর মধ্যে কিন্তু অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। যদিও স্বর্ণ অনেক দিন পর্যন্ত সে খবর পায় নি। অরুণ পেতে দেয় নি—ইচ্ছে করেই। সুবিধেও হয়েছিল অনেকটা, চিঠিপত্র ওখান থেকে বিশেষ কিছু আসত না। দেবেই বা কে, দেবার মধ্যে ভুতু আর রেবাই যা দেয় মধ্যেমিশেলে এক-আধখানা। হরেন একখানাই মাত্র চিঠি দিয়েছিল এখানে—ছুটি নেবার জন্যে খুবই চেষ্টা করছে সে, পেলেই মাসখানেকের জন্যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসবে—মাত্র—এইটুকুই বক্তব্য ছিল তাতে। স্বর্ণ সে চিঠির উত্তর দেয় নি—ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার অন্তরের পাত্র ছাপিয়ে উঠেছে স্বামীর একটির পর একটি মিথ্যাচরণে—হরেনও আর লেখে নি। কিন্তু ছেলেমেয়ের চিঠিতেও এসব খবর পায় নি স্বর্ণ—অরুণ তাদের বারণ করে দিয়েছিল। যা সাংঘাতিক রোগ, উদ্বেগের কারণ ঘটলে যতটা যা এগিয়েছে আরও হয়ত বেশি পিছিয়ে যাবে।

একেবারে শেষের দিকে শুনল সব। তাও একবারে নয়, দুবারে।

স্বর্ণর শাশুড়ী মারা গিয়েছেন—সে এখানে আসার মাস তিনেক পরেই। কল-তলায় পড়ে গিয়ে নাকি তাঁর কোমরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না; মা কান্নাকাটি করাতে ছেলেরা কথা দিয়েছিল যে এক্স্-রে করে হাড় ঠিকভাবে বসিয়ে প্লাস্টার করা পর্যন্তই সেখানে রাখা হবে, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে নার্স রেখে দেবে, সে-ই দেখাশুনো করবে, কোন অসুবিধে হবে না তাঁর। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে নার্স বিরল, যদি বা পাওয়া যায়, অনেক টাকা দিতে হবে। সে টাকা কে কতটা দেবে এই ঠিক করতে করতেই কয়েকদিন কেটে গেল। হরেনই সবটা দিতে পারত কিন্তু তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পাওয়াই ভার। তাছাড়া মা যখন তার একার নয় তখন সে সবটা দেবেই বা কেন। শেষে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে কড়া চিঠি লিখতে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে হ'ল কিন্তু নার্স রাখা আর হয়ে উঠল না। বুড়ি ঝি আয়না স্বর্ণর ছেলেমেয়ের মায়া কাটিয়ে কোথাও যেতে পারে নি, সে-ই অগত্যা কিছু কিছু সেবার ভার নিলে। তার হাতে খেতেও হ'ল হরেনের মাকে—এবং দিব্যি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি যে, যে-কাপড়ে সে ময়লা পরিষ্কার করছে সেই কাপড়েই ভাত এনে তাঁকে খাওয়াচ্ছে। সে বুড়োমানুষ, ছেলেমেয়ে সামলে বারবার স্নান করা বা কাপড় কাচা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হরেনের মা প্রথম প্রথম এ নিয়ে কান্নাকাটি ছেলেদের গালিগালাজ করেছিলেন, একদিন না খেয়েও ছিলেন অনেকক্ষণ—কিন্তু কোন ছেলেই তাতে

BanglaBook.org

বিচলিত না হওয়াতে শেষে অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য বেশিদিন এ-ভোগান্তি সহ্য করতে হয় নি তাঁকে। আয়নার দ্বারা সেবার স্থূল কাজগুলো চলত, শুশ্রূষা যাকে বলে তা চলত না। সে শিক্ষা তার ছিল না, তাকে কেউ বলে দেয় নি। একভাবে শুয়ে থাকার ফলে বেড্‌সোর হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নাকি পেটও ছেড়ে দিয়েছিল। যাইহোক, খুব বেশিদিন ভুগতে হয় নি, পড়ে যাওয়ার মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই ছুটি পেয়ে গেলেন। তবে কখন যে তিনি মারা গেছেন তা কেউ জানে না, মরার সময় ছেলেদের হাতের জলও পান নি। বিকেলে চা দিতে গিয়ে আয়না দেখেছে যে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন বৃদ্ধা!

এই প্রথম খবর।

শাশুড়ী সম্বন্ধে প্রীতি বা স্নেহ থাকার কথা নয় স্বর্ণর মনে, তবু খবরটা শুনে তার কষ্টই হয়েছিল। বিশেষ করে শেষদিনগুলোর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। স্বর্ণর মন স্বাভাবিকভাবেই স্নেহপ্রবণ ও সহনশীল—তাই কখন যে সে শাশুড়ীকে ক্ষমা করেছে মনে মনে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি, এখন বুঝতে পারল। কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই এখানে—যে চোখের জল অজস্রধারায় ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে, তা নির্ভেজাল দুঃখেরই প্রকাশ।

কিন্তু আরও সাংঘাতিক খবর তার জন্যে তোলা ছিল। সেটা পেল আরও কদিন পরে, তার দুমাসের এই শেষ মেয়াদও শেষ হয়ে যাবার মাত্র দিনসাতেক আগে। অবশ্য ঘটনাটাও খুব পুরনো নয়, যদিও তার সূত্রপাত হয়েছে অনেক আগে থাকতেই। সে ইতিহাসও প্রীতিপদ হবে না বলেই তখন জানায় নি অরুণ।—স্বর্ণ চলে আসার পর আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে হরেন, মদ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আরও। কাউকে গোপন করার চেষ্টা মাত্রও করত না সেসব কথা। প্রকাশ্যেই নতুন ঝিয়ের সঙ্গে 'ঘর' করতে শুরু করে, এমন কি স্বর্ণর শাড়ি-গহনাও তাকে কিছু কিছু বার করে দেয়। ছেলেমেয়েদের বলে দেয় তাকে নতুন মা বলে ডাকতে। কিছু দিন পরে পরে, যখন সে গৃহিণীপদে বেশ কায়েম হয়ে বসেছে, যথেচ্ছ হুকুম চালাচ্ছে সকলের ওপর এবং সংসারের খরচপত্র করছে—তখন নাকি উচ্ছ্বাসের বশে আলমারী সিন্দুকের চাবিও তার হাতে তুলে দিয়েছিল হরেন। হয়ত ঠিক উচ্ছ্বাসেও নয়—মদের ঝোঁকেই দিয়ে থাকবে—তারপর ভুলে গিয়েছিল কিম্বা আর ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন মনে করে নি। সে যাই হোক, ঝিটি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করে নি, স্বর্ণর সমস্ত গহনা এবং নগদ হাজার দুই টাকা নিয়ে সে একদিন সরে পড়েছে—সঙ্গে নিয়ে গেছে জীবেনদের নতুন ছোকরা চাকরটিকে। ছেলেটা ফুট-ফুটে দেখতে, মাত্র আঠার উনিশ বছর বয়স তার। ঝিয়ের থেকে বয়সে অনেক ছোট। সম্ভবতঃ টাকার লোভ দেখিয়েই তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

হরেন তার এই নতুন গৃহিণীকে ভালবেসেছিল কিনা কে জানে, তবে তাকে বিশ্বাস করেছিল অনেকখানি—এটা ঠিক। এই ঘটনায় তাই আর্থিক ক্ষতির চেয়ে সম্ভবত অপরাধবোধটাই বেজেছিল, আত্মভিমান যা লেগেছিল। এই শ্রেণীর লোকদের বুদ্ধির অভিমানটাই প্রবল হয়, সেই অভিমানে আঘাত লাগলে মর্মান্তিক বাজে।...কারণ যাই হোক, এই নিরুদ্দেশের ঠিক দুটি দিন পরেই তার একটা 'স্ট্রোক্' হ'ল। কোন বিলিতী হোটেলে একা বসে বসে মদ খাচ্ছিল, সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। প্রথমটা মাতাল অবস্থা ভেবে নাকি তারাও অতটা খেয়াল করে নি, ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেছে। শেষে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়াতে ভয় পেয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাইতেই তবু রক্ষা, বাড়িতে পাঠালে কেউ ডাক্তার ডাকত কিনা সন্দেহ, এমনই সকলে বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

BanglaBook.org

হাসপাতালে অনেক চেষ্টায় জ্ঞান যদি বা হয়েছে, পক্ষাঘাতের ভাবটা এখনও যায় নি। সমস্ত বাঁ দিকটা অনড় অসাড় হয়ে আছে। কথাও কইতে পারছে না ভাল করে—কথা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে, খুব মন দিয়ে না শুনলে বুঝতে অসুবিধা হয়। বাড়িতে নিয়ে এসেছে এখন, জীবেনই দেখাশুনো করছে, চিকিৎসাও চলছে—তবে ডাক্তাররা আশা-ভরসা খুব একটা দিতে পারছেন না। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এই অবস্থাই এখন চলবে দীর্ঘকাল। তাও কোনদিনই একেবারে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ।...

স্যানাটোরিয়ামের মধ্যে নয়, বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে একটা পাহাড়ে-পথের ধারে ঝরা পাইন পাতার ওপর বসে শুনছিল খবরটা। সেটা অপরাহ্নকাল, সামনের পাহাড়গুলোর তলায় তলায় ইতিমধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, বহু নিচে নদীর রজতরেখাটা পর্যন্ত অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে অনেকখানি। কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না স্বর্ণর, সে চেয়ে ছিল সামনের বড় পাহাড়টার চুড়োয় তখনও যে সূর্যরশ্মিটুকু লেগে আছে—তারই দিকে। একফালি একটু রোদ একেবারে সেই চুড়োরও মাথাটায়—আর নিচে অতল গভীর রহস্যময় অন্ধকার। অন্ধকারটাকে মনে হচ্ছে তরল কোন পদার্থ, নিচে থেকে পাত্র ভরে ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠছে।

আজ প্রথম মনে হ'ল ওর, সন্ধ্যা ওপর থেকে নামে না, নিচে থেকে ওঠে। দিনের বেলা যেন সে ঐ নিচেকার গহন অরণ্যের ঝোপে ঝাড়ে ছায়ায় আত্মগোপন করে থাকে, দিনের দৃষ্টি সরে গেলেই একটু একটু করে মাথা তোলে, ভরসা পেয়ে ওপরে উঠে আসে। তা হোক, তবু সে নিচেরই জিনিস, সে সব সৌন্দর্যকে বিলুপ্ত করতে পারে, একাকার করতে পারে—তার সৌন্দর্যসৃষ্টির কোন ক্ষমতা নেই, তার কোন নিজস্ব রূপ নেই। যেটুকু দিনের আভাস এখনও প্রকাশিত রয়েছে ঐ সুদূর শিখর-চূড়ায়, তা যেমন মনোহার, তেমনি মহিমাময়। এতদূর থেকেও যেন ওর প্রতিটি পত্রপল্লবের ঝলমলানি দেখা যাচ্ছে, তাদের শাখাপ্রশাখার ছায়া আলাদা আলাদা বেছে নেওয়া যাচ্ছে।...

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল স্বর্ণ। স্বামী সাংঘাতিক অসুস্থ, হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রী—না হ'লেও চিরদিনের মতো পঙ্গু পরপ্রত্যাশী হয়ে থাকবে। ব্যথা পাবারই কথা, ব্যথা পেলও সে প্রথমটা। ওর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল তীব্র ব্যথার। বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠেছিল যেন, ইচ্ছে হয়েছিল পাখা মেলে সেই মুহূর্তে উড়ে চলে যেতে স্বামীর বিছানার পাশে। আহা, কে-ই বা তার সেবা করছে, কে-ই বা মুখে জল দিচ্ছে! উঠে বসা স্নান করা তো দূরের কথা—নিজে নিজে কিছু খাওয়ারও শক্তি নেই। প্রাকৃতিক কাজগুলোর জন্যে পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে হয়েছে, হয়ত তার জন্যে মুখনাড়া খাচ্ছে কত লোকের। তাও হয়ত শেষ অবধি কেউ করছে না ঠিক সময়ে—ময়লা মেখে পড়ে থাকতে হচ্ছে। মেয়ে করছে অবশ্য, রেবা অনেকটা ওর মতোই হয়েছে—কিন্তু তার কীই বা বয়স, সে কি গুছিয়ে করতে পারছে, রুগীর সব কন্না! শুয়ে থেকে থেকে যদি হরেনেরও তার মায়ের মতো শয্যাক্ষত হয়ে যায়! বাপ্‌ রে, অবস্থা ভাবলেই যে বুকের মধ্যেটা হাহাকার ক'রে ওঠে!...

কিন্তু সে ঐ প্রথম কিছুক্ষণই।

তারপরই একটা বিরাট ঔদাসীন্য বোধ করল ও। এমন কখনও বোধ করে নি এর আগে করবে তা কখনও ভাবে নি, নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল খানিকটা পরে।

মনে হ'ল ওর কী মাথাব্যাথা? ও-ই তো মরতে বসেছিল, এখনও সে আশঙ্কা একেবারে দূর হয়ে গেছে কিনা কে জানে, হয়ত এখনও সে মৃত্যু একেবারে ওকে ছেড়ে যায় নি, ওর দেহের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে! যেদিন একেবারে প্রত্যক্ষ মরণের সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন ওর দিকেই বা কে তাকিয়েছিল? নিষ্করুণ

BanglaBook.org

অবহেলায় নির্মম ঔদাসীন্যে শুধু নয়—মর্মান্তিক আগ্রহের সঙ্গেই সেদিন ওকে বিদায় দিয়েছিল ওর আপনজনেরা। ওকে সরাতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল যেন।...না, সংসার থেকে বিদায়ই নিয়ে এসেছে সে; সংসারও তাকে বিদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে আবার কেন? স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, এমন কি ওর ছেলেমেয়ে—সবই যেন কোন সুদূর পূর্বজন্মের কথা। এজন্মে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এ ওর নবজন্ম। সে জন্মের ঋণ সে শোধ দিয়েছে সংসারকে—কড়ায় ক্রান্তিতে। দেহপাত করে বুকের রক্ত দিয়ে—বলতে গেলে সমস্ত জীবন দিয়েই। এখন এ জন্মের ঋণটার কথাই ভাববে সে।

সে ঋণ তার সামনে বসা এই লোকটার কাছে। সাধারণ ঋণ নয়—যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার ঋণ, একাগ্র মৃত্যুজয়ী ভালবাসার ঋণ। শুধু পয়সা দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে নয়, করুণা বা অবহেলায় নয়—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, যেন যথা-সর্বস্ব পণ ক'রে লোকটা লড়াই করেছে যমের সঙ্গে, স্বর্ণর ভাগ্যদেবতার সঙ্গে। এমন নিখুঁত যত্ন এমন আন্তরিকতা কখনও দেখে নি সে, আর কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। প্রতিটি সত্তা সজাগ রেখে তার কথা ভেবেছে যেন লোকটা! শুধু তার কথাই ভেবেছে, আর কিছু নয়। অথচ কীই বা তার মূল্য, ওর কাছে সে কতটুকু। রূপবান কান্তিমান, বিত্তশালী ঐ লোকটা ইচ্ছা করলে রাশিরাশি সুন্দর মেয়ে দুপায়ে জড়ো করাতে পারে—সে জায়গায় স্বর্ণ তো কীটাণুকীট। তবুও তাকেই সর্বাগ্রগণ্য করে রেখেছে সারা জীবন, আজও সে-ই তার কাছে সর্বাধিক।

না, স্বর্ণও আর কারও কথা ভাববে না, ওর কথা ছাড়া।...

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল সে, 'তুমি অন্য কোন কথা বলো অরুণদা; ওসব কথা ভাল লাগছে না। শুনে লাভই বা কি, যে কাঠ খাবে সে আঙ্গরা বমি করবে, এ তো জানা কথা। তার জন্যে কে কী করবে আর।'

অরুণ চমকে উঠল যেন। স্বর্ণর কাছ থেকে এ উত্তর আশা করে নি আদৌ। ওর প্রাণ মমতায় ভরা, সকলের জন্যেই ওর টান—এই জানত সে। সেও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'অন্য কথা আর কি বলো! এবার তো ফেরার কথা। পরশু সোমবারের পরের সোমবার ভাল দিন আছে, সেদিন গাড়িরও ব্যবস্থা করতে পারব, সেইদিনই যাব ভাবছি। ওদিকে ট্রেনেও ঐদিন রিজার্ভ ক'রে রাখবার কথা বলে এসেছি আমার বন্ধু আর-টি-ও বচ্চন সিংকে। করে রাখবে নিশ্চয়।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে, এখান থেকে?'

খুব শান্ত, খুব সহজভাবে প্রশ্ন করে স্বর্ণ।

আবারও চমকে ওঠে অরুণ। রীতিমতো থতমত খেয়ে যায়। এ বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন কি দ্বিধার অবকাশ আছে—তা জানা ছিল না তার একেবারেই। সে হতভম্বের মতো খানিকটা তাকিয়ে থাকে স্বর্ণর মুখের দিকে, তারপর আমতা আমতা করে বলে, 'কেন—বাড়ি?...মানে, বাড়ি ফিরবে তো এবার?'

'বাড়ি!' একবার মাত্র শব্দটা উচ্চারণ করে চুপ করে যায় স্বর্ণ আবার। তারপর তার কটা চোখের স্থিরদৃষ্টি অরুণের চোখের ওপর রেখে আগের মতোই শান্ত সুরে বলে, 'আগে বোকা ছিলুম বলে বুঝতে পারি নি—এখনও বোকা, তবু মোটা কথাগুলো বুঝতে পারি। আমার জন্যেই তুমি জীবনটা মাটি করলে—এখনও আমার জন্যে জীবনপাত করছ। তুমি আমাকে ভালবাসো—সেটা লুকিও না। আমি জানি, এখন পরিষ্কার সব দেখতে পাই। তুমিই আমাকে ভালবাসো শুধু এ পৃথিবীতে—আন্ত্রিক ভালবাসা—এমন ভাল কেউ আমাকে বাসে নি! কেউ কোনদিন এমনভাবে আমার কথা ভাবে নি তোমার মতো। আমিও আর কারও কথা ভাবব না। কেন ভাবব, সে আমি তো মরেই গেছি। আমাকে মরা বাঁচিয়েছ তুমি,

BanglaBook.org

এখন তোমারই ষোল আনা জোর।...বাড়ি বলো ঘর বলো—আমার কাছে সবই এখন তুমি।...তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চলো। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার ঝিগিরি করলেও আমার সুখ। আর ঘর করতে চাও—সে আমার ভাগ্যি বলে মানব।'

শুনতে শুনতেই বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল অরুণের মুখ, এখন এই সায়াহ্নবেলার পাহাড়ি শীতেও তার ললাটের কোলে কোলে ঘাম দেখা দিল। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার—কাঁপছে বুকের মধ্যেও। সে বার-দুই মুখ খুলতে চেষ্টা করল কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না গলা দিয়ে।

কী বলবে তাও বোধহয় বুঝতে পারল না। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা, এ অকল্পিত সৌভাগ্যে তার বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই। এ কি সত্যিই স্বর্ণ বলছে কথাগুলো—না আর কেউ? না কি তার এতদিনের নিভৃত স্বপ্নই ভুল শোনাচ্ছে তাকে—তার নিজের কলুষিত কামনা?...মাথার মধ্যে এমন ক'রে সব তালগোল পাকাচ্ছে কেন? বুকের মধ্যেই বা কিসের ঢেউ এসব? সে কি এবার পাগল হয়ে যাবে নাকি?...

'কী হ'ল, কথা কইছ না যে? বাক্যি হরে গেল নাকি তোমার? নাকি আমার সঙ্গে ঘর করতেই সাহসে কুলোচ্ছে না? রোগটা এখনও সারে নি ভাবছ?...বেশ তো বাপু, না হয় তোমার ঘরে ঢুকব না, কাছে যাব না, দূর থেকেই সেবা করব। তোমার কাছে—তোমার বাড়িতে থাকতে পারলেই আমার ঢের।'

না, ভুল হয় নি তার কিছুমাত্র। ঠিকই শুনেছে অরুণ। জীবন ধন্য হয়ে গেছে তার। আশার অতীত সিদ্ধি মিলেছে, এ জন্মের সাধনা শেষ হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

এবার কথা বলতে পারল সে। তার মানসিক অবস্থার পক্ষে আশ্চর্য রকম শান্তভাবেই বলল, 'তোমার অসুখের ভয় আমার একটুও নেই স্বর্ণ।...অসুখ তোমার সেরে গেছে—ডাক্তাররা সমস্ত রকম পরীক্ষা করে দেখেছেন।...আর না সারলেও সে ভয় আমার নেই, কোনদিনই ছিল না। তোমাকে পেয়ে, তোমার জন্যে মরেও আমার সুখ।...সে কথা নয়, আমি ভাবছি তোমার কথাই!'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না আর। দোহাই তোমার!...এবার একটু নিজের কথাটা ভাবো দিকি!'

'কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আর কোন কথাই যে নেই ভাববার মতো।...তুমি যা দিতে চাইছ—একদিনের জন্যেও যদি তা সম্ভব হ'ত—তা হ'লে আর কোন দুঃখ থাকত না আমার জীবনে, সেই মুহূর্তে মরে গেলেও আমার সুখ ছিল। কিন্তু তোমার এতটুকু দুঃখের কারণ ঘটিয়ে স্বর্গসুখও আমার বিষ লাগবে যে!'

'আমার দুঃখুটা তুমি আবার এর মধ্যে কোথায় দেখলে তাই শুনি! এ তো আমি স্বেচ্ছাসুখে যেতে চাইছি তোমার সঙ্গে। বাড়ির কথা বলছ—আমার আবার বাড়ি কোথায়? ও বাড়ি তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়ে বেঁচেছে। তারা তো আমাকে চায় নি—অসুখটা হ'তে শিঁটিয়ে ছিল সবাই। সকলে নিজের কথা ভেবেছে, আমার কথাটা কেউ ভেবেছে কি? এক তুমিই ভেবেছ! ওদের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি?...তাছাড়া যার জন্যে বাড়ি—তার সঙ্গেই তো সম্পক্ক ঘুচে গেছে! তার নাম শুনলে এই গলা অবদি বিষে তেতো হয়ে যায় সবটা।...না, ও বাড়িতে আর আমি যাবো না।'

'কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে? তাদের কথাটা ভাবছ না কেন?'

প্রশ্নটা করে শান্তভাবেই—কিন্তু সমস্ত প্রাণটা যেন তার ঔৎসুক্যে আগ্রহে—কী একটা ঐকান্তিক আশায় তার ঠোঁটের কাছে এসে অপেক্ষা করতে থাকে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে।

'ছেলেমেয়ে!'

BanglaBook.org

একমুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায় যেন স্বর্ণ। আর সেই মুহূর্তকালের নীরবতাতেই নিজের বিপুল আশা ও অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুদণ্ড শুনতে পায় তার সামনের ঐ লোকটি। আর কিছু শুনতে চায় না অরুণ, আর কিছু শোনবার প্রয়োজনও থাকে না। তার উত্তর সে পেয়ে গেছে।

কিন্তু স্বর্ণ তখনই আবার কথা শুরু করে, কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়েই যেন বলে, 'ছেলেমেয়েও তো তার। আমার দাদামশাই বলতেন, বংশ তো নয় বেউড় বাঁশের ঝাড়। বেউড় বাঁশের ঝাড়ে বেউড় বাঁশই ফলে। বেইমানের ঝাড়ের কথা ভেবে আমার ইহকাল পরকাল খোয়াতে গেলুম কী দুঃখে? ওদের কথা আর আমি ভাবব না। এই কমাসে ভুলেই তো গেছি, আর কেন?...আমি মরে গেলেও যা হ'ত এখনও তাই হবে। বড় হবেই একরকম ক'রে। যাদের ঝাড় তারাই দেখবে। আমি গেলেই কি আর মানুষ করতে পারব?'

'তা হয় না স্বর্ণ!' বুকের সে ঢেউ-ওঠা বন্ধ হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের বাদশাহী ঘুচে গেছে চিরকালের মতো। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে যে আশাটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে এখন ঠাণ্ডা মাটির নিচে সমাধিস্থ। সহজ স্বাভাবিক সুবুদ্ধি, দূর-দৃষ্টির পথ অবারিত হয়েছে আবার মাথার মধ্যে। তাই বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই কথাগুলো বলতে পারল অরুণ, 'তা হয় না স্বর্ণ। তোমার ছেলেমেয়ে তোমারই। যে ঝাড়ই হোক তোমারই রক্তমাংস দিয়ে তৈরি তারা। তাদের কথা আজ না ভাবো—দুদিন পরে ভাবতেই হবে। তাদের ভোলা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। দায়িত্বও অত সহজে এড়াতে পারবে না!'

'আমি ম'লে—তাদের কী হ'ত? তারা কি বাঁচত না—না বড় হ'ত না?

'বড়ও হ'ত—বাঁচতও। কিন্তু তুমি ম'লে তাদের মাথা হেঁট হ'ত না, চিরদিনের মতো একটা লজ্জা একটা কলঙ্কের বোঝা চাপত না।...ছেলেমেয়েদের এত বড় সর্বনাশ আর নেই; মায়ের নাম মুখ উঁচু ক'রে যদি না বলতে পারে—তাহলে জীবনটাই তাদের মাটি হয়ে যাবে। নিজের সন্তানরা চিরকাল অভিসম্পাত করতে থাকবে—এ কি তুমি সইতে পারবে? আর সে শাস্তি কেনই বা দেবে তুমি তাদের, তারা তো এখনও পর্যন্ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করে নি। তুমি ম'লে তোমার স্মৃতি তারা পূজো করত, অন্তত করবার চেষ্টা করত, তোমার নামটার সঙ্গে হয়ত একটা ব্যথাও জড়ানো থাকত তাদের মনে—কিন্তু এতে তো তোমাকে শুধু ঘেন্নাই করবে তারা। সে তুমি কি সইতে পারবে? আজকের এই অভিমানের মিথ্যে পর্দাটা যখন থাকবে না তখন তুমিই সেখানে ফিরে যাবার জন্যে মাথা কুটবে, অথচ সে পথ তখন বন্ধ হয়ে যাবে তোমার কাছে চিরকালের মতো। ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো কথাটা।'

'সে যা-ই হোক, 'তোমার মুখ চেয়ে সব সইতে পারব।'

পাগলের মতো একটা ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলে কথাগুলো, বলতে বলতেই তার দুচোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে ওঠে।

'কিন্তু আমি কার মুখ চেয়ে তোমার সে দুঃখ সইব বলো। তোমার মুখ চেয়েই তো আমি আছি। তোমার সুখেই আমার সুখ। তাছাড়া তুমিও সে পারবে না। আমার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাবোধ এখন বলছ কথাগুলো—কিন্তু এ সাময়িক। সন্তানের সঙ্গে যোগ চিরকালের—নাড়ির, আত্মার। সে অত সহজে অস্বীকার করা যায় না।...যখন সে ব্যথা জাগবে মনে, অথচ যখন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার পথ থাকবে না, তখন আমিও তোমার কাছে বিষ ঠেকব।...এ-কূল ও-কূল দুকূলই যাবে তোমার।'

'তাহলে—তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না—তুমি, তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে!'

আর্তনাদের মতো শোনায় প্রশ্নটা, হাহাকারের মতো মনে হয়।

আর সে হাহাকার উচ্চতর হাহাকারেরই সৃষ্টি করে শ্রোতার মনে, সে আর্তনাদ ব্যাকুলতার প্রতিধ্বনি তোলে। স্বর্ণর এ হাহাকার সাময়িক কিন্তু ওর মনের এ হাহাকার বুঝি কোনদিনই শান্ত হবে না।

BanglaBook.org

বর্তমানের লোভ বড় বেশি। মনে হয় এই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা শুধুই মূঢ়তা। দূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের এ স্বর্গ হারানোর কোন অর্থ নেই। তবু বিচলিত হয় না অরুণ, লোভ জয়ই করে। কারণ ভবিষ্যৎটা সুদূর হ'লেও স্পষ্ট—অন্তত তার কাছে। সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে উত্তর দেয়, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করি নি স্বর্ণ, তোমাকে ত্যাগ করা মানে ইহজন্মই ত্যাগ করা। কিন্তু আমি জানি, তুমি এখন যেটা ভাবছ দুদিন পরে সেটা ভাববে না, আজকের এ ঝোঁক যখন কেটে যাবে তখন আমাকেই তুমি দুষবে। অভিমানের কুয়াশাটা কেটে গেলে নিজের মনের চেহারাটা তুমি দেখতে পেতে, যেটা আমি পাচ্ছি। তাই এত বড় সৌভাগ্য মেনে নিতে ভয় পাচ্ছি, এ দুর্লভ বরও মাথা পেতে নিতে পারছি না।...তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও স্বর্ণ, আমি জানি শুধু ছেলেমেয়ে নয়—স্বামীর টানও তোমার কম নেই। হরেনবাবু তোমারই মুখ চেয়ে আছেন—তাঁর সেবা তোমাকেই করতে হবে। কর্তব্য বলে নয়—তুমি চাও বলেই। স্বামীর প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রতি সব কর্তব্য শেষ ক'রে—ছেলের বৌ যেদিন অপমান করবে, সেদিন সব দেনা-পাওনা শোধ ক'রে আমার কাছে চলে এসো। ততদিন পর্যন্ত এমনি আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষা করব।'

'ততদিন যদি বাঁচি—তবে তো। বাঁচলেও সে তো বুড়ি হয়ে যাবার কথা। তুমিও তো বুড়ো হয়ে যাবে!'

'হোক না। তখনই আমাদের বেশি দরকার হবে পরস্পরকে। দুজনে কোন তীর্থে চলে যাবো। তখন তো আর কোন কলঙ্কের ভয় থাকবে না!'

চুপ ক'রে যায় স্বর্ণ। কিন্তু তার দুটি চোখের কোল বেয়ে কূল ছাপিয়ে অজস্র জল ঝরে পড়তে থাকে ধারায় ধারায়। মনে হয় তার এ কান্নার বুঝি শেষ হবে না। সে দিক থেকে প্রাণপণে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে অরুণ।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বলে স্বর্ণ, প্রায় চুপি চুপিই বলে—যেন কতকটা নিজেকে শুনিয়েই, 'কিন্তু সেখানে গিয়ে কি আর টিকতে পারব? মনের অগোচর পাপ নেই—তোমার কাছে লুকোতেও পারব না—আমিও যে তোমাকে এ কমাসে ভালবেসে ফেলেছি অরুণদা। মানুষকে ভালবাসলে ভোলা যায়—দেবতাকে ভালবাসলে সে ভালবাসা আর ফেরানো যায় না। তুমি দেবতা—তোমাকে যে মন দিয়েছি সে মন যে তোমারই সঙ্গে থাকবে। সেখানে গিয়ে যদি তোমার কথাই ভাবি—পাপ হবে না? তুমিই বলে দাও না, কী ক'রে থাকব সেখানে?'

'হয়ত পাপ হবে, হয়ত কষ্ট হবে—তবু আমার জন্যে না হয় সেটা সইলেই, আমার ঘরে এলে আরও বেশি পাপ হ'ত, আরও বেশি কষ্ট হ'ত।...আমার মন তো এতকাল ধরে তোমার কাছে পড়ে রয়েছে, তাতেও তো আমি কাজকর্ম সব ক'রে গেছি। দেবতা আমি নই স্বর্ণ, মানুষই। মানুষ বলেই—এইমাত্র যে কথাটা বললে তাতে আমার মন ভরে গেছে, আমার এতদিনের ভালবাসা সার্থক হয়েছে। নাই বা পেলুম তোমার রক্তমাংসের ঐ শরীরটাকে, সে আশা তো করিও নি কখনও—তোমার মনটা যদি পেয়ে থাকি সে-ই আমার বড় লাভ। তুমি আমাকে সুখী করেছ—এই জোরেই তুমি সংসারে থাকতে পারবে। আমি তোমাকে অহরহ সেই আশীর্বাদই করব আজ থেকে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে পাহাড়ের শিখরেও। অন্ধকারে সব যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়, আর কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট ক'রে। আকাশের তারাগুলো জ্বলে শুধু মাথার ওপরে, তারই একটা অস্পষ্ট আভা এসে পড়ে ওদের মুখেচোখে।

পকেট থেকে টর্চটা বার ক'রে অরুণ বলে, 'চলো এবার ফিরি। দেরি হয়ে গেছে—হাসপাতালের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত। তোমারও ঠাণ্ডা লাগছে।'

BanglaBook.org

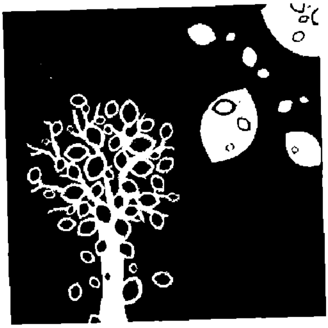

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাই পেড়েছিলেন কথাটা। নইলে কারও মাথাতেই যেত না হয়ত। বলাইয়ের নিজেরও না। তিনিই একে-ওকে বলে মেয়ে ঠিক করেছিলেন। পাড়ারই মেয়ে বলতে গেলে। এ পাড়াতে নতুন এসেছে ওরা। বাড়ি করে উঠে এসেছে নিবড়ের দিক থেকে। মেয়েটাও একেবারে ফেলনা নয়, পরিপূর্ণ সংসার ওদের, পাঁচ ভাইয়ের বোন। তার মধ্যে তিন ভাই-ই—সামান্য সামান্য হ'লেও—রোজগার করে। মেয়েও শ্যামবর্ণের ওপর মন্দ দেখতে নয়, তেরো-চোদ্দ বছর বয়স, বলাইয়ের সঙ্গে মানাবেও দিব্যি।

এ-সম্বন্ধ পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন তিনি। ছোট মেয়ে, সহজে পোষ মানবে—নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারবেন। আরও ভেবেছিলেন—যার কোন আয়ই নেই, এক পয়সা রোজগার করে না, সে অন্তত তেজ দেখিয়ে বৌকে নিয়ে আলাদা হ'তে পারবে না।

বেশ ভেবেচিন্তে হিসেব করেই এ কাজে এগিয়েছিলেন। মেয়ে তারা সহজে দিতে চায় নি। জরদ্গব মূর্খ ছেলে, তার হাতে তাদের একটা বোন—তুলে দিতে যাবে কোন দুঃখে? শ্যামাই সেখানে বসে পাঁচজনকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন, বিয়ে হ'লেই তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব বলাইয়ের নামে উইল করে দেবেন। বাড়ি তাঁর—ইচ্ছে হ'লে ওরা দলিল দেখে আসতে পারে—তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে কেনা। সুতরাং যথেচ্ছ দান-বিক্রয়ের অধিকার তাঁর আছে।

পাড়াতে এসে পর্যন্তই কঞ্জুষ সুদখোর বুড়ির ঐশ্বর্যের সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী শুনেছে তারা! এও শুনেছে যে ঐ মা-বাপ-মরা নাতিকে তিনিই বুকে করে মানুষ করেছেন। সুতরাং ওকে যথাসর্বস্ব দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ছেলের পৈতৃক বাড়ি-ঘরও আছে—বিনা মেরামতে বাড়িটা ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু বাগান-পুকুর-জমি কোথায় যাবে! সব দিক বিবেচনা করে তারা রাজি হয়ে গিয়েছিল।

বিয়েও কতকটা বিয়ের মতোই হয়েছিল। হেম-কনকরাও এসেছিল। দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে গেছে। তাদেরও পীড়িত বিবেক সান্ত্বনা লাভ করেছিল। মা একা থাকেন—তাদের যখন কারও এসে থাকবার উপায় নেই-ই—তখন এছাড়া আর পথ কি? তাছাড়া—তারা ভেবেছিল—ঘাড়ে চাপ পড়লে যাহোক একটা রোজগারের চেষ্টাও করবে।

শ্যামাই খুশি হয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি।

কিন্তু বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোহ ভঙ্গ হ'ল তাঁর। বৌ ছেলেমানুষ কিন্তু মনের মতো করে গড়ে নেবার মতো মানুষ নয়। যেমন জেদ তার তেমনই তেজ। বিয়ের আটটা দিন কোনমতে মুখ বুজে ছিল, মাসখানেক পরে ঘর করতে এসেই নিজ মূর্তি ধরল। প্রথম দিন বাসন মাজার কথা বলতেই সোজাসুজি বলে দিল, 'বাসন-টাসন মাজতে পারব না আমি, ওসব আমার অব্যেস নেই, হাতে লাগে।'

BanglaBook.org

অগত্যা তাকে রান্নাঘরে লাগালেন শ্যামা। কিন্তু সেখানেও হুলস্থুল বেধে গেল। পাঁচ ছটাক তেলে পনেরো দিন রান্না হয় তাঁর—মালতী এক বেলাতেই তার অর্ধেক খরচ করে ফেলল। তাছাড়াও ফেলে-ছড়িয়ে একাকার কাণ্ড। শ্যামা ঠাকরুন ব্যাপার দেখে বকে চেঁচিয়ে কেঁদে-কেটে হাট বসিয়ে ফেললেন একেবারে। মালতী কিন্তু গ্রাহ্যও করল না। বরং বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিল, 'ওসব ডেয়ো-ডোকলার মতো রান্না আমার দ্বারা পোষাবে না। যে পারে সে করুক!'

পরের দিন রান্নায় না দিয়ে অন্য কাজে টানবার চেষ্টা করলেন শ্যামা, 'নাৎবৌ একবার আমার সঙ্গে বাগানে চল্ তো ভাই, হাতাপিতি করে পাতাগুলো কুড়িয়ে আনি।'

কিন্তু প্রস্তাব মাত্র বেঁকে দাঁড়াল নাৎবৌ, 'কেন, আমরা কি ভিখিরী যে পাতা কুড়িয়ে খেতে হবে? ঘরে দালানে গুচ্ছের পাতা রয়েছে সাপ-বিছের বাসা হয়ে...ঐগুলোই বরং লোক ডাকিয়ে ফেলিয়ে দিন!'

আরও খানিকটা চেঁচামেচি করলেন ওর দিদিশাশুড়ী, কিন্তু মালতী গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ওঁর অনুযোগ অভিযোগ বকুনির কোন জবাব দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করল না।

তবু খুব সহজে হাল ছাড়েন নি শ্যামা। আর দুদিন থাক, যখন বুঝবে যে এই ঘর করা ছাড়া গতি নেই তখন আপনিই ঠাণ্ডা হবে—ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। মিষ্টি কথায় আদর করে কাছে টানবারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুদিন না যেতেই জ্ঞান-নেত্র তাঁর ভাল করে উন্মীলিত হ'ল। বুঝলেন এ-মেয়ে সেই ভবীদেরই একজন, যাকে কোন পরিমাণ তেলসিঁদুরেই ভোলানো যায় না। বসে বসেই খাচ্ছে এসে পর্যন্ত। কিন্তু তাতেও সে তুষ্ট নয়। সে শুধু বসে খেতেই চায় না, ভাল খেতেও চায়। দু-একদিন সামান্য সামান্য নাক-তোলার পর একদিন সটান ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'রোজ রোজ এই থোরসড়সড়ি আর শুষুনি শাকের ঝোল দিয়ে খেতে পারব না আমি। রাত্তিরেও শুকনো কড়কড়ি ভাত খাওয়া আমার পোষাবে না, এই সাফ্ বলে দিলুম।'

'ইঁঃ—কণ্ঠে একটা বিচিত্র সুর বার করেন শ্যামা, তাঁর আর সহ্য হয় না, 'খেতে পারব না! নবাবনন্দিনী এলেন একেবারে! তোর দাদারা কটা মাছের মুড়ো রোজ খাওয়াত শুনি!'

'মুড়ো না খাওয়াক—ডাল তরকারী তো দিত। আর অমন ঠাণ্ডা কড়কড়ি ভাতও খেতে হ'ত না।'

'যা যা—তাই খেগে যা সেখানে। আমার কাছে ওসব নবাবী চলবে না।'

'কেন যাব! বসিয়ে খাওয়াবে বলে কি তারা বিয়ে দিয়েছে। তোমরা আমাকে খাওয়াতে বাধ্য!'

'খাওয়াতে হবে বলে কি কালিয়া-পোলাও খাওয়াতে হবে নাকি! যা জুটবে তাই খাওয়াব!'

'যা জোটে তাও তো খাওয়াও না। ছিষ্টি বেচে দাও কেন! বাড়িতে যা হয় তাও তো রাঁধতে পারো। অত পয়সার আহিঙ্কে কেন! এত পয়সা কে খাবে তোমার। কার জন্যে তাংড়াও? ম'লে তো আমরাই খাব, না হয় জ্যান্তেই খেলুম কিছু!'

শ্যামা এবার ক্ষেপে যান একেবারে, 'য়্যা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বসে বসে আমার মরণ টাঁকছ হারামজাদী!...এক পয়সা দোব না তোদের। পথের ভিখারীকে দিয়ে যাব তবু তোদের দোব না!'

'ইস! দেবে না বৈকি! সকলের সামনে সত্যি করেছিলে মনে নেই? পাঁচ ভাইয়ের বোন আমি, তাদের সঙ্গে চালাকি করেছ শুনলে তারা তোমাকে জ্যান্তে পুঁতবে এই বলে দিলুম।

BanglaBook.org

টাকা পাব বলেই তো তোমার ঐ মুখ্খু নাতির হাতে দিয়েছে—নইলে এই পাত্তরে কেউ মেয়ে দেয়!'

এরপর শ্যামা যা কাণ্ড করেন তা ঐন্দ্রিলাকেও হার মানিয়ে দেয়। মালতীও দমবার মেয়ে নয়—ভাতসুদ্ধ থালা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে যায় সে। ফলে শ্যামা আরও চিৎকার করতে থাকেন, মাথা খোঁড়েন, ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেন। কিন্তু তাতে মালতীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সে সারাদিন না খেয়ে পড়ে থাকে, রাত্রে বলাই কাছে টানতে গেলে তাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়।

ফলে বলাইয়েরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। সে মানসিক গঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে, জন্তুর মতোই বড় হয়ে উঠছে শুধু। জৈব প্রবৃত্তিগুলো সেই ছাঁচেই ঢালা। বেশিক্ষণ মিনতি করা তার ধাতে পোষাল না, সেই ঠাঁই ঠাঁই করে গোটাকতক চড় কষিয়ে দিল মালতীকে। মালতীও তার হাতের ওপরে প্রচণ্ড এক কামড় দিয়ে রক্ত বার করে দিল, তারপর ঘরের এবং বাড়ির দোর খুলে সেই অন্ধকার রাত্রেই একছুটে বাপের বাড়ি চলে গেল।

ওর দাদারা অবশ্য তিরস্কার করল খুব। বলল, 'এতগুলো টাকা, বুড়ি আর কদিন, কটা মাস মানিয়ে চলতে পারলি না?

দুষ্টু ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে মালতী বলল, 'অমন পয়সার মুখে আগুন! না খেয়ে যদি মরেই গেলুম তো পয়সা ভোগ করবে কে'?

পরের দিনই সকালে ওর বড়দা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চাইলেন, বুঝিয়ে বলতে গেলেন ওর ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু মালতী বলল, 'আমি আজই তাহ'লে ওদের ঐ পুকুরের জলে ডুবে মরব—মরব মরব মরব, এই তিন সত্যি করলুম। পুবের সুয্যি পশ্চিমে উঠলেও আমার কথার নড়চড় হবে না।'

কথাটা শ্যামার কানে উঠতে তিনি বললেন, 'ভালই হ'ল আমাকে আর খ্যাংরা মেরে তাড়াতে হ'ল না।...এক মাসের মধ্যে যদি নাতির আর একটা বিয়ে না দিই তো কি বলেছি!'

কিন্তু বলাই সেই এক মাসের ভরসাতেও থাকতে পারল না। যে বাঘ নররক্তের স্বাদ পেয়েছে, বেশিদিন নররক্ত না পেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওর কর্মহীন জীবনে—পশুধর্মের তাগিদটাই সর্বপেক্ষা প্রবল। সে কোনমতে পাঁচ-ছটা দিন কাটাবার পর আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। দিদিমাকে না জানিয়েই সোজা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

শালাদের তরফ থেকে অবশ্যই অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হ'ল না কিন্তু মালতী কঠিন হয়ে রইল। তার এক প্রতিজ্ঞা, বলাই যদি ও-বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করে, মানুষের মতো নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে—তবেই মালতী তার ঘর করবে, নইলে এইখানেই ইতি।

বলাই অবাক হয়ে গেল প্রথমটায়। ওর সম্বন্ধে এ আশা কেউ করে তা ওর ধারণার অগোচর। সে অনেক অনুনয় বিনয় করল, পায়ে হাতে ধরতে গেল—কিন্তু মালতী ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতোই অনমনীয় কঠিন হয়ে রইল। শেষে বলাই বলল, 'আমাকে কে কাজ দেবে? আমি তো কিছুই জানি না।'

'সে আমরা বুঝব। তুমি রাজি আছ কি-না তাই বলো।'

রাজি না হয়ে বলাইয়ের উপায় ছিল না।

মালতী তাকে পৈতে হাতে নিয়ে দিব্যি গালিয়ে তবে ছাড়ল। বলাই আর সেদিন ও-বাড়ি ফিরল না। পরের দিনও না—আর কোনদিনই না। শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করতে লাগল পাকাপাকি ভাবে।

BanglaBook.org

শ্যামা প্রথম দিনটা একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। যে কখনও বাড়ি ছেড়ে বাগানে পর্যন্ত বেরোয় না, তার এ অন্তর্ধান চিন্তার কথা বৈকি!

কিন্তু সারারাত জেগে বসে থাকার পর ভোরবেলা যখন খবর পেলেন (একই পাড়ায় দুই বাড়ি—খবর পাওয়ার বিশেষ কোন অসুবিধা নেই) যে বলাই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠেছে এবং সেখানেই রাত্রিবাস করেছে, তখন কোন চেঁচামেচি করলেন না, কোন গালমন্দও দিলেন না, শুধু তাঁর মুখের রেখাগুলো আগেকার মতোই কঠিন হয়ে উঠল।

এইটেই তাঁর চরিত্রের স্বধর্ম—এ ক'দিন যে চেঁচামেচি গালিগালাজ করেছেন সেটা তাঁর বয়োধর্ম-জনিত বিচ্যুতি। সে ক্ষণিকের দুর্বলতা চলে গেছে, বিভ্রান্তিমূলক হয়ে তিনি স্ব-স্বভাবে ফিরে এসেছেন আবার। খবরটা যে এনেছিল তাকে খুব শান্ত-কণ্ঠেই বললেন, 'বাঁচা গেল দুগ্‌গার মা। এবার নিশ্চিন্তি হলাম একেবারে। সব বন্ধনই তো খসে গিয়েছে, ঐটে শুধু পায়ের বেড়ির মতো আটকে বসে ছিল। তা আপনি আপনি যে খসে গেল, লাথি ছুঁড়ে জোর ক'রে খসাতে হ'ল না—সেই ভাল। নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলুম।'...

শালাদের চেষ্টায় দিন পাঁচেক পরেই শিবপুরের দিকে কোথায় এক মারোয়াড়ীর কারখানায় চাকরি হয়ে গেল বলাইয়ের। ছোট কারখানা, খাটুনি বেশি মাইনে কম। যতদিন না কাজ শেখে ভাল করে—মাত্র একটাকা রোজ, তাও ছুটির মাইনে নেই। 'আন্‌স্কিল্‌ড্ লেবার' ঠিকে হিসেবে নেওয়া হয়েছে—ওদের নাকি রবিবারের ছুটিও পাওনা হয় না। রোজ পাঁচ ছ'মাইল হেঁটে যাতায়াত—লোহাপেটা কাজ, সর্বপ্রকার কর্মে অনভ্যস্ত বলাই পারে না, তার চোখে জল এসে যায় কাজ করতে করতে—রাত্রে ফিরে মড়ার মতো এলিয়ে পড়ে—তবু মালতীর দয়া হয় না। সে বলে, 'এক টাকাটা আড়াই টাকা হতে বেশি দেরি হবে না। আর খাটুনি? প্রথম প্রথম অমন কষ্ট সকলকারই হয়—দু'দিনেই সয়ে যাবে। পুরুষমানুষ খাটবে না তো কি?'

তারপর চুপি চুপি বলে, 'ভাবছ কেন, বুড়ি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? এতদিন তবু ভাবছিল তুমিই খেতে না পেয়ে ফিরে যাবে। এবার চাকরি করার খবর পেয়েছে, কেঁদে এসে পড়ল বলে—দুচারদিনের মধ্যেই। আসুক না, ওর কাছ থেকে মোটামুটি কিছু টাকা বার ক'রে নিয়ে এপাড়ায় তোমাকে একটা দোকান করে দেব। বুঝলে বোকারাম?'

কথাটা বলাইয়েরও মনে লাগে। মনে হয় এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। এক-ফোঁটা মেয়ের বুদ্ধি দেখে প্রশংসায় তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু দেখা গেল বলাই বা মালতী কেউ কিছুমাত্র চিনতে পারে নি শ্যামাকে। শ্যামা কেঁদে এসে পড়লেন না—দু'চারদিনে তো নয়ই—দু'চার মাসেও না। এদিকে বলাইয়ের পক্ষে সে চাকরি রাখা সম্ভব হ'ল না। কোনমতে একটা সপ্তাহ বেরিয়েছিল, তারপর আর কিছুতেই গেল না। মুখ গোঁজ ক'রে বলল, 'ও ভূতের খাটুনি আমার দ্বারা হবে না। আমি মরে যাব। তার চেয়ে তোমরা আমাকে এখানেই কেটে ফেল, সেও আমার ভাল!'

শালাদের উপদেশ অনুরোধ যুক্তি, মালতীর শাসন—কোনটাতেই কোন ফল হ'ল না। মালতী কথা কইল না দু'দিন, ওর ঘরে শুতে গেল না। তবুও বলাই চুপ ক'রে বসে রইল ঘরে। মালতী রাগ করে বলল, 'ওকে খেতে দিও না। কাজে না গেলে খাওয়া নেই। দেখি উপোস ক'রে কতদিন থাকতে পারে, যেমন কে তেমনি'

কিন্তু শালাশালাজদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। একে জামাই তায় ব্রাহ্মণ, উপবাসী অভুক্ত পড়ে থাকবে বাড়ির মধ্যে আর তাঁরা খেয়ে বসে থাকবেন? শেষে শালারাই উদ্যোগী হয়ে

BanglaBook.org

একজনকে মধ্যস্থ ক'রে পাঠালেন শ্যামার কাছে। যা হবার হয়ে গেছে, হাজার হোক বালক তো বলতে গেলে—তিনি ওকে মাপ করুন, কিছু টাকা দিয়ে বরং একটা দোকান ক'রে দিন, দু'পয়সা রোজগার করতে শিখুক! এখানেই এসে থাকবে, বৌও মাপ চাইবে তাঁর কাছে।

শ্যামা বললেন, 'দিতে হয়—আমাকে ছেড়ে যাদের মুরুব্বির ধরতে গেছে—তারাই দিক। আমি এক আধলা দেব না। আমি জানি আমার সে নাতি মরে গেছে। সে পরিচয় ধরে যদি কেউ এবাড়ি ঢোকার চেষ্টা করে মুড়ি-খ্যাংরা মেরে তাড়াব।'

তখন অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে বলাইয়ের পৈতৃক সম্পত্তি বেচিয়ে সেই টাকায় ওকে একটা ছোটখাটো মুদির দোকান করে দেওয়া হবে। ও সম্পত্তি থেকেই বা লাভ কি, পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে, বাড়ির জানালা-কপাটগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাচ্ছে পাড়ার লোকে। মালতীর বড়দা তবু একবার বললেন, 'জমিগুলো বেচে দাও বরং, ভিটেটা থাকুক, সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে ওরাই গিয়ে বসবাস করতে পারবে।' মালতী রাজি হ'ল না তাতে। সে একবার এর মধ্যে গিয়ে দেখে এসেছে সে বাড়িঘর। সে বললে, 'হ্যাঁ,—তা আর নয়। ঐ নিবান্দাপুরীতে আমি একা গিয়ে বাস করি আর চোর-ডাকাতে গলাটা কেটে দিয়ে যাক। চোর-ডাকাতে না কাটলেও ভূতে ঘাড় মটকাবে এটা তো ঠিক। সেই বুড়ি, ওর ঠাকুমা না কে, সে ঐ বাড়িতে পেত্নী হয়ে আছে, পাড়াসুদ্ধ সবাই দেখেছে। ওকে যদি দোকান ক'রে দাও, ও তো সে কোন্ ভোরে বেরিয়ে আসবে আর রাত-দুপুরে ফিরবে, আমি একলা ঐ হানাবাড়িতে কার ভরসায় থাকব শুনি?'

সুতরাং সবসুদ্ধই বেচে দেওয়া হ'ল। জলের দামেই একরকম। পাশের বাড়ির দত্তরা কিনলেন। অন্য লোককে বেচলে হয়ত আরও কিছু দাম পাওয়া যেত, কিন্তু কাগজপত্র কোথায় কি আছে, জমির সীমানা চৌহদ্দি কি, কেউ জানে না। পাঁচ ভূতে চেপে বসে আছে দখল ক'রে অনেক জায়গা। মামলা-মোকদ্দমার ফের, বেশি দাম দিয়ে বাইরের লোক কিনবে কেন? তবু যা পাওয়া গেল সেই টাকার মধ্যে থেকেই মালতীর বড়দা তাঁদেরই জমিতে নিজস্ব মাটির ঘর একখানা তুলে দিলেন, আর বাকি টাকাতে এই পাড়াতেই একটা মুদির দোকান খুলে বসল বলাই।

বলা বাহুল্যে সে দোকান মাস চার-পাঁচের বেশি টেকে নি। যে কিছুই জানে না সংসারের, তার পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। হিসেব ক'রে দামটা পর্যন্ত নিতে পারত না বলাই। দুনিয়াসুদ্ধ লোককে বাকি দিয়ে বসে রইল, সে-টাকার কিছুই আদায় হ'ল না! সুতরাং আবারও যে তিমিরে সেই তিমিরে। এদিকে ততদিনে মালতীর একটি মেয়ে হয়েছে। দাদারা চিরকাল বোনের সংসার টানতে পারবেন না—আকারে ইঙ্গিতে ভাল ক'রেই জানিয়ে দিলেন এবার। দাদাদের যদি বা বোন সম্বন্ধে দুর্বলতা ছিল, বৌদিদের ছিল না। বড় বৌদি তো স্পষ্ট বললেন একদিন, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! তেজ দেখিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছিল, তখন হুঁশ ছিল না?...যার তেজে তেজ মেয়েমানুষের—সে মানুষটা কেমন তা ভেবে দেখা উচিত ছিল। ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ তো ছেলেমানুষের মতো থাকে না কেন! দাদাদের কথা শোনা উচিত ছিল না তখন?...বুড়ি দিদিশাশুড়ী, অন্যায় দেখেছে বকেছে—তাতেই আর ঘর করা চলল না?...আমরা শ্বশুরঘর করতে এসে কি রকম উঠতে-লাথি বসতে-ঝ্যাঁটা খেয়েছি—চোখে দ্যাখে নি?'

এবার মালতী সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখল। পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন—এই আশ্বাসেই এতদিন এত জোর দেখিয়েছে, সেই ভাইরা এভাবে সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেবে তা ভাবে নি কোনদিন। মুখে যাই বলুক, সত্যি সত্যিই কিছু না খেয়ে থাকা যায় না।

BanglaBook.org

অবশেষে তারই তাড়নায় বলাই এসে একদিন শ্যামার পায়ে ধরতে গেল, 'আমাকে মাপ করো, আমি না বুঝে অন্যায় ক'রে ফেলেছি!'

শ্যামা হাসলেন একটু। সে হাসি দেখে—কিছু না বুঝেও বলাই শিউরে উঠল। এমন নিরানন্দ কঠিন হাসি সে আর কখনও দেখে নি। শ্যামা বললেন, 'মাপ করেছি আমি অনেকদিনই। তবে যদি মনে করে থাকো যে দয়া ক'রে এসে মাপ চাইলেই আমি গলে যাব আর এরে-বেরে তোমাকে আর তোমার মাগকে ঘরে তুলব—সেটা তোমার মস্ত ভুল। আর না। আর কোনদিনই না। চৌকাঠ যেদিন ডিঙ্গিয়েছ সেইদিন থেকেই সব সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে। নিজে বিষয় বেচেছ, আলাদা ঘরও তুলেছ শুনেছি—নিজের সংসার নিজেই চালাও যেমন ক'রে পারো। কোন সহায় সম্বলই ছিল না আমার, মেয়েছেলে হয়ে যদি এতগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পেরে থাকি, তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে পারবে না?'

এই শেষ আশা ছিল বলাইয়ের, খুবই একটা ভরসা ছিল। মালতীও বুঝিয়েছিল তাই, কেঁদে গিয়ে পায়ে পড়লে ফেলতে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু এতকাল এই মানুষের সঙ্গে ঘর করেছে বলাই, যত মূর্খই হোক, শ্যামার ভাবভঙ্গী ভাল ক'রেই চেনে। তাঁর মুখের রেখায় এবং গলার আওয়াজে বুঝল যে খুব সহজে কিছু হবে না এখানে। তার মনে হ'ল সত্যি-সত্যিই বুঝি তার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, অতল অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। সে কেঁদে ফেলল এবার, দিদিমার পা দুটো চেপে ধরে বলল, 'তবে আমার কি হবে, কোথায় দাঁড়াব?'

আস্তে আস্তে পা ছাড়িয়ে নিয়ে শ্যামা বললেন, 'এখানে আর কিছু হবে না তা আমি পরিষ্কারই বলে দিচ্ছি। তোমায় ও বৌকে আমি এবাড়ির বেড়া পেরোতে দেব না। ওদের ছেড়ে তুমি থাকতেও পারবে না। যদি বা জায়গা দিই দু'চারদিন পরেই তুমি আবার পালাবে। এবার হয়ত কিছু হাতিয়ে পালাবে। সুতরাং সেও আমি রাখব না। খেটে খাওয়াও তোমার দ্বারা হবে না। যা হবে তা বলে দিচ্ছি—তুমি ভিক্ষে ধরো!'

প্রথমটা বুঝতেই পারে নি বলাই। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বসে ছিল শ্যামার মুখের দিকে। তারপর বিহ্বল ভাবে কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছিল শুধু। 'ভিক্ষে ধরব? মানে ভিক্ষে করব আমি?'

'আর কি করবে বলো? কি জান! লেখাপড়া শেখো নি যে আপিসে চাকরি করবে, গতর নেই যে কারখানায় গিয়ে লোহা পিটবে কিম্বা মোট বইবে—তাও তো বেয়েচেয়ে দেখেছ শুনেছি, বুদ্ধির জোরও এমন নেই যে ব্যবসা ক'রে খেতে পারবে। সে যারা পারে তারা দু'টাকা একটাকা পুঁজি নিয়েও নিদেন রাস্তার ধারে বসে তেলেভাজা ভেজে সংসার চালায়। ওর কোনটাই তোমার দ্বারা হবে না। যা হবে, যা পারবে তাই বললুম, এখন শোনা না শোনা তোমার মর্জি। বামুনের ছেলে ছেঁড়া জামার মধ্যে দিয়ে পৈতে দেখিয়ে রেলগাড়িতে ভিক্ষে ক'রে বেড়াও, তোফা চলে যাবে। ঐ ক'রে শুনেছি কত লোক দু-পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে ফেলেছে।'

তবু বলাই তখন উঠতে পারে নি। অত সহজে হাল ছাড়লে তার চলবে না বুঝেই আবারও পায়ে ধরতে গিছল, 'এবারটির মতো আমাকে মাপ করো, বাড়িতে থাকতে না দাও—কিছু টাকা ধার দাও, আর একবার চেষ্টা করি দোকান করবার!'

'বেশ তো, সে তো ভাল কথা। উত্তম কথা। কী গয়না আনবে আনো, কত টাকা চাই তাও বলো। সুদ কিছু চড়াই লাগবে। সেই মতো সোনা হাতে রাখব আমি। বুঝে-সুঝে সোনা এনো!'

'সোনা—?' বিহ্বলভাবে বলে, 'সোনা কোথায় পাবো?'

BanglaBook.org

'তবে কি তোমাকে শুধু হাতে টাকা দেব ভেবেছ? কেন, টাকা রাখার আমার জায়গা নেই? কারবার ক'রে তুমি আমার দেনা শোধ করবে সেই ভরসায় টাকা ধার দেব তোমাকে এখনও সেরকম ভীমরতি আমাকে ধরে নি।'

তারপরই নিজ মূর্তি ধরেন, 'সরে পড়ো দিকি বাছা, মিছে বকিও না বসে বসে। আমার এখন ঢের কাজ আছে। উঠে পড়ো, গুটি-গুটি পথ দ্যাখো!'

সেই শেষ। বলাই আর আসে নি। আসতে সাহস হয় নি তার। মালতী রেগে বলেছিল, 'তুমি মনিষ্যি না কি? হাতটা মুচড়ে ধরলে ঐ বুড়ির দম্ভযি থাকত কোথায় তাই শুনি! কেড়ে-বিগড়ে নিয়ে আসতে পারলে না কিছু টাকা? নিজের নাতিকে পুলিশে দিতে তো পারত না!'

'হ্যাঁ, তবেই চিনেছ ওকে। ও সব পারে। জেলে দিয়ে ছাড়ত আমাকে তা'হলে। ওসব আমি পারব না। ও যা পাজি, নিজে মরে গিয়ে খুনের দায়ে আমাকে ফাঁসি দেওয়াতে পারে।'

সম্ভাবনাটা মনে করেও যেন শিউরে ওঠে বলাই।

তারপর দুজনেই চুপ করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেমে আসে একটা অসহনীয় নীরবতা। সেদিন আর কারুরই কিছু খাওয়া হয় না। স্ত্রীর কঠিন মুখভাবের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস হয় না বলাইয়ের—আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু আর কিছুই পারে না। তার ভাগ্যের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা জড়িয়ে তার এই সর্বনাশটা করল—এটুকু বোঝে, শুধু তার কি প্রতিকার ভেবে পায় না। এদিক ওদিক থেকে—বড় মাসীর বাড়ি থেকেই বেশির ভাগ—দু-টাকা এক টাকা চেয়ে আনে। বড় মামাকে চিঠি লেখে—কিন্তু কোথাও থেকে এমন কিছুই পায় না—যাতে দু এক দিনের বেশি সংসার চলে। সুতরাং দিদিমার উপদেশ শোনা ছাড়া কোন উপায়ও থাকে না কিছু।

॥ ২ ॥

ঐন্দ্রিলা খুব সহজে মেয়ের বাড়ি আসতে চায় নি। সে জানত যে সীতার এখানে এসে ওঠা মানে একটা পেট চালাবার বাড়তি খরচ তার ঘাড়ে চাপানো তো বটেই—সামান্য যেটুকু আয়ের পথ ছিল সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাওয়া। বলতে গেলে যে পরের দোরে ঝাঁট দিয়ে পরের কন্না ক'রে পেট চালায়, ভিখিরীর মতো সতীন-পোদের পুরনো কাপড় চেয়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করে, তার মাথার ওপর এই বোঝা চাপাতে ইতস্তত করেছে সে শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু ক্রমশ আর উপায় রইল না। বহু দোর ঝাঁট দিয়েছে সে-ও, বহুদূর ঘুরেছে এই ক বছরে। চেনা জানা—তাদের চেনা তাদের চেনা, এই ভাবে শেকলের গ্রন্থি ধরে ধরে সম্ভব অসম্ভব যত যোগাযোগ করতে পেরেছে—সব জায়গাতেই সে কিছুদিন কিছুদিন কাজ করেছে। বোধ করি তার দুষ্টগ্রহের জন্যই টিকতে পারে নি কোথাও। এক এক জায়গা থেকে এক এক কারণে চলে আসতে হয়েছে। কিছুদিন পর পরই অসহায়ভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। কেউই তাকে বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি, কেউই তাকে ধরে রাখতে চায় নি।

কেবল একজন ছাড়া।

সেই তাঁর কাছেও গিয়েছিল সে। বছর খানেক পরেই গিয়েছিল। সে সময়টায় মাসখানেকেরও ওপর কোন চাকরি ছিল না, পুরনো মনিববাড়ি ঘুরে ঘুরে শুধু সামান্য পুঁজিই শেষ হয়ে গিয়েছিল—চাকরি বা চাকরির আশ্বাস মেলে নি কোথাও। তার মধ্যেই শুনতে পেল—নাতির টাইফয়েডের মতো হয়েছে, পয়সার অভাবে কোন চিকিৎসাই হয় নি,

BanglaBook.org

পাড়ার কোন্ ভদ্রলোক বই দেখে কী ওষুধ দেন হোমিওপাথী গুলি—তারই ভরসায় পড়ে আছে। এ খবর পেয়ে আর থাকতে পারে নি—লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিসর্জন দিয়ে কোলাঘাটের গাড়িতেই চড়ে বসেছিল আবার।

কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। শুধু ধার-ক'রে আনা গাড়ি-ভাড়াটাই খরচ সার হয়েছিল। গোরুর গাড়িতে করে বেলা দুটো নাগাদ অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় সেই বাড়ির সামনে নেমে দেখেছিল কতকগুলো অপরিচিত ছেলেমেয়ে বাড়ির সামনে খেলা করছে। আগে ভেবেছিল—ডাক্তারবাবুর নাতিরা কেউ হবে। কিন্তু তারপরই মনে পড়েছিল, তাঁর ছেলে বা মেয়ে কারুরই সন্তানসংখ্যা খুব বেশি নয়। তাছাড়া তাদের এমন দীন বেশভূষা হবে না।...তখনই বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছিল, তার ওপর যখন একটি আধ-ময়লা কাপড় পরা কালোমতো মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে গা বাছা, তোমাকে চিনতে পারলুম না তো?' তখন বেশ কিছুক্ষণ সে কোন উত্তর দিতে পারে নি। তারপর অনেক কষ্টে শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'ডাক্তারবাবু? এখানে যে এক ডাক্তারবাবু ছিলেন—?'

'ওমা, তিনি তো কবে মারা গেছেন! তাঁরই ছেলের কাছ থেকে তো এই বাড়ি আমরা কিনেছি। তা সেও তো আজ আট ন মাস হয়ে গেল। তুমি তাঁর কে হও গা বাছা? এত দূরে গাড়ি ভাড়া ক'রে একেবারে এসে হাজির হয়েছ অথচ এতদিনের মধ্যেও খবরটা পাও নি!'

উত্তর দেওয়া কঠিন। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আরও কঠিন মনে হয়েছিল ঐন্দ্রিলার। কোনমতে থতিয়ে থতিয়ে বলেছিল, 'আমি অনেকদিন বিদেশে ছিলুম, শরীরও ভাল ছিল না, চিঠিপত্তর লিখতে পারি নি, আমাকেও কেউ লেখে নি।'

ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়ই মঙ্গলা এসে পড়েছিল। সেদিন হাটবার, সে হাটে যাচ্ছিল। অনেকটা দূর চলেও গিয়েছিল। সেইখান থেকেই গোরুর গাড়ি থামতে দেখে পিছন ফিরেছিল—কতকটা অলস কৌতূহলেই। কিন্তু তারপরই চিনতে পেরেছিল ঐন্দ্রিলাকে। সে পড়ি কি মরি ছুটেছিল আলের পথ ধরে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেছিল, 'ওমা, বামুনদি যে এতকাল পরে! কোত্থেকে এলে গা এমন ভাবে! বেশ মানুষ যা হোক বাপু! কী খোঁজাটাই না খুঁজেছি। এতদিন পরে মনে পড়ল আমাদের কথা! চলো চলো আমার ঘরে বসবে চলো—'

সে ভদ্রমহিলার সন্দেহ তবু যায় নি। তিনি বলেছিলেন, 'তুই এঁকে চিনিস তাহলে? কে রে মঙ্গলা? ডাক্তারবাবুর কে হন?'

'ওমা—চিনি না! ডাক্তারবাবুর অসুখের সময় এসে কী কন্নাটা করেছিলেন। ডাক্তারবাবুর নিজের মেয়ের মতোই।'

এই সামান্য মিথ্যা কথাটুকুর জন্যে মঙ্গলার কাছে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা বোধ করে ঐন্দ্রিলা। যদিও সে মিথ্যার অলীক স্বর্গটুকু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সে মহিলা আবারও বলেন, তবু রক্ষে!...আমি বলি সেই শেষের দিকে নাকি ডাক্তারবাবুর কে-এক ঢেম্‌নি জুটেছিল—তিনিই বুঝি এলেন এতকাল পরে সোহাগ কাড়াতে!'

মঙ্গলা আর দাঁড়াতে দেয় নি ঐন্দ্রিলাকে, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নিজের ঘরে। বলেছিল, 'ওসব এঁটো কথায় কান দিও না বামুনদি। ডাক্তারবাবু তো মরলেন এখানে একা, মরবার সময় সেই আমি যা-ই ছিলুম তাই তবু মুখে একটু জল পড়েছিল। কিন্তুক মরবার পর শোক করার নাম ক'রে বিষয় সামলাতে এসে পাড়া ঘরে বাপের ছেরাদ্দ সপিণ্ডিকরণের কিছু আর বাকি রেখে যায় নি তো ছেলেমেয়েরা। ধন্যি তোমাদের ভদ্দরনোকদের ঘরের কাণ্ডকারখানা। আমরা ছোটনোক বটে, তবু সত্যি হ'লেও বাপমায়ের নামে এমন কুচ্ছো আমরা মুখে আনতে পারি না—বিশেষ তেনারা গত হবার পর। ছি ছি!'

BanglaBook.org

মঙ্গলাই যাহোক ক'রে একটু খাওয়ার যোগাড়ও ক'রে দিয়েছিল। বলেছিল, নিজেই দুটো ফুটিয়ে মুখে দাও যেমন ক'রে হোক। মুখ তো শুকিয়ে আমসি পারা হয়ে উঠেছে। ঘরে মিষ্টিফিষ্টি কিছু নেই, থাকার মধ্যে মুড়ি আর গুড়। তা বাপু সে আর তোমাদের খেয়ে কাজ নেই—আমাদের তো আর তত এঁটোকাটার বিচের নেই, জেনেশুনে বামুনের বিধবাকে ওসব খাওয়াতে পারব না। এ নতুন হাঁড়ি, নতুন ইঁট পেতে দিয়েছি—দুটো সেদ্ধপক্ক ক'রে নাও, আমি চট্ ক'রে ওদের বাড়ি থেকে একটুকু নুন তেল চেয়ে এনে দিচ্ছি।'

এত হাঙ্গামা তখন করার ইচ্ছা ছিল না, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই করতে হয়েছিল। কিছু না খেলে আবার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত শরীর বইবে না বলেই। খাওয়া কেন-মুখে জল দিতেও ইচ্ছে করছিল না তার। দেহ মন দুইই ভেঙ্গে পড়েছে এক দিক্‌চিহ্নহীন হতাশায়। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়, নিজের এই অদূর এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা ছাপিয়েও যেটা মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে—সেটা হচ্ছে নিরতিশয় আত্মগ্লানি। অমন দেবতার মতো মানুষটাকে বুঝি সে-ই মেরে ফেলল। তিনি কিছুই চান নি তার কাছে, উপকারের কোন মূল্যই দাবি করেন নি। শেষকাল অবধি ভিক্ষার মতো করে চেয়েছিলেন, সে শুধু কাছে থাকুক। তার জন্যে ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন, এমন কি মানসম্ভ্রম, দুর্নামের ভয়ও ত্যাগ করেছিলেন। দিনরাত পরিশ্রম করে, রাত জেগে, রাশি টাকা খরচ করে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এতখানি স্নেহের কী মূল্যই সে দিল!...একটা মিথ্যা দম্ভ—সতীত্বের একটা অকারণ আস্ফালন দেখাতে গিয়ে তাঁর বুকে সে চরম শেল হানল। আস্ফালন ছাড়া কী বলবে সে, তিনি যা মানুষ ছিলেন—আর কোনদিন কোন দুর্বলতা প্রকাশ করতেন না, বুক ফাটলেও মুখ ফুটত না। ঐন্দ্রিলা স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেলেও তিনি পিছিয়ে যেতেন। সেটুকু ঐন্দ্রিলা বুঝেছিল, চিনেছিল তাঁকে। অথচ আজ এখানে থাকলে সীতারও কোন অভাব থাকত না, নাতিটাও মানুষ হ'তে পারত। তিনি তো সীতাকে এখানেই আনিয়ে নিতে বলেছিলেন, জমিজমা বাড়িঘর সব লিখে দিতে চেয়েছিলেন!

মঙ্গলা বললে, 'তুমি চলে যাবার পর, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না বামুনদি, মানুষটা যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে গেল। খুব একটা ঘা খেয়েছিল ভেতরে ভেতরে। খাওয়া-দাওয়া তো ছেড়ে দিলে একেবারে। আমাদের পেড়াপীড়িতে শুধু বসত একবার থালার সামনে ঐ পর্যন্ত। তাই কি দিনেরাতে দুবার বসানো যেত! যা করে ঐ একবার দিনান্তরে...কোথাও যেত না, শুধু চুপ ক'রে বসে থাকত বিছানার ওপরে। ঘরের বাইরেই বেরোতে চাইত না। অত সাধের ডাক্তারি, তা-ই ছেড়ে দিলে। লোক হাতে পায়ে ধরত এসে, হেজ্জা-হিজ্জি করত। তা ঐ এক কথা, আমার শরীর ভাল নেই, আমি পারব না আর। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা—আমি মরে গেছি ধ'রে নাও।...ঐ হালচাল দেখেই আমি বুঝেছিলুম যে বেশিদিন আর নয়, দিন থাকতেই বলেছিলুম ছেলেমেয়েদের খবর দিই, তারা এসে পড়ুক। তা বলে, না—কিছুতেই না। যতদিন আমার জ্ঞান থাকবে ততদিন দরকার নেই। তারা সুখে থাক, শান্তিতে থাক। তুই পারবি নি আমার মুখে একটু জল দিতে এ কটা দিন? আমি বলি, তা পারব নি কেন, তবু ছেলে বলে একটা কথা। তা তার জবাবে বলে, ঐ টেবুলের ওপর পোস্টকাট লেখা আছে, যেদিন আমার বাক্যি হরে যাবে, আর চোখ খুলতে পারব নি, সেইদিন ঐ পোস্টকাটখানা ডাকে দিস।...তাই দিয়েছিলুম, কিন্তুক ওমা, সে ছেলেমেয়ে—জামাই, সেই শালা বাবু এসে আমার ওপর কী টাঁইশ। কেন আগে খবর দেওয়া হয় নি! পেরথমে কোন জবাব দিই নি—শেষে আর থাকতে পারলুম নি, বললুম—তোমরা কে বাপু, তোমাদের তো দেখি নি কোন দিন, চিনিও নি। যাকে চিনতুম, যাকে দেখেছি এতকাল তারই হুকুম তামিল করেছি। বলেছিল একশোবার, বাক্যি হরে

গেলে চিঠি দিস, তাই দিইছি।...আর আমি তো বাছা তোমাদের ভিটেবাড়ির পেরজা নই, আমাকে চোখ রাঙ্গাচ্ছ কিসের জন্যে তাই শুনি! আমি তোমাদের কাছে অত কৈফেয়ৎ দিতেই বা যাব কেন?...বাপের ওপর যদি এতই টান—এতকালের মধ্যে খবর নাও নি কেন বাছা কোনদিন? কৈ, কখনও তো একবার উঁকি মেরেও উদ্দিশ নিতে দেখি নি!...এমনি খুব ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠতে তবে চুপ ক'রে গেল—'

শুনতে শুনতে ঐন্দ্রিলার বজ্রাহতের মতো শুকিয়ে যাওয়া চোখেও যেন ভাদ্রের বন্যা নামে। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মতো। অনেকক্ষণ পরে, খানিকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তারা—তারা এসে আর দেখতে পায় নি বুঝি?'

'না। সেইরকমই ইচ্ছে ছিল যে তেনার। পই পই ক'রে বলে রেখেছিল।...ওরা এসে পৌঁছল যখন, তখন দুপহরের বাসি মড়া হয়ে গেছে। আমাকে বলে রেখেছিল যখন বুঝবি আর বেশি দেরি নেই, তখন তুই-ই একটু মুখে জল দিস আর ভগবানের নাম শোনাস। ভয় পাস নি, লজ্জা করিস নি—তুই-ই আমার যথার্থ মেয়ে। তা আমি শুনিয়েও ছিলুম! যতক্ষণ শ্বাস ছিল ততক্ষণ ভগবানের নাম করিছি বসে বসে।'

তারপর একটু থেমে, একটু ইতস্তত ক'রে বলেছিল, 'বাক্যি হরে যাবার একদিন না দুদিন আগে আমাকে বলছে কি, মরবার আগে যদি আর একবার তাকে দেখতে পেতুম তো কোন দুঃখু থাকত না রে। একবার যদি ভুল ক'রেও এসে পড়ত!...বড্ড ইচ্ছে ছিল—। এই অবধি বলে আর রা কাড়ে নি, চুপ ক'রে গিয়েছিল। তবে নাকি কথাটা বলতে বলতে, থেমে যাবার পরও অনেকক্ষণ পজ্জন্ত—হাতের সেই বড় শীল-আংটিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল কেবল।...একবার খুলেও ফেললে হাত থেকে, আবার কী মনে ক'রে পরে নিলে। তা আমার কেমন পেত্যয় হ'ল, আংটিটাই বোধহয় তোমাকে দেবার ইচ্ছে ছিল, লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারল নি। তাই পরানটা যেমনি বেরিয়ে গেল অমনি আমি সেটা খুলে নিজের ঘরে রেখে গেলুম। যদি কোন দিন এসে পড়ো কি ঠিকানা পাই—এই ভরসায়। তা যাই হোক, এসেও গেলে তো বাপু, তেনারই টানে বোধ হয়।...এখন মনে হচ্ছে ভালই করেছিলুম, ওদের হাতে পড়লে আর উপুড়-হাত করত নি। এই তাই কথা তুলেছিল একবার, হাতে আংটির দাগ রয়েছে—সে আংটি কোথায় গেল? নিহাৎ সকালে আমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখেছিল—বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলে নি। চামার, সব চামার।...এখানে সাতখানা গেরামের লোক বাবুকে দেবতার মতো মান্যি করত, এতকাল কাটল এখানে—তা এখানে ছেরাদ্দ না শান্তি না কিচ্ছু না, একটা কাঁধকাট পজ্জন্ত খাওয়ালে নি। তাড়াহুড়ো করে মালপত্তর আদ্দেক বেঁধে সরে পড়ল। বাড়ি-জমিও সব ঐখেনে বসে বেচেছে, এদিক মাড়ায় নি।...ছেদ্দা তো সব কত—ব্যাটা ব্যাটার বৌ তো জুতো খটখটিয়ে এল জুতো খটখটিয়ে চলে গেল—নিতান্ত শ্মশানে গিয়ে জুতোটা একবার খুলেছেল এই যা। তাও বোধহয় সে জুতো নষ্ট হয়ে যাবার ভয়েই—'

আরও বহু কথা বলেছিল মঙ্গলা। সেসব কথা ঐন্দ্রিলা শোনেও নি ভাল করে। শুনতে পারে নি। দু চোখের জলে তার দৃষ্টিই শুধু ঝাপ্‌সা হয়ে যায় নি—কোনও যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঝাপ্‌সা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ বর্তমানও—তার সমগ্র চৈতন্য, সমস্ত জীবন। তারই অদৃষ্ট আর তারই দুর্বুদ্ধি নইলে অমন মানুষের অমন মতিভ্রম হবে কেন, আর সে-ই বা অত তেজ দেখিয়ে অত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন। এখানে আর দুটো মাস থাকলে তার কী এমন ক্ষতি কী এমন অধঃপতন হ'ত। অথচ তা থাকলে আজ তার ভাবনা কী? যা-খুশি সে আদায় ক'রে নিতে পারত—চিরজীবনের মতো মেয়ের আর তার হিল্লে হয়ে যেত। এমন ক'রে আর পরের দোরে লাথিঝাঁটা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে হত না

তাকে। এখন আর কিছুই রইল না। আশা ভরসা সহায় অবলম্বন—আপনজন বলতে কেউ কোথাও রইল না আর! এতদিনের জীবনে স্বামী ছাড়া আর যে একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী পেয়েছিল সে—তাকে নিজে হাতেই মেরে ফেললে। দুঃখের শেষ তার হবে না ইহজীবনে কোনদিন—তা সে খুবই বুঝেছে কিন্তু এ অনুশোচনারই কি শেষ হবে?

সেইদিনই সেখান থেকে চলে এসেছিল ঐন্দ্রিলা কোনমতে একটু কিছু মুখে দিয়েই। মঙ্গলা বলেছিল দুটো চারটে দিন তার ওখানেই থেকে আসতে, সে প্রবৃত্তি আর তার হয় নি! যেখানে সে সর্বময়ী কর্ত্রী ছিল সেখানে দীনদুঃখিনী আশ্রয়হীনার মতো দাসীর ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে ইচ্ছা করে নি তার! তা ছাড়া ফেরার গাড়ি-ভাড়া তার কাছে পুরো নেই, সেটাও লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়ে মঙ্গলার কাছ থেকেই চেয়ে নিতে হবে যখন– তখন আবার কদিন তার ঘাড়ে চেপে "ভুক্তিধ্বংসে" লাভ কি? দেওয়ারই সম্পর্ক বরং তার, সেখানে হাত পেতে সামান্য কিছু নেওয়াও অপমানের। সে অপমান যত কম সইতে হয় ততই ভাল।

তারপরও বহুদিন বহু জায়গায় ঘুরেছে। বেশ ক বছরই। কোথাও বাসা বাঁধতে পারে নি আর। কোথাও কিছু সুবিধা হয় নি। একান্ত অসময়ে ডাক্তার-বাবুর প্রায় বারো আনা ওজনের আংটিটা হাতে এসে পড়েছিল। তাঁর সে শেষ স্মৃতিচিহ্ন, তাঁর পরম স্নেহের এবং বোধ করি ঐকান্তিক প্রেমের নিদর্শন সেই উপহার–সেটা দুদিনও কাছে রাখতে পারে নি ঐন্দ্রিলা। কলকাতায় ফিরেই বেচতে হয়েছে, নইলে হয়ত নাতিটাকে বাঁচানো যেত না। মেয়েকে পনেরোটা টাকা পাঠিয়েও নিজের হাতে কিছু ছিল– তাইতেই কটা দিন তবু এদিক ওদিক ঘুরে আশ্রয়ের চেষ্টা করতে পেরেছিল। মানুষটা মরেও তার চরম দুঃসময়ে একান্ত কাজে লাগল।

কিন্তু সে টাকাও গোনা-গাঁথা। একদিন তাও ফুরোল আবার। অথচ কোন ব্যবস্থাই কোথাও করে উঠতে পারল না। চাকরি দু-একটা যে না পেলে তা নয়—কিন্তু দু-মাস চার মাসের বেশি রাখতে পারলে না কোনটাই। এতদিন শত্রুতা করেছে গ্রহ, তার ভাগ্য। এবার শরীরও পিছনে লাগল! হয়ত ঐ বিরূপ গ্রহেরই চরম মার। কিন্তু সে মার আর ঠেকাতে পারল না কিছুতেই। শরীর আর বইল না একেবারেই। নানা রোগে ধরেছে, তার মধ্যে পেটের গোলমালটাই প্রধান। এর শুরুও আজ নয়–ভাল হজম হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরেই, এবার সে গোলমাল প্রবল আকার ধারণ করল। হাতে পা ফুলতে লাগল, পেটটা বড় হয়ে উঠল। অর্থাৎ উদুরীর লক্ষণ। শেষ যেখানে চাকরি পেয়েছিল–জয়নগরে, সেখানে মনিবরা বেগতিক দেখে হঠাৎ একখানা রিকশা ডেকে মালপত্র চাপিয়ে ওকেও তাতে তুলে দিলে। রিক্‌শাওয়ালাকে ভাড়া আগাম দিয়ে বলে দিলে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে। এত দ্রুত এবং এত আচমকা ঘটল ব্যাপারটা যে ঐন্দ্রিলা রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়ে হ্যাঁ-না কিছু বলতেই পারল না। অভিভূতের মতোই গাড়িতে গিয়ে উঠল। অবশ্য আগেকার মতো ঝগড়া করার শক্তিও ছিল না তার, গলার শির ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গাল-মন্দ দিয়ে পাড়া মাথায় করবে—সে ক্ষমতা একেবারেই চলে গেছে ভুগে ভুগে। তাছাড়া এটা সেও বুঝল যে, ওদের বিশেষ দোষও নেই। পয়সা খরচ করে লোক রাখে লোকে দরকারের জন্যেই, অথচ ঐন্দ্রিলা এই চাকরিতে ঢুকে পর্যন্তই সন্ধ্যার দিকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছে, বাড়ির লোককে রেঁধে নিতে হচ্ছে প্রায় সম্পূর্ণই। সকালেও অসুবিধা কম নয়, এখানে অফিসের ভাত দিতে হয় ভোরবেলা–সাতটার গাড়ি না ধরলে অফিস করা যায় না–কিন্তু সেও পেরে ওঠে না সে। বাড়ির পুরুষরাই যদি নিত্য ভাতে ভাত খেয়ে অফিসে যায় তো রাঁধুনী রেখে লাভ কি ....

ওখান থেকে প্রায় রিক্ত-হস্তে ধুঁকতে ধুঁকতে যখন মেয়ের বাড়ি এসে দাঁড়াল এন্দ্রিলা,

BanglaBook.org

তখন তার অবস্থা দেখে সীতা চীৎকার করে উঠল। কী মড়ার দশা হয়েছে তার অমন সুন্দরী মায়ের। অমন যে রঙ, তাও যেন পুড়ে তামার বর্ণ হয়ে গেছে। হাত পা নলি-নলি অথচ হাত-পায়ের পাতাগুলো ফুলো ফুলো পেটটা ঢাক। মেঘের মতো এক ঢাল চুল-সামনের দিকে তার আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই-সব চুল উঠে টাক পড়ে গেছে, পেকেও গেছে অর্ধেক।

কেঁদে ফেলল ঐন্দ্রিলাও। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, তোর কাছেই মরতে এলুম রে এবার, যা হয় ক'রে একটু ঠাঁই দে–নইলে কি সত্যি সত্যিই রাস্তায় পড়ে মরব?'

'ছি ছি, অমন কথা বলতে নেই। চুপ করো, চুপ করো। চলো, ঘরে গিয়ে একটু বসবে চলো আগে।' তখনকার মতো সান্ত্বনা দিয়ে নিজের ঘরে এনে তুলল বটে। কিন্তু মনের মধ্যে বিশেষ বল পেল না সীতা। তার অবস্থা আগেকার চেয়েও একটু অসহায় হয়ে উঠেছে। সতীন-পোরা যখন সবাই এক সংসারে ছিল, তখন ভূতের মতো খেটে, বৌদের মন যুগিয়ে নিজের অবস্থা অনেকটা স্থিতিস্থাপক করে নিয়েছিল, যা হোক এতটু আধিপত্যের মতোও হয়েছিল। এখন তারা সব ভিন্ন হয়ে গেছে, পৃথক পৃথক সংসার। একজনের ভাগে পড়া ছাড়া উপায় নেই। অনেক ভেবে সে মেজ সতীন-পোটিকেই বেছে নিয়েছিল। তার সংসার কম কিন্তু বৌটিও তেমনি অকর্মণ্য। তার তরফেই আগ্রহ বেশি ছিল। কিন্তু যেখানে ত্রিশ-বত্রিশজনের পাতা পড়ে, সেখানে দুটো লোকের খাওয়া কেউ টেরও পায় না, পাঁচ-ছনের মধ্যে দুজন অনেক খানি। তাদের খরচটা চোখে দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই বেশ একটু সংকুচিত হয়ে থাকতে হয় সীতাদের। অবশ্য ছেলের পড়াশুনা বা কাপড়জামা বাবদ অন্য সতীন পোরাও কিছু কিছু সাহায্য করে–তবে তা নিয়মিত কিছু নয়, পাঁচবার চাইলে একবার পাওয়া যায়। তার ওপর ভরসা নেই কোন। এক্ষেত্রে আশ্রিতের সংখ্যা দুজনের সঙ্গে আরও একজন যুক্ত হলে এরা কি বলবে–সবসুদ্ধই খোয়াতে হবে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি রইল না সীতার।

প্রথম দু-চার দিন অবশ্য কিছুই বলেন নি কেউ, বরং বড় সতীন-পো উদ্যোগী হয়ে পাড়ার এক ভদ্রলোককে ধরে একটু হোমিওপাথী ওষুধের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। পুরনো চাল মানকচু প্রভৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পথ্যের জন্যে, নিজের সংসার থেকে।

কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে দেখা গেল মেজবৌয়ের মুখ ভার-ভার। আরও দুদিন পরে মেজকর্তা কার্তিক সীতাকে ডেকে মার কুশল প্রশ্ন করে উপদেশ দিলেন, 'বৌমা, এসব চিকিচ্ছেয় কিছু হবে না, দিদিমাকে যদি বাঁচাতে চাও তো তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও যেমন করেই হোক। ওখানে কাছাকাছি বড় হাসপাতাল আছে– নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্তি, ওষুধপত্তর সবই পাবে, পাস করা ডাক্তার আছে-কোন ভাবনাই থাকবে না। এখানে এমনভাবে ফেলে রাখলে বাঁচবেন না উনি। এ তো মনে হচ্ছে পুরোনো উদুরী– ভাল রকম চিকিচ্ছের দরকার।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, না বোঝবার কোন কারণ নেই। কিন্তু বুঝেই বা উপায় কি? দুশ্চিন্তায় যেন নিমেষে ঘেমে উঠল সীতা, মাথা হেঁট করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'মা যে যেতে চায় না সেখানে মোটে, তাছাড়া মামারাও তো কেউ নেই, সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়েই বা যাবে কে? দিদ্‌মা সেসব পারবে না।'

কার্তিক ভ্রূ কুঁচকে জবাব দেয়, 'তোমার দিদ্‌মা তো এধারে ডোকলা সেধে সেধে এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে ঘুরে বেড়ান-সুদের তাগাদা দিয়ে দিয়ে। তোমার মা-ই বলেছেন সে-কথা। পোদড়া, শালিমার, শিবপুর পর্যন্ত হেঁটে পাড়ি দেন। মেয়েকে মৌড়ীর হাসপাতালে

BanglaBook.org

নিয়ে যেতে পারবেন না? তাছাড়া তোমার একটা বোনপোও তো থাকে না ওখানে?'

'তার কথা ছেড়ে দিন–সে এক জন্তু! সে বাড়ি থেকে বেরোয়ই না সাতজন্মে!'

'তবু ওখানে পাঠালে, তোমার দিদ্‌মার ঘাড়ে নিয়ে গিয়ে ফেললে কি আর একটা উপায় তিনি করবেন না হাজার হোক পেটের মেয়ে তো!'

হাত-পা হিম হয়ে আসে। বড় বেশি স্পষ্ট-ইঙ্গিতটা। বেশি দিন না বোঝার ভান করলে হয়ত আরও বেশি কিছু বুঝতে হবে। সকলকেই পথে বসতে হবে হয়ত। সে আর কথা বাড়ায় না। দিদ্‌মা যে কী রকম মা তাও–বৃথা জেনেই আর বোঝাবার চেষ্টা করে না। বরং আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে মার কাছে কথাটা পাড়তে যায়।

কিন্তু সেখানেও কোনও সুবিধা হয় না। ঐন্দ্রিলা কথাটা শুনেই আবার কাঁদতে শুরু করে, 'সেবার বাইরের বাগান থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবার এ মূর্তিতে গিয়ে দাঁড়ালে বেড়ার আগড়টাই খুলতে দেবে না। রাস্তা থেকে খ্যাংরা মেরে বিদেয় করবে! সেবার খ্যাংরা দেখিয়েছিল-এবার মারবে সত্যি সত্যিই।....তবু তখন খাটবার গতর ছিল। বসে খাওয়াবে আবার চিকিচ্ছে করাবে মা? সেদিন পূবের সূর্য্যি পশ্চিমে উঠবে।...তার চেয়ে সোজা-ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে খালধারে বসিয়ে দে, একেবারে এগিয়ে থাকি। ফেলতেও আর লোক ডাকতে হবে না তোদের, রাশ জ্বালাতেও হবে না–জ্যান্তই শ্যাল-কুকুরে খেয়ে যাবে!'

এর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ছিল তা কাঁটার মতোই বেঁধে সীতাকে। তারও চোখে জল এসে যায়। সে যে কত অসহায় ও অক্ষম, তা বুঝেও বোঝে না মা। অসুখ হলে মানুষ একটু অবুঝ হয়ে পড়ে ঠিকই—তবু চোখে যা দেখেছে, যা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, তাও বুঝতে চায় না কেন?

কিন্তু অভিমানেরও অবসর নেই সীতার। খানিকটা পরে তাই আবারও পূর্ব কথার সূত্র ধরতে হয় তাকে। বলে, 'আচ্ছা, দিনকতক বড় মাসিমার কাছে গিয়ে থাকলে কি হয়? হাসপাতাল তো ওদের বাড়ির কাছেই–কেউ না কেউ নিয়ে যেতে পারবে। বড় মেসোমশাইও তো বসে থাকেন আজকাল-?'

কথাটা বলে ফেলে উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে সে।

ঐন্দ্রিলা তখনই কোন জবাব দেয় না–কিন্তু আস্তে আস্তে শান্ত হয় একটু। চোখের জল মুছে বলে, 'কুটুম-বাড়িতে এমন মড়ার দশা গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াতে পারব না—সে মাথা কাটা যাবে বড্ড। তুই না হয় একটা কাজ কর বরং—তুই-ই একবার যা। ন্যাড়া ধনা শুনছি কিছু রোজগার করছে এখন, মেজকর্তার দুই ছেলেও আপিসে ঢুকেছে, কান্নাকাটি করলে সবাই কিছু কিছু দেবে। আর যদি মেজকর্তা নিজে থেকে যেতে বলে তো কথাই নেই। সে তবু একটু মান থাকে।'

প্রস্তাবটা সীতার মোটেই ভাল লাগে না। সে চিরকাল ভীতু-মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির মানুষ। নিজের শরীরের ওপর দিয়ে সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছে সে কিন্তু বাইরের কারুর কাছে হাত পাততে, কি ইনিয়ে-বিনিয়ে ভিক্ষা করতে তার মাথায় বাজ পড়ে যেন।

সে খানিকটা চুপ থেকে বলে, 'তুমি যেভাবে একে-ওকে ধরে রাঁধুনীর কাজ যোগাড় করো, সেইভাবে আমাকে একটা যোগাড় করে দাও না। তুমি না হয় এখানে থাকতে-? ছেলেটাকে দেখতে পারতে–'?

'তুই কি পাগল হয়েছিস' এক কথায় প্রস্তাবটাকে উড়িয়ে দেয় ঐন্দ্রিলা, 'কত নশো পঞ্চাশ পাবি তাতে? খাওয়া-পরা বড়জোর দশটা কি বারোটা টাকা। তাতে এখানে আমাদের দুটো প্রাণীর চলে কখনও? এদের রান্না না করলে এরা বসিয়ে খাওয়াবে কেন? তুই গতর খাটাচ্ছিস তাই আমাদের খেতে দিচ্ছে। এ-ই তো বলতে গেলে রাঁধুনীর কাজ।

BanglaBook.org

তুই গেলে কি আমি তোর কাজ সাপ্‌টে করতে পারব? তার আদ্দেকও তো পারব না। আর কাজ না পেলে, ওরা বসিয়ে খাওয়াবে নাকি দু'-দুটো লোককে?

কথাটা মর্মান্তিকভাবেই সত্য। এবং সেজন্যে খুব দোষও দেয়া যায় না ওদের। জিনিসপত্রের দাম আগুন হয়ে উঠেছে—এখনও বেড়েই চলেছে দিন দিন। কোনকালে যে আবার কমবে, তা মনে হয় না। ওদের চাষের ফসল ঘরে ওঠে বলেই অত টের পায় না এখনও—তবু যা দু-একটা জিনিস কিনতে হয়, তাতেই জিভ বেরিয়ে যায়। দুটো পেট যদি বসিয়েই খাওয়াবে তো এখনই—এক সপ্তাহ না যেতে যেতে—নোটিশ দেবে কেন? দশ-বারো টাকা সে যদি পাঠায়ও, তাতেই বা কি হবে, দুটো লোকের কি খরচা পোষাবে?....

অগত্যা চোখের জল চোখে মেরে দুরু দুরু বক্ষে বড়মাসীর বাড়িই যেতে হয় একদিন।

অবস্থা সকলের সামনেই খুলে বলে। চোখের জলও চেষ্টা করে ফেলতে হয় না, আপনিই পড়ে। নিজের এই অসহায় অবস্থা, এই দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে আরও অনেক বেশি। অনেক অপ্রকাশিত নিরুদ্ধ বেদনা কণ্ঠে পথ না পেয়ে চোখের আগল ঠেলে বেরিয়ে আসে। রুগ্ন অসমর্থ মা—এতকাল ধরে ওর জন্যে জীবনপাত করে আজ বলতে গেলে শেষ অবস্থায় ওর দোরে এসে দাঁড়িয়েছে—দুটো দিনও তাকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নেই ওর। অথচ ওরই স্বামীর জমিজমার আয়ে অত বড় সংসারটা চলছে। চাকরি-বাকরি করে কেউ কেউ, কিন্তু সে আর কতটুকু, সমুদ্রের কাছে পাদ্যার্ঘ।

মহাশ্বেতা মেজকর্তার মুখের দিকে চায়। তার মুখও ক্ষণে আরক্ত, ক্ষণে বিবর্ণ হচ্ছে, তারও অবস্থা অমনিই অসহায় বুঝি তারও জোর করে কারও জন্য সুপারিশ করার সাহস নেই আর। এই যুদ্ধের বাজারে এত বড় সংসারটা বজায় দিয়ে যাচ্ছে মেজকর্তা—এই-ই ঢের। ফেলে নি সে কাউকে, কারুর পাত পাতাও বন্দ করে নি। যা হোক পরতেও দিচ্ছে—তা মোটা চটই হোক আর থলেই হোক। তবু ওরই দুটো ছেলে রোজগার করছে, মহার রোজগেরে ছেলে বলতে এখনও পর্যন্ত একটাই, শুধু ন্যাড়া। ধনার চাকরি গেছে এর মধ্যেই। সবচেয়ে ছোটটা এই সবে কোন্ এক কারখানায় ঢুকেছে। রোজগারের মতো রোজগার করতে এখনও তার ঢের দেরি। অথচ সংসার মহারই বড়। সে আবার কোন্ মুখে বোন-বোনঝির জন্যে সুপারিশ করবে?

মেজকর্তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে প্রমীলাও। তার চোখে ভ্রূকুটি। বোধহয় নির্বোধ স্বামীর বদান্যতাকে তার ভয়। কিন্তু অম্বিকাপদ কারও দিকে তাকায় না, চুপ করে বসে সব শোনে। তারপর সীতার অব্যক্ত ও অস্পষ্ট প্রার্থনা স্পষ্ট বা ব্যক্ত হয়ে ওঠবার আগেই উঠে গিয়ে ঘর থেকে পাঁচটা টাকা এনে সীতার হাতে দেয়। বলে, 'বাজারের যা হালচাল, দেখতেই তো পাচ্ছ। আমাকে বাধ্য হয়েই সবদিকে টেনেটুনে চলতে হচ্ছে, ক'দিন তাও চালাতে পারব কে জানে।... এর চেয়ে বেশি আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার। বরং মাঝেমধ্যে যদি খুব ঠেকে পড়ো কখনও তো একখানা চিঠি দিও—এত খরচ করে সাত দেশ ভেঙ্গে আসবার দরকার নেই। যা পারি এক টাকা দু'টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।'

সাফ সাফ পরিষ্কার কথা। কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর বা ধরপাকড়ের রাস্তা থাকে না কোথাও। মাথা হেঁট করে টাকা কটা হাত পেতে নেয় সীতা—নিতেই হয়। চেষ্টা করেও চোখের জল বন্ধ করতে পারে না—গোপন করার চেষ্টা করে শুধু।

প্রমীলা বোধ করি স্বামীর বুদ্ধি-বিবেচনায় খুশী হয়েই ওকে ডেকে আরও দুটো টাকা দেয় নিজের সঞ্চয় থেকে। ছোটবৌ কিছুই করতে পারে না, তার হাতে কিছুই নেই। স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে বা জোর করে টাকা আদায় করার মানুষ সে নয়।... সে শুধু উঠে এসে পাশে বসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

BanglaBook.org

মহাশ্বেতাও তার সর্বশেষ সামান্য পুঁজি থেকে একটা টাকা বার করে। আড়ালে ওর হাত ধরে কান্নাকাটি করে, 'তুই মনে ভেবে রাখ্ মা তোর বড়মাসী মরে গেছে। আমার কাছে আর কোন আশা রাখিস নি। তোর মাকেও সেই কথা বলে দিস।.... আমার ক্ষমতা বলতে তো ও-ই—ঐ তো থুম হয়ে বসে আছে। পাখির আহার করে বলতে গেলে—পাছে এদের সংসারের ভার বলে মনে হয় ওর খাওয়াটা। সে কি আর শালীর হয়ে ভাইকে বলতে যাবে?.... কখনই বলবে না। সে সাহস আমারও নেই আর। এখন তো গুষ্টিসুদ্ধ ওদের হাততোলায় আছি। পারব না বলে ঝেড়ে ফেললেই হ'ল—সে ম্যাদের আর আপীল আদালত নেই। তখন পথে বেরোতে হবে ভিক্ষে করতে।'

ন্যাড়া শুধু ফেরবার বাস-ভাড়াটা দিয়ে দেয় হিসেব করে। সে-ই তুলে দিতে এসেছিল বাসে। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলে, 'বুঝতেই তো পারছিস—কীই বা রোজগার করি, এ কি আর বলবার মতো, না এ থেকে কিছু করা যায়। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সবটাই মেজকাকে ধরে দিয়ে গিয়েছিলুম—মাইনে ওপরটাইম সব, পাইপয়সা হিসেবে করে; তা মেজকাও তো কম চালাক নয়, সবটাই ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "ও তুই-ই রাখ, তোর টিফিন আছে, রেলের টিকিট আছে—এত হিসেব করে মনে করে আমি কি দিতে পারব, তুই বরং এক কাজ কর—একটা ভার নিয়ে নে, আমি নিশ্চিন্তি হই। সারা গুষ্টি বলছি না—তোদের ভাইবোন, বাপ-মা'র যা কাপড়-জামা-জুতো লাগে, তুই সেইটে চালা।" খুবই লেহ্য কথা, নাই বা বলি কোন্ মুখে? টানছে তো কম না, দাদার বছর বছর ছেলে হওয়া— সে বেন তোলা থেকে দুধের খরচ, সবই তো সে যোগাচ্ছে। তবু সবকটা বাঁচে না তাই রক্ষে। আমারই তো দুটো, কম করে তিন পো দুধ লাগে রোজানি। সবই দিচ্ছে, কোনদিন না বলে নি।... আমি কোন্ লজ্জায় বলি এই সামান্য ভারটাও বইতে পারব না। অথচ এতগুলো লোকের কাপড়-জামা-জুতো—তাই কি কম? অবিশ্যি আমার ভায়েদের জামা-জুতো খুব লাগে না—কিন্তু তাহলেও যা লাগে, তাই কিনেই এক-এক মাসে একটা পয়সা বাঁচে না।'

বাড়ি ফিরে সীতা টাকা আটটা কার্তিকের হাতে দিতে সে আকাশ থেকে পড়ে, 'এ আবার কি? এ টাকা কিসের'?

সতীন-পোদের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলবার সাহস নেই সীতার আজও, সে মাথা হেঁট করেই জবাব দেয়, 'বড়মাসীর কাছে গিছলুম, তাঁরাই দিলেন ওষুধপত্তরের জন্যে—'

'তা আমাকে দিচ্ছ কেন বৌমা?'

'আপনিই রাখুন। খরচপত্তর তো সব আপনিই করছেন—আমি আর আলাদা করে কী করব ও টাকায়?'

'ও, সেদিন যে কথাটা বলেছিলুম, তাতে বুঝি মনে করলে তোমার মাকে আমি দুটি খেতে দিতেই কাতর, তাই খোরাকী ধরে দিলে চেয়েচিন্তে এনে?... কালটাই এমনি বটে, ভাল কথা কাউকে বলতে নেই। বলে, যার জন্যে চুরি করি, সে-ই বলে চোর। ... আমি বলেছিলুম দিদ্‌মার ভালর জন্যেই—এখানে পড়ে থেকে ঐ হোমোপাথীর গুলি খেয়ে কি আর উদুরী রোগ সারে?... তা যে যেমন বোঝ!'

রাগ যথেষ্ট করল বটে কিন্তু টাকা-ক'টা শেষ পর্যন্ত ট্যাকেই পুরল কার্তিক।

।৩।

কিন্তু সেই হোমিওপাথী গুলির জোরেই হোক আর নিয়মিত সুপথ্য সেবনেই হোক—শেষ পর্যন্ত কতকটা সামলেই উঠল ঐন্দ্রিলা। নিজে নিজে কিছু না ধরেই উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল একটু, একটু রান্নাঘরে বসে এটা ওটা টুকটাক সাহায্যও করতে লাগল মেয়েকে। আরও কদিন পরে নিজে সেধে বড় নাকি গণেশের সংসারে এতটি বড়িও দিয়ে দিলে বসে

BanglaBook.org

বসে। এতাবৎ তার 'পোরের ভাত' খাওয়ার পুরনো সরু, চাল এবং মানমণ্ড খাওয়ার কচু গণেশই সরবরাহ করেছে। সে কৃতজ্ঞতা তো ছিলই, অন্য একটা আশাও ছিল বোধ হয়।

কার্তিক সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারের পর থেকে আর মুখে কিছু বলে নি বটে কিন্তু তার, তার স্ত্রীর এমন কি তার ছেলে-মেয়েদেরও মুখভাব কি কথাবার্তা থেকে তাদের মনোভাব বুঝতে বাকি থাকত না সীতার। ঐন্দ্রিলার এখানে থাকটা যে একান্ত অবাঞ্ছিত—সে তথ্যটা ভাষা ছাড়া সর্বপ্রকারে ব্যক্ত হ'ত অহরহ। শুধু উপায় নেই বলেই—পিঠে কুলো ও কানে তুলো দেবার মতো ক'রে পড়ে থাকা। ঔদাসীন্য বা অজ্ঞাতার ভান করা ছাড়া উপায় ছিল না সীতারও। এখন মা একটু ভাল হ'তেই তাই সে মাকে চেপে ধরল, 'এদের সংসারের তো খুব বেশি খাটুনি নেই, এদেরটা তুমি চালিয়ে নাও, আমাকে একটা কোথাও কাজকর্ম দেখে দাও। যা হোক দুটো পয়সা আসে বাইরে থেকে তবু।... বলতে নেই—খোকাও তো বড় হয়ে গেছে, মাকে ছেড়ে বেশ থাকতে পারবে।'

ঐন্দ্রিলা প্রথম দু-একদিন কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল— বলেছিল, 'দুটো দিন সবুর কর, আমিই চলে যাব কোথাও কাজ-কর্ম নিয়ে আবার।'

কিন্তু তারপর, বোধ করি সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বুঝেই—কী ভাবল, একদিন বড় নাতি গণেশকে একটু নিরিবিলি পেয়ে গিয়ে ধরল, 'নাতি-ভাই, একটা কথা বলতে এলুম। খুবই জ্বালাতন করছি তোমাদের—কিন্তু আমারই বা আর কে আছে বলো তোমরা ছাড়া? যতদিন গায়ে জোর ছিল, গতর খাটাতে পেরেছি, ততদিন কাউকেই বিরক্ত করি নি। এখন নিতান্ত ভগবান মেরেছেন বলেই—'

বলতে বলতেই গলা বুজে এল, বাধ্য হয়েই থামতে হ'ল ওকে।

ততক্ষণে গণেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আক্রমণটা কী ধরনের এবং কোন দিক দিয়ে আসবে শেষ পর্যন্ত বুঝতে না পেরেই আরও অস্বস্তি তার। কিন্তু ঐন্দ্রিলা বেশিক্ষণে উৎকণ্ঠায় রাখল না, একটু সামলে নিয়েই আবার শুরু করল, অনেক দিন তো মেজ নাতির ঘাড়ে চেপে খেলুম, আর ভাল দেখাচ্ছে না। এখন একটু তবু মানুষের মতো হয়েছি—এটা-ওটা কাজও করতে পারছি—তাই, তাই সীতি বলছিল যে তুমিই এদের সংসারটা একটু দ্যাখো, আমি বরং কোথাও বাইরে রান্নার কাজটাজ নিই।... আগে রাজি হই নি—ভেবেছিলুম নিজেই যা পারি করব, ওকে আর এতটা মাথা হেঁট করতে দোব না, তাছাড়া এখনও ওর তো বিপদের বয়স যায় নি কিন্তু ভেবে-চিন্তে মনে হচ্ছে বাইরে কোথাও গিয়ে বড় সংসার সামলানো, সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। অথচ এধারেও, অন্য কোন পথও তো দেখছি না। তাই তোমাকে বলতে এলুম, কোথায় যাবে কার বাড়ি, কে কেমন লোক তা তো জানি না হাজার হোক তোমাদেরই বংশের বৌ—যদি তোমাদের জানাশুনো তেমন কোন বাড়ি থাকে—'

কথাটা শেষ করতে দেয় না গণেশ, বলে ওঠে, 'হ্যাঁ—তা আর নয়! সৎমাই হোক আর যাই হোক, মা তো সম্পর্কে, আমি যাব তার জন্যে রাঁধুনীর-কাজ খুঁজতে! বেশ বুদ্ধি তো আপনার!'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'কেন, কেতো কি কিছু বলেছে আপনাদের—!'

এতখানি জিভ কেটে ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না, না, ছিঃ ছিঃ! সে একটা কথাও বলে নি—কেন মিছে কথা বলব! তা নয়, কিন্তু আমার তো একটা বিবেচনা আছে ভাই। তার ওপর চাপটাও তো হচ্ছে খুব!'

এবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে গণেশ। তারপর বলে, 'তা আমি, না হয় ভজা, বিশু, এরাও কিছু কিছু দিলুম। আপনাদের দুজনের মতো চাল-ডাল-কাপড়—এগুলো যদি

BanglaBook.org

আমরা ভার নিই, কেতোর ওপর খুব চাপ একটা পড়বে না!'

'সে তো জানি ভাই। ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করুন, বেটারা তোমার লক্ষপুষী হোক, ভাত এক মুঠো দিতে তুমি কাতর হবে না তা জানি। কিন্তু ধরো ভাতকাপড় ছাড়া আরও তো খরচ আছে। ছেলেটার লেখাপড়া আছে তো!'

এই অবধি বলে আবার চুপ ক'রে যায় ঐন্দ্রিলা। জিজ্ঞাসু উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে গণেশের মুখের দিকে।

গণেশ কিন্তু তখনই কোন কথা বলে না। খানিক পরে শুধু বলে, 'আচ্ছা ভেবে দেখি একটু। ওদের সঙ্গেও কথা বলি। তবে বৌমাকে ওসব যুক্তি করতে বারণ করুন, ওভাবে আমাদের মুখ ডোবানো চলবে না। আপনি করেন সে আলাদা কথা—কেউ অত খবর রাখে না—তাছাড়া বাবা রাঁধুনী বামনীর মেয়ে কিনে এনেছেন টাকা দিয়ে, তা জানেও অনেকে। কিন্তু বৌমার কথা আলাদা। মেয়ে যে ঘরেরই হোক, এখন আমাদের বাপের বৌ। আমাদের ইজ্জৎটাও তো ওঁর দেখা দরকার। ওসব করলে আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না—বলে দেবেন!'

'রাঁধুনী বামনীর মেয়ে'!...'মেয়ে যে ঘরেরই হোক'—!

কথাগুলো চাবুকের মতো এসে বাজে ঐন্দ্রিলার কানে। উত্তরও মুখের কাছে এসে ঠেলাঠেলি করে। এখনও, এই দুর্বল দেহেও, সে এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। এমন উত্তর দিতে পারে যাতে এসব কথা আর মুখে না বেরোয় কোন দিন! কিন্তু তবু, প্রাণপণে উদ্যত রসনা সম্বরণই করে ঐন্দ্রিলা। গত ক বছরে সে অনেক শিখেছে। বিশেষ এই শেষ কটা বছরে। দরিদ্রকে নিঃস্বকে অনেক সহ্য করতে হয়! এই এখন শেষ এবং একমাত্র আশ্রয়, এটা নষ্ট করা চলবে না কিছুতেই। যতই ঝাঁটালাথি মারুক—তিন তিনটে লোককে ভাত দিচ্ছে, কাপড় যোগাচ্ছে—মাথার ওপর একটা আচ্ছাদনও দিয়ে রেখেছে।

তবু, বহুক্ষণ পর্যন্ত কানের মধ্যেটা জ্বালা করতে থাকে যেন। মাধব ঘোষালের বিপুল সম্পত্তির কথা মনে পড়ে যায় অনেক দিন পরে। হরিনাথও তখনকার দিনে কম মাইনে পেত না। দুর্ভাগিনী সে—তার দৃষ্টি পড়েই সব ছারখার হয়ে গেল। মানুষ দুটোও গেল—আজ তারা বেঁচে থাকলে সে রাজরানী—আবার নিজের বুদ্ধির দোষে ন্যায্য পাওনাও হারিয়ে বসে রইল। এখনও তো সেই শত্তুররা ভোগ করছে, দেখে আসুক না—কী ছিল তার। ভোলার ভাগের গুলোও কিনে নিয়েছে শিবু, শিবু তো এখন রীতিমতো ধনী। ভোলা রেস খেলে শেষে মদ ধরে সব উড়িয়ে দিয়েছে তাই, নইলে সেও কিছু না ক'রে বসে খেতে পারত!

যাই বলুক আর যাই করুক— গণেশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা সুব্যবস্থাই ক'রে দিল। এইটেই আশা করেছিল ঐন্দ্রিলা, গণেশের কাছে গিয়ে সেদিন কথা পাড়ার কারণটাও এ-ই। সব ভাই মিলে বসে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বটে তবে প্রধান উদ্যোগী যে গণেশই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা যা কিছু—এসব খবর চাপা থাকে না। গণেশের ছেলেরা পর্যন্ত আপত্তি করেছিল কিন্তু সে সব কোন কথায় কান দেয় নি সে। ভায়েদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, যে রকম দিনকাল পড়ছে তাতে আজ হোক কাল হোক একটা রোজগারের চেষ্টা করতেই হবে সীতাদের। তাছাড়া এভাবে এখানেও চিরকাল রাঁধুনী বামনী করে রাখা ঠিক নয়। যতই হোক, তাদেরই বাপ। বাবা একটা অন্যায় কাজ করলেও মানিয়ে নিতে হয়। রাগের মাথায় তারা সম্পত্তিটা উড়িয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি খুব। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ওদের একটা ব্যবস্থা করতে তারা বাধ্য। এ নিয়ে পাড়ায় এখনও ঘোঁট হয় তা সে জানে। নিজের কানেই শুনেছে। তাদেরও তো বয়স হ'ল—এবার ভুলটা সংশোধন করাই ভাল।

খুব একটা হাতি-ঘোড়া কিছু নয়। খিড়কীর দিকে বাগানের উত্তর পুব কোণে কাঠা-

তিনেক জমিতে একটা মাটির চালাঘর তুলে দেবে ওরা; সেই জমি আর এক বিঘে ধান-জমি— ওরা ক ভাই, নিজেদের ভাগ থেকেই হোক আর কিনেই হোক— লেখাপড়া ক'রে দেবে ওদের বৈমাত্র ভাই নিতাইয়ের নামে।

তবু এই খবরেই সীতার চোখে আনন্দে জল এসে গিয়েছিল; তুলসীতলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল সে। এতদিন পরে কি দুঃখিনীর ওপর দয়া হ'ল তাঁর? ছোটই হোক আর মাটিরই হোক— নিজের ঘর যা-ই হোক, তার কাছে স্বর্গ। যত যৎসামান্যই হোক, একটু সম্পত্তিও সেটা। নিতাইয়ের পৈতৃক সম্পত্তি।

কার্তিক খুঁৎখুঁৎ করছিল খুবই, 'এতও তো ওদের চলবে না, এসব নিয়ে থুয়েও যদি আমাদের নাম ডুবোতে বেরোয় বৌমা, তখন কী করবে? মাঝখান থেকে সম্মান যা যাবার তা তো যাবেই, সম্পত্তিটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

গণেশ মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, তা যাবে না। খাওয়া-পরা তো চলছেই, তোর সংসারেই হোক আর আমার সংসারেই হোক— চলেও যাবে। নগদ টাকার যেটা দরকার— সেটা ও থেকেই হবে খানিকটা। এর পরও বৌমা যে বাইরে কাজ নেবে তা মনে হয় না। সে প্রকৃতির মানুষ সে নয়। ঘর-বাড়ি জমির একটা টান আছে—ফেলে যাওয়াটা অত সহজ নয়।... আর সে যা-ই হোক, আমাদের কর্তব্য আমরা ক'রে গেলুম, তার ধর্মে যা হয় সে করবে। সামান্যই তো গেল—আমরা থাকতে থাকতে দিয়ে গেলুম সে-ই ভাল হ'ল। আমাদের গুণধররা কি দিতেন এর পর? কিন্তু ধর্মের চোখে দায়িত্বটা আমাদেরই থেকে যেত বরাবর।'

আরও একটা ভাল প্রস্তাব দিল গণেশ। ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বলল, 'দিদিমা, একটা কথা ভাবছিলুম। নিতাইয়ের যা পড়াশুনোর অবস্থা, ও যে কোন দিন পাস্‌টাস ক'রে কেষ্ট বিষ্টু হবে তা মনে হয় না। তার চেয়ে আমি বলি কি, এক কাজ করা যাক— আমাদের নীলু স্যাকরার ঘরে ওকে সাকরেদ ক'রে দিই, সোনা-রূপোর কাজ শিখুক। দুটো তিনটে বছর লেগে-পড়ে থেকে যদি কাজটা শিখে নিতে পারে তো ওর পয়সা খায় কে তখন!'

প্রথমটা শিউরে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা, 'বামুনের ছেলে স্যাকরার কাজ শিখবে?'

'দেখুন গে যান বামুনের ছেলে জুতোর দোকান খুলে সত্তিক জাতের পায়ে হাত দিয়ে জুতো পরাচ্ছে!' প্রায় খিঁচিয়ে উঠেছিল গণেশ, 'স্যাকরার কাজে দোষ কি? আমারই তো মামাতো ভায়রা তার ছেলেকে দিয়েছিল বৌবাজারের মিনেওলার কাছে কাজ শিখতে। এখন সে শুধু মিনের কাজ করেই ডাইনে বাঁয়ে দুহাতে রোজগার করছে। সোনা চেঁচে যা গুঁড়ো বেরোয়, তা যাদের কাজ তাদের বুঝিয়ে দিয়েও যেটুকু থাকে—নষ্ট বলে বুঝিয়ে দেয় স্যাকরাদের—তাইতেই বৌ মেয়ে বোনকে সোনায় মুড়ে দিয়েছে একেবারে, কলকাতায় সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে একটা বেনেটোলায় একটা দু'খানা বাড়ি কিনেছে আর বয়েসই বা কি, ধরো চল্লিশও পেরোয় নি বোধ হয়।.... স্যাকরার কাজে পয়সা কম!— ষ্যাম্নে দিয়ে যাও পয়সা। যেতেও কাটে আসতেও কাটে। একই সোনা যতবার আসবে যাবে—বানির কথা ছেড়েই দাও, পানমরা খাদময়লা বাবদই এতটি ঘরে উঠবে। পুরনো সোনা কেনো গালাও—সেই সোনাতেই আবার গয়না গড়াও—পুরো গিনি সোনার দাম দিয়ে যাবে খদ্দের হাসিমুখে। অমন লাভের ব্যবসা আর আছে! আমাদের নীলুই কেন ধরুন না— ছেঁড়া কাপড়ে গেরো দিয়ে পরত, সেলাই করার ছুঁচ জুটত না। সে এখন তিনশো বিঘে জমির মালিক। ঐ অতবড় বাড়ি ফেঁদেছে বাজারের মোড়ে। তবু তো এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে—শহর বাজারে থাকলে আজ ও বহু-লক্ষপতি!'

দীর্ঘ বক্তৃতা দেয় গণেশ, ঐন্দ্রিলাও অভিভূতের মতো শুনে যায়। গণেশ আবার বলে, 'লেখাপড়া কি ওর হবে মনে করেন? এতখানি বয়স হয়ে গেল—এখনও হাই ইস্কুলে যেতে

BanglaBook.org

পারল না। কবে পাস করবে—করে আপনার দুঃখু ঘোচাবে! আর পাস করলেই যে চাকরি পাবে তার কোন ঠিক আছে? যুদ্ধের বাজারে তবু কাজকর্ম মিলছিল—এবার তো লড়াই থেমেছে—ছাঁটাইয়ের পালা শুরু হবে এবার। প্রথম লড়াইয়ের পর যা হয়েছিল, খুব মনে আছে আমার। একেবারে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। মার্কিন মুলুকে হাজারে হাজারে ছোকরা আত্মঘাতী হয়েছিল কাজকর্ম যোগাড় করতে না পেরে!'

যুক্তি অকাট্য। ক্রমশ ঐন্দ্রিলাও বোঝে। বলে, 'তা দ্যাখো তোমরা ভাই—যা ভাল বোঝো।'...

সীতাকে বলতে সে তো রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠল। আরও পাঁচ ছ বছর কি আট বছর পরে ছেলে হয়ত পাস করবে কিম্বা তাও করবে না। সেই সুদূর এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বসে থাকার আর ধৈর্য নেই তার। তার চেয়ে, দু বছর পরে যদি পাঁচটা টাকাও রোজগার করে আনতে পারে তো সে-ই তার ভাল। তবু ছেলের রোজগার, জোরের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারবে সমাজে মাথা উঁচু করে। ভিক্ষার অন্ন খেয়ে তার অরুচি হয়ে গেছে। আর সে পারেও না, পরিশ্রমেরও শেষ সীমায় এসে পড়েছে এবার, শরীর আর বইতে চাইছে না।

আরও কদিন পরে—মনের মধ্যে সমস্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো তোলাপাড়া করে ঐন্দ্রিলারও ভাল লাগল কথাটা। মনে হ'ল বুঝি ঈশ্বরই এবার মুখ তুলে চেয়েছেন, নইলে ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ ছোটলোকগুলোরই বা এমন সুবুদ্ধি হবে কেন। মাথাগোঁজার মতো নিজস্ব একটা ঘর, যা হয় একটু জমি, আবার ছেলের রোজগার,—এ তো সীতার ভাগ্যে মণি-কাঞ্চন যোগেরই মতো। এটুকু পেলেই সে খুশি, মনে করবে সৌভাগ্যের স্বর্গদ্বার খুলে গেছে তার সামনে।....

পুজো-সিন্নি দিয়ে যেদিন প্রথম নিজের ঘরে এসে উঠল সীতা সেদিন ঐন্দ্রিলা তাকে বলেছিল, 'যাক্ বাবা—এবার আমি নিশ্চিন্তি, আমার এবার ছুটি। এখন যত তাড়াতাড়ি চোখ বুঝতে পারি ততই তোর মঙ্গল, একটা দায় নেবে যায় তোর মাথার ওপর থেকে। আমার এই একটা পেট কমলে চাই কি ভরসা ক'রে ব্যাটার বে দিয়ে বৌ আনতে পারবি ঘরে। একনাগাড়ে তো খেটে গেলি জীবনভোর—বৌ আনলে তবু সুসার হবে খানিকটা, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে বসে খেতে পারবি তার মাথায় সব চাপিয়ে দিয়ে।'

'তবেই হয়েছে।' হেসে জবাব দিয়েছিল সীতা, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি ফুটেছিল সেদিন, 'বসে খাবারই আমার বরাত দেখছ না! বরং তুমি বেঁচে থাকো—তবু একটু আহা-উহু করবার লোক থাকবে, আমার জন্যে ভাববার, আমার হয়ে টেনে কথা বলার থাকবে।... বসে খাবার সময় যদি সত্যিসত্যিই আমার আসে কোন দিন তো দেখো—সেইদিনই আমি পটল তুলব।'

কথাটা হাসতে হাসতেই বলেছিল সীতা। কে জানে সে সময় তার বিধাতাপুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা, একটু হেসেছিলেন কিনা!...

মুখে যাই বলুক, এ ঘরে এসে সীতার শুধু আনন্দ নয়, আশাও জেগেছিল একটু। ঘরটা যেন নানাদিক দিয়েই পয় ফলাচ্ছে মনে হয়; এবার হয়ত সত্যিই তার নিরন্ধ্র দুঃখের দিন কাটতে শুরু হ'ল। সব জিনিসেরই আয়-পয় আছে—এ তো নিজের বাস্তু জমি, ভিটে। ঘর করা নাকি অনেকের সয় না—মা বসুমতীকে আঘাত দিয়ে ভিদ গাড়া। অবশ্য এ মাটির ঘর, ভিদ গাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে নি—তবু ভয় একটু ছিল বৈকি মনে মনে। বিশেষ তার যা বরাত। কিন্তু এ ঘরে এসে ওঠবার পর অনেকগুলো সুবিধে হয়ে গেল।

নিতাই নিলুর ওখানে সাকরেদ হয়ে ঢুকেছে দু তিন মাস আগেই, গণেশ যখন কথাটা

BanglaBook.org

পেড়েছিল প্রায় তখনই। কিছু দেবার কথা নয়—খানিকটা অন্তত কাজ না শিখলে। এরাও তা আশা করে নি। দয়া ক'রে কাজ শেখাচ্ছে এই ঢের। আর সত্যিই, ওকে দিয়ে তার তেমন কোন উপকার হচ্ছে না এখন। কিন্তু হঠাৎ, এখানে আসার মাসখানেক পরেই, তার দু-টাকা ক'রে মাসে জলপানি বরাদ্দ ক'রে দিলে নীলু, নিজে থেকেই। বললে, 'বামুনের ছেলে, সেই কোন সকালে দুটি ভাত খেয়ে আসে—সারাদিন পড়ে থাকে এখানে—কিছু না দিলে অধর্ম হবে যে!'

কথাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি সীতার। ছেলের রোজগারে টাকা হাতে করবে সে! এক টাকাই হোক, দুটাকাই হোক—ভিক্ষার দান নয়, দয়ার দান নয়—দাসীবৃত্তিরও পুরস্কার নয়। ছেলের দশ আঙুলে খাটা কড়ি। আজন্ম যা দেখে আসছে—দয়া আর অবহেলা—এ তা নয়, তা থেকে কিছু স্বতন্ত্র। দুটাকা ভবিষ্যতের বহু টাকার অঙ্কুর। নূতন স্বর্ণালোকিত জীবনপথের দ্বার-উন্মোচন। খবরটা শুনে মনে হয়েছিল একবার অতর্কিতেই—এত সুখ তার কপালে সহ্য হবে না হয়ত!

এর মধ্যে আর একটু সুবিধা হয়ে গেল ওর। ক্রীতদাসীত্ব থেকে আপনিই মুক্ত হয়ে গেল—পুরোপুরি না হ'লেও আংশিক। ওর যখন ঘর উঠেছে তখনই কার্তিকের বড় ছেলের বিয়ে হয়। সে বৌ দেখতে খুব ভাল নয়, বয়সও ঢের—কিন্তু কাজের মেয়ে, শাশুড়ীর ঠিক উল্‌টো। ওদের আপনা-আপনির মধ্যেই, ঘরবর কতক জানাশুনোই, এখানে এর আগে একবার থেকে গেছে সে দুতিন দিন—কনে বৌ বলতে যা বোঝায় তা নয়। এবার এসেই সে রান্নাঘরে ঢুকল, হাঁড়ি-হেঁসেলের প্রধান ভারটা তুলে নিল। সুতরাং নিয়মিত দুবেলা রান্নার দায়িত্ব আর তার রইল না। অনেকখানি স্বাধীনতা পেল। খাটে ঠিকই—কিন্তু এক জায়গায় বাঁধা মাইনের ঝি কি রাঁধুনীর মতো নয়, আশ্রিত গলগ্রহের মতো নয়, এ খাটুনিতে সম্মান আছে কিছু। এখন সে সব সংসারেরই কিছু কিছু কাজ ক'রে দেয়। তাতে হয়ত আগের চেয়ে খাটুনি কিছু বেশিই হয়—তবু তার ভাল লাগে। এর ফলে সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করে, কেউ চাল কেউ তেল কেউ কাপড়। কোন কোন দিন খেতেও বলে কেউ কেউ। বললে ওদের তিন পুরুষকেই বলে। আজকাল ঐন্দ্রিলাও ঘুরে ঘুরে এদের সংসারে অনেক কাজ ক'রে দেয়—আরও হয়ত দিতে পারে, সীতাই বেশি যেতে দিতে চায় না ওধারে। মার রসনা ও মেজাজ অনেকটা সংযত হয়েছে ঠিকই—কিন্তু স্বভাব এত সহজে যায় না, তা সীতা জানে। দুঃখের জীবনে তার বহু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, অনেক অল্প-বয়সেই। মানুষের মন বুঝতে শিখেছে সে অনেকের চেয়েই বেশি

আরও একটা সুযোগ ঘটে গেল তার অকস্মাৎ। মধ্যে মধ্যে সামান্য কিছু ক'রে নগদ উপার্জনের উপায় হয়ে গেল। এ অসম্মানের কিছু নয়। কোথাও নিচু হ'তে হবে না এর জন্যে। বরং সবদিক দিয়ে ভেবে দেখলে বেশ সম্মানেরই কাজ। কাজটা এলও সেধে, আপনা থেকেই। এখানকারই একটি মেয়ে, বনলতা নাম—কলকাতায় মামার বাড়িতে ছিল দীর্ঘকাল, নাকি তিনটে পাসও করেছে—কিছুদিন হ'ল দেশে এসে বসবাস করছে। বিয়ে-থা হয় নি কিন্তু সেজন্যে কুণ্ঠিতও নয়, দুঃখিতও নয়। সে-ই এসে বাড়ি বাড়ি আলাপ ক'রে গেছে, নইলে হয়ত কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলবারও সাহস হ'ত না সীতার। জামাজুতো পরা লেখাপড়া জানা হালফ্যাশানের মেয়ে—তাদের সঙ্গে মিশবে এ তাদের ধারণাতেই আসে না।

বনলতা শুধু মিশলই না, বেশ ভাবও জমিয়ে নিল সীতার সঙ্গে। 'মামী' 'মামী' করত, গ্রাম সম্পর্কে—মামীর মতোই মান্য করত, অন্তত বাহ্যিক ব্যবহারে। তার মতো সামান্য অবস্থার গরিব দুঃখী লোককে ঘেন্না করে না, ঘরে বসে গল্প ক'রে যায়—এতে সীতা তার কাছে কৃতজ্ঞও ছিল মনে মনে। বনলতাই কথাটা তুলল একদিন। মামী একটা কাজ করতে

BanglaBook.org

পরবে? তা'হলে কিছু নগদ পয়সা হাতে আসে খুব সহজে। কাজ অবশ্য কিছুই না—কী একটা রাজনৈতিক দল (এসব শব্দও সীতার অপরিচিত), কী যেন পার্টি না কি যেন বলে তাকে—তারা একটা মিছিল বার করবে; মিছিলটা বড় না হ'লে কারুর চোখে পড়ে না, অথচ তাদের দলে অত লোক নেই, সেই জন্যে তারা ঠিক করেছে বাইরে থেকে যদি কেউ তাদের মিছিলে যোগ দেয় তো যারা বেরোবে তাদের প্রত্যেককে দশ আনা পয়সা, গাড়িভাড়া আর একবেলার খাওয়া দেবে। মামী যাবে?

কথাটা বুঝতেই খানিক সময় লাগল সীতার। সে ভেবে পায় না যে তার কাজটা ঠিক কী। এত পয়সা কি কেউ অমনি দেয়? সে জিজ্ঞাসা করে, 'তা সেখানে গিয়ে কী করতে হবে আমাকে?'

'কিছুই করতে হবে না। ওমা, এ কি কারখানার চাকরি নাকি যে কিছু একটা করতে হবে! শুধু হেঁটে যাবেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে—এই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তারা যখন একটা ধূয়ো ধরিয়ে দেবে—সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেই কথাটা বলবেন। তাও, যদি আপনার কষ্ট বোধ হয় তো চুপ ক'রে থাকবেন— শুধু গেলেই হবে।'

দশ আনা পয়সা—গাড়িভাড়া, আবার খাওয়া। প্রলোভন বড়ই বেশি। খানিকটা ইতস্তত ক'রে কতকটা বিমূঢ়-ভাবেই যেন প্রশ্ন করল সীতা, 'তা তাতে নিন্দে হবে না পাড়া-ঘরে? লোকে যদি কিছু মন্দ বলে—?'

'মন্দ বলবে কেন! এ তো দেশের কাজ। আজকাল মেয়ে-পুরুষ মিলেই তো দেশের কাজ করে সব জায়গায়।... সরকার মানে গবর্মেন্ট অন্যায় কাজ করছে, সরকার চোর মিথ্যেবাদী পুঁজিবাদীদের দালাল—তাদের নিন্দে করতে, তাদের কাজের প্রতিবাদ করতেই আমরা বেরোই। এর মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই। এ তো গৌরবের কাজ। কত বড় বড় নেতারা বেরোয় এই সব মিছিলে জানেন? কত মান্যগণ্য লোক—সরকারও তাদের সমীহ করে চলেন। তাদের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে পথে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ছেলেদের মধ্যে। আর আমরাও তো আছি, আমাদের যদি নিন্দে না হয়, আপনার হবে কেন?.... দেখবেন কত তাবড় তাবড় বাড়ির মেয়েরা, যাদের সামনে দাঁড়াতেও আপনারা ভয় পান—তারা বেরিয়ে পড়েছে।...আর এখানেও তো নয়, বাসে ক'রে শহর-বাজারে যাবেন, সেখান থেকে হেঁটে যেতে হবে খানিকটা। সে ঢের দূর, এখানকার কেউ টেরই পাবে না হয়ত।'

নানাযুক্তিতে সে অভিভূত করে সীতাকে। শেষ পর্যন্ত কথা নিয়ে তবে ওঠে। এবং সেই কথা নেওয়ার অজুহাতেই পরের দিন যথাসময়ে এসে ওদের ঘরে হাজির হয় বনলতা। এক রকম জোর ক'রেই ধরে নিয়ে যায়। কালকের অর্ধসম্মতির আজ আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সীতার মনে—এখন তো রীতিমতো ভয়ই করছে—তবু চক্ষুলজ্জাতে পড়েই যেতে হয়। সামান্য অনিচ্ছা প্রকাশ করতেই বনলতা যা কট্‌কট্‌ ক'রে কথা শুনিয়ে দিলে, তারপর আর 'না' বলবারসাহস হয় না।

অবশ্য কাজটা এমন কিছু নয়—সত্যিই। যেটুকু হাঁটতে হ'ল—সেটুকু সীতার কাছে কোন পরিশ্রমই নয়। এর চেয়ে ঢের কঠিন পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত। ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতেই যা একটু লজ্জা হয়েছিল প্রথম দিকটায় (বনলতা বলে 'আওয়াজ তোলা'), কিন্তু ক্রমে তাও সয়ে গেল। সকলের সঙ্গে বলায় খুব একটা চেঁচাতেও হয় না। অবশ্য গাড়িভাড়া যে সকলের দিল ওরা তা মনে হ'ল না। হুড় হুড় ক'রে লোক সব উঠে পড়ল বাস্-এ, কে কার টিকিট নেয় আর কী করে। পাঁচ-ছ জনেরও টিকিট কেটেছে কিনা সন্দেহ—কন্‌ডাক্‌টরকে ভয় দেখাচ্ছিল—এসব জনতার ব্যাপার, বেশি গোলমাল করলে ভাল হবে না। সে মরুক গে, দিলেও ওর আঁচলে তো উঠত না;—যেটা নিয়ে তার মাথাব্যথা, সে দশ আনা পয়সাটা সে পেয়েছিল ঠিক ঠিক। অবশ্য সবাই নাকি পায় নি

BanglaBook.org

সেজন্যে কিছু কিছু অসন্তোষের গুঞ্জনও কানে এসেছিল—কিন্তু সেটা ঠিক কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত তা সীতা জানে না। তার পয়সাটা বনলতা নিজে এনে তার হাতে দিয়েছিল। এটেই লাভ। নিখরচায় দশ আনা পয়সা পাওয়া। খাবারও দিয়েছিল, তবে সে খাবার খেতে পারে নি সীতা। রাস্তায় বসে শালপাতা পেতে রুটি আর ডাল খাওয়া তার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। সে রুটিও এক একটা এক রকমের। নানান বাড়ি থেকে এসেছে নাকি, ক্ষমতা বুঝে কোন্ বাড়ি কখানা দেবে তার বরাত দেওয়া হয়েছিল। কেউ চল্লিশ কেউ পঞ্চাশখানা রুটি ক'রে দিয়েছে। ডালটা কেবল বান কেটে কাঠের জ্বালে এখানেই সেদ্ধ করা হয়েছে এক কড়া। সেদ্ধই—তাতে কেবল হলুদ গুঁড়ো আর একটু নুন পড়ল। সীতা দাঁড়িয়ে দঁড়িয়ে দেখল সে ডাল রান্নার ছিরি। না তেল না ঘি—না কোন সম্বরা। অবশ্য ভাল ক'রে রান্না হলেও সীতা খেতে পারত না। প্রবৃত্তি হ'ত না তার। বিধবার সংস্কারে বাধত। বনলতাও খুব একটা পীড়াপীড়ি করল না। শুধু মামী মুখে একটু জল পর্যন্ত দিলে না বলে আপসোস করতে লাগল।...

ফিরতেও বেশ রাত হ'ল সীতার। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় যখন বাড়ি এসে পৌছল তখন তার সেই অবসন্ন দৃষ্টি ও একান্ত শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে ঐন্দ্রিলা আগুন হয়ে উঠল একেবারে। ঝাঁ ঝাঁ করে বকলও খুব কানিক।

'বলি তোর আক্কেলটা কি? কিসের জন্যে এমন খুন হ'তে গিয়েছিলি তাই শুনি? ভেবে মরছি আমি, চোদ্দবার ঘর বার করে করে আমার পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল।.. সেই কোন্ সকাল নটা দশটায় বেরিয়েছে—ফিরল এই রাত এগারোটায়। ছেলেটা সুদ্ধ ভেবে অস্থির।... ভারী ঐ ক আনা পয়সার জন্যে প্রাণটা খোয়াবি নাকি?... কী ছিরি হয়েছে মুখচোখের, একবার কোন ঘরে গিয়ে আয়নায় দ্যাখ দিকি। মুখে যেন কে সাত বুরুল কালি মেড়ে দিয়েছ!....এরা বার বার জিজ্ঞেসা করে—কোথা গেল কোথা গেল, বড় নাতবৌয়ের পিঠের ব্যথা বেড়েছে, ওরা খোঁজ করছিল যদি ডাল ভাতটা ক'রে দিতে পারিস—তা কী যে বলি তারই ঠিক নেই। নিজেই গিয়ে যতটা পারি রান্না তুলে দিলুম, বললুম বনলতার সঙ্গে কোথায় গেছে, সেই ধরে নিয়ে গেছে কি কাজের জন্যে। কার্তিক বললে, ও মেয়েটা নাকি ভাল নয়, নানারকম ভুচুং দিয়ে মেয়েদের টেনে নিয়ে যায় বাজে কাজে। ... আর কখনও ওর সঙ্গে যাবি নি বলে দিলুম। এবার এলে সোজা বলে দিবি— ভদ্রলোক গেরস্তঘরের মেয়ে আমি—ওসব আমার দ্বারা হবে না। দশ আনা পয়সার জন্যে কি যমের বাড়ি যেতে হবে নাকি?'

সেদিন এবং তার পরেও কদিন পর্যন্ত সীতারও সেই রকম মনোভাব ছিল। আর ওসবের মধ্যে যাবে না সে। ভাল লাগে না ওর— নিজেকে একেবারে বেমানান মনে হয়। ওসব তার মতো মুখ্যু পড়াগেঁয়ে মেয়ের জন্যে নয়। এসব কাজ কিছু বোঝেও না সে ভাল কি মন্দ—তাইতেই আরও অস্বস্তি বোধ করছে। আর দরকারই বা কি, এই ধরনের আনটো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার!... রাস্তার ধারের বাড়িগুলো থেকে ভদ্রলোকরা যেভাবে চাইছিল তাদের দিকে, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল সীতার।

কিন্তু দিনকতক পরে আবারও একদিন টেনে নিয়ে গেল বনলতা। এবার বরাদ্দ বারো আনা। মিছিল বেরোবে কলকাতায়, ট্রেনে ও বাসে যেতে হবে। তা হোক বনলতা নিজে এসে বাড়িতে পৌছে দিয়ে যাবে রাত্রিবেলা, কোন ভাবনা নেই। আর খুব যদি লজ্জা করে তো মামী যেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে। ..... ঐন্দ্রিলাকেও নানা যুক্তিতে কাবু করল। পয়সারও খুব দরকার, সেইটেই বড় যুক্তি। জিনিসপত্র চেয়ে নেওয়া চলে, হাত পেতে নগদ পয়সা নেওয়া বড় লজ্জার। মধ্যে অনেক দুঃখ ক'রে বৌদিকে চিঠি লিখেছিল ঐন্দ্রিলা, কনক তার উত্তরে দুটি টাকা মনি আর্ডার ক'রে পাঠিয়েছে। লিখেছে যে ওর দাদা যে

BanglaBook.org

বৌয়ের হাতে কখনও হাত তুলে এক পয়সা দেয় না তা তো জানেই ও, মিছিমিছি তাকে বিব্রত করে কেন? হেমকে বলে বিস্তর কান্নাকাটি ক'রে এইটুকুর ব্যবস্থা করেছে সে, আর কিছু করতে পারল না। হেমেরও খুব টানাটানি চলছে। জিনিসের দাম বেড়েছে চারগুণ—মাইনে বাড়ে নি। সস্তায় রেশনটা পাচ্ছে—সেই তবু রক্ষে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, খরচ কি কম। ফ্রিতে পড়ে, তবু বইখাতার খরচই কত। চাকরিও হেমের বেশি দিন নয় আর, এর পর যে কী করবে সেই ভেবে এখন থেকে ঘুম হয় না। এখন সন্ধ্যেয় ফিরে একটা দোকানে খাতা লিখে—পনেরো টাকা পায় হেম, সেই ভদ্রলোকই বলেছে চাকরি গেলে সে পুরো দিনের জন্যেই রাখবে, কিন্তু সে আর কতই বা মাইনে দেবে। ইত্যাদি—

এর পর বনলতার সঙ্গে যেতে বারণ করাও কঠিন বৈকি!

আরও দু-একদিন এই ভাবে বেরোতে হ'ল সীতাকে। কথাটা চাপাও রইল না বাড়িতে। কার্তিক বাঁকা হাসি হেসে গণেশকে বলল, 'কালে কালে হ'ল কি! স্বাধীন ভারতে সবাই দেখছি ডবল প্রমোশন পেয়ে গেল। অমন বৌমা যে বৌমা, সাত চড়ে রা বেরোত না যার, সেও লীডার হয়ে গেল!'

কথাটা সীতার কানেও উঠল। ওঠবার মতো ক'রেই বলেছিল কার্তিক। লজ্জাও হ'ল একটু। তবু আরও খারাপ ভাবে যে নেয় নি এই ভাল। একেবারে সোজাসুজি বারণও করে নি। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলতে হবে।....

এরই মধ্যে একদিন—দিনটা খুব মনে থাকবে ঐন্দ্রিলার, জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও—সকাল থেকেই মন খারাপ ক'রে বসে ছিল সীতা গুম খেয়ে। মন খারাপের কারণ, হরির নোট দেবে বলে অনেক কাণ্ড ক'রেও পাঁচটা পয়সা যোগাড় করতে পারে নি। অবশ্য হাতে পয়সা ছিল না বলে যে পাঁচ পয়সার বাতাসা আসত না তা নয়, ছেলেকে পাঠিয়ে পাঁচুর দোকান থেকে আনানো যেত অনায়াসেই—অমন দু এক পয়সার জিনিস আনিয়েছেও সে বহুবার কিন্তু হরির নোট দেবে বলেই ধার করতে মন সরে নি। দেবতার পূজা ধার ক'রে দিতে নেই—তার স্বামী প্রায়ই বলতেন। অথচ ঘরদোর সব কুঁজেও তিনটের বেশি পয়সা বেরোয় নি। জমি পেয়েছে কিন্তু তার ধান তখনও ওঠার সময় হয় নি। সেই বা আর কত, এক বিঘেতে বড় জোর দশ মণ ধান হবে, ভাগের পর, অর্ধেক পাঁচ মণ পাবে সে। কিন্তু সে এখন সুদূর'শরাহত। এখন এই অবস্থাটই প্রত্যক্ষ—দুটো ফুটো পয়সার জন্যে তার হরির নোট দেওয়া বন্ধ রইল। বৌদের কারও কাছে চাইলে পেত সে, দুটো চারটে কেন—চার আনা পয়সাও পেতে পারত। কিন্তু ঐ একই কারণে চাইল না। এ হরির নোটের উপলক্ষটা এমনই যে ভিক্ষে ক'রে বা ধার ক'রে দিতে মন উঠল না তার। বরং দুদিন পরেই দেবে, ছেলের জলপানির টাকাটা হাতে পেলেই—তবু এ হরির নোট ভিক্ষে ক'রে দেবে না সে কিছুতেই।

উপলক্ষটা সৌভাগ্যসূচকই—অকল্পিত অভাবনীয় সৌভাগ্য। কাল সন্ধ্যায় খবরটা দিয়েছে নিতাই। এ মাস থেকে তার জলপানি পাঁচ টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছেন নীলু-কাকা। এই সামনের মাসেই সেই হারে পাবে সে। দু' টাকা নয়—পুরো পাঁচটা টাকা। খবরটা নিয়ে প্রায় নাচতে-নাচতে এসেছিল নিতাই—খুশিতে ডিগবাজি খেতে খেতে। তার নম্র স্বভাবে, বাধ্য বিনত ব্যবহারে এবং কাজ শেখবার আগ্রহেই খুশি হয়েছে নীলু, সে কথা সে গণেশের কাছে বলেওছে এর মধ্যে একদিন। তাতে গণেশই শুনিয়ে দিয়েছিল নীলুকে, 'কিছু তো কাজ হচ্ছেই ওকে দিয়ে, তা একটা চাকর রাখতে হ'লেও ধরো তোমার গে ওর চেয়ে বেশি খরচ হ'ত—আর এ তো ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে তোমার হুঁকোর জল পাল্‌টানো পর্যন্ত সবই করছে শুনতে পাই। দাও না কিছু বাড়িয়ে, বিধবাটার একটু সুসার হয়।'

এ বেতনবৃদ্ধি নিশ্চয় সেই কথারই ফল। তবু দু টাকা থেকে একেবারে পাঁচ টাকা

BanglaBook.org

হবে, আশা করে নি সীতা। এত তাড়াতাড়ি সুপারিশটা কাজে লাগবে তাও ভাবে নি। সব দিক দিয়েই অপ্রত্যাশিত সুখবর। সত্যিই বুঝি পাথরচাপা কপালের প্রণাম জানিয়েছিল মনে মনে—এ ঘরে উঠে আসারই ফল এটা, নতুন ঘর নতুন সৌভাগ্যরই সূচনা করেছে।

ধন্যবাদ দিয়েছিল ভগবানকে, যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেবার কারণ এতাবৎ তার ঘটে নি কোনদিনই, নিতান্ত দেওয়া স্বভাব বলেই দিয়েছিল। বাস্তু দেবতাকেও প্রণাম জানিয়েছিল মনে মনে—এ ঘরে উঠে আসারই ফল এটা, নতুন ঘর নতুন সৌভাগ্যরই সূচনা করেছে।

সেই সময়েই সঙ্কল্প করেছিল সকালে উঠে পাঁচ পয়সার হরির নোট দেবে।

আজ না দিলে ক্ষতি নেই অবশ্য, বর্ধিত বেতনের টাকাটা থেকেই দেওয়া উচিত বরং—তবু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল সীতার। কেন এমন হ'ল কে জানে, এমন তো বাধা পড়ে না কখনও। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। ভাত চড়াল না, রান্নার কোন যোগাড়ই করল না। শেষে ঐন্দ্রিলাই তাড়া দিল একসময়, 'আ মর, থুম হয়ে বসে রইলি হাত পা গুটিয়ে, ছেলেটা খেয়ে যাবে কি? একে তো এই ভাত খেয়ে যায় বাড়ি থেকে, আবার সেই রাত্রে বাড়ি এসে ভাত খায়—এই এত বড় বেলা দাঁতে কুটো কাটে না একটা। তাও যদি দুটো পেটে না পড়ে তো ছেলেটা মরে যাবে যে।... ওঠ, ভাত চাপা।... আর এবার তো যা হয় ভগবান একটু মুখ তুলে চাইলেন—এবার থেকে ওকে একটা ক'রে পয়সা দিয়ে দিস রোজ—মুড়ি কিনে খাবে। এমনভাবে পিত্তি পড়া ঠিক নয়—বিশেষ ওদের কাঁচা বয়স।... শরীর ভেঙ্গে যাবে একেবারে।'

মার ধমকে সচেতন হয়ে উঠেছিল সীতা। সত্যিই তো, যে ছেলের জন্যে হরির নোট, সে-ই শেষে উপবাসী থাকবে নাকি সারাদিন? এত মন খারাপ করারই বা কি আছে। ভগবান কি আর তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পারছেন না? সীতাও যেন নিজেকে ধমক দিয়েই সক্রিয় ক'রে তুলেছিল।

তারপর অবশ্য সবই যথানিয়মে চলেছিল। নিতাই ঠিক সময়েই খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রান্নাতে বেশি দেরি হওয়ার কোন কারণ নেই, ডাল ভাতে আর ডুমুরের তরকারি—এই তো রান্না। কাঠের জ্বালে কতটুকুই বা সময় লাগে।

নিতাই খেয়ে বেরিয়ে গেলে সীতা এটা ওটা খুচরো কাজ সারছিল তার। স্নান ক'রে এসে ওদের সংসারে যাবে—কারও কোন কাজ আছে কিনা খবর নিতে। গণেশের শাশুড়ী এসে আছেন, ওখানে নিরামিষ হেঁশেলে রান্না বেশি। হয়ত সীতার জন্যে অপেক্ষাই ক'রে আছে গণেশের স্ত্রী। কিন্তু রেঁধে দিয়ে এলে লাভ বই লোকসান নেই, দুটো একটা তরকারী নিয়েও আসতে পারবে নিতাইয়ের জন্যে। ঐন্দ্রিলা স্নান সেরে পুজোয় বসেছে, সেও যাবে একটু পরে ওদিকে—ছোট গিন্নীর ডাল ভিজানো আছে, বড়ি দিয়ে দিতে হবে। ওদের এটা খাওয়ার সময় নয়। একবার খাওয়া—যত বেলা গেলে খায় ততই ভাল।

সীতা ঘর-বারান্দা নিকিয়ে স্নান করতে যাবে, এমন সময় ঝড়ের মতো বনলতা এসে হাজির। আজ একটা বিরাট ব্যাপার ক'রে তুলছে তারা, অনেক লোকের দরকার। আজ গেলে পুরো একটা টাকাই পাওয়া যাবে খরচ ছাড়া; তবে সময় মোটে নেই, কারণ যেতে হবে সেই বাগনানের দিকে, অনেক দূরে। বাস ট্রেন অনেক হাঙ্গামা। যেতে হ'লে এখনই বেরোতে হবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা না হ'লে গাড়ি ধরা যাবে না।

ঐন্দ্রিলা হাঁ হাঁ ক'রে উঠেছিল 'সারা দিনের ফের, অতদূর যাওয়া—ফিরতেই কোন্ না বেশি রাত হবে—রান্না ভাত দুটি মুখে দিয়ে যা। একটা জল খাওয়া নেই কিছু না, রাত্রিরে একগাল মুড়ি চিবিয়ে থাকা—দিনান্তরে দুটো ভাতও যদি না পেটে পড়ে, তা'হলে বাঁচবি কী ক'রে?

কিন্তু ভাত খওয়ার আগে স্নান সারা আছে, আহ্নিকপূজো আছে—খুব তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

সারলেও আধ ঘন্টা। বনলতা হাত-ঘড়িটা দেখিয়ে বলেছিল, 'উঁহু, অত সময় নেই। আজ তাহ'লে থাক—আমি একাই যাচ্ছি। তবে আজ গেলে ভাল হ'ত। আমি না হয় ওদের বলে কয়ে আরও কিছু বেশি পয়সা পাইয়ে দিতুম, পথে কোথাও বসে একটু জলটল খেয়ে নিতে পারতেন, কী চাট্টি মুড়ি।'

বলতে বলতেই সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল—অর্থাৎ চলে যাবার ভূমিকা। সীতা যেতে দেয় নি একটা টাকার প্রলোভন ত্যাগ করা আজ তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সকালের হতাশা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি মন থেকে। তাছাড়া, তার মন বলে—এ সুযোগও ভগবানেরই দেওয়া, এও তার আসন্ন সুসময়েরই একটা লক্ষণ।

সে তিনচার মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়েছিল। মাকে বুঝিয়েছিল যে, একদিন না খেলে মানুষ মরে যায় না। একাদশী তো মাসে দুটো করতে হয়—না হয় আরও একদিন করল। একটু গুড় গালে দিয়ে জল খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বনলতার সঙ্গে।...

অপরাহ্ন পেরিয়ে গেল। সন্ধ্যাও পার হয়ে গেল এক সময়ে। গভীর রাত হ'ল ক্রমশ। পাড়াঘর নিষুতি হয়ে এল। যুগলবাবু রাত দশটার সময় প্রত্যহ মদ খেয়ে মাতলামি করতে করতে যান এই পাড়া দিয়ে, তিনিও চলে গেলেন। কিন্তু তবু, সীতার দেখা নেই। সকালের ভাত জল দিয়ে রেখেছিল ঐন্দ্রিলা। সেই ভাতই নিতাইকে দিল। চাল ধুয়ে ঠিক ক'রে রেখেছে—সীতা এলেই পাতা-লতা জ্বেলে চড়িয়ে দেবে। যে লোক বাইরে তার জন্যে ভাত রেঁধে রাখতে নেই—অকল্যেণ হয়, নইলে ফুটিয়েই রাখত গরম ভাত দুটি।... কিন্তু আর কখন আসবে সে?

ঐন্দ্রিলা আর থাকতে না পেরে গণেশের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। গণেশ অনেক বাঁকা এবং কটু কথা শোনাল, কিন্তু বেরিয়েও পড়ল একটা ছেলেকে ডেকে আলো এবং লাঠি নিয়ে। তাতেও খবর বিশেষ পাওয়া গেল না, বনলতা সুকুমার—যারা ও দলের পাণ্ডা এখানকার, তারা কেউই ফেরে নি। ওধারে হয়ত ঠিক সময় গাড়ি ধরতে পারে নি কিম্বা এদিকেরই—তাই ফিরতে পারে নি কেউ। ঘুরে এসে এই আশ্বাসই দিয়েছিল গণেশ।

একেবারে সকালবেলা সুকুমার এসে খবরটা দিল। কাল ওখানে ওটা ঠিক ঠিক সাধারণ প্রতিবাদ মিছিল নয়—আর একটু গুরুতর ব্যাপার ছিল। হাঙ্গামা প্রবল হয়ে ওঠায় পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়—আর তার ফলেই,—একটা গুলি ছিটকে এসে লেগে সীতা মারা গেছে। লাশ পুলিশের জিম্মায় আছে এখনও। ওঁরা কি কেউ যেতে চান?

॥ ৪ ॥

ভগবানের এই শেষ চরম মার— এই এত বড় আঘাতটাও ঐন্দ্রিলাকে একা সহ্য করতে হ'ল—নিদারুণ দুঃসময়েও কেউ কাছে এসে দাঁড়াল না। খবর গিয়েছিল সব জায়গাতেই। কিন্তু কেউই আসতে পারে নি। এসেছিল একমাত্র বুড়ো—মহার বড় ছেলে। সে আসা আর না আসা দুই-ই সমান।

শ্যামা খবরটা শুনে দুঃখিত হয়েছিলেন খুবই। নাতনী বলে নয়, সীতাকে তাঁর স্বভাবের জন্যেই ভালবাসতেন। তাহলেও—তাঁর আসা সম্ভব নয়। জীবনে কোন দিন জামাইবাড়ি যান নি তিনি—জামাইবাড়ি যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সামর্থ্যও এসেছে কমে। সব চেয়ে বড় কথা—এখন বাড়ি-ঘর ছেড়ে এক বেলার বেশি থাকা সম্ভব নয় কোথাও।

দুঃখ হয়েছিল ঠিকই—তবে যে খবরটা দিতে এসেছিল তাকে কথাও শোনাতে ছাড়েন নি! মেয়ে তাঁর নির্বোধ—নাতনী আরও নির্বোধ হবে সেইটেই স্বাভাবিক। আর মরতে বোকারাই মরে চিরকাল। গেরস্ত ঘরের মেয়ে-ছেলে, বামুনের বিধবা—ও সব ধিঙ্গীপনা করতে যাওয়াই বা কেন! ঐন্দ্রিলার কি এতখানি বয়সেও এতটুকু আক্কেল হ'ল না! সে কী

BanglaBook.org

বলে এ সব বরদাস্ত করেছে! সে বারণ করতে পারে নি? যেমন এই বেহায়াপনায় প্রশ্রয় দিয়েছে—তেমনি মরুক এখন আজীবন কপাল চাপড়ে। স্বাধীন হয়েছেন সব, স্বাধীন জেনানা। মদ্দদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লীডারি করবেন। ....সরকারের সঙ্গে লড়বেন। রাজত্ব উল্টে যাবে তাদের একেবারে, কতক-গুলো পাড়াগেঁয়ে মেড়ার ঐদুটো বুকনিতে। হাত্তোর বুদিদ্ধ রে! বোকা, বোকা ; মেয়েটা তাঁর চিরকাল বোকা ; ঐ নাতনীকে তাঁরা এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন—একটা তুচ্ছ কারণে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাক্ষসের ঘরে তুলে দিয়ে এল। সেই বোকামির ফল জীবন- ভোর ভোগ করছেন নিজে—নিজের মেয়েও। কথায় বলে না, যে মরবে আপনার দোষে, কী করবে তার হরিহর দাসে! তা ওদেরও হয়েছে সেই দশা!

বিস্তর কথা শুনিয়ে—ঘরে কিছুই নেই, ছেলেটিকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না বলে বিস্তর দুঃখ প্রকাশ ক'রে—একটা টাকা বার ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি গরিব মানুষ, এর বেশি আর তাঁর সামর্থ্য নেই, ঐন্দ্রিলা তো জানেই তার মায়ের অবস্থা। পরের টাকা সুদে খাটিয়ে দেন—লোকে ভাবে না জানি কত বড় মহাজন...সে সঙ্গতি থাকলে মেয়েকে পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করতে দেবেন কেন?....

হেমও আসতে পারে নি। কারণ ঠিক সেই সময়েই কনক গুরুতর পীড়িত, শয্যাগত হয়ে পড়েছিল। যার কখনও অসুখ করে না বিশেষ, তার একটু কিছু হলেই লোকে অঘটন ভাবে, অসুবিধাতেও পড়ে। এ তো টাইফয়েড, সত্যি সত্যিই সাংঘাতিক অসুখ। বাড়িতে দেখবার বা করবার লোক নেই বলে রেলের হাসপাতালে দিয়েছে, কিন্তু তাতে দায় বেড়েছে আরও। নিজের ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া সব দেখতে হচ্ছে হেমকেই। রান্না সে কোন দিনই করে নি, করতে পারেও না—তবু যা হোক আধসেদ্ধ-পোড়া—নামিয়ে দিতে হচ্ছে। বিকেলে বাজার থেকে রুটি করিয়ে আনে, কোন্ দোকানীকে চারটে পয়সা আর আটা দিয়ে। কিন্তু তারও ঝঞ্ঝাট আছে—তার সঙ্গে আছে হাসপাতালে ছুটোছুটি। কাজেই আর এক পাও কোথাও নড়া সম্ভব নয়।

আর—হেম কথাটা লিখেও ছিল ঐন্দ্রিলাকে—এসেই বা কি করবে। মরা তো আর বাঁচাতে পারবে না। চিঠি আসতে আসতেই তো তিন দিন কেটে গেছে—অপঘাত মৃত্যু, শ্রাদ্ধ-শান্তি যা হবার তা এর মধ্যে হয়ে গেছে নিশ্চয়। শোকের প্রথম প্রচণ্ড দুঃসহতাও কেটে এসেছে অনেকটা। এখন গিয়ে লাভ কি? নাবালকের ভার নেবার সাধ্য তার নেই যখন, তখন না যাওয়াই ভাল। আপন নিয়মে যা হচ্ছে তাই হোক। যারা এতকাল দেখেছে তারাই দেখবে নিশ্চয়।...

গোবিন্দদের বাড়িও খবর পাঠিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। পাড়ার একটি ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এসব খবর দেবার ভার নিয়েছিল। নিজে গাড়িভাড়া খরচ করে ক'রে ঘুরেছিল, যদিও ফল কিছুই হয় নি। অনর্থক তার এই ক্ষতি করার জন্যে ঐন্দ্রিলা লজ্জাই বোধ করেছিল পরে।

রানী-বৌদি মরবার পর ওদের কোন খবরই পায় নি দীর্ঘকাল। বড়মাসীর মৃত্যুসংবাদটাও এখানে এসে শুনেছে এবার। বড় দুঃখে শেষ জীবনটা গেছে কমলার। পক্ষাঘাতের মতো সব অঙ্গ পড়ে গিয়েছিল, ইদানীং উঠতে পারতেন না একেবারেই। ফলে অনেক সময় ময়লা মেখেই পড়ে থাকতেন। গোবিন্দর নতুন বৌ এ সব পারত না—মনও ছিল না তার। একে তো শ্বশুরবাড়ি পা দেওয়া থেকেই জুতোসেলাই চণ্ডীপাঠ খাটুনি শুরু হয়েছে, তার ওপর শয্যাশায়ী রুগীর সেবা—অত সে পারে না। আগে নাতনীরাই দেখত; কিন্তু গোবিন্দ নিজের বিয়ের পরেই এই পক্ষের সম্বন্ধীর সঙ্গে পরিবর্ত করে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, সে শ্বশুরবাড়িতেই থাকে বেশির ভাগ। ছোট মেয়েটাকে তার দিদিমা এসে নিয়ে গিয়েছেন এই বিয়ের পর, গোবিন্দ আর চাড় করে ফিরিয়ে আনে নি। তার ফলে,

BanglaBook.org

মুখে জল দেবারই কেউ ছিল না বলতে গেলে, সেদিক দিয়ে মরেই বেঁচেছেন কমলা। হঠাৎ রাত্রে ঘুমের মধ্যেই একদিন প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। একেবারে শেষ হবার সময়টায় আর কষ্ট পান নি বিশেষ।

তবু, গোবিন্দ ছিল বাড়িতে যখন খবরটা যায়। শুনলও সব, তবে তারও আর কিছু করার উপায় ছিল না। চাকরি তার নামমাত্রে ঠেকেছে এখন। সেও সব দিন যায় না, মাইনেও তাঁরা পুরো দেন না, পাঁচ-দশ করে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু আদায় হয়। এ ধরনের প্রেস আরও সব হয়েছে, তাদের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম অনেক ভাল—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে বরং কারবার গুটিয়ে আনছে মালিকপক্ষ। মধ্যে থিয়েটার লাইনে দু-এক টাকা বাড়তি রোজগার হচ্ছিল, সাজিয়ে দেওয়া, রং করে দেওয়া এইসব করে চার-পাঁচ টাকা করে পেত, এখন তাও হয় না। শরীরের জন্যে পেরে ওঠে না। খুবই দুরবস্থার দিন কাটছে তার। সে স্পষ্টই বলে দিল, 'যাওয়া তো উচিত ছিল ভাই এখনই, আমাদেরই তো গিয়ে দাঁড়ানো কর্তব্য—কিন্তু ভগবান মেরেছেন, এখন গাড়িভাড়ার পয়সাটাই যোগাড় করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আর অত বড় বিপদে শুধু শুধু গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা করে এসে তো কোন লাভ নেই....'

বাকি থাকে কান্তি। তাকে খবরই পাঠানো গেল না। তার ঠিকানাই জানে না কেউ। সুতরাং আত্মীয় বলতে কেউই এল না। কেউ এসে একবার একটা সান্ত্বনাও দিল না। নিজের শ্বশুরবাড়িতে খবর দেয় নি ঐন্দ্রিলা, ঘেন্নাতেই দেয় নি। তারাও কেউ আসে নি। যা করলে সীতার সতীনপোরাই বরং। যা হয় একটু শুদ্ধ হবার ব্যবস্থাও করে দিলে ছেলেটার। নিয়মমতো যেটুকু যা করা দরকার সবই হ'ল। মায় দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াবারও আয়োজন করে দিল।

ওরাই ঐন্দ্রিলাকে ভরসা দিল। বলল, 'আপনিই থাকুন এখানে—ওর অভিভাবক হয়ে। যতদিন না ওর নিজের পেট চালাবার মতো সামর্থ্য হয়, ততদিন আমরা কিছু কিছু দেব। ঐ জমিটা আছে, ওর আয়ে ঘরের মেরামত, খাজনা, এগুলো চলে যাবে মনে হয়। তাছাড়া ওর জলপানি তো রইলই, আরও বাড়বে নিশ্চয়—যত দিন যাবে।... আপনিই বা এই বয়সে এই শরীরে কোথায় যাবেন? আপনি গেলে ছেলেটাকেই বা কে দেখবে। যতদিন বাঁচবেন, ও আপনারই দায়। আপনাকেই দেখতে হবে।'

বুক ভেঙ্গে যাবারই কথা। মনে হয় নি ঐন্দ্রিলার যে সে আর কোনদিন উঠতে পারবে, আর কোনদিন স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার টানতে পারবে। বিশেষ এই ঘর—এই সংসার। তবু উঠতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত, রান্না-খাওয়া, ঘর-সংসারের অন্য সব কাজই শুরু করতে হ'ল। ঐ ছেলেটার মুখ চেয়েই বুক বাঁধতে হ'ল ওকে—মেয়েরই গুঁড়োটুকু। যদি বাঁচে, যদি কোনদিন বিয়ে-থা করে মানুষের মতো ঘরগেরস্থালি পেতে বসতে পারে তো তার নাম থাকবে। তারও, ওরও! ঐ দৌহিত্রটুকুই ওরও ভরসা, জলপিণ্ডের স্থল। অবশ্য বাঁচবে সে ভরসা আর করে না সে। দিদিমা বলতেন যে আঁটকুড়ো হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে, —ভগবান যে নমুনা দেখিয়েছেন ওর ভাগ্যের, তাতে এই শেষ জলপিণ্ডটুকুর ব্যবস্থাও রাখবেন কিনা সন্দেহ। উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়, তার অদৃষ্টও সেই শুরু থেকেই বুঝে নিয়েছে ঐন্দ্রিলা। আশা আর রাখবে না, পরের বাড়ির কাজ করার মতোই করে যাবে। চাকরি যতদিন থাকে। গেলেও হা-হুতাশ করবে না। পথেই নেমে আসবে আবার।

॥ ৫ ॥

সব চেয়ে যার ভরসা করেছিল ঐন্দ্রিলা, সেই অভয়পদও এল না। ওরা কেউই আসে নি—এক বুড়ো ছাড়া। বুড়োর হাত দিয়েই মেজকর্তা দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

অভয়পদর আর আসা হবেও না কোনদিন। কোথাও আর যেতে পারবে না সে। যে অভয়পদকে সে চিনত—তারা সবাই চিনত, সে আর নেই। সেই প্রাক্তন খোলসটার মধ্যে থেকে পরিচিত মানুষটা কবেই যেন বিদায় নিয়েছে। খোলস যেটা পড়ে আছে, সেটাও যেন রক্ত-মাংসের কিছু নয়—পাথর। পাথরের মতোই স্থাণু ও জড়।

অনেকদিন ধরে স্থির নির্বাক হয়ে বসে আছে অভয়পদ। বসে থেকে থেকে আরও স্থির আরও নির্বাক হয়ে গেছে সে। চাকরি যাবার পর প্রথম প্রথম বাগানের কাজ করত এটা-ওটা, সারাদিন বাগানেই থাকত প্রায়। এখন সেটুকুও আর পারে না। শরীরে কুলোয় না আর। অতিরিক্ত শীর্ণ হেয়ে গেছে সে, শীর্ণ আর দুর্বল। সেখানেও তার এক নতুন পরীক্ষা, না খাওয়ার পরীক্ষা। একটা মানুষ কত কম খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে—সেইটেই যেন পরখ করে দেখতে চায় সে। দিনান্তে একবার, তাও পাখির আহার করে। শুধু ভাতের সামনে বসে মাত্র। সেটাও যে বন্ধ করে নি—বোধহয় চেঁচামেচি গোলমাল করবে এরা, অনুরোধ উপরোধ কান্নাকাটি করবে—এই ভয়েই। নিজের সর্বপ্রকার ব্যয় কমিয়ে ফেলার সঙ্কল্প তার। দীর্ঘ দশাসই পুরুষ, পাঁচহাত ধুতি পরা কোনক্রমেই সম্ভব নয় তাই সে চেষ্টা করে না, কিন্তু সাতহাতীর বড় সে আনতে দেয় না। জামা বাড়িতে অবশ্য কখনই গায়ে দেয় না—খুব শীত পড়লে পুরনো অফিস যাবার কোটগুলো বার করে পরে। সেগুলোও সে বরাবর কিনত রেলের বাবুদের কাছ থেকে, বেশির ভাগই আধপুরনো। রাত্রে কাঁথা গায়ে দিয়ে কাটে বরাবরই। এখনও তাই। তফাতের মধ্যে খুঁজে খুঁজে ছেঁড়া কাঁথাগুলো এনে গায়ে দেয়।

কাঠের বেঞ্চে শোওয়াও বহুকালের অভ্যাস। ইদানীং সেখানে যা কেবল একটু উন্নতি হয়েছে শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে গেছে না খেয়ে খেয়ে—হাড়গুলো উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে সর্বাঙ্গে। সেই অবস্থায় কঠিন অনাবৃত কাঠের ওপর শুয়ে গাময় ঘা হতে শুরু হয়েছিল। সে ঘায়ের সঙ্গে এ শোওয়ার কোন সম্পর্ক আছে, সেটা কেউই বুঝতে পারে নি। মহাশ্বেতাও না। লক্ষ করেছিল অম্বিকাই। ঘায়ের জায়গাগুলো মিলিয়ে দেখেছিল—উঁচু-হয়ে-ওঠা হাড়ের জায়গাগুলোর সঙ্গে। সে-ই ধুনুরী ডাকিয়ে বেঞ্চের মাপে একটা সরু তোশক করিয়ে দিয়েছে। তৈরি করিয়ে নিজের হাতে পেতে দিয়ে দাদাকে বলে গেছে, 'এর ওপর শুয়ো যেন। আমি তোশক করিয়েছি, এ সরু তোশক আর কোন কাজে লাগবে না।... শুধু শুধু কতকগুলো ঘা-নিয়ে জ্বালাতন হয়েই বা লাভ কি!'

আর কিছু বলে নি অম্বিকা। কোন ভাইয়েরই বেশি কথা বলা অভ্যাস নেই। কিন্তু সেই দুটি কথাতেই কাজ হয়েছে। মহাশ্বেতারা ভেবেছিল—এতকাল পরে কিছুতেই বিছানাতে শুতে রাজি হবে না সে—কিন্তু অভয় একটু ইতস্তত করে শুয়েই পড়েছে শেষ পর্যন্ত। তারপরও আর কোন আপত্তি ওঠে নি। নতুন ব্যবস্থাকে সে মেনে নিয়েছে।

তবে—তফাৎটা কি সে বুঝতে পারে? সে কি অনুভব করে শয্যার এই অভিনব (তার কাছে) কোমলত্ব। এ একটা অদ্ভুত অবস্থা অভয়পদর। এরা সবাই লক্ষ করেছে—সে চেয়ে থাকে কিন্তু তার নজরে যেন কিছু পড়ে না। রকেই বসে থাকে বেশির ভাগ—ওর সামনে দিয়েই গরু-ছাগল এসে গাছপালা খেয়ে গেলেও কিছু বলে না। একটা শব্দ পর্যন্তও করে না তাড়াবার জন্যে। সাধারণভাবে কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। অনেকক্ষণ ধরে সামনে এসে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও হুঁশ হয় না তার।

এ নিয়ে নানান রকম কানাঘুষো হয় বাড়িতে বা জ্ঞাতিমহলে। বেবুভুল হয়ে আসছে ক্রমশ', 'ভীমরতি অবস্থা', 'আর দেরি নেই বেশি'—এ সব কথাও কানে যায় মহাশ্বেতার। শোনে আর আড়ালে চোখের জল মোছে। শুধু ভয় নয়—অনুতাপেরও জল এটা। মনে কোনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে বোধহয় তার গঞ্জনাতেই মানুষটা তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে আনছে, 'ওপোস করে শুকিয়ে মরতে চাইছে।' টাকাটা যাবার পর

BanglaBook.org

দিনকতক প্রায় দিবারাত্র স্বামীকে কটু-কাটব্য করত, কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে মাথা খুঁড়ে অভয়পদকে উত্ত্যক্ত-উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলত। এরা সবাই অনেক নিষেধ করেছে তখন, বলেছে, 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না অমন করে—শেষে কি মানুষটা আত্মঘাতী হবে?' কিন্তু তখন কারও কথা শোনে নি টাকার শোকে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল, আর সেই ক্ষতির জন্যে নিজের অতিরিক্ত লোভ নয়— স্বামীকেই দায়ী করত সে।

কিন্তু ইদানীং অভয়পদর এই স্তম্ভিত অবস্থা দেখে তার যেন চৈতন্য ফিরেছে কতকটা। এবার সে ভয় পেয়েই চুপ করেছে। আসলে অভয়পদের জন্যে যে চিন্তার কিছু আছে, তার জন্যেও যে কোন দিন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠবার কারণ ঘটতে পারে, সেটাই ভাবে নি কেউ। তার স্ত্রীও না। কিন্তু এখন নিজের আসন্ন সর্বনাশের চেহারাটা স্পষ্ট না হলেও—আবছামতো দেখতে পেয়েছে সে। যতই যা হোক—তবু ঐ মানুষটা যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণই তার জোর, তার যতকিছু, 'দম্ভজ্যি'—ও না থাকলে তো পথের ভিখিরী। এধারে যতই বোকা হোক—এতবড় ক্ষতিটা বোঝার মতো সাংসারিক জ্ঞান তার আছে।

তাছাড়াও বোধ হয় কিছু আছে—নিজের স্থূল লাভ-লোকসানের প্রশ্নটা ছাড়াও।

ওরা যে স্বামী-স্ত্রী, পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানুষ দুজন, সবচেয়ে আপন পরস্পরের, এটা ওরা ভুলেই গিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। অথবা, সেটা ভাবার কোন অবসর বা অজুহাত মেলে নি ওদের জীবনে। তবু কোথায় সূক্ষ্ম অন্তঃ-সলিলা ফল্গুধারার মতো সে বোধটা ছিলই—জীবনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে। ছিল বলেই নতুন করে সে অস্তিত্বটাকে খুঁজে পেয়েছে মহাশ্বেতা। আর সেই সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সমস্ত আকুলতা উদ্বেগ ও মমতায় টান পড়েছে তার।

তার অমন সুন্দর স্বামী— মহাদেবের মতো।

অমন দেবতার মতো স্বভাব তার। নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার নিরাসক্ত। সকল প্রকার মানবিক ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে। অথচ দয়ামায়ায় পূর্ণ—সে পরিচয় মহাশ্বেতা তো কতবারই পেয়েছে। যে যেখানে আছে মহাশ্বেতার আত্মীয়, সকলেই এ মানুষটার কাছে উপকৃত। তাকে কোন দুঃখ স্পর্শ করে না কিন্তু পরের দুঃখ সম্বন্ধে সে এতটুকু উদাসীন নয়। বহু ভাগ্যে এমন স্বামী মেলে, আর বহু জন্মের পাপে এমন স্বামী পেয়েও ক্ষোয়াতে হয়।

আরও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মহাশ্বেতাকে তার জ্যাঠতুতো বড় জা। সে বলেছে, 'সংসার থেকে ছেলেপুলে থেকে যখন একেবারে সরে যায় মানুষ, তার মনের নেপ্‌চোটা চলে যায়—তখন আর তাকে ধরে রাখা যয় না। সন্ন্যিসী হয় সে এক রকম, ঘরে থেকে মনটা এমনভাবে ঘর-সংসার থেকে সরে যাওয়া ভাল না। মায়ার টান গেলে আত্মা আর থাকবে কেন? টানটাই তো ধরে রাখে গা।'

বড় ভয় ধরেছে মহাশ্বেতার কথাটা শোনবার পর থেকে। টানটা ফিরিয়ে আনার জন্য উঠে-পড়ে লেগেওছিল কিছুদিন। কিন্তু কী করলে সেটা ফিরে আসে, ঠিক কী করা উচিত তা ভেবে পায় না। মধ্যে, তরলারই পরামর্শে খুব সটেপটে ধরেছিল সে স্বামীকে, 'তুমি বাপু মন্তরটা নিয়ে নাও। মন্তর নিয়ে জপ আহ্নিক করতে থাকলে মনটা ভাল হবে।'

ওদের কুলগুরু আছেন, এরা বাড়ি সুদ্ধ বড়রা সবাই দীক্ষাও নিয়েছে, অভয়ের অনুমতি নিয়ে মহাশ্বেতাও নিয়েছিল। কেবল অভয় নিজেই নেয় নি। তখন সবাই খুব জেদ করাতে বলেছিল 'ভগবানকে ডাকব তার জন্যে আর একটা মানুষকে সুপারিশ ধরার কি দরকার? তাঁকে ডাকার ইচ্ছে যদি মন থেকে না জাগে তো হাজার মন্তর নিলেও তাঁকে ডাকা হবে না। এই যে সকাল বেলা গিয়ে রোজ আহ্নিকে বসো—ভগবানের কথা কতটুকু ভাব বলো তো!'

তখন তবু যুক্তি দিত। এখন কথাই বার করা যায় না। বার বার বলার পর একটি

BanglaBook.org

সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, 'ও আমার ভাল লাগে না।'...

আরও নানা উপায়ে সংসারের দিকে স্বামীর মন ফেরাবার চেষ্টা করেছে মহাশ্বেতা, মায়ার টানকে প্রবল করে তুলতে চেয়েছে। ছোট একটা নাতিকে এনে কোলের কাছে—কখনও বা কোলের ওপর বসিয়ে দিয়েছে, নাতি-নাতনীদের পাঠিয়েছে কাছে বসে গল্পগুজব করতে, তাদের দিয়ে খাবার করে পাঠিয়ে দিয়েছে—শিখিয়ে দিয়েছে, জোর করে আবদার করে খাওয়াবি, একটু কিছু খাওয়াতে পারলে একটা পয়সা দেব, কিন্তু কোনটাতেই কোন ফল হয় নি। তার সেই নির্লিপ্ত নিরাসক্তি, জীবন সম্বন্ধে নিতান্ত নিরুৎসুকতা তাকে যেন বর্মের মতোই আচ্ছাদিত করে রেখেছে, সে বর্ম ভেদ করা যায় না কোন অস্ত্রেই।

অথচ এটাকে বিষাদ বলে ভাববার কোন কারণ নেই। আগে বরং একটা হতাশা একটা দুঃখের ছায়া তার মুখে দেখা যেত—এখন সেটাও নেই। আগেকার ভাবলেশহীন মুখভাবই ফিরে এসেছে আবার বরং যেন আরও ভাবলেশহীন, আরও পাথরের মতো হয়ে উঠেছে মুখটা। মানুষটাই যেন পাথর হয়ে গেছে—ভিতরে-বাইরে। পাথরের মতোই নিশ্চল পাথরের মতোই প্রাণস্পন্দনহীন। অমনি পাথর হয়ে গেছে বুঝি মনটাও, কোন কিছু ভাববার অভ্যাস ফেলেছে হারিয়ে।

কিন্তু তা নয়। এরা বুঝতে পারে না। ভাবেই সে বেশি আজকাল। সে ভাবনা বড় বেশি মনের গভীরে, আর সে ভাবনাতে একেবারে ডুবে তলিয়ে গেছে বলেই সেটা চোখে পড়ে না।

চিন্তা নয় এটা—ভাবনাই। সমস্ত মানসিক সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা। এই থেকেই তার আত্মা আনন্দ-রস আহরণ করে। এটা তার ভাবনা-বিলাস।

বাইরে যতটা নিষ্ক্রিয় সে ভেতরে ততটাই সক্রিয়। মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে সে তার পূর্ব জীবনের রোমন্থন করে। করেই যায় বার বার। কর্মজীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাসটাকে মানস-জগতে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেষ্টা করে। বারবার একই জীবনযাপন করতে চায় সে। করেও। সেই জীবনেই সে বেঁচে আছে সেইখানেই তার অস্তিত্ব। বাইরের জগতে সে মৃত—তাই অমন স্থাণু।

সে জীবনটা চলচ্চিত্রের মতো অভিনীত হতে থাকে তার মনের পর্দায়। উপন্যাসের মতো মনের পাতায় লিখে যায় সে। তা নিয়ে তার যত্ন ও উৎকণ্ঠারও অবধি নেই। প্রতিটি অনুচ্ছেদ ঠিক সন তারিখ ধরে ধরে—পারম্পর্য বজায় রেখে সাজানো প্রয়োজন। এদিক ওদিক—আগুপিছু না হয়ে যায়। এক এক সময় সংশয় জাগে—ভুল হচ্ছে না তো? যত্ন করেই আবার সেটা সংশোধন করে। মনে করে করে মিলিয়ে নেয় অন্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেঃ

শশীবাবু যেবার রিটায়ার করল সেইবারই লং সাহেব নতুন এল বিলেত থেকে। শশীবাবুর সে কী আপসোস, এই নতুন সাহেবটা কেমন তা নেড়ে চেড়ে দেখা হ'ল না। শশীবাবুর জীবনে ঐ একটিই ধ্রুব চিন্তা ছিল—আনন্দ বলুন, বিশ্রাম বলুন আর শখই বলুন—সাহেবদের কী করে বোকা বানাবেন। তাদের কত বুদ্ধি—যে বিদ্যে-বুদ্ধির অহঙ্কারে বেটারা ওঁদের থেকে অত বেশি মাইনে নেয়—সে বুদ্ধির দৌড় কতটা তাদের বুঝিয়ে দেবেন আচ্ছা করে। তাদের নাকের জলে চোখের জলে করাবেন। ...করাতেনও. ওঃ সেবারে হাচিনস সাহেবকে কী জব্দটা না করলেন, সেই আসাম রেলের ঠিকের ব্যাপারে।

আচ্ছা, শশীবাবু রিটায়ার করলেন সেটা কোন সাল? উনিশশো নয় হবে—না দশ? না না, শশীবাবু তো রিটায়ার করলেন তাঁর বড় জামাইটি মারা যাবার পর, সেই শোকেই কতকটা। যুদ্ধে গিয়েই তো মারা গেল সে জামাই, ফরাসী মুলুকে কোথায় যেন ম'ল—লাশটা জ্বালানোও হ'ল না। এঁরা কুশের পুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধশান্তি করলেন। তা

BanglaBook.org

হ'লে—দশ কি করে হবে? চোদ্দ সালের আগে তো হ'তে পারে না। অথচ লং সাহেব যেন এসেই সদ্য-মরে-যাওয়া রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্যে শোক-সভা করলেন না?—আসার বোধ হয় সাত-আট-দিনের মধ্যেই সভাটা করা হ'ল। শশীবাবু রিটায়ার করার সময় কে এলেন তাহলে—ম্যাকডুগাল কি? না, ম্যাকডুগাল এল অনেক পরে। ম্যাকডুগাল একেবারেই ম্যানেজার হয়ে এসেছিল। তার জন্যে হঠাৎ বড় করে একটা সভা ডাকা হ'ল অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। সেই প্রথম ও রকম সভা হ'ল ওদের।

ম্যাকডুগালের সে সভাটার কথাও বেশ মনে আছে অভয়পদর। গঙ্গার ধারে সামিয়ানা খাটিয়ে খুব জোর সভা হয়েছিল। ঠিক ছিল সামিয়ানার নিচে শুধু বাবুরা বসবেন। কারখানা মিস্ত্রীরা—তখনকার দিনে কুলীই বলা হ'ত সকলকে—আর তার মতো যে সব কর্মচারী, না বাবু না কুলী তারাও সামিয়ানার বাইরে ঘিরে দাঁড়াবে। শীতকাল সেটা, বেলা দুটোয় সভা—কোন অসুবিধেই হবে না। বড়দিনের মুখটাতেই সভা ডাকা হয়েছিল, বেশ মনে আছে অভয়পদর।... সেও ছিল দাঁড়ানোর দলে—দাঁড়িয়েই ছিল এক কোণে—হঠাৎ ডানকান সাহেবের নজর পড়ে গেল। ডানকান ট্যাস সাহেব ছিলেন কিন্তু কে বলবে পাকা সাহেব নন। আর তেমনি মেজাজও ছিল, বড় বড় সাহেবদের যেমন দিলদরিয়া মেজাজ হয়—সব দিকে নজর, সকলের ওপর সমান দৃষ্টি। ডানকানই অভয়পদের ওপরওলা লাহিড়ীবাবুকে বললেন, 'ওকে ভেতরে এনে বসাও অভিকে—(ডানকান অভয় উচ্চারণ করতে পারতেন না—বলতেন অভি), ও কেরানীর অনেক ওপরে, আধা-ইঞ্জিনীয়ার বলতে পার ওকে।'

ওঃ, সে কী চোখ টাটিয়েছিল সেদিন সকলকার। কেরানীবাবুরাও, ম্যাক্‌ডুগালকে দেখবে কি—উল্‌টে ওকেই দেখেছে শুধু। সভার পর খাওয়ার সময়ও—মিস্ত্রীদের সব হাতে হাতে দেওয়া হ'ল কমলালেবু আর কেক, অভয়পদ বাবুদের সঙ্গে মাটির সরা পেল। কেক কমলালেবু ছাড়াও তাতে একটা করে সিঙ্গাড়া আর কি যেন—হ্যাঁ, ভূষণবাবু খইচুর আনিয়েছিলেন ধনেখালি থেকে—সেই খইচুর ছিল। অভয়পদ খায় নি সে-সব, কোনকালেই আপিসে কিছু খেত না—সরাসুদ্ধ ঝাড়নে বেঁধে বাড়ি এনেছিল। তা নিয়ে কত হাসাহাসি, বাবুরা টিটকিরি দিয়েছিল, বাবুর খানা কি কুলীর পেটে সহ্য হয়!.... অথচ, অভয় হলপ করে বলতে পারে, বাবুরা সবাই কিছু কিছু পকেটে করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। একটা নিয়ে লুকিয়ে রেখে আর একটা সরা নেবার জন্যে বাবুরা যে কাণ্ড করেছিল— কেউ তিন-চারটেও নিয়েছে— সে উঞ্ছবৃত্তি অভয় কোনকালে করতে পারবে না, করেও নি সে। ....

সেই কেক নিয়েই তো সেবার কী গণ্ডগোলটা না হ'ল। অভয় কেকটা নিয়ে গিয়ে মাকে খেতে দিয়েছিল। সে কথাটা কেমন করে যেন চাউর হয়ে যায় পাড়ায়-পাড়ায়, রায়েরা মজুমদাররা—তার সঙ্গে ওদের জ্ঞাতিরা মিলে সে কি ঘোঁট সকাল সন্ধ্যে—কী সমাচার, না অভয় ডিম দেওয়া কেক খাইয়েছে ব্রাহ্মণের বিধবাকে। কথাটা ক্ষীরোদার কানে পৌঁছতে তিনি শুষ্ক মুখে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, ওরা যা বলছে—সত্যি'? অভয় তার জবাবে মিথ্যেই বলেছিল, 'তুমি ক্ষেপেছ! এসব কেকে আবার ডিম দিচ্ছে! ডিম অত সস্তা কি না!' বাইরে থেকে শুনে চোখ বড় বড় করে মহাশ্বেতাও স্বামীকে বলতে গিয়েছিল, 'এটা তুমি কি করলে! ছি ছি,—এর তুল্য পাপ আছে। মাকেও পরকে মজালে, নিজেও মজলে।' খুব উত্ত্যক্ত করে তুলতে তাকে বলেছিল, 'বেশ করেছি খাইয়েছি। পাপ হয় আমার হবে, সে আমি বুঝব। মার আবার পাপ কি, মা তো অজান্‌তে খেয়েছে।'

আজও সে জন্যে দুঃখিত বা অনুতপ্ত নয় সে। মা কতদিন তাকে বলেছেন তার আগে, 'হ্যাঁ রে, কেক আবার কি মিষ্টি রে?' 'কেক কেমন খেতে রে?' 'সায়েবরা যখন খায় তখন নিশ্চয়ই খুব ভাল মিষ্টি। তা সন্দেশের চেয়ে ভাল? তোরা তো খেয়েছিস—?' এত করে বলার মানেই তাঁর মহাপ্রাণী খেতে চেয়েছিল। সে খাওয়ানোতে কোন দোষ আছে বলে

BanglaBook.org

মনে করে না অভয়পদ।....

ঐ ম্যাকডুগালই আবার যখন চলে গেল—বিলেতেই আর একটা কি বড় কাজ পেয়ে, তখনও খুব ধুমধাম করে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়েছিল তাকে। সেবার তো অভয়পদর আরও খাতির। সাহেবদের মহাজন সে, খাতক সাহেবরাই তাকে নিয়ে গিয়ে সামনে বসিয়ে দিয়েছিল।... উঃ, ব্যাটারা কি ঘা-ই দিয়ে গেল! হাসি, খাতির, কাঁধে হাত রাখা, তার আড়ালে কী শয়তানিই ছিল ব্যাটাদের মনে। পঙ্কজবাবু বলতেন ঠিক কথাই—'সাদা চামড়াকে কখনও বিশ্বাস করবে না। ওরা মিছরীর ছুরি!'

থাক সে কথা। অভয়পদরই অদৃষ্ট। নইলে সব সাহেব কিছু সমান নয়। সেই যে হাওড়ার পুলের প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিয়েছিল সে—সে সময়, সত্যিই যখন জলের মতো বুঝিয়ে দিলে, তখন ওদের এখানকার বড় সাহেব যিনি ছিলেন এগিয়ে এসে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছিলেন। বিলেত যাবার সময় নিজের গায়ের গরম কোটটাই দিয়ে গিয়েছিলেন—উপহার। সে কোট আজও খোকা—মানে দুর্গা গায়ে দিচ্ছে। বিলেত গিয়েও দু-তিন বছর পর পর বড়দিনে কার্ড পাঠিয়েছিল অভয়কে মনে করে করে। না, সবাই অকৃতজ্ঞ নয়, একজন দুজনের জন্যে সব সাদা চামড়াকে গাল দেবে না সে।....

এমনিই স্মৃতি রোমন্থন করে যায় সে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঠায় একভাবে বসে থাকে এক জায়গায়। অনেকক্ষণ পর পর চোখের পাতা পড়ে শুধু, সেইটুকু থেকেই প্রাণস্পন্দন টের পাওয়া যায়। বাকিটা পাথরে মতোই স্থির অনড় হয়ে থাকে। সাদা দাড়ি-গোঁফে সাদা চুলে ফর্সা রং-এ শ্বেত পাথরে মূর্তির মতোই মনে হয় তাকে। পাড়ার লোক অনেকে দূর থেকে ওকে দেখায়—জীবিত মানুষ কেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে। মন শুধু কাজ করে যায়, দ্রুত নয়—তাড়াহুড়ো নেই কোথাও আর—আস্তে আস্তে সময় নিয়ে সে স্মৃতির আলপনা এঁকে যায়। জাল বুনে যায় ক্রুশকাঠির বোনার মতো। আলপনা একবার শেষ হ'লে মুছে ফেলে, আবার শুরু করে গোড়া থেকে। কুশের চেন—খোলে আর বোনে। সেখানে যেমন তাড়াও নেই তেমনি বিশ্রামও নেই। গভীর থেকে গভীরে ডুবে যায় হয়ত—তবু ঐটুই তার জীবন, ঐখানেই এখনও সে কর্মঠ আছে।

তার এ ভাবনা-বিলাসের খবর তার বাড়ির লোক কেউ রাখে না। এ তার গোপন সঞ্চয় যেন, কৃপণের মতো নিজেই নাড়ে-চাড়ে, সযত্নে অন্যের থেকে আড়াল করে রাখে। দৈবাৎ কখনও এ রহস্যটা ধরা পড়ে যায়। হয়ত অনেকক্ষণ ধরে মহাশ্বেতা কিছু বলছে, আগে খেয়ালই করে নি, যখন খেয়াল হল তখন, তার দিকে না চেয়েই উত্তর দিল, 'ও তিনটে কয়েল বাদ। ওগুলোতে কি দোষ আছে, গ্রেগরী সাহেব দিতে বারণ করেছে!'

কিম্বা দুর্গাপদ এসে হয়ত কোন চমকপ্রদ খবর দিল—বেশ চেঁচিয়েই বলে সে—'দাদার এই অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে—কিন্তু তাতেও শুনল,'হ্যাঁ, শুনেছি। শশীবাবু বলেছে আমাকে।' নাতি এসে গলা জড়িয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে হয়ত—দাদু বলে উঠল, 'কোটটা—কোটটা আগে সেলাই করে দিতে বল তোর মাকে।'

অবশ্য এগুলো দৈবাৎই। তবু সকলেই শুনেছে এক আধবার। এরা বলে, 'ভুল বকছে।' বলে, 'এই রকমই হয়। ক্রমশ সব গুলিয়ে যায় মাথার মধ্যে।' একমাত্র তরলাই বাড়ির মধ্যে যা ধরতে পারে এর রহস্যটা। বলে, 'না দিদি, ভুল-বকা নয় ওসব। আমার মনে হয়, উনি দিন-রাত বসে বসে কেবল আফিসের ভাবনাই ভাবেন। সেই সব আগেকার কথা—বোধ হয় সেই কথা তুলে কেউ গল্প করলে উনি অনেকটা চাঙ্গা হ'তে পারেন। অনেক দিন তো কাটালেন ওখানে—ঐ কথাই ভাল লাগে।'

কিন্তু তরলার কথায় কেউ কান দেয় না। মহাশ্বেতা তো নয়ই—সংসারের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা এত গভীরভাবে ভাবতে পারে কেউ তা তার ধারণাতেও আসে না।

প্রদীপের শিখা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ক্রমশই—তবু তা যে খুব তাড়াতাড়ি নিভবে কেউ ভাবে নি। এইভাবেই আরও দু-চার বছর চলবে, সকলেই আশা করেছিল। এদের দেহের গঠনই ভিন্ন, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি মজবুত অনেক বেশি ঘাতসহ। বোধহয় এটা পেয়েছে ওরা মায়ের কাছ থেকে, তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং জরা-জনিত দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনও কঠিন ব্যাধি কিছু তাঁর নেই। কিম্বা দুঃখে-কষ্টে পোড় খেয়ে খেয়েই ক্রমশ মজবুত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অভয়পদর দেহ যে সাধারণ রক্ত-মাংসের, কালের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি অন্য মানুষের মতো তাকেও ক্ষইয়ে আনতে পারবে, এটা কেউ ভাবতে পারত না ঠিক। তার কারণও ছিল। এ বাড়ির কেউই কখনও অভয়পদকে বিশেষ অসুস্থ হতে দেখে নি বরং দেখেছে বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কঠোর পরিশ্রম করতে—কী আফিসে কী বাড়িতে। বিশ্রাম শব্দটার সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, দৈনিক পাঁচ ঘণ্টার বেশি সে ঘুমোয় না, শোয় নিরাবরণ কাঠের বেঞ্চিতে। বিলাস তো নয়ই, আরামও তার সয় না। তার রক্তে অনন্ত প্রাণধারা প্রবাহিত, তার অস্থিতে অমিতবীর্য কাঠিন্য। সে যে এখন বসে থাকে—নিতান্ত ইচ্ছা করেই—এও তার এক রকমের তপস্যা, কষ্টসহিষ্ণুতার একটা পরীক্ষা। নইলে ইচ্ছে করলেই, আজও সে ঘুরে-ফিরে আবার আগেকার মতো কাজকর্ম করতে পারে নিশ্চয়। তার এ কর্মবিমুখতার মূলে দৈহিক কারণ নেই ততটা—যতটা মানসিক কারণ আছে।

হয়ত তাই। কিন্তু দেহের ওপর মনের প্রভাব যে অনেকখানি সেটা এদের জানা ছিল না তেমন। বেঁচে থাকার আগ্রহ ও ইচ্ছা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লৌহকঠিন দেহেও যে ক্ষয় ধরেছে সেটা বুঝতে পারে নি। তাই, প্রথম যেদিন ছটা বেজে যাবার পরও অভয়পদ চোখ বুঝে বিছানাতেই শুয়ে রইল, সেদিন প্রথম দিকটায় উদ্বেগের চেয়ে বিস্ময়ই বোধ করেছিল সকলে বেশি।

তবুও সোজাসুজি এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে সাহস হ'ল না মহাশ্বেতার, ছুটে গেল সে মেজকর্তার কাছেই। অম্বিকা সারা রাত ঘুমোয় না, সে সন্ধ্যা থেকে বসে গেলাস গেলাস চা খায় আর ভূতের মতো সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ভোরের দিকে মেয়েরা উঠলে সে নিশ্চিন্ত হয়, সেই সময়ই চোখের পাতা দুটোও বুজে আসে তন্দ্রায়। পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত ঘুমোয় একটানা। কেউ ডাকলেও সাড় আসে না সহজে। কিন্তু আজ কথাটা শোনা মাত্র তার সমস্ত জড়তা কেটে গেল, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল মহাশ্বেতার সঙ্গে সঙ্গে। খবরটা শুনে মুখ তো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলই, মহার মনে হ'ল তার পা দুটোও অল্প অল্প কাঁপছে। সম্ভবত কাঁচা ঘুম ভাঙ্গার জন্যেই, মহা মনে মনে ভাবল।

অনেক ডাকাডাকিতে অতিকষ্টে চোখ খুলল অভয়পদ; মনে হ'ল চোখ মেলে চাইতে তার কষ্টই হচ্ছে রীতিমতো। চোখের পাতাগুলো যেন অবশ হয়ে এসেছে, চেষ্টা করেও চাইতে পারছে না।

অনেকক্ষণ সময় লাগল তার ভাল করে চেয়ে দেখতে। অবশ্য চোখ খোলার পর বেশ স্থিরভাবেই চেয়ে রইল সে ভায়ের দিকে, তারপর অতি ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আর না, আর উঠব না আমি। এই শেষ।'

মুখের কাছে ঝুঁকে ছিল মহাশ্বেতা, কথাগুলো সেও শুনতে পেয়েছিল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল। বোধ করি সেই শব্দেই—ঈষৎ ভ্রূকুটি করল অভয়। অম্বিকাপদ বলল, 'কেঁদো না—একটু দ্যাখো, আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি—'

'উঁহু।' আবার কথা কয়ে উঠল অভয়, 'ডাক্তার নয়। তুমি বসো। জীবনে কোন দিন ওষুধ খাই নি—যাবার সময় আর কেন? লাভও নেই কিছু।'

এইটুকু বলতেই বোধহয় অনেকখানি আয়াস করতে হয়েছিল, ক্লান্তিতে চোখ বুজল

BanglaBook.org

আবার। অম্বিকাপদ দাদাকে চেনে, বোধ করি একমাত্র সে-ই চেনে। সে আর ব্যস্ত হ'ল না—বেঞ্চির কাছে মেঝেতেই শান্তভাবে বসল।

মহাশ্বেতার কান্নায় বাড়িসুদ্ধ প্রায় সবাই ছুটে এসেছে তখন। দুর্গাপদ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইল অম্বিকার দিকে, অর্থাৎ ডাক্তার ডাকবে কিনা। অম্বিকা ঘাড় নেড়ে নিষেধ করল। তারপর বহুক্ষণ সেই নিস্পন্দ মানুষটার কাছ থেকে কোন সাড়া আসে কিনা দেখে বলল, 'একটু দুধ আনতে বলি। একটু দুধ খাও—মুখ ধোওয়া পরে হবে খন।'

'না।' চোখ না চেয়েই উত্তর দেয় অভয়পদ, 'কী লাভ?'

'না খেয়েই বা লাভ কি? এদের মনে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া—। আর খেলেও তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না তোমার।'

একটুখানি চুপ করে থেকে অভয়পদ উত্তর দিল, 'খেতে কষ্ট হবে। বোধহয় গিলতে পারব না কিছু। দরকারও তো নেই—'

আরও খানিক পরে আর একবার চোখ খুলল। চারিদিকে তাকাল একবার। সবাইকে যেন দেখে নিল ভাল করে। তারপর আবার ধীরে ধীরে বুজে এল চোখের পাতা দুটো। বলল, 'ওদের এখন যেতে বলো অম্বিকা, এখনই আমি মরছি না। হয়ত আজও মরবো না.. ওঠার আমার শেষ হয়ে গেছে, সেইটেই বলছিলুম।...'

দুপুরের দিকে আর একবার চোখ খুলল সে। তখন শুধু মহাশ্বেতা বসেছিল কাছে। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর আস্তে আস্তে বলল, কতকটা যেন আপন মনেই, 'বড়' তাড়াতাড়ি এসে পড়ল শেষটা। আমিও বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়েও খালধারে গিয়ে পড়ে থাকতুম। জন্মে কখনও গাড়ি-পাল্কী চড়ি নি—মরার পর লোকের কাঁধে চড়তে হবে—ভাবেতেই কষ্ট হচ্ছে!'

বলে হাসলও একটু। বহুদিন পরে সে হাসি বড় করুণ দেখাল ওর মুখে।

সকালে বিস্তর কেঁদেছিল মহাশ্বেতা, আছাড়ি-পিছাড়ি করে কেঁদেছিল—এখান থেকে সরে রান্নাঘরের দাওয়ায় পড়ে। কিন্তু এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে সে। তরলাই তাকে বুঝিয়েছে, 'দিদি কাঁদবার সময় ঢের পাবেন, জীবনভোরই তো তোলা রইল কান্না—। এখন একটু শক্ত হোন। শেষ সময়টা কাছে থাকুন, যতটা পারেন সেবা ক'রে নিন। নইলে এর পর আপসোসের শেষ থাকবে না।'

মহাশ্বেতাও বুঝেছে কথাটা। তরলার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর তার চিরদিনের বিশ্বাস, ঠিকই বলেছে বৌটা। খুব ভেবেচিন্তে বলে—একেবারে নিয্যস্ খাঁটি কথা। সে জোর করে মনকে শক্ত করেছে। শুধু খাওয়ার সময়টাই আর একবার ভেঙ্গে পড়েছিল। আগে অতটা বুঝতে পারে নি। সকাল করেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল মেজবৌ, জোর করে হাত ধরে ওকে এনে বসিয়েছিল আসনে। মহাশ্বেতা প্রথমটা যেতেই চায় নি—'খাওয়ায় ইচ্ছে নেই আমার একদম, সত্যি বলছি। মুখেই দিতে ইচ্ছে করছে না কিছু। আর সে তখন তোদের সঙ্গে না হয় বসব। এখন বুড়ো মাগী আমাকে সাততাড়াতাড়ি খেতে দেবার দরকার কি?' প্রমীলা বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'খেতে তো হবেই, পোড়ার পেট সব্বকাল আছে আর সব্বকাল থাকবে। কাজটা সেরে নিয়ে বটঠাকুরের কাছে একটু স্থির হয়ে বসো। দরকার কিছু না পড়ুক, চোখ খুলে তোমাকে দেখতে পেলেও ওঁর শান্তি হবে।'

আর কোন প্রতিবাদ করে নি মহাশ্বেতা কিন্তু প্রমীলা ভাতের থালা এসে ধরে দিতে, চমকে উঠেছিল। আজকাল মাছতো তাদের বাড়ি ঢোকেই না। জিনিসপত্তরের দাম আগুন, দু'টাকা-আড়াই টাকা সেরের কম মাছ নেই বাজারে—এ রাবণের গুষ্টিকে এক টুকরো করে দিতে গেলেও তো দুসের মাছ লাগে। পুকুর থেকে না ধরানো হলো বা ছোটকর্তা ছিপ ফেলে না ধরলে আর মাছ পাতে পড়ে না। কিন্তু আর যাই হোক—আজ কেউ মাছ ধরতে

যায় নি—এই বিপদের মধ্যে। অথচ পাতে এত রকম মাছ এল কোথা থেকে? যে যে মাছগুলো মহাশ্বেতার প্রিয়, তার সবগুলিই আছে, পার্শে, বাটা, চিংড়ি—'এত মাছ এল কোথা থেকে রে? কেউ পাঠিয়েছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল মহাশ্বেতা।

এক মুহূর্ত দেরি হয়েছিল উত্তর দিতে। প্রমীলা যেন কথা খুঁজে পায় নি সেই নিমেষকাল সময় চোখের পাতা সামান্য একটু অবনত হয়েছিল তার। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট। মহাশ্বেতারও বুঝতে বাকি থাকে নি ইঙ্গিতটা। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে, আছড়ে পড়েছিল থালার পাশে।

ব্যাকুল হয়ে প্রমীলা একেবারে কোলের মধ্যে তুলে নিয়েছিল ওর মাথাটা, 'চুপ চুপ, ও দিদি, এখনও যে মানুষটা বেঁচে। ভাতের থালার সামনে বসে ঠিক দুপুরে কাঁদলে অকল্যাণ হবে যে! চুপ করো, চুপ করো, আমার মাথা খাও!'

চুপ করেছিল একটু পরেই কিন্তু খেতে পারে নি। নিতান্ত অকল্যাণের ভয়েই প্রমীলা তরলার পীড়াপীড়িতে একটু মাছ ভাত তুলে মুখে ঠেকিয়েছিল একবার—নিয়মরক্ষার মতো।...

কিন্তু কাঁদে নি আর। এখনও বিশেষ কান্নাকাটি করল না। একটা কথা বলার জন্য বহুদিন ধরে ছটফট করছে সে—অনভ্যাসে লজ্জায় বলতে পারে নি। আজও সকাল থেকে কথাটা বলতে চেষ্টা করেছে বহুবার। এখন বলতে না পারলে আর বলাই হবে না কোনদিন। এ-ই শেষ সুযোগ বোধহয়। সে স্বামীর পায়ে একটা হাত রেখে সেই কথাটাই বলল, 'আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক বাক্যি যন্ত্রণা অনেক গাল-মন্দ করেছি—আমার পাপের শেষ নেই। তোমার কাছে আজ ঘাট মানছি, তুমি মাপ করো আমাকে।'

'পাপ! আমারই পাপের কি শেষ আছে বড়বৌ!' হঠাৎ যেন অভয়পদ তার কণ্ঠে খানিকটা জোর ফিরে পায়, 'তোমার ওপর ছেলেদের ওপর চিরদিন অবিচার করেছি। আমিই তাদের সংসারে এনেছি—অথচ কোনদিন মানুষ করার চেষ্টা করি নি—অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে বসে ছিলুম। কিন্তু অদৃষ্টের ওপর সে বিশ্বাসও তো ছিল না, সেও তো মিথ্যে—নইলে এত হাঁকড়-পাকড় করে অধম্ম করে পয়সা রোজগার করতে যাব কেন, আর তুমিই বা এমন করে সর্বস্ব খোয়াবে কেন? আমি ঠগ বড়বৌ, আমি চোর জোচ্চোর মিথ্যেবাদী! সকলকে ঠকিয়েছি,—তোমাকে, ছেলেদের, জগৎ-সংসরকে ঠিকয়েছি,—নিজেকেও ঠকিয়েছি সেইসঙ্গে চিরদিন। আমার অন্যায়ের সীমা-পরিসীমা নেই। পারো তো তুমিই আমাকে মাপ করো।'

জীবনে এত কথা তার স্বামী বোধহয় কোনদিন বলে নি তাকে, এমন নিনু হয়ে তো নয়ই। অত বড় শক্ত মানুষটার এই দুর্গতি দেখে আবারও চোখে জল এসে যায় মহাশ্বেতার। কথাগুলো সব বোঝে না সে— আকুতি ও আকুলতাটা বোঝে।

অভয়পদরও অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। চোখ বুজে হাঁপাতে থাকে সে। সে হাঁপানোর ধরন দেখে—বিশেষত আজ সকাল থেকে যে ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়ছিল, তারপর এই ঘন ঘন সশব্দ নিঃশ্বাসে মহাশ্বেতার ভয় হয় বুঝি শ্বাসই উঠছে।

কিন্তু সে ভয় পেয়েছে তা চোখ বুজেও বুঝতে আরে অভয়পদ। অতি কষ্টে একটা আঙ্গুল তুলে ওকে আশ্বস্ত করে। ইঙ্গিতে বুকটা দেখিয়ে দেয়। চিরদিন সমস্ত ভয়ে এই স্বামীই ওকে অভয় ও আশ্বাস দিয়ে এসেছে—আজও সে অভ্যাস যায় নি তার। এক সঙ্গে ভিড় করে সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে ইতিহাস মনের সামনে এসে দাঁড়ায় মহাশ্বেতার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উদ্গত অশ্রু দমন করে কাছে সরে আসে সে, আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

সত্যিই কঙ্কালসার হয়ে গেছে হাড়-পাঁজরের খাঁজে যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে চামড়াটা।

BanglaBook.org

অমন বলিষ্ঠ মানুষটার এই পরিণতি! অভাগী রাক্ষসী সে, তার জন্যেই বোধ হয় এই হাল হ'ল। তারই দুর্বার লোভ—সেই সেই লোভই তাকে পিশাচী করে তুলেছিল। অগ্র-পশ্চাৎ ভাল-মন্দ কিছু ভাবে নি সে, ছিন্নমস্তার মতো নিজেই নিজের রক্তপান করেছে—মনের আনন্দে নিজের মহাসর্বনাশের সৌধ রচনা করেছে।

আবারও দু-চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে চোখে। এবার আর দমনও করতে পারে না তা—শুধু প্রাণপণে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে শব্দটা নিবারণ করে।

খানিকটা পরে দুজনেই সামলে ওঠে একটু। মহাশ্বেতা প্রায় চুপি চুপি প্রশ্ন করে, 'প্রাচিত্তির করাবে একটা? ও বাড়ির মেজদি বলছিল—এ সময়, এ সময় নাকি করতে হয়।'

'না। প্রাচিত্তির অনেকদিন ধরেই হচ্ছে—তোমরা টের পাও নি। তুষানলে ধিকি-ধিকি পুড়লেও এর চেয়ে বেশি হ'ত না। ওসব লোক দেখানো প্রাচিত্তিরে আমার আর কি করবে?'

একটু পরে আবারও বলে আরও চুপি চুপি, ভগবানকে নিত্য ডেকেছি, বলেছি যদি আমার প্রাচিত্তির শেষ হয়ে থাকে তো এবার আমাকে নিয়ে নাও। কারুর সেবা না আমাকে নিতে হয়—গুয়ে-মুতে না পড়ে থাকি। মনে হচ্ছে তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন এবার, প্রাচিত্তির শেষ হয়েছে।'

বিকেলে আবার অম্বিকাপদ কাছে এসে বসল। দুর্গাপদও। অম্বিকা চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল—দুর্গাপদ দাদার পায়েহাত বুলোতে লাগল। অভয়পদ চোখ খোলে না, কিন্তু ওদের উপস্থিতি অজানা থাকে না, সেটা টের পায় ওরা।

মিনিট কতক পরে অম্বিকা বলে, কিছুই তো খাবে না বলছ, তা অন্য কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে যদি থাকে—'

এবার উত্তর দেয় অভয়। আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে কণ্ঠ, একটু যেন জড়িয়েও এসেছে। তবু বুঝতে পারে এরা। অভয় বলে, 'ইচ্ছে।.... যা আছে তা আর মেটানো হয়ে উঠবে না। পরবে না তোমরা। বহুদিন থেকেই মনে ইচ্ছে ছিল, একবার আপিসের সেই জায়গাটা ঘুরে আসি।'

দুর্গাপদ বলে, 'কিন্তু সে আপিস তো সেখানে নেই দীর্ঘকাল। ভেঙ্গে-চুরে সমতল হয়ে গেছে। সে তো অনেক দিন নেই বড়দা—'

'জানি।' শ্রান্তভাবে উত্তর দেয়, 'সেই জায়গাটা—।'

আর কিছু বলে না। সম্ভব নয়, তা এরাও বোঝে। তাই চুপ করে থাকে দুজনেই।

আরও খানিক পরে অম্বিকা বলে, 'আমাকে কিছু বলতে চাও। কোন ভার দিয়ে যাবে—?'

'না। তোমাকে জানি, তুমি যত দিন বাঁচবে বড়বৌ আর ছেলেদের তুমি দেখবে। তারপর—ওদের অদৃষ্ট। কোন দিনই ওদের কথা ভাবি নি, আজই বা নতুন করে ভাবতে বসব কেন?'

'আত্মীয়দের কাউকে দেখবে? খবর দেব?'

'না না।' এই অবস্থাতেও যেন চমকে ওঠে অভয়পদ, আমাকে চুপি চুপি যেতে দাও। শান্তিতে। কেউ না, কাউকেই দেখতে চাই না।'

এরপর যেন একেবারেই চুপ করে সে। দুর্গা কী সব প্রশ্ন করে, রাত্রে মহাশ্বেতা তড়িৎ সবাই এসে একটু দুধ খাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করে—কিন্তু অভয় আর কথা কয় না, মুখও খোলে না। একেবারে নিথর হয়ে পড়ে থাকে।

শেষরাত্রের দিকে শ্বাস ওঠার লক্ষণ টের পাওয়া যায়।

টের পায় প্রমীলাই প্রথম। সে-ই ছুটে গিয়ে অম্বিকাকে ডেকে আনে। ছেলেদের ডেকে তোলে ঘুম থেকে। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায়—কেবল ক্ষীরোদা ছাড়া। তাঁকে কেউ এ খবর জানায়ও নি।

BanglaBook.org

এবার সবাই মিলে ধরাধরি করে নামানো হয় বেঞ্চির ওপর থেকে। তেশূন্যে মরতে নেই। মাটিতে শোয়ানোই নিয়ম। সাবধানেই তোলে কিন্তু তাও বোধ হয় টের পায় অভয়পদ। কে একজন ঠাকুরঘর থেকে চরণ-তুলসী এনে কপালে বুকে রাখে। অম্বিকা কাছে বসে গীতা পাঠ করে। দুর্গা বুড়োকে বলে তারক-ব্রহ্ম নাম শোনাতে। পাশে দাঁড়িয়ে বলে বলে দেয় সে-ই। ধনা ফোঁটা ফোঁটা করে চরণামৃত দেয় মুখে।

একেবারে ভোরবেলা হঠাৎ যেন চোখের পাতা দুটো নড়ে একু, ঠোঁটটাও ঈষৎ কাঁপতে থাকে। অম্বিকা হ্যারিকেনের আলোতেই তা লক্ষ করে। কানের কাছে মুখ এনে বলে, কিছু বলবে দাদা? কাউক কিছু বলতে চাও? বৌদিকে ডাকব?

'গায়ত্রী—গায়ত্রীটা ভুলে গেলুম যে। বেঁচে থাকতেই—'

খুব আস্তে আস্তে বলে, শোনাই যায় না এমন ক্ষীণ স্বরে। যে দু-তিনজন ঝুঁকে পড়েছিল মুখের ওপর, তারাই শুনতে পেল। তাও কথাটা শেষ হ'ল না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল—তেমনি হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল।

অম্বিকা জোরে জোরে গায়ত্রী মন্ত্র শোনাতে লাগল। শুনতে শুনতে সেই মৃত্যুপথযাত্রীর বিবর্ণ মুখও যেন উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। মনে হ'ল সে বুঝতে পারছে মন্ত্রটা, মনেও পড়েছে বোধ হয়। হয়ত নিজেও মনে মনে সে মন্ত্র উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে দু-তিন মিনিটের বেশি নয়। তারপরই মাথাটা একদিকে কাৎ হয়ে হেলে পড়ল, দু-একবার পড়ে যাওয়া বন্ধ ঠোঁট নড়ে ফু ফু করে শ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর সব স্থির হয়ে গেল।

কিছুই রইল না আর। কেবল প্রথম ঊষার ক্ষীণ আলোয় মনে হ'ল কিছু পূর্বের সেই প্রসন্ন দীপ্তিটা এখনও মুদিত দুই চোখের কোণে ও বন্ধ ওষ্ঠের রেখায় লেগে আছে। মৃত্যুর কালিমা সে প্রসন্নতা নষ্ট করতে পরে নি।....

ক্ষীরোদার ভাল ঘুম হয় না আজকাল, মাঝে মাঝে তন্দ্রার মতো আসে শুধু। তেমনিই একটা আচ্ছন্নতা এসেছিল ভোরের দিকে। অকস্মাৎ প্রবল কান্নার রোল কানে যেতে চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। বুকের মধ্যেটা আকুলি-বিকুলি করে উঠল ভয়ে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, নিচে নামতেও পারবেন না, শুধু সেইখানে বসেই অসহায় আকুল কণ্ঠে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'হ্যাঁরে—ওরে অ অম্বিকা, অ দুগ্‌গ!—ওরে অ ছেলেরা—এ কান্না কাদের বাড়ি উঠল রে। ওরে কে গেল রে এমন ভোরবেলা? আমার বাড়িতে কেউ গেল না তো? আমারই কোন সব্বনাশ হ'ল নাকি রে? আমার ছেলেগুলো আছে তো সব? আমার বড়ছেলে, আমার অভয় ভাল আছে তো রে?... ওরে তোরা কেউ আমাকে খবরটা দিয়ে যা না রে। আমি যে আর ভাবতে পারছি না।... ওরে অ ছেলেরা, বুড়ো, হাবলা, তোরা একটিবার কেউ আয় না রে—'

কাউকে দেখা যায় না, কোন সংবাদই পান না তিনি। অথর্ব বৃদ্ধার ব্যাকুল আহ্বানে কেউ ছুটে এসে ওপরে আসে না। সম্ভবত শুনতেও পায় না কেউ। তাঁর আর্ত আহ্বান ও কাতর প্রশ্ন শূন্য ঘরের চারটে দেওয়ালে ব্যর্থ মাথা কুটে যেন তাঁর কাছেই ফিরে আসে আবার। ক্রমশ খুঁৎ-খুঁৎ করে কাঁদতে শুরু করেন তিনিও। কাঁদেন নিজের জন্যেই। সবাই তাঁকে অযত্ন অবহেলা অগ্রাহ্য করছে—সেইজন্যে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন একটু পরে। শ্রান্তি থেকেই আচ্ছন্ন ভাবটা আসে আবার, একটু তন্দ্রার মতো বোধ হয়—ঘুমিয়েই পড়েন শেষ পর্যন্ত।

নিচের কান্নার রোলও তখন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। ক্ষীরোদার ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

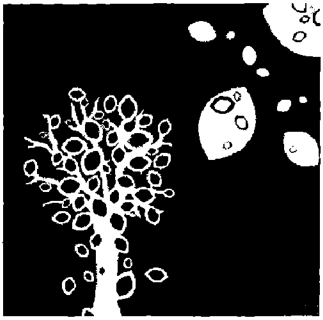

গ্রন্থশেষ

শ্যামা ঠাকরুণ কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখতে পারেন। বেশিদূরে যেতে হবে না—কলকাতার কাছেই, খুবই কাছে থাকেন তিনি। বি-এন-আর দিয়ে গেলে হাওড়া থেকে আট ন মাইলের মধ্যেই। বাসেও যেতে পারেন—বারদুই বাস বদল করতে হবে, এই যা।

সে বাড়িও তাঁর তেমনি আছে। একটুও বদলায় নি। বাইরের জগতে কত কি পরিবর্তন হ'ল, কত এগিয়ে গেল দেশ, জাতি; চারিদিকে উন্নতির, নতুন ক'রে গঠনের কত আয়োজন, চারিদিকে কর্মব্যস্ততা—নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা। নতুন কল্পনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু সেসব কোন হাওয়াই সে বাড়ির সেই ঘন গাছগাছালিতে পূর্ণ অন্ধকার প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারে না। হাওয়াই ঢোকে না। সমস্ত উঠানটা আম কাঁঠাল পেঁপে গাছে এমন জড়াজড়ি আর সেই গাছে-গাছে এমন বিভিন্ন রকমের লতা যে, দিনের বেলা সামান্য আলো যদি বা তার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে নিচে নামে—হাওয়া একদম আসে না। অথচ হাওয়ার অভাব নেই, এ বাড়ির বাইরে গেলেই হয়ত এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আপনি পাবেন। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন ঝড়ের মতো দক্ষিণা বাতাস বইতে থাকে তখনও সে হাওয়া এই গাছপাতাগুলোর মাথার ওপর দিয়ে, তাদের মাথার ওপরের পত্র-পল্লব কাঁপিয়ে নুইয়ে চলে যায় কিন্তু নিচের ঘর্মাক্ত মানুষের শ্রান্তি দূর করতে তার এতটুকু আভাস পর্যন্ত মেলে না।

সে বাড়ি খুঁজে বার করতেও আপনার অসুবিধা হবে না। স্টেশন থেকে এগিয়ে সরস্বতীর পুল পার হয়ে রাজবাড়ি বাজার ছাড়িয়ে সিদ্ধেশ্বরীতলা ডাইনে রেখে আরও একটু যদি হাঁটতে পারেন, মাত্র রশিদুই পথ—তাহলেই দেখতে পাবেন—তিনদিকে গভীর পগার বা খানায় ঘেরা দ্বীপের মতো বাড়িটি একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তবে খুব চট করে দেখতে পাবেনও না। নিবিড় বাঁশঝাড়ে আর তেপল্‌তের ঘন বেড়ায় আড়াল করে রাখবে আপনার দৃষ্টি; আরও বহু গাছপালা—কলাঝাড়ে ডুমুর গাছে হাসনুহানায়-যেন নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছে সামনের দিকটায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে ঠাওর পাবেন একটা বেড়া, বেড়ার গায়ে ছোট্ট একটু আগড়। আগড় ঠেলে পায়ে-চলা সরু পথের রেখা ধরে বেশ খানিকটা ভেতরে এগিয়ে গেলে বাড়িটা দেখতে পাবেন ভাল করে। সামনের দিকে ছোট পুকুরও আছে একটা, তার পাড়ে পাড়ে নারকেল-সুপুরি-আমড়া তেঁতুলের অসংখ্য গাছ থাকা সত্ত্বেও তবু সেইখানটাই একটু ফাঁকা। বাড়িটা যে আদৌ দেখা যায়—তার কারণ ঐটুকু খোলা জায়গার আলো। তা নইলে বাড়ির ভেতর বার সবটাই প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

এসব গাছপালা শ্যামাই লাগিয়েছেন। এত ঘন গাছপালায় ফল ফসল হয় না তা তিনিও জানেন—খনার বচন তিনিই শোনান কতজনেকে, 'গাছ-গাছালি ঘন সবে না, গাছ হবে তার ফল হবে না।' তবু কোনটাই প্রাণ ধরে ফেলে দিতে পারেন না। বরং এখনও পুঁতে চলেছেন এটা-ওটা। কেউ বলতে এলে বলেন, 'থাক থাক। খেতে দিতে তো হচ্ছে না।... আমার বরাতে ফলের ভোগ নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছ। নইলে নিজের অতগুলো থাকতে—! আমার অদৃষ্টই

BanglaBook.org

নিষ্ফলা। মাঝখান থেকে ওদের দুষি কেন?... আর কাটো বললেই কি কাটা যায়—? বলে বাড়ির গাছা আর কোলের বাছা দুই-ই সমান।'

কিন্তু নিজেও এক এক সময় ধৈর্য রাখতে পারেন না। বিশেষ যখন পরের বাড়ি কোথাও গিয়ে দেখে আসেন লাউমাচায় বড় বড় লাউ...উঠানে হয়ত মৃদুঙ্গের মতো কুমড়ো, কিম্বা মোটামোটা কালীবৌ কলার কাঁদি বা গাছ ভর্তি কাঁঠাল-আম—তখন বাড়িতে এসে অবশিষ্ট কটা দাঁত কিড়মিড় করে গালাগাল দেন অকৃতজ্ঞ গাছগুলোকে, 'মরণ তোদের, মরণ! মরণ! পোড়াকপাল হ'লে কি গাছপালাও পিছনে লাগে রে! কেন আমি কি করেছি তোদের? ঐসব চোখখাকী গতরখাকীদের বাড়ি গিয়ে ফসল ঢেলে দিয়ে আসতে পারো—আমাকে একটা দিতেই বুক চড়চড় করে? আমার বেলাই সব আগুন লেগে পুড়ে যায়, ছাতার ধোয়ায় ধুয়ে যায়?'

গাছপালার সেই প্রায় দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করে যদি বাড়িটাতে আপনার নজর চলে তো দেখবেন, বাড়িটা নেহাৎ ছোটও নয়। বাইরের দিকে বৈঠকখানা ঘর আছে, তার রক আছে। ভেতরে দুটো ঘর-দালান—এছাড়া মাটির বড় রান্নাঘর, তার প্রশস্ত দাওয়া এবং বেশ খানিকটা উঠোন নিয়ে পাঁচিলঘেরা মূল বসত-বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বাগান—যে করেছিল তার রুচিবোধ আছে। কিন্তু সে বাড়ির আসল চেহারাটা আজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঘন ছায়ার আস্তরণে যেন ঢাকা পড়ে আছে সবটা, দুপুর বেলা ছাড়া সবটা নজরে পড়াই কঠিন। কখনই রোদ নামে না বলে বাড়িটা কেমন স্যাঁতসেঁতে ভিজে-ভিজেও লাগে বারো মাস। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ছাড়ে। ভিজে ভিজে হওয়ার আরও কারণ তিনদিকে গভীর খানা বা পগার। এ পগার একেবারে কখনই শুকোয় না, গ্রামের অন্য সব পগার শুকিয়ে খট্‌খট করে যখন তখনও এ-খানাটায় সামান্য জল থাকে। তার ফলে ভাম-ভোঁদড় গো-হাড়গেলের স্থায়ী আড্ডা এখানে। বর্ষাকালে পগারের জল উপ্‌চে বাগানে ওঠে। ময়লা নোংরা জল, ঘেন্না হয় সে জলে পা দিতে। তবু শ্যামা তাতে এক সান্ত্বনার সূত্রও আবিষ্কার করেছেন। সে জলের সঙ্গে কিছু কিছু মাছ এসে তাঁর পুকুরে পড়ে—বাগানে বা উঠানে চুপড়ি চাপা দিয়ে ধরাও যায় কিছু কিছু। তিনি খান না, খাবার লোকও কেউ নেই আর, কিন্তু পাড়া-ঘরে বিক্রি করে দুচারটে পয়সা পাওয়া যায়, সেইটেই লাভ।

সাধারণ হিসেবে বাড়িটা বড়ই—তবু তাতে তিলধারণের স্থান নেই। না, ফার্নিচারে বোঝাই নয়, দালান দাওয়া রক রান্নাঘর, এমন কি শোবার ঘরেও কিছুটা অংশ বোঝাই হয়ে গেছে শুকনো পাতায়। খ্যাংরাকাঠি চেঁচে বার করে নেওয়া নারকেল পাতা তো আছেই— তাছাড়াও আছে অসংখ্য গাছের অসংখ্য শুকনো পাতা ও পালা, আমড়া পাতা, বাঁশ পাতা, সুপুরি পাতা, সুপুরির বেল্‌দো, বাঁশের গোড়া, কঞ্চি। সারাদিনই ঘুরে ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করেন তিনি— একটি একটি করে পাতা কুড়িয়ে বেড়ান—সংগ্রহ করেই চলেছেন। কার জন্যে এখনও তাঁর এই কষ্টস্বীকার উঞ্ছবৃত্তি তা তিনিও জানেন না। তাঁর যা সামান্য রান্না-খাওয়া তাতে বর্তমান সঞ্চয়েই অন্তত বিশ বছর চলবার কথা। আরও অতদিন তিনি বাঁচবেন না এটা ঠিক, তবু সে পাতা জমিয়েই যাচ্ছেন, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। কেউ অনুযোগ করলে কি ঠাট্টা করলে চটে যান। বলেন, 'থাক না বাছা, পাতায় নজর দাও কেন? কেউ কি আমাকে দরকারের সময় এক মণ কাঠ কি কয়লা দিয়ে উগ্‌গার করবে? ওতে আমার সম্বচ্ছরের জ্বালানির খরচা বেঁচে যায়। আর খাওয়াতে পরাতে তো হচ্ছে না ওদের—উল্‌টে ওরাই আমার সুসার করছে সংসারে!... পাতার জন্যে আট্‌কাচ্ছেই বা কার কি? কারুর কি থাকার অসুবিধে হচ্ছে?'

তা হচ্ছে না। কারণ কেউই নেই এ-বাড়িতে। অদূর অভিষ্যতে কেউ আসবে অথচ থাকবার মতো লোকের অভাব নেই তার। বলতে গেলে হাঁটের ফিরাঙ্গ তার চারিদিকে। মরে হেজে গিয়েও তিন ছেলে তিন মেয়ে ছিল। একটা ছেলে হারিয়ে গেছে আরও দুটো ছেলে বর্তমান। রোজগারও করে তারা। বিয়ে-থা করেছে, ছেলেমেয়েও আছে। মেয়েও আছে দুটো—

তাদের ছেলেমেয়ে! নাতি-নাত্‌নীদেরও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। জাজ্জ্বল্যমান সংসার। তবু কেউই নেই আজ তাঁর কাছে। সন্তান বলতে এখন এইসব গাছপালা, শুকনো পাতা আর টাকার সুদ। চোখে দেখতে পান না, চলেন ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে—কোমর ভেঙ্গে গেছে বহুদিনই—তবু পাতা জমানোরও যেমন বিরাম নেই, তেমনি টাকা জমানোরও না। তেজারতি কারবার ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটি-বাটি রেখে চার আনা আট আনা পয়সা থেকে শুরু করে গহনা-বন্ধক রেখে বিশ পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকাও ধার দেন। সুদও নেন চড়া। চোখে দেখতে পান না বলে কত লোক ঠকিয়ে যায়—আজকাল হিসেব করতেও কেমন গোলমাল হয়ে যায়, সেটা যে বোঝেন না তাও নয়—তবু ছাড়তেও পারেন না কারবার। প্রবল নেশার মতোই ওটা তাঁকে পেয়ে বসে আছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জিনিসটা কি অনুভব করে দেখে নেন—তেমনি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সিকি আধুলি টাকা বার করে দেন। আর প্রয়োজন হলে সেই ভুঁয়ে-মুয়ে হয়ে হেঁটেই সুদ আদায় করে বেড়ান। হেঁটে যান হেঁটে আসেন— শিবপুর থেকে পোদড়া শালিমার পর্যন্ত।

তবে আজকাল আর যেতে পারেন না। শক্তিসামর্থ্যর অভাব বলে নয়— বাড়িতে রেখে যাবেন এমন লোক নেই বলে। অথচ—ছিল নয়, আজও আছে সবাই। বড় ছেলে-বৌ থাকে জামালপুরে, ওরা নাকি সেখানে খাপরার বাড়ি তুলে নিয়েছে, সেখানেই থাকবে। শুধু তাঁর কাছে থাকতে হবে বলেই আসবে না এখানে। ছোট ছেলে বাড়ি-ঘর কিছুই করতে পারে নি, টালিগঞ্জের দিকে কোথায় যেন খোলার ঘর ভাড়া করে থাকে। কালা-হাবা মানুষ, সামান্য আয়—এই বাজারে ঘর-ভাড়া দিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটে—তবু এখানের এই নিজেদের পাকা বাড়িও পছন্দ নয়।

বিধবা মেয়ে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তার যা স্বভাব, সে মেয়ের আর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না শ্যামার। বড় মেয়েই যা ন-মাসে ছ-মাসে আসে এক-আধদিন—মায়ের খবর নিয়ে যায়। তবে তারও বৃহৎ সংসার, ফেলে এসে ওঁকে আগলাবে তা সম্ভব নয়।

এ-সব ছাড়াও কিন্তু ছিল একজন।

বলাইটাই ছিল। সে কোনদিন কোথাও যেতে পারবে না— এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি, পাখির পাখ্‌না কাটা গেছে, ওড়বার পথ বন্ধ হয়েছে মনে করেছিলেন। সেই ভাবেই জন্তুর মতো করে রেখেছিলেন তাকে। লেখাপড়া শেখে নি—ভদ্রসমাজে বেরিয়েও কারও সঙ্গে কথা কইতে পারতে না। দিনরাত ঘরের কোণে মুখ বুজে বসে থাকত। তবু সেও রইল না। নিজের দোষেই তাকে হারালেন শ্যামা, নিজের বুদ্ধির দোষে। শেষবারের মতো শখ হয়েছিল তাঁর আবার সংসার পাতবার। শেষ শখ জেগেছিল পরের মেয়ের সেবা খাবার। সেই শখেই সব গেল—বেনোজল এসে ঘোরো জল বার করে নিয়ে গেল—মূলে-হাভাত হ'ল। মুখে আগুন তাঁর ইচ্ছে করে নিজের মুখে নিজে নুড়ো জ্বেলে দিতে। লজ্জা-ঘেন্না নেই—তাই আবার ঐ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধতে গিয়েছিলেন। সারাজীবন ধরে দেখেও চৈতন্য হ'ল না—নিজের ভাগ্য বুঝতে পারলেন না তিনি—আশ্চর্য!... বলে, 'এত সুখ তোর কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে!' কোন লজ্জায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করতে গেলেন তিনি।

বলাই চলে যাওয়ার পর থেকে শ্যামা একাই আছেন। একেবারে নিঃসঙ্গ একক। ভালই আছেন। যারা আসে তাঁর কাছে—অধিকাংশই খাতক—তাদেরও তাই বলেন, 'বেশ আছি আমি, বেশ থাকি একলা একলা। লোক থাকলেও আমার কোন উপকার হবে না এ আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। তবে আর কেন? বরঞ্চ থাকলেই দায়, এ আমি ইচ্ছে হ'লে খাচ্ছি না হয় তো এক ঘটি জল খেয়ে পড়ে থাকছি, অপর কারুর ভাবনা তো ভাবতে হচ্ছে না।'

'তবুও', খাতকরা কর্তব্যবোধে উদ্বেগ প্রকাশ করে হয়ত 'মানুষের শরীর, বলা তো যায় না। রাত-বিরেতে যদি অসুখ-টসুখ হয়ে পড়ে—'

কথা শেষ করতে দেন না শ্যামা, 'কী আর হবে তাতে, মরে পড়ে থাকব, এই তো! সে

BanglaBook.org

যদি কপালে লেখা থাকে তো ঘুচবে না, লোক থাক আর না-ই থাক। খবর পাবেই ঠিক—বিষয়ের দখল নিতেও অন্তত পচা-মড়াটা বার করতে হবে।... মরবার পর লাশটা কি হবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

না, একাই বেশ আছেন। বেশ থাকেন তিনি। উনআশি বছর বয়স চলছে, রোগে ও অনাহারে শীর্ণ শরীর, সামনে ঝুঁকে পড়তে পড়তে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে মুখটা। কোমর ভেঙ্গে গেছে অনেকদিন, যদিচ দাঁত এখনও সব পড়ে নি। একটু চললেই কোমর পিঠে যন্ত্রণা হয়, খব কষ্ট হয় যখন মধ্যে মধ্যে একবার কোমরের পিছনে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। সবটা সোজা হয় না, কেমন একটা অদ্ভুত ত্রিভঙ্গ আকার ধারণ করে।

তবু সেই অবস্থাতেই সারাদিন বাগানে ঘুরে বেড়ান প্রেতিনীর মতো। কোথায় এখনও একটা গাছ পোঁতবার মতো আট আঙুল জায়গা খালি আছে—আর কোথায় আছে জ্বালবার মতো একটি শুকনো পাতা—তারই সন্ধানে। অবশ্য দিনের আলো বড় কম। চারটে বাজলেই এ বাড়িতে আলো জ্বালবার প্রয়োজন হয়। মশার গর্জন শুরু হয়ে যায় কোণে কোণে—সেই ভয়াবহ ঝুপ্‌সি অন্ধকার বাড়িতে একা চুপ ক'রে বসে থাকতে হয় তখন। রাত্রিটাই বড় দুঃসহ। ঘুম হয় না তাঁর আজকাল। কোনদিন এক ঘণ্টা, কোনদিন দু' ঘণ্টা কোন দিন আদৌ চোখ বুজতে পারেন না। তেল খরচার ভয়ে আলোও জ্বালেন না, মনকে বোঝান—'চোখে যখন দেখতে পাই নে তখন আলো জ্বাললেই বা কি না জ্বাললেই বা!' দিনের আহার সারতেই বেলা তিনটে বাজে, রাত্রে খাওয়ার প্রয়োজনই হয় না। যদি বা কোনদিন ইচ্ছা হয়, গভীর রাতে উঠে হাতড়ে হাতড়ে টিনের কৌটো থেকে চালভাজা বার করে অন্ধকারেই তাতে একটু তেলহাত বুলিয়ে নিয়ে আরও গভীর রাত পর্যন্ত বসে বসে কুড়-কুড় ক'রে চিবিয়ে খান। আর হয়ত নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবেন বসে বসে।

এই রাতের বেলাটা একটু ভয় ভয়ও করে আজকাল। আরও সেই জন্যে ঘুম আসে না হয়ত। না, প্রাণের ভয়, অসুখের ভয় নয়। অশরীরী কোন প্রাণীর ভয়ও না। ভয় মানুষের, চোর-ডাকাতের। অবশ্য তার জন্যে সতর্কতারও ত্রুটি নেই। ছাদের কড়ি ও বরগার খাঁজে, রান্নাঘরের মেজে খুঁড়ে—বন্দকী গহনা ও টাকা লুকিয়ে রাখেন তিনি। দুপুরবেলা রান্নাখাওয়ার সময় দোর বন্ধ ক'রে মেজে খোঁড়েন, আবার বসে বসে গোবর-মাটি দিয়ে বার বার নিকিয়ে সে খোঁড়ার চিহ্ন বিলুপ্ত করেন। যতক্ষণ না নিজেই ভুলে যান কোথায় রেখেছেন ততক্ষণ নিকিয়েই যান।

তবু কাউকেই ডাকেন না তিনি। কাউকে অনুরোধ করেন না কাছে এসে থাকতে। দিনের পর দিন এমনি নিঃসঙ্গ কাটে তাঁর। একা একা বাগানে ঘুরে বেড়ান আর কোমর ছাড়াবার জন্যে মধ্যে মধ্যে বেঁকে-চুরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। শূন্য বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। হঠাৎ একটা উড়ো-কাক জোরে ডেকে উঠলেও চমকে ওঠেন শ্যামা। এমনিই নিঃসঙ্গে দিন কাটে তাঁর—এমনিই সর্বপ্রকার শব্দে অনভ্যস্ত হয়ে গেছেন তিনি।

আজকাল অন্ধকার হবার পরও ঘুরে বেড়ান অনেকক্ষণ পর্যন্ত। রাজগঞ্জের কলে পাঁচটার ভোঁ না বাজলে ঘরে ঢোকেন না। ঘুরে বেড়ান আর হিসেব করেন মনে মনে, তাঁর ছেলে-মেয়েদের সব ধরলে একুশটা নাতি-নাতনী । আর হিসেব করেন, কার কাছে কত সুদ বাকি আছে, সুদে আসলে কার কোন্ বন্ধকী জিনিসের দাম ছাড়িয়ে গেছে ঃ 'এবার পাকড়াশী-গিন্নী এলে পষ্ট বলব, না দিতে পারো এলে দিয়ে যাও, আমি আর বসে থাকতে পারব না। এখন বেচলেও আমার ঢের পাওনা থাকবে, সে যা দেবে তুমি তা ঢের বুঝেছি, মিছিমিছি গরিব বিধবার লোকসান করো কেন?' নিজের মনেই মহড়া দেন কথাটার—হাত-পা নেড়ে।

বলাইয়ের খবর তিনি রাখেন না। শুনেছেন যে সে তাঁর উপদেশই শুনেছে, সত্যিই ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে। তা খাক। কে কি করছে না করছে তা জেনে তাঁর দরকার নেই। কাউকেই দরকার নেই আর।

বেশ আছেন তিনি। একাই ভাল আছেন।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org